

ভারতের সাধক

ভারতের সাধক

৯ম খণ্ড

শঙ্করনাথ রায়

করুণা প্রকাশনী । কলিকাতা-৯



প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৩

প্রকাশক
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১৮এ টেমার লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
সুপ্রকাশ সেন

অবধূত নিত্যানন্দ

বীরভূমের একচক্র গ্রাম। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সেদিন ধীর পদে এ গ্রামের হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মস্তকে জটার ভার, গৌরকান্তি দীর্ঘবপু এই অভ্যাগতকে দেখিয়া পণ্ডিতের আনন্দের সীমা নাই। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া যুক্তকরে কহেন, "প্রভু, কৃপা ক'রে দর্শন যখন দিয়েছেন, আজ আমাদের সেবার অধিকার দিন। এখানেই রাত্রি যাপন করুন।"

স্মিতহাস্যে হস্ত উত্তোলন করিয়া সন্ন্যাসী আশীর্বাদ জানান। বুঝা গেল, এ রাত্রির মতো আতিথ্য গ্রহণে তাঁহার আপত্তি নাই। হস্ত পদ প্রক্ষালনের জল-দেওয়া হইলে তিনি আসন বিছাইয়া বসিলেন।

পণ্ডিতের বালক-পুত্র কুবের। খেলাধূলা সাঙ্গ করিয়া সবে মাত্র বাড়ি ফিরিয়াছে। ছুটিয়া আসিয়া অতিথির চরণে সে দণ্ডবৎ করিল।

সন্ন্যাসীর চোখে এ কোন্ বিদ্যুতের ঝলক? স্থির, প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে তিনি এই বালকের দিকেই চাহিয়া আছেন। কাঁচা সোনার মতো তাহার রং, সুন্দর সুঠাম অঙ্গখানি লাবণ্যে ঢলঢল। চোখে-মুখে দিব্য আনন্দের আভা। হাড়াই পণ্ডিতের এ পুত্রটি মায়ামুক্ত সন্ন্যাসীকে আজ কোন্ আকর্ষণে ফেলিতে চাহিতেছে? এ কোন্ জন্মান্তরের সম্বন্ধ? আজিকার এ সাক্ষাতের অন্তরালে কোন্ গূঢ় দৈবী ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা কে বলিবে? সর্বত্যাগী পরিব্রাজকের দৃষ্টি বালকের দিকে বার বার নিবদ্ধ হইতে থাকে।

পণ্ডিত ও তাঁহার স্ত্রীর সেবা-যত্নের অবধি নাই। অতিথি পরম পরিতুষ্ট হইলেন, ভগবৎ কথা প্রসঙ্গে ও আনন্দে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইল।

পরের দিন প্রভাতে পণ্ডিতকে ডাকিয়া সন্ন্যাসী যাহা বলিলেন তাহাতে তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কহিলেন, "দ্যাখো বাবা, আমি নানা তীর্থ পর্যটনের জন্য বার হয়েছি, বয়স যথেষ্ট

হয়েছে দেখাশুনো করবার মতো সঙ্গে কেউ নেই। আমি ভাবছি কি, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবেরকে আমার সঙ্গে নেব। তোমাদের কোনো ভয় নেই, পুত্রাধিক স্নেহে তাকে আমি রক্ষণাবেক্ষণ করবো, তীর্থ ও ধর্ম উভয়ই তার লাভ হবে—কুল পবিত্র হবে। এতে তোমার সম্মতি চাই।"

হাড়াই পণ্ডিত নিস্তব্ধ নিতশির। ভাবিয়া আকুল হইলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবের তাঁহাদের নয়নমণি, তাহাকে বিদায় দিতে গেলে যে হৃদয় ভাঙিয়া যাইবে। আবার সম্মতি না দিয়াই বা উপায় কি? সন্ন্যাসীর ক্রোধে হয়তো ইহকাল পরকাল উভয়ই যাইবে। হাড়াই নিজে ভগবদ্ভক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ। কিছুটা স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, মানুষ তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তিতে পুত্রের কতটুকু কল্যাণ সাধন করিতে পারে? তবে এ শক্তিধর সন্ন্যাসীর হাতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিই না কেন? এমন যে পরাক্রমশালী রাজচক্রবর্তী দশরথ, তিনিও ঋষি বিশ্বামিত্রের হাতে প্রাণপ্রিয় পুত্র দুইটিকে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

চিন্তাকুল হৃদয়ে পণ্ডিতপ্রবর পত্নী পদ্মাবতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। এ বিষয়ে তাঁহার মতও যে নেওয়া চাই। সন্ন্যাসীর এ অনুরোধের কথা তাঁহাকে জানাইলেন।

পদ্মাবতীর মনে পড়িল কয়েকদিন আগেকার এক ঘটনা। বালক কুবের হঠাৎ সেদিন এক ভাবের ঘোরে মূর্ছিত হইয়া পড়ে, তারপর শুশ্রূষার ফলে তাহার সংজ্ঞালাভ হয়। উৎকণ্ঠিতা মায়ের প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়, "মাগো, হঠাৎ কি জানি কেন আমার চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল। তারপর সে অবস্থায় আমি স্বপ্ন দেখলাম—এক দিব্যকান্তি মহাপুরুষের সঙ্গে আমি দূর-দূরান্তের তীর্থস্থানে বেড়াচ্ছি। তারপর যে সব দৃশ্য ভেসে এল তা মনে নেই।"

মায়ের মনে পুত্রের সেই কথারই স্মৃতি আজ আলোড়ন তুলিয়া দেয়। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার তাঁহার সীমা নাই। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে স্বামীকে শুধু কহিলেন, "ওগো, ধর্মের দিকে চেয়ে যা তুমি স্থির করবে, তাতেই আমার মত।"

পণ্ডিত তাঁহার জীবনসর্বস্ব এই পুত্রকে সন্ন্যাসীর করে অর্পণ করেন। সারা গ্রামে ঘনাইয়া আসে বিষাদের ছায়া। দ্বাদশ বৎসরের বালক কুবের দণ্ড-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেদিন ঘরের বাহির হইয়া পড়েন, আর সেখানে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন নাই। পর্যটন, পরিব্রাজন ও অবধূত জীবনের নানা পর্যায় অতিক্রম করিয়া কুবের একদিন ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু একচাকায় নয়—নবদ্বীপে, প্রেমভক্তি প্রচারের এক প্রেরিত পুরুষরূপে। নাম তখন—নিত্যানন্দ অবধূত। শ্রীচৈতন্যের কীর্তন নর্তনে নদীয়া তখন টলমল, শক্তিধর নিত্যানন্দের আবির্ভাবে এই আনন্দের স্রোতে জোয়ার জাগিয়া উঠে। অদ্বৈত প্রভু ইহারই স্তুতি সেদিন গাহিয়া উঠেন :

তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি
তুমি সে চৈতন্যের বক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি।

হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে সন্ন্যাসী সেদিন বুঝিবা এক ঐশী ইঙ্গিতেই আসিয়া আবির্ভূত হন, বালক কুবেরের জীবনধারাটিকে অর্গলমুক্ত করিয়া দেন। দেশ-দেশান্তর অতিক্রম করিয়া চৈতন্য-প্রেমের সমুদ্রে আসিয়া একদিন তাহা ঝাঁপাইয়া পড়ে।

চতুর্দশ শতকের কথা। একচাকা গ্রামে তখন এক সম্পন্ন ও ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেন। গৃহস্বামীর নাম সুন্দরমল্ল। বংশের উপাধি বাঁড়ুরী। লোকে ডাকিত ওঝা বলিয়া। যজনযাজন ও অধ্যাপনায় তাঁহার সংসার চলে, বিত্ত ও প্রতিপত্তি কোনো কিছুরই তাঁহার অভাব নাই। কিন্তু পণ্ডিতের মনে বড় কষ্ট, সন্তান হইয়া প্রায়ই বাঁচে না। বহু পূজা আরাধনা ও শান্তি স্বস্ত্যয়নের পর এক পুত্র জন্মিল, উমা মহেশ্বরের চরণে তাহাকে সমর্পণ করিয়া নাম রাখিলেন, হাড়াই। পোশাকী নাম মুকুন্দ বাঁড়ুরী।

বিদ্যাবত্তা ও চরিত্রগুণে এ পুত্র ক্রমে খ্যাতিমান হইয়া উঠেন। বংশের তিনি একমাত্র পুত্র, বাপ-মা তাই আদর করিয়া অল্প বয়সে

তাঁহার বিবাহ দেন। সম্ভ্রান্ত বংশের সুলক্ষণা কন্যা পদ্মাবতীকে পুত্রবধূ রূপে তাঁহারা ঘরে আনেন। ইহার অল্পকাল পরেই সুন্দরমল্ল ও তাঁহার স্ত্রী লোকান্তরে চলিয়া যান।

হাড়াই পণ্ডিত নিজে শাস্ত্রবিদ্ ও ধর্মপরায়ণ, পত্নীও বড় ভক্তি-মতী। ব্রত-পূজা, দান-ধ্যান ও অতিথি সৎকারে তাঁহাদের অত্যন্ত নিষ্ঠা। কিন্তু দীর্ঘদিন কোনো পুত্রসন্তান না হওয়ায় মনে তাঁহাদের সুখ নাই, শান্তি নাই। কিছুদিন পরে পদ্মাবতী রাত্রিতে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেন। তাঁহার নয়ন সমক্ষে যেন এক সুদীর্ঘ জ্যোতির্ময় বর্ত্ম খুলিয়া গেল। জটাজুটধারী, আজানুলম্বিত-বাহু এক দিব্যপুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। প্রসন্নমধুর হাস্যে তিনি কহিলেন, "বৎসে, তোমার মনস্তাপের আর প্রয়োজন নেই। পাপী তাপী উদ্ধারের জন্য এক মহাশক্তিধর পুরুষ তোমার গর্ভে শীঘ্র জন্মগ্রহণ করবেন। তুমি দুশ্চিন্তা ক'রো না।" স্বপ্নবার্তা কিন্তু সত্য হইয়া উঠে। ১৩৯৫ শকাব্দের মাঘ মাসে, শুক্লপক্ষে, ত্রয়োদশী তিথির এক শুভক্ষণে এক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এই শিশুই উত্তর কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের অন্যতম নায়ক, নিত্যানন্দ ; গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তিন প্রভুর অন্যতম।

অনিন্দ্যসুন্দর শিশু। যে দেখে সেই তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া যায়। পিতামাতার আদরের নাম, কুবের। যথাকালে হাড়াই পণ্ডিত খুব ধুমধাম করিয়া পুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসব করিলেন। এ শিশু শুধু পিতামাতারই নয়, পাড়া-প্রতিবেশীরও যে আনন্দ-ধন। রূপে ভুবন-মোহন, মুখে আধ আধ মধুর বুলিতে ভুবন-মঙ্গল হরিনাম। সহচর-দের সঙ্গে শিশু খেলিতে যায়, মা পদ্মাবতী মোহন সাজে তাহাকে সাজাইয়া দেন, সে যেন তাঁহার এক মস্ত বড় কাজ। নিজের লালপেড়ে নীলাম্বরী শাড়িটি কোঁচা দিয়া পরাইয়া দেন, কপালে আঁকের শ্বেতচন্দনের ফোঁটা, চোখে মাখাইয়া দেন কালো কাজল। কুবের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়, যে একবার দেখে লাবণ্য ঢল-ঢল শিশুকে কোলে তুলিয়া বার বার আদর জানায়।

কুবের ক্রমে বড় হইয়া উঠিতে থাকে। সহচরদের সহিত যে খেলাধূলা সে করে তাহার ভঙ্গী বড় বিচিত্র। শাস্ত্র পুরাণের কথা ও কাহিনী শুনিতেই বেশী উৎসাহ। তাই আমোদপ্রমোদ ও ক্রীড়ায়ও তাহাই রূপায়িত হইয়া উঠে, কখনো রামলীলা কখনো কৃষ্ণলীলা তিনি সঙ্গীদের নিয়া অভিনয় করিয়া বেড়ান।

প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের সন্তান। শাস্ত্র বিশারদ না হইলে চলিবে কেন? মান-সম্মান ও অর্থোপার্জন, সবই যে নির্ভর করে ইহার উপর। হাড়াই ওঝা পুত্র কুবেরকে তাই টোলে ভর্তি করিয়া দেন। মেধা ও প্রতিভার দিক্ দিয়া বালকের জুড়ি নাই, অল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণে তাঁহার ব্যুৎপত্তি হয়। বয়স তখন মাত্র বার বৎসর তখনই দুরূহ ন্যায়শাস্ত্রে কুবের পারঙ্গম হইয়া উঠে। পণ্ডিতেরা সস্নেহে তাঁহাকে ন্যায়চূড়ামণি উপাধি প্রদান করেন। অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে ইহারই উল্লেখ করিয়া লেখা হইয়াছে—"ন্যায় চূড়ামণি ইহার শাস্ত্রের আখ্যাতি, নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি।"

সবে মাত্র বার বৎসর বয়স। কিন্তু কুবেরের জীবনে যেন তখনই এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত হইতে চাহিতেছে। খেলাধূলা ও অধ্যয়নের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ কি জানি কেন সে গম্ভীর হইয়া বসে. পরিপার্শ্ব হইতে আপনাকে অবলীলায় বিচ্ছিন্ন করিয়া নেয়। গত জন্মের সাত্ত্বিক সংস্কার এবার জীবনের দোরগোড়ায় বার বার আঘাত করিয়া ফিরে। সংসারের কোনো আকর্ষণই যেন আর তাহার নাই।

পুত্রের এ পরিবর্তন দেখিয়া জনক-জননীর দুশ্চিন্তার অবধি নাই। এ কি অদ্ভুত ভাবান্তর ও উদাসীনতা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে? উভয়ে ভাবিতে বসেন—পুত্রকে কি তবে তাড়াতাড়ি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিবেন? তাহাতে কি সংসারের দিকে মন একটু ফিরবে?

ঠিক এই সময়েই হাড়াই ওঝার গৃহে ঘটে সন্ন্যাসীর আকস্মিক আবির্ভাব। কুবেরের বিবাগী মনের শিথিল বোঁটায় এ যেন দমকা হাওয়ার একটা বড় আঘাত।

সন্ন্যাসীর সঙ্গীরূপে এবার তাঁহার পরিব্রাজন শুরু হয়। দূর-দূরান্তের অরণ্যে পর্বতে, দুর্গম তীর্থস্থলগুলিতে দিনের পর দিন উভয়ে পরিক্রমা করিয়া বেড়ান। পরিব্রাজক জীবনের কঠোরতায় কুবের ক্রমে অভ্যস্ত হইতে থাকেন। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও পবিত্রতার মধ্য দিয়া তাঁহার সাধনজীবনের ভিত্তিটি দৃঢ়তর হইয়া উঠে। বৎসরের পর বৎসর এরূপে অতিবাহিত হইয়া যায়। অবশেষে কুবের একদিন তাঁহার অভিভাবক-সন্ন্যাসীকে হারাইয়া ফেলেন। কিশোর সাধকের জীবনে শুরু হয় নিঃসঙ্গ পর্যটনের পালা।

কিছুদিন যাবৎ কুবেরের অন্তর দীক্ষা গ্রহণের জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় তাঁহার চিহ্নিত গুরু, কোন্ শুভ মুহূর্তে অধ্যাত্ম-জীবনের বীজটি তিনি রোপণ করিয়া দিবেন, আর জীবন তাঁহার ধন্য হইবে, এই চিন্তায় অন্তর দিনের পর দিন আলোড়িত হইতে থাকে।

নানা তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে সেবার তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলেন। কৃষ্ণলীলার মুখ্যভূমিতে আসা মাত্র মনপ্রাণ কৃষ্ণাবেশে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। কুঞ্জগলির পথে পথে, জঙ্গলাকীর্ণ লীলাস্থলীর আনাচে-কানাচে, দিনরাত ঘুরিয়া বেড়ান। আর্তিভরে খেদোক্তি করিতে থাকেন, জীবন-সর্বস্ব কৃষ্ণধন কোথায়? কে তাঁহাকে এ পরম সম্পদ মিলাইয়া দিবে? উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের মতো সারা বৃন্দাবন তখন তিনি ঢুঁড়িয়া বেড়াইতেছেন।

সহসা একদিন নয়ন পথে পড়িল বহু শিষ্য পরিবৃত পরমভাবগত এক সন্ন্যাসীর মূর্তি। কৃষ্ণরসে তনুমন সদা রসায়িত। এই সন্ন্যাসী হইতেছেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী। শ্রীচৈতন্য-লীলার সহায়ক ঈশ্বরপুরী ও অদ্বৈত আচার্য ইঁহারই কৃপাপ্রাপ্ত।

মহাত্মার দর্শন মাত্রেই তরুণ সাধক কুবেরের সর্ব অঙ্গে ভক্তিরসের জোয়ার জাগিয়া উঠিল। ভাব-প্রমত্ত হইয়া কিছুক্ষণ মধ্যে তিনি সংবিৎ হারাইলেন।

মাধবেন্দ্রপুরীর চোখে মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠে। কে এই বৈষ্ণব

যে সদা করে কৃষ্ণরসে অবগাহন? এই তরুণ বয়সে এমন কৃপাধন্য হইয়া উঠিয়াছে! সর্বদেহে তাঁহার অষ্টসাত্ত্বিক ভাববিকার, বদনমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিয়াছে অপরূপ জ্যোতির আভা। ভূতলে পতিত দেহটির দিকে মাধবেন্দ্র নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন।

দীর্ঘকাল পর তরুণ সংবিৎ পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়া কহিলেন, "প্রভু, বহু ভাগ্যবলে আজ আপনার দর্শন মিলেছে। কৃপা ক'রে এ অভাজনকে উদ্ধার করুন, আশীর্বাদ করুন, আমার যেন কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।"

মহাপ্রেমিক মাধবেন্দ্রপুরী দু'হাত প্রসারিয়া তাঁহাকে করেন আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

তারপর এক শুভলগ্নে কৃষ্ণমন্ত্রে এই নবীন সাধককে করিলেন দীক্ষিত। নামকরণ হইল, নিত্যানন্দ। উভয়ের নর্তন কীর্তনে বৃন্দাবনে আনন্দরস উথলিয়া উঠিল। প্রেমভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ মাধবেন্দ্রের পূতসান্নিধ্য লাভ করিয়া সেদিন নিত্যানন্দের আনন্দের আর সীমা নাই। গদ্‌গদস্বরে বার বার তাঁহার মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তকবি এই পুরীমহারাজের প্রেম-শক্তির প্রশস্তি গাহিয়া বলিয়াছেন—

মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর,
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর।
কৃষ্ণরস বিনে আর নাহিক আহার,
মাধবেন্দ্র পুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার।[১]

মাধবেন্দ্রের কৃপাদীক্ষা[২] এ সময়ে সাধক নিত্যানন্দের জীবনে

১ বৃন্দাবন দাস: চৈতন্য ভাগবত

২ ভক্তিরত্নাকর ও অন্যান্য গ্রন্থে মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্য লক্ষ্মীপতি কর্তৃক নিত্যানন্দের দীক্ষা দানের কথা আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য-প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। মাধ্বদের দর্শন ও সাধনপ্রণালীর সহিত কিন্তু শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাদৃশ্য নাই। (দ্রঃ সাধক ৮ম খণ্ড, মাধ্বাচার্য) কাজেই নিত্যানন্দের মাধ্ব-দীক্ষার কথা যুক্তিসঙ্গত নয়।

এক নূতন রসতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দেয়। কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করিয়া আবার তিনি পর্যটনে বাহির হন। এবার তিনি এক স্বেচ্ছাবিহারী অবধূত। ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া কখনো রঙ্গনাথে, রামেশ্বরে, কখনো বা নীলাচলে ও গঙ্গাসাগরে ঘুরিয়া বেড়ান। কৃষ্ণরসের ঐন্দ্রজালিক মাধবেন্দ্রপুরীর স্পর্শ তাঁহার সারা সত্তাকে আজ উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। যে দেব-দেউলেই তিনি যান, আকুল হইয়া কেবলই খুঁজিয়া বেড়ান, কোথায় প্রাণ-সর্বস্ব শ্রীনন্দ-নন্দন, কবে তাঁহার দর্শন লাভে এ জীবন শীতল হইবে, সার্থক হইবে?

কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল নিত্যানন্দ কিন্তু আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। এবার নিরন্তর থাকেন ভাবসাগরে নিমজ্জিত। দিবারাত্র জ্ঞান নাই, আহার নিদ্রার প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে। প্রেম সাধনার গভীর স্তরে ধীরে ধীরে হইতেছেন প্রবিষ্ট।

একান্তে প্রচ্ছন্নভাবে বৃন্দাবনে তিনি দিন যাপন করিতেছেন। হঠাৎ এ সময়ে কৃষ্ণ একদিন স্বপ্নযোগে কহেন, "অবধূত, কেন আর বৃথা এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করা? গৌড়দেশে নবদ্বীপে যাও। প্রেমভক্তির সুধাভাণ্ড হাতে করে নিমাই পণ্ডিত সেখানে আচণ্ডালে পরম সম্পদ বিতরণ করছে, তাঁর কর্মে তনুমনপ্রাণ ঢেলে দাও। ভাগবতধর্ম, ভগবৎপ্রেম প্রচারের তুমি যে চিহ্নিত পুরুষ। তোমার ভেতর দিয়ে এ মহাব্রত উদ্‌যাপিত হয়ে উঠুক।"

ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দ তৎক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছেন। প্রেমভক্তির উৎস-সন্ধান এবার মিলিয়াছে। সোৎসাহে তাহারই উদ্দেশে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নিত্যানন্দ সেদিন নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রথমেই নন্দন আচার্যের সহিত তাঁহার দেখা। দেবদ্বিজ সন্ন্যাসীর উপর আচার্যের অগাধ ভক্তি, অপূর্ব তাঁহার

বৈষ্ণবীয় নিষ্ঠা। নিত্যানন্দের দেবদুর্লভ কান্তি, আজানুলম্বিত বাহু ও আয়তনেত্র দেখিয়া তিনি মোহিত হন এবং সযত্নে নিজ গৃহে রাখিয়া দেন। নীরবে প্রচ্ছন্ন জীবনযাপনেই অতিথির অভিলাষ। তাই তাঁহার নির্দেশে আচার্য কাহাকেও এ সংবাদ দেন নাই।

নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ কিন্তু সর্বজ্ঞ গৌরাঙ্গের কাছে অজানা রহে নাই। কয়েকদিন হয় প্রভু কেবলই ভক্ত পার্ষদদের বলিতেছেন, "তোমরা সবাই দেখবে, শিগ্‌গীরই নবদ্বীপ ধামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে।"

ভক্তেরা জিজ্ঞাসু হইয়া এ উহার মুখের দিকে তাকায়। কে এই মহাপুরুষ? কি তাঁহার পরিচয়? কিছুই বুঝা যাইতেছে না।

কৌতুকী প্রভু এবার ব্যাপারটিকে আরও কিছুটা স্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। কহিলেন, "তোমরা এক আনন্দের সংবাদ শোনো। কাল রাতে চমৎকার এক স্বপ্ন আমি দেখলাম। মোহন বেশধারী, অনিন্দ্যসুন্দর এক অবধূত পুরুষ আমার সম্মুখে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বদনমণ্ডল থেকে জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। তিনি বললেন, আমি আর তিনি নাকি অভিন্নহৃদয়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানালেন, আজই তিনি আমাদের দর্শন দান করবেন।"

মহাপুরুষের এ প্রসঙ্গটি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুর একি বিচিত্র রূপান্তর! ভাবাবিষ্ট হইয়া বারংবার তিনি হুঙ্কার ছাড়িতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কহেন, "ছাখো, তোমরা শিগ্‌গীর নবদ্বীপ ধামের চারিদিকে সন্ধান নাও। সেই মহাপুরুষকে অবিলম্বে বার করতে হবে। তাঁকে দেখবার জন্য আমার মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।"

ভক্তেরা ত্রস্তব্যস্ত হইয়া বাহির হন। কিন্তু বহু খোঁজখবর করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

গৌরাঙ্গ এবার নিজেই পার্ষদগণ-সহ নগরে বাহির হইলেন। স্বপ্নে দৃষ্ট মহাপুরুষকে দর্শন না করিয়া তাঁহার স্বস্তি নাই। নয়নে প্রেমাশ্রুর ধারা, সারা দেহখানি পুলকাঙ্কিত—প্রভু যন্ত্রচালিতবৎ

নবদ্বীপের রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে জুটিয়াছে বহুতর ভক্ত। নন্দন আচার্যের গৃহের সম্মুখে আসিবামাত্র প্রভু থামিয়া পড়িলেন। তারপর ঢুকিয়া পড়িলেন অঙ্গনে। সম্মুখে তাঁহার দণ্ডায়মান শুভ্র-কান্তি প্রেমিক পুরুষ—নিত্যানন্দ। দর্শনমাত্র প্রভু তাঁহাকে স্বগণসহ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন।

একি মহা বিস্ময়! যে পরম বস্তুর জন্য তীর্থে তীর্থে অরণ্যে পর্বতে নিত্যানন্দ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়াছেন, আজ তাহা নিজে যাচিয়া আসিয়া নন্দন আচার্যের গৃহে উপস্থিত। শুধু তাহাই নয়, প্রভু সাগ্রহে এতদিন নিত্যানন্দেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। এবার তাঁহার নিভৃতির আড়াল ঘুচাইয়া দিয়া এক মুহূর্তে তাঁহাকে করিলেন আত্মসাৎ।

আনন্দাবেশে নিত্যানন্দ অধীর। অপার ঔৎসুক্যে প্রভুর ভুবন-ভুলানো রূপ দেখিতেছেন। এ রূপ দেখিয়া তাঁহার নয়ন যেন আর ফিরিতে চাহে না। বৃন্দাবনদাস এ অপরূপ রূপমাধুর্যের ঝাঁপিটি উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন—

বিশ্বম্ভর মূর্তি যেন
মদন সমান।
দিব্য গন্ধ মাল্য
দিব্য বাস পরিধান॥
কি হয় কনক দ্যুতি
সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে
চাঁদের সাধ লাগে॥
দেখিতে আয়ত দুই
অরুণ নয়ন।
আর কি কমল আছে
হেন হয় জ্ঞান॥

সে আজানু দুই ভুজ
হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে যজ্ঞসূত্র
অতি সূক্ষ্ম ক্ষীণ॥

গৌরসুন্দরের পদ্মপলাশ নেত্রের দিকে চাহিয়া নিত্যানন্দ ভাবের গভীরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছেন। নির্নিমেষ নয়নে, ঋজু দেহে, তিনি একেবারে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান। প্রভু এবার ভক্তপ্রবর শ্রীবাসকে সোৎসাহে কহিলেন, "পণ্ডিত, দিব্য প্রেমাবেশ যদি দেখতে চাও, তবে নিত্যানন্দের উদ্দীপনা জাগিয়ে তোল, শিগ্‌গীর ভাগবত থেকে শ্রীনন্দনন্দনের রূপ বর্ণনা করো।"

প্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র শ্রীবাসও শ্লোক পড়িতে লাগিলেন পরম আনন্দে। —বর্হাপীড়ম্ নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্…। শ্যামসুন্দরের রূপমাধুর্যের বর্ণনায় নিত্যানন্দের আনন্দতরঙ্গ চকিতে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। সর্বশরীরে আত্মপ্রকাশ করে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি প্রেমবিকারের চিহ্ন।

কিছুটা বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্তির পর তাঁহার নর্তন কীর্তন শুরু হয়, হুঙ্কার ধ্বনিতে নন্দন আচার্যের গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে। এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া ভক্তদের হৃদয় হয় আনন্দে উদ্বেলিত।

নিত্যানন্দ ক্রমে শান্ত হন। এবার শুরু হয় পরস্পরের কুশল-প্রশ্ন ও প্রশস্তির পালা।

পুলকাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে নিত্যানন্দ কহিলেন, "প্রভু, এত তীর্থ, এত জনপদ আমি ঘুরেছি আর তোমার সন্ধান করেছি, কোথায়ও তোমায় পাই নি। অবশেষে জানলাম, তুমি নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছো, জীবের উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করেছো। তাই তো দর্শনের আশায় এখানে ছুটে এলাম।"

প্রভুও হটিবার পাত্র নহেন। সমাগত ভক্তদের সম্মুখে নিত্যানন্দের মর্যাদা বাড়াইয়া কহিলেন—

মহাভাগ্য দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন॥ (চৈঃ ভাঃ)

প্রেমাবেশে বিহ্বল দুই প্রভু অতঃপর পুলকাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন। এখন হইতে নিত্যানন্দ হইলেন গৌরাঙ্গের প্রধান পার্ষদ, নবদ্বীপে প্রেমভক্তি আন্দোলনের অন্যতম নিয়ন্তা। বৈষ্ণব ভক্তেরা তাঁহাদের প্রাণসর্বস্ব গৌর-নিতাইকে দেখিয়াছেন এক সম্মিলিত ভাবঘন বিগ্রহরূপে। বৈষ্ণব কবিও তাই প্রেমভরে গাহিয়াছেন—

দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।

পরের দিন ব্যাসপূজা হইবে। স্থির হইল, শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনেই নিত্যানন্দ এ পূজার অনুষ্ঠান করিবেন। সন্ধ্যার পরই গৌরাঙ্গ শ্রীবাস অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদিনই ভক্তগণ-সহ এখানে তিনি কীর্তনানন্দে মত্ত হন। আজ যেন তাঁহার উৎসাহ শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। দুয়ারে কপাট লাগাইয়া দেওয়া হয়। গৌর-নিতাইকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হয় বৈষ্ণব ভক্তদের উদ্দণ্ড কীর্তন।

আজ গৌরাঙ্গের যেন উদ্দীপনার সীমা নাই। প্রেমাবেশে দেহ থরথর কাঁপিতেছে। মুখে উচ্চারিত হইতেছে সঘন হুঙ্কার। উদ্দাম নৃত্যেরও যেন আর বিরাম নাই। দিব্য লাবণ্যময় বিশাল দেহটি ভূমিতে বার বার আছাড়িয়া পড়ে—ভক্তেরা হাহাকার করিয়া উঠেন। অশ্রু কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারের প্রকাশ দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। যে কথা এতকাল লোকে শুধু শুনিয়াছে, ভক্তিশাস্ত্রে পড়িয়াছে, শ্রীবাস অঙ্গনে আজ তাহারই অপূর্ব রূপায়ণ। নৃত্য শেষে ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দকে শান্ত করিয়া গৌরাঙ্গ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাত্রিযোগে নিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরেই রহিয়া গিয়াছেন। ...াঙ্গের অদ্ভুত নৃত্যলীলা, ভক্তদের এই কীর্তন ও জয়ধ্বনি—আজ

তাঁহাকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। হৃদয়ের প্রেম উৎসটি যেন শতধারে আজ উৎসারিত, বিশ্বের সমস্ত কিছু প্লাবিত না করিয়া উহা নিরস্ত হইবে না।

প্রেমাবিষ্ট নিত্যানন্দ রাত্রিতে এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসেন। সন্ন্যাসী জীবনের পরম ধন—দণ্ড ও কমণ্ডলু দুইটি অকস্মাৎ ভাঙিয়া ফেলেন। অরণ্য প্রান্তরে, তীর্থে তীর্থে কম কঠোর জীবন এযাবৎ তিনি যাপন করেন নাই। চিরবাঞ্ছিত নিধি আজ বহুদিন পরে মিলিয়াছে। এবার তাঁহার নূতন জীবনের পালা। প্রেমের ঠাকুরের পাশে দাঁড়াইয়া প্রেমভক্তির প্রচারে তাঁহাকে ব্রতী হইতে হইবে। তাই তো দণ্ড-কমণ্ডলুর বোঝা তিনি এমন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত সবিস্ময়ে দেখেন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ভাবাবেশে সংবিৎহারা, সন্ন্যাস-দণ্ড ও কমণ্ডলুটি ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেছে।

সংবাদ পাইয়া গৌরাঙ্গ দ্রুতপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলেন, নিত্যানন্দ অর্ধবাহ্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন, সুস্মিত আনন হইতে দিব্য আনন্দের জ্যোতি ঝরিয়া পড়িতেছে। সস্নেহে শ্রীপাদের হস্তটি ধারণ করিয়া প্রভু তাঁহাকে স্নানের ঘাটে আনয়ন করিলেন। ভগ্ন দণ্ড কমণ্ডলু তখনই গঙ্গায় বিসর্জিত হইল। অবধূত নিত্যানন্দ হইলেন মহাপ্রেমিক নিত্যানন্দ—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রধান পার্ষদ।

ভাবরাজ্যের মানুষ, আনন্দ চঞ্চল নিত্যানন্দকে নিয়া ভক্তদের বিপদ বড় কম নয়। গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছেন, শিশুর মতো শুরু করিলেন জলকেলি, আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। অথচ এদিকে ব্যাসপূজার সময় প্রায় হইয়া গিয়াছে।

গৌরাঙ্গ কোনোমতে তাঁহাকে বুঝাইয়া-সুজাইয়া পণ্ডিতের গৃহে নিয়া আসিলেন। সেখানে ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন করা হইয়াছে। অঙ্গন মধ্যে প্রভু ভক্তগণ-সহ কীর্তনানন্দে বিভোর, আর

ঘরের ভিতরে নিত্যানন্দ ব্যাসপূজার আসনে বসিয়া গিয়াছেন। পূজা শেষে মালা অর্পণ করিয়া প্রণাম নিবেদন করিতে হইবে, কিন্তু নিত্যানন্দের সেদিকে কোনো হুঁশই নাই। আবেশ-বিহ্বল হৃদয়ে মালাখানি হাতে নিয়া তিনি বসিয়া আছেন।

শ্রীবাস বার বার ব্যগ্রভাবে কহিতেছেন, "শ্রীপাদ, ব্যাসদেবের উদ্দেশে মাল্য অর্ঘ্য দিয়ে আপনি পূজা এবার সাঙ্গ করুন।"

তাঁহার একটি কথাও কিন্তু নিত্যানন্দের কানে পোঁছে নাই। ভাবাবিষ্ট তিনি। এদিক ওদিক তাকাইয়া কেবলই কাহাকে যেন খুঁজিতে চাহিতেছেন।

উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত তখন গৌরাঙ্গকে ডাকিয়া আনিলেন। কহিলেন, "প্রভু, দ্যাখো তোমার নিত্যানন্দ পূজা সমাপ্ত করতে দিচ্ছেন না। এবার মাল্য অর্ঘ্য দেবার কথা, কিন্তু তা তাঁর হাতেই রয়ে গিয়েছে। তুমি এসে যা করবার হয় করো।"

প্রভুকে নিত্যগীত থামাইতে হইল, তাড়াতাড়ি পূজার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। বেদীর সম্মুখে গিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, একি করছো তুমি? মালাগাছ হাতে তুলে নিয়ে এমন চুপচাপ বসে কেন? এবার ব্যাসদেবের উদ্দেশে ভক্তিভরে অর্ঘ্য দাও।"

ভাববিভোর হইয়া আছেন অবধূত নিত্যানন্দ, চোখে মুখে এক অপূর্ব আনন্দের দ্যুতি খেলিয়া গেল। বহুবাঞ্ছিত প্রভু তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, হাতের এ মালা তাঁহার গলায় না পরাইয়া আর কাহার উদ্দেশে নিবেদন করিবেন? পরমানন্দে তিনি গৌরসুন্দরের গলায় পুষ্পমালাটি পরাইয়া দিলেন। সমবেত ভক্ত কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে সে অঞ্চল মুখরিত হইয়া উঠিল।

মাল্যপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই নিতাই আনন্দ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া যান। প্রভুর সে প্রেমমধুর নয়নাভিরাম রূপের বদলে একি অলৌকিক ঐশ্বর্যময় মূর্তি! এ ঐশ্বর্য ও বিভূতি দেখিয়া তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর বিভূতিলীলা সংবরণ করিয়া গৌরাঙ্গ তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন,—

যে কীর্তন নিমিত্ত করিলা
অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল
কিবা চাহ আর॥
তোমার সে প্রেমভক্তি
তুমি প্রেমময়।
বিনে তুমি দিলে কারো
ভক্তি নাহি হয়॥
আপনা সংবরি উঠ,
নিজ জন চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা
তাহারে বিলাহ॥

প্রভু গৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম প্রচারের প্রধান ও চিহ্নি উপস্থিত! এবার তিনি স্বেচ্ছামতো নাম-প্রেমধন বিলাইয়া করিবেন।

করজোড়ে ভক্তি গদ্‌গদকণ্ঠে অবধূত নিত্যানন্দ সর্বসমক্ষে গৌরাঙ্গের স্তবগান করিতে লাগিলেন।

এমনিতেই নিত্যানন্দ এক মহাপ্রেমিক পুরুষ—তদুপরি অন্তরে লাগিয়াছে প্রেমাবতার গৌরাঙ্গের দিব্যস্পর্শ। দিব্য ভাবের প্রবাহ তাই উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, নিত্য নূতন লীলাচ্ছন্দে নিত্যানন্দকে নাচাইয়া তুলিতেছে। এ প্রমত্ত অবস্থায় তাঁহাকে স্থির করিয়া রাখিবে কে? চৈতন্য ভাগবতের ভাষায়, এখন তিনি—

অহর্নিশ ভাবাবেশে
পরম উদ্দাম।
সর্ব নদীয়ায় বুলে
জ্যোতির্ময় ধাম॥

সেদিন অপরাহ্ণে নিমাই স্বগৃহে বিশ্রাম করিতেছেন। এমন

সময় অবধূত নিত্যানন্দ একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত। প্রেমাবেশে তিনি তখন মাতোয়ারা, দুই চোখে দরদর ধারে পুলকাশ্রু নির্গত হইতেছে। কখনো অট্টহাসি হাসিতেছেন, কখনো বা পরম উল্লাসভরে প্রভুর অঙ্গনে নৃত্য করিতেছেন। নৃত্যপরায়ণ এই দিগম্বর পুরুষকে দেখিয়া বাড়ির মেয়েরা লজ্জায় পলায়ন করিল। নিমাই বিশ্রামরত ছিলেন, দ্রুতপদে শয়নমন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রেমোন্মাদ নিত্যানন্দকে শান্ত করিতে তাঁহার বেশী সময় লাগিল না। নিজের মস্তকের আচ্ছাদন-বস্ত্রটি তাঁহার কোমরে সযত্নে জড়াইয়া দিলেন, স্বহস্তে তাঁহাকে চন্দন চর্চিত করিলেন, গলে দিলেন গন্ধপুষ্পের একগাছি মালা; অতঃপর শুরু করিলেন অবধূতের অপূর্ব স্তুতি—

নামে নিত্যানন্দ তুমি
রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ
রাম মূর্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ—পর্যটন
ভোজন ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু
নাহিক তোমার॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি
মনুষ্যের কোথা?
পরম সুসত্য—তুমি
যথা কৃষ্ণ তথা॥

প্রভু শুধু এখানেই থামিলেন না। ভিক্ষা মাগিলেন, "শ্রীপাদ, আমার বড় অভিলাষ—তোমার একটি কৌপীন কৃপা ক'রে আমায় দান করো।"

নিত্যানন্দের কৌপীনটি আনানো হইল। গৌরাঙ্গ এটি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ভক্তেরা আগ্রহ-ব্যাকুল হইয়া

প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছেন। এবার তিনি সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা সবাই এ পবিত্র বস্ত্রখণ্ড শিরে ধারণ করো। নিত্যানন্দ কৃষ্ণরসময়—তাঁর কৃপায় তোমাদের প্রকৃত কৃষ্ণভক্তির উদয় হবে।"

প্রভুর নির্দেশে ভক্তেরা সোল্লাসে কাড়াকাড়ি করিয়া নিত্যানন্দের পাদোদক পান করিলেন। অবধূত কিন্তু পূর্ববৎ প্রেমাবিষ্ট ও মৌনী হইয়াই আছেন, আর স্মিত হাসি হাসিতেছেন।

নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সেদিন নিত্যানন্দের মহিমার তত্ত্বটি এমনিভাবে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছিলেন। ভক্তদের বুঝিতে বাকি রহিল না—অবধূত নিত্যানন্দ শুধু প্রভুর প্রধান পার্ষদই নহেন, অভিন্নহৃদয় সখা এবং প্রধান সহকর্মীও বটেন।

গৌরাঙ্গ প্রেমধর্ম ও নামকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তক। জীব উদ্ধারের ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। নিবেদিত-প্রাণ ভক্তদলও চারিপাশে কম জুটে নাই। কিন্তু তাঁহার প্রেমধর্ম-বাহিনীর প্রস্তুতি এতদিন সম্পূর্ণ হয় নাই—অভাব ছিল অভিযাত্রা পথে তাঁহার প্রধান এই সহকারীর। অবধূত নিত্যানন্দের আবির্ভাবে সে অভাব আজ দূর হইয়াছে। এবার যাত্রা শুরুর পালা।

নবদ্বীপের পথে পথে নিতাই এবার প্রবল উৎসাহে নাম প্রচার শুরু করিয়াছেন। নগরের লোকে বলাবলি করিতে থাকে—একে নিমাই পণ্ডিত ও তাঁহার সঙ্গীদের কীর্তন-নর্তনে লোকের রক্ষা নাই, তারপর এই দিব্যকান্তি, শক্তিধর তরুণ সাধক কোথা হইতে আসিয়া জুটিল? প্রেমঘনমূর্তি কে এই অবধূত?

নিত্যানন্দ এখন হইতে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই বাস করেন। সর্ববন্ধনমুক্ত আনন্দময় মহাপুরুষ—সদাই যেন বালকবৎ ভাব। বালচাপল্য আর আনন্দরঙ্গে সদা উচ্ছল হইয়া ফিরেন। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী দেবীকে নিতাই মা বলিয়া ডাকেন। এই বত্রিশ বৎসরের বালককে লইয়া মালিনী দেবীরও ঝঞ্ঝাটের সীমা নাই।

চাঞ্চল্য ও আবদারের নানা অত্যাচার তাঁহাকে সহিতে হয়। নিতাই নিজের হাত দিয়া কিছু খান না—মালিনী দেবীকেই তাই তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। ভক্তিনিষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিতের দৃষ্টিতে নিতাই যে পরম দুর্লভ ধন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন। তাছাড়া প্রভুর মুখে নিত্যানন্দের স্বরূপ মাহাত্ম্য তিনি শুনিয়াছেন। এ গৃহে এই মহাপুরুষ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, এ যে তাঁহার পরম সৌভাগ্য।

প্রভু একদিন কৌতুক করিয়া শ্রীবাসকে কহিলেন, "পণ্ডিত, তুমি এসব কি করছো বলতো? অজ্ঞাত-কুলশীল এ অবধূতকে তুমি ঘরে রেখেছো কেন? এর কি জাত কুল কিছুর ঠিক আছে? শিগ্‌গীর ভালোয় ভালোয় একে বিদেয় করো।"

এ যে প্রভুর এক পরীক্ষা তাহা বুঝিতে শ্রীবাসের দেরি হয় নাই। হাসিয়া কহেন, "প্রভু, তোমার ছলনা বুঝতে আমার বাকী নেই। যে তোমায় একদিনের তরেও ভালোবাসে, ভক্তি করে, সে হয় আমার প্রাণতুল্য। আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যে তোমারই অভিন্ন-স্বরূপ, তিনি যে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। আমাকে আর এসব পরীক্ষায় ফেলা কেন প্রভু?"

নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য শ্রীবাস কিছুটা বুঝিয়াছেন, একথা জানিয়া প্রভুর সেদিন আনন্দের সীমা রহিল না। স্মিত হাস্যে বর প্রদান করিলেন, "শ্রীবাস, আমি আজ তোমার প্রতি বড় প্রসন্ন হয়েছি। আমি বলছি, তোমার গৃহে দারিদ্র্য কখনো থাকবে না, আর তোমার স্বজনদের থাকবে আমার উপর অচলা ভক্তি।"

শচীমাতার কাছেও নিতাই এক অমূল্য নিধি। গৌরাঙ্গ নিজে নিতাইকে পরিচিত করিয়া দিয়া বলেন, "মা, এই তোমার হারানো ছেলে বিশ্বরূপ।" বহুদিনের চাপা দীর্ঘশ্বাস মায়ের বুক হইতে নিঃসারিত হয়, অশ্রুসজল চোখে নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁ বাবা, সত্যিই কি তুই আমার বিশ্বরূপ?"

"বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিয়া নিতাই বলেন, "হ্যাঁ, মা, আমিই যে তোমার সন্তান।"

নিমাই আর নিতাই—এ দুটিকে নিয়া শচীর আনন্দ ও গর্বের সীমা নাই। নিতাই নূতন আসিয়াছেন বটে, কিন্তু দুইদিনেই তাঁহার পরম প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

গৌরাঙ্গ পরিকরদের সংখ্যা তখন কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে, ভক্ত সমাজের বিস্তৃতি ঘটিতেছে। প্রভু এবার নিতাই ও হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, "আজ থেকে তোমরা দু'জন জীব উদ্ধারের কাজে আমার সহায় হও। পাপ, অনাচার আর শুষ্ক ধর্মাচরণে দেশ ছেয়ে গেছে। সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তোমরা কৃষ্ণনাম বিলাও। এ কাজ তোমরা ছাড়া আর কে করবে, বলো? পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু সবাইর কাছে এই ভুবনমঙ্গল নাম তোমরা পৌঁছে দাও।"

প্রভুর নির্দেশ পাইয়া নিত্যানন্দ মহাখুশী, ঈশ্বর-নির্দিষ্ট ব্রতরূপে এ কাজকে তিনি গ্রহণ করিলেন। নবদ্বীপের পথে পথে ঘরে ঘরে সকলকে সাধিয়া বিলাইতে লাগিলেন হরিনাম। তাঁহার প্রধান সহায়ক হইলেন নামাচার্য যবন হরিদাস।

দুই জনেরই পরনে সন্ন্যাসীর বেশ। দেহ দীর্ঘায়ত, দিব্য লাবণ্যে ভরা রূপ প্রাণমন কাড়িয়া নেয়। উদাত্ত কণ্ঠের নাম শুনিয়া ভক্তজনেরা ধন্য হয়।

অধার্মিক ও বৈষ্ণব-দ্বেষীর সংখ্যা তখন নদীয়ায় প্রচুর। নাম প্রচারক এই সন্ন্যাসীদুটিকে দেখিয়া কেহ অবজ্ঞা দেখায়, কেহ বা টিট্‌কারী দেয়; কেহ বা মারমুখী হইয়া তাড়াইতে আসে। পরম ভাগবত নিত্যানন্দের তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া নগরময় ঘুরিয়া বেড়ান, সাধিয়া সাধিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলকে বলেন, "ভাই কৃপা ক'রে একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করো, আমায় বিনামূল্যে কিনে নাও।"

জগন্নাথ ও মাধব নবদ্বীপের দুই প্রতাপশালী ব্যক্তি, নগরের শান্তিরক্ষার ভার রহিয়াছে ইহাদের উপর। অর্থ ও সামর্থ্যের যেমন,

অভাব নাই, পাপাচার ও অত্যাচারেও তেমনি ইহাদের জুড়ি মেলানো ভার। দুই ভাই মদের নেশায় সর্বদা চুর হইয়া থাকে, ভক্ত বৈষ্ণব দেখিলে উপহাস করে, অসম্মান অত্যাচার করিতেও কিছুমাত্র তাহাদের বাধে না। সমস্ত নদীয়া এই দু'জনের ভয়ে সন্ত্রস্ত।

নিতাই ও হরিদাস ইহাদের নানা কুকীর্তির কথাই শুনিতে পান। দূর হইতে দুই মাতালের হুড়াহুড়িও মাঝে মাঝে তাহাদের চোখে পড়ে।

নিতাই ভাবিতে থাকেন, পাতকী উদ্ধারের জন্য গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। কিন্তু কৃপার যোগ্য এমন পাতকী প্রভু আর কোথায় পাইবেন? তাঁহার কোনো শক্তি বিভূতির লীলা না দেখিয়া তো লোকে এমনিতেই উপহাস করে। জগাই মাধাইর পরিবর্তন সাধন যদি করা যায়, তবে তো সকলে প্রভুর প্রভুত্ব বুঝিবে, তাঁহার জয় গাহিবে।

নিতাই সেদিন পরম ভাগবত হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভাই হরিদাস, এ দুই পাতকীর দুর্গতি তো দেখতেই পাচ্ছো। হরিনাম করার অপরাধে, মুসলমান কাজীর আদেশে, তোমার উপর কি দুঃসহ অত্যাচারই না হয়েছিল, কিন্তু তুমি তো তাদের জন্য সেদিন শুভ ইচ্ছাই জানিয়েছিলে। এবার তুমি মনে মনে একবার জগাই মাধাইর উদ্ধারের সঙ্কল্প করো, অচিরে প্রভু এদের কৃপা করবেন। তাতে দেশবাসী বুঝতে পারবে প্রভুর মাহাত্ম্য ও প্রভাব।"

হরিদাস হাসিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, একথা তোমার মুখে সাজে না। তোমার ইচ্ছা যে প্রভুরই ইচ্ছা, একথা যে আমার অবিদিত নয়। তুমি যখন একবার ভেবেছ—জগাই মাধাই উদ্ধার হলে ভাল হয়, তবে প্রভুর কৃপা থেকে তাদের আর বঞ্চিত করে কে?"

উভয়ে মিলিয়া সেদিন জগাই মাধাইর বাসগৃহের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উদাত্ত স্বরে হরিনাম কীর্তন শুরু হইল। কাণ্ড দেখিয়া সকলের তো চক্ষুস্থির। এ দুই সন্ন্যাসী কি পাগল, না—মরিতে বাসনা হইয়াছে ইহাদের? কোনো হিংসার কাজ, ঘৃণিত কাজ করিতে

এ দুরাত্মাদের বাধে না। কেহ কেহ সম্মুখে আসিয়া সতর্ক করিয়াও দিল—"কেন ভাই সাধ ক'রে এ দুর্বৃত্তদের ক্ষেপিয়ে তুলছো? তোমাদের কি প্রাণের মায়া নেই?"

হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া নিত্যানন্দ অগ্রসর হইয়া চলেন। সম্মুখে মূর্তিমান্ যমদূতের মতো জগাই মাধাই দণ্ডায়মান। মদের ঘোরে চক্ষু আরক্তিম, হস্তে যষ্টি। উত্তেজিত হইয়া কৃষ্ণনামরত দুই সন্ন্যাসীর দিকে দু'জনে ধাইয়া আসিল। কৌতুকী নিত্যানন্দের রঙ্গ বুঝিয়া উঠা ভার। বৃদ্ধ হরিদাসকে টানিয়া নিয়া উর্ধ্বশ্বাসে তিনি সেখান হইতে পলায়ন করিলেন।

রাজপথে ততক্ষণে চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী দুইটি কোনোমতে প্রাণ বাঁচাইয়া ফিরিতে পারিয়াছে—একদল লোক ইহাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বিদ্রূপ করিবার লোকেরও অভাব নাই, তাহারা বলিতে থাকে, "এ পাপিষ্ঠ দুটোকে এমন ক'রে ঘাঁটিয়ে কি লাভ বাপু, এদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে আবার এমন পালিয়ে যাওয়াই বা কেন?"

লীলাময় নিত্যানন্দের আসল স্বরূপ তাঁহার সহকারী হরিদাসের অজানা নয়। এবার কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত সয়েছি, জলে ডুবেও আবার ভেসে উঠেছি। এতদিন এতো অত্যাচার সহ্য ক'রেও প্রাণটা কোনো মতে ছিল। কিন্তু আজ দেখছি চঞ্চল অবধূতের সঙ্গী হয়ে তাও শেষে খোয়াতে হবে!"

কৌতুকী নিত্যানন্দ জগাই-মাধাই উদ্ধার লীলার ভূমিকাটি রচনা করিতেছেন। এ লীলায় গৌরাঙ্গের আবির্ভাব চাই, করুণা চাই। নইলে তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় লোকে কি করিয়া পাইবে? তাঁহার প্রভুত্বই বা জনসমাজে কি করিয়া হইবে প্রতিষ্ঠিত? প্রভুর কানে এ দুই দুরাত্মার অত্যাচারের কথা তিনি প্রথমে পৌঁছাইয়া দিতে চান। তারপর এক বড় সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে এই পাতকীতারণ লীলায় অবতরণ করাইতে চান।

আপন মনোভাব নিতাই গোপন রাখিলেন, হরিদাসের ঐ প্রণয়-কোন্দলের জের টানিয়া কহিলেন, "আমার চঞ্চলতার দোষ ধরলে কি হবে! একবার তোমার প্রভুর কথাটাও ভেবে দেখো। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে ধরেছেন তিনি রাজসিক বৃত্তি। পরিকরদের ওপর আদেশ জারি করেছেন—ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম বিতরণ ক'রে বেড়াতে হবে। তাঁর এ আজ্ঞা পালন না করলে চলবে না, আবার দুরাত্মাদের কাছে গিয়েও আমাদের প্রাণ হবে বিপন্ন। হরিদাস, তাই বলছি, আমার দোষ না ধরে, তোমার প্রভুর কাণ্ডটাও একবার দেখে নাও।"

ভক্তজনসহ গৌরাঙ্গ সেদিন ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস দুই ভগ্নদূতের মতো সেখানে আসিয়া উপস্থিত। নিত্যানন্দ জগাই-মাধাইর নানা দুষ্কর্মের কথা, আজ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবনের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। তারপর কহিলেন, "প্রভু, তুমি নবদ্বীপের এই দুই মহাপাতকীকে আগে কৃষ্ণনাম নেয়াও, তবে তো লোকে তোমার মাহাত্ম্য বুঝবে। যে ধার্মিক সে তো তার আপন স্বভাবেই নামকীর্তন করতে এগিয়ে আসছে। চরম পাপী যে, তাকে ভক্তি পথে নিয়ে এসো, তবে তো তোমার পাতকীপাবন নাম সার্থক হবে।"

প্রেমাবতার নিত্যানন্দের এই অনুরোধ এড়ানোর উপায় নাই। প্রভুকে জগাই-মাধাই উদ্ধারের জন্য কথা দিতে হইল :

হাসি বোলে বিশ্বম্ভর—
হইল উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন
পাইল তোমার॥
বিশেষে চিন্তহ
তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তার
করিবে কুশল॥

প্রেম-ভিখারী নিত্যানন্দ নদীয়ার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান, সাধু-অসাধু, ভক্ত-অভক্ত সবাইর দুয়ারে গিয়া যাচিয়া যাচিয়া নাম-প্রেম দান করেন। সেদিন কীর্তন-টহল হইতে ফিরিতেছেন। সঙ্গে রহিয়াছেন সহকারী হরিদাস। দু'জনেই দেখিলেন, অদূরে পানোন্মত্ত দুই ভাই জগাই মাধাই ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ ইহাদের উদ্ধারে নিতাই কৃতসঙ্কল্প। দুই বাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া তিনি উচ্চ স্বরে নামকীর্তন শুরু করিলেন।

দুই পাপী প্রচণ্ড ক্রোধে ও উত্তেজনায় লাফাইয়া উঠে। এই তো নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গী সেই অবধূত—দিন নাই রাত নাই তারস্বরে হরিনাম গাহিয়া লোকের শান্তি ভঙ্গ করে। জগাই-মাধাই হরিনামের বিরোধী, এ কথা সে ভালভাবেই জানে, তবুও তাহার ভয়-ডর নাই! এত বড় স্পর্ধা তো নবদ্বীপের কাহারও নাই। মাধাই ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়, নিতাইর মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারে এক ভাঙা কলসী।

আঘাতের ফলে নিতাইর মস্তক হইতে দরদর ধারে রক্ত ঝরিতেছে। এক হাতে তিনি আহত স্থানটি চাপিয়া ধরিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে গাহিতেছেন কৃষ্ণনাম। পথচারীর দল করুণ নেত্রে এ অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে যাইবে, এমন দুঃসাহস কাহার? দুর্বৃত্তদের কোপে একবার পড়িলে যে আর নিস্তার নাই। মাধাইর এ হঠকারিতায় জগাই কিন্তু বড় চঞ্চল হইয়া পড়ে। তাই তো, এ সন্ন্যাসী তো তেমন কিছু অপরাধ করে নাই। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের দু'ভাইর তেমন কি ক্ষতি সে করিয়াছে? মাধাই এতটা নির্মম না হইলেই পারিত। নিতাইর বুক বাহিয়া রক্ত ঝরিতেছে, কিন্তু দেহে মনে কোনো বিকার, কোনো বৈলক্ষণ্যই যেন নাই। দিব্যকান্তি পুরুষের দুই চোখে অতলস্পর্শী করুণার মহিমা! কি যেন এক অপূর্ব মোহিনী শক্তি এই প্রেমিক সন্ন্যাসীর রহিয়াছে, জগাই তাহার অমোঘ আকর্ষণে সেই মুহূর্তে বাঁধা পড়িয়া যায়।

উত্তেজিত মাধাই আবার নিতাইকে আঘাত করিতে যাইবে এমন সময় জগাই তাহাকে ধরিয়া ফেলে।—দৃঢ়স্বরে কহে, "ওরে, কেন শুধু শুধু এই বিদেশী সন্ন্যাসীকে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারছিস্? এবার থাম্ তো।" মাধাইকে নিরস্ত হইতে হইল, নিত্যানন্দ একটা প্রাণঘাতী আঘাতের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন।

ইতিমধ্যে গৌরাঙ্গের নিকট এ চাঞ্চল্যকর সংবাদ পৌঁছে—নিত্যানন্দ আহত হইয়াছেন, মাধাইর নিষ্ঠুর আঘাতে তাঁহার মস্তক হইতে হইতেছে রক্তপাত! স্বগণসহ তখনি তিনি ত্বরিৎগতিতে ঘটনা-স্থলে আসিয়া উপস্থিত।

প্রাণপ্রতিম নিতাই আহত। ক্ষতস্থান হইতে দরদর ধারে রক্ত ঝরিতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া গৌরাঙ্গের ধৈর্যের বাঁধ সেদিন ভাঙিয়া গেল। ক্রোধে হুঙ্কার ছাড়িলেন, এই পাপিষ্ঠদের আজ দিবেন তিনি চরম দণ্ড।

নিতাই অগ্রসর হইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার হস্ত ধারণ করেন। প্রেম বিগলিত কণ্ঠে কহেন, "প্রভু, ক্ষান্ত হও, মাধাইর যেন দোষ হয়েছে, কিন্তু জগাই তো নিরপরাধ। বরং তার সহায়তায়ই আমার জীবন রক্ষা হয়েছে। সত্যি বল্‌ছি প্রভু, এ আঘাত ও রক্তপাতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি। কৃপা ক'রে জগাই আর মাধাইকে আমায় তুমি ভিক্ষে দাও।"

ততক্ষণে জগাইর প্রতি প্রভুর করুণা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই তো পরম প্রিয় নিত্যানন্দের জীবন সে রক্ষা করিয়াছে। তবে তো তাহাকে প্রভুর আজ অদেয় কিছু নাই। প্রেমভরে ভুবাহু বাড়াইয়া জগাইকে আলিঙ্গন করিয়া কহেন, "জগাই, তুমি আমার প্রাণসর্বস্ব নিত্যানন্দের জীবন রক্ষা করেছো, আজ আমায় তুমি কিনে নিয়েছ। আশীর্বাদ করি, কৃষ্ণ-কৃপা তোমার ওপর বর্ষিত হোক্। আজ হতে তোমার ভক্তি লাভ হোক্।"

অপূর্ব প্রভুর মহিমা, অপূর্ব তাঁহার এই বর দান। সমবেত পার্ষদ ও ভক্তগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া ওঠেন। গৌরাঙ্গের দিব্য

স্পর্শে জগাইর দেহে দেখা যায় অদ্ভুত প্রেমাবেশ! মূর্ছিত হইয়া তখনি সে ভূতলে পতিত হয়।

মাধাইর অন্তরেও ইতিমধ্যে তীব্র অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠে। আর সে ধৈর্য ধরিতে পারে না, সাশ্রুনয়নে সেও প্রভুর চরণ জড়াইয়া ধরে। বলে—এক সঙ্গে দুই ভাই এতদিন পাপ করিয়াছে, আজ কেন কৃপা বিতরণের বেলায় দুই রকমের ফল? তাছাড়া, মাধাই হয়তো অধর্মাচরণ করিয়াছে, কিন্তু দয়াময় প্রভু তাঁহার নিজের ধর্ম, দয়া-ধর্ম, ছাড়িবেন কিরূপে?

মাধাইর এ ক্রন্দন ও মিনতিতে কিন্তু প্রভু টলিতেছেন না। তাহাকে কহিলেন, "মাধাই, তোমার অপরাধের যে সীমা নেই। পরম ভাগবত নিত্যানন্দের—আমার অভিন্নহৃদয় নিত্যানন্দের রক্ত-পাত তুমি করেছ। শ্রীপাদ কৃপা ক'রে যদি তোমায় ক্ষমা করেন তবেই তোমার রক্ষা। তুমি তাঁর চরণে ধরে পড়ো।"

মাধাই পদতলে পড়া মাত্রই নিতাই তাহাকে দুই হাতে টানিয়া তুলিলেন, প্রেমালিঙ্গন দিয়া তাহার সর্ব অপরাধ করিলেন মার্জনা। এবার প্রভুর কৃপা বর্ষণ করাইয়া দুই মহাপাপীকে শুদ্ধ করিয়া নিতে হইবে। নিতাই তাই সানুনয়ে কহিলেন—

কোন জন্মে থাকে যদি
আমার সুকৃতি।
সব দিনু মাধাইরে
শুনহ নিশ্চিত॥
মোরে যত অপরাধ
কিছু তার নাই।
মায়া ছাড় কৃপা কর
তোমার মাধাই॥ (চৈঃ ভাঃ)

অবধূত নিত্যানন্দের একি ক্ষমাসুন্দর রূপ, একি পরমমধুর প্রেমলীলা! ভক্তেরা পুলকাঞ্চিত দেহে অনিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে

চাহিয়া আছেন। মিলিত কণ্ঠের আনন্দধ্বনির মধ্যে গৌরাঙ্গ এবার মাধাইকেও করিলেন আলিঙ্গনাবদ্ধ, প্রেমভক্তি দানে তাহাকে করিলেন কৃতার্থ। জগাই-মাধাই আত্মসাৎ-এর এ লীলাটি অবধূত নিত্যানন্দের প্রভাবে সেদিন এমনি করিয়াই নবদ্বীপের ভক্তজন সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল।

ক্ষমা ও আশ্বাস পাইলে কি হয়, অনুশোচনার তীব্র দহনে মাধাইর অন্তর নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। নিত্যানন্দের পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া একদিন সে কহিল, "প্রভু, আমি এমন মহাপামর যে তোমার দিব্য অঙ্গে আঘাত করেছি, রক্তপাত করেছি। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ক'রে হবে, কৃপা ক'রে তাই আমায় বলে দাও।" নিত্যানন্দের চরণে একান্ত শরণ নিয়া বার বার সে তাঁহার মহিমার স্তুতি গাহিতে থাকে।

দয়াল নিতাই প্রেমপুরিত নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, দিব্য দেহের আলিঙ্গনে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া কহেন—

শিশুপুত্রে মারিলে কি
বাপে দুঃখ পায়।
এই মত তোমার
প্রহার মোর গায়॥
তুমি যে করিলে স্তুতি,
ইহা যেই শুনে।
সেই ভক্ত হইবেক
আমার চরণে॥
আমার প্রভুর তুমি
অনুগ্রহ পাত্র।
আমাতে তোমার দোষ
নাহি তিলমাত্র॥

যে জন চৈতন্য ভজে
সেই মোর প্রাণ।
যুগে যুগে আমি তার
করি পরিত্রাণ॥ (চৈঃ ভাঃ)

প্রেমাবতার নিত্যানন্দের আলিঙ্গন ও আশ্বাসবাণী পাইয়া মাধাই যেন আজ প্রাণ পায়। তাহার বুকের উপর হইতে এক বিরাট পাষাণভার নামিয়া যায়। নিতাইর চরণে নিবেদন করেন, "দয়াল প্রভু, তুমি তো আজ আমায় কোল দিয়ে উদ্ধার করলে। কিন্তু দীর্ঘ বৎসর ধরে যে কত লোকের হিংসা করেছি, কত অপরাধ করেছি, তার কোনো সীমা সংখ্যা নেই। আমি তাদের আজ চিনতে পারবো কি ক'রে? তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনাই বা জানাবো কি ক'রে? কৃপা ক'রে তাই আমায় বলে দাও, প্রভু।"

নিত্যানন্দ উপায় কহিয়া দিলেন, "মাধাই, তুমি আজ থেকে সর্ব অপরাধ ভঞ্জনকারিণী গঙ্গার সেবা-কার্য শুরু করো। গঙ্গার ঘাটে সহস্র সহস্র মুক্তিকামী ভক্তের সমাবেশ হয়। তাদের জন্য ঘাট নির্মাণ করো, দিনরাত গঙ্গাতীরে বাস ক'রে ভক্তদের পদরেণু ও আশিস্ গ্রহণ করো।"

মাধাই এই উপদেশ পালন করিতে বিলম্ব করে নাই। স্বহস্তে এক কোদালি নিয়া সে ঘাট নির্মাণে ব্রতী হয়, গঙ্গাতীরে আগত ভক্তজনের সেবায় করে জীবন উৎসর্গ। নিজের নির্মিত এই ঘাটে মাধাই প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়া গঙ্গা স্নান করে, দুই লক্ষ নাম জপ সমাপ্ত করে। তারপর স্নানার্থীদের চরণে ভক্তিভরে সে প্রণত হয়, কাতরে নিবেদন করে—

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত করিনু অপরাধ
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ।

এই ঘাটে বসিয়াই এক কঠোরতপা ব্রহ্মচারীরূপে সে খ্যাতি লাভ করে। আজিও নবদ্বীপে 'মাধাইর ঘাট' পাষণ্ডী মাধাইর এই দিব্য রূপান্তরের পবিত্র স্মৃতিটি বক্ষে ধরিয়া আছে।

জগাইর জীবনেও লাগে গৌর নিতাইর পুণ্য স্পর্শ, জীবনে তাহার আসে মহা পরিবর্তন। উভয় ভ্রাতার একি অপূর্ব বৈষ্ণবীয় আর্তি আর দৈন্য। নবদ্বীপের যে কেহ ইহাদের দর্শন করে, তাহারই দু'চোখ অশ্রু সজল হইয়া উঠে। লোকে বলাবলি করিতে থাকে, ধন্য পুরুষ এই নিমাই পণ্ডিত আর তাঁহার প্রধান পরিকর, অবধূত নিত্যানন্দ। ঐশ্বরীয় শক্তি ধারণ না করিলে দুর্বৃত্ত জগাই মাধাইর এমন পরিবর্তন তাঁহারা কি করিয়া সম্ভব করিলেন ?

এমনি করিয়া সেদিন নিত্যানন্দের কৌশল ও রঙ্গলীলা সারা নদীয়ায় গৌরাঙ্গের প্রভাবকে বিস্তারিত করিয়া দেয়।

শ্রীবাসের কুটিরে প্রতিদিন কীর্তন ও অভিনয়ের নব নব রঙ্গ ষ্ঠিত হইতেছে। প্রভু গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ, এই দুই প্রেমঘন বিগ্রহকে ঘিরিয়া ভক্ত-গোষ্ঠীর আনন্দের আর সীমা নাই। নবদ্বীপে বৈষ্ণবের সংখ্যা ও শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। গৌর হইয়াছেন তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ, আর নিতাই বিরাজমান তাঁহাদের শক্তি ও প্রতিষ্ঠার উৎসরূপে। প্রভু নিতাইকে পরিকরদের সম্মুখে তাঁহার দ্বিতীয় বিগ্রহ-রূপে স্থাপন করিয়াছেন। ভক্তগোষ্ঠী ও ভক্ত সংগঠনের মধ্যে তাঁহাকে প্রধান প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে হইবে, তাই বার-বারই অন্তরঙ্গ মহলে নূতন করিয়া অবধূতের স্বরূপ ও লীলা মাহাত্ম্য তিনি তুলিয়া ধরিতেছেন।

সেদিন সন্ধ্যায় গৌরসুন্দর ভক্তজন পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণকথায় মত্ত রহিয়াছেন। অন্যতম প্রধান পার্ষদ মুরারি গুপ্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদিনকার অভ্যাসমতো মুরারি প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ করিলেন। তারপর প্রণত হইলেন পার্শ্বে উপবিষ্ট অবধূত নিত্যানন্দের পদতলে।

প্রভু সব কিছু লক্ষ্য করিতেছেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠেন, "মুরারি, প্রণাম নিবেদন করতে গিয়ে তোমার কিন্তু একটা ব্যতিক্রম

ঘটলো। তোমার মতো ভক্তবীরের কাছে সবাই প্রকৃত তত্ত্ব জান্‌বে, প্রকৃত আচরণ শিখবে, এই তো আমি আশা করি। কিন্তু সেই তোমারই দেখছি সব কিছু গোলমাল হয়ে গেছে।

মুরারি গুপ্তও হটিবার পাত্র নহেন। করজোড়ে কহেন, "প্রভু, আমার যা কিছু আচার-আচরণ, সবই তো তোমারই প্রভাবে, তোমারই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আর প্রণামের যে ক্রম তুমি ভেতর থেকে শিখিয়ে দিচ্ছ, বাইরের ব্যবহারে যে তা-ই প্রকাশ পাচ্ছে।"

"ভাল, ভাল মুরারি। আজ আর বৃথা বাক্যব্যয় ক'রে কাজ নেই। আগামী কালই সব কিছু তোমার ভেতর হয়তো স্ফুরিত হবে, প্রকৃত তত্ত্ব হবে তোমার বোধগম্য।"

সেদিনকার সভা ভঙ্গের পর মুরারি চলিয়া গেলেন। অন্তরে তাঁহার যুগপৎ হর্ষ ও ভয়ের দোলা লাগিতেছে। প্রভুর ইঙ্গিতের মর্ম বুঝিয়া উঠা ভার। কি ভাবে, কোন্ তত্ত্ব তিনি স্ফুরিত করিবেন কে জানে?

সেই রাত্রিতে মুরারি গুপ্ত এক স্বপ্ন দর্শন করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। গৌর ও নিতাই দুই প্রভু দিব্যোজ্জ্বল মূর্তিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গৌরসুন্দর এসময়ে স্পষ্টভাবে তাঁহার উপলব্ধিতে আনিয়া দিলেন—নিত্যানন্দ শুধু তাঁহার দ্বিতীয় বিগ্রহই নয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রতিম। কহিলেন, গৌরকে প্রণাম নিবেদনের আগে পরম ভক্ত মুরারি যেন নিতাইয়ের চরণে প্রণতি জানায়।

অস্ফুটকণ্ঠে বার বার নিত্যানন্দ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মুরারি গুপ্তের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ভোরে উঠিয়াই তিনি প্রভুর গৃহের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। প্রভু ভক্ত-পারিষদদের মধ্যে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। মুরারি সম্মুখে গিয়া প্রথমেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, তারপর গ্রহণ করিলেন গৌরাঙ্গ প্রভুর চরণধুলি।

কৌতুকী প্রভু ভক্তদের সমক্ষে অবধূত নিত্যানন্দের মহিমা প্রচারের জন্য ব্যগ্র। স্মিতহাস্যে তিনি কহেন, "মুরারি, তোমার প্রণামের ক্রম আজ যেন অন্য রকম দেখছি।"

"প্রভু, সবই তোমার লীলা। তুমি যেমন দেখালে ও বুঝালে, সেই অনুযায়ীই তো আমায় আচরণ করতে হলো। তুমি স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে যে দেখিয়ে দিলে—নিত্যানন্দ তোমার জ্যেষ্ঠ।"

সমবেত ভক্তদের শুনাইয়া সস্নেহে গৌরাঙ্গ কহেন, "মুরারি, তুমি আমার বড় প্রিয়, তাই তো নিত্যানন্দ-তত্ত্ব বুঝবার অধিকার তুমি পেয়েছ।"

প্রভুর কর্মলীলার, কৃপালীলার প্রধান সহকারী নিত্যানন্দ। অক্রোধ পরমানন্দরূপী এই বিরাট পুরুষের কীর্তন-তাণ্ডবে নদীয়া তখন টলমল। মানুষের দ্বারে দ্বারে তিনি প্রেম-ভক্তির পসরা নিয়া ফিরেন, প্রভুর প্রবর্তিত মণ্ডলীর সংগঠনকে ধীরে ধীরে পূর্ণায়ত করিয়া তুলেন। এই বিরাট সংগঠন শক্তি গৌরাঙ্গের কাজীদলন লীলার পরম সহায়ক হইয়া উঠে, মুসলমান শাসনকর্তার আদেশ অমান্য করিয়া এই দেশে প্রকাশ্যে ও সর্বপ্রথমে কীর্তন-অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়।

বহুতর লোক এখন হইতে প্রভু গৌরাঙ্গের চরণে শরণ নিতে আরম্ভ করে, বৈষ্ণব ভক্তগোষ্ঠীর আয়তনও ক্রমেই বিস্তৃততর হইতে থাকে। কিন্তু পাষণ্ড, পাপাচারী ও বৈষ্ণব বিরোধীদের সংখ্যা দেশে তখন নিতান্ত কম নয়। প্রেম ভক্তিধর্মের নেতা নিমাই পণ্ডিতকে তাহারা স্বীকৃতি দিতে চাহে না। প্রকাশ্যে বৈষ্ণবদের করে নানা লাঞ্ছনা ও উপহাস, অত্যাচার করিতেও অনেক সময় দ্বিধা করে না।

প্রভু একদিন সঙ্গোপনে নিত্যানন্দকে নিকটে ডাকাইলেন। কহিলেন, "শ্রীপাদ, আমার প্রাণের ইচ্ছা—পাপক্লিষ্ট জীবকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করবো, আর তারা উদ্ধার পাবে। কিন্তু তা সকল হতে

পারছে কই ? হিংসা ও দ্বেষের আগুন ছড়িয়ে নিন্দুকেরা আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে। এর একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে আমার সন্ন্যাস গ্রহণ। সংসারের ভোগ সুখ একেবারে ত্যাগ না করলে সংসারের জীব আমায় তো প্রীতির চোখে তেমন দেখবে না, আমার কথারও মূল্য তারা দেবে না।"

নিত্যানন্দের শিরে এ যেন এক আকস্মিক বজ্রাঘাত। রুদ্ধবাক্ হইয়া করুণ নয়নে তিনি প্রভুর দিব্য মূর্তির দিকে চাহিয়া আছেন।

প্রভু বুঝিলেন, তাঁহার বিচ্ছেদের এ পূর্বাভাস নিত্যানন্দের প্রাণে কি তীব্র আঘাত হানিয়াছে। সান্ত্বনার সুরে, প্রেমপূরিত কণ্ঠে তাঁহাকে কহিলেন,—"শ্রীপাদ, ভেবে ছাখো, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কোনো শত্রু নেই। আমি সেই সন্ন্যাসী হয়ে কেঁদে কেঁদে লোকের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম ভিক্ষে করবো। তাহলে তো আর তারা নাম প্রচারে বাধা জন্মাতে আসবে না ? কাজেই আমার সন্ন্যাসের কথায় তুমি এমন ভেঙে পড়ো না।"

নিত্যানন্দ তবুও নিরুত্তর। একি মহা দুর্দৈবের কথা আজ তাঁহাকে শুনিতে হইতেছে ? কোন্ মুখে তিনি প্রভুর এ নিষ্ঠুর প্রস্তাবে সম্মতি দিবেন ?

প্রভু এবার তাঁহার শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, স্বীয় আবির্ভাবের নিগূঢ় কারণটি জানাইয়া অবধূতকে কহিলেন—

ইথে তুমি কিছু দুঃখ
না ভাবিও মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে
সন্ন্যাস কারণে॥

জগৎ উদ্ধার যদি
চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি
করিবে আমারে॥

এতক্ষণে নিত্যানন্দ মুখ খুলিলেন। সজল চক্ষে প্রেম গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "প্রভু, তুমি স্বেচ্ছাময়। যে সিদ্ধান্ত তুমি মনে মনে স্থির করেছ তার অন্যথা করবে এমন শক্তি কার আছে? তোমার বিহনে ভক্তদের কি গতি হবে, শচী-মা আর বিষ্ণুপ্রিয়ার কি মর্মান্তিক অবস্থা হবে, তাই আমি কেবল ভাবছি। তোমার এই জীব-উদ্ধারলীলার গতিপ্রকৃতি অবশ্য শুধু তুমিই জানো। সন্ন্যাস নেওয়া যখন স্থির ক'রেই ফেলেছ, তখন তাই হোক। কিন্তু তোমার মনের কথাটি অন্তরঙ্গ ভক্তদের একবারটি জানাও, তারা অন্তত প্রস্তুত হয়ে নিক্।"

নিত্যানন্দের এ অনুরোধ গৌরাঙ্গ অগ্রাহ্য করেন নাই। তাই পার্ষদদের মধ্যে কয়েকজন এ আসন্ন বিচ্ছেদের কথা সেদিন জানিতে পারিয়াছিলেন।

প্রভুর গৃহত্যাগের দিনটি অবশেষে আসিয়া যায়। ভক্তদের প্রেম-বন্ধন, স্নেহময়ী জননীর আকর্ষণ ও পত্নীর প্রণয়পাশ ছিন্ন করিয়া তিনি পথে বাহির হইয়া পড়েন। কাটোয়া নগরে পরম ভাগবত সন্ন্যাসী-কেশব ভারতীর আশ্রম। এই মহাপুরুষের নিকট তিনি সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। নব নামকরণ হইল—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। এ সময়ে তাঁহার সঙ্গী হইবার অধিকারী হন অবধূত নিত্যানন্দ, গদাধর ইত্যাদি পঞ্চ পার্ষদ।

কাটোয়ায় গিয়া দীক্ষা গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যের প্রেমসিন্ধু যেন উত্তাল, দুর্বার হইয়া উঠে। মহাভাবরসে সদা তিনি মাতোয়ারা। হৃদয়ে তাঁহার নিরন্তর পশিতেছে নীলাচলনাথ দারুব্রহ্মের অমোঘ আহ্বান। তাই ব্যাকুলভাবে এবার তিনি মহাধাম নীলাচলের দিকে ধাবমান হইলেন।

চির বিদায়ের আগে জননী ও ভক্তদের সহিত প্রভু একবার সাক্ষাৎ করিতে চান। তাই নিত্যানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, আমি আর নবদ্বীপে ফিরবো না, শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের ভবনে অপেক্ষা করবো। তুমি নিজে গিয়ে জননী ও ভক্তদের সংবাদ দাও।"

নিত্যানন্দ নবদ্বীপে পৌঁছা মাত্র ভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া যায়। প্রভুর সংবাদের জন্য সকলেই মহা ব্যগ্র। সকলকে আশ্বস্ত করিয়া নিতাই শচীমাতার চরণ বন্দনা করিতে যান। প্রভুর গৃহের দৃশ্য দেখিয়া সেদিন তাঁহার পক্ষে আত্মসংবরণ করা কঠিন হয়। পুত্রশোকে মাতা উন্মত্তা-প্রায়, নিরন্তর তিনি বিলাপ করিতেছেন, বারো দিন যাবৎ কোনো আহার্যই গ্রহণ করেন নাই। বিরহবিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ মূর্তি দেখিয়া অশ্রুরোধ করা যায় না। নিত্যানন্দ উভয়কে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তারপর শচীমাতাকে কহিলেন, "মাগো, তোমার উপবাসে যে কৃষ্ণও উপবাসে থাকেন। তুমি স্থির হয়ে উঠে বসো, ভোগান্ন প্রস্তুত করো। আমি ক্ষুধার্ত, তোমার হাতের প্রসাদান্ন খেতে আমার বড় অভিলাষ হয়েছে। আমার সঙ্গে আজ ভক্তেরাও তোমার এখানে প্রসাদ পাবেন।"

নয়নাশ্রু মুছিয়া শচী রন্ধন শুরু করিলেন। সেদিন প্রভুর গৃহে নিত্যানন্দ ও ভক্তদের আহার সম্পন্ন হইল, শচীদেবীও উপবাস ভঙ্গ না করিয়া পারিলেন না। তারপর শচীমাতা ও ভক্তগণসহ নিত্যানন্দ অদ্বৈতের গৃহে উপনীত হইলেন। শান্তিপুরে সেদিন আনন্দের বান ডাকিয়া উঠিল।

জননী ও ভক্তদের নানাভাবে প্রবোধ দিয়া চৈতন্য এবার পুরীর পথে পা বাড়াইলেন। সঙ্গী শুধু অন্তরঙ্গ ভক্ত ও পার্ষদগণ।

নৃত্য ও কীর্তন করিতে করিতে সকলে সুবর্ণরেখার তটে আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রভু তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, আর ভক্তেরা আসিতেছেন কিছুটা পিছনে। এ সময়ে নিত্যানন্দ এক দুঃসাহসী কাজ করিয়া বসেন।

প্রভু প্রায়ই ভাবাবিষ্ট ও অর্ধবাহ্য অবস্থায় থাকেন, সন্ন্যাসদণ্ডটি ঠিকমতো হাতে রাখিতে পারেন না। এজন্য পণ্ডিত জগদানন্দকেই এটি সন্তর্পণে বহন করিতে হয়। সেদিন পণ্ডিত ভিক্ষায় বাহির হইবেন, প্রভুর দণ্ডটি নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, প্রভুর এ সন্ন্যাসদণ্ড তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, এটা কিন্তু খুব সাবধানে রাখতে হবে। আমি গ্রাম থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ ক'রে এখনই ফিরে আস্‌ছি।"

নিত্যানন্দ তখন ভাবাবেশে বিভোর, কখনো বা থাকেন অর্ধবাহ্য অবস্থায়। প্রভুর দণ্ডটি হাতে আসিতেই চেতনা ফিরিয়া আসে, চিন্তা করিতে থাকেন, জীব উদ্ধারের জন্য প্রেমাবতার প্রভুর আবির্ভাব। তাঁহার আবার এ দণ্ড কমণ্ডলু বহন করা কেন? হঠাৎ কি এক অদ্ভুত উদ্দীপনা তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত হয়, হস্তস্থিত দণ্ডটি তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলেন, নদীর জলে দেন তাহা বিসর্জন।

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত জগদানন্দের তো চক্ষুস্থির! ভাবপ্রমত্ত অবস্থায় নিত্যানন্দ এ কি সাংঘাতিক কাজ করিয়া বসিয়াছেন? প্রভুর সন্ন্যাসদণ্ড যে এক পরম পবিত্র বস্তু। এটি ভগ্ন হইয়াছে দেখিলে যে তিনি তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিবেন। পণ্ডিত সঙ্কোচে ভয়ে জড়সড় হইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই প্রভুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ। দণ্ডটি ভগ্ন দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "কার এমন সাহস, কে আমার দণ্ডের এই দুরবস্থা করেছে?"

নিত্যানন্দ তখনও ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "প্রভু, এ কাজ আমারই। যদি ইচ্ছা হয়, তুমি দণ্ড বিধান করো!"

নিত্যানন্দের একথা শুনার পর প্রভুকে রোষ সংবরণ করিতে হইল। সর্ব পাশমুক্ত অবধূতের এ আবার কোন্ বিচিত্র লীলা, কে বলিবে? তাছাড়া, চৈতন্য যে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মান

দিয়া থাকেন। তাই ভাবের ঘোরে দণ্ড ভাঙার জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করারই বা উপায় কই ?

প্রভু শুধু কহিলেন, "এ পৃথিবীতে একমাত্র এ দণ্ডটিই ছিল আমার প্রধান অবলম্বন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় আজ তাও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ভালই হলো। এবার আর কারুর সঙ্গেই আমার কোনো সম্পর্ক রইল না। এখন থেকে আমি একলাই পথ চলবো, আর তোমরা সবাই যদি নীলাচলে যেতে চাও— পৃথকভাবে এসো।"

এ ব্যবস্থাই ভক্তদের আপাতত মানিয়া নিতে হইল। প্রভুকে আগে যাইতে দিয়া ভক্তেরা তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন।

জলেশ্বর গ্রামে শিবের এক জাগ্রত বিগ্রহ বর্তমান। এখানে পৌঁছিয়াই প্রভু নবভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। কীর্তন ও উদ্দণ্ড নর্তনের ফলে সেখানে লোকের ভিড় জমিয়া যায়।

ইতিমধ্যে অনুসরণকারী পরিকরগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত ; ভক্তপ্রবর মুকুন্দের সুললিত কীর্তন ও ভাবাবিষ্ট প্রভুর নৃত্যে এক আনন্দের হাট বসিয়া গেল।

শ্রীচৈতন্যের অন্তর পরম প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠে। সন্ন্যাসদণ্ডটি ভাঙার ফলে যা কিছু উষ্মার সঞ্চার হইয়াছিল, এতক্ষণে তাহা দূর হইয়াছে। এবার নিত্যানন্দকে নিকটে আহ্বান করিয়া প্রেমপুরিত কণ্ঠে অনুযোগ দিলেন—

কোথা তুমি আমারে
করিবে সংবরণ।
যেমতে আমার হয়
সন্ন্যাস রক্ষণ ॥
আরো আমা পাগল
করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর তবে
মোর মাথা খাও ॥

যেন কর তুমি আমা
তেন আমি হই।
সত্য সত্য এই আমি
সভাস্থানে কই॥

প্রভুর শ্রীমুখের এ কথা কয়টিতে অবধূত নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য ও তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চৈতন্য একাকী সবার আগে নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিলেন। জগন্নাথ মন্দিরে সেদিন দেখা গেল অভূতপূর্ব দৃশ্য। শ্রীবিগ্রহ দর্শন মাত্রেই প্রভু প্রেমোদ্বেল হইয়া উঠিয়াছেন, সর্বদেহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বল্পকাল মধ্যেই দিব্যকান্তি দেহখানি সংবিৎহারা হইয়া ধূলায় লুটাইতে থাকে। রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম এই সময়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে উপস্থিত। তরুণ সন্ন্যাসীর অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। পরিহারীদের সাহায্যে তাঁহাকে তিনি সযত্নে নিজ আলয়ে নিয়া গেলেন।

নিত্যানন্দ ও অপর সঙ্গীরা পিছনে পড়িয়াছিলেন, এবার প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। চৈতন্য ও তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তদের পরিচয় পাইয়া সার্বভৌমের আনন্দের অবধি রহিল না। চৈতন্য ও নিত্যানন্দ এই উভয়কেই তিনি পরম যত্নে তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করাইলেন।

ভাবের মানুষ নিত্যানন্দকে সামলাইয়া চলা বড় কঠিন। কখনো তাঁহার প্রেমাবেশ উদ্দাম হইয়া উঠে, কখনো বা উদ্দণ্ড নর্তন-কীর্তন ও হুঙ্কারে তিনি সকলকে সচকিত করিয়া তুলেন। একদিন তো ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি জগন্নাথ মন্দিরে এক প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াই বসিলেন। মন্দিরের গর্ভগৃহে দাঁড়াইয়া নিত্যানন্দ সেদিন সঙ্গীগণ সহ কীর্তন করিতেছেন। অকস্মাৎ মহাভাবে উদ্দীপিত হইয়া পড়িলেন। প্রেম-প্রমত্ত অবধূতের হুঙ্কারে সবাই ভীত চকিত হইয়া উঠিল। ভাবের ঘোরে প্রচণ্ড বিক্রমে তিনি ছুটিলেন জগন্নাথ-

বলরাম বিগ্রহদ্বয়কে আলিঙ্গন করিতে। মন্দির পরিহারীরা সবাই ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিল, কিন্তু তাঁহাকে ঠেকানো গেল না। বেদীর উপর আরোহণ করিয়া অবধূত নিত্যানন্দ বলরাম-বিগ্রহকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন, আর তাঁহার মালাগাছ তুলিয়া নিয়া নিজের গলায় পরিলেন। ঈশ্বরীয় ভাবে তিনি তখন উদ্দীপিত, আননখানি দিব্য আনন্দের ছটায় উদ্ভাসিত। ভক্ত ও পরিহারীদের জয়ধ্বনিতে শ্রীমন্দির মুখরিত হইয়া উঠিল।

নিত্যানন্দের এই প্রেম-প্রমত্ত ভাব এ সময়ে নীলাচলবাসীর বিস্ময় উদ্রেক করিতে থাকে। চৈতন্যের প্রধান পার্ষদরূপে সর্বত্র তিনি হন অসামান্য মর্যাদার অধিকারী।

চৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন; ভক্ত পার্ষদদের কাহাকেও সঙ্গে নিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। সবাইকে কহিলেন, সেতুবন্ধ হইতে তিনি না ফিরিয়া আসা অবধি তাঁহারা সবাই যেন নীলাচলেই অপেক্ষা করেন। নিত্যানন্দ প্রমাদ গণিলেন। কহিলেন, "সে কি কথা প্রভু, একাকী তোমার যাওয়া কি ক'রে হয়? তোমার প্রায়ই কোনো বাহ্যজ্ঞান থাকে না, কখন কি বিপদ ঘটে তা কে জানে? কাউকে তোমায় সঙ্গে নিতেই হবে। দক্ষিণের পথঘাট সব আমার চেনা, সেখানকার তীর্থগুলো আমি পরিক্রমণ ক'রে বেড়িয়েছি। আমাকেই তোমার সঙ্গে যেতে দাও।"

চৈতন্য এ প্রস্তাবে রাজী নন, এই ভ্রমণ সময়ে তাঁহাকে বহুতর কার্য সাধন করিতে হইবে, বহুলোককে উদ্ধার করিতে হইবে, এ সময়ে মুক্ত ও স্বতন্ত্র হইয়াই তিনি চলিতে চাহেন। নিত্যানন্দের স্নেহবন্ধনে নিজেকে জড়িত রাখা তাঁহার মনঃপূত নয়—

প্রভু কহে আমি নর্তক
তুমি সূত্রধার।
যৈছে তুমি নাচাহ
তৈছে নর্তন আমার॥

সন্ন্যাস করি আমি
চলিলাম বৃন্দাবন।
তুমি আমা লৈয়া
আইলা অদ্বৈত ভবন॥
নীলাচল আসিতে তুমি
ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড।
তোমা সবার গাঢ় স্নেহে
আমার কার্য ভঙ্গ॥

সঙ্গীরূপে অন্য কোনো ভক্তকে গ্রহণের প্রস্তাবও তিনি উড়াইয়া দিলেন। এবার নিত্যানন্দ মিনতি করিয়া কহিলেন, "বেশ কথা, আমরা অন্তরঙ্গের দল না হয় নাই গেলাম, কিন্তু পরিচারক ও সঙ্গী হিসাবে একজন কাউকে তোমায় নিতেই হবে। তুমি সদাই থাকবে প্রেমাবেশে বিভোর, দুই হস্ত থাকবে কীর্তন বা নামজপে ব্যাপৃত, কৌপীন-বহির্বাস ও জলপাত্রই বা বহন করবে কে, কে-ই বা এসব দেখাশুনা করবে? ভক্তসরলপ্রাণ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস এখানে রয়েছে ও তাকেই আমরা তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, অন্তত একে নিতেই হবে।"

নিত্যানন্দের এ অনুরোধ এড়ানোর উপায় রহিল না। অগত্যা প্রভু স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, তবে তাই হোক, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

প্রভু দাক্ষিণাত্য ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের পর শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সেদিনকার এই দীর্ঘ পরিক্রমার উদ্দেশ্যটি কম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। ব্রজরসতত্ত্বের মর্মজ্ঞ রামানন্দ রায়কে তিনি এ উপলক্ষে আত্মসাৎ করিলেন, প্রেমধর্মের বীজ সারা দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতে বপন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

মহাধাম নীলাচলে চৈতন্যের লীলানাট্যের মঞ্চটি ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছে। ভারতের দূর দূরান্তে পাদ-পরিক্রমা করিয়া তিনি লক্ষ লক্ষ লোককে কৃষ্ণনামে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, এবার তাঁহার

পড়িল মাতৃভূমি গৌড়ের উপর। এখানকার জনসমাজে তান্ত্রিক প্রভাব বড় প্রবল। নব্যন্যায়ের তর্ক ও কচকচিতে পণ্ডিতসমাজ সদাই থাকে অতিমাত্রায় মুখর। সাধারণ মানুষের জীবনে নীতিধর্ম ও শরণাগতির চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া ভার। তাই নিজের এই আবির্ভাবভূমিতে তাঁহার নব-ধর্ম প্রচার না করিলে চলিবে কেন? সারা গৌড়দেশকে মন্থন করিয়া প্রেমভক্তির অমৃত উৎসারিত করিতে প্রভু ব্যগ্র হইলেন।

কিন্তু এই বিরাট কাজের ভার তিনি কাহাকে দিবেন? প্রভু নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে পুরীধামে বাস করিতেছেন। উচ্চকোটির ভক্ত ও সাধকদের অনেকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হইয়াছেন সন্ন্যাসী। অনেকেরই ধারণা, প্রভুর প্রকৃত অনুগামী হইতে হইলে বুঝি গার্হস্থ্য অবলম্বন না করাই ভাল।

অদ্বৈত অবশ্য গৃহীরূপেই গৌড়ে অবস্থান করিতেছেন। প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্মজ্ঞ ও ব্যাখ্যাতা রূপে তিনি পরিচিত। গৌড়ীয়া ভক্তসমাজ তাঁহার মতো মহাপুরুষকে পাইয়া ধন্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অদ্বৈত বৃদ্ধ হইয়াছেন, এই বিরাট বৈষ্ণব সংগঠনের ভার নিবার মতো বয়স তাঁহার নাই। তাছাড়া, গৌড়দেশে জ্ঞানপন্থী পণ্ডিতের ছড়াছড়ি। ইহাদের আত্মসাৎ করিতে হইলে প্রেমঘন মূর্তি নিতাইর মতন নেতারই প্রয়োজন। প্রভু তাই মনে মনে ভাবিলেন, এ গুরুভার নিত্যানন্দকেই দিবেন।

নিতাই প্রভুর অভিন্নহৃদয় সহকারী। ভক্তগণ তাঁহাকে প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর বলিয়া ভাবিয়া নিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। নব ভাবের উদ্বোধন ঘটাইতে, নবগঠিত বৈষ্ণবসমাজে নূতন উদ্দীপনা নূতন রসতরঙ্গ সৃষ্টি করিতে, তাঁহার মতো সমর্থ পুরুষ আর কে আছে? বলা বাহুল্য সিদ্ধান্ত স্থির করিতে প্রভুর দেরি হইল না।

নিত্যানন্দকে একদিন বিরলে ডাকিয়া নিয়া কহিতে লাগিলেন, "শ্রীপাদ, আমার দুঃখের অবধি নেই। আমি নিজমুখে ঘোষণা করেছি, বিদ্বান্ মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, ধনী দরিদ্র সবাইকে কোলে টেনে

নেব, হরিভক্তি ও প্রেমধর্ম বিতরণ করবো। কিন্তু তার তো উপায় দেখছিনে। আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, গৃহস্থদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আর রইল না। তুমিও যদি সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ ছেড়ে দিয়ে উদাসীন হয়ে থাকো, তবে পতিত অন্ত্যজনদের গতি কি হবে? তাদের উদ্ধার কে করবে? তুমি নিজেকে এমন ক'রে সংবরণ ক'রে রাখলে তো চলবে না। শ্রীপাদ, আমার কথা রাখো। তুমি গৌড়দেশে ফিরে যাও, সেখানে গিয়ে সংসারী হও, সংসারের ঊষর ক্ষেত্রে প্রেমভক্তির অমৃত প্রবাহ নামিয়ে আনো।"

এ কি নির্মম আদেশ! প্রভুর কথা কয়টি শুনা মাত্র নিত্যানন্দ মর্মাহত ও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এ যেন এক আকস্মিক বজ্রাঘাত। অতি অল্প বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াছেন। সন্ন্যাস ও অবধূত জীবনের মধ্য দিয়া ভাগবত প্রেমের পরম মাধুর্য খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। পূর্বতন জীবনের সমস্ত কিছু মহান্ আদর্শ বিসর্জন দিয়া শেষকালে বিবাহ করিতে হইবে, গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করিতে হইবে?

একথাও নিতাই বুঝিয়া নিয়াছেন, প্রভুর জীব উদ্ধার ব্রতের তিনি এক বড় সহায়ক। এ ব্রত সাধনের জন্য যে কোনো প্রকার দুঃখ-বরণে বা ত্যাগ স্বীকারে তিনি পরাঙ্মুখ নন, ইহাও সত্য। প্রভুর আজিকার আদেশ সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন। নিতাইর কাছে ইহা যতই অনভিপ্রেত হোক, তাহা অমান্য করার প্রশ্ন উঠে না। তাই অবনত শিরে এ নির্দেশ তিনি গ্রহণ করিলেন। সর্বজনবন্দিত অবধূত নিত্যানন্দ সেদিন প্রভুর দেওয়া শৃঙ্খল বন্ধন স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

নিতাই এবার গৌড়ের পথে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে তাঁহার রহিয়াছেন প্রেমধর্ম প্রচারের উপযুক্ত ভক্তদল—রামদাস, গদাধরদাস, সুন্দরানন্দ, পরমেশ্বরদাস, পুরুষোত্তমদাস ইত্যাদি।

নিত্যানন্দ নূতন উদ্দীপনায় উন্মত্ত, রসাবেশে আনন্দচঞ্চল। ভক্ত পরিকরদের মধ্যেও তিনি এসময়ে এক বিস্ময়কর অলৌকিক

শক্তি সঞ্চারিত করেন। তারপর ভাববিহ্বল সঙ্গীদলসহ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে গৌড়ে আসিয়া উপস্থিত হন।

গৌড়দেশে সেদিন নিত্যানন্দের প্রকাশ ঘটে প্রেমদাতা 'দয়াল নিতাই' রূপে। ভুবনমোহন তাঁহার দিব্যকান্তি, উল্লাসময় তাঁহার নর্তন-কীর্তন, প্রেমে বিগলিত ঘন তাঁহার নয়নের অশ্রু আর অদ্ভুত তাঁহার সাত্ত্বিক বিকার। এই অলৌকিক পুরুষের সান্নিধ্যে আসিয়া ভক্তেরা সাক্ষাৎভাবে ভাগবত প্রেমের স্পর্শ অনুভব করে, তাঁহার দিব্য প্রেম দর্শনে নরনারী সেদিন উদ্বেল হইয়া উঠে, তাঁহার দৃষ্টি সম্পাতে ও করস্পর্শে হয় প্রেম প্রমত্ত। সেদিনকার গৌড়ে প্রেমাবতার নিত্যানন্দ-প্রভু যেন ভাগবতী সাধনার এক শতদলরূপে বিরাজিত, আর তাহার মধুলোভে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে দূর দূরান্তের ভক্তদল।

নিত্যানন্দের এ সময়কার বর্ণনা দিতে গিয়া, তাঁহার ঐশ্বর্য ও করুণার কথা তুলিয়া বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

যাহারে করেন দৃষ্টি
নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া
পড়েন পৃথিবীতে॥

এ এক অপূর্ব শক্তি সঞ্চারণ। নাচিয়া গাহিয়া কাঁদিয়া ও হুঙ্কার ছাড়িয়া নিত্যানন্দ সেদিন সারা গৌড়ে অপূর্ব প্রেমতরঙ্গের সৃষ্টি করিলেন।

সেদিন তিনি পানিহাটি গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। চারিদিকে বহুসংখ্যক পার্ষদ ও ভক্তদলের ভিড়। অবিরাম ধারায় কীর্তনানন্দ চলিয়াছে। হঠাৎ তিনি ঈশ্বরীয় ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। ভক্ত আদেশ দেন, এখনি তাঁহাকে সাড়ম্বরে অভিষেক করাইতে হইবে। ভারে ভারে গঙ্গাজল আনয়ন করিয়া নিত্যানন্দের অভিষেক সম্পন্ন হয়। বনমালা গলে, চন্দনচর্চিত দেহে

খট্টার উপর তিনি উপবিষ্ট, আর রাঘব পণ্ডিত তাঁহার শিরে ছত্র ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তদের কীর্তন ও উল্লাস ধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রাঘব পণ্ডিতের গৃহে লীলাকৌতুকী নিত্যানন্দ সেদিন এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটান বলিয়া জনশ্রুতি আছে। পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া সহাস্যে স্মিত হাস্যে কহেন, "পণ্ডিত, শিগ্‌গীর আমার জন্য এক ছড়া কদম্বমালা গেঁথে আনো, কদম্ব যে আমার সব চাইতে প্রিয়।"

রাঘব মহা বিপদে পড়িলেন। এ অসময়ে কদম্বপুষ্প কোথায় পাইবেন? জোড়হস্তে বার বার একথা নিবেদন করিয়াও নিষ্কৃতি পাইলেন না। নিত্যানন্দ গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, "পণ্ডিত, দ্যাখো না একবার বাড়ির ভেতর গিয়ে। খোঁজ নাও। হঠাৎ কোথাও এ ফুল ফুটে থাকতেও তো পারে।"

সত্যই তো। রাঘব পণ্ডিত দেখিলেন, গৃহকোণের এক লেবুগাছে গুটিকয়েক কদমফুল ফুটিয়া আছে। বিস্ময় বিমূঢ় রাঘব কোনোমতে আত্মসংবরণ করিয়া মালা গাঁথা শেষ করিলেন, তারপর সর্বসমক্ষে এটি পরাইয়া দিলেন নিত্যানন্দের গলায়।

সেদিনকার কীর্তনে নিত্যানন্দ আরও একটি অলৌকিক লীলা বিস্তার করেন বলিয়া শোনা যায়। কীর্তনরত ভক্তদের নাসিকায় হঠাৎ দমনক পুষ্পের তীব্র সুবাস প্রবেশ করিতে থাকে। বিস্মিত হইয়া সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতেছেন। নিত্যানন্দ এ রহস্যের মর্ম কহিলেন—

চৈতন্য গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্তন।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন॥
সর্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা॥
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য দমনক গন্ধে।
চতুর্দিক পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে॥

তোমা সবাকার নৃত্য কীর্তন দেখিতে।
আপনে আইসে প্রভু নীলাচল হৈতে॥
এতেকে তোমরা সর্ব কার্য পরিহরি।
নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপনা পাসরি॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে।
সভার শরীর পূর্ণ হউক প্রেমরসে॥

নিত্যানন্দের প্রেমদৃষ্টিপাতে সেদিন সমবেত ভক্তদের মধ্যে এক অপরূপ দিব্য ভাবের সঞ্চার হয়, কীর্তনক্ষেত্রে স্বর্গীয় আনন্দের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠে। তাঁহার অপরূপ ঐশ্বর্য প্রকাশের ফলে প্রতিটি লোক সেদিন অলৌকিক প্রেমাবেশে আত্মহারা হয়—

অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম,
পুলক হুঙ্কার।
স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ, গর্জন
সিংহসার॥
শ্রীআনন্দ মূর্ছা আদি
যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত
কৃষ্ণ অনুরাগ॥
সভার শরীরে পূর্ণ
হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দস্বরূপের
প্রেম-বল॥
যে দিকে দেখেন
নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেই দিকে মহাপ্রেম-
ভক্তি বৃষ্টি হয়॥

পানিহাটিতে প্রায় তিন মাস কাল নানা লীলাবিলাসের পর

নিত্যানন্দ খড়দহে চলিয়া আসেন। সেখানেও আনন্দের হাট বসিয়া যায়। এ হাটের ক্রেতা আপামর জনসাধারণ, বিক্রেতা নিত্যানন্দ, পণ্য চৈতন্যপ্রভু। সুরধুনীর তীরে তীরে নিতাই কীর্তন ধরেন—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ
লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ
সে হয় আমার প্রাণ॥

'প্রেমদাতা দয়াল নিতাই'র সে এক অপরূপ রূপ। গুরুগম্ভীর তত্ত্বের আড়ম্বর নাই, সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ নাই, আছে শুধু ভাবোদ্বেল কীর্তন-নর্তন আর নয়নাশ্রুর ধারা। আচণ্ডালে তিনি প্রেম বিতরণ করিতে থাকেন, কখনো ভূমিতলে লুটাইয়া, কখনো লোকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহেন, "ভাই, দয়া ক'রে একবার কৃষ্ণ ভজ, গৌরাঙ্গ ভজ। বিনামূল্যে চিরতরে আমায় কিনে নাও। আমায় তোমাদের দাসানুদাস করো, ভাই।"

দেবপ্রতিম মহাসাধকের এ কি হৃদয়বিদারক দৈন্য ও আর্তি। যে-ই এ দৃশ্য দর্শন করে, নয়নাশ্রু সংবরণ করা তাহার পক্ষে কঠিন হয়। নিত্যানন্দকে কিনিয়া নেওয়া তো দূরের কথা, মুহূর্তে সে নিজেই তাঁহার চরণে বিক্রীত হইয়া বসে। প্রেমিক অবধূতের প্রেম যেমন অতি-মানুষিক, তাঁহার এই প্রচার পদ্ধতিও তেমনি অভিনব। ভাগীরথীর দুই তীরে এমনিভাবে হরিনাম-প্রেমের মহোৎসব তিনি জাগাইয়া তোলেন।

দিক্‌বিদিকে সংবাদ রটিয়া যায়, পতিতপাবন রূপে গৌড়দেশে নিত্যানন্দের প্রকাশ ঘটিয়াছে। আচণ্ডালে নাম-প্রেমসুধা বিতরণ করিয়া তিনি জীবের উদ্ধার সাধন করিতেছেন। অলৌকিক তাঁহার শক্তি, অপরিমেয় তাঁহার জীবপ্রেম, আর প্রভু চৈতন্যের তিনি দ্বিতীয় কলেবর! দলে দলে লোক প্রেমধর্মের প্রবর্তক এই বিরাট পুরুষকে দর্শনের জন্য ভিড় জমায়।

প্রেম সরোবরে নিতাই সদা ভাসমান—প্রেম-রসেরই তরঙ্গভঙ্গে তিনি সদা টলমল। হৃদপদ্মে তাঁহার নব নব ভাবের দল বিকশিত হইয়া উঠে, উদ্বোধন ঘটে নব নব লীলারঙ্গের।

সর্বত্যাগী এই অবধূতের হঠাৎ কি এক খেয়াল হয়, মনোহর নাগর সমাজে তিনি সজ্জিত হইবেন, সর্ব অলংকারে ভূষিত হইয়া দেশের যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইবেন। এই অদ্ভুত ইচ্ছা জাগিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে বসনভূষণ সংগ্রহে দেরি হইল না। এমনিতেই দেহখানি সুগৌর সুঠাম, এবার নীল বসনে মণ্ডিত হইয়া এটি আরও নয়নাভিরাম হইয়া উঠিল। কণ্ঠে তাঁহার রত্নহার, হস্তে সুবর্ণ বলয়, অঙ্গুলি কয়টিতে রত্ন খচিত অঙ্গুরীয়—চরণে রমণীয় রৌপ্য নূপুর। অঙ্গ চন্দনে চর্চিত, ললাটে অঙ্কিত তিলক চিহ্ন, আর গলে বিলম্বিত রহিয়াছে মল্লিকা-মালতীর শুভ্র সুগন্ধ মালা। এই দিব্য রূপ, এই মোহন সাজ, আর তাঁহার নৃত্যের ছাঁদ একবার যে দেখে সে মোহিত হয়। নিত্যানন্দের ভুবনমঙ্গল নামকীর্তন একবার যে শ্রবণ করে—মন প্রাণ তাঁহার চিরতরে বাঁধা পড়িয়া যায়।

তাঁহার পারিষদ দলও কম রঙ্গিয়া নন। মনোহর ব্রজরাখাল বেশে তাঁহারা সদাই সজ্জিত থাকেন। বসন ভূষণের পারিপাট্য তাঁহাদেরও যথেষ্ট। গলে গুঞ্জামালা, হাতে শিঙ্গা, বেত্র ও বংশী নিয়া তাঁহারা শহরে জনপদে সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ান। এই পরিকরদের এক একটি যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, অলৌকিক প্রেম ও শক্তির নানা প্রকাশ দেখাইয়া, ভক্তিরসের প্রবাহ উদ্বেলিত করিয়া সারা গৌড় দেশে তাঁহারা চাঞ্চল্য তুলিয়া দিলেন।

খড়দহ প্রভৃতি অঞ্চল পরিক্রমা করিয়া নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে উপনীত হন। এখানে ত্রিবেণীর ঘাটে পরম ভক্ত উদ্ধারণ দত্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। সাক্ষাৎ মাত্রই ঘটে তাঁহার আত্মসাৎ। উদ্ধারণ সর্বমনপ্রাণ নিত্যানন্দের চরণে নিবেদন করেন, অতুল ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া তিনি হন তাঁহার পার্শ্বচর। সপ্তগ্রামে নিরন্তর অবধূতের নর্তন-কীর্তন ও আনন্দলীলা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

এখানকার বণিকসমাজের নেতা হইতেছেন উদ্ধারণ দত্ত। ইহারই প্রভাবে গৌড়ীয় বণিকেরা নিত্যানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্ত হয়। বাংলার হিন্দুসমাজে ইহারা তখনও জলচল ছিল না। নিত্যানন্দ ইহাদের নূতন মর্যাদা দান করিলেন, নবধর্মের প্রবর্তনে সুবর্ণ বণিকেরা হইয়া উঠিল তাঁহার পরম সহায়ক।

নাম-প্রেমের ঝঙ্কারে সপ্তগ্রাম অঞ্চল মাতাইয়া তুলিয়া নিতাই শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার দর্শনে অদ্বৈতের আনন্দের অবধি রহিল না। সোৎসাহে দুই বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে তিনি আলিঙ্গনে করিলেন। ভাবমত্ত দুই মহাপ্রেমিকের হুঙ্কারে ও ক্রন্দনে শান্তিপুরে সেদিন এক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা হইল।

বৃদ্ধ আচার্য অদ্বৈত প্রভুর কণ্ঠে সেদিন নিত্যানন্দের স্তুতি উচ্চারিত হইতে শোনা যায়—

তুমি নিত্যানন্দ মূর্তি
নিত্যানন্দ নাম।
মূর্তিমন্ত তুমি
চৈতন্যের গুণগ্রাম॥
সর্বজীব পরিত্রাণ
তুমি মহা সেতু।
মহাপ্রলয়েতে তুমি
সত্য-ধর্ম সেতু॥
তুমি সে বুঝাও
চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্য-বৃক্ষে
ধর পূর্ণ শক্তি॥
(চৈঃ ভাঃ)

নবদ্বীপের ভক্তেরা মাঝে মাঝে নিত্যানন্দের দর্শন পান এবং আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন, গৌর-লীলাভূমিতে প্রেমভক্তি রসের

নূতন জোয়ার জাগিয়া উঠে। প্রধানত মহাবলী নিত্যানন্দের প্রেরণাতে গৌরাঙ্গ ভজন বিস্তার লাভ করিতে থাকে।

একবার নিত্যানন্দ নবদ্বীপে হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিত দরিদ্র হইলেও বড় শুদ্ধসত্ত্ব ও ভক্তিমান্। পরম আগ্রহে অবধূত নিত্যানন্দের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। নিজে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব হইলে কি হয়, এসময়ে তাঁহার গৃহের উপরই পড়ে ডাকাতদের দৃষ্টি। নিত্যানন্দের বেশভূষায় খুব আড়ম্বর। কণ্ঠে ও হাতে পায়ে রহিয়াছে নানা সোনা রূপার অলংকার। ভক্তদের উপহারও ভারে ভারে কম আসিতেছে না। অবশ্য এসব কোনো কিছুতেই নিত্যানন্দের হুঁশ নাই। দিনরাত নামপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন।

এই ডাকাতদলের নেতা এক তরুণ ব্রাহ্মণ। নরহত্যা গৃহদাহ প্রভৃতি এমন কোনো কুকাজ নাই যাহা করিতে সে পশ্চাৎপদ হয়। দলবল সঙ্গে নিয়া এক রাত্রিতে সে হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহের পিছনে লুকাইয়া থাকে। সুযোগ মতো নিত্যানন্দকে মারিয়া তাঁহার অলংকার ও টাকাকড়ি সে লুট করিবে।

রাত্রি তখনও গভীর হয় নাই। ডাকাতেরা ঠিক করিল, মধ্যরাত্রে তাহারা আক্রমণ শুরু করিবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে কেমন এক অদ্ভুত ঘুমে সবাই অচেতন হইয়া পড়ে। এ রহস্যময় ঘুম টুটিয়া যায় ভোরবেলায়, তখন সূর্যালোক ছড়াইয়া পড়িতেছে। তখন তাড়াতাড়ি তাহারা সরিয়া পড়ে।

দস্যুদলের জেদ কিন্তু বাড়িয়া যায়। আবার একদিন তাহারা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়া সেখানে হানা দিতে আসে। কিন্তু কি বিস্ময়কর ব্যাপার। বাড়ির চারিদিকে এবার কাহারা পাহারা দিতে শুরু করিয়াছে। দীর্ঘ সুঠাম সুন্দরবপু এই রক্ষীদল, আর ইহাদের হাতেও রহিয়াছে নানা মারাত্মক অস্ত্র। এদিনও লুণ্ঠনের সুযোগ হইল না। ভীত হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয়দিন নিশাযোগে আবার তাহারা আসিয়া উপস্থিত। সোর-

গোল করিয়া অঙ্গনে ঢুকিবামাত্র দেখা গেল কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে তাহাদের সকলেরই দৃষ্টিশক্তি হঠাৎ লোপ পাইয়া বসিয়াছে। ভীত বিভ্রান্ত ডাকাতদের নিজেদের মধ্যেই জড়াজড়ি হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। ইহার উপর আবার আরম্ভ হয় প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি। অতিকষ্টে পথ হাতড়াইয়া কোনোমতে তাহারা পণ্ডিতের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

এবার দস্যুদের সত্যই ভয় হইয়াছে। নাম কীর্তনে প্রমত্ত এই নিত্যানন্দটি তবে তো নিতান্ত সাধারণ সাধক নন। নিশ্চয়ই তাঁহারই শক্তিবলে এ তিন দিন এত কিছু অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাগ্যে তাহাদের প্রাণ যায় নাই। দস্যুদলপতি তাঁহার অনুগামীদের সহ নিত্যানন্দের চরণে আসিয়া আত্মসমর্পণ করে। এ কয় দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া সে বলে, "প্রভু, আমি মহাপাষণ্ড, আপনার অলংকারের লোভে পড়ে পণ্ডিতের বাড়ি লুঠ করতে এসেছিলাম। আমার পাপের আর সীমা নেই। আপনি কৃপাময়, এ অধমকে চরণে স্থান দিন।"

দস্যু ব্রাহ্মণটিকে আলিঙ্গন করিয়া অবধূত নিত্যানন্দ কহিলেন, "বাবা, তোমায় ক্ষমা করবো না তো করবো কাকে? তুমি যে মহা ভাগ্যবান্। কৃষ্ণ কৃপার ফলে তুমি কৃষ্ণের ঐশ্বর্যপ্রকাশ এই তিন দিন এমন ক'রে দেখতে পেয়েছো। এ বস্তু ক'জনের চোখে পড়ে, ভাই? তুমি এবার লুণ্ঠন আর নরহত্যা ছেড়ে দিয়ে পাষণ্ডদের ধর্মপথে টেনে নিয়ে এসো।"

আপন গলার মালাটি দস্যুদলপতির কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া দয়াল নিতাই তাঁহাকে সানন্দে জড়াইয়া ধরেন। নিত্যানন্দের প্রসাদে উত্তরকালে সে এক পরম ভাগবতরূপে পরিণত হয়, অশ্রুকম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইতে থাকে।

গৌড়ে আসিবার পর হইতে নিত্যানন্দ যে সব বৈপ্লবিক কাণ্ড শুরু করেন তাহাতে চারিদিকে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। সুবর্ণবণিকেরা

গৌড়ীয়া সমাজে তখন অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল, তিনি তাঁহাদের কোলে তুলিয়া নেন। বণিক উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন মহাভক্ত, ইঁহারই উপর ছিল নিত্যানন্দের ভোগ রন্ধন ও সেবার ভার। বৈষ্ণবীয় উদারতা ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান নিত্যানন্দ, অব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদেরও ধর্ম-গুরুর ভূমিকা গ্রহণের অধিকার দেন। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, নিরক্ষর, অন্ত্যজ হিন্দু তাঁহার কৃপায় শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবে পরিণত হয়। সম-কালীন সমাজের অনুদারতা, প্রাণহীন ধর্মাচরণ ও অজস্র বিধি-নিষেধের নিগড় ভাঙিয়া নিতাই আনয়ন করেন নূতনতর মুক্তির প্রাণপ্রবাহ।

অগণিত লোক তাঁহার এই উদ্দীপনা ও মুক্তিমন্ত্রে সেদিন মাতিয়া উঠে, উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গোঁড়া ব্রাহ্মণদের বিরোধিতাও এ সময়ে তাঁহাকে কম সহ্য করিতে হয় নাই। নিতাইর নামে তাঁহারা নানা নিন্দাবাদ ও কলঙ্ক রটাইতে ছাড়েন নাই। একদল বৈষ্ণবও তাঁহাকে ভুল বুঝিতে আরম্ভ করে। শুধু তাহাই নয়, নিত্যানন্দের সাজসজ্জার পারিপাট্য, তাঁহার রঙীন ও মনোহর ক্ষৌম বস্ত্র, অঙ্গের অলঙ্কারও একদল লোকের নিন্দা-সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠে।

প্রভুর দর্শনের জন্য নিতাই সেবার নীলাচলে গিয়াছেন। সেখানে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার বড় নির্বেদ উপস্থিত হইল। সবাই জানে, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী চৈতন্য-প্রভুর প্রধান অনুগামী তিনি। কিন্তু আপন প্রেমাবেশ ও আনন্দে মত্ত হইয়া একি চঞ্চলের ন্যায় ব্যবহার তিনি করিতেছেন? বৈরাগ্য ও অবধূতবৃত্তি তো অনেক দিন হইল বিসর্জন দিয়াছেন। উত্তম বেশভূষায় সাজিয়া সদাই তিনি আনন্দরঙ্গে দিন কাটাইতেছেন। এজন্য সমাজের ও সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোকের সমালোচনাও তাঁহাকে মাঝে মাঝে সহ্য করিতে হয়।

পুরীধামের প্রান্তে একটি ফুল বাগিচায় নিতাই সেদিন বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন। বেশ কিছুটা ভয়ও হইয়াছে—প্রভু এবার তাঁহাকে কিভাবে গ্রহণ করিবেন, তাঁহার প্রেমধর্ম-প্রচারের পদ্ধতি

ও আচার আচরণ সম্বন্ধে তিনি কি মনোভঙ্গী অবলম্বন করিবেন, তাহা কে জানে ?

সদানন্দময় নিত্যানন্দ মনোদুঃখে, একাকী চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, একথা প্রভুর কানে পৌঁছিল। ভক্তবৎসল প্রভু তখনি দলবল সহ সেখানে ছুটিয়া আসিলেন।

এখানে তিনি এক বিচিত্র কাণ্ড করেন। নিত্যানন্দকে মুখে কিছু না বলিয়া যুক্তকরে প্রভু তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। ভক্তেরা তখন দলে দলে আসিয়া চারিদিকে ভিড় জমাইয়াছে। চৈতন্য সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া নিত্যানন্দের স্তুতি গাহিতে শুরু করিলেন। কিন্তু এ যে বড় অসহনীয় দৃশ্য! নিত্যানন্দ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বিহ্বল হইয়া প্রভুর সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, সন্ন্যাসীর ধর্ম-ছাড়িয়ে তুমি আমায় এ কি অবস্থায় রাখলে ? আমি আমার ভাব-স্রোতে স্বেচ্ছামতই চলেছি। আমার আচার আচরণ, আমার বেশভূষা দেখে কতজনে কত পরিহাস ও বক্রোক্তিও করে। আমার প্রকৃত কর্তব্য কি তা তুমি এবার আমায় বলে দাও।"

নিত্যানন্দকে প্রবোধ দিয়া প্রভু কহিতে লাগিলেন, "শ্রীপাদ, তুমি কি জান না, তুমি সঙ্কল্প ক'রে আমায় যা করাও তাই আমি ক'রে থাকি। আর তোমার মতো মহামুক্ত পুরুষের আচরণে আবার নিন্দনীয় কি থাকতে পারে ? তোমার দেহে যে অলঙ্কার শোভা পাচ্ছে সে যে শ্রবণ কীর্তনাদি নববিধা ভক্তিরই প্রতীক। তুমি আপামর জনসাধারণে যে ভক্তিসম্পদ বিতরণ ক'রে যাচ্ছো তার তুলনা কোথায় ? জীব উদ্ধারে তুমি অবতীর্ণ, সাধারণ বিধিবিধান তো তোমার জন্য নয়।"

ত্রিজগতে এই প্রভু ব্যতীত নিতাইর আর কে আছে ? এই প্রভুর চরণেই যে তিনি তাঁহার সর্বস্ব অর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাই তাঁহার এ প্রবোধ বাক্যে নিতাই স্থির হইয়া উঠিয়া বসিলেন, শান্ত হইলেন।

গদাধরকে নিত্যানন্দ বড় ভালবাসেন। গৌড় হইতে নীলাচলে আসিলেই তিনি তাঁহার সেবা-কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হন, উভয়ের মিলনে অপূর্ব আনন্দ তরঙ্গ উত্থিত হয়। গদাধরের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ গোপীনাথের জন্য এবার তিনি গৌড়ের সূক্ষ্ম আতপ চাল ও রঙীন বস্ত্র আনিয়াছেন। টোটাগোপীনাথে উপস্থিত হইয়া নিতাই আদেশ দেন, "গদাধর, আজ তোমার মনোমতো ক'রে প্রভুর ভোগ লাগাও।"

গদাধর পরম উৎসাহে উদ্যোগ আয়োজনে লাগিয়া যান। উৎকৃষ্ট ভোগান্ন প্রস্তুত হয় এবং উহা শ্রীগোপীনাথকে ভক্তিভরে নিবেদন করা হয়।

হঠাৎ দ্বারদেশে মধুর কণ্ঠের ধ্বনি শোনা যায়, 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ'। চৈতন্য প্রভু হাসিতে হাসিতে এ সময়ে গোপীনাথ মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত। গদাধর ত্রস্তে ছুটিয়া গিয়া দণ্ডবৎ হইলেন। প্রভু স্মিতহাস্যে কহিলেন, "গদাধর, তোমার এ কি আচরণ, বলতো? আজ এই আনন্দের দিনে আমায় তুমি ভিক্ষা নেবার জন্য বল নি? শ্রীপাদ নিত্যানন্দ এনেছেন ভোগের উপকরণ, পরম নিষ্ঠাভরে তা রন্ধন করেছ তুমি, আর শ্রীগোপীনাথের মুখামৃতের স্পর্শ রয়েছে এ প্রসাদে। এতে আমার ভাগ যে নিশ্চয়ই রয়েছে।"

নিত্যানন্দ দর্শনে গদাধর ও অন্যান্য ভক্তদের যে আনন্দ হইয়াছে প্রভুর আগমনে তাহা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

নিত্যানন্দ নীলাচলে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর চৈতন্য তাঁহাকে একদিন নিভৃতে নিকটে ডাকাইয়া আনেন। প্রভুর আয়ত নয়ন দুইটি করুণায় ছলছল, কণ্ঠে মিনতির সুর। মৃদু স্বরে কহেন, "শ্রীপাদ, আর কেন এভাবে সময় ক্ষেপণ করছো? জীব উদ্ধারের জন্য, সমাজকে ধারণ ক'রে রাখবার জন্য অবিলম্বে তোমার দারপরিগ্রহ করা প্রয়োজন। তোমার গৃহজীবনকে কেন্দ্র ক'রে, তোমার বংশের ধারাকে অবলম্বন ক'রে, গৃহে গৃহে বৈষ্ণব জীবন গড়ে উঠুক—তোমার প্রচারিত নামগানে সবাই নূতন মানুষ হয়ে উঠুক। আমি তো বিরাগী, সংসারত্যাগী হয়ে রয়েছি। জীব উদ্ধারের জন্য জীব-

জীবনের বন্ধন স্বীকার—এ যে তোমাকেই করতে হবে। আর দেরি নয়, তুমি আজই গৌড়ে চলে যাও।"

নিতাই একথায় ক্ষুণ্ণ হন। উত্তরে বলেন, "প্রভু ছলনার তোমার অন্ত নেই। নিবেদিতপ্রাণ ভক্তদের বিচ্ছেদের আগুনে জ্বালিয়ে মারতেই যেন তোমার পরম আনন্দ। বেশ, আমি তোমার দেওয়া দুঃখকেই মাথা পেতে নিলাম। কিন্তু সত্য ক'রে আজ বল, তোমার সাক্ষাৎ আমি কখন কিভাবে পাবো।"

প্রভুর অধরে দেখা দেয় স্মিত হাসির আভা। চৈতন্যের যিনি অভিন্নহৃদয়, অভিন্ন কলেবর বলিয়া পরিচিত তাঁহার মুখে বহিরঙ্গ দর্শনের এ ব্যাকুলতা কেন? কিন্তু নিতাইকে আশ্বস্ত করিয়া অবিলম্বে গৌড়ে না পাঠাইলেও চলিবে না—

প্রভু কহে প্রতিবর্ষে এখানে আসিবা।
ইচ্ছামাত্র আমাকে যে দেখিতে পাইবা॥
তোমার নর্তনে আর মাতার রন্ধনে।
নিঃসন্দেহে আমারে পাইবে দুইস্থানে॥

(নিঃ বংশবিস্তার)

অতঃপর আরম্ভ হয় উভয়ের প্রেমার্তি ও ক্রন্দন। নয়নাশ্রুর ধারায় বসন ভিতিয়া যায়। কৃষ্ণকথার রসভুঞ্জনে, আর নিজ নিজ মর্মকথার উদ্‌ঘাটনে সারারাত্রি অতিবাহিত হয়।

প্রভাতে উঠিয়া চৈতন্য ও নিত্যানন্দ সমুদ্র স্নান সমাপন করেন—উভয়ে মিলিয়া দর্শন করেন দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ। সেই দিনটি হইতে দেখা দেয় চৈতন্য প্রভুর বিরাট ভাবান্তর। ভক্তদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া নিমজ্জিত হন কৃষ্ণ বিরহের মহাসাগরে। ভক্তকবি বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ভাষায়—

সেদিন হইতে প্রভুর
হৈল কোন্ দশা।
নিরন্তর কহে কৃষ্ণ
বিরহের ভাষা॥

চৈতন্য এইদিন হইতে প্রবেশ করিলেন গম্ভীরার গর্ভে। আর তাঁহার প্রতিনিধি নিত্যানন্দ বাহির হইলেন সমাজ-জীবনের উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে—প্রেমধর্মের শ্রেষ্ঠতম ধারক ও বাহকরূপে। চৈতন্যের শক্তি যেন অবধূতের জীবনে নূতন করিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে—নব প্রচারিত প্রেমধর্ম আজ তাঁহার মধ্যেই যেন হইয়াছে বিগ্রহীভূত।

নিত্যানন্দ সেবার পানিহাটিতে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে আসিয়াছেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি ও উল্লাসের অন্ত নাই। সেদিন নদীতীরে এক গাছের নিচে পার্ষদদের নিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। এমন সময় এক তরুণ আসিয়া তাঁহার চরণে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানায়। সেবকেরা কহেন, "প্রভু, ইনি সপ্তগ্রামের জমিদারের পুত্র রঘুনাথ। আপনার কৃপাপ্রার্থী হয়ে এসেছেন।"

রঘুনাথের কথা নিত্যানন্দ শুনিয়াছেন। এই বৈরাগ্যবান্ ভক্ত ইতিপূর্বে শান্তিপুরে চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রভু ইহাকে আশীর্বাদ করেন, কিন্তু আরও কিছুকাল সংসারে থাকিয়া ধর্মাচরণ করিতে উপদেশ দেন। সেই দেবদুর্লভ মূর্তি দর্শনের পর হইতে ভক্ত রঘুনাথের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, কবে সংসার ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণতলে আশ্রয় লাভ করিবেন, সেই চিন্তায়ই দিন গুণিতেছেন।

দয়াল নিতাইচাঁদের কথা, তাঁহার জীবোদ্ধার লীলার নানা কাহিনী, রঘুনাথদাস শুনিয়াছেন। চৈতন্যপ্রভুর এই প্রতিভূকে দর্শনের অভিলাষ তাঁহার বহুদিন হইতেই হইয়াছে। আজ সুযোগ পাইয়া এখানে ছুটিয়া আসিয়াছেন।

পরম ভক্ত রঘুনাথের আগমনে নিত্যানন্দের অন্তর প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠে। রঘুনাথ কিন্তু ইতিমধ্যে সরিয়া গিয়া দৈন্যভরে দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নিতাই তাঁহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আনেন, পদদ্বয় করেন তাঁহার শিরে সংস্থাপন। তারপর কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহেন, "হাঁরে চোরা, তুই নিকটে না এসে এতদিন দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্ কেন? আয়, আজ আমি তোর দণ্ড

বিধান করবো। আমার সব ভক্তদের, সব বৈষ্ণবদের তুই দই-চিড়ে ভোজন করিয়ে দে তো।”

এ যে রঘুনাথের পরম সৌভাগ্য। এ আদেশ যে প্রভু নিতাইর দণ্ডদান নয়, এ তাঁহার বরদান। সমকালীন গৌড়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমিদারের সন্তান রঘুনাথ, ধনজনের তাঁহার অভাব নাই। নির্দেশ দেওয়া মাত্র অমনি দিকে দিকে লোক ছুটিয়া যায়। অবিলম্বে চিড়া মহোৎসবের সমস্ত কিছু উপকরণ সংগ্রহ করা হয়।

ভারে ভারে চিড়া, দধি, গুড়, কলা ও মিষ্ট দ্রব্যাদি আসিয়া উপস্থিত। পানিহাটির গঙ্গাতীরে বৈষ্ণব-সমাজের আনন্দমেলা বসিয়া গেল। লক্ষ লোকের সমাবেশ সেখানে, আর চারিদিকে কেবল দীয়তাং ভুজ্যতা রব। ঘনিষ্ঠ পরিকরদের সঙ্গে নিত্যানন্দ তাঁহার এই পুলিন-ভোজন রঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন।

শুনা যায়, মহাবলী নিতাই সেদিনকার এই মহোৎসবে মহাপ্রভু চৈতন্যকেও আকর্ষণ করিয়া আনেন—চিড়া, দধি তাঁহাকে ভোজন করান। কয়েকটি ভাগ্যবান্ ভক্ত সেদিন গৌর ও নিতাই এই দুই প্রভুর লীলাকৌতুকী রূপ দেখিয়া ধন্য হন।

পুলিন ভোজনের পর শুরু হয় রাঘব পণ্ডিতের গৃহে নৃত্য ও কীর্তন। নিত্যানন্দ আজ যেন প্রেমতরঙ্গভঙ্গে উদ্বেল। মনের আগলটি কোন্ মুহূর্তে খুলিয়া গিয়াছে। রাঘবের গৃহে তিনি সেদিন আরো একটি অলৌকিক লীলা বিস্তারিত করিলেন।

উদ্দণ্ড কীর্তনের পর প্রসাদ গ্রহণের ডাক পড়ে। নিত্যানন্দের আসনের দক্ষিণে স্থাপন করা হইয়াছে চৈতন্য প্রভুর জন্য এক আসন। রাঘব পণ্ডিত সবিস্ময়ে দেখেন, নিত্যানন্দের পাশে প্রভু চৈতন্যও প্রসাদ পাইতে বসিয়া গিয়াছেন। কোথায় সুদূর নীলাচল আর কোথায় পানিহাটি! ভক্তের আকর্ষণ প্রভুকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে, আর অলৌকিক দিব্যদেহ ধরিয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। দুই প্রভুর ভোজনাবশিষ্ট তুলিয়া নিয়া রাঘব পণ্ডিত ভক্ত রঘুনাথকে অর্পণ করিলেন।

পরদিন গঙ্গাস্নানের পর নিত্যানন্দ সাঙ্গোপাঙ্গসহ কৃষ্ণকথা শুরু করিয়াছেন। রঘুনাথ এসময়ে দীনভাবে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, বামন হয়ে আমার চাঁদ ধরবার সাধ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণ পেতে আমি অভিলাষী হয়েছি। কিন্তু বার বারই আমার যাত্রাপথে বাধা এসে পড়ছে।"

"রঘুনাথ, তুমি যে মহাভক্ত। বাধা পেয়ে তুমি পশ্চাদ্‌পদ হবে কেন? আরো দৈন্য, আরো আর্তি নিয়ে এগিয়ে পড়।"

কিন্তু অভিজ্ঞ বৈষ্ণবদের কাছে রঘুনাথ যে শুনেছেন, নিতাইর কৃপা না হলে গৌরকৃপা লাভ করা বড় কঠিন। তাই তাঁহার কৃপার জন্য সর্বসত্তা আজ উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—

তোমার কৃপা বিনা কেহ
চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তারে
অধমেও পায়॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন
করিতে করো ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঁই
হইয়া সদয়॥
মোর মাথে পদ ধরি
করহ প্রসাদ।
নির্বিঘ্নে চৈতন্য পাই,
কর আশীর্বাদ॥

রঘুনাথের শিরে চরণ রাখিয়া নিত্যানন্দ তাঁহাকে আশিস্‌ প্রদান করিলেন। সঙ্গীয় পার্ষদদের কহিলেন, "ভক্ত রঘুনাথের বিষয়-বাসনা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তোমরা সকলে আশীর্বাদ করো, প্রার্থিত চৈতন্যপদ সে যেন অচিরে প্রাপ্ত হয়।"

মুমুক্ষু রঘুনাথের দুই নয়নে তখন অঝোর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে। নিত্যানন্দ সস্নেহে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহেন, "রঘুনাথ, তুমি যে মহাভাগ্যবান্। তোমার প্রতি কৃপা ক'রে গৌরসুন্দর নীলাচল থেকে এসে পুলিন-ভোজনে যোগ দিয়েছিলেন, তোমার মহোৎসবের দধি চিড়া তিনি ভোজন করেছেন, রাত্রে আমাদের পঙ্‌ক্তিতে বসে প্রসাদ ভক্ষণও বাদ দেন নি। তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে এমন ক'রে যিনি ছুটে আসতে পারেন, তিনি কি তোমার বিষয়-বন্ধন মোচন করতে পারেন না? ভয় নেই। আমি আশীর্বাদ কচ্ছি, শীগ্‌গীরই তুমি চৈতন্যচরণ পাবে, তাঁর অন্তরঙ্গ পরিকর রূপে অবশ্য গণ্য হবে।"

নিত্যানন্দের কথায় রঘুনাথ আশ্বস্ত হন, ভক্তদের চরণ বন্দনা করিয়া তিনি সপ্তগ্রামে চলিয়া যান। নিত্যানন্দের পুণ্যস্পর্শ পাইবার পর হইতে রঘুনাথের বিষয়-বিরক্তি চরমে উঠে। এ সময় হইতে তিনি বাড়ির ভিতরে যান নাই, শয়ন মন্দিরেও প্রবেশ করেন নাই। যে কয়দিন সংসারে ছিলেন, বহির্বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপে বাস করিতেন, কৃষ্ণনাম জপ আর গৌরাঙ্গ চরণের ধ্যানে থাকিতেন সদা নিবিষ্ট। নিত্যানন্দের কৃপায় অচিরে এই বৈরাগ্যবান্ সাধক লাভ করেন দুর্লভ চৈতন্যচরণ।

সপ্তগ্রামের জমিদার পুত্র রঘুনাথের এই রূপান্তরের মধ্য দিয়া সেদিন নিত্যানন্দের মহিমা নূতন করিয়া ঘোষিত হয়। এই সঙ্গে সারা গৌড়দেশের বৈষ্ণব সংগঠনও দৃঢ়তর ও বিস্তৃততর হয়। নিত্যানন্দ ও ভক্ত রঘুনাথের অনুষ্ঠিত এই চিড়া মহোৎসবের স্মৃতি দীর্ঘকাল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উদ্দীপিত করিয়াছে। আজিও এদেশে উহার স্মৃতি ম্লান হয় নাই।

নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে নিত্যানন্দ সেবার অম্বিকা কাল্‌নায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সঙ্গে প্রিয় শিষ্য ও সেবক উদ্ধারণ দত্ত।

চৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্ত গৌরীদাস পণ্ডিতের বাস এই নগরে। পণ্ডিতের ভ্রাতা সূর্যদাস তৎকালীন রাজসরকারের এক বিশিষ্ট কর্মচারী, সজ্জন ও ভক্তিমান্ বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি সে অঞ্চলে যথেষ্ট। বসুধা ও জাহ্নবী নামে তাঁহার বিবাহযোগ্যা দুইটি কন্যা রহিয়াছে। উভয়েই সুলক্ষণা ও রূপবতী।

নিতাই বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করুন, ইহাই চৈতন্যপ্রভুর ইচ্ছা। তাই নিতাই নিজ সিদ্ধান্তও এবার তিনি স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। সূর্যদাস পণ্ডিতের গৃহে আসার পর কন্যার সন্ধানও পাওয়া গেল। পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠা কন্যা বসুধার পাণিপ্রার্থী হইলেন নিত্যানন্দ।

বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দের তখন অতুল প্রতাপ। চৈতন্যের অভিন্নহৃদয় ভক্ত ও প্রতিনিধিরূপে সর্বত্র তাঁহার অসামান্য মর্যাদা। সূর্যদাস পণ্ডিতের কাছে তাঁহার এ প্রস্তাব মোটেই ফেলিবার মতো নয়। কিন্তু পণ্ডিত বড় দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। সামাজিক বিধিনিষেধের গণ্ডি কি করিয়া অতিক্রম করিবেন? অবধূত-জীবনে নিত্যানন্দ জাতি বিচার করেন নাই, যত্রতত্র আহার বিহার করিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহার হাতে কন্যা সম্প্রদান করিলে সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে যাইতে হইবে, জ্ঞাতি ও আত্মীয়স্বজনেরাও ইহা অনুমোদন করিতে চাহিবে না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সূর্যদাস পণ্ডিত যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু, আপনি উপযাজক হয়ে আমার গৃহে কন্যাপ্রার্থী, এ আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আপনি নিজেই বলুন, জাতিবর্ণ যিনি ত্যাগ করেছেন, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ হয়ে তাঁর ঘরে আমি কি ক'রে কন্যা সম্প্রদান করবো? আপনি আমায় মার্জনা করুন।"

ভক্তসমাজের যুক্তিজাল, বণিকশ্রেষ্ঠ উদ্ধারণ দত্তের অনুনয় বিনয় কোনো কিছুই সেদিন সূর্যদাস পণ্ডিতের সম্মতি আদায় করিতে পারিল না। এ বিবাহ-প্রস্তাব সম্বন্ধে সকলে হাল ছাড়িয়া দিলেন। নিত্যানন্দ এ বিষয়ে তখন আর কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই।

সেবক-ভক্ত উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে নিয়া তিনি গঙ্গাতীরে চলিয়া যান, এক নিভৃত কুটিরে বাস করিতে থাকেন।

এদিকে সূর্যদাস পণ্ডিতের গৃহে দেখা দিল এক আকস্মিক বিপদ। বসুধা এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, বহু চেষ্টায়ও তাঁহাকে নিরাময় করা যাইতেছে না। অবস্থা ক্রমে চরমে পৌঁছিল, মুমূর্ষু রোগিনীকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় নাই।

ভক্ত গৌরীদাস সেদিন সেখানে উপস্থিত। ভাইকে কহিলেন, "সব চেষ্টাই তো করলে, এবার প্রভু নিত্যানন্দকেই আহ্বান করো, তাঁর শরণাপন্ন হও। নইলে বসুধাকে বাঁচাবার কোনো উপায় আমি দেখছিনে। আমার মনে হয়, অবধূতের কথা অগ্রাহ্য করায়, তাঁর অবমাননা করায়, এ বিপদ উপস্থিত হয়েছে।"

উপয়ান্তর নাই, সূর্যদাস অশ্রু সজল চোখে কহিলেন, "তবে তাই হোক, অবধূতের কাছে ক্ষমা চেয়ে, চরণ ধরে তাঁকে নিয়ে এসো। কন্যা যদি তাঁর কৃপায় জীবন পায় তবে তাঁর করেই তাকে সমর্পণ করবো।"

গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নিচে বসিয়া নিত্যানন্দ কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতেছেন। সবাই তাঁহার কাছে গিয়া মার্জনা চাহিলেন। মিনতি করিয়া তাঁহাকে সূর্যদাস পণ্ডিতের গৃহে নিয়া আসা হইল।

মুমূর্ষু বসুধার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবধূত নিত্যানন্দ সেদিন যে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখান তাহা বড় বিস্ময়কর। 'অদ্বৈত-প্রকাশ' গ্রন্থে ঈশান নাগর এ দৃশ্যের এক মনোরম বর্ণনা দিয়াছেন। নিত্যানন্দ কহিতেছেন—

এই কন্যায় যদি মুঞি
জীয়াইতে পারি।
তবে মোরে কন্যা দিবা
কহ সত্য করি॥
শুনিয়া পণ্ডিত কহে
আর বন্ধুগণ।

জীয়াইলে কন্যা দিব,
করিলাম পণ ॥
তাহা শুনি নিত্যানন্দ
আনন্দিত মনে।
মৃত সঞ্জীবন নাম
দিলা কানে ॥
হরিনামামৃত পিয়া
বসুধা উঠিলা।
অলৌকিক কার্যে সবে
বিস্ময় মানিলা ॥

বসুধা সুস্থ হইয়া উঠিলে সূর্যদাস সানন্দে নিতাইর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। ইহার কিছু দিন পরে পণ্ডিত তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা জাহ্নবীকেও তাঁহার করে অর্পণ করেন। চির উদাসীন, সর্বপাশমুক্ত অবধূত চৈতন্য-কৃপায় হইয়া উঠেন প্রেমধর্মের প্রধান উদগাতা—কৃষ্ণনাম রসের প্রধান ভাণ্ডারী। আবার সেই প্রভুরই প্রেরণায় এবার তাঁহাকে হইতে হয় সংসারী।

নিতাই এখন হইতে পত্নীদ্বয়সহ খড়দহে বাস করিতে থাকেন। এখানে প্রেমের ঠাকুর শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করিয়া গার্হস্থ্যের পরিমণ্ডলকে করিয়া তুলেন অমরার আনন্দ-কানন।

তাঁহার প্রথমা পত্নী বসুধা দেবীর গর্ভে পরম বৈষ্ণব বীরভদ্রের জন্ম হয়। খড়দহের গোস্বামীরা ইঁহাদেরই বংশের সন্তান-সন্ততি। দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবী দেবীর পোষ্যপুত্র রামাই গোস্বামী বিস্তারিত করেন আর এক গোস্বামী-শাখা। বাংলার সমাজ-জীবনের নানা স্তরে প্রেমধর্মের প্রবাহ বেশ কিছুকাল নিত্যানন্দ ধারার এই গোস্বামীরা বিস্তারিত করিয়া যান।

নিতাই ভাবের মানুষ। ভাবপ্রমত্ত ঝঞ্জার মতো কখনো তিনি সম্মুখের সমস্ত কিছু ভাঙিয়া চুরিয়া উড়াইয়া দিয়া যান, কখনো বা

অপার প্রেম ও করুণায় বিগলিত হইয়া সহস্রধারায় আপনাকে বিস্তারিত করিয়া দেন। সর্বপাশমুক্ত অবধূতের জীবন আধারে দিনের পর দিন চলে প্রেমরসের এই অপরূপ লীলা। ভাবের মানুষ, রসের মানুষ নিতাইকে তাই অনেক সময় দেখা যাইত উদ্দাম ও স্বাতন্ত্র্যবাদী মহাপুরুষরূপে। কোনো কোনো কঠোরী, বৈরাগ্যবান্ সাধকের চোখে এ স্বাতন্ত্র্য, এ চাঞ্চল্য, কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকিত। এ সম্পর্কে নিন্দা সমালোচনাও মাঝে মাঝে দেখা দিত।

নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ ছিলেন চৈতন্যের সহপাঠী। প্রভুর এবং তাঁহার প্রেমধর্মের তিনি খুব অনুরাগী। কিন্তু গৌড়ে আসিয়া নিতাই যে আচার আচরণ করিতেছেন তাঁহার মর্ম তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। অচ্ছুৎ অন্ত্যজের হাতে ভোজন, তাহাদের নিয়া নাচানাচি, সর্বোপরি স্বর্ণালঙ্কার ধারণ, মাল্য গন্ধ এবং বিলাসের উপকরণ ব্যবহার—এসবেরই বা তাৎপর্য কি? সেবার নীলাচলে থাকার সময়, সুযোগ বুঝিয়া একদিন এই ব্রাহ্মণ চৈতন্যের কাছে এসব কথা পাড়িলেন।

প্রভু সহাস্যে কহিলেন, "সে কি কথা ভাই, তুমি কি জান না, অধিকারী পুরুষ ও মহাসমর্থ সাধকেরা যে সর্ব দোষগুণের অতীত। ভাগবতে ঠাকুর তো নিজেই বলেছেন—

ন ময্যেকান্তভক্তানাং
গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং
বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম।

—যাঁরা রাগাদি দোষ শূন্য, যাঁরা সকলের প্রতি সমদর্শী হ'য়ে প্রকৃতির অতীত হয়েছেন ও পরমেশ্বরকে পেয়েছেন—বিধিনিষেধ-জনিত পুণ্যপাপের সঙ্গে আমার সেই একান্ত ভক্তদের সম্পর্ক নেই।

সন্দিগ্ধচেতা ব্রাহ্মণটিকে প্রভু আরো স্পষ্টরূপে বলিয়া দিলেন, "ভাই, পদ্মপত্রে যেমন জল স্পর্শ করে না, আমার নিত্যানন্দেও তেমনি পাপের স্পর্শ লাগতে পারে না।"

সর্বজন আরাধ্য প্রভুর কণ্ঠে নিত্যানন্দ মাহাত্ম্যের এই ব্যাখ্যা শুনে ব্রাহ্মণটির বিস্ময় চরমে উঠিল, তিনি নির্বাক হইয়া গেলেন। প্রভু বলিয়া চলিলেন—

নিত্যানন্দ স্বরূপ
পরম অধিকারী।
অল্প ভাগ্যে তাঁহাকে
জানিতে না পারি॥
অলৌকিক চেষ্টা যেবা
কিছু দেখি তান।
তাহাতেও আদর করিলে
পাই ত্রাণ॥
পতিতের ত্রাণ লাগি
তাঁর অবতার।
তাঁহা হৈতে সর্বজীব
পাইবে উদ্ধার॥
তাঁর আচার বিধি-
নিষেধের পার।
তাঁহারে বুঝিতে শক্তি
আছয়ে কাহার॥

পরবর্তীকালে প্রভু একবার গৌড় আগমন করেন। দিকে দিকে সেদিন ছড়াইয়া পড়ে এই আনন্দের বার্তা। সহস্র সহস্র ভক্তের হৃদয়-সাগর প্রেমে ভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। জাহ্নবীর তীরে তীরে আনন্দের মেলা বসিয়া যায়। এই সময়ে পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের ভবনে বসিয়া প্রভু একদিন তাঁহার নিকট নিত্যানন্দতত্ত্ব বর্ণনা করেন। পণ্ডিতকে বলেন—

রাঘব তোমারে আমি
নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাই
নিত্যানন্দ বই॥

এই নিত্যানন্দ যেই
করায়েন আমারে।
সে-ই করি আমি, এই
বলিল তোমারে ॥
আমার সকল কর্ম
নিত্যানন্দ দ্বারে।
এই আমি অকপটে
কহিল তোমারে ॥
যে-ই আমি সে-ই নিত্যানন্দ
ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব
জানিবা হেথাই ॥

প্রভু চৈতন্যের এই ইঙ্গিতপূর্ণ চাবি-কাঠিটি দিয়া রাঘব পণ্ডিত নিত্যানন্দতত্ত্বের মঞ্জুষা উন্মুক্ত করেন—গৌর ও নিতাইর অভেদত্ব তাঁহার সাধনসত্তায় স্ফুরিত হইয়া উঠে।

খড়দহকে কেন্দ্র করিয়া নিতাই তাঁহার প্রেম-ভক্তির রসস্রোত তখন দিকে দিকে ঢালিয়া দিতেছেন। সারা গৌড়দেশ জুড়িয়া তখন অপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্য, প্রেমার্তি ও উন্মাদনা। আপামর জনসাধারণ দয়াল নিতাইর জীবনকাঠির স্পর্শে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রেমনাট্যের এ রঙ্গমঞ্চে নিতাইকে কিন্তু বেশী দিন ধরিয়া রাখা যায় নাই। ধীরে ধীরে এক দিব্য ভাবান্তর তাঁহার জীবনে আত্ম-প্রকাশ করিতে থাকে। কোথায় সে নিতাই যিনি 'মাতা হাতীর' মতো নৃত্যের তাণ্ডবে ধরণী কম্পিত করিয়া তোলেন? প্রেমে বিগলিত অশ্রু ধারায় যিনি শত শত পাষণ্ডীকে অবলীলায় ভাসাইয়া নিয়া যান, তিনি আজ ধীরে ধীরে আপন মর্মতলের কোন্ গোপন নীড়ে আশ্রয় নিতে যাইতেছেন?

ভক্ত ও পার্ষদদের অন্তরে এজন্য বিষাদের অন্ত নাই। নিত্যানন্দের

এই অন্তর্মুখীনতায় তাঁহারা বড় বেদনা পান, বড় অসহায় বোধ করেন।

ইহার পর গৌড়ীয়াদের জীবনে আসে মর্মান্তিক আঘাত। নীলাচলধাম হইতে সংবাদ প্রেরিত হয় প্রভু শ্রীচৈতন্য ভক্তদের শোকসাগরে ভাসাইয়া অপ্রকট হইয়াছেন।

নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে আপনাকে আরও সংহৃত করিয়া নেন। প্রায়ই থাকেন বাহ্যজ্ঞানহীন। আর অর্ধবাহ্য অবস্থায় উচ্চারিত হয় কেবল কৃষ্ণকথা আর গৌর-গুণগান।

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের এ সময়কার এক আলেখ্য আঁকিতে গিয়া বলিয়াছেন—

চৈতন্য বিচ্ছেদে সদাই প্রভুর বিলাপ।
কদাচিৎ বাহ্য হইলে চৈতন্য আলাপ॥
কায়মনোবাক্যে সদা চৈতন্য ধেয়ায়।
উচ্চ শব্দ করি সদা গৌরাঙ্গ গুণ গায়॥
আপনে গৌরাঙ্গ গাই গাওয়ায় জগতে।
গৌরাঙ্গের গুণ গাও পাবে নন্দ সুতে॥

চিরদিনের আনন্দ-চঞ্চল নিতাই ক্রমে হইয়া উঠেন ভাবগম্ভীর এবং দুরবগাহ। নয়টি বৎসর এভাবে অতিবাহিত হয়।

১৪৬৪ শকাব্দের এক প্রভাত। শ্যামসুন্দর মন্দিরে মঙ্গলারতির পর নৃত্য ও কীর্তন অনুষ্ঠিত হইতেছে। অবধূত নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাতের জন্য অদ্বৈত প্রভু সেদিন খড়দহ মন্দিরে উপস্থিত। দুই প্রভুর মিলনে ভক্তদের আনন্দের অবধি নাই।

নিতাইও সেদিনকার কীর্তনে দিব্য ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। ক্রমে দেখা দেয় মহাভাবের গাঢ় আবেশ। এ আবেশ সেদিন আর ভাঙে নাই। সুমহান্ জীবনলীলার শেষ অঙ্ক সমাপ্ত করিয়া নিত্যানন্দ চিরতরে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। শুধু খড়দহে নয়, শুধু গৌড়ে নয়, সারা ভারতের ভক্তসমাজে নামিয়া আসে বিষাদের অন্ধকার।

ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষরূপে আবির্ভূত হন নিত্যানন্দ। তাঁহার প্রকাশ ঘটে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রধান সহকারীরূপে, প্রেমভক্তির উত্তাল রসতরঙ্গ তিনি দিকে দিকে উৎসারিত করেন। কর্মমুখর লীলা-চঞ্চল জীবনের চমকপ্রদ অধ্যায়গুলি একের পর এক হয় অতিক্রান্ত। যতটা নিজেকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেন, অনুদ্‌ঘাটিত থাকে তার চাইতে অনেক বেশী, যে পরিমাণে জীবকে তিনি কাঁদান, কাঁদিয়া যান তার চাইতে বহু গুণ। নিত্যানন্দের মর্ম বুঝিতে গিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্তকবিকে তাই হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিতে হইয়াছে—

বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখান যারে সে দেখিতে পারে॥

বীরশৈব বসভেশ্বর

দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদে দক্ষিণ ভারতের কানাড়ায়, বর্তমানের মহীশূরে, আবির্ভূত হন মহাসাধক বসভেশ্বর। ভক্তিধর্মী শৈব-সাধনার এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেন এই সিদ্ধপুরুষ—সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সঞ্চারিত করেন উদার, সার্বভৌম ও বৈপ্লবিক ধর্মবোধ।

বসভেশ্বরের বীরশৈববাদ এবং তাঁহার সংগঠিত লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের অবদান এ দেশের ধর্ম সংস্কৃতিতে আনিয়া দেয় নূতনতর মহিমা, নূতনতর সমৃদ্ধি। শুধু তাহাই নয়, জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির এক অপরূপ সমন্বয় সাধিত হয় এই সিদ্ধ শিবযোগীর ধ্যান-ধারণা, জীবন সাধন ও ধর্ম-আন্দোলনের ফলে।

১১০৫ খৃষ্টাব্দে কানাড়ার বাগওয়াড়ী[১] নামক স্থানে বসভেশ্বর ভূমিষ্ঠ হন। পিতা মাদিরাজ ছিলেন এই অঞ্চলের সরকারী প্রধান—'গ্রামনিমণি'। ধনবান্ ও ধর্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বসভের মাতার নাম মাদাম্বা। মহা ভক্তিমতী এই মহিলা নিজের দিনান্তের কাজ সমাপ্ত হইলে রোজ তিনি নন্দীশ্বরের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হন, দীর্ঘ সময়ে শিবের পূজা ও ধ্যান জপে কাটাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন।

কন্যা আক্কা নাগাম্মার জন্মের পর কয়েক বৎসর গত হইয়াছে, কিন্তু কোনো পুত্রসন্তান এযাবৎ হয় নাই। জননী মাদাম্বার মনে তাই শান্তি ও স্বস্তি নাই, নন্দীশ্বরের মন্দিরে গিয়া প্রভুর কাছে বার বার সাশ্রুনয়নে নিবেদন করেন তাঁহার অন্তরের আকুতি।

১ দ্রঃ—ডঃ পি. বি. দেশাই : বসভ অ্যাণ্ড হিজ টাইমস, পৃঃ ১৬৮ ; আর. সি. সি কার্ : মনোগ্রাফ অন লিঙ্গায়েৎস, পৃঃ ৩ ; ই. থারসটন : কাস্ট অ্যাণ্ড ট্রাইবস অব ইণ্ডিয়া, ভল্যু ৪, পৃঃ ২৩৯।

দেবতা অবশেষে একদিন প্রসন্ন হইয়া উঠেন। মৃদু-মধুর কণ্ঠের দৈববাণী ধ্বনিত হয় মন্দিরের অভ্যন্তরে—"সুতপা মাদাম্বা, এমন ক'রে আর তুমি অশ্রুপাত করো না। তোমার দুঃখ-রজনীর অবসান হবে এবার, কোল জুড়ে আসবে কুলপাবন পুত্র। শিবাংশে হবে তার জন্ম। শিব-আরাধনার নূতন পন্থা সে করবে উদ্ভাবন। শিবভক্ত মানুষের হবে দিক্-দিশারী—হাজার হাজার আর্ত, দীনজনের হবে আশ্রয় স্বরূপ।"

আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠেন মাদাম্বা। স্বামীর কাছে সোৎসাহে বিবৃত করেন এই অলৌকিক ঘটনার কথা।

দম্পতির আশা পূর্ণ হয়, বৎসরান্তে মাদিরাজের গৃহে ভূমিষ্ঠ হয় সুলক্ষণযুক্ত, প্রিয়দর্শন এক পুত্রসন্তান।

নন্দীমন্দিরের অধীশ্বরের কৃপায় জন্ম, তাই তাহার নাম রাখা হয়, বসভেশ্বর।[১]

মাদিরাজ গ্রামের প্রধান, বিত্ত-বিষয়ও তাঁহার যথেষ্ট। তাই এই পুত্রের জন্মকে কেন্দ্র করিয়া সেদিন তাঁহার ভবনে শুরু হয় আনন্দ উৎসব। আত্মীয়-কুটুম্বদের সাড়ম্বরে আপ্যায়ন করা হয় আর সেই সঙ্গে চলে দরিদ্রদের অন্ন বিতরণ।

গ্রামের উপান্তে রহিয়াছে নন্দীশ্বরের প্রাচীন মন্দির। কয়েকদিন হয় এখানে আশ্রয় নিয়াছেন জাতবেদমুনি নামে এক প্রখ্যাত শৈব সাধক।[২] সিদ্ধপুরুষ এবং শিবভক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা বলিয়া লোকে তাঁহাকে যথেষ্ট সমীহ করিয়া চলে। এই সাধক সেদিন আপনা হইতেই মাদিরাজের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। অভ্যর্থনা ও পদবন্দনার পর মাদিরাজ যুক্তকরে নিবেদন করেন, "প্রভু, আপনার সাধনস্থান পবিত্র কুড়ল-সঙ্গম ছেড়ে কবে এখানে

১ কানাড়ী ভাষায় 'বসভ' শিবের বাহন বৃষভেরই প্রতিশব্দ।

২ লিংগিরাজ পুরাণ : ভন্যু ৭৪

এলেন তা তো জানিনে। যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছেনই আমার নবজাত পুত্রটিকে একটিবার আশীর্বাদ ক'রে যান।"

"বৎস, সেই জন্যেই যে আমার বাগওয়াড়ী গ্রামে আসা। আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নেই। কোথায় তোমার নবজাত পুত্র?"

শিশুটিকে তখনই মহাপুরুষের সম্মুখে নিয়া আসা হয়। বর্ষীয়ান্ সাধকের দুই চোখ দিব্য আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাড়াতাড়ি ঝুলি হইতে একটি ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ বাহির করিয়া বালকের কণ্ঠে তিনি স্পর্শ করান। অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করেন শিব মহিমার স্তোত্রমালা।

গৃহে সমাগত নরনারী সবাই বিস্মিত হইয়া মহাত্মার কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছেন। এবার মাদিরাজের দিকে তাকাইয়া তিনি কহিলেন, "বৎস, তুমি পরম-ভাগ্যবান্, তাই এ শিশু তোমার গৃহে আবির্ভূত হয়েছে। কয়েকটি দিব্য লক্ষণ রয়েছে এর অঙ্গে। দেখবে, উত্তরকালে এক শক্তিধর শৈব মহাপুরুষ বলে এ কীর্তিত হবে। বহু সাধকজনের হবে পথপ্রদর্শক। ধ্যানযোগে এর সংবাদ আমি জেনেছি, তাই দ্রুতপদে চলে এসেছি এই গ্রামে।"

শিশুকে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইয়া বৃদ্ধ সাধক ধীর পদে মাদিরাজের ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণের সন্তানকে উপনয়নের পর শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী হইতে হয়। পিতা তাই বসভেশ্বরের শিক্ষার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বালকের মেধা ও প্রতিভা অমানুষী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভৃতি একের পর এক সে আয়ত্ত করিতে থাকে। অভ্যাসমতো শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী থাকিলেও মনে কিন্তু তাহার তৃপ্তি নাই, প্রসন্নতা নাই। জন্মগত সংস্কার কেবলই তাহার মনকে উধাও করিয়া নেয় কোন্ এক অজানার আকর্ষণে। এই কচি বয়সেই সাধন-ভজন ও ধ্যান-ধারণার দিকেই মন বেশী ঝুঁকিয়া পড়িতে চায়।

বাগওয়াড়ীতে বহু অগ্রহার[১] ব্রাহ্মণের বাস। বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়া-কর্মে ইহারা সবাই ছিলেন পারদর্শী। কিন্তু বালক বসভের কাছে কি জানি কেন এগুলি ছিল অর্থহীন ও প্রাণহীন বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। বরং ইহার চাইতে মাতুলালয় ইংগলেশ্বরের ভক্তিময় পরিবেশ আর শিবভক্ত সাধু সজ্জনের সান্নিধ্য তাঁহার কাছে ছিল অনেক বেশী আকর্ষণীয়। বালক বয়সে মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁহাকে ইংগলেশ্বরে গিয়া বাস করিতে হইত। তাই এখানকার প্রভাব ছোটবেলা হইতেই তাঁহার জীবনে বড় হইয়া দেখা দেয়।

ইংগলেশ্বরের শিব বিগ্রহ রেবন-সিদ্ধেশ্বরের খ্যাতি বহুদিনের।[২] স্থানীয় জনসাধারণের পরম শ্রদ্ধার বস্তু এটি। একটি প্রাচীন গুহায় এ বিগ্রহটি অধিষ্ঠিত। পূজা-পার্বণ উপলক্ষে দূর-দূরান্ত হইতে শত শত নরনারী এই পবিত্র গুহায় আসিয়া সমবেত হয়, রেবন-সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের উদ্দেশে জানায় অন্তরের যত কিছু আকুতি। এই বিগ্রহের কাছে ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী নির্ধনের কোনো ভেদ-বৈষম্য ছিল না। উদার সার্বভৌম শিব সাধনা ছিল এখানকার বিশেষত্ব।

ইংগলেশ্বরের দিব্য মণ্ডপ বা মহামনে-তে জড়ো হইতেন দেশ-বিদেশের শৈব সাধু-সন্ন্যাসীরা, ইঁহাদের সান্নিধ্যে আসিয়া তত্ত্ব ও সাধনের উপদেশ নিয়া গৃহস্থ নরনারীরা উপকৃত হইত। বসভেশ্বরের মাতুল বলদেব এবং মাতা মাদাম্বা স্বভাবতঃই ভক্তিভরে এই সব সাধু সন্ন্যাসীদের সেবা যত্ন করিতেন, ধন্য হইতেন তাঁহাদের উপদেশ ও কৃপালাভে। বালক বসভেশ্বরের মানসপটে এই সব শৈব সন্ন্যাসীর স্মৃতি চিরতরে মুদ্রিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই পরিবেশে তাঁহার জীবনে শিবভক্তির উদয় হয় অতি স্বাভাবিকভাবে।

বসভেশ্বর তখন অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। পিতা মাদিরাজ তাহার উপনয়ন সংস্কারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গ্রামের

---

১ বসভেশ্বরের পূর্বপুরুষ ছিলেন অগ্রহার ব্রাহ্মণ, কাম্যকুল ও সাংখ্যায়ন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। (সিংগিরাজ পুরাণ—১২শ খণ্ড)

২ হরিহর: বসভরাজ দেবর রগলে, পৃঃ ১-১০

স্বগোত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সবাই অগ্রহার—যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠানে তাঁহারা দক্ষ ও উৎসাহী, আর এদিকে মাদিরাজও সমাজে ধনবান্ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। তাই উপনয়নের অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার সঙ্গে সামাজিক উৎসব-আনন্দও সেদিন কম দেখা গেল না।

অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যেই বালক বসভের জীবনে ঘটিয়া যায় চরম দুর্দৈব। পিতা ও মাতা গৃহের সবাইকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। ইহার অল্প কিছুদিন পরেই জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নাগলাম্বের সঙ্গে বসভ চলিয়া যান তাঁহার মাতুলালয় ইংগলেশ্বরে। ফলে বসভেশ্বর কিছুদিনের মধ্যেই রেবন-সিদ্ধেশ্বরে সমাগত সাধকদের প্রভাব গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়েন।

শৈব সাধনার এক নূতনতর, উদারতর পন্থার দিকে অতঃপর তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন।[১]

মাতুল বলদেব রাজসরকারে কাজ করেন। বৎসরের বেশীর ভাগ সময় কল্যাণ শহরে (তৎকালীন মঙ্গলওয়াড়া) তাঁহাকে বাস করিতে হয়। তাই মাতামহীর অভিভাবকত্বে এবং আদরযত্নে তিনি ও তাঁহার ভগ্নী নাগলাম্ব লালিত হইতে থাকেন।

মাতামহী ছিলেন এক খ্যাতনামা শিবভক্তি-সিদ্ধা সাধিকা। স্থানীয় মহামনে বা ধর্মসভায় যে সব সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন ঘটিত তাঁহারা সবাই এই বৃদ্ধা মহিলাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন; তাঁহার সেবা-যত্নে আপ্যায়িত হইতেন। বালক বসভও পরমানন্দে ঘোরা-ফেরা করিতেন এই সব সাধু-সজ্জনদের সঙ্গে। রেবন-সিদ্ধেশ্বর এখান হইতে খুব বেশী দূরে নয়। লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন

---

১ গবেষকদের মতে, বীরশৈব সম্প্রদায়ের পূর্বসূরীরা রেবন-সিদ্ধেশ্বরের প্রভাবেই অনেকাংশে প্রভাবিত হন এবং বেদাচার বহির্ভূত শিব-আরাধনার এক নূতনতর বৈপ্লবিক ধারার প্রবর্তন করেন। উত্তরকালে বসভেশ্বর এই সাধকদের ধ্যান-ধারণাকেই রূপায়িত করেন

সাধু-সন্ন্যাসী, বহু শক্তিধর সিদ্ধপুরুষ এ অঞ্চলে যাওয়া-আসা করিতেন। বেদাচারের বাহিরে এক সর্বজনীন শিবভক্তির আন্দোলন ইহাদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেখানে গড়িয়া উঠিতেছিল।

এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শৈব তীর্থ কুড়ল-সঙ্গম খুব বেশী দূরে নয়। লিঙ্গায়েৎ সাধু ও শৈব যোগীদের কয়েকটি সিদ্ধ-গুহা ও সাধনকেন্দ্র প্রাচীনকাল হইতেই সেখানে রহিয়াছে। সেখানকার সাধকেরা অনেক সময় ইংগলেশ্বরের মহামনে বা ধর্মসভায় আসিয়া জুটিতেন। মাতামহী ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নাগলাম্বের সহিত বসভও এই সব সাধুদের সান্নিধ্য উপভোগ করিতেন প্রাণ ভরিয়া। শৈব ধর্মের তত্ত্ব ও সাধনক্রম তিনি এই সুযোগে শ্রদ্ধাভরে তাঁহাদের নিকট হইতে জানিয়া নিতেন।

ইংগলেশ্বরে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়। বসভ এবার পদার্পণ করেন ষোল বৎসরে। কৈশোর ও যৌবনের এই সন্ধিক্ষণেই তাঁহার জীবনে ফুটিয়া উঠে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মননশীলতা। শৈব ধর্মের, বিশেষত লিঙ্গায়েৎদের সর্বজনীন উদার মতবাদের গভীরে প্রবেশ করার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া পড়েন।

বালককাল হইতেই ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকটি তাঁহাকে আকৃষ্ট করে নাই। বাগওয়াড়ীর আত্মীয়-স্বজনেরা খ্যাতনামা কর্মকাণ্ডী পণ্ডিত। যে-কোনো পূজা-পার্বণে উৎসবে তাঁহারা বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড ও যাগযজ্ঞ নিয়া মাতিয়া উঠেন, ধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠার চাইতে বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানই যেন তাঁহাদের কাছে বড় হইয়া উঠে। এ অনুষ্ঠানে আত্মিক সংবেদন তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ যে শুধু ধর্মের প্রাণহীন কাঠামো বা খোলস নিয়া অকারণ মাতামাতি করা।

তরুণ বসভেশ্বরের অন্তর এবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসে। উপনয়নের সংস্কার তিনি অগ্রাহ্য করেন, আর উপবীত ছিন্ন করিয়া আসিয়া দাঁড়ান লিঙ্গায়েতী সাধু-সন্ন্যাসীদের আস্তানায়। এখন হইতে সেই পরম শিবেরই আরাধনা ও সাধনা তিনি করিবেন, যাঁহার কৃপায় পণ্ডিত মূর্খ ও ব্রাহ্মণ অন্ত্যজের ভেদবৈষম্য ঘুচিয়া যায়, ধনী

নির্ধন আচারী অনাচারীর পার্থক্য হয় দূরীভূত। খণ্ড বুদ্ধির পরপারে যে দেবাদিদেব বিরাজিত, যাঁহার অখণ্ড পরমসত্তায় বিশ্বসৃষ্টির স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছু ওতপ্রোত, সেই পরমপুরুষের কাছেই নিজেকে করিবেন তিনি উৎসর্গীত।

অধ্যাত্ম-জীবনের এই বিপ্লব-সূচনায় বসভের সারা অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠে শৈব সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র কুড়ল-সঙ্গমে গমনের জন্য। সেখানে গিয়া কঠোর সাধনায় ব্রতী না হওয়া অবধি জীবনে যে তাঁহার শান্তি নাই, স্বস্তি নাই।

দেবাদিদেব বুঝি তাঁহার ভক্তের অন্তরের এই আকুতি শুনিতে পাইলেন। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটানোর জন্য অচিরে পরম সুযোগ মিলিয়া গেল। বসভের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নাগলাম্বে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, ভক্তিমতী সাধিকা বলিয়া তাঁহার সুনামও এ অঞ্চলে ইতিমধ্যে রটিয়া গিয়াছে। মাতামহী ঠিক করিলেন এবার তাঁহার বিবাহ দিবেন। কুড়ল-সঙ্গমে এক ধনবান্ ও ভক্তিমান্ বংশের ছেলে শিবদাস। রূপে গুণে সব দিক দিয়াই সে নাগলাম্বের বর হইবার উপযুক্ত। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সাড়ম্বরে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। বসভেরও সুযোগ আসিল তাঁহার বহু ঈপ্সিত তীর্থ কুড়ল-সঙ্গমে যাওয়ার জন্য।

মাতামহীকে কহিলেন, "কুড়ল-সঙ্গম সাধু তপস্বীদের স্থান তো বটেই, তাছাড়া সেখানে রয়েছে শাস্ত্রপাঠের ও আত্মিকজীবন গঠনের পরম সুযোগ। ঠিক করেছি, আমি এবার সেখানে থেকেই শাস্ত্রপাঠ করবো, সাধন-ভজনে রত হবো।"

দিদি নাগলাম্বের তো উৎসাহের অবধি নাই। ছোট ভাই তাঁহার কাছাকাছি থাকিবে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে? তিনিও মাতামহীকে চাপিয়া ধরিলেন। এবার বসভের কুড়ল-সঙ্গমে যাওয়ার পক্ষে আর কোনো বাধা রহিল না। অচিরে সেখানে পৌঁছিয়া একটি বিদ্যাকেন্দ্রে তিনি আশ্রয় নিলেন, তারপর ব্রতী হইলেন আত্ম-উজ্জীবনের সাধনায়।

কুড়ল-সঙ্গম এ সময়ে খ্যাত ছিল বেদ, উপনিষদ, আগম এবং কাব্য পুরাণ প্রভৃতির পঠন-পাঠনের জন্য। ১১৬০ খৃষ্টাব্দে এ স্থানে যে চারিটি বিশাল শিলালেখ পাওয়া যায়, তাহাতে বলা হইয়াছে,—'কুড়ল-সঙ্গম সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণদের আবাস স্থল, আর এখানকার সন্ন্যাসী সাধক বা মহাজনেরা সারা কানাড়ায় প্রসিদ্ধ তাঁহাদের বিদ্যাবত্তার জন্য। ঈশানীয়-গুরু এই মহান্ বিদ্যাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ।'

বসভের মেধা প্রতিভা ও জ্ঞানতৃষ্ণার পরিচয় পাইয়া এই ঈশানীয়-গুরুই গ্রহণ করিলেন তাঁহার শিক্ষাগুরুর স্থান।

বসভের মনের স্বাভাবিক ঝোঁক কিন্তু শৈবশাস্ত্র ও শৈবসাধকদের তথ্য আহরণের দিকে। অল্প দিনের মধ্যে দাসিমায়, রেবনসিদ্ধ, মাদরণ, কেশিরাজ প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষদের কথা ও তাঁহাদের তত্ত্ব-উপদেশ তিনি জানিয়া নিলেন। তেষট্টি পুরাণ বা তামিলী নাইনারদের কাহিনী অধ্যয়ন শেষ করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

শাস্ত্র ও ধর্মসাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তরুণ বসভের হৃদয়ে শিবভক্তির ধারাস্রোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

এখানকার নির্জনতা, নিসর্গ-সৌন্দর্য ও আনন্দময় পরিবেশ স্বতঃই মনকে রসাবিষ্ট করিয়া তোলে। সব চাইতে বড় কথা, এখানে আসিয়া বসভ লাভ করেন জাগ্রত বিগ্রহ সঙ্গমেশ্বরের সান্নিধ্য।

প্রতিদিন প্রত্যূষের আগেই বসভ শয্যাত্যাগ করেন। কৃষ্ণা ও মলপ্রভার পুণ্য সঙ্গমে গিয়া সমাপন করেন তাঁহার অবগাহন স্নান। তারপর নিজ হাতে রাশি রাশি পুষ্প চয়ন করিয়া উপনীত হন প্রভু সঙ্গমেশ্বরের মন্দির দ্বারে। ধ্যান ভজন ও স্তবগানে প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হয়। দিনে রাতে এমনি করিয়া চলে ইষ্টদেবের আরাধনা।

সেদিন পূজা ধ্যান সারিয়া সবে তিনি মন্দির চত্বর হইতে বাহিরে আসিয়াছেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে অদূরে দণ্ডায়মান জটাজুটধারী এক

শৈব সন্ন্যাসীর উপর। বসভের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

বসভ শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন করিতেই সন্ন্যাসী প্রসন্ন মনে আশীর্বাদ করেন, স্নিগ্ধ স্বরে কহেন, "বৎস, আমি যে তোমারই জন্য এতদিন অপেক্ষা করে আছি। তুমি প্রভু সঙ্গমেশ্বরের চরণতলে এসে গিয়েছো, ভালই হয়েছে।"

বসভের সারা দেহ-মন-প্রাণ স্বর্গীয় আনন্দে আবিষ্ট হইয়া উঠে। মনে হয়, এ সন্ন্যাসী যেন তাঁহার অতি পরিচিত, অতি আপনার জন। কিন্তু কে তিনি, কি তাঁহার পরিচয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

সন্ন্যাসী এবার তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহেন, "বসভ, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের। আমি তোমায় ঘনিষ্ঠভাবে জানি, বৎস। কিন্তু তোমার পক্ষে আমার পরিচয় জানা সম্ভব নয়। এ অঞ্চলের ভক্ত-সাধকেরা সবাই আমায় জানে জাতবেদমুনি বলে। তোমার পিতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তোমাদের গ্রাম বাগওয়াড়ীতেও আমি গিয়েছি।"

"তাহলে, তখনই কি আপনাকে দেখেছি, প্রভু?" করজোড়ে বসভ নিবেদন করেন।

"না বৎস, তুমি তখন সদ্যপ্রসূত শিশু মাত্র। আমার স্মৃতি ধরে রাখবার মতো বয়স তখন তোমার কই? বাগওয়াড়ীর নন্দীমন্দিরে কয়েকটা দিন অতিবাহিত করতে গিয়েছিলাম—আর তা তোমারই কারণে। প্রভু সঙ্গমেশ্বরের প্রত্যাদেশ পেয়ে তোমায় আমি দিয়েছিলাম লিঙ্গায়েৎ শৈবদের প্রথা অনুযায়ী লিঙ্গ-দীক্ষা, তোমার কণ্ঠে স্থাপন করেছিলাম লিঙ্গ প্রতীক। প্রভু সঙ্গমেশ্বরের চিহ্নিত ভক্ত তুমি, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক কিছু কাজ তোমায় করতে হবে। পরে জানতে পারবে সব।"

"প্রভু, আমি বালক মাত্র। শৈশব থেকেই অজানিতভাবে ইষ্টরূপে গ্রহণ করেছি দেবাদিদেব মহাদেবকে। কিন্তু এই ইষ্টের

দর্শন কি ক'রে হবে, কি ক'রে তাঁর সেবায় মন-প্রাণ ঢেলে দেবো, তা আমার জানা নেই। এই অবোধ অজ্ঞান বালককে আপনি কৃপা ক'রে আশ্রয় দিন, পরম পথের সন্ধান দিয়ে কৃতার্থ করুন।"

"সেইজন্মেই তো এ স্থানে আমার আগমন। বৎস, তোমায় আমি নূতন ক'রে লিঙ্গ-দীক্ষা দেবো, আর দেবো নিগূঢ় সাধনার গভীরে প্রবেশ লাভের উপদেশ, কিন্তু এ সবই প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র। এই সঙ্গে তোমায় প্রাচীন ও নবীন শাস্ত্রে পারঙ্গম হতে হবে। শৈবধর্মের প্রচারে, জন-জীবনের উন্নয়নে, তোমার একটা বিধি-নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কাজেই সাধনা ও সিদ্ধির সঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞানও তোমায় আয়ত্ত করতে হবে।"

সেদিন এমনি আকস্মিকভাবে ঐশী কৃপার দ্বার উন্মোচিত হয় বসভের জীবনে। জাতবেদমুনির প্রভাবে এখন হইতে অতি সহজে কুড়ল-সঙ্গমের বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রবিদের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিতে থাকে।

সহজাত শুভসংস্কার ও সাধননিষ্ঠা বসভের রহিয়াছে, তদুপরি রহিয়াছে শক্তিধর গুরুর নির্দেশ ও পরিচালনা। তাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার সাধনজীবনে যেমন রূপান্তর ঘটে, তেমনি তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠেন প্রাচীন বেদ-বেদাঙ্গ আগম এবং আধুনিক শাস্ত্র ও প্রকরণ গ্রন্থের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে।

সাধনা ও শাস্ত্র অধ্যয়নের মধ্য দিয়া বসভের মনে ইষ্টভাবনা ও শিবতত্ত্বের একটা নূতনতর উপলব্ধি ফুটিয়া উঠে। পরমতত্ত্ব হিসাবে শিব অনাদি ও অনন্ত, অবিনশ্বর। বিশ্বসৃষ্টির সব কিছু তাঁহা হইতেই উদ্ভূত—আবার লয় হয় তাঁহাতেই। চেতন, অচেতন, স্থাবর জঙ্গম সবই শিবের শরীর, শিবময়। তবে তাঁহার সৃষ্ট এই বিশ্ব-সংসারে উচ্চ-নীচের ভেদবৈষম্য কেন থাকিবে?

পৌরাণিক যুগের শিবের ক্ষেত্রেও দেখা যায়—তিনি আশুতোষ, পরম কারুণিক। আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, পণ্ডিত-মূর্খের ভেদ

তাঁহার কাছে নাই। হিমালয় শিখরের গলিত তুষারের মতো তাঁহার কৃপার ধারা সতত সর্বত্র ঝরিয়া পড়িতেছে। শিবের বৈশিষ্ট্য—তাঁহার মহা করুণা। তবে এই করুণার ধারাকে সমাজের সর্ব স্তরে কেন ছড়াইয়া দেওয়া হইবে না? জাতিভেদের প্রাচীর কেন মাথা উঁচাইয়া থাকিবে শিবভক্ত জঙ্গমদের মধ্যে? কৃত্রিম বর্ণভেদের বিলোপসাধন করিয়া, স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য দূর করিয়া কেন শিব-আরাধনা ও শিবলোকের কল্যাণধারাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হইবে না?

গুরু জাতবেদমুনির কাছে বসভ মাঝে মাঝে তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করেন। গুরু সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ দেন না, প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে দুই চারিটি কথা বলিয়া উঠিয়া যান।

সেদিন দুজনে এ বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ হইল। বসভ সবিনয়ে কহিলেন, "গুরুদেব, শৈবযোগ ও শিবভক্তি আজ যে পর্যায়ে রয়েছে তাতে আমার মনে শান্তি খুঁজে পাচ্ছি না।"

"কি ব্যাপার, খুলে বলতো!"

"শৈবধর্ম করুণার ধর্ম, সর্বজনীন ধর্ম। একদল আচার্য ও সাধুমণ্ডলীর গণ্ডীর মধ্যে একে এমন ক'রে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা কেন? বৈদিক অবৈদিক, আর্য, দ্রাবিড়, ব্রাহ্মণ শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলের মধ্যেই শিবের আরাধনাকে ছড়িয়ে দেওয়া হোক না কেন?"

"বেশ তো, বৎস, এতো অতি উত্তম কথা।"

"প্রভু, আজকের দিনের সমাজের দিকে চেয়ে দেখুন। ধর্ম, ন্যায়নীতি বলতে কিছু নেই। স্বার্থের কলুষে দেশ ভরে গিয়েছে। এ সময়ে শৈবধর্মেরই বা কি দুর্দশা। সাধকেরা নেমে গিয়েছে গোপন বীভৎস পাপাচারের পথে। আজ এ ধর্মের উজ্জীবন চাই। প্রকৃত শিবভক্তির মধ্য দিয়ে এ উজ্জীবনকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে, নিয়ে যেতে হবে দীন হীন প্রতি মানুষের দ্বারে, দেবাদিদেব আশুতোষের প্রসন্নতা লাভ করবে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সবাই।"

"বসন্ত, কানাড়ায়, শুধু কানাড়া কেন সারা দক্ষিণ ভারতে, এক নূতন শৈব আন্দোলন আসন্ন, তা আমি জানি। এই আন্দোলন সফল হবে তোমার সাধনা ও সিদ্ধিতে। কিন্তু বৎস, এজন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি তো চাই।"

"আদেশ করুন, এই মুহূর্তে আমি সকল কিছু ত্যাগ ক'রে শৈব সন্ন্যাস গ্রহণ করি। সারা দেহ মন নিয়োজিত করি ঈশ্বরের এই মহান্ কর্মে।"

"না বৎস, এজন্য তোমার সন্ন্যাস নেবার প্রয়োজন নেই। বরং গৃহে থেকে, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকেই তোমায় করতে হবে এই নূতন শৈব আন্দোলনের নেতৃত্ব।"

"আপনার কথার মর্ম ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে, প্রভু। আমায় একটু বুঝিয়ে বলুন।"

"জানতো কর্ণাটী শৈব সাধকদের কথা—'কায়কভে কৈলাস', অর্থাৎ কায়ক বা কর্ম হচ্ছে মানব-জীবনের কৈলাস। এই কায়ক সাধনা তোমায় গ্রহণ করতে হবে, কৈলাসপতির সংসারকে ক'রে তুলতে হবে কৈলাসস্বরূপ। কায়কের মূল কথা, দেহ মনকে ব্যবহারিক কর্মে নিয়োজিত রাখতে হবে এবং এই ব্যবহারিক কর্মকেই বিশ্বাস করতে হবে ঐশ্বরীয় কর্ম বলে। দেহ মনের কর্ম ও ধর্ম-সাধনায় যে ঐকতান বেজে উঠবে, তার ফলে মানবসমাজে নেমে আসবে মুক্তির স্বর্গ। আরও একটা কথা আছে। ব্যবহারিক কর্মজাত সমস্ত অর্থ নিবেদন করতে হবে শিবভক্ত ও শিবযোগী জঙ্গমদের সেবায়। স্মরণ রাখবে এই সঙ্গে, শিবে পূর্ণ আসক্তি ছাড়া কর্মে অনাসক্তি জন্মে না। শিবে পূর্ণ আত্মোৎসর্গ ছাড়া এ সাধনা সম্ভব নয়।"

"বেশ, আপনার অনুমতি পেলে এই সাধন-পথই আমি আজ থেকে বেছে নেবো।"

"তাই নাও বৎস। আর এ সঙ্গে তৈরী হও গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করার জন্য। অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যের প্রশাসনের ভারও তুমি

পাবে। শৈবধর্মের নব জাগৃতির জন্য তার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বসভ, মূল কথাটি কোনোদিন যেন বিস্মৃত হয়ো না, তা হচ্ছে—কায়কভে কৈলাস।"

"কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে আত্মার মুক্তিসাধন, এ বড়ো কঠিন কাজ প্রভু। আপনার আদেশে সঙ্কল্প আমি গ্রহণ করেছি, কিন্তু এই সঙ্গে মনে ভয়ও হচ্ছে, এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে দেবাদিদেবের পরম পদে আমি পৌঁছুতে পারবো তো।"

"ভয় নেই বসভ, তোমার দিকে আজ শুধু আমার স্নেহদৃষ্টি রয়েছে তাই নয়, অল্লাম প্রভুদেবের প্রসন্ন দৃষ্টিও রয়েছে তোমার উপর নিবদ্ধ।"

"প্রভুদেবের নাম আমি শুনে আসছি, এখনো তাঁর দর্শন পাবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। প্রকৃত পরিচয়ও জানা নেই।"

"মনে রেখো, প্রভুদেব অল্লাম হচ্ছেন শিবসাধনা ও শিবসিদ্ধির ঘনীভূত বিগ্রহ। দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শৈবযোগী বলে তিনি সাধক সমাজে স্বীকৃত। যোগবিভূতির দিক্ দিয়ে অনেকে তাঁকে তুলনীয় মনে করেন মহাযোগী গোরখনাথের সঙ্গে। ধর্ম ও সমাজের দুর্গতিতে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছে, শৈবধর্মের একটা পুনরুত্থান তিনি চান। তোমার মতো শক্তিমান্ সাধকের উপর তাঁর দৃষ্টি তাই রয়েছে।"

"তার দর্শনের সৌভাগ্য কি আমার হবে না?"

"এখনো সময় হয় নি বৎস। যথাসময়ে তুমি তাঁর সান্নিধ্য ও সহায়তা পাবে।"

স্মিত হাস্যে বসভকে আশিস্ জানাইয়া জাতবেদমুনি ধীর পদে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কুড়ল-সঙ্গমের মঠ মন্দিরে, সাধক ও পণ্ডিতসমাজে বসভ ক্রমে সুপরিচিত হইয়া উঠেন। যে-কোনো মহামনে-তে বা ধর্মসভায় যান, এই নবীন শিবভক্তের ব্যক্তিত্ব ও মতবাদ জনগণকে সচকিত করিয়া তোলে। তাঁহার উদার দৃষ্টিভঙ্গী, সর্বজনীন শৈববাদ, ধারালো যুক্তিতর্ক সবাইকে মুগ্ধ করিতে থাকে।

গুরুর আদেশ, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিয়া করিতে হইবে। কিন্তু কোথায় এ কাজ শুরু করিবেন? মঙ্গলওয়াড় চালুক্যদের শাসনকর্তা বিজ্জলের রাজধানী, সেখানেই জীবিকার উদ্দেশ্যে গিয়া উপস্থিত হন। প্রথমটায় কিছুটা অসুবিধায় পড়িলেন। প্রভু সঙ্গমেশ্বর ঠিক কোথায় তাঁহার কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন তাহা জানা নাই। যাই হোক যে-কোনো একটা কাজ তাড়াতাড়ি না জুটাইতে পারিলে বিপদ। কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর রাজকোষাগারে হিসাবরক্ষকের এক শিক্ষানবীশী কাজ তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

আত্মিক সাধনা আর ব্যবহারিক কর্ম দুইয়েতেই বসভের সমান নিষ্ঠা। যথাসাধ্য শ্রম ও দক্ষতার সহিত তিনি কাজে রত হইলেন। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝিলেন, কর্মচারীরা সবাই বড় অলস প্রকৃতির। সরকারী কাজে শৈথিল্য যেমন রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে অজস্র ভুলভ্রান্তি। একটি বড় হিসাবের ভুল তাঁহার নজরে পড়িল। সিদ্ধ-দণ্ডাধিপ তখন কোষাগারের অধ্যক্ষ। বসভ তখনই সরাসরি তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত।

হিসাবের খাতায় এ ধরনের মারাত্মক ভুল দেখিয়া তো অধ্যক্ষের চক্ষুস্থির। তখনই উহা সংশোধনের আদেশ দিলেন।

বসভের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এবার তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন স্থায়ী চাকুরীতে।

তরুণ কর্মচারীর পরিচয় নিতে গিয়া সিদ্ধ-দণ্ডাধিপের আনন্দের অবধি রহিল না, কহিলেন, "দেখ্‌ছি, তোমার পিতা মাদিরাজ আমার জ্ঞাতি, তুমি আমার আত্মীয় হয়ে অন্যত্র কেন থাকবে? এখন থেকে আমার গৃহে এসে বাস করতে থাকো।"

সিদ্ধ-দণ্ডাধিপের সস্নেহ পৃষ্ঠপোষকতায় ও নিজের দক্ষতার গুণে উপর্যুপরি বসভের পদোন্নতি ঘটিতে থাকে। ক্রমে এই সুদক্ষ, ন্যায়নিষ্ঠ, তরুণ কর্মচারীর প্রতি প্রদেশের শাসক বিজ্জলের দৃষ্টিও

আকৃষ্ট হয়। বসভকে সরকারী কোষাগারের দায়িত্বপূর্ণ কাজে তিনি নিযুক্ত করেন।

কয়েক বৎসর পরে সিদ্ধ-দণ্ডাধিপ লোকান্তরে চলিয়া যান এবং বিজ্জল তরুণ বসভকেই প্রদান করেন অধ্যক্ষের পদ। বসভ একজন শৈবসাধক, কুড়ল-সঙ্গমের সাধু-সন্ন্যাসী ও ঈশানীয়-গুরু প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার গুণমুগ্ধ একথা বিজ্জল শুনিয়াছেন। বসভ ইতিমধ্যে মঙ্গলওয়াড়-এ অবস্থান করিয়া একটি শিবভক্ত গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়াছেন, একথাও তাঁহার জানা আছে। তাই এই তরুণ ধর্মনিষ্ঠ কর্মচারীকে রাজকোষাগারের অধ্যক্ষ পদে বরণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইলেন।

ভাণ্ডারী বা অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের পর বসভ গুরুর আদেশে বিবাহ করেন। সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা, পরম ভক্তিমতী, গঙ্গাম্বি পত্নীরূপে তাঁহার গৃহে অধিষ্ঠিতা হন। স্বামীর সংসার এবং শিবভক্ত শরণদের সেবা, দুইই তিনি আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরিয়া তোলেন।

গুরু জাতবেদমুনির উপদেশ বসভ মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, কর্মজীবনকে কৈলাসে পরিণত করিতে হইবে আর আত্মিক সাধনাকে ছড়াইয়া দিতে হইবে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে। তাই মঙ্গলওয়াড়ে থাকিয়া রাজস্ব বিভাগের কার্যে যেমন দক্ষতা ও তৎপরতা তিনি দেখাইতেন, কুড়ল-সঙ্গমে গেলেও তেমনি ফুটিয়া উঠিত তাঁহার অপরিসীম ইষ্টনিষ্ঠা ও ধ্যান-ভজনের দিব্য আবেশ।

বিজ্জল ছিলেন শৈবসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। বসভের শৈব দীক্ষা ও সাধনার খ্যাতি তিনি শুনিয়াছেন, সচিব তাঁহারই ধর্মপথের পথিক, ইহাতে তিনি মনে মনে মহা আনন্দিত। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বিজ্জল বুঝিলেন, বসভ প্রাচীন শৈববাদের অনুগামী নহেন, বেদাচার বহির্ভূত, সংস্কারপন্থী, এক নূতন শৈবধর্ম তিনি স্থাপন করিতে উৎসুক। বিজ্জলের মনে সচিব সম্বন্ধে দ্বিধা ও সংশয় জাগিয়া উঠে। কিন্তু আবার ভাবেন, এই তরুণ সাধক কুড়ল-সঙ্গমের

সাধু-সন্ন্যাসীদের পরমপ্রীতিভাজন, তা ছাড়া, কানাড়ার শিবভক্ত সাধু ও গৃহস্থেরা দলে দলে তাঁহার কাছে আসা-যাওয়া করিতেছে। তাঁহার এই জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনের মধ্যে আপত্তি করার তো কিছু নাই। বরং শাসনকর্তা হিসাবে বিজ্জলের কাজের পক্ষে ইহা কিছুটা সহায়কই হইবে।

ব্যবহারিক কর্ম আর শিব-সাধনার অপরূপ্ সমন্বয় সাধন করিয়াছেন বসভ, তাঁহার নূতন সুসংস্কৃত শৈববাদ প্রচারেও হইয়াছেন উদ্বুদ্ধ। এ সময়ে একবার তিনি কুড়ল-সঙ্গমে গিয়া উপস্থিত হন।

গুরু জাতবেদমুনির সহিত সাক্ষাৎ হইতেই স্মিতহাস্যে তিনি কহিলেন, "বৎস বসভ, তোমার ভাগ্য আজ বড় সুপ্রসন্ন। অল্লাম প্রভু এ সময়ে এখানে উপস্থিত। তোমার প্রসঙ্গ উঠিতেই কহিলেন, —তোমার সাধনা সিদ্ধির পথে এগিয়ে এসেছে। তাই ভাবছি, বড় সুসময়েই তুমি এসে পড়েছো।"

অল্লাম প্রভুর চরণে প্রণাম নিবেদন করিতেই বসভকে তিনি প্রাণ ভরিয়া করিলেন আশীর্বাদ। তারপর স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "বসভ, দেখতে পাচ্ছি তোমার কায়ক-সাধনা ও ইষ্টনিষ্ঠা ঠিক পথেই চলেছে। কিন্তু বৎস, ইষ্টদর্শন না হলে তো তোমার কায়ক-সাধনা দৃঢ়ভূমিতে স্থাপিত হবে না। কর্মক্ষেত্রকে কৈলাসে পরিণত করার সঙ্কল্প তুমি গ্রহণ করেছো, কিন্তু কৈলাসপতির দর্শন না পেলে তো সে সাধনায় সহজে তুমি জয়যুক্ত হবে না। ইষ্টদর্শন লাভ ক'রে ইষ্টের আশীর্বাণী নিয়ে অগ্রসর হও, তবেই তো শৈবধর্মের পুনর্গঠনের ব্রত তোমার সফল হয়ে উঠবে।"

সেদিন গভীর রাত্রে সঙ্গমেশ্বর মন্দিরে গিয়া বসভ ধ্যান-জপে বসিয়াছেন। ভাবাবেশে দীর্ঘ সময় নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ মন্দিরগৃহ স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বর আবির্ভূত হইলেন তাঁহার নয়নসমক্ষে। দৈবীকণ্ঠের বাণী শুনা গেল, "বৎস বসভ, শিবভক্তি ও শিবযোগের উজ্জীবনের

জন্য, প্রচার ও প্রসারের জন্য, যে সঙ্কল্প তুমি করছো, তা অবশ্য সিদ্ধ হবে। সহস্র সহস্র সাধকজন, শিবভক্ত নরনারী তোমার সহায়তার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে, তাদের ভেতর তোমার সাধনা ও সিদ্ধির কল্যাণ-ধারা তুমি বিস্তারিত ক'রে দাও।"

জ্যোতির্ময় দিব্য মূর্তিটি ধীরে ধীরে এবার মন্দিরের লিঙ্গ প্রতীকে মিলাইয়া যায়। সাধক বসভের অন্তরে বার বার অনুরণিত হইতে থাকে দৈবী কণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার। দ্রুতপদে তখনই তিনি ছুটিয়া যান যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভুর কাছে। যুক্তকরে, কাতর কণ্ঠে, অনুনয় করেন, "প্রভুদেব, আপনার কৃপায় এ দাস ধন্য হয়েছে। কিন্তু কৃপার ধারা একবার উন্মুক্ত ক'রে আর যেন আমায় বঞ্চিত করবেন না।"

"বৎস, তুমি শান্ত হও, স্থির হয়ে বসো"—স্নিগ্ধ-মধুর হাস্যে অল্লাম প্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দেন।

"প্রভু, আমার প্রার্থনা আপনাকে পূর্ণ করতেই হবে। নিজের সম্বন্ধে আমার মূল্যবোধ রয়েছে, আমার শক্তি যে সীমাবদ্ধ সে সম্বন্ধে আমি সচেতন। শৈবধর্মের পুনরভ্যুদয় এক বিরাট কাজ, অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐশ্বরীয় কাজ। সাক্ষাৎভাবে আপনি আমায় সহায়তা না করলে আমার পক্ষে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।"

"বসভ, আমি যাঁকে জীবনভর ধ্যেয়াই সেই ইষ্টের দর্শন তুমি লাভ করেছো। তাঁর আশীর্বাদও পেয়েছো। শিবের আদিষ্ট কাজে, শিব স্মরণ ক'রে, তুমি অগ্রসর হও। পাপাচার আর কলুষে শৈব-সম্প্রদায় ভরে উঠেছে, এর সংস্কার সাধন করো সর্বাগ্রে। লিঙ্গ-দীক্ষার ভেতর দিয়ে সহস্র সহস্র বীরশৈব সাধক সৃষ্টি করো দেশের দিকে দিকে। এই পুনর্গঠিত শৈবেরা পরিচিত হবে বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎ বলে। আর একাজে আমার সাহায্য অদূর ভবিষ্যতে, প্রয়োজনমতো, অবশ্যই তুমি পাবে, বৎস।"

অল্লাম-প্রভু ও সমবেত শিবযোগীদের পদবন্দনা করিয়া হৃষ্টচিত্তে বসভ মঙ্গলওয়াড়ে ফিরিয়া আসেন।

নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শৈবধর্মের সংস্কার সাধনে ও প্রচারে

তিনি ব্রতী হন। তারপর অচিরে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত হইয়া উঠেন ভক্তি-ভাণ্ডারী বসভেশ্বর নামে।

বসভেশ্বরের প্রচারিত বীরশৈববাদ এবং তাঁহার জীবন ও সাধন-পন্থার তাৎপর্য বুঝিতে হইলে কানাড়ার ধর্ম আন্দোলনের পশ্চাৎপট অনুধাবন করা দরকার।

বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল দীর্ঘদিন। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ মহাবংশে দেখা যায়, মহারাজ অশোক বনবাসী (উত্তর কানাড়া) এবং মহিষমণ্ডলে (মহীশূর) ধর্ম প্রচারকদের প্রেরণ করেন। কয়েক শতক ব্যাপিয়া এখানকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বৌদ্ধ মতবাদের প্রতাপ দেখা যায়, তারপর ক্রমে তাহা নিস্তেজ হইয়া আসে। একাদশ শতকেও বল্লিগাভের বৌদ্ধকেন্দ্রের স্মৃতি জনমানব হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। কানাড়ায় জৈনধর্মের প্রভাব অতঃপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রকূট ও গঙ্গবংশের রাজারা সোৎসাহে এ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, তাই অষ্টম হইতে দশম শতক অবধি এই ভূখণ্ডে দেখিতে পাই জৈন সাধুদের প্রবল প্রতিপত্তি। কোপন ও শ্রবণবেলগোলার জৈনমন্দিরগুলি তখনকার জনসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠে। চালুক্যরাজের সেনাপতি নাগদেবের ভক্তিমতী পত্নী সত্তিমবে প্রায় পনের শত জৈনমন্দির স্থাপন করিয়া যান। এজন্য জনগণ তাঁহাকে আখ্যা দেয়—দান-চিন্তামণি।

কানাড়ায় বৈষ্ণব ও শৈবের সংখ্যাও একসময়ে নিতান্ত কম ছিল না। চালুক্য রাজারা ছিলেন বিষ্ণুভক্ত, ইষ্টরূপে তাঁহারা বরাহ অবতারের পূজা করিতেন। বাদামীর মনোরম গুহা, মন্দির আজিও এই ইষ্টপূজার স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

মহাত্মা মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগ এবং তন্ত্রের সাধনাও এক সময়ে মহারাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানের মধ্য দিয়া কানাড়ায় ছড়াইয়া পড়ে। শক্তিমান্ সাধক ও সিদ্ধদের মাধ্যমে জনসমাজে এ সাধনা বিস্তারিত হয়।

ভারতের শৈবধর্ম অতি প্রাচীন। ঋক্‌বেদের রুদ্রের উল্লেখ হইতে এই ধর্ম ও উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরাণিক ও মধ্যযুগে এই শাস্ত্রানুগ শৈবধর্মের বিস্তার সাধিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে শৈবসম্প্রদায় কতগুলি উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং এক শ্রেণীর সাধকদের মধ্যে মানসিক বিভ্রান্তি ও নৈতিক অধঃপতনের প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়। একাদশ শতকের কানাড়ায় ও শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে নানা পাপাচার ও নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়। পাশুপত (লাকুল), কালামুখ, কাপালিক সবাইর ভিতরেই ছড়াইয়া পড়ে পাপাচার এবং স্খলন পতনের ত্রুটি।

বহুলখ্যাত তরুণ বীরশৈব, বসভেশ্বরের ভাগিনেয় ও হাতে-গড়া সাধক, চন্নবসভেশ্বর সমকালীন ধর্মসম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে একটি দোঁহাতে বলিয়াছেন[১] :

শৈব রয়েছে বিমূঢ় হতবাক্ হয়ে,
পাশুপত খুঁজে পাচ্ছে না পথের সন্ধান,
কালামুখীর দুই চোখে অন্ধত্বের কালো,
মহাব্রতী ঘুরছে তার ঔদ্ধত্য আর অহঙ্কার নিয়ে।
সন্ন্যাসী আজ ঈশ্বরবিমুখ,
কৌল হয়েছে উন্মাদ রোগগ্রস্ত,
ভক্তিমার্গে এই ছয় জনার কাকে আনবে টেনে ?

দ্বাদশ শতকে শৈবধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়াস পান তিনটি স্বনামখ্যাত সাধক ; সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইঁহাদের প্রভাব ছিল অসমান্য। ইঁহাদের নাম—একান্তদ রামাইয়া, মহামণ্ডলেশ্বর বিরূপরস এবং বীর গাগ্যিদেব। কিন্তু শৈব সাধনা সিদ্ধির সহিত সামাজিক উদারতার সমন্বয় সাধনে ইঁহারা সক্ষম হন নাই। এ সমন্বয়ের জয়ধ্বনি সর্বপ্রথমে উচ্চারিত হয় বীরশৈব বসভেশ্বরের

১ ডক্টর পি. বি. দেশাই : বসভেশ্বর অ্যাণ্ড হিজ্ টাইম্‌স

ইষ্টদেব মঙ্গলময় শিবকে বসভ গুরুকৃপায় ও স্বীয় সাধনশক্তি বলে দর্শন করিয়াছেন, উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার সর্বব্যাপী চৈতন্যময় পরমসত্তা। আর অনুভূতি রাজ্যের এই শিখরে উঠিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, গুরুর কৃপায় অপার করুণায় হইয়াছেন উদ্বেল, শিবতত্ত্বকে জনগণের মধ্যে বিস্তারিত করিতে হইয়াছেন বদ্ধপরিকর। শুধু তাহাই নয়, এই করুণা ও জনকল্যাণের সঙ্কল্প নিয়া বসভেশ্বর কানাড়ায় যে সামাজিক বিপ্লব ও সর্বজনীন মুক্তির সূচনা করেন, ভারতের ধর্মসংস্কৃতির ইতিহাসে আজো তাহা স্মরণীয় হইয়া আছে।

বসভেশ্বর উপলব্ধি করিয়াছেন—তাঁহার ইষ্ট সঙ্গমেশ্বর যে বিভু, তাঁহার সর্বব্যাপী পরমসত্তায় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে ওতপ্রোত, সর্বত্র সর্ব সময় তাঁহার অস্তিত্ব বসভ অনুভব করিয়াছেন মনপ্রাণ দিয়া। একটি বচনে এ পরম অনুভূতির আভাস পাই[১] :

হে প্রভু, যেখানেই নয়ন দুটি আমি মেলে দিই,
তোমার মাধুর্য করি নিরীক্ষণ,
অনাদি অনন্ত মহাকাশের যে দিকেই তাকাই—
নয়ন আমার ভরে ওঠে তোমার রূপে।
তুমিই যে এই বিশ্বসৃষ্টির নয়নের জ্যোতি,
তুমিই যে এই লাবণ্যময় প্রদীপ্ত আনন,
তোমার নিঃসীম হস্ত দুটিই প্রসারিত দিগন্ত জুড়ে,
ওগো কুড়ল-সঙ্গমের দেব,
তোমার চরণচিহ্ন ছড়ানো দেখি যে দিকে দিকে।

দেবাদিদেবের সীমাহীন ব্যাপ্তি ও অনন্ত ঐশ্বর্যের প্রশস্তি গাহিয়া বসভেশ্বর আর একটি অনুপম বচনে বলিতেছেন :

এই বিশ্বসৃষ্টির মতোই
সীমাহীন তুমি প্রভু, স্বর্গের মতোই
তুমি ঊর্ধ্বায়িত, মহীয়ান—

১ স্পীক্ বসভ—অনুবাদ : এ. সুন্দররাজ থিয়োডো

প্রপঞ্চের চাইতেও তুমি বৃহত্তর,
তোমার রাতুল চরণ দুটি স্থাপিত রয়েছে
পৃথিবীর নিম্নতম স্তরে,
আর তোমার উজ্জ্বল কিরীট
ধক্ ধক্ করে জ্বলছে অবিরত
এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি ছাড়িয়ে।

সাধক বসভের আর একটি বড় পরিচয় তাঁহার মানবপ্রীতি—শিবশরণ, শিব-ভক্তদের প্রীতি। সর্বজনীন প্রেম দিয়া যেমন নিজ সাধনাতে তিনি জয়যুক্ত হন, তেমনি ইহারই মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ উদারবুদ্ধি ও ভক্ত মানুষের সঙ্গে তিনি বাঁধা পড়েন নিবিড় বন্ধনে। বসভের অনুভূতিলব্ধ 'বচনে' তাঁহার এই করুণাঘন স্বরূপটি ফুটিয়া উঠিতে দেখি :

করুণার রসধারা আর সঞ্জীবনী শক্তি
নেই যাতে—কি করে তা
অভিহিত হবে ধর্ম বলে ?
করুণার অমৃতধারা পড়বে ঝরে অজস্র ধারায়,
আর লক্ষ কোটি মানুষের জীবনে
করুণার রস সতত হবে উৎসারিত
ধর্ম বিশ্বাসের মূল দেশ থেকে—
তবেই না রক্ষা পাবে এই বিশ্বসংসার।
ওগো, করুণা নেই যেখানে
সেখানে নেই আমার প্রভু দেবাদিদেব কুড়ল-সঙ্গম।

ধর্মজীবনে এবং ব্যবহারিক জীবনে বসভেশ্বরের এখন বিপুল প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি।

দিকে দিকে খ্যাতি রটিয়া যায়—বসভ শিব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কুড়ল-সঙ্গমের শৈব সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রকারেরা তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিবযোগী অল্লাম-প্রভু, সাধক

সমাজে যিনি প্রভুদেব বলিয়া খ্যাত, বসভেশ্বরকে কৃপা করিয়াছেন অকৃপণ করে, আখ্যা দিয়াছেন তাঁহাকে—ভক্তিভাণ্ডারী।

প্রাদেশিক শাসনকর্তা বিজ্জলের দরবারেও বসভেশ্বর প্রথম সারির সচিব। রাজ্যের রাজস্বের হিসাব ও কোষাগারের পরিচালন-ভার তাঁহারই উপর। বিজ্জলের তিনি দক্ষিণ হস্ত।

ঋদ্ধি ও সিদ্ধির এই সমাহার বসভেশ্বরকে রাজ্যমধ্যে করিয়া তুলিয়াছে অনন্যসাধারণ। শত শত শিব-শরণ এবং শিবভক্ত গৃহী ও সন্ন্যাসী সাধক প্রতিদিন তাঁহার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। ধর্ম, দর্শন ও সাধন সম্পর্কে সোৎসাহ আলোচনা চলে। আর চলে সাধু-সংবর্ধনা ও সাধু ভোজন—দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে সারা নগরী মুখরিত হইয়া উঠে।

ভক্তজন ও সাধকদের সমাবেশে বসভেশ্বর যে শৈবধর্মের কথা, বীরশৈববাদের কথা বলেন—তাহা কিন্তু বেদানুগ শৈবধর্ম নয়। কর্মকাণ্ডের কথা ইহাতে নাই, নাই বর্ণাশ্রমের সমর্থন। বেদাচার বহির্ভূত এ এক বৈপ্লবিক ও সংস্কারপন্থী নবতর শৈবধর্ম। বসভেশ্বর ঘোষণা করেন, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে, স্ত্রী-পুরুষের ভেদ বৈষম্য না মানিয়া, প্রত্যেক নবজাত শিশুকে দিতে হইবে লিঙ্গদীক্ষা। এই দীক্ষার বলে সাধনক্ষেত্রে সকল শিবভক্তই হইবে সমপর্যায়ভুক্ত, সমান অধিকারযুক্ত। বসভেশ্বর আরও কহেন, শিব-শরণ বা শিবে শরণাগত সন্ন্যাসী মাত্রেই শিবের প্রতিভূ। প্রত্যেক ভক্তের প্রধান কর্তব্য এই শিব-শরণদের আন্তরিক সংবর্ধনা জানানো এবং ইঁহাদের সেবা ও ভোজনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা।

বীরশৈববাদের দার্শনিক ভিত্তিও বসভেশ্বর এই সময়ে রচনা করেন। তাঁহার সৃষ্ট স্থায়ী ধর্মসভা অনুভব-মণ্ডপেও দার্শনিকতা ও সাধনপদ্ধতির উপকরণ সংগৃহীত হয়।

এই মত অনুযায়ী শিব হইতেছেন অনাদি অনন্ত পরমপুরুষ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। শক্তি শিবের ক্রিয়াশীল সত্তা, শিব

হইতে শক্তিকে কোনোমতে পৃথক করা যায় না। তাই দার্শনিক মহলে বীরশৈববাদকে বলা হয় শক্তি-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

এই মতের সাধকেরা লিঙ্গ ও অঙ্গ এই দুইটি তত্ত্বের উপর জোর দেন। লিঙ্গ হইতেছেন শিব, আর অঙ্গ—জীবাত্মা। আসলে এই দুইটিতে কোনো পার্থক্য নাই। অজ্ঞানতার জন্য আমরা অন্তর্নিহিত ঐক্যকে উপলব্ধি করিতে পারি না, এই অজ্ঞানতার মল দূর হইলেই শিবশক্তির অখণ্ড পরমসত্তা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। একের সাথে, অখণ্ডের সাথে, সাধকের ঘটে মহামিলন। এই মহামিলনই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। এই মিলনকে শৈবযোগের ভাষায় বলা হয়—লিঙ্গাঙ্গ সামরস্য।

এই সামরস্য সাধিত হয় দীর্ঘ দিনের সাধনার ফলে এবং ছয়টি স্তরের ভিতর দিয়া সাধককে অগ্রসর হইতে হয়। এগুলিকে বলা হয় ষট্‌স্থল। অষ্টাবরণ বা আটটি সূক্ষ্ম মানসক্রিয়ার উপরও বীরশৈব সাধকেরা গুরুত্ব আরোপ করেন।

লিঙ্গাঙ্গ সামরস্য বা পরম প্রাপ্তির পথে চলিতে হইলে সাধকের নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক আচার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। বসভেশ্বরের অনুগামী সাধকেরা এগুলিকে বলেন—পঞ্চাচার। কায়ক বা শিবে উৎসর্গীত ব্যবহারিক কর্ম বীরশৈববাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। কায়কের মূল কথা—প্রত্যেক মানুষকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কর্ম করিতে হইবে। এই কর্ম শিবেরই কর্ম, এই সঙ্গে বজায় রাখিতে হইবে 'দাসোহং' মনোভাব। কায়কের উপার্জিত অর্থে শিবভক্তের কিন্তু কোনো অধিকার নাই, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট অর্থ তাহাকে দান করিতে হইবে। বীরশৈববাদের প্রচারক জঙ্গম সাধুরা এই অর্থ ব্যয় করিবেন সমাজের কল্যাণে।

কায়ক বা নিবেদিত কর্ম সম্বন্ধে বসভেশ্বর অত্যন্ত উদারপন্থী। যে কোনো বর্ণের লোক স্বেচ্ছানুযায়ী তাহার বৃত্তি নির্বাচন করিবে. এই বিধি তিনি দিয়াছেন

অনুভব মণ্ডপ বা সাধক-সভা বসভেশ্বরের এক বিশিষ্ট অবদান। এই সভায় পণ্ডিত অপণ্ডিত, উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্য সবাই মিলিত হইতেন। নিজেদের সাধনজীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা যেমন সবাই দিতেন, বিতর্কেও তেমনি করিতেন অংশ গ্রহণ।

এই অনুভব মণ্ডপকে শিবানুভব মণ্ডপও বলা হইত। এখানকার আলোচিত তত্ত্ব বিশেষ করিয়া বসভেশ্বর ও অন্যান্য সিদ্ধ সাধকদের উপদেশ ও অনুভূতি-জাত তত্ত্ব শ্লোকবদ্ধ হইত 'বচন'-রূপে।[১] তারপর অগণিত শিবভক্তের জন্য এগুলি বিভিন্ন শহরে ও জনপদে বিতরণ করা হইত।

সঙ্কলিত বচনগুলিতে বসভেশ্বর শুধু তত্ত্বের ব্যাখ্যান করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। এই তত্ত্বকে রূপায়িত করিতেন নিজের ব্যবহারিক জীবনে। শাসনকর্তা বিজ্জলের সচিব ও কোষাগারের অধ্যক্ষরূপে তিনি ছিলেন সমাজের এক অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কিন্তু নিজ গৃহে, অনুভব মণ্ডপে, দরিদ্র অস্পৃশ্যদের সঙ্গে উপবেশন করিতে তাঁহার বাধিত না। সরকার হইতে যে উচ্চ বেতন তিনি পাইতেন, সংসার-যাত্রা নির্বাহের জন্য তাহা হইতে সামান্য কিছু রাখিয়া দিয়া অধিকাংশ অর্থ ব্যয় করিতেন শিব-শরণ ও শিবযোগীদের জন্য। তাঁহার ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন, সিদ্ধ জীবন, তাই সে সময়ে আকৃষ্ট করে সহস্র সহস্র সাধারণ নরনারীকে। জনমনে তিনি পরিগ্রহ করেন শিবকল্প মহাপুরুষের আসন।

সেদিন অনুভব মণ্ডপে ভক্ত আর শিব-শরণেরা জড়ো হইয়াছেন। আত্মিক সাধনার নানা সমস্যা নানা জটিলতার হইতেছে সমাধান। এক সাধক বসভকে প্রশ্ন করেন, "প্রভু-প্রভু বলে আকুল হয়ে কতো ডাকছি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। কিন্তু কই একান্ত আপনার জন হয়েও, প্রাণপ্রভু হয়েও, তিনি তো সাড়া দিচ্ছেন না। বলে দিন এবার আমি কি করি?"

১ বসভেশ্বর কমেমোরেশন্ ভল্যুম: কায়ক—ভি. কে. জাবলি।

বসন্ত অন্তর্লীন হইয়া যান। ভাবাবেশে নির্গত হয় আশ্বাসভরা এক 'বচন'—[১]

মুখে শুধু প্রভু-প্রভু বললে হবেনা কোন কাজ,
বিশ্বাসের ভিত্তি যেথানে নেই
'প্রভু' ডাক যে সেখানে শূন্যগর্ভ।
একবার বিশ্বাসে ভর করে দাঁড়াও,
অমনি হৃদয় তাঁর যাবে গলে,
এগিয়ে আসবেন প্রভু সঙ্গমেশ্বর—
এই যে আমি, এই যে আমি, ব'লে

এক নবীন সাধক সেবার বসভকে প্রশ্ন করেন, "ইষ্টদেব শিবে আত্মসমর্পণ করলে সাধকের কোন্ অবস্থা হয়, পরিপূর্ণতা ও আনন্দে কি তার হৃদয় ভরে ওঠে চিরতরে ?

বসভেশ্বর উত্তর দেন তাঁহার সদ্য রচিত এক 'বচনের' মধ্য দিয়া, সাধনা ও সিদ্ধির পথে দান করেন দিব্য প্রেরণা :

প্রভুর প্রতি সত্যকার প্রেম যখন জাগে,
মানুষের কামনা বাসনা হয় নিষ্কাশিত।
প্রভুর পদে যে নেয় আশ্রয় ও শরণাগতি,
অন্তরে তার থাকে না ভেদ বৈষম্যের রেখা।
প্রেমের কারবারে যে হয় ধনী,
অপর ধনকে তুচ্ছ করে সে অবলীলায়।
পরা শান্তি লাভ করেছে যে সাধক,
ভ্রান্তি আর চাঞ্চল্য নেই তার জীবনে—
ঈর্ষা অহঙ্কারের গণ্ডী সে করেছে অতিক্রম,
পরম প্রভু আসন পেতেছেন তাঁর হৃদয়ে।

নব দীক্ষিত অপরিণত সাধকদের উদ্দেশ্য করিয়া বসভেশ্বর একস্থলে বলিতেছেন : "তোমার সাধনার বৈরীরা লুকিয়ে আছে

১ বচনস্ অব বসভন্না : অনুবাদ—মেনৃজেস্ অ্যাণ্ড

তোমারি দেহে মনে। তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে বিপন্ন পশুর মতো আর্ত চীৎকার করতে হবে, উদ্ধারকে করতে হবে ত্বরান্বিত।"

একটি 'বচনে' এই আর্ত ভঙ্গিটি তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শৈবধর্মের তিনটি তত্ত্ব—পশু, পাপ ও পশুপতির তত্ত্ব এখানে আভাসিত :

হতভাগ্য পশু মুমূর্ষু হয়েছে খাদে পড়ে,
কি করে নিজেকে বাঁচাবে সে,
নিরুপায় হয়ে কতই বা ছুঁড়বে সে চারটে পা ?
নিজের প্রভুকেই ডাকতে হবে তাকে—
মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাবার আশায়।
তেমনি করে হে সাধক, হে পশু,
আর্ত হয়ে ডাকো তোমার পশুপতিকে,
বলো—হে প্রভু, হে কৃপাময়,
টেনে তোল আমায় এই গহ্বর থেকে,
পাপ আর কলুষ আমায় চেপে ধরবার আগে
তোমার পুণ্যহস্তে করো আমায় উদ্ধার।

সঙ্গমেশ্বরের কৃপাই সাধকপ্রবর বসভের প্রধান উপজীব্য, এই কৃপাই তাঁহার পরমাশ্রয়। এ সম্বন্ধে তিনি প্রভুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন :

তোমার কৃপায় অসম্ভব হয়ে ওঠে সম্ভব
শুষ্ক শাখায় নামে সবুজের স্নেহ—
জীর্ণপাতায় জাগে নূতন প্রাণের জোয়ার।
তোমার কৃপায় ঊষর ভূমিতে আসে স্নিগ্ধ সরসতা,
আর প্রাণঘাতী বিষ হয় অমৃত।
কৃপা তোমার এনে দেয় প্রাচুর্যের সমারোহ
হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গম দেব।

১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। মঙ্গলওয়াড়-এর রাজনৈতিক জীবনে এ সময়ে ঘটে এক চাঞ্চল্যকর পটপরিবর্তন। চালুক্যরাজ তৃতীয় তইলো এ সময়ে দুর্বল হস্তে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছেন। নিজের সেনাধ্যক্ষ ও শাসনকর্তাদের আয়ত্তে রাখার শক্তি তাঁহার নাই। শত্রুর আক্রমণ ও সামন্তরাজাদের বিদ্রোহের ভয়ে তিনি সদা সন্ত্রস্ত।

ইতিমধ্যে রাজা এক মহাসঙ্কটে পড়িলেন। বিদ্রোহী কাকতীয় বংশের সামন্ত দ্বিতীয় প্রোলকে দমন করিতে গিয়া নিজেই হইলেন তাঁহার হস্তে বন্দী। বিজ্জল ও অন্যান্য অমাত্যদের হস্তক্ষেপের ফলে রাজা বন্দীদশা হইতে উদ্ধার পাইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় আর রাজধানী কল্যাণে ফিরিয়া আসিলেন না।

ইহার ফলে সারা রাজ্যে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা, প্রশাসন ভাঙিয়া পড়ার উপক্রম হয়। শক্তিমান্ শাসনকর্তা বিজ্জল তখন মঙ্গলওয়াড়-এ বসিয়া ঘটনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেছেন, অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ভাবিতেছেন, দুর্বল হস্ত হইতে যে রাজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িতেছে শক্তিধর বিজ্জল কেন তাহা অধিকার করিবেন না ?

কলচুরি সম্রাটবংশে বিজ্জলের জন্ম। দুই-তিন পুরুষ যাবৎ চালুক্যরাজদের সামন্ত বা শাসনকর্তা হিসাবে তাঁহারা কাজকর্ম করিতেছেন। এবার সুযোগ আসিয়াছে রাজসিংহাসন অধিকারের, কলচুরি সাম্রাজ্য আবার প্রতিষ্ঠা করার। বিজ্জল ভাবেন, সেনা ও যুদ্ধ উপকরণ তাঁহার আছে, নিজে তিনি কুশলী যোদ্ধা, কুশাগ্রবুদ্ধি; রাজনীতিজ্ঞতায় তাঁহার জুড়ি নাই। অধিকাংশ অমাত্য ও সামন্ত মেরুদণ্ডহীন চাকুল্যরাজার উপর আস্থা হারাইয়া বসিয়াছে, বরং তাঁহারা বিজ্জলেরই পক্ষপাতী। প্রজারাও উন্নততর শাসন ও আইন-শৃঙ্খলার প্রবর্তনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এই সুবর্ণ সুযোগ বিজ্জল কেন হেলায় হারাইবেন ? ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে কেন

তিনি গ্রহণ করিবেন অসহায় দর্শকের ভূমিকা? না, আর দেরি করা নয়, রাজদণ্ড তাঁহাকে ছিনাইয়া নিতেই হইবে।[১]

অচিরে সুযোগও মিলিয়া গেল। রাজা তইলো বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইয়া রাজধানী কল্যাণে আর ফিরিয়া আসেন নাই। অমাত্য ও সেনাধ্যক্ষদের ষড়যন্ত্রের ভয়ে তিনি দূরে সরিয়া আছেন। নিজেই বরং তিনি আদেশ দিলেন তাঁহার প্রতিনিধিরূপে বিজ্জলই কল্যাণে অবস্থান করিবেন, গ্রহণ করিবেন সারা রাজ্যের শাসনভার।

বিজ্জল এবার সাড়ম্বরে কল্যাণে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই একদল সামন্ত ও শাসনকর্তার সমর্থন নিয়া নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন।

মঙ্গলওয়াড় হইতে অন্যান্য সচিব ও উচ্চ রাজকর্মচারীর সঙ্গে বসভেশ্বরকেও কল্যাণে আসিতে হয়। বিজ্জল রাজসিংহাসনে আসীন হইয়াই বসভেশ্বরকে নিযুক্ত করেন রাজ্যের কোষাগার-অধ্যক্ষরূপে। আয়-ব্যয়ের সমস্ত কিছু দায়িত্বও তাঁহার উপর অর্পিত হয়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাগিদ ও তাঁহার নিজস্ব যুক্তিতর্ক যাহাই থাকুক, চালুক্য সিংহাসন বিজ্জল অন্যায়ভাবে জোর করিয়াই দখল করিয়াছেন। মনে মনে তিনি ঠিকই জানেন, ন্যায়নীতির দিক দিয়া কাজটা ভাল হয় নাই। অমাত্য ও সামন্তদের মধ্যে একদল ঈর্ষা-পরায়ণ হইয়াছে, আর জনসাধারণের মধ্যে জাগিয়াছে অসন্তোষ। এ সময়ে বসভেশ্বরের মতো একজন জনপ্রিয় ধর্মনেতা তাঁহার পাশে থাকেন, ইহা তিনি চাহেন। কিন্তু বসভেশ্বরের উপরও আজকাল তিনি তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না।

---

১ বিজাপুর জেলার মুত্তগী নামক স্থানে একটি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বিজ্জলের তৎকালীন মনোভাব ও পরিকল্পনার চিত্র পাওয়া যায়। শিলালেখটি বিজ্জলের উত্তরাধিকারী রাজা রায়মুরারী সোভিদেবের আমলে উৎকীর্ণ হয়। দ্রঃ ডক্টর পি. বি. দেশাই : বসভ অ্যাণ্ড হিজ টাইম্‌স পৃ : ২৯-৩০

২ চন্নমল্লিকার্জুন : লাইফ টাইম অব বসভেশ্বর

বিজ্জল সনাতনী শৈব, বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপর তাঁহার তীব্র অনুরাগ। অপর দিকে দেখা যাইতেছে বসভ একজন সংস্কারবাদী বীরশৈব। ব্রাহ্মণ শূদ্রের তারতম্য তিনি মানেন না, শিবভক্ত ও লিঙ্গদীক্ষায় দীক্ষিত মানুষ মাত্রকেই সানন্দে কোল দেন। তাছাড়া, বিজ্জলের রাজসিংহাসন দখল করার কাজ-টাকেও বসভেশ্বর তেমন সুচক্ষে দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। তবুও সাময়িকভাবে বসভের প্রতিষ্ঠা, জনপ্রিয়তা ও লক্ষ লক্ষ বীরশৈবের নেতৃত্বকে রাজা কাজে লাগাইতে মনস্থ করিলেন।

রাজধানী কল্যাণে আসার পর হইতে বসভেশ্বরের মনে কিন্তু শান্তি নাই। কুচক্রী বিজ্জল হঠাৎ নিতান্ত অন্যায়ভাবে চালুক্য সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। অথচ তাঁহারই অধীনে বসভেশ্বরকে কাজ করিতে হইবে। নৈতিকতার দিক দিয়া মনে তিনি একটুও সায় পাইতেছেন না। বিপুল সংখ্যক শিব-ভক্তেরাই বা এ সম্পর্কে কি ভাবিতেছে? এ পরিস্থিতে কি তাঁহার কর্তব্য, অচিরেই তাহা স্থির করিতে হইবে। মন তাই বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এই সঙ্কটময় সময়ে সেদিন তাঁহার ভবনে আবির্ভূত হন মহা-সমর্থ শিবযোগী অল্লাম প্রভু। ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিয়া বসভেশ্বর কহেন, "প্রভুদেব, আপনার আগমনে এ ভবন আজ পবিত্র হয়েছে, আর আমিও অন্তরে পেয়েছি পরম শান্তি। রাজা বিজ্জলের অধীনে কাজ করার ইচ্ছা আর আমার নেই। কল্যাণনগর ত্যাগ ক'রে আর কোথাও চলে যাবো বলে ভাবছি। কিন্তু তাতেও রয়েছে এত বড় বাধা। শৈবধর্মের উজ্জীবন ও পুনর্গঠনের পবিত্র কাজটি আজ এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছেছে যে এ সময়ে এ নগর ছেড়ে গেলে সমূহ ক্ষতি হবে। আন্দোলন শিথিল হয়ে পড়বে। আমায় বলুন, এ সঙ্কটে কোন্ পথ আমি অবলম্বন করবো।"

"বৎস, 'কায়কভে কৈলাস' এই কানাড়ী বাণীর রহস্য তুমি কি ভুলে গিয়েছো?"

"না, প্রভু। এক মুহূর্তের তরেও তা ভুলি নি।"

"তোমার ব্যবহারিক জীবনের কাজ তো শিবেরই কাজ। রাজ্যে, সমাজে যা ঘটবার তা ঘটুক। তোমার তাতে কি হয়েছে? নিজের কাজের পরিমণ্ডলকে কৈলাস বলে জ্ঞান করো, নিষ্ঠাভরে তুমি তোমার কাজ ক'রে যাও।"

"কিন্তু প্রভু, বিশ্বাসহন্তা পররাজ্য-অপহারক বিজ্জলের সান্নিধ্যটা যেন........।"

"তেমন ভালো লাগছে না, এই তো?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"রাজা বিজ্জল কি করেছেন না করেছেন তা দেখবেন শিব স্বয়ং। তুমি এ নিয়ে বৃথা কেন চঞ্চল হয়েছো? বিজ্জলের ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল অপেক্ষা তোমার সিদ্ধ জীবনের পরিমণ্ডল অনেক বেশী শক্তিশালী, অনেক বেশী জ্যোতির্ময়। তাঁর সান্নিধ্যে থাকলে তোমার মতো সাধকের আবার কি অপকার হবে?"

"বুঝতে পারছি প্রভু, এ-ও আমার একটা বড় রকমের পরীক্ষা।"

"হ্যাঁ, বৎস, এই পরীক্ষাই তোমার শিবসাধনার শেষ পরীক্ষা। ঘৃণ্য পাপীর সান্নিধ্যে থেকেও তুমি অবিচল ও অনাসক্ত থাকো কিনা, সহজ সমাধি তোমার অধিগত হয় কিনা, তাই আমি দেখতে চাই।"

"বেশ প্রভু, তাই হবে, আপনার এ আদেশ সদাই হবে আমার শিরোধার্য।"

"একটা কথা মনে রেখো বৎস। বিজ্জলের পাপের ভরা পূর্ণ হতে আর দেরি নেই। শিব সত্বরই তাঁর শাস্তি বিধান করবেন।"

"কিন্তু প্রভু, একটা বিশেষ নিবেদন আমার রয়েছে। অভয় দেন তো বলি।"

"বল বসভেশ্বর, তোমায় আমায় অদেয় কিছুই নেই।"

শিব-ভক্ত শরণদের জন্য এক বিশাল অনুভব-মণ্ডপের প্রতিষ্ঠা আমি করেছি। আমি চাই, অধ্যক্ষ ও নিয়ন্তা হিসাবে আপনার নাম এর সঙ্গে যুক্ত হোক। এই পবিত্র মণ্ডপে আপনি মাঝে মাঝে

উপস্থিত হবেন, শিবযোগী ও শিবভক্তদের দান করবেন নিগূঢ় সাধনের উপদেশ। এই আমার প্রার্থনা।"

"বৎস, আমি তো সদাই তোমার ধর্ম-আন্দোলনকে আশীর্বাদ জানাচ্ছি, সাহায্যও করছি। তবে, শুধু শুধু আমার নামটি এর সঙ্গে যুক্ত রাখার কি সার্থকতা আছে, বলতো?"

"প্রভু, আমার সাধনা ও সিদ্ধি যাই থাক্, রাজমন্ত্রী বলেই সবাই আমায় জানে। আর আপনার পরিচয়—আপনি মহামুক্ত সিদ্ধপুরুষ, এ দেশের শ্রেষ্ঠ শিবযোগী। তাছাড়া, বিস্ময়কর শক্তি-বিভূতি রয়েছে আপনার করায়ত্ত। আপনার পুণ্যময় নামটি বীরশৈবদের অনুভব-মণ্ডপের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দিন। তার ফলে আমাদের আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে বিপুল পরিমাণে।"

"বেশ বৎস, তাই যদি হয়, আমার নাম এতে যুক্ত করে দিয়ো। আমি স্বেচ্ছামতো তোমাদের মণ্ডপে মাঝে মাঝে এসে উপস্থিত হবো, তোমাদের সমস্যার সমাধানে সাহায্যও করবো।"

বসভেশ্বরকে প্রাণভরা আশীর্বাদ জানাইয়া অল্লাম-প্রভু ধীরপদে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কল্যাণ দাক্ষিণাত্যের এক শ্রেষ্ঠ নগর এবং বিজ্জলের রাজধানী। এই নগরই এখন হইতে বীরশৈব আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। বসভেশ্বরের ভবনে, তাঁহার অনুভব-মণ্ডপে, হাজার হাজার শিবভক্ত গৃহস্থ, যোগী, জঙ্গম আসিয়া ভিড় করে। আর সমদর্শী সাধক বসভ এই সব ভক্তদের জ্ঞান করেন ইষ্টদেব শিবের প্রতিভূ বলিয়া, তাঁহাদের ডাকেন—'মহেশ্বর' নামে।

রাজমন্ত্রীরূপে বসভেশ্বর প্রচুর বেতন পান, কিন্তু এই বেতনের সামান্য কিছু নিজ পরিবারের জন্য রাখিয়া আর সবই ব্যয় করেন অভ্যাগত 'মহেশ্বর'দের অশন-বসনের জন্য। প্রতিদিন শত শত নরনারী পঙ্‌ক্তি ভোজন করেন বসভেশ্বরের অঙ্গনে। উৎসবে পার্বণে যেদিন ভাণ্ডারা দেওয়া হয় সেদিন তো অগণিত ভক্ত, সাধু ও সন্ন্যাসী

ভোজনে বসিয়া যায়। ভক্তি-ভাণ্ডারী বসভেশ্বরের অর্থভাণ্ডারও হয় সেদিন সাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

তাহার গৃহের এই অন্নসত্রের খ্যাতি প্রচারিত হয় দেশের দিক্-বিদিকে। কিন্তু এ খ্যাতিও এক অনর্থ ডাকিয়া আনে।

সনাতনপন্থী শৈবেরা কোনোদিনই বসভের উপর তেমন প্রসন্ন নন। তাঁহার উদার বৈপ্লবিক মতবাদ এসময়ে বহু নরনারীকে আকৃষ্ট করিতেছে, বীরশৈবদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় রাজধানী হইতেছে কম্পিত। বসভেশ্বরের গৃহের এই জনসংঘট্ট প্রাচীনপন্থী শৈব আচার্যদের আর সহ্য হইতেছে না। রাজা বিজ্জল তাঁহাদের মতোই সনাতনী শৈব। এবার তাঁহার দরবারে মন্ত্রী বসভেশ্বরের নামে এক অভিযোগ উত্থাপিত হইল। অভিযোগকারীদের সমর্থন জানাইলেন বসভের বিরোধী একদল অমাত্য।

সবাই কহিলেন, "মহারাজ, অর্থমন্ত্রী ও কোষাগারের অধ্যক্ষ বসভেশ্বরের উপর সমস্ত কিছুর ভার দিয়া আপনি পরম নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু আপনার মন্ত্রী যে তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন সে খবর আপনি রাখেন না।"

রাজা বিজ্জল চমকিয়া উঠেন, প্রশ্ন করেন, "কি তাঁর অপরাধ, রাজ-সরকারের কি ক্ষতি তিনি করেছেন তা কি আপনাদের জানা আছে। তবে সব আমায় খুলে বলুন।"

"মহারাজ, আপনি কি জানেন, বসভেশ্বরের ভবনে রোজ কয়েক হাজার বীরশৈব প্রসাদ পায়। কিন্তু টাকা আসে কোথেকে? আপনার কোষাগার থেকেই এ টাকা ব্যয়িত হচ্ছে।"

"না-না, তা হতে পারে না, বসভেশ্বর তেমন লোক নয়। উচ্ছৃঙ্খল ধরনের একটা শৈবধর্ম নিয়ে যতই মাতামাতি করুক, সরকারী তহবিল তছরুপ কখনো সে করবে না।"

"সুচতুর মন্ত্রী বসভেশ্বর আপনার চোখে ধুলো দিচ্ছে। আপনি অবিলম্বে হিসাব পরীক্ষা করুন, তার অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ নিশ্চয় পেয়ে যাবেন।"

রাজা মনে মনে ভাবিলেন, 'বেশ তো, একদল সম্ভ্রান্ত আচার্য কথাটা যখন তুলেছেনই, রাজকোষ পরীক্ষা করে দেখা যাক্ না কেন ?'

তৎক্ষণাৎ রাজার সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে হিসাব-নিকাশ নেওয়া হইল, কোষাগারে নগদ অর্থ-গণনাও বাদ গেল না। কিন্তু তহবিল ভাঙার কোনো চিহ্ন দেখা গেল না।

রাজা বিজ্জল এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন, "মন্ত্রীবর, বলুন তো আপনার ভবনে রোজ হাজার হাজার লোকের পাত্ পড়ে, তার ব্যয় সঙ্কুলান কি ক'রে হয় ?"

বসভেশ্বর সবিনয়ে নিবেদন করেন, "মহারাজ, বীর শৈবদের কায়ক তত্ত্বে আমি বিশ্বাস করি। পরিশ্রম দ্বারা যে অর্থ আমি উপার্জন করি তার নগণ্য অংশ পরিবারের জন্য রেখে দিয়ে আর সব উৎসর্গ করি শিবের প্রতিভূ শিবভক্তদের জন্য। আমার মতো এই তত্ত্বে অনেকেই বিশ্বাসী, তাঁদের প্রদত্ত অর্থও ভক্ত জঙ্গমদের সেবায় যথেষ্ট সাহায্য করে। শিবের কাজে অর্থের অভাব হবার তো কথা নয়, মহারাজ।"

রাজা বিজ্জল, তখন বেশ কিছুটা অপ্রস্তুত। অভিযোগকারী পণ্ডিতেরাও অতঃপর ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন।

বসভেশ্বরের দৃষ্টিতে শিবভক্ত মাত্রেই 'মহেশ্বর'। তাঁহার ভবনের ভৃত্য ও রক্ষীরা তাঁহারই শৈব মতবাদে বিশ্বাসী, তাই এই সব ভৃত্য ও রক্ষীদের তিনি গণ্য করেন ইষ্টের বিভূতি রূপে। গৃহের একটি ভৃত্যের, প্রতিবেশী একটি ভক্তের, আহার সমাধা না হওয়া অবধি বসভ নিজে কোনো আহার গ্রহণ করেন না। এমনি ছিল তাঁহার ধর্মানুশীলনে নিত্য রীতি।

একদিন গভীর রাতে বসভেশ্বরের গো-গৃহে চোর আসিয়া উপস্থিত হয়। দুগ্ধবতী, সুপুষ্টা কয়েকটি গাভী নিয়া চোরেরা তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে সরিয়া পড়ে।

রাত্রি প্রভাত হইলে ভৃত্যেরা চুরির ঘটনা জানিতে পারে এবং তাড়াতাড়ি মনিবকে তাহারা সংবাদ দেয়।

গো-গৃহে পৌঁছিয়া বসভেশ্বর দেখেন, মাতৃহারা গো-বৎসগুলি করুণনয়নে চাহিয়া আছে, কোনো আহার্য্য গ্রহণে তাহাদের রুচি নাই। বসভেশ্বর মহাউদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন, মা-হারা হইয়া কিরূপে ইহারা প্রাণে বাঁচিবে? দুই চোখ তাঁহার জলে ভরিয়া উঠে।

ব্যগ্রস্বরে পরিচারকদের কহেন, "এক্ষুনি তোমরা সবাই চোরদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো। তোমরা ফিরে না আসা অবধি আমার পক্ষে আহার নিদ্রা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। চোরদের ঠিকানা পেলে তক্ষুনি এই বৎসগুলোকে তাদের মায়েদের কাছে পৌঁছে দাও।"

আদেশমতো সন্ধান তখনই শুরু হইয়া যায়। তস্করদের ধরিয়া আনা হইলে বসভেশ্বর কহেন, "ভাই, দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ তা বজায় থাক। তোমাদের ঘরে দধি দুগ্ধের সরবরাহ বেড়ে যাক, শিবভক্তদের সেবা হোক বোধ হয় এটাই প্রভুর ইচ্ছা। তোমরা গাভীগুলো রেখেই দাও আর এই বৎসগুলোকে এখনি নিয়ে যাও তোমাদের ঘরে। আহা! মা-হারা হয়ে কি দুঃখে এরা রয়েছে।"

শিবপ্রতিম সাধকের এই অদ্ভুত আচরণে তস্করদের চোখে জল আসিয়া যায়। বসভেশ্বরের চরণে শরণ মাগিয়া সেইদিন হইতেই তাহারা শুরু করে উন্নততর জীবন। কৃপালু বসভেশ্বর উত্তরকালে ইহাদের লিঙ্গদীক্ষা দান করিয়াছিলেন।

বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের নেতার পদে বসভেশ্বর এখন সমাসীন। এই সম্প্রদায়ের জন্য দরকার সুসম্বদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের। সাধনা ও সিদ্ধির ক্রমিক পর্যায় নির্ণয় করা, পুরাতন শৈবলাচার সংস্কার-সাধন, নবদীক্ষিত বীরশৈবদের আচার বিচার ও নৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ—এই সব গুরুত্বপূর্ণ কর্ম তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে।

তাঁহার নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির সহিত, সংস্কারপন্থী আদর্শ ও আচরণের সহিত যুক্ত হয় অনুভবমণ্ডপে আগত শিবভক্ত ও সিদ্ধযোগীদের মতবাদ। এই সংযুক্তি ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়া বীরশৈব সম্প্রদায়ের ভাবধারা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, আচার-ব্যবহারের নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

বসভেশ্বরের ধর্ম-আন্দোলনের প্রধান সহায়ক তাঁহার প্রতিভাধর ভাগিনেয় চেন্ন-বসভ, বালককাল হইতেই চেন্ন-বসভের জীবনে দেখা দেয় আত্মিক মুক্তির ব্যাকুলতা, শৈব দর্শন ও শৈব যোগসাধনায় অতি অল্পকাল মধ্যে তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠেন। বীরশৈববাদের প্রচার ও সংস্কারধর্মী মতবাদ সংস্থাপনে তিনি মাতুল বসভেশ্বরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠেন।

এই সঙ্গে তাঁহাদের শক্তি বৃদ্ধি করেন, শোলাপুরের ভক্ত সিদ্ধরাম, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও উচ্চকোটির শৈব সাধক মদিভাল মচ্ছইয় প্রভৃতি। বসভেশ্বরের ধর্ম-আন্দোলনে ইঁহারা শক্তি সঞ্চয় করেন, দিকে দিকে ছড়াইয়া দেন তাঁহার বাণী ও আদর্শবাদ। সর্বোপরি তাঁহার বীর শৈববাদ উপকৃত হয় এবং সাধক ও দার্শনিক সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভুর আশীর্বাদ ও সহযোগিতার ফলে।

বসভেশ্বরের ধর্ম-আন্দোলনে সিদ্ধ নারী-সাধিকাদের অবদান কম নয়। তাঁহার অনুভবমণ্ডপে ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদবৈষম্য যেমন ছিল না, তেমনি পুরুষ ও নারীর ছিল সমান মর্যাদা এবং সমান অধিকার। ধর্মীয় উদারতার দিক দিয়া এটি বসভের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। বহুকাল আগে গৌতম বুদ্ধ তাঁহার মণ্ডলীতে নারী সাধিকাদের প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে তিনি ও তাঁহার শিষ্যেরা নারীদের এই অধিকার দানে তেমন ইচ্ছুক ছিলেন না। বসভেশ্বরের বেলায় কিন্তু দেখি, নারীদের সমমর্যাদা দিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বা দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং সাধনজীবন গঠনের ব্যাপারেও দেখা গিয়াছে তাঁহার অসামান্য নিষ্ঠা ও তৎপরতা।

বীরশৈব সাধিকা লকম্মা ছিলেন ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ। কল্যাণনগরে সাধক বসভেশ্বরের তখন বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। প্রতিদিন তাঁহার অনুভবমণ্ডপে শিবভক্ত ও শিবযোগীদের সমাবেশ হয়। ধর্মালাপ ও বিচার বিশ্লেষণের শেষে হাজার হাজার ভক্ত নরনারী আনন্দ কলরবের মধ্যে ভোজনপর্ব সমাধা করে।

লকম্মা ও তাঁহার স্বামী একদিন কৌতূহল ভরে অনুভবমণ্ডপে আসিয়া হাজির হন। বসভ তখন শিবযোগীদের কাছে কায়ক-এর তত্ত্ব বুঝাইতেছেন। কি করিয়া মানবজীবন ও ব্যবহারিক কর্মকে ইষ্টদেব শিবের চরণে উৎসর্গ করিতে হয়, কি করিয়া গার্হস্থ্য জীবনকে পরিণত করা যায়। পুণ্যময় কৈলাসরূপে তাহার ব্যাখ্যান চলিতেছে। বসভের ব্যক্তিত্বে ও আন্তরিকতায় লকম্মা ও তাঁহার স্বামী মুগ্ধ হইলেন, ভাষণ শেষে আশ্রয় নিলেন তাঁহার চরণতলে, বসভেশ্বরের কাছে লিঙ্গদীক্ষা নিয়া এই দম্পতি শুরু করিলেন ত্যাগ তিতিক্ষাময় সাধনা।

লকম্মার বৈরাগ্য ও সংযম ছিল অসাধারণ। কথিত আছে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে প্রতিদিন যে নির্দিষ্ট সংখ্যক তণ্ডুল ভোজনের জন্য রন্ধন করিতেন, তাহা অপেক্ষা বেশী হইলে লকম্মা তৎক্ষণাৎ স্বামীকে দিয়া ভিখারীদের মধ্যে উহা বিতরণ করাইতেন। পরবর্তী বেলার জন্য একটি তণ্ডুলকণাও তিনি নিজের কুটিরে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে দিতেন না।

বসভেশ্বর নারী-ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন অক্কা মহাদেবী।[১] এই শিষ্যার প্রশংসায় বসভেশ্বর নিজে ছিলেন পঞ্চমুখ। তা ছাড়া, তাঁহার শিষ্য ও সহকর্মী সিদ্ধরাম, মাদিভায়ল, চেন্ন-বসভ হইতে শুরু করিয়া যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভু অবধি অনেকেই এই সাধিকার যোগসিদ্ধি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।

মহাদেবী ছিলেন দাক্ষিণাত্যের একটি রাজ্যের রাজা কৌষিকের

---

১ সরোজিনী শিনৃত্রি: বসভ অ্যাণ্ড উওম্যান হুড, সেন্টিনারী মেমোরিয়াল ভল্যুম, গবর্নমেন্ট অব মাইসোর।

মহিষী। তরুণ বয়স হইতেই এই ভক্তিমতী মহিলার জীবনে আসে অজানা লোকের আহ্বান, শিববিগ্রহের সেবা-পূজার জন্য অন্তরে জাগে আকুল আগ্রহ। স্বামী কিন্তু স্ত্রীর ধর্মানুরাগ তেমন সুচক্ষে দেখেন নাই; সুযোগ পাইলেই শিবের নিন্দা সমালোচনায় তিনি মুখর হইয়া উঠিতেন।

মহাদেবীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই, ইষ্টদর্শনের আকাঙ্ক্ষা বরং দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিতেই থাকে। ইতিমধ্যে হঠাৎ রাজভবনে আগমন ঘটে এক বীরশৈব সন্ন্যাসীর। ইহার কাছে বসভের কথা, কল্যাণের অনুভবমণ্ডপ ও বীরশৈবদের সমাবেশের কথা তিনি জানিতে পারেন। প্রাণে জাগিয়া উঠে মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ভিতর হইতে বার বার কে যেন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতে থাকে—"ওরে, মহাসাধক বসভেশ্বরই তোমার চিহ্নিত গুরু, তাঁর কৃপা পেলে তবেই পূর্ণ হবে তোর ইষ্ট দর্শনের সঙ্কল্প।"

অতঃপর আর একদিনও মহাদেবী স্বামীর প্রাসাদে বাস করেন নাই। গোপনে রাজ-অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া চলেন কল্যাণ নগরীর দিকে। প্রভু বসভেশ্বরের চরণে স্থান না নেওয়া অবধি জীবনে তাঁহার শান্তি নাই, স্বস্তি নাই।

তাঁহার মতো রূপসী তরুণীর পক্ষে একাকিনী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা সহজ কথা নয়। বিঘ্ন বিপদ, দুঃখ দুর্দশা, দিনের পর দিন এ সময়ে কম আসে নাই। কিন্তু মহাদেবী যে ইষ্টদেবের কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন, তাঁহারই কৃপায় সফল হইল এই অভিযাত্রা। অচিরে বসভেশ্বরের দর্শন তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

তীব্র মুমুক্ষা ও আর্তি নিয়া মহাদেবী গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। সর্বস্ব ছাড়িয়াছেন সর্বময় পরম শিবকে লাভ করার জন্য। ত্যাগ-বৈরাগ্যময় সাধনার প্রস্তুতি তাঁহার জীবনে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। নিষ্ঠা ও পবিত্রতায় ভরা এই নারী সাধিকাকে দর্শন মাত্রেই বসভেশ্বর তাঁহাকে সেদিন মা বলিয়া ডাকিলেন,

দিলেন তাঁহাকে শৈব যোগের নিগূঢ় সাধনা। উত্তরকালে এই তরুণী শিষ্যার সঙ্গে তিনি ব্যবহার করিতেন অল্পবয়স্ক পুত্রেরই মতো।

দিব্যদৃষ্টি সহায়ে বসভ বুঝিলেন, এই নবাগতা শিষ্যার সাধন-জীবনে রহিয়াছে বিরাট সম্ভাবনা। তাই শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনতত্ত্ব দুই-ই তিনি অকৃপণ করে ঢালিয়া দিলেন তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব আধারে। অল্পকাল মধ্যে অক্কা মহাদেবী বীরশৈব সাধনার এক স্তম্ভরূপে গণ্য হন, চিহ্নিত হন এক সিদ্ধ সাধিকা রূপে। শত শত নারী তাঁহার সান্নিধ্য ও উপদেশ লাভে কৃতার্থ হয়।

এই শিষ্যার সিদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বসভেশ্বর বরাবরই অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। মহাদেবী যে উচ্চকোটির সাধিকা তাহা সবাইকে জানানোর জন্য সেবার তিনি এক কৌশল অবলম্বন করেন।

অল্লাম প্রভু এ সময়ে কয়দিনের জন্য কল্যাণে আসিয়াছেন। অনুভবমণ্ডপে তাই ভক্ত, যোগী ও সাধু-সন্ন্যাসীর ভিড়ের অন্ত নাই। বসভেশ্বর সেদিন অক্কা মহাদেবীকে এই বিরাট গুণীজন সমাবেশের সমক্ষে দাঁড় করাইয়া দেন। আর অল্লাম প্রভুকে অনুরোধ করেন, তাঁহার এই নবীনা শিষ্যার সাধনা ও সিদ্ধি কোন্ স্তরে অবস্থিত তাহা যেন তিনি নির্ণয় করিয়া দেন।

অল্লাম ও অপরাপর যোগীদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া অক্কা মহাদেবী সবাইকে সেদিন বিস্মিত করেন। অতঃপর শুধু বীরশৈব মহলেই নয়, দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন ধর্মমণ্ডলীতে এই মহিয়সী নারী সাধিকার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে।

বসভেশ্বরের কাছে ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শূদ্র, স্ত্রী-পুরুষের যেমন ভেদবৈষম্য নাই। তেমনি নাই নবীন প্রবীণ সাধকদের। অনুভব-মণ্ডপের সভায় নিত্য নূতন কত সাধনেচ্ছু ভক্তেরা আসে। বসভেশ্বর অপার প্রেম ও স্নেহ নিয়া সাহায্য করেন তাঁহাদের আত্মিক জীবন গঠনে। এই সময়ে বেদী হইতে বীরশৈবদের নির্দেশ দিতে গিয়া যে সব বচন তিনি রচনা করেন, উত্তরকালের সাধকদের কাছে তাহা গণ্য হইয়া রহিয়াছে অমূল্য সম্পদরূপে

বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎরা কণ্ঠে লিঙ্গ-ধারণ করে দীক্ষার দিন হইতে। মন্দির বা বিগ্রহ পূজা তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। এই সম্পর্কিত একটি 'বচনে' বীরশৈবদের মতবাদ পরিস্ফুট :

যাদের আছে বিপুল বিত্ত বিভব
হে প্রভু, তারা তৈরী করুক তোমার মন্দির,
কিন্তু আমার মত বিত্তহীন তা করবে কি দিয়ে ?
আমার নিজের চরণ দুটিই হচ্ছে স্তম্ভ,
তার ওপর স্থাপিত রয়েছে আমার দেহরূপ মন্দির—
আমার শিরোদেশে এই মন্দিরের গম্বুজ।
হে প্রভু, ইঁট কাঠ দিয়ে গড়া যে মন্দির
তাতো একদিন ধসে পড়ে গুঁড়ো হয়ে যায় ;
কিন্তু আমার এই সিদ্ধ কায়া—
চলমান মন্দির রূপে ছড়াবে তোমার দিব্য নাম,
বেঁচে থাকবে, আর অটুট থাকবে দীর্ঘকাল।

বীরশৈবদের সাধনায় কায়কের কথা, ইষ্টদেব শিবের চরণে নিবেদিত কর্মের কথা, রহিয়াছে। কিন্তু কায়াকে ক্লিষ্ট করিয়া যে সাধনা অনুষ্ঠিত হয় তাহার কথা নাই। দেহের উপর নির্যাতন না চালাইয়া মনকে নিয়ন্ত্রিত করো, সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করো—ইহাই যে প্রভু সঙ্গমেশ্বর চাহেন। তাই বসভেশ্বর বলিতেছেন :

প্রকাণ্ড এই উই-এর ঢিবির নিচে
লুকিয়ে আছে বিষাক্ত গোখ্রো সাপ,
উই ঢিবির ওপরে যদি করো লাঠির আঘাত
গভীরে লুকানো সাপ হয় কি নিহত ?
তেমনি বাইরের এই দেহের অস্থি মজ্জা মাংস
যতই চালাও কৃচ্ছ্র আর নির্যাতন—
হৃদয়ের যদি না হয় কোনো শোধন,
পাপ আর অজ্ঞানতার না হয় মৃত্যু,

তবে মিলবে না আমার প্রভুর অনুমতি,
এই দেহের নিপীড়ন করবেন না তো সমর্থন।

নবীন শিষ্যেরা বসভকে প্রশ্ন করেন, "প্রভু, পিচ্ছিল মনকে নিয়ে তো আর পারছিনে। ইষ্টধ্যানে একে কেন্দ্রীভূত করা যে এত দুঃসাধ্য তা তো জানতেম না। এর প্রতিবিধান কি বলুন তো।"

এই সব নবীন শিষ্যদের সতর্ক করার জন্য বসভেশ্বর একটি 'বচনে' বলিতেছেন :

মন বশ করার কথা বল্‌ছো, হে সাধক,
হিংস্র ক্রূর কেউটে সাপের মত যে এই মন।
যতক্ষণ থাকে সাপুড়ের মোহনিয়া বাঁশীর বশ,
ততক্ষণ হিংসা আর খলতা যায় ভুলে,
সুরে সুরে ফণা নাচিয়ে কত খেলাই না খেলে,
আর ক্রীতদাসের মত করে সে আত্মসমর্পণ।
কিন্তু সাপুড়ের একটি মুহূর্তের ভুল
এনে দেয় অভাবনীয় বিপদ আর বিনষ্টি,
ক্ষিপ্রবেগে কেউটে হঠাৎ ছোবল্ মেরে বসে—
ঢেলে দেয় তার প্রাণঘাতী বিষ।
তাই জানাও তোমার আকুল প্রার্থনা,
বল, হে মোর প্রভু, হে কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর
সাধন-জীবন আমার সদাই যেন থাকে
সদা সতর্ক, থাকে যেন সংযমের কঠিন বন্ধনে—
মন ভুজঙ্গ তাকে যেন না করে দংশন।

দুর্বল, নিষ্ঠাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ সাধনা ও সিদ্ধির কথা ভাবিয়া ভয় পায়। ক্ষুদ্র শক্তি নিয়া অনাদি অনন্ত দেবাদিদেবকে কি কখনো লাভ করা যায়, এই প্রশ্ন তাঁহার আত্মিক অভিযাত্রাকে সংশয়াকুল করিয়া তোলে। এই সব সাধকের জন্য বসভেশ্বর উচ্চারণ করেন আশ্বাসের বাণী :

ক্ষুদ্র ও বৃহতের প্রশ্ন নিয়ে
কেন শুধু নিজেকে করো হতাশ আর উদ্‌ভ্রান্ত ?
বিশালকায় হস্তী—বিপুল সামর্থ্য তার দেহে,
অথচ ভ্যাখো, অঙ্গুলি প্রমাণ একটি অঙ্কুশ
অবলীলায় করছে তার নিয়ন্ত্রণ।
আকারে ক্ষুদ্র বটে এই অঙ্কুশ
কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণের পরিধি কি বিস্তৃত।
গগনচুম্বী প্রস্তরীভূত ঐ যে পাহাড়,
ওর গর্ভে রয়েছে ক্ষুদ্র এক টুকরো হীরে,
তীব্র দ্যুতির ছটায় করছে ঝলমল,
আকারে ক্ষুদ্রতা, না দ্যুতির ঝলক্—
কি দিয়ে করবে তার মূল্য নিরূপণ ?
দূরবিস্তারী সূচীভেদ্য অন্ধকার—
ক্ষুদ্র একটি মোমের আলোয় মুহূর্তে হয় দূর,
এই মোমের আলো কি তুচ্ছ হবে ক্ষুদ্র বলে ?
হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গম দেব,
ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ যে মন আমার
তোমার মত ভূমাকে, বিভুকে ধারণ করে হয় ধন্য—
সে মনকে কি ক্ষুদ্র বলে করবো হেলা ?

এক সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠীর পুত্র বসভেশ্বরের কাছ হইতে নিয়াছেন লিঙ্গ-দীক্ষা। তারপর শুরু করিয়াছেন তাঁহার আত্মিক সাধনা। এই সঙ্গে বীরশৈব আন্দোলনকে দিকে দিকে বিস্তারিত করার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ও তৎপরতার অবধি নাই। নিজের প্রচুর ধন-সম্পদ ও লোকলস্করও এই মহান্ কর্মে তিনি নিয়োজিত করিয়াছেন। কিন্তু সাধন-জীবনে তেমন কিছু উন্নতি এযাবৎ তাঁহার হইতেছে না। অনুভবমণ্ডপের সম্মেলনে একদিন এই শিষ্যটি তাঁহার এই সাধনদৈন্যের কথা নিয়া খেদোক্তি করিলেন। বসভেশ্বর কহিলেন :

হাতীর পিঠে কিংখাব-মোড়া হাওদায় ব'সে
চলেছো তুমি রাজার মতো,
শরীরে লেপন করেছো সুগন্ধী প্রসাধন।
কিন্তু এই রাজকীয় বিলাসিতার ভিড়ে
সত্যকে জানবে কি ক'রে বলতো ?
অহং-এর বিলয়ে নিহিত রয়েছে পরমধর্ম—
সে ধর্মের বীজ তো আজও করনি বপন ?
অহমিকার হাতীতে চড়ে স্ফীত হয়েছো গর্বে,
এই গর্বই তোমায় ফেলবে টেনে ভূমিতলে।
প্রভু সঙ্গমেশ্বরকে জানতে চাওনি তুমি—
জানতে চেয়েছো নরকের আস্বাদ।

হিংসা, পাপ আর কদাচারে সারা দেশ তখন ভরিয়া গিয়াছে। সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্য, সংস্কারবাদী নূতন ধর্ম ও সংস্কৃতি গঠনের জন্য বহু তরুণ এসময়ে উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু বসভেশ্বরের মূল কথা—আগে নিজেকে করো শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, মোহাচ্ছন্ন মনকে করাও মুক্তিস্নান, তারপর শিবশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া অগ্রসর হও জগতের কল্যাণে। তিনি বলিতেছেন :

কুটিলতার জটিল ঘৃণ্য জালে
ছেয়ে গেছে আমাদের এই পৃথিবী—
সেই জাল তুমি ছিন্ন করতে চাও,
চাও এই পৃথিবীকে সরল করতে, সুন্দর করতে ?
কিন্তু কে তুমি ? কে দিয়েছে তোমায় এ কর্তৃত্ব ?
নিজের জটিলতাকে আগে সরল করে নাও,
দেহ আর মনকে শুদ্ধ করো, ঋজু করো—
তবে তো করবে অপরকে কলঙ্কমুক্ত।
প্রভু সঙ্গমেশ্বরের কাছে কপটতার নেই স্থান,
নিজের জন্য সবার আগে করো অশ্রু বিসর্জন,
কুটিলতা আর মলিনতা দাও ধুয়ে মুছে,

তবেই প্রভুর কাছ থেকে পাবে অনুমতি,
অপরের কলঙ্ক তখন করবে বিমোচন।

সিদ্ধ শিবযোগী অল্লাম প্রভুর শ্রীমুখ হইতে বসভেশ্বর প্রাপ্ত হইয়াছেন পরা-ভক্তি ও মহা-প্রেমের পরমতত্ত্ব। এই তত্ত্বটি বীরশৈব সাধকদের অন্তর পটে সদাই তিনি উৎকীর্ণ করিয়া দিতেন। কহিতেন, "ইষ্টের প্রতি প্রেম থাকবে সারা প্রাণমন জুড়ে, সারা জীবন জুড়ে, তবে তো আত্মিক সাধনায় আসবে সিদ্ধি, হবে পরম প্রাপ্তি। এই তত্ত্বটি বসভের একটি 'বচনে' চমৎকাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে[১] :

খেলার আনন্দে নিশ্চয়ই মেতে ওঠো তুমি,
গান গাও সুরে ছন্দে তাল-লয়ে,
গ্রন্থপাঠ হয়তো এনে দেয় কতই পাণ্ডিত্য,
কিন্তু সব কিছুই যে হয়ে যায় ব্যর্থ,
যদি না দাসোহং ব'লে একান্ত নিষ্ঠায়
আশ্রয় নাও প্রভুর রাতুল চরণে।
পেখম ধরে ময়ুরী কত নাচই তো নাচে,
বীণার তারে বেজে ওঠে কতনা মধু ঝংকার
তোতার কণ্ঠে কতনা শেখানো বুলি ঝরে,
কিন্তু তাতে হৃদয়ের পেলব স্পর্শ কোথায়?
প্রাণে তোমার প্রেমের বাতি জ্বালিয়ে
যদি না ডাকো আকুল হয়ে, তবে কি করে
প্রভু তোমায় করবেন অঙ্গীকার?

বসভেশ্বর এখন সাধনা ও ধর্মজীবনের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। তাঁহার বীরশৈব মতবাদ দেশের অসংখ্য পণ্ডিত ও সাধকের সমর্থন লাভ করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ শিবযোগী অল্লাম-প্রভুর মূল্যবান সহযোগিতা এবং অনুভবমণ্ডপের অধ্যক্ষতাও বসভেশ্বরের খ্যাতি প্রতিপত্তি কম বাড়ায় নাই। লক্ষ লক্ষ সংস্কারপন্থী শিবভক্ত এখন তাঁহাকে অনুসরণ

১ সিলেক্টেড্ সেইং অব বসভ : বাগি

করিতেছে, শিবকল্প গৃহী-যোগীরূপে দিতেছে তাঁহাকে অভাবনীয় শ্রদ্ধা ও সম্মান।

বলা বাহুল্য, বসভের এই মর্যাদা ও জনপ্রিয়তায় সনাতনী শৈবেরা মোটেই খুশী নয়। বরং তাহাদের ঈর্ষা দিন দিন আরো বাড়িতেছে। রাজা বিজ্জলও আজকাল মন্ত্রী বসভেশ্বরের অসাধারণ প্রতিপত্তিতে বেশ কিছুটা চিন্তিত। তাছাড়া, ব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্যকে একাকার করিয়া দিয়া বসভ বেদাচার বিরোধী কাজ করিতেছেন, ইহাও রাজার মনঃপূত নয়। অথচ হঠাৎ তাঁহাকে পদচ্যুত করাও সমীচীন হইবে না। জনসাধারণের বিশাল অংশ তাঁহাকে দেবতার মতো জ্ঞান করে। তাঁহার বা তাঁহার ধর্মান্দোলনের উপর কোনো হস্তক্ষেপ এইসব ভক্ত অনুগামীরা সহ্য করিবে না। বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ হয়তো শুরু করিয়া দিবে। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তোইলোকে সিংহাসনচ্যুত করার পর হইতেই অমাত্য ও সচিবদের মধ্যে একটা বিরোধী দল গজাইয়া উঠিয়াছে। গোপনে বেশ কিছুটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে, এ সংবাদও বিজ্জলের অজানা নয়। তাই এ সময়ে বসভেশ্বরকে ঘাঁটানো কূটনীতির দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁহার অনুগামী বিপুল সংখ্যক বীরশৈবদের ক্ষেপাইয়া তোলাও হইবে এক চরম নির্বুদ্ধিতা। তাই বিজ্জল এখনই তাঁহাকে আঘাত করিতে ইচ্ছুক নন। অদূর ভবিষ্যতে কোনো সময়ে এ সুযোগ হয়তো আসিবে, এই প্রতীক্ষায়ই দিন গুণিতেছেন।

এ সময়ে বসভেশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহার ফল হয় দূরপ্রসারী।

কম্বলিয় নাগিদেব নামে অন্ত্যজ সাধক এক শহরের প্রান্তে বাস করিতেন। একজন সাধননিষ্ঠ বীরশৈব বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। অনুভবমণ্ডপের সভায় প্রবীণ শৈব সাধকেরাও ইহার মতামতের গুরুত্ব দিতেন, সবাই তাঁহাকে দেখিতেন সম্মানের চোখে।

ঘুরিতে ঘুরিতে বসভ সেদিন নাগিদেবের বাড়ির সম্মুখে গিয়া

উপস্থিত। একটি ক্ষুদ্র ভক্তগোষ্ঠী সেখানে সমবেত হইয়াছে এবং শিব-উপাসনার নানা নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ চলিয়াছে।

বসভেশ্বরকে দেখিয়া গৃহস্বামী ও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা তো মহা আনন্দিত। সোৎসাহে অভ্যর্থনা জানাইয়া তাঁহাকে গৃহের ভিতরে আনা হইল। শ্রদ্ধাভরে তাঁহার উপদেশ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে ধন্য হইলেন।

বেলা বাড়িয়া গিয়াছে। বসভ এবার ভক্তদের কাছে বিদায় নিবেন। নাগিদেবযুক্ত করে কহিলেন, "প্রভু, আমাদের পরম সৌভাগ্য, এই দীনের কুটিরে আপনার মতো সিদ্ধ মহাপুরুষের পায়ের ধূলি পড়লো। আজ এখানে ইষ্টগোষ্ঠী করা হয়েছে, প্রসাদান্ন নিবেদন করা হয়েছে ইষ্টদেবকে। আমাদের একান্ত ইচ্ছে, আপনি এখানে প্রসাদ গ্রহণ করুন। অবশ্য যদি আপনার এতে কোনো আপত্তি না থাকে।"

"আপত্তির তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, নাগিদেব। জান তো, শিবভক্ত মাত্রেই আমার চোখে 'জঙ্গম'—মহেশ্বর। শিবের মন্দির, শিবের বিগ্রহ প্রতিটি ভক্তসাধকের দেহে ও অন্তরে প্রতিষ্ঠিত—এ আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আর এই বিশ্বাসই তো আমাদের সাধনার প্রধান অঙ্গ।"

ভক্ত শিষ্যদের আনন্দের অবধি নাই। বসভকে নিয়া সবাই পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসিয়া যান, আনন্দ কলরব আর জয়ধ্বনিতে অন্ত্যজ পাড়া মুখরিত হইয়া উঠে।

বসভেশ্বরের বিরোধী কয়েক ব্যক্তি নিকটেই ছিলেন। ছুটিয়া গিয়া তাঁহারা রাজা বিজ্জলের গুরু আচার্য নারায়ণ ভট্টকে ইহার বিবরণ দিলেন। সনাতন শৈব মতের ধারক-বাহক ক্রমিত, কুচিগ প্রভৃতি বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধকদের কাছেও তখনি সংবাদ পাঠানো হইল। বসভেশ্বরের বিরোধী একদল প্রতিপত্তিশীল রাজ-অমাত্যও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সবাই মিলিয়া রাজা বিজ্জলের প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত।

উত্তেজিত কণ্ঠে তাঁহারা কহিলেন, "মহারাজ, আপনি নিজ হাতে রাজদণ্ড গ্রহণ করার পর থেকে, সারা দেশে আশা ভরসা জেগে উঠেছে। আপনাদের প্রাচীন কলচুরীয় বংশ যেমনি শিবভক্ত তেমনি বেদাচার ও বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষণে তৎপর। কিন্তু এ রাজ্যে ধর্মের যে সব অনাচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে তো কলচুরী বংশের কল্যাণ হবে না।"

"আপনারা আমায় খুলে বলুন, কিসের অনাচার, আর কোথায় এটা ঘটছে।"

রাজগুরু নারায়ণ ভট্ট এবার দৃঢ়কণ্ঠে কহেন, "মহারাজ, পাপমতি বসভেশ্বর যে ধর্ম সমাজ সব কিছু উচ্ছন্ন দিতে বসেছে। এর কোনো প্রতিকার কি আপনি করবেন না?"

"বসভেশ্বর ধর্ম সংস্কারে মত্ত, যাকে তাকে দীক্ষা দিচ্ছে। এ তো সবাই আমরা জানি। কিন্তু হঠাৎ এমন কি ঘটলো যে দলবদ্ধ হয়ে আপনারা ছুটে এসেছেন?"—গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেন রাজা বিজ্জল।

"সে কথা বলার জন্যই তো আমরা এসেছি। শুনুন মহারাজ। বসভেশ্বর তার নিজ গৃহে, নিজের অনুভবমণ্ডপে অন্ত্যজ অস্পৃশ্যদের নিয়ে কত কিছু পাপাচারই তো ক'রে যাচ্ছে, তাতে আমরা এতকাল কিছু বলি নি। কিন্তু এমন সাহস হয়েছে তার যে অবলীলায় নগরের যত্রতত্র অধর্ম অনাচার সে ক'রে যাচ্ছে।"

"ব্যাপার কি খুলে বলুন, আচার্য্য দেব।"

"মহারাজ, নগরের প্রান্তে, নাগিদেব নামে এক অস্পৃশ্য ব্যক্তির ঘরে গিয়ে বসভেশ্বর সবার সঙ্গে বসে ভোজন করেছে। প্রকাশ্যে বহু লোকের দৃষ্টির সম্মুখেই একাজ সে করেছে। অথচ সে জানে, রাজ্যের রাজা বেদাচার মানেন, জাতিভেদ বর্ণভেদ মেনে চলেন। কোন্ সাহসে প্রকাশ্যে সে তার বিরোধিতা করছে? এতে আপনার সনাতন শৈব ধর্মকে সে যেমন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে, তেমনি অপমান করেছে আপনাকে। না—মহারাজ, এ অন্যায়ের শাস্তি আপনাকে

দিতে হবে কঠোরভাবে। নইলে লোকে বুঝবে, আপনি দুর্বল হস্তে শাসন করছেন।"

রাজা বিজ্জল মন দিয়া কথাগুলি শুনিলেন, তারপর ধীর স্বরে কহিলেন, "আচার্য্যদেব, আপনি ও রাজপণ্ডিতেরা এখানে রয়েছেন। বিশিষ্ট অমাত্যদেরও আমি দেখতে পাচ্ছি। আপনারা সবাই অতি বিশ্বস্ত, আমার কল্যাণের জন্যও সদা যত্নবান। তাই খোলাখুলি-ভাবেই এ ব্যাপারটা আমি আলোচনা করতে চাই।"

"হ্যাঁ, তাই করুন মহারাজ, সেটাই তো আমাদের কাম্য।"

"তবে শুনুন আপনারা। বসভেশ্বরের কোনো কথাই আমার অজানা নাই। তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে আমি তাঁকে দিনের পর দিন লক্ষ্য ক'রে আসছি, আজকের ঘটনার সব বিবরণও চরমুখে আমি শুনেছি।"

"তবে সত্বর তার দণ্ডবিধান করুন।"

"হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা একটা করতেই হবে, তা ঠিক। কিন্তু আজই, এখনই নয়।"

"সে কি মহারাজ, আপনি কি বসভেশ্বরের চেয়ে শক্তিমান্ নন? এ রাজ্যের রাজদণ্ড কি আপনার হাতে নেই? পাপাচার আর অন্যায়ের সব কথা জেনেও আপনি চুপ হয়ে তা সহ্য করবেন।"—নারায়ণ ভট্ট ক্ষুব্ধ কণ্ঠে, এক নিঃশ্বাসে কথা কয়টি বলেন।

"তবে শুনুন, রাজদণ্ড আমি ধারণ করি এবং শক্ত হাতেই করি। এ কয় বৎসরে কল্যাণ রাজ্যকে সামরিক শক্তির দিক দিয়ে আমি অজেয় ক'রে তুলেছি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো তা ভালোভাবেই জানে। বসভেশ্বরকে সমুচিত দণ্ড দেবার শক্তি আমার নিশ্চয় আছে।"

"তবে?"

"সেই কথাই তো আমি বুঝিয়ে বলছি। বসভেশ্বর শুধু আমার একজন সুদক্ষ মন্ত্রী হলে কথা ছিল না। কিন্তু সে এখন কানাড়া রাজ্যের, শুধু কানাড়া কেন সারা দাক্ষিণাত্যের, অন্যতম প্রধান ধর্মনেতা। ধীরে ধীরে সে অতি মাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ আজ তাকে সম্মান করে, ভালবাসে। তার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তুত। বসভেশ্বরকে কঠোর দণ্ড দিলে, গণবিক্ষোভ ও গণবিদ্রোহের আশঙ্কা রয়েছে।"

"তবে কি তাঁকে আপনি শাস্তি দেবেন না, আর তার শক্তি দিন দিন বেড়েই চলবে?"—হতাশভাবে বলে উঠেন আচার্য্য।

"আঘাত আমি তার ওপর হানবোই। কিন্তু সে হবে চরম আঘাত। কূটনীতি ও প্রশাসনের দিক দিয়ে বসভেশ্বরের প্রভাব প্রতিপত্তির এই বৃদ্ধি মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু এখনই তাঁর দণ্ড বিধান ক'রে জটিলতার সৃষ্টি করতে আমি চাই না। আপনারা জানেন, চালুক্য-রাজ তোইলো-তৃতীয়ের দুর্বল শাসনে সারা দেশ খণ্ড বিখণ্ড হচ্ছিল, ধর্ম যাচ্ছিল রসাতলে। নিজে এ সিংহাসন ভোগ করবো বলে আমি তার হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিই নি, নিয়েছি দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য।"

"মহারাজ, তা তো বটেই"—পণ্ডিত ও অমাত্যেরা তোষামোদের সুরে বলিয়া উঠেন।

"কিন্তু এই সহজ সত্যটি রাজ্যের একদল লোক এখনো স্বীকার ক'রে নিতে পারছে না। গোপনে সদাই তারা ষড়যন্ত্র করছে আমার রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্য। ঠিক এ সময়ে বসভেশ্বর ও তার বৃহৎ সংগঠনকে বিদ্রোহী ক'রে তোলা যুক্তিযুক্ত হবে না। বসভেশ্বরকে আমি অবশ্যই ডেকে পাঠাবো। অস্পৃশ্যদের নিয়ে প্রকাশ্যে যেভাবে সে ঢলাঢলি করছে সেজন্য কঠোর ভাষায় তাকে তিরস্কার করবো। সতর্ক ক'রে দেবো, আর যেন এই অনাচার সে বা তার সংস্কারপন্থী বীরশৈবেরা না করে। অন্যথায় কঠোর দণ্ড দেওয়া হবে।"

আচার্য্য ও তাঁহার দলবল ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিছু পরেই বসভেশ্বরকে রাজার সকাশে ডাকিয়া আনা হইল। বিজ্জল তাঁহাকে কাছে বসিতেও দিলেন না, দূরস্থিত এক আসনে স্থান গ্রহণ করিতে বলিলেন। তিনি যেন এক অস্পৃশ্য।

এবার রাজা বিরক্তি ও উষ্মার সঙ্গে প্রশ্ন করেন, "বসভ, এ

তোমার কি দুর্মতি, বলতো ? ঘরে বসে ভাঙ্গী, চামার চণ্ডালদের নিয়ে কত পাপাচারই তো করছো। কিন্তু অস্পৃশ্যের সঙ্গে প্রকাশ্যে তুমি পঙ্‌ক্তি ভোজন করলে কোন্ সাহসে। এতে যে আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম ভেঙে পড়বে, প্রজারা হয়ে উঠবে দুর্নীতিপরায়ণ, স্বেচ্ছাচারী। রাজ শাসনের ভয় যাবে ভেঙে। তোমার এ অপরাধ অমার্জনীয়। তাছাড়া, অস্পৃশ্যের সঙ্গে একসাথে বসে খেয়েছো, তাই তোমাকেই আমি গণ্য করছি অস্পৃশ্য বলে। রাজা ও তাঁর মন্ত্রীর ভেতর এই ব্যবধান তুমিই সৃষ্টি করলে, বসভ, তোমার হঠকারিতা দিয়ে।"

বসভেশ্বর এবার শান্ত স্বরে উত্তর দেন, "মহারাজ, আমার ধর্মীয় মতবাদ তো মোটেই আপনার অজানা নয়। আমার আচার-ব্যবহারে গোপনতা কিছু নেই, রাজা ও ধর্মের বিরোধিতা করা তো দূরের কথা তাদের সেবাতেই আমি নিযুক্ত রয়েছি। কিন্তু শিবের জগতে শিব-সন্তানদের মধ্যে ভেদজ্ঞান থাকবে, এ আমি চাইনে। ব্রাহ্মণ শূদ্র সবাই মিলে হবে একটি একান্নবর্তী পরিবার, পাপ-তাপে ভরা এই পৃথিবীকে ক'রে তুলবে কৈলাস ধাম। এটা আমার নবতর শৈব ধর্মের মূল কথা। এতে পাপাচার কিছুমাত্র নেই, কারুর অকল্যাণের প্রয়াসও নেই।"

"না বসভ, তুমি এসব অবাস্তব, ভাবাবেগময় কথায় আমায় বিভ্রান্ত করতে পারবে না। তোমার সংস্কারপন্থী ধর্মে গণ-বিদ্রোহের বীজ নিহিত রয়েছে। বেদধর্ম ও বেদাচার ধ্বংস করার কু-অভিসন্ধি নিয়েই তুমি কাজ করছো, অন্ত্যজদের সমর্থনে নিজের শক্তি বাড়িয়ে তোলার স্বপ্ন দেখছো।"

"এ আপনি কি বলছেন, মহারাজ ?"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আর শোন, এর ফল কিন্তু তোমার পক্ষে মোটেই ভালো হবে না। যাক্, আর যা-ই করো, প্রকাশ্যে অন্ত্যজদের সঙ্গে বসে তুমি বা তোমার দলের লোকেরা যেন কখনো ভোজন ক'রো না, সমাজের বুকে স্বেচ্ছাচার ও বিদ্রোহের সূচনা

ক'রো না। প্রথম অপরাধ আমি মার্জনা করলাম। কিন্তু তোমায় সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, এর পর কেউ প্রকাশ্যে এরূপ অপরাধ করলে তার আমি চরম দণ্ড বিধান করবো।"

ক্রুদ্ধ বিজ্জল দৃঢ়স্বরে কথা কয়টি বলিয়া বসভেশ্বরকে বিদায় দিলেন। সেই দিন হইতে রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে গড়িয়া উঠিল এক বিরোধের প্রাচীর।

কয়েক মাস পরের কথা। রাজধানী কল্যাণে এবার আর একটি ঘটনা ঘটে যাহার ফলে এক বৃহত্তর সঙ্কট ঘনাইয়া আসে।

হরলয় নামক এক অন্ত্যজের পুত্রের সঙ্গে মধুবায় নামক এক ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ সেদিন অনুষ্ঠিত হয়। উভয়েই বীরশৈব সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু এ ঘটনায় সনাতনী আচার্যেরা গর্জিয়া উঠেন। একে অস্পৃশ্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিবাহ, তদুপরি ব্রাহ্মণের কন্যা যাইতেছে অস্পৃশ্যের ঘরে। এ যে প্রতিলোম বিবাহ। শাস্ত্র কখনো ইহার সমর্থন করে না। প্রভাবশালী সনাতনপন্থীরা রাজা বিজ্জলের দরবারে অভিযোগ পেশ করিলেন।

হরলয় ও মধুবায় উভয়কেই ডাকাইয়া আনা হইল। বিজ্জল উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "ছাখো, এ প্রতিলোম বিবাহ দেশের শাস্ত্র বিধানের বিরোধী। সরকারী আইন এটা কখনো সমর্থন করবে না। এজন্য গুরুতর কারাদণ্ড তোমাদের পেতে হবে। ভালো চাও তো এ বিবাহ এখনই নাকচ ক'রে দাও।"

অভিযুক্তেরা একটুও ভীত নয়। স্পষ্ট ভাষায় তাহারা নিবেদন করে, "মহারাজ, আমাদের বীরশৈব মত অনুযায়ীই এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, এতে তো কারুর কিছু হানি হয় নি। কারুর কিছু বলারও নেই।"

"তবে কি রাজ-রোষের ভয়ও তোমরা করছো না"—বিজ্জল ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন।

"মহারাজ, কারুর রোষের পরোয়া আমরা করিনে। মাথার

ওপরে দেবাদিদেব শিব, আর চোখের সামনে মহাসাধক বসভেশ্বর। এই দুই ছাড়া আর কাউকে আমরা জানিনে।"

রোষে উত্তেজনায় রাজা বিজ্জলের সারা দেহ কম্পিত হইতেছে। দৃঢ় স্বরে আদেশ দিলেন, "এরা রাজদ্রোহী, সমাজদ্রোহী। চরমদণ্ডই এদের প্রাপ্য। দুষ্টদের চোখ উপড়ে ফেলে দেওয়া হোক। দেশের লোক বুঝুক, সমাজ ও রাজশক্তির বিরোধিতা করলে কোন্ দণ্ড পেতে হয়।"

আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হয়। এক মর্মান্তিক স্তব্ধতা নামিয়া আসে রাজধানীর জন-জীবনে।

বসভেশ্বর শিহরিয়া উঠেন এ সংবাদে। সাধন কুটিরে একান্তে গিয়া উপবেশন করেন। করুণ আর্তি জাগিয়া উঠে সারা অন্তরে। যুক্তকরে নিবেদন করেন, "হে দেবাদিদেব, হে প্রভু সঙ্গমেশ্বর, সারা জীবন ধরে আমি এগিয়ে চলেছি তোমারি নির্দেশে। সাধন ভজন, বীরশৈবদের সংগঠন ও সংস্কার সব কিছুতেই পেয়েছি তোমারই সমর্থন ও প্রেরণা। আজ আমায় বলে দাও, অতঃপর কি আমার কর্তব্য।"

কিছুক্ষণের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া বসভেশ্বর গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যান। তারপর ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বরের ঘটে আবির্ভাব। প্রশান্ত কণ্ঠে প্রভু কহেন, "বৎস বসভেশ্বর, কায়কের সাধনা তোমার শেষ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকে তোমার সাধনার বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে মুক্তির দীপশিখা। শিবভক্তির জোয়ার এসেছে লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনগণের জীবনে। তোমার ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কাজ তুমি সমাপন করেছো। এবার এসে পড়ো তোমার প্রাণপ্রিয় কুড়ল-সঙ্গমে। সেখানে তোমাতে আমাতে কি আনন্দেই না কাটবে।"

সিদ্ধান্ত স্থির করিতে বসভের একদিনও দেরি হইল না। রাজা বিজ্জলের কাছে পদত্যাগ পত্র তিনি পেশ করিলেন।

যোগীবর অল্লাম-প্রভু তখন বল্লিগাভেতে অবস্থান করিতেছেন। তাড়াতাড়ি সেখানে এক পত্র পাঠাইয়া বসভ সঙ্গমেশ্বরের নির্দেশ

তাঁহাকে জানাইয়া দেন। তারপর সর্বত্যাগী জঙ্গমের বেশে শুরু করেন কুড়ল-সঙ্গমের দিকে পদযাত্রা।

ভক্তেরা কাঁদিয়া বলে, "প্রভু, আমাদের প্রতি কি নির্দেশ রইলো আপনার? কি ক'রেই বা আমাদের দিন কাটবে, তা বলে দিন।"

প্রশান্ত কণ্ঠে বসভেশ্বর বলেন, "শিবময় ধর্মজীবন, আর শিবের মতন ত্যাগপূত তপস্যা নিয়ে দিন যাপন করো। অনুভবমণ্ডপ আর বীরশৈব সংগঠনের কাজ পূর্ববৎ চালিয়ে যাও তোমরা। ভুলবে না, তোমরা সবাই শিবভক্ত, শিবস্বরূপ হওয়াই তোমাদের সাধনার চরম লক্ষ্য। প্রভু সঙ্গমেশ্বর আমায় ডাক দিয়েছেন। তাঁর পুণ্যধামেই আমি এবার যাচ্ছি। তাঁর প্রেরণায় তোমাদের ভেতর এসেছিলাম, তোমাদের সেবা যথাসাধ্য করেছি। এবারে তাঁরই আদেশে ফিরছি কুড়ল-সঙ্গমে।"

সহস্র সহস্র মানুষের আর্তি ও ক্রন্দন পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, বসভেশ্বর ধীর পদে অগ্রসর হইলেন প্রভুর ধামের দিকে।

সঙ্গমেশ্বর তীর্থে পৌঁছিয়া তাঁহার আনন্দের আর অবধি নাই। জীবনে এবার আসিয়াছে চির-বিরতির পালা। এবার শুধু প্রভু আর তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের আনন্দ-রঙ্গ, আনন্দ-মিলন।

প্রভুর চরণকমল ধ্যানেই বাকিটা দিন বসভেশ্বর অতিবাহিত করিবেন। যতদিন এ দাসকে তিনি আত্মসাৎ না করেন, ততদিন চলিবে তাঁহার আরাধনা ও ধ্যান জপ। সঙ্গমেশ্বরের চরণে সেদিন অশ্রুনয়নে নিবেদন করিলেন:

তোমার চরণ-কমলের মধুকর আমি,
হে প্রভু, চেয়ে দেখো, তাইতো জিহ্বা আমার
তোমার নামের সুধায় হয়েছে মিঠে,
তোমার মুখশশীর জ্যোতির ছটায়
প্রদীপ্ত হয়েছে আমার এই নয়ন যুগল।
তোমার নিরন্ধ্র ভাবনা আর অনুধ্যানে
আমার দিনরাতের ব্যবধান গেছে ঘুচে,

তোমার স্তুতিগানের পবিত্র ঝঙ্কারে
আমার এ শ্রবণ দুটি সদাই রয়েছে ভরপুর।

পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যে যে একটি নিবিড় আনন্দময় অনুভূতি রহিয়াছে, তাহা বসভেশ্বরের এ সময়কার একটি বচনে পরিস্ফুট। তাঁহার মতে—সাধক দেহ যেন একখানি রম্য বীণা, পরম প্রভু লীলাভরে এই যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, আবার নিজ হাতেই সুরে তালে লয়ে তাহা সানন্দে বাজাইয়া চলিয়াছেন। এই রূপকটির বর্ণনা দিতে গিয়া বসভ গাহিয়াছেন :

দয়াল প্রভু, আমার এই দেহকে
কর তোমার বীণা যন্ত্রের দেহ।
আমার এই শির হোক তার শীর্ষচক্র,
স্নায়ু-শিরাগুলোর হোক রূপান্তর
সেই বীণার মধু-নিস্যন্দী তারে,
আমার এই হাতের আঙুলগুলো হয়ে উঠুক্
বীণার তার-জড়াবার কান,
হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর!
আমার এ দেহবীণার তারে তারে
কর আঘাত, আর বাজাও তোমার দিব্য সুর।

এ সময়ে হঠাৎ একদিন রাজধানী কল্যাণের এক দুঃসংবাদে কুড়ল-সঙ্গমে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। জানা যায়, বিরোধীদের আকস্মিক আক্রমণে রাজা বিজ্জল নিহত হইয়াছেন এবং আততায়ীরা বীরশৈব দলেরই অন্তর্ভুক্ত চরমপন্থীদল।

হরলয় ও মধুবায়ের চক্ষু উৎপাটন করার পর বিজ্জলের বিরুদ্ধে জনরোষ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। বসভেশ্বরের অন্তরঙ্গ সাধকেরা শান্ত থাকিলেও একদল উগ্র বীরশৈব রাজার এই নৃশংস কার্যের সমুচিত দণ্ড বিধান করিতে উদ্যত হয়। এই দলের প্রধান নেতা জগদেব। সহকারীদের মোল্ল ও বোমযকে নিয়া রাজা বিজ্জলের নিধনের জন্য

তিনি এক গোপন চক্রান্ত গড়িয়া তোলেন। তারপর সুযোগ বুঝিয়া হঠাৎ একদিন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজাকে তাঁহারা হত্যা করেন। রাজধানী কল্যাণে অতঃপর চলিতে থাকে সরকারী দমন-অভিযান আর উত্তাল হইয়া উঠে গণ-বিক্ষোভ ও গণ-সংঘর্ষ।

কুড়ল-সঙ্গমের ভক্তেরা বসভেশ্বরকে এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির কথা জানাইলেন, চাহিলেন কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ।

ধ্যানাবিষ্ট বসভেশ্বর শুধু কহিলেন, "বিজ্জলের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। তাই বুঝি তাকে বিদায় নিতে হলো। তবে জগদেব ভুল করেছে, নিজ হাতে নিধনের অস্ত্র তুলে না নিয়ে তাঁর ওপরই নির্ভর করা উচিত ছিল, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ন্তা হয়ে যিনি রয়েছেন সদা জাগ্রত। এ সম্পর্কে আমার নিজের কিছু বলার নেই, করারও নেই। এখন প্রভুর লীলার আমি দর্শক মাত্র।"

গুরু জাতবেদমুনি বহুদিন যাবৎ গত হইয়াছেন। কিন্তু কুড়ল-সঙ্গমের শৈব সাধক ও সন্ন্যাসীর সমাবেশ পূর্ববৎই রহিয়াছে। বসভেশ্বর কিন্তু আজ কাহারও সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করেন না, আপন মনে দিনের বেলায় ঘুরিয়া বেড়ান সঙ্গমস্থলে, আর রাত্রে ধ্যান জপে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন।

এখন কেবলই তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন পরিপূর্ণতার পথে, দেবাদিদেব মহেশ্বরের পরম সঙ্গমের দিকে। দেহ, মন, আত্মা সব কিছুই আজ ভরিয়া উঠিয়াছে তাঁহার প্রভুর প্রেমে, আর অবদানে। এ সময়কার একটি বচনে তিনি গাহিয়াছেন[১] :

হে প্রভু, যত কিছু কথা আমার
ভরে তুলবো তোমার নামের সুধায়,
নয়ন দুটি জুড়ে উঠবে ফুটে
তোমার নয়নাভিরাম রূপ।
তোমার রম্য স্মৃতিতে পূর্ণ হবে আমার অন্তর,

১ স্পীচেস্ অব বসভন্ন—অনুবাদ : মেনজেস্ অ্যাণ্ড অংগি

শ্রবণ দুটি উঠবে ভরে তোমার যশোগানে,
হে কুড়ল-সঙ্গম দেব,
তোমার চরণকমল দুটি ছুঁয়ে
সার্থক ক'রে তুলবো আমার এ জীবন।

সাধনার চরম স্তরে পৌঁছিয়াছেন বসভেশ্বর। ধ্যান দৃষ্টিতে সদাই হইতেছে অপরূপ দর্শন। পরম শিব আর তাঁহার অনাদ্যন্ত সৃষ্টি দুইই হইয়া গিয়াছে একাকার। বসভের মুখনিঃসৃত একটি বচনে, এই দিব্য অভিজ্ঞতাটি বর্ণিত :

যে দিকেই করি নয়নপাত, হে প্রভু,
নিরন্তর হয় শুধু তোমারই দর্শন।
এই সীমাহীন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড
বিলসিত রয়েছে তোমারই অপরূপ রূপে—
তুমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের আয়ত নয়ন,
বিকচ কমল সদৃশ আনন তুমিই,
স্কন্ধ, হস্ত, ও চরণদ্বয় তাও যে প্রভু তুমি,
বিশ্ব নিয়ন্তা হে কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর,
কোটি কোটি নক্ষত্রে খচিত তোমার এই মহাকাশ—
তোমার এই বিরাম বিহীন সুমহান্ সৃষ্টি—
তোমারই মত অনাদি আর অনন্ত,
তোমারই মত অপরূপ মহিমায় তারা সমুজ্জ্বল।

সাধনার এই পরম অবস্থার পর দেহবোধ তাঁহার বিলুপ্ত হয়, ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বর প্রাণপ্রিয় ভক্ত বসভেশ্বর দেহ মন আত্মাকে করেন আত্মসাৎ।

১১৬৭ খৃষ্টাব্দের বসভের মহাপ্রয়াণের এই মর্মান্তিক দিনটি বীরশৈব সাধকেরা কোনো দিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

লাটু মহারাজ

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেদিন ভক্ত লাটুকে নিয়া মহাব্যস্ত। এই নতুন অবাঙালী শিষ্যটি নিরক্ষর, কোনমতে বর্ণ পরিচয় করাইয়া দিলে যদি বা লেখাপড়ার দিকে তাহার মনটা ঘোরে। আজ ঠাকুর তাই স্থির করিয়াছেন, লাটুর অক্ষর পরিচয় শেষ করিয়া তবে ছাড়িবেন।

ঠাকুর যতবার পড়ান 'ক', ছাত্র ততবার বলে 'কা'। পশ্চিমদেশীয় ভক্তের জিহ্বায় অকারান্ত উচ্চারণ আসে না। ঠাকুর মহা সমস্যায় পড়িয়াছেন, আর বলিতেছেন, "শালা, 'ক'কে যদি 'কা' বলিস, তবে এতে আকার দিলে তখন কি বলবি?" বহু চেষ্টার পর রামকৃষ্ণ শিক্ষাদানে ক্ষান্ত হইলেন। বলিলেন, "যা, শালা, তোর পড়েই আর কাজ নেই!"

উত্তরকালে এই নিরক্ষর শুদ্ধসত্ত্ব শিষ্যের আধারে ঠাকুর অকৃপণ করে কৃপার ধারা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিজের সাধন-জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—পবিত্রতা, সরলতা ও ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা। তাঁহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই অধ্যাত্ম-শিল্পী রামকৃষ্ণের এই বিহারী ভক্ত লাটু মহারাজের মধ্যে।

ব্যবহারিক শিক্ষা ও লেখাপড়ার অভাব যে ভবগৎ-প্রাপ্তির অন্তরায় ঘটাইতে পারে না, তাঁহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ঠাকুর নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন; উত্তরকালে লাটু মহারাজের অলোকসামান্য অধ্যাত্ম-জীবনেও দেখা গিয়াছে তাহারই অনুকৃতি।

ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রয়াস সেদিন বিফল হইয়া গেল। লাটু তারপর পরমানন্দে গঙ্গাতীরের বাগানে গিয়া প্রাণ খুলিয়া গান শুরু করিলেন, 'মনুয়ারে—সীতারাম ভজন করলিজিয়ে।'

স্মিতহাস্যে ঠাকুর দূর হইতে শুনিতেছেন। লাটুকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, তোর ওতেই হবে।" সত্যিই ইহাতেই তাঁহার

হইয়াছিল। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া বৈরাগ্যবান্ স্বভাবসরল লাটু সদ্‌গুরুর নির্দেশিত শ্রদ্ধা-ভক্তির পথেই অগ্রসর হন। এই পথেই তাঁহার ভাগবত জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। লীলাময় রামকৃষ্ণের আনন্দ-কাননের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া লাটু মহারাজ ফুটিয়া উঠেন একটি দিব্য সৌগন্ধবিস্তারী পুষ্পরূপে।

লাটু মহারাজ তাঁহার উত্তর জীবনে ঠাকুরের একটি গল্প প্রায়ই ভক্তদের কাছে বলতেন। গুরু-নিষ্ঠার দিক দিয়া এ গল্পটি কিন্তু লাটু মহারাজকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

রামচন্দ্রের সভায় সর্বজনসমক্ষে ভক্ত বীর হনুমান যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভু রামচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া এ সময়ে হনুমানকে একছড়া বহুমূল্য মুক্তামালা উপহার দেন। হনুমান উহা প্রথমে নাড়িয়া-চাড়িয়া কি যেন পর্যবেক্ষণ করেন। তাহার পর প্রত্যেকটি মুক্তা নখাঘাতে বিদীর্ণ করেন, ভেতরকার বস্তুটি বুঝি আবিষ্কার করিতে চাহেন। তাহার পর ঐ মালা ছুঁড়িয়া ফেলেন ভূতলে।

প্রভু রামচন্দ্রের মালার এই অপমান! লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্বাণ উদ্যত করিয়াছেন, এমন সময় শ্রীরাম বাধা দিয়া কহেন, "আসল কথাটা কি জানো, মুক্তামালাতে 'রামনাম' কোথাও ক্ষোদিত নেই, তাই পরমভক্ত হনুমানের কাছে এটা মূল্যহীন, পরিত্যজ্য।"

গুরু রামকৃষ্ণের প্রতি এমনই একনিষ্ঠ ভক্তি লাটু মহারাজেরও ছিল। জীবনে প্রাপ্ত সমস্ত কিছু তত্ত্ব ও শিক্ষাই তিনি সদ্‌গুরু রামকৃষ্ণের কষ্টিপাথরে সতর্করূপে যাচাই করিয়া নিয়াছেন।

লাটু মহারাজের গুরুভাইরা বলিতেন, ভক্তবীর পবন-তনয় যেমন রামচন্দ্রের লীলায় এক উজ্জ্বল রত্ন, রামকৃষ্ণের লীলায় লাটু মহারাজও তেমনই একটি বড় সম্পদ। তাই বুঝি কাশীতে স্থাপিত স্মৃতি-মন্দিরে হনুমানজীর প্রস্তরমূর্তি বিরাজ করিতেছে এই নৈষ্ঠিক ভক্তের প্রেম-ভক্তির স্মারকরূপে।

লাটু মহারাজের গুরুকৃপায় সৌভাগ্য ও অধ্যাত্ম-সিদ্ধির পরিমাপ করা যায় তাঁহার গুরুভাই বিবেকানন্দের একটি মন্তব্যে

মধ্য দিয়া। ঠাকুর ও ঠাকুর-সন্ততির আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আমাদের মধ্যে লেটোটাই ঠাকুরকে ঠিক ধরেছিল।" সদ্‌গুরুর অনুসরণে, নিরন্তর অনুধ্যানে, লাটু মহারাজের অন্তর-সত্তা তাঁহারই ভাবে ও ভাবনায় হইয়াছিল বিভাবিত। দেহেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল রামকৃষ্ণেরই ছাপ। তাই প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের আকৃতির সহিত লাটু মহারাজের সাদৃশ্য দেখিয়া একবার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

লাটু মহারাজের জীবন ছিল ত্যাগবৈরাগ্যময়। এ জীবন ভক্তিময় ভজনের নিরালা পথটি ধরিয়াই অগ্রসর হয়। রামকৃষ্ণ মণ্ডলী তাঁহার প্রাণপ্রিয় হইলেও বিবেকানন্দের প্রবর্তিত সঙ্ঘে তিনি যোগ দেন নাই। প্রিয় গুরুভ্রাতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও তিনি মঠে রাত্রিবাস কখনো করিতেন না। বলিতেন, "হামরা সাধু। হামাদের আবার জমি, বাড়ি, বাগান, ঐশ্বর্য এ সব কি বাবা? এ সবের মধ্যে হামি থাকবে না।"

তবুও মঠের বাহিরে, একান্তচারী এই মহাপুরুষের রামকৃষ্ণময় জীবন হইতে, মণ্ডলীর কত সাধু-সন্ন্যাসী যে অধ্যাত্ম-পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছে, আপ্তকাম হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রায়ই লাটু মহারাজের কাছে নবীন ভক্তদের পাঠাইতেন। আর এই কঠোরী মহাপুরুষের কাছে পাঠানোর সময় আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "লাটুর কাছে ঘেঁষতে ভয় কিসের রে? ওর বাইরে একটু রুক্ষভাব—সেটা লোকসঙ্গ এড়ানোর জন্য, কিন্তু ওর ভেতরটা একেবারে ক্ষীরে ভরপুর।"

ভক্তপ্রবর গিরিশ ঘোষ তো লাটু মহারাজ সম্পর্কে ছিলেন উচ্ছ্বসিত, সবাইকেই তাঁহার আশীর্বাদ চাহিয়া নিতে তিনি উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন, "এমন বেদাগ্‌ সাধু আমি জীবনে কখনো দেখি নি।"

দক্ষিণেশ্বরে একদিন সমাধির পরে অর্ধবাহ্য অবস্থায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ লাটুকে বলিয়াছিলেন, "ওরে লেটো, দেখবি একদিন তোর মুখ দিয়ে বেদ-বেদান্ত ফুটে বেরোবে।"

এই অমোঘ বাক্যের ফল ফলিয়াছিল এবং নিরক্ষর লাটু মহারাজ প্রখ্যাত হইয়াছিলেন রামকৃষ্ণের এক অসামান্য সৃষ্টিরূপে।

লাটু মহারাজের বাল্যকালের নাম রাখতুরাম। বিহারের ছাপরা জেলায় এক কৃষকের পরিবারে তাঁহার জন্ম। গরীব ঘরের ছেলে, ভেড়া-ছাগল চরানো অর্ধনগ্ন রাখাল, এই রাখতুরাম যে একদিন রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক হইবেন, তাহা কে জানিত? জানিতে পারিলে কেহ হয়তো তাঁহার জন্মের সাল তারিখ সতর্কতার সহিত লিখিয়া রাখিত। তবে মোটামুটিভাবে অনুমান করা যায়, রাখতুরাম পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে।

বাল্যকালেই রাখতু পিতামাতাকে হারায় এবং তারপর সে পিতৃব্যের সংসারে থাকিয়া মেষপালন করিতে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা লাভেরও কোনো সুযোগ তাহার ঘটে নাই। আর্থিক দুরবস্থায় পড়িয়া পিতৃব্য সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং এখানে রামকৃষ্ণ-ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে পরিচারক হিসাবে রাখতুরাম কাজ করিতে থাকে। বাড়ির সকলে আদর করিয়া তাহাকে ডাকিত লালটু নামে। তেজস্বী, সৎ ও ঈশ্বরভক্ত এই নূতন ভৃত্যটিকে রাম্ দত্ত ও তাঁহার পরিবারের সবাই স্নেহ করিতেন। অকপট ও উচিতবক্তা এই বালক কিন্তু মাঝে মাঝে সমস্যার সৃষ্টি করিয়া বসিত, রাম দত্ত সস্নেহে তাহাকে মানাইয়া চলিতেন।

গৃহে ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ প্রায়ই চলে। বালক উৎকর্ণ হইয়া এই আলোচনা শুনিতে চেষ্টা করে। কি এক অমোঘ আকর্ষণ যে সে অনুভব করে, কিছুই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না।

এক একদিন কম্বল চাপা দিয়া শুইয়া লালটু গুম্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠে। অহৈতুক কান্নায় দুই চোখ ভাসিয়া যায়।

সাধক নিত্যগোপাল অবধূত এই সময়ে রাম দত্তের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। ধর্মালোচনা ও নামগান তাই মাঝে মাঝে হয়. আর

মধ্য দিয়া। ঠাকুর ও ঠাকুর-সন্ততির আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আমাদের মধ্যে লেটোটাই ঠাকুরকে ঠিক ধরেছিল।" সদ্‌গুরুর অনুসরণে, নিরন্তর অনুধ্যানে, লাটু মহারাজের অন্তর-সত্তা তাঁহারই ভাবে ও ভাবনায় হইয়াছিল বিভাবিত। দেহেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল রামকৃষ্ণেরই ছাপ। তাই প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের আকৃতির সহিত লাটু মহারাজের সাদৃশ্য দেখিয়া একবার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

লাটু মহারাজের জীবন ছিল ত্যাগবৈরাগ্যময়। এ জীবন ভক্তিময় ভজনের নিরালা পথটি ধরিয়াই অগ্রসর হয়। রামকৃষ্ণ মণ্ডলী তাঁহার প্রাণপ্রিয় হইলেও বিবেকানন্দের প্রবর্তিত সঙ্ঘে তিনি যোগ দেন নাই। প্রিয় গুরুভ্রাতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও তিনি মঠে রাত্রিবাস কখনো করিতেন না। বলিতেন, "হামরা সাধু। হামাদের আবার জমি, বাড়ি, বাগান, ঐশ্বর্য এ সব কি বাবা? এ সবের মধ্যে হামি থাকবে না।"

তবুও মঠের বাহিরে, একান্তচারী এই মহাপুরুষের রামকৃষ্ণময় জীবন হইতে, মণ্ডলীর কত সাধু-সন্ন্যাসী যে অধ্যাত্ম-পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছে, আপ্তকাম হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রায়ই লাটু মহারাজের কাছে নবীন ভক্তদের পাঠাইতেন। আর এই কঠোরী মহাপুরুষের কাছে পাঠানোর সময় আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "লাটুর কাছে ঘেঁষতে ভয় কিসের রে? ওর বাইরে একটু রুক্ষভাব—সেটা লোকসঙ্গ এড়ানোর জন্য, কিন্তু ওর ভেতরটা একেবারে ক্ষীরে ভরপুর।"

ভক্তপ্রবর গিরিশ ঘোষ তো লাটু মহারাজ সম্পর্কে ছিলেন উচ্ছ্বসিত, সবাইকেই তাঁহার আশীর্বাদ চাহিয়া নিতে তিনি উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন, "এমন বেদাগ্‌ সাধু আমি জীবনে কখনো দেখি নি।"

দক্ষিণেশ্বরে একদিন সমাধির পরে অর্ধবাহ্য অবস্থায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ লাটুকে বলিয়াছিলেন, "ওরে লেটো, দেখবি একদিন তোর মুখ দিয়ে বেদ-বেদান্ত ফুটে বেরোবে।"

এই অমোঘ বাক্যের ফল ফলিয়াছিল এবং নিরক্ষর লাটু মহারাজ প্রখ্যাত হইয়াছিলেন রামকৃষ্ণের এক অসামান্য সৃষ্টিরূপে।

লাটু মহারাজের বাল্যকালের নাম রাখতুরাম। বিহারের ছাপরা জেলায় এক কৃষকের পরিবারে তাঁহার জন্ম। গরীব ঘরের ছেলে, ভেড়া-ছাগল চরানো অর্ধনগ্ন রাখাল, এই রাখতুরাম যে একদিন রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক হইবেন, তাহা কে জানিত? জানিতে পারিলে কেহ হয়তো তাঁহার জন্মের সাল তারিখ সতর্কতার সহিত লিখিয়া রাখিত। তবে মোটামুটিভাবে অনুমান করা যায়, রাখতুরাম পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে।

বাল্যকালেই রাখতু পিতামাতাকে হারায় এবং তারপর সে পিতৃব্যের সংসারে থাকিয়া মেষপালন করিতে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা লাভেরও কোনো সুযোগ তাহার ঘটে নাই। আর্থিক দুরবস্থায় পড়িয়া পিতৃব্য সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং এখানে রামকৃষ্ণ-ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে পরিচারক হিসাবে রাখতুরাম কাজ করিতে থাকে। বাড়ির সকলে আদর করিয়া তাহাকে ডাকিত লাল্টু নামে। তেজস্বী, সৎ ও ঈশ্বরভক্ত এই নূতন ভৃত্যটিকে রাম দত্ত ও তাঁহার পরিবারের সবাই স্নেহ করিতেন। অকপট ও উচিতবক্তা এই বালক কিন্তু মাঝে মাঝে সমস্যার সৃষ্টি করিয়া বসিত, রাম দত্ত সস্নেহে তাহাকে মানাইয়া চলিতেন।

গৃহে ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ প্রায়ই চলে। বালক উৎকর্ণ হইয়া এই আলোচনা শুনিতে চেষ্টা করে। কি এক অমোঘ আকর্ষণ যে সে অনুভব করে, কিছুই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না।

এক একদিন কম্বল চাপা দিয়া শুইয়া লাল্টু গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠে। অহৈতুক কান্নায় দুই চোখ ভাসিয়া যায়।

সাধক নিত্যগোপাল অবধূত এই সময়ে রাম দত্তের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। ধর্মালোচনা ও নামগান তাই মাঝে মাঝে হয়, আর

লালটুর অন্তরের গভীরে রহস্যময় শিহরণ জাগে, নূতন জীবনোন্মেষের ইঙ্গিত সারা দেহমন চঞ্চল করিয়া তুলে।

রামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রায়ই আলোচিত হয় আর এসব তাহার কানে পৌঁছে। দিনরাত চলে তাহার গুঞ্জরণ—'যে সদা ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই কাছে ঈশ্বর হন প্রকাশিত।'

প্রভু রামকৃষ্ণের কথাগুলি লালটু মনে রাখিয়াছে। মন তাই অজানা পরম বস্তুর জন্য বার বার চঞ্চল হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে কেনই বা সে ফুঁপাইয়া কাঁদে আর চক্ষুর জল ফেলে বাড়ির কেহ সে রহস্যের সমাধান করিতে পারে না।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দটি লালটুর জীবনের এক স্মরণীয় বৎসর। একদিন মনিব রাম দত্তের সঙ্গে গিয়া সে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে। ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া লালটু প্রণাম করে, করজোড়ে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া থাকে।

সমবেত ভক্তদের উদ্দেশ্য করিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠেন, "ছাখো, যারা নিত্যসিদ্ধ তাদের কিন্তু জন্মে জন্মে জ্ঞানচৈতন্য হয়েই রয়েছে। তারা যেন পাথরচাপা ফোয়ারা। মিস্ত্রী এখানে-সেখানে ওস্কাতে ওস্কাতে যেই এক জায়গার চাপটা সরিয়ে দেয়, অমনি ফোয়ারার মুখ থেকে ফর্‌ফর্‌ করে জল বেরুতে থাকে।"

কথা কয়টি শেষ করিয়া হঠাৎ ঠাকুর লাটুকে স্পর্শ করিলেন।[১] এই দিব্য স্পর্শে ঘটে তাহার বিস্ময়কর ভাবান্তর। গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, সমস্ত শরীর কম্পমান, দেহের রোমরাজী কণ্টকিত। আর তার অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইতেছে কান্না।

রাম দত্ত বিপদ গণিলেন। ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন, "ব্যাপার তো বুঝলুম। তা, ছেলেটি কি সারাক্ষণ কাঁদতেই থাকবে?"

১ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়: শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা

ঠাকুর আবার স্পর্শ করা মাত্র লালটুর ক্রন্দন থামিয়া যায়। অধ্যাত্ম-জীবনের অলৌকিক শক্তিধর শিল্পী ছিলেন রামকৃষ্ণ। সেদিন লালটুর অন্তস্তলে কোন্ পাথরচাপা নির্ঝরের মুখ তিনি নিপুণ হস্তে খুলিয়া দিলেন তাহা তিনিই জানেন।

ইহার পর লালটুর জীবনে এক বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে। তাঁহার সমস্ত চঞ্চলতা ও কলরব হয় অন্তর্হিত—সে যেন তখন একটি কলের পুতুল। ঠাকুরের জন্য ফল-মূল নিয়া আবার একদিন লালটু পরমোৎসাহে দক্ষিণেশ্বরে যায়। ঠাকুরের মিষ্টি কথা শুনিয়া ও প্রসাদ পাইয়া নিজেকে জ্ঞান করে কৃতকৃতার্থ।

ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বাস করার জন্য লালটু বদ্ধপরিকর। কিন্তু এই সময়ে ঠাকুর হঠাৎ কিছুদিনের জন্য স্বগ্রামে চলিয়া যান। তীব্র ব্যাকুলতা নিয়া চাতক পক্ষীর মতো দক্ষিণেশ্বরে লালটু মাঝে মাঝে বসিয়া থাকে। তাঁহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ দেশে গেলেও অলক্ষিতে এখানে সদাই বর্তমান আছেন। তবে লালটু তাঁহার সূক্ষ্মদেহের সান্নিধ্য ছাড়িবে কেন?

একদিন ভক্তবৎসল ঠাকুরের কৃপায় তাহার মনোবাঞ্ছা কিন্তু পূর্ণ হয়, অলৌকিকভাবে ঠাকুর তাঁহাকে দর্শন দান করেন। লালটুর অধ্যাত্ম-জীবনে সদ্‌গুরুর আশীর্বাদটি এই দর্শনের মধ্য দিয়া সক্রিয় হইয়া উঠে।

পরমহংসদেব কামারপুকুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মনিবের প্রদত্ত ফল-মূল ও মিষ্টান্ন নিয়া আবার একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছে। ঠাকুর সস্নেহে এবার কহিলেন, "ওরে আজ তুই এখানেই থেকে যা। মায়ের প্রসাদ পাবি।"

লালটু দক্ষিণেশ্বরে রহিয়া গেল। রাত্রে প্রসাদ পাইবার পর সে ঠাকুর রামকৃষ্ণের পদসেবার ভার পাইয়াছে। তাই আনন্দ আর ধরে না। অকস্মাৎ তাহার সারা দেহে মনে একটা দিব্য ভাবের ঘোর নামিয়া আসে, তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। চোখে নামে অশ্রুর বন্যা।

ঠাকুর নীরবে লক্ষ্য করিতেছেন। এবার রহস্য করিয়া হাসিয়া বলেন, "কিরে, তোর আবার একি হল?"

কম্পিত কণ্ঠে লালটু উত্তর দেয়, "হামে কি জানে?"

সবাই বুঝিলেন, পরমহংসদেবের সামান্যতম কৃপা কটাক্ষে এই নবাগত শিষ্যের দেহে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার ভাব হইয়াছে এমন ঘনীভূত।

লালটুকে দিয়া আর বাড়ির পরিচারকের কাজ করাইতে রাম দত্তের মন এবার সরে না। ঠাকুরের কাজের জন্যেই তাঁহাকে তিনি নিয়োজিত রাখতে চান। লালটু আজকাল ঠাকুরের উৎসব অনুষ্ঠানে কর্মী হিসাবে ঘোরাঘুরি করিতে থাকে। অবশেষে ঘটনাচক্রে দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরের সেবক হৃদয় মুখুয্যে অপসারিত হন, রাম দত্ত নিজেই উৎসাহ করিয়া লালটুকে স্থায়ীভাবে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দেন।

ঠাকুরের সেবায় লালটু এবার কায়-মন-প্রাণ ঢালিয়া দেয়। সদ্‌গুরুর সস্নেহ ও সতর্ক দৃষ্টিও তাহার উপর থাকে নিবদ্ধ। মাঝে মাঝে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন, "দেখিস রে লেটো, তুই যেন ইখানকার বাইরেটা দেখে ভুলে যাস নি। ওরে এটার (হাড় মাসের খাঁচা) সেবায় কিছু পাওয়া যায় না। এর ভেতরে যে বাস করে, তার সেবা করলে সব পাবি!"

সাধক লাটু সারা জীবন ভরিয়া এই নির্দেশটি পালনে চেষ্টিত ছিলেন। ঠাকুরের দেহাবসানের পরেও তাঁহার মুখ্য ভাব ছিল —'তাঁকে যেন না ভুলি।' ঠাকুরকে জীবন-সর্বস্ব করিবার এই সাধনায় লাটু মহারাজ যে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি কৃতী গুরুভাইরা অকুণ্ঠ চিত্তে ইহা স্বীকার করিতেন।

লাটুর সাধনায় ছিল আত্মসমর্পণের সাধনা। সদ্‌গুরু চরণে তিনি বিসর্জন দিয়াছিলেন তাঁহার দেহ-মন-প্রাণ, সর্বসত্তা।

আত্মসমর্পণের এই সাধনায় লাটু মহারাজের নিরক্ষরতা ও শুদ্ধা-ভক্তির বেগ তাঁহাকে অশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

শিষ্য নিজেকে সমর্পণ করিতেছেন; তাঁহার যেমন সব কিছু দিয়াও মন প্রাণ ভরিয়া উঠিত না, গুরুর তেমনি চাওয়ার অন্ত ছিল না। শিষ্যের আত্মসমর্পণকে নিরন্ধ্র ও নিখুঁত করিবার জন্য তাঁহার কি ব্যাকুলতা, কি সতর্ক প্রহরা!

শরৎ মহারাজের মাতা একদিন লাটুকে আদর করিয়া চচ্চড়ি রাঁধিয়া খাওয়ান। লাটু তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে বলিতেছেন, "আজ এমন চচ্চড়ি রসুই হয়েছে যে হামনে জীবনে খায় নি, মোশাই।"

ঠাকুর যেন তাঁহার সঙ্গী অবোধ বালকটি। ব্যথিত স্বরে তিনি বলিলেন, "বলিস্ কিরে। তুই একা সে-সব খেয়ে এলি। ইখানকার জন্যে কিছু আনলি নে?"

ঐ চচ্চড়ি পরের দিন আনানো হয়। সর্বপাশমুক্ত, সর্বলোভমুক্ত ঠাকুর তাহা ভোজন করেন। গুরুগতপ্রাণ শিষ্য সামান্য চচ্চড়িটুকু খাইতে গিয়াও ঠাকুরের কথা স্মরণে রাখুক, নিজের তৃপ্তির সহিত ঠাকুরের তৃপ্তির অন্বয় সাধন করুক, আত্মবৎ সেবার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝুক—ইহাই ছিল রামকৃষ্ণের চচ্চড়ি-ভক্ষণে উৎসাহের প্রকৃত মর্ম। শিষ্য গুরুকে যেমন আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন, গুরুও তেমনি তাঁহাকে দিয়াছিলেন সর্বাত্মক আশ্রয়।

যদু মল্লিকের বাড়িতে সেদিন সিংহবাহিনীর পূজা হইতেছে। সংবাদ পাইয়া রামকৃষ্ণ লাটু প্রভৃতি ভক্তদের নিয়া দেবীকে প্রণাম করিতে গেলেন। মল্লিক মহাশয় তখন মহাব্যস্ত, এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছেন, ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করা তো দূরের কথা, একবার বসিতেও বলিলেন না।

রামকৃষ্ণ দেবী প্রতিমা প্রণাম করিয়া সঙ্গী ভক্ত-শিষ্যদের নিয়া বাহিরে আসিলেন। লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা এবার রামকৃষ্ণকে চাপিয়া ধরিলেন। শুধু শুধু অপমানিত হইবার জন্য এই অভদ্র বড়লোকের বাড়িতে কেন তিনি আসেন?

ঠাকুর স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁরে, তোরা কি তবে বাড়ির

বড়লোক কর্তাকে দেখতে গিয়েছিলি যে, বসতে বলে নি বলে অভিমান করছিস্। সাধু হতে চাইলে অভিমান ত্যাগ করতে হবে, কেউ মানলো কি না মানলো, এসব চলবে না, বুঝলি ?"

এমনি করিয়াই ঠাকুর লাটু প্রভৃতি ভক্তদের নিয়া অহমিকার অঙ্কুর সযত্নে দিনের পর দিন উৎপাটন করিতেন।

গিরিশ ঘোষ একদিন মদ্যপানের পর মত্ত অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ঠাকুর লাটুকে কহিলেন, "ওরে, যা তো গাড়িতে গিরিশবাবু কিছু ফেলে এসেছে কিনা ছাখ্।"

লাটু গাড়ির ভিতরে উঁকি মারিয়া তো অবাক্। তারপর সেখান হইতে একটি মদের বোতল ও গ্লাস উদ্ধার করিয়া আনিলেন। উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল।

ঠাকুর প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ওগুলো রেখে আয়। শেষ খোঁয়াড়ীর কাজে লাগবে।"

উদ্দাম গিরিশবাবুকে রামকৃষ্ণ কিভাবে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। ভক্তের জন্য এই উদার আশ্রিতবাৎসল্য ও সহনশীলতা দেখিয়া লাটুর চোখে সেদিন অশ্রুধারা নামিয়া আসে।

লাটু প্রথম বয়সে খুব ব্যায়াম চর্চা করিয়াছিলেন, কুস্তী কসরতও কম করিতেন না। স্বভাবতঃই সে সময়ে তিনি বেশী পরিমাণে আহার করিতে পারিতেন এবং ইহাতে প্রচুর উৎসাহও তাঁহার ছিল।

"ওরে, কখনো ভুলিসনে, তপস্যা করতে গেলে কম খেতে হয়"—ঠাকুরের এই সতর্কবাণী লাটুর মর্মমূলে গিয়া প্রবিষ্ট হয় এবং তাঁহার এই একদিনের কথায় তিনি আহারের কৃচ্ছ্র সাধনে রত হন।

ক্লান্ত হইয়া প্রথম প্রহর রাত্রে একদিন তিনি ঘুমাইতেছিলেন। ঠাকুর তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "সে কিরে, এত ঘুমুলে সাধনভজন করবি কখন ? লাটু গুরুবাক্যের তাৎপর্য তখনি বুঝিলেন, নিজেকে করিলেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। এখন হইতে রাত্রির অধিকাংশ সময়ই ধ্যান-জপে কাটাইতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই নিয়ম পালন করিয়া গিয়াছেন।

লাটু অন্তরঙ্গভাবে ঠাকুরের সেবা করিতেন আর দিন রাতের অবসর সময়টা কাটাইতেন সাধনকর্মে। পরে ঠাকুর এই শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তকে শ্রীমা সারদামণির সেবায়ও নিয়োজিত করেন।

মায়ের সম্বন্ধে কথা উঠিলে ভক্তির আবেগে লাটুর কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইত। তিনি বলিতেন, "মা'র মতো বৈরাগ্য হামনে ত দেখি নি! আউর তাঁর দয়ার কি তুলনা আছে? মায়ের কৃপায় আমার জীওন সার্থক হয়েছে। হামি তাঁকে পেয়েছি।"

গুরুভাইরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন, মায়ের পরিপূর্ণ আশীর্বাদ তাঁহার ভক্ত সন্তান লাটুর উপর বর্ষিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ-সর্বস্ব ছিলেন লাটু মহারাজ। গুরু-দর্শন, গুরুপরিচর্যা, গুরুদত্ত সাধনা তাঁহার জীবনে আবর্তিত হইত পবিত্র অক্ষমালার মতো।

প্রতিদিন ভোরবেলায় শয্যাত্যাগের আগে ঠাকুরের দিব্য আনন-খানি না দেখিয়া তিনি কার্যারম্ভ করিতেন না। একদিন ঠাকুর বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, লাটুও তাঁহার প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। দুই হাতে চক্ষু আবরিত করিয়া তিনি শুধু চেঁচাইতেছেন "মোশাই, আপনি কুথায়!"

লাটু যতই চীৎকার করিয়া ডাকেন পরমহংসদেব দূর হইতে ততই ব্যস্ত হইয়া উত্তর দেন, "যাচ্ছি রে যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি।"

যতক্ষণ ঠাকুর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত না হইলেন লাটু তাঁহার চক্ষু হইতে হাতদুটি অপসারিত করিলেন না।

এক ভক্ত সেদিন লাটুকে একজোড়া নূতন চটি দিয়াছিলেন। পর দিনই উহার একপাটি কোথায় হারাইয়া যায়। রামকৃষ্ণ এ সংবাদ শুনিয়া বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই নিজে বাগানে উপস্থিত হইয়া শুরু করিলেন ঐ চটির সন্ধান।

লাটু ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসেন। কাতর স্বরে কহেন,

"ওখানে কি খুঁজছেন, মোশাই? আপুনাকে হামার চটি খুঁজে বেড়াতে হোবে না, আমার যে পাপ হবে।"

ঠাকুর চটিজুতা খুঁজিতেছেন এবং পরিতাপের সুরে বলিতেছেন, "তাই তো রে। নতুন জুতো জোড়া তোর ভোগে এলো না!"

লাটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিয়া ওঠেন, "হামার জুতোর জন্য আপুনি কষ্টো কচ্ছেন, হামার আজ দিনটাই খারাপ যাবে।"

ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া উত্তর দিলেন, "ওরে, দিন কি ওতে খারাপ যায়? যেদিন ভগবানের নাম নেওয়া হয় না সেইদিনই খারাপ যায়!"

ঠাকুরের এই অপূর্ব ভক্তবাৎসল্যের রসে সাধক লাটু মহারাজ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। এই সৌভাগ্যের তুলনা কোথায়?

লাটু গুরু-কৃপায় জপসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার অন্তর সত্তায় নিরন্তর নাম-সাধনা চলিত। উত্তরকালে তিনি বলিতেন, "নাম করতে করতে নাম মনের মাঝে আপন বাসা বেঁধে নেয়।··· একমাত্র নামের শক্তিতে মনের ধর্ম পাল্টে যায়, মনের সঙ্কল্প-বিকল্প সব বন্ধ হয়ে যায়। মনে যখন ঢেউ থাকে না, তখনই মন 'নিসপিওর' হয়। তখনই ভগবানের শক্তি নামতে থাকে, সৎ বস্তুকে চেনা যায়।"

নিরন্তর নাম-জপের অভ্যাস চালাইয়াই প্রথম জীবনে লাটু মহারাজ কামজয়ের সাধনায় জয়ী হইয়াছিলেন, এই কথা উত্তর-কালে তিনি সাধন প্রয়াসীদের প্রায়ই বলিতেন।

ব্রহ্মচারী সাধক লাটুকে ডাকিয়া রামকৃষ্ণ সেদিন বলিলেন, 'ছাখ্, নামের সঙ্গে নামীর ধ্যান করবি।'

ভাব-ভেদে ইষ্টভেদ হইয়া থাকে। লাটু নিজ ধ্যেয়ের আসনে কাহাকে বসাইবেন? সম্মুখে সদ্‌গুরুর প্রেম-ঘন বিগ্রহ বর্তমান। প্রধানত তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই লাটুর কঠোর তপস্যা এযাবৎ অগ্রসর হইয়াছে। রামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে সেদিন তরুণ সাধকের

সকল সমস্যা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়া যায়। ভাবগ্রাহী ঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন, "ছাখ, ধ্যান করতে বসবার আগে ইখান্‌কে (আপনার বক্ষে অঙ্গুলি সঙ্কেতে) একবার ভেবে নিবি। এঁকে ভাবলেই তাঁকে মনে পড়ে যাবে।"

ঠাকুরের সমাধিমগ্ন অবস্থায় দিব্য জ্যোতির্ময় রূপটি লাটুর ইষ্টের বেদীতে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

লাটু মহারাজ বলিতেন, "গুরু—সচ্চিদানন্দ। সাধনপথে গুরু করা ভাল। তুমি ভগবান্‌কেও গুরু ক'রে নিতে পার—বাকী ভগবানের ভক্তদেরই গুরু করা ভাল। কেন জান? তোমার যখন পিয়াস লাগে—তুমি কি করো? কাছাকাছি যেখানে পানি মিলবে সেখানকেই যাও তো?"

সর্বজ্ঞ আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের চালনা করিতেন নিজ নিজ প্রবণতা ও প্রস্তুতি অনুযায়ী। লাটুর ভক্তি ও ভাবময়তা গোড়ার দিকে গুরু সেবা ও নাম-জপ ধরিয়াই অগ্রসর হয়। ঠাকুর তাঁহাকে সংকীর্তনের রসেও রসায়িত করিয়া নিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কীর্তন-অনুষ্ঠানের সময় ঠাকুর মাঝে মাঝে লাটু ও অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করিতেন। এই শক্তি সঞ্চারের কালে লাটুর ভাব-তরঙ্গ উদ্বেলন হইয়া উঠিত। তাঁহার অশ্রুপাত, সর্বাঙ্গের কম্পন, উদ্দণ্ড নৃত্য ও হুঙ্কার এক অপার্থিব ভাব-ঘন পরিবেশের সৃষ্টি করিত। লাটুর ভাবময়তাকে ঠাকুর যেমন প্রশংসা করিতেন। তেমনি আবার উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য সতর্কবাণীও উচ্চারণ করিতেন। তরুণ সাধককে বলিতেন, "ভাব যেন মাতা হাতী। ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে, সব তোলপাড় করতে থাকে। কিন্তু ওরে, বেশী নাচুনি-কাঁদুনি ভাল নয়। ওতে সময় সময় ভাব ভঙ্গ হয়ে যায়। ভাবকে গোপন করতে না পারলে তা অন্তর্মুখী হতে চায় না।"

গুরুর এই নির্দেশের পরে ভাবাবেশের পরবর্তী স্তরে লাটুর মধ্যে ধীরে ধীরে অপূর্ব সংযম ও প্রশান্তি আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণের নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, "আমি সারেও আছি, মাতেও আছি।" নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও রূপ-ব্রহ্ম তাঁহার নিকট একাকার। সাধন পদ্ধতির দিক দিয়াও ঠাকুর সর্ব ভাবধারার সমন্বয়কে উৎসাহিত করিতেন। লাটু প্রভৃতি ভক্তদের তিনি তাহাদের নিজ নিজ মানসিক গঠনভঙ্গী ও প্রস্তুতি অনুযায়ী চালিত করিতেন। আবার বিভিন্ন সাধনধারার সমন্বয় দেখানোর জন্য, এই সমন্বয়ের রসাস্বাদন করাইবার জন্য, বলিতেন, "ওরে তোরা একঘেঁয়ে হোস্ নি। একঘেঁয়ে ইখানকার ভাব নয়। ইখানে ঝোলেও খাবো, ঝালেও খাবো, অম্বলেও খাবো—এই ভাব।"

লাটু মহারাজ ঠাকুরের সাধন সমন্বয়ের মর্ম বুঝিয়াছিলেন, তাই ভাব ও জ্ঞান তাঁহার জীবনে সমভাবে স্ফুরিত হইয়া উঠে। গুরু-কৃপা এবং তাঁহার নিজস্ব সুকঠোর ব্রহ্মচর্য ও সাধনভজন লাটু মহারাজের সম্মুখে ধীরে ধীরে পরমবোধের ইন্দ্রিয়াতীত দ্বার খুলিয়া দেয়।

এই মহাসাধকের তপস্যার বিষয়ে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, "কি ঠাকুরের সঙ্গে, কি তাঁহার দেহত্যাগের পর, তিনি আজীবন প্রায় সারা রাত্রি জাগিয়া ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন এবং দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন।...এইরূপে সারা রাত্রি ধ্যান-ধারণায় রত থাকিলেও তিনি নিয়মিতভাবেই ঠাকুরের সেবা করিয়া যাইতেন।"[১]

সারদানন্দজী একান্তচারী লাটু মহারাজের সাধন সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ কাহিনী ভক্তদের বলিতেন। ঠাকুরের তখন দেহান্ত ঘটিয়াছে। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সবাই নিজ নিজ সাধনায় রত। এই সময়ে গুরু-ভ্রাতাদের মধ্যে লাটুকে কেন্দ্র করিয়া একদিন কৌতুককর ঘটনা সংঘটিত হয়। লাটু দিবাভাগে নিদ্রা যান এবং রাত্রেও কাহারো সঙ্গে বসিয়া তেমন ধ্যান-জপ করিতে তাঁহাকে দেখা যায় না। গুরু-ভ্রাতা শরৎ মহারাজ প্রায়ই গভীর রাত্রে শায়িত থাকা কালে ঠক্‌ঠক্ শব্দ শুনিতে পান। প্রথমটায় সকলে মনে করেন যে

১ সারদানন্দ : লীলাপ্রসঙ্গ

ঘরে ইঁদুরের উপদ্রব বাড়িয়াছে। শেষটায় কিন্তু লাটুর উপরই সন্দেহ ঘনীভূত হয়।

শরৎ মহারাজ ও অপর সবাই সেদিন মধ্য-রাত্রিতে নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া আছেন। সবাইকে ঘুমন্ত মনে করিয়া লাটু মহারাজ চুপি চুপি নাম জপের মালা হাতে নিয়া সাধনে বসিলেন।

জপের মালা আবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুভাইরা একযোগে চড়াও হন, "তবে রে শালা," বলিয়া লাটু মহারাজকে জড়াইয়া ধরেন। বমাল সহ চোর ধরা পড়াতে মধ্যরাত্রে মঠে এক হৈচৈ পড়িয়া গেল।[১]

এমনই ছিল লাটু মহারাজের তপস্যার সুমধুর গোপনতা ও অন্তর্লীন ভঙ্গিমা।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকৃষ্ণ জপ-ধ্যান-নিরত লাটুর সমগ্র সত্তায় একটি প্রচণ্ড নাড়া দিয়া দিলেন। ব্যাপারটি রাখাল মহারাজ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলিয়াছেন, "একদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে ঠাকুরের আদেশে লাটু আমাদের সকলকে ডেকে তুলল। ঠাকুর আমাদের বললেন, 'তোরা আজ খুব জপ করতে থাক্।'

"তারপর তিনি 'জাগো মা কুল-কুণ্ডলিনী' গানখানি বেড়াতে বেড়াতে গাইতে লাগলেন। হঠাৎ কি জানি দেহটা কেঁপে উঠলো আর লেটো উহুঁ উহুঁ ক'রে চীৎকার ক'রে উঠলো। ঠাকুর তার কাঁধ দুটো চেপে ধরে বললেন, ঠিক বসে থাকবি। আসন থেকে উঠতে পাবি নি!'

"কিছুক্ষণ পরে লেটো বেহুঁশ হয়ে পড়লো। ঠাকুর তখনো সেই গান গেয়ে তাঁর শক্তি সঞ্চারিত ক'রে দিচ্ছিলেন।"

১ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়: লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা
মহেন্দ্রনাথ দত্ত: তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান।

লাটু মহারাজ তখন কৃচ্ছ্র ও তপশ্চর্যায় রত। নিজের অভীষ্ট সাধনে দিনের পর দিন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। একদিন তিনি শিব মন্দিরে ধ্যানমগ্ন—অচৈতন্য-প্রায় হইয়া আছেন। কৃপালু রামকৃষ্ণ ধ্যানী শিষ্যের অবস্থাটি সম্যক্ অনুধাবন করিলেন। একটি হাতপাখা ও এক গ্লাস জল নিয়া ঠাকুর তখনি লাটুর নিকট গিয়া উপস্থিত। শিষ্যের ঘর্মাক্ত কম্পমান দেহে ব্যজন করিতে করিতে কহিলেন, "ওরে বেলা যে গড়িয়ে এল, সন্ধ্যেটন্ধ্যে সাজাবি কখন ?"

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে লাটুর লজ্জার সীমা রহিল না। আপত্তি জানাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আপুনি একি করছেন ? এতে যে হামার অকল্যাণ হোবে। কুথায় আপুনাকে হামি সেবা করবে, না—আপুনি হামার জন্য কষ্ট করছেন।"

স্মিতহাস্যে ভক্ত-বৎসল ঠাকুর উত্তরে কহিলেন, "ওরে তোর কে সেবা করছে ? তোর ভেতরে যে উনি (শিবলিঙ্গকে দেখাইয়া) এসেছিলেন। তাঁর সেবা করবো না, সেকি কথারে ! এত গরমে ওঁর যে কষ্ট হচ্ছিল।"

কি ঘটিয়াছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে লাটু বলিলেন, "হামি তো কুছু জানে না, বাকী তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সামনে একটা জ্যোতি দেখতে পেলুম, সব ঘরখানা ভরে গেল, আর কুছু হামার মনে নেই।"

একদিন কি এক কারণে লাটু তাঁহার ধ্যানে মনটি নিবিষ্ট করিতে পারিতেছেন না। রামকৃষ্ণকে বিপদের কথা নিবেদন করিলেন। ঠাকুরের নানা প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইলেন, "আজ মন্দিরে যাবার আগে মনে হয়েছিল—মা যদি বর দিতে আসেন তবে হামি কি চাইবো ?"

গুরু তখনি ব্যগ্র হইয়া শিষ্যকে সতর্ক করিয়া দিলেন, ঐ হয়েছে রে ! কামনা আশ্রয় করলে কখনো কি জপ-ধ্যানে মন বসে ? ওসব করবি নি। ধ্যানে বসে বর চাইতে নেই।"

দেব-দেবীর দর্শন লাভ হইলে সাধক সাধারণত বর প্রার্থনা

করিয়া নেয়, এই কথাই সরল লাটুর জানা আছে। এবার তাঁহার সর্ব সমস্যার সমাধান করিয়া ঠাকুর নির্দেশ দিলেন, "নারে না, বর চাইতে নেই। একান্তই মা যদি তোকে বর নিতে বলেন, তবে বলবি,—মা আমি ধন-জন দেহসুখ চাইনে, আমার কেবল শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

এমনই করিয়া সাধনের প্রতি স্তরে, প্রতি গ্রন্থিতে কৃপাসিন্ধু ঠাকুর আশ্রিতদের সযত্নে রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার অধ্যাত্ম-সন্তানদের সাধনজীবনের কোনো রন্ধ্রপথেই তাঁহার সদাজাগ্রত দৃষ্টিকে এড়াইয়া অবিদ্যার প্রবেশ সম্ভব ছিল না।

লাটুর পরবর্তী সাধনজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্বামী অদ্বৈতানন্দ বর্ণনা করিয়াছেন। একদিন ধ্যানতন্ময় অবস্থায় লাটু অচৈতন্য হইয়া পড়েন। মুখ থুবড়িয়া মাটিতে পড়িয়া তিনি গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে থাকেন।

এ সংবাদ পাওয়া মাত্র ঠাকুর সেখানে গিয়া উপস্থিত। তিনি তাঁহাকে চিত করিয়া শোয়াইয়া দিলেন আর তাঁহার বুকে নিজের হাঁটু দিয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে লাটুর সংবিৎ ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই বুঝি আজ মা কালীকে দেখেছিস্? চুপ কর্ শালা। চুপ কর্। শুনতে পেলে এখনই একটা হৈচৈ পড়ে যাবে!" স্বভাব-শান্ত সাধক লাটু চুপ করিয়া গেলেন। ইহার পর হইতে ধ্যানকালে গুরুভাইরা তাঁহার রূপান্তরের নানা বিশিষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাইতেন।

গুরু কৃপায় ও নিজের কঠোর-তপস্যার ফলে লাটুর নানা দিব্য দর্শন হইতে থাকে। ধ্যানে তিনি রামচন্দ্র, মহাবীরজী, বিশ্বনাথ, মা-কালী, কিষণজী ও যোগমায়ার দর্শন প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন ঐশ প্রকাশের, বিভিন্ন লীলামূর্তির আনন্দধারায় স্নাত হইয়া সাধক লাটু তাঁহার চরমসিদ্ধির দিকে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকেন।

একদিন নিশীথ রাত্রে রামকৃষ্ণ লাটুকে বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসনে ধ্যান করিতে পাঠাইলেন। দৃঢ় ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, নির্ভীক

ও শক্তিধর সাধক ছাড়া ঠাকুর পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সহসা কাহাকেও বসিতে দিতেন না।

সিদ্ধ আসনে গিয়া লাটু মহারাজ উপবেশন করেন বটে, কিন্তু ঠাকুরের সিদ্ধি-পূত এই পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিবার পূর্বক্ষণে এই বীর সাধকের অন্তর কাঁপিয়া উঠে।

ধ্যানে দর্শনাদির পরে লাটু এক বিপদে পতিত হন। কোনোমতেই আসন ছাড়িয়া তিনি উঠিতে পারিতেছেন না। পঞ্চমুণ্ডী আসনের চারিদিকে লাটু বীভৎস ভীতিপ্রদ দৃশ্যাদি দেখিতেছেন, একেবারে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। সর্বজ্ঞ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অজানা কিছুই নাই। তিনি নিকটেই ছিলেন, এবার সঙ্কটমোচনের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন। উচ্চকণ্ঠে অভয় জানাইয়া বলিলেন, "কিরে ভয় পেয়েছিস নাকি? এত ভয় কিসের? আয় আয়, আমার সঙ্গে চলে আয়।"

আর একদিনের কথা। বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর সিদ্ধাসনে লাটু মধ্যরাত্রে ধ্যান শুরু করিয়াছেন। একনিষ্ঠ সাধকের নিশ্চল নিস্পন্দ দেহে বাহ্য চৈতন্যের চিহ্নমাত্র নাই। ব্রাহ্মমুহূর্ত উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তখনো লাটু ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় বেলতলায় বসিয়া আছেন। প্রিয় শিষ্যকে ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘরে দেখিতে না পাইয়া ঠাকুর বেলতলার দিকে অসগ্রর হইলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন, লাটু ধ্যানাবিষ্ট, বাহ্যজ্ঞান নাই। বেলতলার অদূরে দুইটি কুকুর স্থির নিষ্পলক নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঠাকুর কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, ক্রমে সাধক চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। সম্মুখে করুণাঘন সদ্‌গুরুর দিব্যমূর্তি। আনন্দাপ্লুত লাটু ঠাকুরের পাদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন।

ঘরে ফিরিবার পথে রামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওরে তোর মহা-সৌভাগ্য।" মা তোর রক্ষার জন্য দুটো ভৈরবকে পাঠিয়েছিলেন। কুকুরের বেশ ধরে দুটো ভৈরব তোকে এতক্ষণ পাহারা দিচ্ছিল, দেখলুম।"

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের চিহ্নিত ভক্তেরা তখন একে একে আসিয়া জুটিয়াছেন। প্রায় দিনরাত্র ঠাকুরের নির্দেশে শিষ্যদের নাম-জপ, কীর্তন ও ধ্যান চলিতেছে। গৃহী-শিষ্যের দলও ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসিয়া ধীরে ধীরে হইতেছেন রূপান্তরিত। এসময়ে একদিন ঠাকুর সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "নেটো চড়েই রয়েছে। ক্রমে লীন হবার যো!"

যুবক নরেন্দ্রনাথ (উত্তরকালের বিবেকানন্দ) তখন মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন। দ্বিধা ও সংশয়ে তখনো তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া আছে। তাই বুঝি সেদিন ধ্যানাবিষ্ট লাটুর ধ্যান ভাঙানোর জন্য রামকৃষ্ণ নরেনকেই তাঁহার কাছে পাঠাইলেন। নিকটেই রহিয়াছে একটি বড় গাছ। লাঠি দিয়া এই গাছের গুঁড়িতে নরেন বার বার আঘাত করিতে লাগিলেন। এই শব্দে লাটুর ধ্যান টুটিয়া যাক, ইহাই তিনি চান। কিন্তু লাটুর কোন হুঁশই নাই।

এমন সময় ঠাকুর ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "থাক, ওকে আর বিরক্ত করিস নি।"

নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "ওর হুঁশ থাকলে তো বিরক্ত করবো। একেবারেই যে বেহুঁশ।" শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "এরকম বেহুঁশ না হতে পারলে কি ধ্যান জমেরে।"

অন্যান্য দিন পরমহংসদেব লাটুকে দিয়াই নরেনের খোঁজখবর করাইতেন। আজ ধ্যান-বিভোর লাটুর অবস্থাটি দেখানোর জন্যই বুঝি তাঁহার সন্নিধানে নরেনকে পাঠাইলেন।

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালেই স্পর্শমণি ঠাকুরের স্পর্শ-প্রভাবে লাটু এক উচ্চতর অধ্যাত্ম-স্তরে আরূঢ় হন। তাঁহার ধ্যানতন্ময়তা এমন বাড়িয়া যায় যে এসময়ে প্রায়ই, ঠাকুর নিজের হাঁটু দিয়া শিষ্যের বক্ষ ঘর্ষণ করিতেন, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতেন।

সদ্‌গুরু রামকৃষ্ণের নিকট হইতে লাটু যে সাধনা ও সিদ্ধি লাভ

করিয়াছিলেন, সারা জীবন তাহা ঠাকুরের নাম করিয়া, ঠাকুরের উপদেশ হিসাবে, মুমুক্ষুদের মধ্যে তিনি বিলাইয়া গিয়াছেন।

সাকার ও নিরাকার ধ্যান সম্বন্ধে লাটু মহারাজ বলিতেন, "ভক্ত নামরূপ নিয়ে ধ্যেন করে, আর জ্ঞানী জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ নিয়ে ধ্যেন করে। বাকী যা নিয়েই ধ্যেন করনা কেনো, শেষে দুজনাই এক জায়গায় পৌঁছায়। জানবে ধ্যেন জমলে নামও ছুটে যায়। তখন একটা রেশ থাকে। বাকী, সেটা যে কি তা মুখে বলতে পারা যায় না। ধ্যেন জমলেই অখণ্ডের বোধ এসে যায়। এ বেপার মুখে বলা যায় না। সেই বোধে দেহজ্ঞান থাকে না, মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প কুছু থাকে না, বুদ্ধিভি চলে যায়, তখন শুধু বোধ থাকে।"

আপন অধ্যাত্ম জীবনের অভিজ্ঞতার কথা লাটু মহারাজ তাঁহার প্রজ্ঞা-প্রোজ্জ্বল সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন,—"জানো, সাধনকালে জ্যোতি-ট্যোতি দেখা কুছু নয়—ওসব দেখলে শুধু বিশ্বাস দৃঢ় হয়। যখন দেহবোধ চলে যায় আর অন্তর শুদ্ধ, পবিত্র হয়, তখনই বুঝতে পারা যায় যে, জ্যোতির পারে এক মুল্লুক আছে—যে মুল্লুকের খবর বুদ্ধি-বিচার দিয়ে মেলে না। একদিন তো কাশীপুরে ওনার (শ্রীরামকৃষ্ণের) মাথায় হাত বুলুচ্ছিলুম ; তখন তো হামার সামনেই সেই মুল্লুক খুলে গেলো। সেই মুল্লুকে যা দেখেছি তা চোখ ধরতে পারে নি, যা আস্বাদন করেছি তা জিব নিতে পারে নি। কিন্তু সব কুছু হামি অনুভব করেছি।"

কাশীপুরের বাগানে রামকৃষ্ণের সেবায় ভক্তগণ প্রাণ-মন ঢালিয়া দেন। নিরন্তর গুরু পরিচর্যার মধ্যেই তাঁহারা অধ্যাত্ম সাধনার মূল ধারাটির সন্ধান প্রাপ্ত হন। এ সময়ে সবাই ঠাকুরকে নিয়াই দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁহাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার অবসর বড় একটা মিলিত না।

কেউ কেউ এ সময়ে মন্তব্য করেন, "তাই তো ভজনের সুযোগ আর তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। যারা সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এসে তপস্যা শুরু করেছে, তাদের দশা কি হবে?"

লাটু মহারাজ উত্তেজিত হইয়া বলেন, "ত্যাখো, আস্‌লি উপাসনা হচ্ছে তাঁর সেবায়। তিনি (ঠাকুর) হামাদের বলতেন, 'উপাসনা করবার সময় ভাবতে হয় যেন তিনি (ইষ্টদেব) সামনে রয়েছেন আর তুমি তাঁর পা ধুয়ে দিচ্ছো, তাঁকে নাওয়াচ্ছো, তাঁকে খাওয়াচ্ছো, তাঁকে সাজাচ্ছো গোছাচ্ছো, হৃদয়ে বসাচ্ছো, যেন ফুল দিয়ে পূজা করছো'—হামাদের তো সেখানে ঠাকুরের সেবায় ভাই হোত।"

গুরু-অন্ত প্রাণ-সাধকের নয়নযুগল এই সেবাধর্মের মাহাত্ম্য-কীর্তন করিতে করিতে দিব্য জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত।

একদিন রামকৃষ্ণ বাগানে বেড়াইতে নামিয়াছেন। পরমভক্ত গিরিশের স্তুতিতে তাঁহার মধ্যে দেখা গেল দিব্য ভাবাবেশ।

"তোমাদের চৈতন্য হোক্" বলিয়া কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন সম্মুখস্থ ভক্তদের আশীর্বাদ করিলেন। পুণ্যময় দেহের স্পর্শে সবাই ধন্য হইল। লাটু কিন্তু সেই সময়ে সোরগোল শুনিয়া এবং ভক্তদের আহ্বান পাইয়াও ছুটিয়া আসেন নাই। কল্পতরুরূপী ঠাকুরের কাছে সেদিন তিনি কেন আশিস্‌-প্রার্থী হন নাই, এ প্রশ্নের উত্তরে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "তিনি তো আশীর্বাদ দিয়ে হামাদের ভরপুর ক'রে দিয়েছেন। আবার হামি কি চাইবো তাঁর কাছে?"

অহৈতুক গুরুকৃপার রসধারা যাঁহার সারা সত্তাকে অভিসিঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, প্রাণ-সর্বস্ব সেই ঠাকুরের নিকট লাটুর নূতন করিয়া আর কি-ই বা চাহিবার ছিল?

লাটুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাঁহাকে সর্বসাধারণ এবং ঘনিষ্ঠ মহলের কাছে 'অদ্ভুত' রূপেই চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাই তাঁহার সন্ন্যাস নাম হইয়াছিল অদ্ভুতানন্দ স্বামী। বহুর মধ্যে লাটু মহারাজ ছিলেন একক, সাধারণের মধ্যে ছিলেন অসাধারণ—এবং রহস্যময়!

দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকৃষ্ণ শুদ্ধসত্ত্ব কিশোর লাটুকে সারদা-

মণির সম্মুখে উপস্থিত করেন। সারদামণির নানা গৃহকর্মে সহায়তা করিয়া ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া লাটু তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে চিহ্নিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা-সারদামণির স্নেহরসে যেমন লাটু বাধত হন, তেমনি উভয়ের সঙ্গে এক স্বাভাবিক অপত্য-সম্বন্ধের যোগেও নিজেকে তিনি যুক্ত করিয়া নেন। মমত্ব ও নির্ভরতার দিক দিয়া এ যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন।

বরানগরের মঠে একদিন ভোরবেলায় শশী মহারাজ দেখিতে পান যে ঠাকুরের হালুয়াভোগ রান্নার কড়াইটি অপরিচ্ছন্ন রহিয়াছে। গত রাত্রে লাটু মহারাজ তাহাতে ছোলা সিদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহা পরিষ্কার করিতে ভুল হইয়াছে। ঠাকুরের সেবার ত্রুটি হইলে একান্ত ভক্ত শশী মহারাজের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া যাইত। তিনি লাটু মহারাজকে গালি দিতে লাগিলেন।

তিরস্কারের উত্তরে বালকের মতো লাটু মহারাজ ভয় দেখাইয়া বলিলেন, "তোমার বাবা-মা আর হামার বাবা-মা কি আলাদা আছে? হামি মাকে আজই পত্র দিব।"

ঠাকুরের লোকান্তরের পর শ্রীমার সঙ্গে লাটু মহারাজ বৃন্দাবন ধামে তীর্থ ভ্রমণে যান। খামখেয়ালী সাধক পুত্রকে নিয়া এই সময়ে মার ঝামেলা কম পোহাইতে হইত না। আহারে বসিয়া লাটু সমস্ত খাবার বানরদের বিলাইয়া দিতেন। আবার অসময়ে আসিয়া মা ও তাঁহার সঙ্গিনীদের কাছে নিজের খাবার চাহিতেন, তাঁহাদের বিব্রত করিতেন। যমুনার তীরে কখনো বা সারা দিনমান ঘুরিয়া আসিয়া বালকবৎ লাটু মায়ের নিকট আব্দার করিতেন, "বড় খিদে পেয়েছে মা, জলদি হামায় কিছু খাবার দিন।"

"আমার লাটুর সবই অদ্ভুত", এই মন্তব্য করিয়া শ্রীমা তাঁহার সমস্ত স্নেহের দাবি স্মিতহাস্যে মানিয়া নিতেন।

শ্রীমার উপর লাটু মহারাজের শাসনেরও এক মনোরম বিবরণ আছে। বলরামবাবুর ভবনে মা সেদিন আসিয়াছেন। বহির্বাটীতে

লাটু তখন অবস্থান করিতেছেন। সাগ্রহে তাড়াতাড়ি এই খেয়ালী পুত্রের সঙ্গে তিনি দেখা করিতে আসিলেন।

লাটু বাড়ির অভ্যন্তরে মেয়ে মহলে ইচ্ছা করিয়াই এতক্ষণ যান নাই। এবার মা নিজেই বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ জুড়িলেন—"কি বাবা লাটু, কেমন আছ?"

লাটু বিপদে পড়িলেন। উষ্মা-জড়িত কণ্ঠে মাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি ভদ্দর ঘরের মেইয়া, সদর বাটীতে তুমি কেন? ভেতরে যাও। হামি তো তোমার গোলাম আছি! হামি সেখানে গিয়ে তোমার সাথে দেখা করছি।'

অদ্ভুতানন্দের অদ্ভুত খেয়াল সারদাদেবীর জানা ছিল। তাই হাসিতে হাসিতে তখনি লাটুর অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি চলিয়া যান। এবার অন্দরমহলে বাড়ির ভিতরে গিয়া মায়ের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া লাটু যুক্তকরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।[১]

বরানগর মঠে নরেন্দ্রনাথ লাটুকে বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাস নিবার নির্দেশ দেন। এই হোমের পূর্বে পিণ্ডদান করিতে হয়। লাটু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক ভঙ্গীতে পিতৃ-পুরুষকে আহ্বান করিলেন। তারপর সরল অনাড়ম্বর গ্রাম্য ভাষায় কহিতে লাগিলেন, "এ মেরা বাপজী, হিয়া আয়, হিয়া বৈঠ্। ইয়ে পূজা লে, পিণ্ড লে, পানি লে।"

অদ্ভুত চরিত্র, অদ্ভুত ভাবময়তা ও ধ্যানানুরাগের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ লাটুর নামকরণ করিলেন অদ্ভুতানন্দ। সন্ন্যাস গ্রহণের পর লাটু মহারাজের ত্যাগ বৈরাগ্য আরও বাড়িয়া যায়। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপদেশটি অধিকতর নিষ্ঠার সহিত আঁকড়াইয়া ধরেন।

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা

মুক্ত বিহঙ্গের মতো স্বেচ্ছাবিহার করিতেন লাটু মহারাজ, আর গঙ্গার তীরে বসিয়া করিতেন জপ-ধ্যান। বেশভূষা বা আহার্যের দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নাই—কঠোরতপা তপস্বীর একাগ্র সাধনসত্তার সম্মুখে বিরাজিত শুধু তাঁহার ইষ্টদেব।

বলরাম মন্দিরে বা উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাপাখানায় আপন খেয়াল মতো কখনো কখনো কিছুদিন তিনি বাস করিতেন, আবার কোথায় হইতেন অদৃশ্য।

অর্থের প্রতি তাঁহার তীব্র বিতৃষ্ণা যেমন ছিল, চিরজীবন নারী সান্নিধ্য এড়াইয়া চলার ঝোঁকও ছিল তেমনই প্রবল।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে লাটু মহারাজ সেবার কাশ্মীরে বেড়াইতে গিয়াছেন। হাউস বোটে সকলে উঠিতে যাইবেন, লাটু অকস্মাৎ লাফাইয়া মাটিতে পড়িলেন। বোটের মাঝি সপরিবারে এককোণে বাস করে। নৌকায় নারীরা রহিয়াছে দেখিয়া লাটু বাঁকিয়া বসিলেন, এই হাউস বোটে তিনি কিছুতেই উঠিবেন না। স্বামীজী তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তবে নৌকায় তোলেন।

একান্তচারী, আত্মগোপন প্রয়াসী লাটু মহারাজ কোনো অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করেন নাই। উচিত-বক্তারূপেই সর্বত্র তিনি পরিচিত ছিলেন।

একবার এক প্রবীণ গৃহী ভক্ত বরানগর মঠে আসেন এবং মাতব্বরী চালে তরুণ সন্ন্যাসীদিগকে আঘাত দিয়া কথা বলিতে থাকেন। বয়সে বড় বলিয়া সকলে ইঁহার অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইতেছেন। লাটু মহারাজের কাছে আসিয়া ভদ্রলোকটি তাঁহার বৈরাগ্য-প্রবণতাকেও উপহাস করিতে ছাড়িলেন না।

এক মুহূর্তে লাটু জ্বলিয়া উঠিলেন। সরোষে কহিলেন, "আঁশ-চুপড়ীর গন্ধ না হলে মেছোনীদের ঘুম হয় না, শুনেছি। আপনারও যে সেই অবস্থা! আপুনি ত্যাগের পথে না এসে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা কি বুঝবেন? জনক রাজার কথা বলছেন, বাকী, জনক রাজা কি সবাই হোতে পারে?"

অভিভাবকত্ব-প্রয়াসী প্রবীণ ব্যক্তিটি লাটুর তিরস্কারে একেবারে চুপ্‌সাইয়া গেলেন।

বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে নিয়ম করেন যে ভোর চারটায় ঘণ্টা বাজানো হইবে এবং সবাই তখন ধ্যান-জপ শুরু করিবে। এ আদেশ জারীর পরদিনই দেখা গেল, লাটু মহারাজ তাঁহার কাপড়-গামছা নিয়া মঠ ত্যাগ করিতেছেন।

সবাই তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে লাটু বলেন, "হামি তোমার ওসব কানুন মানতে পারবো না। ঘড়ি ধরে হামার মন ধ্যেনে বসে যাবে না।"

স্বামীজী তাঁহাকে বুঝান, "নূতন সাধকদের জন্যই এই বিধি, লাটু, তোর জন্য এসব নয়।" অনেকক্ষণ পরে লাটু নিরস্ত হন।

আপ্তকাম, রামকৃষ্ণময়, এই ত্যাগী সন্ন্যাসীর নিজের মানসিক ও আধ্যাত্মিক গঠনের সহিত মঠ স্থাপনা ও কর্মানুষ্ঠানের সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে নাই। তাই মঠের গুরুভাইদের সহিত আত্মিক যোগ রাখিয়া লাটু নিভৃত ও নিজস্ব আবেষ্টনীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকিতেই ভালবাসিতেন।

অথচ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল চিরজাগ্রত। নরেন্দ্র যে ঠাকুরের চিহ্নিত শিষ্য ও প্রতিনিধি একথা তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন। তাই উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দের সংগঠন হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখিলেও লাটু মহারাজ গুরুভাইদের প্রতি ও মঠের প্রতি গভীর মমত্ব চিরদিন পোষণ করিয়া গিয়াছেন।

লাটু মহারাজ স্বেচ্ছামতো বিচরণ করেন, যত্রতত্র ভিক্ষা গ্রহণ করেন, ইহা অনেকের মনঃপূত নয়। এদিকে মঠের অধ্যক্ষ রাখাল মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি গোপনে কয়েকজন

ভক্তকে নিয়োজিত করেন, তাঁহারা যেন লাটু মহারাজকে বুঝাইয়া ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত করেন।

লাটু মহারাজ বুঝিলেন, তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তিতে মঠের সুনাম নষ্ট হইবে বলিয়া রাখাল মহারাজ আতঙ্কিত হইয়াছেন। আগত ভক্তদের তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ঠিকই তো, রাজাকে অনেক দিক ভেবে চলতে হয়। মঠের সুনাম তাকেই যে রক্ষে করতে হবে। তাই সে হামাকে এমন অনুরোধ জানিয়েছে তোমাদের মু দিয়ে।"

ইহার পর তিনি বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসীর অবশ্য করণীয় মাধুকরী বা ভিক্ষা-বৃত্তি ত্যাগ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁহার ভাবাবেগ ও উৎসাহ বশে বলিতেছিলেন, "ওরে দেখছিস্ কি? যা ক'রে গেলুম, পরে তার ফল বুঝতে পারবি। এর পরে দেখবি—লোকের পর লোক আসছে। তখন বুঝবি এই বিবেকানন্দটা কি ক'রে গেছে।"

তেজস্বী, উচিত-বক্তা, লাটু মহারাজ চট্ করিয়া উত্তর দিলেন, "ভাই, তুমি আর কি নোতুন করেছো? শঙ্কর বুদ্ধ এঁরা যা ক'রে গেছেন, তুমি তো তার উপর শুধু দাগা বুলিয়েছ। এর বেশী কুছু করেছ কি?"

উদারচেতা স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন, কথাটি অপ্রিয় হইলেও সত্য। উত্তরে কহিলেন, "ঠিক বলেছিস লেটো! ঠিক। শুধু দাগাই আমি বুলিয়েছি।"

একবার লাটু মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হন। কয়েকটি পণ্ডিত লাটু মহারাজকে প্রশ্ন করিতে গেলে, স্বামীজী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠেন, "আপনারা আগে আমায় প্রশ্ন করুন। আমি যদি সদুত্তর না দিতে পারি তবেই আমার এই প্রবীণ গুরুভ্রাতাকে বিরক্ত করবেন।"

বলা বাহুল্য, স্বামীজীকে ডিঙাইয়া লাটুর নিকট কাহাকেও পৌঁছিতে হইল না। দেশে ফিরিয়া আসিয়া লাটু মহারাজ সবাইকে

বলিলেন, "হাঁ, গুরুভাই হচ্ছে লোরেন, আমি যে শালা এক মুখ্যু, তা কাউকে জানতেই দিলে না।"

গুরুকৃপায় কাশীপুরে লাটু মহারাজের প্রথম সমাধির আস্বাদন লাভ হয়। ইহার পর তিনি মহাধাম জগন্নাথ পুরীতে গমন করেন। লাটু বলিতেন, "হামনে দারু-ব্রহ্মের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম—যে রূপ দেখে মহাপ্রভু চোখের জলে ভেসে যেতেন, হামাকে আপুনি তাই দেখান। এমনি শরণ নেবার পর তিনি হামার প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের আট বৎসর পর লাটু মহারাজের আবার একবার সমাধি হয়। এ কথাটি তিনি তাঁহার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, "হামার উপর তাঁর অশেষ কৃপা, তাই সাত-আট বছর মেহনতি করিয়ে তিনি ফিন্ সেই ওবস্থায় হামাকে তুলে দিলেন। একদিন গঙ্গাতীরে বসে ধ্যেন করছি, আকাশ-বাতাস ছেয়ে একটি জ্যোতি এলো, তার মাঝে অসংখ্য জ্যোতি, নিজেকে হারিয়ে ফেল্লুম। বাকী, সে মুলুক থেকে নেমে এসে যে কি আনন্দে রইলুম—তখন সব কুছু আনন্দময় হয়ে গিয়েছে।"

সারা অস্তিত্বে বিস্তারিত পরমানন্দের এই ধারাটি লাটু মহারাজ শুধু নিজের জীবনেই ধরিয়া রাখেন নাই, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই অমৃত তিনি মুক্তিকামী সাধকদের মধ্যে বিলাইয়া গিয়াছেন।

জীবনের শেষ আটটি বৎসর লাটু মহারাজ কাশীধামে যাপন করেন। ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ এই রামকৃষ্ণ সন্তান অল্পকাল মধ্যে কাশীর সাধকসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠেন। নিভৃতে আপন সাধনভজন নিয়া রত থাকিলেও বহু গৃহী ও সন্ন্যাসী সাধক

তাঁহার উপদেশ লাভে ধন্য হন, নিজেদের আত্মিক জীবন গঠনে অনেকে সমর্থ হন।

দেহান্তের এক বৎসর আগে লাটু মহারাজের পায়ে একটি গ্যাংগ্রিন্ হয় এবং বার বার ইহাতে অস্ত্রোপচার করিতে হয়। প্রতি অস্ত্রোপচারের সময়ই সার্জনেরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেন, মহা-পুরুষের চোখে মুখে দুঃসহ যন্ত্রণার কোনো চিহ্নই নাই। নির্বিকার চিত্তে ইষ্টধ্যানে তিনি রহিয়াছেন সদা বিভোর, আর দেহবোধ হইয়াছে তিরোহিত।[১]

কাশী হাড়ারবাগের বাড়িতে শরৎ মহারাজ রোগ শয্যাশায়ী লাটু মহারাজকে দেখিতে আসিয়াছেন[২] সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সাধু, কেমন আছো?"

"শরীর ধারণ বিড়ম্বনম্"—সহাস্যে উত্তর দেন লাটু মহারাজ।

লাটু মহারাজকে প্রণাম করিয়া শরৎ মহারাজ বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। এমন সময়ে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর এক সন্ন্যাসী প্রশ্ন করেন, "আপনি লাটু মহারাজকে প্রণাম করেন কেন?"

"সে কি! সাধু যে আমাদের সবাইর আগে ঠাকুরের চরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমাদের সন্ন্যাসী গুরুভাইদের মধ্যে লাটু মহারাজই জ্যেষ্ঠ। তাঁকে প্রণাম করবো না, বালস্ কি রে!"

সেদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দের একজন ভক্ত মৃত্যু পথযাত্রী লাটু মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, জগৎ কি এখন আর আপনাদের কাছে ভার-বোঝা বলে মনে হয়?"

লাটু স্মিতহাস্যে কহিলেন, "ভাখো, গঙ্গার জলে ডুব দিলে, মাথার ওপর হাজার মণ জল থাকলেও ভারটা বুঝা যায় না। তেমনি ভগবানের সংসারে ভগবান্‌কে ধরে ডুব দিলে, সংসারের বোঝা আর

১ দ ডিসাইপল্‌স্ অব রামকৃষ্ণ—অদ্ভুতানন্দ।

২ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা।

বোঝা বলে মনে হয় না, সংসার তখন আনন্দের খেলা বলে মনে হয়। তুলসীদাসের একটা কথা মনে রেখো—'যো যাকো শরণ লিয়ে, সে রাখে তাকো লাজ। উলটু জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ।' আরো একটি কথা জেনে রাখ্‌বে—'তোম জ্যায়সা রাম পর, তোমসে ত্যয়সা রাম। ডাহিনে যাও তো ডাহিনে যায়, বামে যাও তো বাম।"

১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল লাটু মহারাজের বিদায়ের লগ্নটি আসিয়া গেল। পরম সন্তোষের সহিত প্রভু বিশ্বনাথের চরণামৃত পান করিয়া চিরতরে তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেন। রামকৃষ্ণময় মহাসাধকের জীবনধারাটি এবার মিশিয়া গেল সচ্চিদানন্দ সাগরে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

রামকৃষ্ণের মানসপুত্র ও ঘনিষ্ঠতম লীলাপার্ষদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জীবন যেন রামকৃষ্ণেরই এক ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির অপূর্ব সমাহার দেখা গিয়াছিল তাঁহার সাধনজীবনে, সেই সঙ্গে অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল গুরুর উদার ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী। চরিত্র, আচরণ ও ব্যক্তিত্বের এই ঐক্য ছিল গুরু ও শিষ্যের মধ্যে, ফলে উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল অপূর্ব একাত্মকতাবোধ। প্রাণপ্রিয় ভক্ত ও সহচর রাখাল সদাই থাকিতেন ঠাকুরেরই রসে অভিসিঞ্চিত।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবী ভবতারিণীর কাছে স্বগতোক্তি করিতে শুনা যায়,—"মা, তোমার কাছে কাতর হয়ে বলেছিলাম, আমারই মতো আর একজনকে সঙ্গী ক'রে দাও, তাই বুঝি রাখালকে হেথায় পাঠিয়েছো।"

শুধু সঙ্গী নয়, রাখাল ছিলেন ঠাকুরের লীলাসঙ্গী। ঠাকুরের ঐহিক জীবন ও অধ্যাত্মজীবনের অন্তরঙ্গ জন।

রামকৃষ্ণ ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিকরেরা রাখালকে আদর করিয়া ডাকিতেন—রাখালরাজ। আর উত্তরকালে তিনিই হন রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর রাজা। এই পদগৌরব ও নেতৃত্বের ইঙ্গিত ঠাকুর নিজেই দিয়া গিয়াছিলেন।

ঠাকুরের এই ইঙ্গিতের নিহিতার্থ বুঝিতে বিবেকানন্দের ভুল হয় নাই। তাই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষের পদে এই প্রিয়তম গুরুভাইকেই তিনি বরণ করিয়াছিলেন। এই পদের গুরু-দায়িত্ব রাখালও অবলীলায় পালন করিয়া গিয়াছেন।

মঠের কাজের সংগঠন ও প্রচার, জনসেবা এবং আর্তত্রাণ, সাধনপ্রয়াসী ভক্ত-শিষ্যদের পরিচালনা—এ ধরনের বহুমুখী অনেক

কিছু কর্তব্য কর্মই তাঁহাকে করিতে হইত, আর এগুলি তিনি সম্পন্ন করিতেন অসাধারণ দক্ষতায়, স্মিতমুখে, প্রশান্ত চিত্তে।

মঠ পরিচালনার নিত্যকার সমস্ত কিছু জটিল ও বহুমুখী কাজ শেষ হইলেই রাখাল মহারাজ আপন মনে ডুব দিতেন আত্মিক সাধনার গভীরে। বহিরঙ্গ জীবন হইতে অন্তরঙ্গ লোকে উত্তরণের মধ্য দিয়া 'রাজা' হইতেন 'রাজর্ষি'। তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যকে উদ্দেশ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভাইদের বলিতেন, "রাখাল হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার একটা বিরাট আধার। লক্ষ লক্ষ ভোল্টের শক্তি ওর ভেতর সুপ্ত রয়েছে।"

রাখালের অধ্যাত্ম সাধনা ও সিদ্ধির কেউ প্রশংসা করিলে স্বামীজী উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, বলিতেন, "রাজার স্পিরিচ্যুয়েলিটি আঁকড়ে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে কোলে করতেন, আদর ক'রে খাওয়াতেন, একসঙ্গে শয়ন করতেন, তার সঙ্গে কি কারো তুলনা হয় রে! রাজা আমাদের মঠের প্রাণ—আমাদের রাজা।"

রামকৃষ্ণের আদরের ধন, গুরুভ্রাতাদের মধ্যমণি, ধীর গম্ভীর সার্থক সাধক এই রাখাল মহারাজই উত্তরকালে বহুলখ্যাত হইয়া উঠেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে।

চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত গণ্ডগ্রাম শিকরা। এই গ্রামেরই এক সম্পন্ন গৃহস্থ আনন্দমোহন ঘোষের পুত্ররূপে উত্তরকালের বহুজন বন্দিত রাখাল মহারাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দ আবির্ভূত হন। মাতা কৈলাসকামিনী ছিলেন পরম ভক্তিমতী মহিলা। পূজা-অর্চনা ধ্যান-ধারণায় সদাই তাঁহার ঝোঁক ছিল। ভাগবত ও কৃষ্ণলীলার গ্রন্থাদি পাঠেও ছিলেন পরম উৎসাহিনী। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী তাঁহার অঙ্ক আলোকিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হয় এক সুদর্শন শিশু। আদর করিয়া জননী ও পরিজনেরা নাম রাখেন রাখাল।

পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাখাল তাঁহার জননীকে হারান,

অতঃপর বিমাতা হেমাঙ্গিনী দেবীই তাঁহাকে পুত্র জ্ঞানে পালন করিতে থাকেন, সযত্নে মানুষ করিয়া তোলেন।

শিশু রাখালের স্বভাব বড় অদ্ভুত। সঙ্গীদের নিয়া প্রায়ই পূজার খেলায় থাকেন মত্ত। কখনো ঘোষেদের পূজা মন্দিরে, কখনো বা বোধন তলায় মা-কালীর বিগ্রহ নিয়া আনন্দ করেন। এই পূজা-খেলার মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে কোন্ এক অজানা ভাব-গম্ভীর তন্ময়তায় শিশুচিত্ত ডলাইয়া যায়, কখনো বা সঙ্গীদের সাথে শ্যামা-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে রাখাল বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। আত্মজনেরা শিশুকে নিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।

ছেলে বড় হইতেছে, লেখাপড়ার সুবন্দোবস্ত করা দরকার। অভিভাবকেরা ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিলেন, রাখাল কলিকাতার ভাল স্কুলে পড়াশুনা করিবে। বিমাতা হেমাঙ্গিনী দেবীর পিত্রালয় কলিকাতায়। স্থির হয়, সেখানে থাকিয়াই ছেলে পড়িবে। ইংরেজী স্কুল ট্রেনিং একাডেমিতে তিনি ভর্তি হইলেন।

সঙ্গেই সুন্দর একটি ব্যায়ামাগার। রাখাল সেখানে সোৎসাহে শরীর-চর্চা করেন। স্কুলের সহধ্যায়ী নরেনও সেখানে যাওয়া-আসা করেন। প্রিয়দর্শন তেজস্বী এই যুবক যেন এক আগুনের ফুল্‌কি। অনতিকালমধ্যে রাখাল তাঁহার প্রতি খুব আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং দুজনের মধ্যে গড়িয়া উঠে অপূর্ব ঘনিষ্ঠতা। যে অমোঘ আকর্ষণে দুজনের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা জন্মে, যেভাবে তাহা পরিণত হয় অচ্ছেদ্য আত্মিক সম্পর্কে, তাহার তাৎপর্য কে সে সময়ে বুঝিতে পারিয়াছিল?

বাংলার শিক্ষিত তরুণ সমাজে তখন কেশবচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রভাব। এই ব্রাহ্ম নেতার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাঁহার আদর্শ চরিত্র ও বাগ্মিতা, প্রভাব বিস্তার করে রাখালের তরুণ জীবনে। কেশবের সংস্কারপন্থী আন্দোলনে রাখাল আকৃষ্ট হন।

উন্নততর নৈতিক জীবন এবং ব্রহ্ম উপাসনার আস্বাদও রাখালের অন্তর্জীবনে গভীরভাবে করে রেখাপাত।

অবসর ও সুযোগ পাইলেই ব্রাহ্মসমাজ গৃহে গিয়া বসেন, উপনিষদের মর্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। আর প্রাণে জাগে তীব্র আকুলতা, কি করিয়া পরমার্থ লাভ করা যায়? দিনরাত এই ভাবনাতেই থাকেন বিভোর।

পড়াশুনায় ছেলের অমনোযোগ দিন দিন বাড়িতেছে। পিতা আনন্দমোহন চিন্তিত হইয়া পড়েন। বিবাহ দিলে সংসারের আকর্ষণ বাড়িবে মনে করিয়া তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। কোন্নগরের ডাক্তার ভুবনমোহন মিত্রের কন্যাটি বড় সুলক্ষণা, পছন্দ করিয়া এই মেয়েটিকেই রাখালের বধূরূপে ঘরে আনা হয়। এই বিবাহ সম্বন্ধকে সূত্র করিয়াই রাখালের অধ্যাত্ম-জীবনের সম্মুখে আসে এক পরম সুযোগ। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সান্নিধ্য তিনি প্রাপ্ত হন, ধীরে ধীরে পরিণত হন নূতন মানুষে।

রাখালের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সাধক রামকৃষ্ণের অনুরাগী, ইহাদের মাধ্যমেই হঠাৎ একদিন তিনি ঠাকুরের পাদমূলে আসিয়া পৌঁছেন।

পূত সলিলা গঙ্গা তটে, দক্ষিণেশ্বরে, ভবতারিণী মন্দিরে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। কিছুদিন যাবৎ সিদ্ধ মহা-সাধকের অন্তরে জাগিয়াছে শুদ্ধসত্ত্ব আধার, ভক্তদলের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। জগন্মাতার নিকট তাই মাঝে মাঝে ব্যাকুল প্রার্থনা জানান—"মাগো, বিষয়ী লোকের কথা বলতে বলতে জিভ যে আমার জ্বলে গেল।"

মা আশ্বাস দেন, "তোর ভয় নেই। ত্যাগী শুদ্ধাত্মা ভক্তেরা সব এবার আসছে।"

বালকবৎ ঠাকুর আর একদিন আব্দারের সুরে মাকে জানান, "মা, আমার তো সন্তান-টন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছে করে, একটি পরম শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে আমার সঙ্গে সব সময়ে থাকে। তেমনি একটি ছেলে আমায় এনে দে।"

এই প্রার্থনা জগজ্জননী পূর্ণ করিয়াছিলেন, জুটাইয়া দিয়াছিলেন পুত্রপ্রতিম শিষ্য রাখালকে।

বিবাহের পর রাখাল কোন্নগরে তাঁহার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। এই পরিবারটি ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরমভক্ত। রাখালের শ্যালক নিজেই সেদিন ভগ্নীপতিকে ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য দক্ষিণেশ্বরে নিয়া যান।

উভয়ে দেবপ্রতিম ঠাকুরকে প্রণাম করেন। কুশল প্রশ্নাদির পর ঠাকুর একদৃষ্টে রাখালের দিকে তাকাইয়া থাকেন—একি, এ ছেলেটি তো তাঁহার অচেনা নয়! অল্প কিছুদিন আগের কথা। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রহিয়াছেন। হঠাৎ দেখিলেন, বটতলায় একটি দিব্য লাবণ্যময় বালক দাঁড়াইয়া আছে। ঠাকুরের দিকে সে তাকাইয়া আছে সতৃষ্ণ নয়নে।

হৃদয়কে ডাকিয়া এই অলৌকিক দর্শনের কথা কহিতেই সে বলিয়া উঠিল, "মামা, আমি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝেছি। তোমার ছেলে হবে, তাই এটা তুমি দেখেছো।"

ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "সে কিরে? আমার তো মাতৃযোনি! আমার ছেলে কখনো হবে না।"

ইহার পরই আবার একদিন স্পষ্টতর রূপে দেখিলেন, একটি দিব্য শিশু জগন্মাতার কোলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার দিকে ইঙ্গিত করিয়া মা সানন্দে কহিলেন, "এই ছাখ্ তোর ছেলে।"

রামকৃষ্ণ কিন্তু বড় ভয় পাইয়া গেলেন। দেবী এ আবার কি বলিতেছেন! গার্হস্থ্য জীবন তিনি চিরতরে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই জীবনেই কি আবার প্রবেশ করিতে হইবে? পুত্র জন্ম নিবে তাঁহার ঘরে?

অন্তর্যামিনী মা সহাস্যে কহিলেন, "না গো তা নয়। এটি হচ্ছে তোর মানসপুত্র।"

একথা শোনার পর তবে রামকৃষ্ণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচেন।

আর একদিন আসে এই মানস সন্তানের বিষয়ে নূতন সঙ্কেত। ঠাকুর মানসনেত্রে দেখিতে পান, গঙ্গাবক্ষে মনোরম একটি পদ্মের উপর গোষ্ঠবিহারী কৃষ্ণ বিরাজিত, আর তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া আছে এক রাখাল-সখা—নূপুর পায়ে মনোহর ভঙ্গীতে সে নৃত্য করিতেছে।

এই দিব্যদর্শন যখন হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই ভক্ত মনোমোহনের সঙ্গে রাখাল গঙ্গা অতিক্রম করেন, উপস্থিত হন দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র ভূমিতে। বিস্ময় ও কৌতুকভরা নয়নে ঠাকুর দেখিলেন—এই তো সেই পূর্বদৃষ্ট গোপ বালক। জগজ্জননীই বুঝি এবার তাহাকে পাঠাইয়াছেন।

ঠাকুর অনেকক্ষণ রাখালের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর হইল—শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ।

মুহূর্তমধ্যে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন। গদ্‌গদ কণ্ঠে, অস্ফুট স্বরে বলিতে থাকেন, "সেই নাম—রাখাল। ব্রজের রাখাল!"

সাক্ষাতের পর বেশ কিছুক্ষণ পরমানন্দে কাটিয়াছে। এবার রাখালকে সস্নেহে সুধাস্নিগ্ধ স্বরে বলেন, "আবার শিগ্‌গীরই এসো একদিন। বুঝলে? শিগ্‌গীর এসো।"

তরুণ রাখালের জীবনে ঠাকুরের এই দর্শন জাগাইয়া তোলে অভূতপূর্ব আলোড়ন। এ আলোড়ন সহজে নিবৃত্ত হইতে চাহে না। ঠাকুরের মোহন মূর্তি, মধুর কণ্ঠ, আর সস্নেহ আহ্বান বার বার মনে পড়িতে থাকে। কেবলই মনে হয়, এ যে কত জন্মের চেনা জন, এ যে আত্মার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়। জন্মান্তরের ধারা বাহিয়া এই আত্মিক যোগ যেন চলিয়া আসিয়াছে।

রাখাল কলিকাতায় ফিরিলেন বটে, কিন্তু মন পড়িয়া রহিল ঠাকুরের কাছে। ব্যাকুল হইয়া আর একদিন একলাই দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া যান। ঘনিষ্ঠ আত্মজনের মতো স্নেহের সহজ ও স্বাভাবিক

দাবি নিয়া ঠাকুর প্রশ্ন করেন—"তোর এখানে আসতে এত দেরি কেন রে? তোর জন্য যে আমি ভেবে ভেবে এ ক'দিন অস্থির।"

রাখাল তো অবাক। শুধু একটি দিনের দেখা, এরই মধ্যে ঠাকুর তাঁহাকে এমন আপনার করিয়া নিয়াছেন! মন তাঁহার অজানা আনন্দে ভরিয়া উঠে। নিঃশব্দে ঠাকুরের পদপ্রান্তে বসিয়া থাকেন—ভাবসমুদ্র অন্তরে কেবলি তরঙ্গায়িত হইতে থাকে।

ইহার পর হইতে রাখাল মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হন। আর ঠাকুরকে দেখিলেই হইয়া যান একটি আনন্দোজ্জ্বল শিশু। ঠাকুর যেমন তাঁহাকে আদর করেন, যুবক রাখালও তেমনি সহজ অধিকারের বলে তাঁহার কোলেই কখন কখন চড়িয়া বসেন। আব্দারের যেন সীমা নাই, ভুলিয়া যান যে তিনি একটি পূর্ণ বয়স্ক যুবক। ঠাকুরের বাৎসল্য লীলা চলে অব্যাহত ধারায়—স্নেহে, প্রেমে, মমতায় শিশুপ্রতিম পবিত্রচেতা রাখালকে সদা অভিসিঞ্চিত করেন।

রাখাল ঠাকুরকে কখনো দেখেন স্নেহময় পিতা রূপে, কখনো সখারূপে কখনো বা দেখেন তাঁহাকে করুণাময়, মুক্তিদাতা সদ্গুরু-রূপে। গোড়া হইতেই এক সহজ সম্পর্কের মধ্য দিয়াই উভয়ের আত্মিক বন্ধনটি দৃঢ় হইতে থাকে।

আত্মীয়স্বজন কিন্তু রাখালকে নিয়া বড় বিপদে পড়েন। সে সদ্য বিবাহিত যুবক নবজীবনের আনন্দ-আস্বাদ গ্রহণ করিবে, লেখা-পড়ায় কৃতকার্য হইবে, উন্নতির জন্য হইবে যত্নবান্ ইহাই তো তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আচরণ দেখা যাইতেছে বিপরীত। সুযোগ পাইলেই সে দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া যায়। ভাবপ্রমত্ত ঠাকুরের সান্নিধ্যে থাকিয়া নিজেও হয় ভাববিহ্বল। সংসারের সব বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া উঠিতে থাকে।

পিতা আনন্দমোহন বড় দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। কি করিয়া এ ছেলেকে সংশোধন করা যায়? কয়েকদিন তাঁহাকে ঘরের ভিতর জোর করিয়া আবদ্ধও রাখেন। একদিন পিতা বিষয়কর্মে লিপ্ত

রহিয়াছেন, এই অবসরে রাখাল পলায়ন করেন, তারপর সোজা ঠাকুরের পদপ্রান্তে গিয়া নিপতিত হন। উত্তেজিত আনন্দমোহনও দক্ষিণেশ্বরে আসেন পুত্রের পিছু পিছু। ঘরে তাহাকে ফিরাইয়া নিতেই হইবে। কিন্তু ঝগড়া বা বিতর্ক করিবেন কাহার সঙ্গে? রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব বড় অদ্ভুত, দর্শন মাত্রেই প্রাণ কাড়িয়া নেয়। আর, কি সুমধুর প্রাণগলানো ব্যবহার! রাখালের প্রশস্তিও পিতার হৃদয়ে করে গভীর রেখাপাত। পুত্রের নবতর জীবনের সহিত সাময়িক সন্ধি স্থাপন করিয়া পিতা ফিরিয়া আসেন, তাহার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিতে থাকেন।

রাখাল দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া সাধনভজন করিতেছেন। সেদিন তাঁহার শাশুড়ী নিজের কন্যাকে নিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত। কন্যা ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণ করুক, আর রাখালও হোক সংসারী, ইহাই তাঁহার অন্তরের কামনা।

নানা মধুর বাক্যে রামকৃষ্ণ তাহাদের প্রবোধ দেন, প্রণাম করেন। হঠাৎ মনে তাঁহার প্রশ্ন জাগে—রাখালের বধূটি সুলক্ষণা তো? তাহার সংস্পর্শে আসিয়া মানসপুত্র রাখালের অধ্যাত্ম জীবনের ক্ষতি হইবে না তো?

ঠাকুর তখনি মেয়েটিকে নিকটে ডাকিয়া নেন, দেহের লক্ষণগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখেন। তারপর প্রসন্ন মনে মন্তব্য করেন, "না, ভয়ের কোনো কারণ নেই—দেবী শক্তি। স্বামীর ধর্মপথের বাধা হবে না কোনোদিন।"

সারদামণি তখন নহবৎখানায় বাস করিতেছেন। খানিক বাদে ঠাকুর রাখালের স্ত্রীকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দেন, নির্দেশ দেন, "ওকে বলবে, টাকা দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।"

রাখাল দিবারাত্র রামকৃষ্ণের কাছে অবস্থান করেন সহচররূপে। প্রাণ ভরিয়া করেন তাঁহার সেবা পরিচর্যা। এখন হইতে ঠাকুর

যখনি ভাবাবিষ্ট হন, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, রাখালই তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। মমতাভরে বুক দিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখেন।

নিত্যসঙ্গী নবীন সাধক রাখালকে ঠাকুর পরম যত্নে ও সতর্কতায় গড়িয়া তুলিতেছেন। যখনি যেখানে যান, তরুণসুলভ যে চপলতাই রাখাল করুন না কেন, সর্বজ্ঞ ঠাকুরের চোখ এড়ায় না। চরিত্রের সামান্যতম ত্রুটি দেখিলেই নামিয়া আসে তাঁহার শাসন ও তিরস্কার।

নূতন উৎসাহে রাখাল সাধনভজন করিতেছেন। ঠাকুরের কৃপায় মাঝে মাঝে মিলিতেছে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আলোর ঝলক। সেদিন একটি বিশেষ ধরনের অনুভূতি লাভের জন্য মন তাঁহার বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিল, ঠাকুরকে তাই খুব চাপিয়া ধরিলেন।

সব কিছু অন্তর্যামী ঠাকুরের নখদর্পণে। শান্ত স্বরে বুঝাইলেন, "ওরে, এখনো তোর সময় হয় নি, আর একটু সবুর কর।"

রাখাল কিছুতেই ছাড়িবেন না, বার বার একথা নিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বড় বিরক্ত হইলেন। এ কি রকমের একগুঁয়েমি তার। তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

এবার রাখালের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। রাগিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "বেশ তো, আপনার কাছে কিছু চাইনে। আপনার এখানে থাকারও আমার কোনো দরকার নেই। আমি আজই, এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

কিন্তু কি পরম আশ্চর্য। রাখাল যতই চেষ্টা করুন না কেন, দক্ষিণেশ্বরের বহির্দ্বারটি তিনি কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না। পদদ্বয় কি জানি কেন অসাড় হইয়া আসিতে থাকে। ধীরে ধীরে তাঁহার ক্রোধ পরিণত হয় বিস্ময়ে।

ভূমিতলে অসহায়ভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় করুণাময় প্রভু নিকটে আসিয়া জানাইলেন স্নেহ-আহ্বান।

ঠাকুরের চোখে মুখে কৌতুকোজ্জ্বল হাসি। স্নিগ্ধ স্বরে মন্তব্য

করিলেন, "কিরে, গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারলি? তবেই এ-পার বুঝে নে।"

রাখাল বুঝিলেন, ঠাকুরের শক্তি ও কৃপার এই গণ্ডীকে ভেদ করিয়া দূরে যাইবার শক্তি তাঁহার নাই। পরম কারুণিক সদ্‌গুরু তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। আর তাঁহারই নির্দিষ্ট পরিধির ভিতরে রাখালকে থাকিতে হইবে, করিতে হইবে আত্মসমর্পণ। আর এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই মিলিবে পরম কাম্য ধন।

আর একবারের কথা। কি এক কারণে ঠাকুর রাখালকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। ফলে রাখালের অভিমান উদগ্র হইয়া উঠে, ক্রোধভরে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

কৃপালু প্রভু অতঃপর নিজেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাখালের সঙ্গে আসিয়া দেখা করিলেন। এইদিন যে কথা কয়টি বলিলেন, তাহা তাঁহার মতো শক্তিধর অধ্যাত্ম-শিল্পীরই উপযুক্ত।

রাখালকে বলিলেন, "ওরে এখানকার কিন্তু শ্রাবণ মাসের জল নয়। জানিস্ তো, শ্রাবণ মাসের জল হুড়হুড় ক'রে আসে আর বেরিয়ে যায়। এখানে পাতালফোঁড়া শিব। বসানো শিব নয়। তুই রাগ ক'রে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে এলি, আমি মাকে বললুম— 'মা, এতে ওর অপরাধ নিস নি, ও যে নিতান্ত বালক।"

রাখাল অতঃপর তাঁহার স্বস্থান অর্থাৎ ঠাকুরেরই চরণ প্রান্তে ফিরিয়া আসিলেন।

অল্প কিছুকাল পরেই রাখালের সাধনজীবনে জাগ্রত হয় এক অপূর্ব অধ্যাত্ম-অনুভূতি। সেদিন তিনি ঠাকুরের পদসেবায় নিরত আছেন, হঠাৎ এক দিব্য জ্যোতির ছটায় সারা দেহ মন তাঁহার উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তারপর সর্বসত্তা প্লাবিত করিয়া নামিয়া আসে ভাবাবেশের জোয়ার। ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান হয় তিরোহিত। সংবিৎ ফিরিয়া পাইবার পর বুঝিলেন, এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি ঠাকুরেরই কৃপা-প্রসাদের ফল। যে বস্তু লাভ করার জন্য সামান্য কিছুদিন আগে তিনি আন্দোলন করিয়াছেন, রোষভরে ঠাকুরের সঙ্গে

বাতবিতণ্ডা করিয়াছেন, এ যে তাহাই। এই দিনকার অভিজ্ঞতাটি উত্তর জীবনে তাঁহার স্মৃতিতে চিরজাগরূক ছিল।

রাখালের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের প্রায় ছয় মাস পরে নরেনের সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। প্রিয়বন্ধু নরেনের প্রতি ঠাকুরের রহিয়াছে অপার স্নেহ, দুর্বার আকর্ষণ। নরেনও ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসেন, হৃদয়ের জ্বালা জুড়ান। উভয়ের এই ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া রাখালের আনন্দের অবধি নাই।

সেদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ মন্দিরের বিভিন্ন বিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম করিতেছেন। রাখাল তাঁহার সঙ্গে, তিনিও ভক্তিভরে হইতেছেন প্রণত। নরেন তখনো তাহার ব্রাহ্মসমাজের মনোভাব ও ধরণধারণ বর্জন করেন নাই। রাখালের এই ভক্তি গদ্‌গদ ভাব, এই দৈন্যময় প্রণাম নিবেদন তাঁহার মোটেই ভাল লাগিল না। ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।

রাখাল নরেনেরই সঙ্গে একত্রে ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকার পত্রে সহি করিয়াছেন, তারপর আর দেবদেবী বিগ্রহকে প্রণাম করার তাঁহার অধিকার কই? সত্যসন্ধ তেজস্বী নরেনের মনে হইল, এতো সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। রাখালকে ডাকিয়া নিয়া কঠোর ভাষায় তিনি তিরস্কার করিলেন।

রাখাল স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, নরেনের এ আক্রমণের সম্মুখে বড় জড়সড়ো হইয়া পড়িয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার সাহায্যে আগাইয়া আসিলেন। নরেনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ওরে, সকলেরই প্রথমটায় নিরাকার বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া, রাখালের সাকারে বিশ্বাস হয়েছে—নিজের বিশ্বাস অনুযায়ীই তো ও চলবে। ওর যে সাকারেরই ঘর।"

ঠাকুরের এই বিশ্বাসদৃপ্ত কথায় নরেনকে নিরস্ত হইতে দেখা যায়।

নূতন জামাই—তাই শ্বশুরবাড়ি হইতে রাখালের মাঝে মাঝে

নিমন্ত্রণ আসে। কিন্তু সংসারের আকর্ষণ তাঁহার শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাই নূতন দাম্পত্যজীবন আস্বাদনের জন্যও আর যেন উৎসাহ পান না। সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানও তাঁহার কাছে আজকাল বিরক্তিকর।

অন্তর্যামী ঠাকুরের কিন্তু হিসাবে ভুল নাই। দিব্য দৃষ্টি সহায়ে বুঝিতে পারেন, রাখালের অবচেতন মনে সূক্ষ্ম ভোগেচ্ছা কিছু কিছু রহিয়াই গিয়াছে, এগুলি ক্রমে ক্রমে উৎপাদিত করিতে হইবে। এ সম্পর্কে তিনি উত্তরকালে বলিতেন, "রাখাল যে আমার উপর সব নির্ভর করেছিল বাড়ি-ঘর ছেড়ে। তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতুম—একটু ভোগ বাকী ছিল কিনা।"

রাখাল মাঝে মাঝে নিজের গৃহে চলিয়া যান, দুই চারদিন অবস্থান করিয়া আবার ফিরিয়া আসেন দক্ষিণেশ্বরে। আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবেরা তর্ক করেন, "রাখাল, তুমি সাধনভজনে মেতেছো, মুক্তির জন্য অভিলাষী হয়েছো, তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোমার স্ত্রীর তাতে কি? সে বেচারা অসহায়া, কোনো দোষই তো সে করে নি। তাকে ত্যাগ করলে কোন্ ধর্ম লাভ হবে, বল তো?"

পত্নীর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া মাঝে মাঝে রাখালের দুশ্চিন্তা হয়। একদিন তো সরল মনে ঠাকুরকেই বলিয়া বসিলেন, "তাই তো, আমার স্ত্রীর কি উপায় হবে? তার দুর্দশার জন্য শেষটায় কি আমিই দায়ী হবো? পাপের ভাগী হবো?"

ঠাকুর যেন কথাটি কানেই নেন না, নীরব নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া থাকেন। পলকহীন নয়ন দুটিতে বিরাজিত পরম নির্লিপ্ত। রাখাল বড় বিস্মিত হইয়া যান। নিজ জীবনের জটিল প্রশ্নটি তিনি ঠাকুরের কাছে উত্থাপন করিয়াছেন, সিদ্ধান্তের জন্য একান্ত মনে নির্ভর করিতেছেন তাঁহারই উপর। অথচ এদিকে ঠাকুরের মনোযোগ দিবার অবসরই যেন নাই। এ বড় রহস্যময়।

কয়েকদিন পরেই কিন্তু রাখাল তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হন, এই উত্তর আসে ঠাকুরের কৃপায় এক অদ্ভুত অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার

মধ্য দিয়া। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে বসিয়া রাখাল ধ্যান করিতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন, শয্যাপরি উপবিষ্ট ঠাকুরের মূর্তিখানি দিব্য আলোক-ছটায় উদ্ভাসিত হইযা উঠিযাছে ক্ষণপরেই দেখা গেল আর এক অপূর্ব দৃশ্য। জগজ্জননী মহামায়া সেখানে জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে আবির্ভূত হইলেন তারপর ধীরে ধীরে দেবীর ঐ মূর্তি রামকৃষ্ণের অঙ্গে মিশিয়া গেল।

সেদিনকার এই দিব্যদর্শন রাখালের সর্বসত্তায় এক প্রচণ্ড নাড়া দিয়া গেল। রামকৃষ্ণের স্বরূপ ও মাহাত্ম্যের কিছুটা তিনি উপলব্ধি করিলেন। সদ্‌গুরুর উপর আসিল মনের দৃঢ়তর বিশ্বাস। পরমাশ্রয় রূপে একান্তভাবে তাঁহাকে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক জীবনের উপর আসিল প্রবল বিতৃষ্ণা। স্ত্রীর প্রতি যেটুকু মোহ অবশিষ্ট ছিল, সেদিনকার অতীন্দ্রিয় দর্শনের পর সেটুকুও যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

ঠাকুর প্রাযই উচ্চ ভাবভূমিতে আরূঢ় থাকেন, আপনভোলা মহা-পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রেরও কিছু ঠিক থাকে না, অনেক সময় দিগম্বর হইয়াই বসিয়া থাকেন কিন্তু যত ভাবতন্ময়ই থাকুন না কেন, রাখাল প্রভৃতি তরুণ শিষ্যদের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনে একটুও তাঁহার ভুল ত্রুটি হয় না। বিশেষ করিয়া সদাসর্গী রাখালের উপর নিবদ্ধ থাকে তাঁহার সদা জাগ্রত দৃষ্টি। প্রতিদিনকার ধ্যান-জপের প্রেরণা ও নির্দেশ দানের সঙ্গে ঠাকুরের নিজের সেবার কাজ ও গৃহকাজের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি রাখালকে দিয়া করানো হয় সব কিছু যাহাতে নিখুঁত হয় সেজন্য ঠাকুরের সতর্কতার অবধি নাই। আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক এই উভয় জীবনের সতর্ক নিয়ন্ত্রণের ফলেই উত্তরকালে রাখাল মহারাজ রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের নেতৃত্ব এবং দুরূহ দায়িত্বের ভার অনায়াসে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন। সিদ্ধকাম সাধকের জীবনে দেখা যায় জ্ঞান, ভক্তি, কর্মের অপূর্ব সমাহার।

মানসপুত্র রাখালের উপর ঠাকুরের প্রহরা ছিল অতন্দ্র, নিরবচ্ছিন্ন। সেদিন রাখালকে চিন্তিত দেখিয়া নিকটে ডাকিলেন,

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "তোর মুখ অমন দেখাচ্ছে কেন রে? কে যেন একটা গুরুতর অন্যায় করেছিস। ঠিক ক'রে বলতো।"

রাখাল বড় থতমত খাইয়া যান। ভাবিয়া পান না, অজ্ঞাতসারে কোন্ অপকর্ম তিনি করিয়াছেন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ঠাকুর আবার কহিলেন, "ভাল ক'রে ভেবে ছাখ্ তো, কোনো মিথ্যে কথা বলেছিস কিনা।"

এবার রাখালের মনে পড়িল, সত্যিই তো, সেই দিনই রহস্যচ্ছলে এক বন্ধুর কাছে তিনি একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। ভক্তবৎসল রামকৃষ্ণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই তথ্যটি এড়ায় নাই। সাধকের পক্ষে ঠাট্টা-বিদ্রূপের ছলেও যে অসত্য বলা অন্যায়, এ তত্ত্বটি চিরতরে তাঁহার অন্তরে গ্রথিত হইয়া যায়।

উত্তরকালে সত্যসন্ধ আপ্তকাম সাধক রাখাল মহারাজ বলিতেন "যে মিথ্যা কথা বলে বা মিথ্যাচার করে, তার জপতপ সাধন সবই বৃথা। সত্যের প্রতি ঠাকুর আমাদের এমন ধারণা ক'রে দিয়েছেন যে, আমরা বুঝেছি—অন্য অপরাধের বরং ক্ষমা আছে কিন্তু মিথ্যাবাদীর বা মিথ্যাচারীর পাপ থেকে নিষ্কৃতি নেই।"

সেবার ব্রাহ্মদের এক উৎসবে ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে কয়েকটি ঘনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্য। উৎসব অনুষ্ঠানের শেষে ধনী গৃহস্বামী তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী বন্ধুদের নিয়া মহাব্যস্ত, ঠাকুর বা তাঁহার সঙ্গীদের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসরই তাঁহার নাই।

অন্তরঙ্গ ভক্তগণসহ ঠাকুর এক কোণে দাঁড়াইয়া আছেন, মাঝে মাঝে বালকের মতো প্রশ্ন করিতেছেন, "কই রে, কেউ যে আমাদের ডাকৃছে না রে।"

রাখাল এতক্ষণ নীরবে গৃহস্বামীর এই অবহেলা সহ্য করিতেছিলেন। এবার ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন। কহিলেন, "চলুন মশাই। আমরা এক্ষুনি চলে যাই। এ অভদ্র জায়গায় আর থাকা নয়।"

ঠাকুরের কিন্তু নড়িবার মোটেই লক্ষণ দেখা যায় না। উত্তরে বরং অভিমানাহত রাখালকে ভয় দেখাইয়া বলেন, "আরে রোস্। এত ফোঁস ফোঁস করিস্ নে। বলি, গাড ভাড়া তিন টাকা দু আনা কে দেবে? আছে তোর ট্যাঁকে? তাছাড়া, এত রাত্রে তোরা সব খাবিই বা কোথায়?"

রাখাল নিরস্ত হইয়া ভিতরে ভিতরে গর্জিতে থাকেন। অবশেষে গভীর রাত্রে একটি অপরিচ্ছন্ন কোণে বসিয়া সবাই ভোজন সমাধা করিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পথে কিন্তু রাখালের মনশ্চক্ষু হইতে একটি পর্দা অকস্মাৎ সরিয়া গেল। নিমন্ত্রণকারী গৃহস্বামীর উপেক্ষার মধ্য দিয়া ঠাকুরের কি অপরূপ ক্ষমাসুন্দর রূপই না আজ ফুটিয়া উঠিল। এই সঙ্গে রাখাল ধন্য হইলেন নিরভিমানতা ও সরলতার মূর্ত বিগ্রহ-রূপে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া।

রাখালের মনোভাব ঠাকুরের কাছে অজ্ঞাত রহে নাই। তরুণ শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিতে লাগিলেন, "ছাখ্, গৃহস্থেরা অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞানতার জন্য সাধুর সঙ্গে ঠিকমতো আচরণ করতে পারে না, প্রকৃত মর্যাদা দিতে ভুলে যায়। কিন্তু সাধুর উচিত তাদের নিতান্ত অবোধ বলে ভাবা, দোষ না দেখে তাদের কল্যাণ কামনা করা। আমরা আজ ও-বাড়ি থেকে না খেয়ে চলে এলে, গৃহস্থের যে অমঙ্গল হতো রে।"

নীরব বিস্ময়ে রাখাল ঠাকুরের করুণাঘন মূর্তির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন।

অন্তরঙ্গ ভক্ত সাধকের কাহারো কাহারো নানা দিব্য অনুভূতি ও দর্শনাদি হইতেছে। রাখালের অন্তরে এজন্য মাঝে মাঝে ক্ষোভ জাগিয়া উঠে। এত সাধন-ভজন করিতেছেন, কিন্তু কই, ঠাকুরের কৃপা ও দাক্ষিণ্যের পরিচয় তো তিনি তেমন পাইতেছেন না।

ঠিক এই সময়ে ঘটিল এক দিব্য দর্শন। ভবতারিণীর মন্দিরের এক কোণে বসিয়া রাখাল সেদিন জপ করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন, সারা কক্ষটি এক অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, এই জ্যোতির প্রবাহ ক্রমে আরো তীব্র হইয়া উঠে, তারপর অগ্রসর হয় জপনিরত রাখালের দিকে।

একি অদ্ভুত দৃশ্য! রাখাল কি জানি কেন ভয় পাইয়া গেলেন। ছুটিয়া গিয়া আশ্রয় নিলেন ঠাকুরের কক্ষে। বিস্মিত ও বিমূঢ় হইয়া অনেকক্ষণ সেখানে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন।

ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিলেন। তারপর হাসিয়া কহিলেন, "কিরে, তুই না ক্ষোভ করিস দর্শন-টর্শন তেমন কিছু হচ্ছে না। আবার তা যখন হয়, ভয়ে পালিয়ে আসিস্। তা হলে কি করবি, বল্?"

রাখাল বুঝিলেন, ভ্রান্ত বুদ্ধিবশতঃ নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি বড় বেশী ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠাকুর সদ্‌গুরু, অন্তর্যামী, তাঁহার কাছে তিনি চিরতরে আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন। কাজেই সকল দায়িত্বভার যে তাঁহারই। এ কথাটি বিস্মৃত হওয়া তো রাখালের পক্ষে শোভন হয় নাই।

অপর একদিনের কথা। রাখাল মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে বসিয়া একান্তমনে জপ করিতেছেন। ধীরে ধীরে সারা সত্তায় নামিয়া আসিল ধ্যানের স্রোত, তরুণ সাধক তাহার গভীরে সত্তায় নিমজ্জিত হইয়া গেলেন।

এমন সময় সেখানে ঘটিল রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। ভাবতন্ময় অবস্থায় টলিতে টলিতে উপস্থিত হইলেন রাখালের সম্মুখে। দৃপ্তস্বরে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "ওরে, এই যে তোর মন্ত্র। আর এই ভাখ্, তোর ইষ্ট।"

ঠাকুর, এ কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে রাখালের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল জ্যোতির্ময় ইষ্টমূর্তি।

ঠাকুর যেন অধ্যাত্ম-রাজ্যের মহান্ ঐন্দ্রজালিক, প্রতীক্ষিত লগ্ন

উপস্থিত হওয়া মাত্র কোথা হইতে হঠাৎ আবির্ভূত হইলেন, শিষ্যের জীবনে ঢালিয়া দিলেন কৃপার প্রসাদ।

সেদিনকার এই অতীন্দ্রিয় দর্শন রাখালের সারা দেহে মনে জাগাইয়া তোলে অপূর্ব আনন্দ শিহরণ। ভাববিহ্বল হইয়া ঠাকুরের চরণতলে তিনি পতিত হন।

রাখালের সাধন পথের বাঁকে বাঁকে আসে নানা বাধা বিঘ্ন। তরুণ হৃদয় এক এক সময়ে অশান্ত, বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। মনে উঠে চিন্তার তরঙ্গ, ঠাকুরের পরমাশ্রয়ে তিনি বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু যে পরম প্রাপ্তির জন্য মন এত আকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহা এখনো রহিয়াছে সুদূরপরাহত। মাঝে মাঝে অতীন্দ্রিয় দর্শন ও উচ্চতর উপলব্ধি কিছু কিছু হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা তো স্থায়ী হইতেছে না।

সেদিন জপ করিতে বসিয়া মনে বড় অনুশোচনা জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আসিল আত্মধিক্কার। ভাবিলেন, নাঃ আর এমন করিয়া এখানে পড়িয়া থাকা নয়। যেদিকে দুই চোখ যায় সেদিকে বাহির হইয়া পড়িবেন।

ভক্তের অন্তরের এই আলোড়ন অমনি উচ্চকিত করে অন্তর্যামী শ্রীরামকৃষ্ণকে। দ্রুত পায়ে চটি ঠক ঠক করিয়া তখন রাখালের কাছে আসিয়া তিনি উপস্থিত। তরুণ ভক্তকে আশ্বাস দেন, "ভয় কিরে? আমি তো আছি। আচ্ছা হাঁ ক'রে জিবটা বার কর দেখি।"

আদেশ পালনে রাখালের বিলম্ব হয় না। ঠাকুরও তখনি আপনমনে অস্ফুট স্বরে কি এক মন্ত্র উচ্চারণ করেন, নিজের আঙুল দিয়া রাখালের জিহ্বাতে অঙ্কিত করিয়া দেন তিনটি সাঙ্কেতিক রেখা।

তরুণ সাধকের অন্তরের সর্ব কিছু চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ মুহূর্তের মধ্যে শান্ত হইয়া যায়, দিব্য আনন্দের পাথারে এবার তিনি ভাসিতে থাকেন।

প্রয়োজন মতো এমনি করিয়া শক্তিধর রামকৃষ্ণ মানসপুত্র রাখালের সাধনপথের বাঁকে বাঁকে দর্শন দেন, উচ্চারণ করেন অজস্র

অভয়বাণী। সাধনের প্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগাইয়া তোলেন অবিরাম ধারায়, শিষ্যের জীবনকে গড়িয়া তুলিতে থাকেন এক সার্থক অধ্যাত্ম-সৃষ্টিরূপে।

সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া সাধন-ভজন করার ফলে রাখালের সাধনজীবনে আসে পরম প্রশান্তি, দেখা দেয় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের অপূর্ব সমাহার। নিরন্তর সাহচর্য ও উপদেশাদি দিয়া ঠাকুর প্রিয় ভক্তের সাধনজীবনকেও ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে থাকেন। এ সময়ে ধ্যানজপের উচ্চতর প্রণালী শিক্ষা দিবার সঙ্গে ঠাকুর তাঁহাকে আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামের যৌগিক প্রক্রিয়াও কিছু কিছু দিয়াছিলেন।

সেদিন ভবতারিণীর মন্দিরে ঠাকুর অর্ধবাহ্য অবস্থায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাখাল অদূরে বসিয়া জপধ্যানে নিরত। ঠাকুর হঠাৎ তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন। এক গৃহস্থ ভক্ত খানিক আগে ষোড়শোপচারে কারণবারি সহ দেবীর ভোগ দিয়া গিয়াছে। নিবেদিত পাত্র হইতে কারণবারি আঙুলে তুলিয়া রাখালের ভ্রূ-যুগলের মধ্যে ঠাকুর একটি ফোঁটা দিয়া দিলেন। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন নিগূঢ় মন্ত্র। দেবী ভবতারিণীর সম্মুখে অনুষ্ঠিত সেদিনকার ঐ ক্রিয়ার পর রাখালের জীবনে উন্মোচিত হইতে থাকে সাধনার এক একটি নূতন স্তর। বলা বাহুল্য এই তরুণ শিষ্যের প্রত্যেকটি অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার উপরেই সতত নিবদ্ধ থাকিত শক্তিধর সদ্‌গুরুর সদা-জাগ্রত দৃষ্টি।

এসময়কার সাধনকালে, নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই রাখাল একটি বিশেষ শক্তির অধিকারী হইয়া উঠেন। দিব্যদৃষ্টি সহায়ে প্রত্যেক মানুষের অন্তস্তল তিনি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেন। ঠাকুরের দর্শনাভিলাষী হইয়া এ সময়ে নানা শ্রেণীর লোক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইত। নব অলৌকিক শক্তির অধিকারী রাখাল ভাবিতেন, যে কেহ আসিয়া উপস্থিত হইলেই ঠাকুরের কাছে তাঁহাকে টানিয়া নেওয়া কেন? বরং কে কেমন স্তরের লোক আগে হইতে তাহা সঠিকভাবে

নির্ণয় করিয়া নেওয়া ভাল। নবলব্ধ অলৌকিক দৃষ্টি বলে তিনি সকলেরই মনের অভ্যন্তরভাগ আগে হইতে খানিকটা দেখিয়া নিতেন। তারপর যে কটি দর্শনার্থীকে তাঁহার মনে হইত শুদ্ধসত্ত্ব, বাছিয়া বাছিয়া তাহাদেরই উপস্থিত করিতেন ঠাকুরের কক্ষে।

শিষ্যদের আচার-আচরণ সম্পর্কে ঠাকুর অতিমাত্রায় সজাগ। রাখালের এই কাণ্ড তাঁহার চোখ এড়ায় নাই। সেদিন তাঁহাকে ডাকিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিরস্কার করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "আচ্ছা, তোর এসব কি হীনবুদ্ধি বল্ তো? কোথায় মায়ের চরণে শুদ্ধাভক্তি নিয়ে পড়ে থাকবি, তা না—কেবলই অষ্টসিদ্ধির দিকে মন দিচ্ছিস্। বিভূতির দিকে নজর দিলে কি কখনো ঈশ্বর লাভ হয় রে? ছিঃ ছিঃ ওদিকে মন রাখিস্‌নে—ওসব একেবারে ঝেড়ে ফেলে দে।"

রাখাল লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলেন, অন্তর্যামী ঠাকুরের অমোঘ দৃষ্টি সদা নিবদ্ধ রহিয়াছে নগণ্যতম ভক্ত-সাধকের প্রতিটি আচার-আচরণের দিকে। আজ তাই কৃপা করিয়া তরুণ সাধক রাখালের বিভূতি প্রয়োগের ইচ্ছাটিকে অঙ্কুরে এমনভাবে বিনষ্ট করিয়া দিলেন। এই দিনের তিরস্কারের পর হইতে রাখালের কাছে অতীন্দ্রিয় দর্শন ও সিদ্ধাই ইত্যাদি একেবারে তুচ্ছ হইয়া গেল। মনকে তিনি কেন্দ্রীভূত করিলেন ইষ্টের পাদপদ্মের দিকে

রামকৃষ্ণের কক্ষে ধ্যান করিতে বসিলেই রাখাল স্বল্পকাল মধ্যে অন্তর্মুখীন হইয়া যান, তলাইয়া যান চৈতন্যময় সত্তার অতল গভীরে। এভাবে ধ্যানাবস্থায় রাখালকে দেখিলেই ঠাকুরের হৃদয়ে জাগে দিব্য উদ্দীপনা। এক একদিন ভাবপ্রমত্ত হইয়া অস্ফুটস্বরে রাখালকে কহিতে থাকেন, "আমি তো সেখান থেকে এসেছি অনেক দিন। হ্যাঁরে, তুই কবে এলি? বল্ দেখি, কবে এলি?"

অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবকেরা অবাক বিস্ময়ে ভাবিতে থাকেন, রাখালের সৌভাগ্যের অন্ত নাই। জন্মান্তরের পুরানো সম্পর্কের ধারাটি বাহিয়াই তাঁহার জীবনতরী আজ ঠাকুরের চরণতলে আসিয়া

ঠেকিয়াছে। প্রিয় পার্ষদের এই নিত্য সম্বন্ধের গূঢ় ইঙ্গিতটিই যে ভাবমত্ত সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হইতে হঠাৎ আজ প্রকাশিত হইল।

ইতিমধ্যে ঠাকুরকে ঘিরিয়া দক্ষিণেশ্বরে জড়ো হইয়াছে চিহ্নিত শিষ্যগোষ্ঠী। দিব্য স্পর্শ, সান্নিধ্য ও সাধননির্দেশ দিয়া ঠাকুর ইহাদের জীবনে প্রজ্বলিত করিয়াছেন অধ্যাত্ম চেতনার আলো। তাই বুঝি এবার লীলামঞ্চ হইতে নিজেকে অপসৃত করিয়া নিতে চান। এ উদ্দেশ্যে নিজ দেহে সৃষ্টি করিয়াছেন মারাত্মক ক্যান্সার রোগ। আর তাঁহার শুশ্রূষাকে উপলক্ষ করিয়া শিষ্যেরা হইতেছে দিনের পর দিন ঘনিষ্ঠতর, গুরুগতপ্রাণ। সবার অলক্ষ্যে গুরুভাইদের মধ্যেও গড়িয়া উঠিতেছে এক দৃঢ় আত্মিক বন্ধন। ঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে রাখালও নিবিড়ভাবে যুক্ত হইলেন তাঁহার সঙ্গে, অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িলেন তাঁহার প্রত্যেকটি পরিকরের সঙ্গে।

রাখাল প্রায়ই মনে মনে পীড়া বোধ করেন—ঠাকুরের দেহ সিদ্ধ দেহ, তাহাতে কেন এই মারাত্মক রোগের আক্রমণ? সাধন বলে অপরিমেয় শক্তি বিভূতি অর্জনে তবে কি তিনি সমর্থ হন নাই? জগজ্জননীর সাধনায়ই বা কতটা তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন? কি তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ? জিজ্ঞাসু তরুণ সাধকের মনে বার বার এই সব প্রশ্ন আসিয়া ভিড় করে।

শ্যামপুকুরে ঠাকুর রোগশয্যায় থাকা কালে এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হয় যাহার ফলে রাখালের মনের সংশয় ঘুচিয়া যায়, ঠাকুরের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তিনি কৃতার্থ হন।

সেদিন শ্যামাপূজা। অন্তরঙ্গ ভক্ত-শিষ্যেরা সকাল হইতেই পূজার আয়োজনে রত। ঠাকুর স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের পূজা সম্পন্ন করিবেন। পূজার লগ্ন উপস্থিত হইলে ভক্তদের মনে জাগিয়া উঠে এক আকস্মিক ভাবের জোয়ার। আদ্যাশক্তি মহাকালী জ্ঞানে সবাই তখন সমস্বরে ঠাকুরের জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। শুরু হয় তাঁহারই অর্চনা। সচন্দন

রক্তজবা ঠাকুরের চরণে অঞ্জলি দিয়া ভক্তেরা আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠেন।

সকলের সাথে রাখালও সেদিন যোগ দেন ঠাকুরের এই অভিনব অর্চনায়। হৃদয় তাঁহার দিব্য আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। বার বার ভাবিতে থাকেন, শ্যামাপূজার এই আয়োজনে ঠাকুর নিজেই আজ কত উৎসাহ দিয়াছেন। অতঃপর একি কাণ্ড! লগ্ন উপস্থিত হইলে দেখা গেল, নিজেই নিজের পূজা তিনি অঙ্গীকার করিলেন, আর দিব্য আবেশে হইলেন অভিভূত।[১]

রাখাল বিশ্বাস করিলেন, এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তদের ঠাকুর বুঝাইয়া দিলেন, মহাকালী আর মহাকালীর বরপুত্র রামকৃষ্ণের মধ্যে স্বরূপতঃ কোনো ভেদ নাই। ভক্তদের পূজার অঞ্জলি পরম লক্ষ্যে গিয়াই পৌঁছিয়াছে।

সেদিন হইতে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রাখালের চেতনায় জাগিয়া উঠে নূতনতর এক উপলব্ধি। সদ্‌গুরুর সর্বব্যাপী মহিমার আলো নূতন করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাঁহার হৃদয়াকাশে।

সে-বার ঠাকুরের বর্ষীয়ান্ ভক্ত বুড়ো গোপাল (উত্তরকালের অদ্বৈতানন্দ) উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করিয়া কাশীপুরে ঠাকুরের সকাশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তীর্থদর্শনের পর সাধু সেবা করাইতে হয়, বুড়ো গোপালের অভিলাষ—একদল ভাল সাধুকে ডাকিয়া আনিয়া পরিতোষ সহকারে ভোজন করান।

শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "ওরে কোথায় আর সাধু খুঁজতে যাবি? এখানেই সব রয়েছে—এই ছোক্‌রাদের খাওয়ালেই তোর কাজ হবে।"

বুড়ো গোপাল তখনি সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজী হন। ঠাকুর তাঁহাকে দিয়া কতকগুলি গেরুয়া বসন ও মালা-চন্দন আনাইয়া নেন। নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ত্যাগী তরুণ ভক্তেরা সবাই সেখানে উপস্থিত।

১ লীলাপ্রসঙ্গ—সারদানন্দ

ঠাকুর একে একে তাঁহাদের কাছে ডাকিলেন, প্রত্যেককে দান করিলেন একটি করিয়া গৈরিক বস্ত্র ও মালাচন্দন। সহজ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান, কিন্তু তাহার তাৎপর্য বড় গভীর। সেদিন ইহারই মধ্য দিয়া রামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসী সঙ্ঘের বীজ ঠাকুর তাঁহার নিজ হস্তে রোপণ করিলেন।

বৈরাগ্য ও শুদ্ধাভক্তির সহিত ভাগবত প্রেমের অমৃতধারা ঠাকুর এই ভক্তদের জীবনকুম্ভে ঢালিয়া দেন। এই কৃপাপ্রসাদ উত্তরকালে তাঁহার চিহ্নিত সন্ন্যাসী পার্ষদদের সাধনজীবনকে রসসমৃদ্ধ করিয়া তোলে, মানবীয় প্রেম ও ভাগবত প্রেমের অপূর্ব সমাহার সম্ভব হয় তাঁহাদের জীবনে. লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, এই রামকৃষ্ণ শিষ্যদের কেহই শুষ্ক সন্ন্যাসীতে পরিণত হন নাই।

রামকৃষ্ণ প্রায়ই শিষ্যদের বলিতেন, "শুক্‌নো সাধু হবি কেন শুধুশুধু? তোরা জেনে রাখবি, এখানকার ভাব হচ্ছে রসে-বসে।" রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সাধকদের মধ্যে যে কয়জনের জীবনে সাধনরসের এই সমন্বয় দেখা গিয়াছে, রাখাল মহারাজ তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। সুখে দুঃখে মঠ মিশনের কর্মের ভিড়ে বা ভাগবত-প্রসঙ্গে সদাই দেখা যাইত তাঁহার প্রশান্ত, প্রসন্নমধুর মূর্তি।

এই সময়ে ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে তীর্থ পর্যটনের ঝোঁক প্রবল হইয়া উঠে। কেহ যাইতেছেন বুদ্ধগয়াতে, কেহ ছুটিতেছেন পুরী, বারাণসীতে। রাখাল কিন্তু ঠাকুরের সান্নিধ্য ছাড়িয়া কোথাও যাইতে রাজী নন, অটল হইয়া ঠাকুরেরই পদপ্রান্তে বসিয়া আছেন, অবিচল নিষ্ঠায় করিতেছেন তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা। কাশীপুরের বাগানে এ সময়ে তরুণ সাধক রাখালের যে মহিমোন্নত চরিত্র ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাই, উত্তরকালে রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের নায়করূপে দেখা যায় তাঁহারই পরিণত অভিব্যক্তি।

ঠাকুরের রুগ্নাবস্থায় নরেন একদিন অকস্মাৎ গয়াধামে চলিয়া যান। উদ্দেশ্য, সেখানে থাকিয়া কয়েকদিন তপস্যায় অতিবাহিত করিবেন। নরেনের অনুপস্থিতিতে ঠাকুরের সেবার অসুবিধা হইবে বলিয়া রাখাল কিন্তু বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এ দুর্ভাবনার কথা অন্তর্যামী রামকৃষ্ণের অগোচর রহিল না। রোগশয্যায় বসিয়া স্মিতহাস্যে সেদিন রাখালকে কহিলেন, "কেন তুই মিছে ভেবে মরছিস্? কোথায় যাবে সে? কদিন বাইরে থাকতে পারবে? ছাখ্না এল বলে। চার খুঁট ঘুরে আয়, দেখবি কোথাও কিচ্ছু নেই।"

খানিক বাদে নিজের বক্ষ স্পর্শ করিয়া ঠাকুর কহিলেন, "মনে রাখ্বি, যা কিছু আছে সব এইখানে।"

ঠাকুরের শ্রীমুখের এই আশ্বাস-বাণী শ্রবণে রাখাল বিস্ময়ে আনন্দে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুরের কথাই ঠিক হইল। কয়েকদিনের মধ্যে নরেন ও অন্যান্য ভক্তেরা ফিরিয়া আসিলেন, উপবেশন করিলেন ঠাকুরের চরণতলে।

সাধন করিতে করিতে এসময়ে রাখালের অন্তর্দৃষ্টি স্বচ্ছতর হইয়া আসে। উপলব্ধি করেন, প্রভু রামকৃষ্ণ শুধু তাঁহাদের মতো গুটিকয়েক ভক্ত শিষ্যেরই প্রভু নহেন। জগৎগুরুরূপে তিনি অবতীর্ণ। ঐশী লীলার এক চিহ্নিত পুরুষ তিনি। জগতের কল্যাণে প্রেমভক্তি বিতরণের জন্যই তিনি আসিয়াছেন।

একদিন সঙ্গী ভক্তদের কাছে রাখাল ঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার উপলব্ধির কথা স্পষ্টরূপে বলিয়া ফেলিলেন। দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "উনি নিজে কৃপা ক'রে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'সদ্গুরু জগদ্-গুরু'। তোমরা কি ভেবেছো, উনি কেবল আমাদের ক'জনার জন্যই আবির্ভূত হয়েছেন?"

নরেন একথা শুনিলেন। অসামান্য প্রতিভা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল তাঁহার। তাই যে কোনো তত্ত্ব ও তথ্য তাঁহার সম্মুখে আসিত, বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া ছাড়িতেন না। সেদিন রাখালের এই কথাটি সোৎসাহে তিনি সমর্থন করিলেন। পরমশ্রদ্ধায় ঠাকুরের মাহাত্ম্য-কীর্তন শুরু করিলেন।

রাখাল হৃষ্টচিত্তে ঠাকুরকে গিয়া কহিলেন, "আজকাল নরেন আপনাকে খুব বুঝতে শিখছে।"

ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। নরেনকে ডাকিয়া কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা বল্‌তো আমার ভেতরে কি ভাব রয়েছে।"

নরেন তৎক্ষণাৎ একথায় উত্তর দিলেন, "বীরভাব, সখীভাব—সমস্ত কিছু ভাব।"

রামকৃষ্ণ এবার নিজের বুকটি হাত দিয়া স্পর্শ করিলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, "দেখছি, এর ভেতরে যা কিছু।"

তারপর ইশারায় নরেনকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন, "ওরে, কি বুঝলি বল্‌তো?"

"যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভেতর থেকে।"

হর্ষভরে ঠাকুর রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কহিলেন, "দেখছিস্ কেমন বুঝ্‌ছে?"

ঠাকুরের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য সেদিন তাঁহার সহিত কথাপ্রসঙ্গে এমনিভাবে রাখালের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, চিরতরে তাঁহার অন্তরে গ্রথিত হইয়া যায়। রোগশয্যায় শায়িত থাকার সময় ঠাকুর প্রায়ই নরেনের সঙ্গে একান্তে বসিয়া নানা নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করিতেন, আশ্রিত ভক্ত-শিষ্যদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে ইঙ্গিত বা নির্দেশাদিও দিতেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন, "জানিস্, আমাদের রাখালের কিন্তু রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছে করলে একটা প্রকাণ্ড রাজ্য সে চালাতে পারে।"

ঠাকুরের সামান্য একটি মন্তব্য। কিন্তু ইহার নিহিতার্থ বুঝিয়া নিতে তীক্ষ্ণধী নরেনের একটুও দেরি হইল না। ঠাকুরের অভিপ্রায়, ভক্ত-শিষ্যদের যে সঙ্ঘ পরবর্তীকালে গঠিত হইবে, তাহার নায়ক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন রাখাল। বিনা দ্বিধায় তখনি মনে মনে নরেন ইহা মানিয়া নিলেন।

তারপর সুযোগমতো একদিন গুরুভাইদের কাছে রাখালের গুণগান করিতে করিতে কহিলেন, "রাখালরাজকে আজ থেকে আমরা রাজা বলেই ডাক্‌বো।

ভক্তেরা জানেন, রাখাল ঠাকুর রামকৃষ্ণের মানসপুত্র, পরম

আদরের ধন। কাজেই সবাই তাঁহার এই নূতন নামকরণ সোৎসাহে সমর্থন করিলেন।

ঠাকুরের কানে একথা উঠিল। নরেন এবং অন্যান্য ভক্তদের ডাকিয়া আনন্দ সহকারে তিনি কহিলেন, "বেশ করেছিস্ তোরা। রাখালের রাজা নামই ঠিক বটে।"

ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নায়ক সেদিন এভাবে ঠাকুর ও তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে চিহ্নিত হইয়া রহিলেন।

রামকৃষ্ণ ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছেন। তরুণ শিষ্যেরা প্রাণপণে দিন রাত তাঁহার সেবা করিয়া চলিয়াছেন, এই সময়ে এক পাগলী মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত। নানা অনাচার উপদ্রবও করিত।

শশী মহারাজ একদিন অতিষ্ঠ হইয়া কহিলেন, "পাগলীকে আর আস্‌করা দেওয়া ঠিক নয়। এবার এলে ধাক্কা মেরে তাড়াতে হবে।"

কৃপালু ঠাকুরের কানে একথা গেল। রাখালকে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "না—না সে আসবে। আর আমায় দেখেই চলে যাবে। ওকে তোরা তাড়াস্ নে।"

ঠাকুরের আদেশ শশী মহারাজকে শুনাইয়া দিয়া রাখাল কহিলেন, "ঠাকুরের ওপর উপদ্রব সবাই করে, আর তিনি তা অসীম করুণায় সহ্য ক'রে যান। সকলেই কি খাঁটি হয়ে ওঁর কাছে এসেছে? ওঁকে আমরা কষ্ট দিই নি? নরেন্দ্র-টরেন্দ্র আগে কি রকম ছিল—কত তর্ক করতো। ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছেন। ধরতে গেলে আমরা কেউই নির্দোষ নই।"

উদারবুদ্ধি রাখালের কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর বার বার সানন্দে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"প্রেমে, আনন্দে, সেবায় এবং নিয়ত সাধনভজনে রাখাল এক অপূর্ব উদার প্রেমদৃষ্টিতে সকলকে নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহার ঈশ্বরলুব্ধ চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও তাঁহার প্রেমমূর্তি দিন

দিন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইতে লাগিল। ঠাকুর রাখাল প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের সম্বন্ধে বলিতেন, 'আমি কে আর ওরা কে, এই জানলেই হল।' কাশীপুর উদ্যানে তাঁহাদের মধ্যে এই তত্ত্বই দিন দিন স্ফুরিত লইয়া উঠিল। দক্ষিণেশ্বরে যাহা বীজাকারে অন্তরঙ্গদের মধ্যে ছিল, কাশীপুর উদ্যানে তাহা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। অলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের লইয়া একটি মহাশক্তির সঙ্ঘ ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। যে প্রেমসূত্রে ইহারা পরস্পর আনন্দে আবদ্ধ হইতেছেন—সেই প্রেমসূত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ[১]।"

ভক্তদের প্রাণের ঠাকুর ও পরমাশ্রয় শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগস্ট মহাপ্রয়াণ করিলেন। নরেন রাখাল প্রভৃতি ভক্তরা শোকে হইলেন মুহ্যমান। যাঁহার প্রেরণায় ঐহিক জীবনের সব কিছু তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার চরণতলে বসিয়া আত্মিক সাধনার ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন, তিনি আজ কোন্ অদৃশ্যলোকে চলিয়া গেলেন? ত্যাগ বৈরাগ্যে দীপ্ত তরুণ সাধকের জীবনে নামিয়া আসিল এক সীমাহীন শূন্যতা।

নরেনের হৃদয়ে এখন একমাত্র চিন্তা, ঠাকুরের ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্তদের কি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, ঠাকুরের আদর্শ কি করিয়া সর্বত্র প্রচার করা যায়।

রামকৃষ্ণ নিজেই বুঝি একদিন সুযোগ মিলাইয়া দিলেন। ভক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র একদিন ঠাকুরঘরে বসিয়া ধ্যান-জপ করিতেছেন। হঠাৎ ছায়া মূর্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। কহিলেন, "তুই করছিস্ কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার আগে একটা ব্যবস্থা কর্।" নির্দেশটি দিয়া তখনই ঠাকুর অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ: জীবন কথা—দেবেন্দ্রনাথ বসু

সুরেশ মিত্র ছুটিয়া আসিয়া সাশ্রুনয়নে নরেনের কাছে এই দর্শনের কথা বর্ণনা করিলেন। কহিলেন, "ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদের জন্য একটা আস্তানার বন্দোবস্ত করো, একত্রে তারা সাধন-ভজন করুক। প্রতি মাসে আমি অর্থ সাহায্য করবো।"

নরেনের আনন্দ আর ধরে না, সোৎসাহে বরানগরের গঙ্গাতীরে একটা জীর্ণ বাগানবাড়ি ভাড়া করিয়া ফেলেন। তারপর রাখাল তারককে সঙ্গে নিয়া সেই ভাড়াটিয়া বাড়িতে শুরু করেন বসবাস।

ক্রমে অপর ভক্তেরাও এখানে আসিয়া মিলিত হন এবং তাঁহাদের এখানকার সাধনা ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের মধ্য দিয়া সূত্রপাত হয় মঠ প্রতিষ্ঠার। রামকৃষ্ণের কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী এই ভক্তেরা প্রত্যেকেই এক একটি বিশুদ্ধ আধার। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী মূলে, ভবতারিণীর মন্দিরে ও কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর আপন হস্তে এই সব আধারে মুমুক্ষার আলো জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এবার সে আলো আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

নরেন রাখাল প্রভৃতি ভক্তদের ঈশ্বর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হইয়া উঠিল। ধ্যান-জপ, কীর্তন ও শাস্ত্রব্যাখ্যার জোয়ার বহিয়া চলিল।

রাখালের বাবা আনন্দমোহন মাঝে মাঝে পুত্রের সঙ্গে দেখা করিতে বরানগরে আসিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, রামকৃষ্ণের বিরহে যুবক ভক্তেরা স্বভাবতই শোকে অভিভূত হইয়াছে, কিছুদিন পরে এই শোক কমিয়া গেলে যে যাহার বাড়িতে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল অন্যরূপ। ভক্তদের জীবনে ত্যাগ তিতিক্ষা ও তপস্যা যেন আরো তীব্র হইয়া দেখা দিল।

পিতা বার বার কষ্ট করিয়া মঠে আসেন, আর বিষাদখিন্ন হৃদয়ে ফিরিয়া যান। অবশেষে রাখাল একদিন তাঁহাকে নিজের সিদ্ধান্ত অকপটে জানাইয়া দিলেন, "কেন আপনারা কষ্ট ক'রে এখানে আসেন? আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ করুন, যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদের ভুলে যাই।"

দৃঢ়, প্রশান্ত কণ্ঠে যে ভাবে রাখাল এই সঙ্কল্পের কথা কহিলেন তাহাতে পিতা বুঝিয়া নিলেন, আর তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া নেওয়া সম্ভব নয়।

বৈরাগ্যবান্ সাধক রাখাল মায়িক সম্বন্ধ ত্যাগের কথা শুধু মুখেই উচ্চারণ করেন নাই, অন্তরেও ইহা প্রতিফলিত করিতে তিনি সক্ষম হন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী বিশ্বেশ্বরীর দেহান্ত ঘটে, কিন্তু নিরাসক্ত ত্যাগী সাধক রাখাল এজন্য একটুও বিচলিত হন নাই। পরবর্তীকালে তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক বালক পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শোনার পরও তিনি ছিলেন পরম প্রশান্ত ও নির্বিকার।

১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে বরানগর মঠের ত্যাগী ভক্তদের জীবনে সংযোজিত হয় এক নূতন অধ্যায়। নরেনের নেতৃত্ব ও প্রেরণায় বিরজা হোম সম্পন্ন করিয়া সবাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রাখালের নব নামকরণ হয়—স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

তপস্যা সম্পর্কে অন্তরঙ্গ ভক্তদের রামকৃষ্ণ বলিতেন, "ওরে, আমি ষোল ট্যাং করেছি, তোরা অন্তত এক ট্যাং তো কর্।" মুমুক্ষু ভক্তদের একথা স্মরণ আছে। সবাই এবার নব ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন, কৃচ্ছ্রময় সাধনার পথে দৃঢ়পদে তাঁহারা অগ্রসর হন।

এ সময়ে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় নবীন সন্ন্যাসীদের। ভিক্ষা কোনো দিন জুটে, কোনোদিন জুটে না। পাড়াপড়শীরা পরমহংসের ফৌজ বলিয়া টিটকারী দেয়, অনেকে নানা কুৎসা ছড়ায় আর গালাগালি দেয়। কিন্তু তপস্বীদের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সদাই সাধন-ভজনে তাঁহারা বিভোর হইয়া আছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরকালে এসময়কার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "বরানগরে কতদিন গিয়াছে যে খাবার কিছু নেই, ভাত জোটে তো নুন জোটে না। কয়েকদিন হয়তো শুধু নুনভাতই চললো, কিন্তু

কারুর তাতে গ্রাহ্য নেই। জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা ভাসছি। কখনো কখনো শুধু তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ ও নুনভাত—এই মাসাবধি চলেছে। আহা, সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেতো, মানুষের কথা কি?"

বরানগরের এই দিনগুলির স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরবর্তীকালে একবার রহস্যভরে বলেন, "যখন খাবার শক্তি ছিল তখন তেলাকুচো সিদ্ধ ভাত জোটাই মুশকিল হতো, আর এখন খাবার সামর্থ্য নেই তাই উপাদেয় আহার জুটছে।"

পরবর্তী পর্যায়ে বরানগরের তরুণ সাধুদের মধ্যে তীর্থদর্শন ও নিভৃত তপস্যার প্রেরণা জাগিয়া উঠে। অন্যান্য গুরুভাইদের মতো ব্রহ্মানন্দ মহারাজও কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন পরিব্রাজন ও তীর্থ পরিক্রমায়। উত্তর ও মধ্য ভারতের নানা পবিত্র পীঠে তিনি দিনের পর দিন ঘুরিয়া বেড়ান, কখনো বা গভীর ধ্যান-ভজনে থাকেন বিভোর।

সে-বার ব্রহ্মানন্দ নর্মদা তীরে ওঁকারনাথ তীর্থে আসিয়াছেন। পুণ্যতোয়া নর্মদার সহিত আচার্য শঙ্করের নানা স্মৃতি জড়িত, তাই এখানে পৌঁছিয়া ব্রহ্মানন্দ আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে রহিয়াছেন গুরুভাই সুবোধানন্দ, উভয়ে একটি স্থানীয় মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

নর্মদার আকর্ষণ ব্রহ্মানন্দ বহুদিন যাবৎই বোধ করিতেছিলেন। এবার এখানে পৌঁছানোর পর তাঁহার প্রাণমন ভরিয়া উঠিল।

এখানকার আকাশ, বাতাস, পবিত্র নদী-নীর সবই তপস্যার অনুকূল। কত প্রাচীন সাধুরা ঝুপড়ি বাঁধিয়া, গুম্ফা তৈরি করিয়া, নিভৃত সাধনায় বসিয়া আছেন। নদীতীরের এক বৃক্ষমূলে ব্রহ্মানন্দ সেদিন ধ্যানাসনে বসিয়া পড়িলেন। তারপর এখানে ধ্যানস্থ অবস্থায় একাদিক্রমে ছয় দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, অতীন্দ্রিয় পরম

বোধে সর্বসত্তা রহিল নিমজ্জিত। এই সময়ে গুরুভাই সুবোধানন্দ পরম যত্নে তাঁহার দেহের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

গোদাবরী তীরের দণ্ডকারণ্য অঞ্চল প্রভু রামচন্দ্রের লীলাস্থল। এখানকার পঞ্চবটী ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসীদের অতি প্রিয় তীর্থ। এই তীর্থে আসিয়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এক দুর্লভ অধ্যাত্ম-অনুভূতি লাভ করেন।

সেদিন পম্পা সরোবরের তীরে বসিয়া রাম সীতার পুণ্যস্মৃতির অনুধ্যান করিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল জটা-কম্বল পরিহিত ধনুর্ধারী রামচন্দ্র ও মা জানকীর দিব্য মূর্তি। তরু-লতার পুষ্পাঞ্জলি আর পাখির সেখানে কূজনে এক স্বর্গীয় আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে।

'জয় সীতারাম, জয় সীতারাম,' বলিয়া ব্রহ্মানন্দ ভাবাবেগে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন, তারপর বাহ্যজ্ঞান হইল তিরোহিত। চেতনা ফিরিয়া আসার পরও দীর্ঘকাল তাঁহার কণ্ঠে রামনামের গুঞ্জরণ চলিতে থাকে। এই সময়ে প্রায়ই ভাবতন্ময় হইয়া তিনি আত্মহারা হইতেন এবং সুবোধানন্দ সতর্কভাবে সদাই তাঁহাকে আগুলিয়া রাখিতেন।

দ্বারকা, গির্ণার, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দ ও সুবোধানন্দ সেবার বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছেন। এখানে আসিবার পর হইতেই মন তাঁহার কঠোর তপস্যার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। দিনের পর দিন ধ্যানাসনে তিনি বসিয়া থাকিতেন, নিমজ্জিত হইতেন অগাধ ভাব-সমুদ্রে। এক কুঠিয়াতে বাস করিয়াও কোনো কোনো দিন সঙ্গী গুরুভাই সুবোধানন্দের সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত হইত না। সুবোধানন্দ ভিক্ষা করিয়া যে আহার্য আনিতেন, প্রায়ই দেখা যাইত ব্রহ্মানন্দ তাহা স্পর্শ করেন নাই।

এই ধ্যানতন্ময়তা ও কৃচ্ছ্র সাধন দেখিয়া সুবোধানন্দ মনে মনে

ভীত হইয়া উঠিলেন। সত্যিই তো, এভাবে চলিলে শরীর আর কয়দিন টিকিবে? সেদিন গোবিন্দ মন্দিরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত তাঁহার দেখা। কথাপ্রসঙ্গে জানাইলেন, ব্রহ্মানন্দ বৃন্দাবনে আসিয়াছেন এবং কঠোর তপস্যা শুরু করিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গোসাঁইজী প্রায়ই যাতায়াত করিতেন, তাই ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। পরদিনই ধ্যানরত ব্রহ্মানন্দের কুটিরে গিয়া তিনি উপস্থিত হন। দুজনে দুজনকে দেখিয়া মহাখুশী, পুরানো দিনের নানা কথার আলোচনা শুরু হইল।

কথাপ্রসঙ্গে গোসাঁইজী কহিলেন, "পরমহংসদেব তো আপনাকে সব রকম সাধন-ভজন, অনুভূতি, দর্শনাদি করিয়ে দিয়েছেন। তবে আপনি এখন কেন আবার কঠোর সাধনা করছেন?"

ব্রহ্মানন্দ প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "তাঁর কৃপায় যে সব অনুভূতি বা দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলো আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছি মাত্র।"

গোসাঁইজী বুঝিলেন, ঐশ প্রেমের দুর্বার আবেগে ব্রহ্মানন্দ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, এখন তাঁহাকে নিরস্ত করা সম্ভব নয়।

এই সময়ে বৃন্দাবনে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ শুরু হইয়াছে। কয়েক দিন পরে ব্রহ্মানন্দও এই রোগে শয্যাশায়ী হন। সংবাদ পাইয়াই গোসাঁইজী তাঁহার কুটিরে ছুটিয়া আসেন। কুটিরে কোনো মশারী নাই দেখিয়া তখনি উহা কিনিয়া আনেন এবং নিজ হস্তে রোগীর শয্যায় তাহা টাঙাইয়া দেন। গোসাঁইজীর প্রদত্ত ঔষধ খাইয়াই ব্রহ্মানন্দ এ সময়ে তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করেন।

কিছুদিন পরে সঙ্গী সুবোধানন্দ উত্তরাখণ্ডে চলিয়া যান এবং ব্রহ্মানন্দ তখন নিভৃতে বসিয়া কঠোরতর তপস্যায় ব্রতী হন। যেদিন ইচ্ছা হয় মাধুকরী করেন বা কোনো কুঞ্জে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, কখনো বা উপবাসে দুই একদিন কাটাইয়া দেন, ধ্যান-জপে সময় কোথা দিয়া অতিবাহিত হয় তাহা জানিতে পারেন না।

এ সময়ে একদিন ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর জ্যোতির্ময় মূর্তি চকিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হয়; তারপর এই মূর্তি প্রসন্ন হাসি হাসিয়া

অদৃশ্য হইয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ প্রথমটায় চমকিয়া উঠেন, তারপর সারা অন্তর বিষাদে ভরিয়া উঠে। তবে তো ঠাকুরের ভক্ত-সেবক বলরাম আর ইহলোকে নাই! কয়েক দিন পরেই সংবাদ আসিল, বলরাম বসু মহাশয় সত্য সত্যই পরলোকে গমন করিয়াছেন। বলরামের ব্রহ্মানন্দের সম্বন্ধ মায়িক নয়, আত্মিক। ঠাকুরের পরমভক্ত ও অন্যতম প্রধান সেবক বলিয়াই বলরামের অন্তর্ধান সেদিন এমন করিয়া বাজিয়াছে।

অতঃপর কনখল, আবু পাহাড়, জ্বালামুখী প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল সাধন-ভজন করিয়া ব্রহ্মানন্দ তাঁহার গুরুভাই তুরীয়ানন্দ সহ আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। এবার তপস্যা শুরু করেন ব্রজমণ্ডলের কুসুম সরোবরে।

তুরীয়ানন্দ পরমপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে কখনো ভিক্ষা করিতে দিতেন না, নিজেই গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া আহার্য সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। একদিন ভিক্ষায় মিলিল কয়েকটি শুক্‌নো রুটি, একটু গুড় বা ব্যঞ্জনও যোগাড় করা গেল না। ঐ রুটিই কুয়োর জলে ভিজাইয়া তিনি ব্রহ্মানন্দের সম্মুখে ধরিলেন। দুই চোখ তাঁহার অশ্রুসজল হইয়া উঠিল, কম্প্রকণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ, আপনাকে ঠাকুর কত আদর-যত্ন করতেন। ক্ষীর, সর, ননী খাওয়াতেন, আর আমার কি দুর্ভাগ্য, আজ ঠাকুরের এত আদরের রাখালকে আমি খাওয়াচ্ছি শুক্‌নো রুটি।"

বলিতে বলিতে কান্নায় তিনি ভাঙিয়া পড়িলেন। গুরুভাইদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মানন্দ ছিলেন এমনি সমাদর ও শ্রদ্ধার বস্তু।

১৮৯২ সালের প্রথমার্ধ। রামকৃষ্ণ ভক্তদের মঠ এ সময় বরানগর হইতে আলম বাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সেখানকার চিঠি হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এক বিস্ময়কর আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হন। সুদূর আমেরিকায়, চিকাগোর বিশ্ব-ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। এই গৈরিক পরিহিত তরুণ সন্ন্যাসীর মুখে বেদান্তের তত্ত্ব ও ধর্ম সমন্বয়ের উদাত্ত বাণী

শুনিয়া পাশ্চাত্যের মানুষ উচ্চকিত হইয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকায় শুরু হইয়াছে ভারতের ধর্ম সংস্কৃতির নব মূল্যায়ন।

বিবেকানন্দের এই সাফল্য ভারতেও আনিয়া দিয়াছে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা, জাতি ও ধর্ম সম্পর্কে নূতনতর গর্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়া উঠিয়াছে। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে দশ দিক হইয়াছে পরিপূরিত।

কলিকাতা হইতে আরো সংবাদ আসিয়াছে, মঠে রামকৃষ্ণের জন্ম দিনের উৎসবে এবার যে আনন্দ উৎসব হয় তাহা অভূতপূর্ব। এবার দক্ষিণেশ্বরে প্রায় বিশ হাজার লোক প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দের হৃদয় তাই আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ঠাকুরের মাহাত্ম্য এবার তবে জগৎবাসী উপলব্ধি করিবে, তাঁহার উদার ধর্মীয় আদর্শ ও সাধনপথ গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিবে।

ইতিমধ্যে ব্রহ্মানন্দ স্বামী একবার লখ্‌নৌতে গিয়া উপস্থিত হন। গুরুভাইদ্বয় তুরীয়ানন্দ ও শিবানন্দের সহিত দীর্ঘদিন পরে তাঁহার মিলন ঘটে, সবাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন।

ব্রহ্মানন্দের সাধন পিপাসা তখনো পূর্ববৎ তীব্র রহিয়া গিয়াছে। মনে সঙ্কল্প করিয়াছেন, ঠাকুরের সহিত অবস্থানের কালে যে দিব্য আনন্দের স্রোতে সদা নিমগ্ন থাকিতেন, সাধনার ফলে সেই প্রেম-মধুর অনুভূতি জাগ্রত না হওয়া অবধি বৃন্দাবন তিনি ত্যাগ করিবেন না। আবার তাই সেই বৃন্দাবনেই ফিরিয়া আসিলেন, শুরু করিলেন কঠোর তপশ্চর্যা।

ধ্যান-ভজনের মধ্য দিয়া দিনের পর দিন তাঁহার কাটিয়া যায়। মাধুকরী বা ভিক্ষার জন্য কুটির হইতে এক পা-ও বাইরে যাইতে মন সরে না। একেবারে অজগর বৃত্তি। ঈশ্বরের কৃপায় যে দিন যে আহার্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই হয় তাঁহার ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি।

একদিন আসনে বসিয়া নিভৃতে একমনে তিনি জপ করিতেছেন। এসময়ে পুণ্যকামী এক শেঠ অযাচিতভাবে একখানি কম্বল তাঁহার গায়ে চড়াইয়া দিয়া চলিয়া যায়। ক্ষণপরেই সেখানে উপস্থিত হয়

এক তস্কর। কোনো কিছু না বলিয়া অতি সন্তর্পণে সেই কম্বলটি খুলিয়া নিয়া দ্রুতপদে সে সরিয়া পড়ে। ব্রহ্মানন্দ মৌন হইয়া জপ করিতেছেন। তস্করের কুকর্ম সবই লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু একেবারে রহিলেন নির্বিকার। মনে মনে ভাবিলেন, ইহা মহামায়ার লীলা ছাড়া আর কিছু নয়, এক হাতে দান করিয়া আর এক হাতে তিনিই এটি করিলেন অপসারিত।

রামকৃষ্ণ লীলা সংবরণ করার পর হইতেই ব্রহ্মানন্দ বিরহ-বেদনায় অধীর হইয়া রহিয়াছেন। হৃদয়ের মধ্যে অহর্নিশি গুমরিয়া উঠিতেছে একটা বিরাট আর্তি ও হাহাকার। এই আর্তি এই হাহাকার কি করিয়া দূর হইবে, দিব্য আনন্দে দেহ-মন-প্রাণ কবে হইবে পরিপ্লাবিত তাহা জানেন শুধু জীবনবিধাতা। নিজ জীবনের নৈরাশ্য ও অব্যক্ত বেদনার অবসান ঘটানোর জন্যই দিনরাত ধ্যান-ভজনের মধ্যে তিনি নিমজ্জিত থাকিতে চাহিতেছেন। বৈরাগ্যময় তপস্যাকে তাই এমনভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন।

বৃন্দাবন ধামে তখন রাসযাত্রার বড় ধুমধাম। ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রহ্মানন্দ লালাবাবুর কুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছেন। সুসজ্জিত রাসমঞ্চে কৃষ্ণ-রাধার বিগ্রহ বিরাজিত। ভক্ত ও সেবকেরা ভাবাবেশে মত্ত হইয়া কীর্তন করিতেছেন। দূর হইতে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে ব্রহ্মানন্দ সেদিকে তাকাইয়া আছেন, প্রেমভক্তি-রসের ধারায় হৃদয় হইতেছে অভিসিঞ্চিত।

হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, মঞ্চের সম্মুখে উপবিষ্ট প্রধান বাবাজীটি ইশারা দিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন।

কাছে যাইতেই বাবাজী তাঁহাকে পরমযত্নে নিজের পাশে বসাইয়া দিলেন। ব্রহ্মানন্দ তখন কীর্তনের আনন্দে আত্মহারা, অন্যদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর তাঁহার নাই। এক একবার ভাব-তন্ময়তার ফলে বাহ্য চেতনা লোপ পাইবার মতো হইতেছে।

রাস উৎসবের ভক্তদের এত হৈ-চৈ ও নর্তন-কীর্তনের মধ্যেও বাবাজী কিন্তু প্রশান্ত মনে তাঁহার জপে নিরত রহিয়াছেন। শুধু

তাহাই নয়, অপরিচিত তরুণ সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দের দিকেও তাঁহার সস্নেহ দৃষ্টি রহিয়াছে নিবদ্ধ। যতবারই ব্রহ্মানন্দের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়, ততবারই বাবাজী নিজের জপমালার মেরুটি তাঁহার ললাটে স্পর্শ করাইয়া দেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ উদ্দীপিত হইয়া উঠেন দিব্য আনন্দের তরঙ্গে।

ব্রহ্মানন্দের এবারকার বৃন্দাবন-বাস ও তপস্যার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে তাঁদের ভক্তেরা লিখিয়াছেন, "এইরূপ কঠোর সাধন-ভজন ও তন্ময়ভাবে থাকিতে থাকিতে একদিন তাঁহার অন্তরলোক সহসা দিব্য আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া আনন্দরসে প্লাবিত হইয়া উঠিল। মনের যে অশান্তি, যে অভাব, যে দুঃখ-নৈরাশ্য তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল তাহা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল। গভীর প্রশান্তি তাঁহার সর্বাঙ্গে প্রকাশ পাইল এবং আনন্দের নির্ঝর যেন নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমগ্র বিশ্ব এক অতীন্দ্রিয় ভাবস্পন্দনে স্পন্দিত হইল[১]।"

ব্রহ্মানন্দের সাধনজীবনে সহজ আনন্দের স্রোত আবার ফিরিয়া আসে। আনন্দময় ঠাকুরের কথা, তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভক্ত-শিষ্যদের কথা, ভাবিয়া হৃদয় হয় নবভাবে উদ্দীপিত। অতঃপর বৃন্দাবন ছাড়িয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়া সারা দেশে এক নূতন প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছে, নূতন আধ্যাত্মিকতার জোয়ার বহিতেছে। বিশেষ করিয়া কলিকাতার আকাশ-বাতাস তখন বিবেকানন্দের জয়গানে ভরপুর। আলম বাজারে তখন কত লোকজনের আনাগোনা। কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী রামকৃষ্ণভক্তদের দর্শনের জন্য। তাঁহাদের উপদেশ নিয়া জীবন গঠনের জন্য, আদর্শবাদী যুবকেরা দলে দলে আসিতেছে।

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন কর্তৃক প্রকাশিত।

দৃশ্যপটের এ পরিবর্তন দেখিয়া ব্রহ্মানন্দের আনন্দের সীমা নাই। বুঝিলেন, লগ্ন উপস্থিত—প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণ মূর্তিমেয় ভক্ত-শিষ্যদের জীবনে যে দীপালোক জ্বালাইয়া গিয়াছেন, এবার তাহা ছড়াইয়া পড়িবে দিগ্‌বিদিকে। যাঁহারা ঠাকুরের কৃপাধন্য, অনন্য নিষ্ঠায় যাঁহারা ঠাকুরকে জ্ঞান করিয়াছেন পরমাশ্রয়রূপে, এবার তাঁহাদের প্রস্তুত হইতে হইবে চরম ত্যাগের জন্য, তাঁহার কাজে দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য।

সেদিন বলরাম বসুর ভবনে বসিয়া গুরুভাই যোগানন্দ ও প্রেমানন্দকে কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "ঠাকুরের কৃপায় বৃন্দাবনে পরম আনন্দে ছিলুম। এবার যাতে মঠের সবাকার ভেতর ঠাকুরের সেই প্রেমভক্তির ভাব বিকাশ পায়, যাতে তাদের দেখে ঠাকুরের কথা সবাই স্মরণ করতে পারে, তাই তো বৃন্দাবন ছেড়ে তাদের সেবা করতে এলুম। এমন সময়, এই যুগ তো আর সহজে মিলবে না।"

আন্তরিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ে ভরা ব্রহ্মানন্দের এই কথাকয়টি। শুধু তাহাই নয়, তিনি যে তাঁহার সর্বশক্তি নিয়া ঠাকুরের ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য এবার বদ্ধপরিকর তাহাও সেদিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল গুরুভাইদের চোখে।

বিশ্ব-ধর্মসভার জয়গৌরব নিয়া, পাশ্চাত্য দেশে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় ১৮৯৭ সালে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাগবাজারে পশুপতি বোসের বাড়িতে দেশবাসী তাঁহাকে সাড়ম্বর সংবর্ধনা জ্ঞাপনের বন্দোবস্ত করিয়াছে। সেখানে গিয়া স্বামীজীর কণ্ঠে ব্রহ্মানন্দ একটি মনোহর পুষ্পমালা জড়াইয়া দিলেন।

স্বামীজী তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলেন। স্মিতহাস্যে কহিলেন, "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।"

ব্রহ্মানন্দও সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল স্বরে উত্তর দেন, "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাসম পিতা।"—স্বামীজী বয়সে তাঁহা হইতে কয়েক দিনের বড়, এ কথাটি তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন।

সেই দিনই অপরাহ্নে আলম বাজার মঠে ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী কাছে ডাকাইলেন, বিদেশ হইতে সংগৃহীত টাকার ব্যাগটি তাঁহার হাতে দিয়া সবাইর উদ্দেশে কহিলেন, "এদ্দিন যার জিনিস বয়ে বেড়িয়েছি আজ তাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।"

এই বৎসরই স্বামীজীর নেতৃত্বে বলরাম বসুর ভবনে মিলিত হইয়া ভক্তরা স্থাপনা করিলেন রামকৃষ্ণ মিশন। ইহার অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মানন্দ মহারাজের প্রেরণা ও নির্দেশে মিশনের কর্মীরা মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, দেওঘরে দুর্ভিক্ষের ত্রাণ কার্যে অবতীর্ণ হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শে বিবেকানন্দ তখন আলমোড়ায় গিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দকেই একধারে মঠ ও মিশনের সমস্ত কিছু দায়িত্ব বহন করিতে হইতেছে: অর্থ সংগ্রহ, কর্মীদের পরিচালনা, তরুণ ভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবনের সাহায্য দান, সব কিছু তিনি করিতেন অনন্য নিষ্ঠায় এবং অসাধারণ দক্ষতার সহিত। কিন্তু এত কিছু বহুমুখীন কর্মে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও কোনোদিন তাঁহার আত্মাভিমান জাগে নাই, বাহ্যিক জীবনের সংঘাত তাঁহাকে চঞ্চল করে নাই। অপার প্রশান্তি নিয়া অচল অটল পর্বতের মতো সংগঠনের স্নায়ুকেন্দ্রে তিনি সদাই থাকিতেন বিরাজিত।

স্বামীজী সে-বার ব্রহ্মানন্দকে কহেন, "রাজা, আমাদের এমন একটা সংগঠন তৈরি করো যা আপন ত্যাগে ও তেজ বীর্যে আপনা-আপনি চলে যায়, আমরা মরি বা বাঁচি তার অপেক্ষা না ক'রে এটা যেন বেঁচে থাকতে পারে।"

স্বামীজীর এই নির্দেশ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও যত্নে মিশনের মধ্যে এমন একটা দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা ও আত্মিক শক্তির উদ্বোধন ঘটে যাহা দীর্ঘদিন রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর বহুমুখী কর্মধারাকে সঞ্জীবিত ও উদ্দীপিত করিয়া রাখিয়াছে।

কাশ্মীরে কিছুকাল অবস্থানের পর স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে

ফিরিয়া আসেন। স্বাস্থ্য তাঁহার তখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাখাল প্রভৃতি গুরুভাইরা আতঙ্কিত হইয়া পড়েন।

গিরিশ ঘোষ এ সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি মঠে ছুটিয়া আসেন। শয্যায় পড়িয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না, স্বামীজী কোনোমতে হাঁটিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গিরিশবাবু কহিলেন, "একি স্বামীজী, শুনলাম তুমি অত্যন্ত পীড়িত, তাই দেখতে এলাম। এখন দেখছি তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো।"

স্বামীজী উত্তর দিলেন, "কি করবো বল জি-সি। বিছানায় শুয়ে থেকে যতবার চোখ মেলেছি দেখেছি রাজা প্যাঁচার মতো মুখ ক'রে সামনে বসে আছে। তার মুখখানার ঐ ভাব দেখে আর শুয়ে থাকতে পারলুম না। তাই আস্তে আস্তে উঠে এলুম। আমি হাঁট'ছি বেড়াচ্ছি দেখে যদি রাজার মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে।"

এমন সময়ে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহেন, "এ কি, তুমি এভাবে উঠে এলে যে? শরীর কি কিছুটা ভাল বোধ হচ্ছে?"

গিরিশবাবুকে উদ্দেশ করিয়া স্বামীজী কহেন, "রাজা শালা আমায় রোগী ক'রে শুইয়ে রাখতে চায়। রোগ-কোগ কি? আমি এখন বেশ ভাল আছি।"

ব্রহ্মানন্দ স্থান ত্যাগ করার পর কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, "বুঝলে জি-সি, রাজার কাজ দেখে আমি কিন্তু অবাক্ হয়ে গেছি। কি সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে মঠ ও মিশনের কাজ চালাচ্ছে। রাজার রাজবুদ্ধির তারিফ অবশ্যই করতে হয়। ঠাকুর ঠিকই বলতেন—রাখালের রাজবুদ্ধি; একটা প্রকাণ্ড রাজ্য চালাতে পারে। তা ঠিক।"

গিরিশ সোৎসাহে একথায় সায় দেন,—"তা হবে না কেন? ঠাকুরেরই তো ছেলে।"

স্বামীজী হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠেন। তারপর বলেন, "ভ্যাখো, রাজার স্পিরিচুয়েলিটি আঁকড়ে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে

কোলে করতেন, আদর ক'রে খাওয়াতেন, এক সঙ্গে শয়ন করতেন, তার কি তুলনা হয়? রাজা আমাদের মঠের প্রাণ—সত্যিই সে আমাদের রাজা।"

সে-বার এক ইউরোপীয় ভক্ত মঠে আসিয়া বিবেকানন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতেছেন, স্বামীজীর কাছে কোনো একটি জটিল তত্ত্বের তিনি মীমাংসা চান। স্বামীজী সাহেবকে বলেন, "তুমি এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে। তাঁর কাছে গিয়ে সব খুলে বল।"

ভক্তটি ব্রহ্মানন্দেরই দ্বারস্থ হইলেন। ব্রহ্মানন্দ কিন্তু তাঁহাকে ফেরত পাঠাইলেন স্বামীজীরই কাছে, কহিলেন, "তিনি ছাড়া তোমায় এ তত্ত্ব কে বোঝাবে, বল?"

স্বামীজীর কাছে ভক্তটি আবার যাইতেই তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তবে শোন, ওঘরে বসে আছেন যে ব্রহ্মানন্দ তিনি হচ্ছেন একটি সক্রিয় ডায়নামো—আধ্যাত্মিক শক্তি সদাই নিঃসৃত হচ্ছে তার ভেতর থেকে। আর আমরা এখানকার সবাই হচ্ছি তাঁরই অধীনস্থ। তুমি তাঁকে ভাল ক'রে চেপে ধর—কাজ হবে।"

ব্রহ্মানন্দ বুঝিলেন, বিদেশী ভক্তটি একজন প্রকৃত সত্যান্বেষী। এবার সযত্নে কাছে বসাইয়া জটিল সমস্যার সমাধান তিনি অবলীলায় করিয়া দিলেন। ভক্তটির আনন্দ আর ধরে না। তখনই স্বামীজীর কক্ষে গিয়া বার বার জ্ঞাপন করেন তাঁহার কৃতজ্ঞতা। বলেন, "আমার ভারতে আসা সার্থক হয়েছে, স্বামী ব্রহ্মানন্দের কৃপায় সত্য বস্তু কি, তা আমি বুঝতে পেরেছি।"

১৮৯৯ সালে রামকৃষ্ণ মঠ বেলুড়ের নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। তারপর একদিন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রাণপ্রিয় রাজাকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান। এসময়ে গুরুভাইয়ের সমক্ষে যুক্তকরে ব্রহ্মানন্দের কাছে নিবেদন করেন, "রাজা, তোর আদর শুধু ঠাকুরই যে জানতেন। আমরা কি জানি যে তোর প্রকৃত সমাদর করবো?"

দ্বিতীয়বার আমেরিকা ও ইউরোপ সফর করিয়া স্বামীজী দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর অল্প দিনের মধ্যেই রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করেন ব্রহ্মানন্দের উপর। স্নেহপূর্ণ নয়নে স্বামীজী তাঁহাকে কহেন, "রাজা, আজ থেকে এসবই তোর। আমি কেউ নই।"

বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ দুজনেরই প্রকৃতি ও গুণাবলী ছিল ভিন্ন রকমের। কিন্তু দুই জনেই ছিলেন অতি অন্তরঙ্গ, পরস্পরের প্রতি একান্তভাবে নির্ভরশীল ও বিশ্বাসসম্পন্ন। আর সর্বোপরি তাঁহাদের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য হইয়া উঠিয়াছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের একাত্মকতার মধ্য দিয়া।

রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সংগঠনে, রামকৃষ্ণের তত্ত্ব প্রচারে স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দ দুইজনেই ছিলেন দুইজনের পরিপূরক। তাঁহাদের যুগ্মশক্তি ও যুগ্ম প্রতিভা তাই এদেশের অধ্যাত্মজীবনের কল্যাণে এমন সার্থক হইতে পারিয়াছিল।

"স্বামীজী ছিলেন দৃপ্ত সিংহের মতো তেজস্বী, সাগরের মতো অপার, গভীর জ্ঞানবৈরাগ্য ও বিদ্যাবুদ্ধির আধার, তারুণ্য শক্তির দুকূলপ্লাবী উত্তাল উদ্বেল তরঙ্গে সতত চঞ্চল, আর মহারাজ ছিলেন ধীর প্রশান্ত অচঞ্চল, আকাশের মতো উদার, অপরিমেয়, অসীম ভাবতন্ময়, কমনীয় বালস্বভাবের মাধুর্যে কোমল। একজন ছিলেন প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক কর্মশক্তির দীপ্যমান ভাস্কর, অপরে ছিলেন অন্তর্মুখী ভাবদ্যুতির বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতি। একজনের বাণী প্রাণস্পর্শী বিদ্যুৎবাহী শক্তিকণা, অপরের অন্তঃসলিলা ফল্গুর পূতপ্রবাহ। একজনের বিশাল আকর্ণবিস্তৃত নয়নে বিশ্বগ্রাসী প্রেমপূর্ণ প্রখর দিব্য তেজ। অপরের ধ্যানস্তিমিত লোচনে সকরুণ, অপার্থিব, ঠাকুরের কথায়—'ক্যালকেলে দৃষ্টি, যেন ডিমে তা দিচ্ছে'[১]।'

দ্বিতীয় বারে আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া স্বামী

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত

বিবেকানন্দ একদিন ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য গুরুভাইদের বলেন, "প্রথম বারের পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে ওদের সঙ্ঘবদ্ধতা দেখে বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, তাদের সব প্রতিষ্ঠানের ভিতর ব্যবসাদারী বুদ্ধি,—আর নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ভরে রয়েছে। নিজের নিজের প্রাধান্য আর ক্ষমতার লোভে যেন সবাই তারা সদাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। গরীব দুর্বলদের পিষে ফেলে ধনীরা নিজেদের সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের যোগাড় করে নিচ্ছে। এই দেখে এবার জ্ঞান হল—'ওসব যেন সাক্ষাৎ নরক।"

ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ত্যাগপূত আদর্শ প্রেমভক্তির ভিত্তিতে মঠের কাজকর্ম চলিতেছে, ভক্ত ও কর্মীরা নিঃস্বার্থভাবে জীব সেবায় ব্রতী হইয়াছে, ইহা দেখিয়া স্বামীজী খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

মিশনের তরুণ কর্মীদের অধ্যাত্ম-জীবন যাহাতে সুগঠিত হয়, কর্মব্রত উদ্‌যাপনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ঈশ্বরভজন ও ঈশ্বরনিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়, সেদিকে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। ত্যাগ বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক ধৃতি দৃঢ় না হইলে, ঈশ্বরপ্রেমের আনন্দ-রস হৃদয়ে ওতপ্রোত না হইলে, মঠ মিশনের কাজে স্বার্থবুদ্ধি, ঐহিকতা ও অহমিকা আসিবে, সঙ্ঘের ভিত্তি ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়িবে, ইহা ব্রহ্মানন্দ জানিতেন। তাই সর্বসময়ে তরুণ সাধুদের তিনি যোগাইতেন ঈশ্বরীয় প্রেরণা ও সাধন-ভজনের উদ্দীপনা।

কর্মীদের উপদেশ দিতে গিয়া মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "মনের গোলমালের জন্য ধ্যান-জপ হয় না। কাজের জন্য ধ্যান-জপের সময় পাওয়া যায় না, মনে করা ভুল। ওয়ার্ক অ্যাণ্ড ওয়ারশিপ—কর্ম এবং উপাসনা একসঙ্গে করবার অভ্যাস করতে হবে। কেবল সাধন-ভজন নিয়ে থাকতে পারলে ভাল, কিন্তু কয়জনে তা পারবে? কিছু না ক'রে অজগরবৃত্তি অবলম্বন ক'রে থাকে এক সম্পূর্ণ জড়বুদ্ধি

লোকেরা অর্থাৎ যাহাদের মস্তিষ্ক খাটাবার কোনোই শক্তি নেই, কোনো রকমে বেঁচে থাকে, তারাই পারে—আর পারেন মহাপুরুষেরা যাঁরা সকল কর্মের পার। গীতায় আছে, কর্ম না ক'রে জ্ঞানলাভ হয় না। কর্মের মধ্যে দিয়ে যেতেই হয়। যারা কর্ম ছেড়ে দিয়ে সাধনভজন করে, তাদেরও ঝুপড়ি বাঁধতে আর রান্না করতে সময় কেটে যায়। কর্ম ঠাকুর স্বামীজীর—এই ভাব নিয়ে করলে কোনো বন্ধন তো হবেই না, অধিকন্তু তার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক, নৈতিক মানসিক, শারীরিক সব রকমের উন্নতি হবে। তাঁদের পায়ে আত্মসমর্পণ করে। শরীর মন সব তাঁদের পায়ে দিয়ে দাও।"

মানুষের মনস্তত্ত্ব ও মনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে মহারাজ অভিজ্ঞ ছিলেন। এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নবীন সাধকদের উদ্দেশে বলিতেন[১]

"মন খাটিতে চায় না, সকল সময় সুখ খোঁজে। কিছু পাইতে হইলে খাটিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় অভ্যাস দৃঢ় করিবার জন্য জোর করিয়া ধ্যান-জপাদি করিতে হয়। যদি অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে কষ্ট বোধ হয়, শুইয়া জপ করিবে, ঘুম পাইলে বেড়াইয়া বেড়াইয়া করিবে। এইরূপে অভ্যাস দৃঢ় ও ধাতস্থ করিয়া লইতে হইবে। ইচ্ছা হইলেই কি ছাড়িয়া দিতে হইবে? এইরূপভাবে চলিলে কোনোদিনও অভ্যাস দৃঢ় হয় না। মনের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করা চাই। এইরূপ চেষ্টার নামই সাধন। মনকে বশে আনাই সাধন পথের লক্ষ্য।"

পৃথিবীতে সৎ অসৎ দুই আছে এবং থাকিবে। এসম্পর্কে নবীন সাধনার্থীদের তিনি দার্শনিক মনোভাব অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেন। বলিতেন, "সৎভাবের লোক উপকার করেই যাবে, এ তাদের স্বভাব। দুষ্টলোক অনিষ্ট করবে, সেও কিন্তু তাদের স্বভাব। 'একজন সাধু নদীর ধারে বসে ধ্যানজপ ভজন করত। একদিন

একটি বিছে জলে ভেসে যাচ্ছে দেখে তার মনে দয়া হল এবং হাতে ধরে বিছেটাকে জল থেকে পাড়ে তুলে দিলে। বিছেটাকে যেমনি ধরতে গেছে, অমনি সে হাতে কামড়ে দিয়েছে। সাধুটি তখন যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে বিছেটা আবার জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। তা দেখে সাধুটি আবার তাকে পাড়ে তুলে দিলে—বিছেটা আবার তাঁকে কামড়ে দিলে। কিছুক্ষণ পরে বিছেটা আবার জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখে সাধুটি যখন তাকে ফের তুলতে যাচ্ছে, তখন এক ব্যক্তি বললে,—'দেখুন বিছেটা আপনাকে বার বার কামড়ে দিচ্ছে, আর আপনি ফের তাকে তুলতে যাচ্ছেন? তার কথা শুনে সাধুটি জবাব দিলে, 'বিছের স্বভাব কামড়ানো, সে কামড়াচ্ছে; সাধুর স্বভাব পরোপকার করা, আমি তাই করব। সে আমাকে কামড়েছে বলে আমি নির্দয় হব কেন?' এই ব'লে আবার বিছেটাকে জল থেকে তুলে অনেক দূরে ফেলে দিলে, যাতে আর না জলে পড়তে পারে। যাদের সৎস্বভাব, তারা এইরূপই ক'রে যাবে—তারা কখনও নিজের স্বভাব ছাড়ে না।"

তরুণ ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মানন্দের কণ্ঠে যে আশা ও উৎসাহের বাণী শুনিতেন, তাহা অপূর্ব। তিনি বলিতেন, "উঠে পড়ে লেগে বস্তু লাভ করে নে। মনটাকে ঠিক কম্পাসের কাঁটার মতো করতে হবে। জাহাজ যে দিকেই যাক না কেন, কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকেই থাকে। তাই জাহাজের দিক্ ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তাহলে তারও আর কোনো ভয় থাকে না। হাজার কুলোকের মধ্যে পড়লেও তার বিশ্বাস ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবৎকথা হলেই সে ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। কি রকম জানিস্? যেমন চকমকি পাথর শত বৎসর জলের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার আগুন নষ্ট হয় না—তুলে লোহার ঘা মারা মাত্রই আগুন বেরোয়, সেই রকম তাঁকে লাভ ক'রে যে ধন্য হয়েছে সে অন্য কিছুতেই মন দিতে পারে না। কেবল তাঁকে নিয়েই দিন যাপন করে। ভগবৎ কথা ও সাধু ভক্তের সঙ্গ ছাড়া তার আর কিছুই ভাল লাগে না। ঝড়ের এঁটো

পাতার মতো পড়ে থাকে, নিজের কোনো ইচ্ছা বা অভিমান থাকে না, বাতাস তাকে যে দিকে নিয়ে যায় সে দিকেই যায়। সে তখন সংসারেও থাকতে পারে, আবার সচ্চিদানন্দ-সাগরেও ডুবে যেতে পারে।

"তোদের মনের স্বভাবটা যাতে পাকা হয়ে যায় তার চেষ্টা কর্। একবার অন্য রকম হয়ে গেলে আর উপায় নেই। বাসনাহীন মন কেমন জানিস? যেমন শুকনো দেশলাই—একবার ঘষলেই দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে। কিন্তু ভিজে গেলে ঘষতে ঘষতে কাঠি ভেঙে গেলেও জ্বলে না। তেমনি মনে একবার অন্য রকম ছাপ পড়লে শত চেষ্টাতে তা নষ্ট করা যায় না।"

মঠের যুবক সাধুদের সতর্ক করিতে গিয়া তিনি কহিতেন,[১] "আসল তপস্যা তিনটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম সত্যাশ্রয়ী হতে হবে, সত্য খোঁটাকে সর্বদা ধরে থাকতে হবে, প্রত্যেক কাজে। দ্বিতীয় কামজয়ী হতে হবে। তৃতীয় বাসনা জয়ী হতে হবে। এই তিনটি পালন করতেই হবে এইগুলি জীবনে ফলানো বা সাধন করাই আসল তপস্যা। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি সবচেয়ে দরকারী, অর্থাৎ ব্রহ্মচারী হতে হবে। আমাদের শাস্ত্র বলেন, যারা বারো বৎসর কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য পালন করে, তাদের পক্ষে ভগবান লাভ করা খুব সোজা। এরূপ হওয়া ভারী শক্ত। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের বলছি, ঠিক ঠিক ব্রহ্মচারী না হলে ঠিক ঠিক ধ্যান হওয়া অসম্ভব। সূক্ষ্ম বাসনা জয় করা ভারী শক্ত। এই জন্য সন্ন্যাসীদের এত কঠোর নিয়ম। সন্ন্যাসী কোনো স্ত্রীলোকের দিকে তাকাবে না। এমন কি, ফটোগ্রাফ দেখলেও মনের উপর একটা ছাপ পড়তে পারে। মনের স্বভাব হচ্ছে কোনো একটা সুন্দর জিনিস দেখলেই ভোগ করতে চায়। এইরূপে অনিচ্ছাসত্ত্বে অনেক জিনিস ভোগ করে। এটা অতিশয় হানিকর। ব্রহ্মচর্য পালনে ওজঃশক্তি বৃদ্ধি হবে।"

১ ধর্মপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ : কথোপকথন

একটি জিজ্ঞাসু ভক্ত ধ্যানজপ সম্পর্কে মহারাজের কাছে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাঁহার উত্তরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি লিখেন,[১] "ধ্যান-জপে ও পূজা-পাঠে যত বেশী সময় দিতে পারা যায় তা কল্যাণকর। যাহারা শুধু সাধন-ভজন লইয়া থাকিতে চায়, তাহাদের অন্তত ১৪-১৫ ঘণ্টা ধ্যান-জপ করা উচিত। অভ্যাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে সময় আরও বাড়িয়া যাইবে। মন যত ভিতরের দিকে যাইবে, তত বেশী আনন্দ পাইবে। ভজনে একবার আনন্দ পাইলে আর কোনোমতেই ছাড়িতে ইচ্ছা হইবে না। তখন কত সময় কি করিতে হইবে—সে প্রশ্নের মীমাংসা মন নিজেই ঠিক করিয়া লইবে। মনের এইরূপ অবস্থা না হওয়া-পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ⅓ ভাগ সময় যাহাতে ধ্যান-জপে কাটে, বিশেষভাবে তাহার চেষ্টা করিবে। সৎগ্রন্থ পাঠ করিবে ও ধ্যান-জপের সময় মনে কত ভাব উঠে, মন কতটা স্থির হয় ইত্যাদি বিষয় ভাবিবে। শুধু চোখ-কান বুজিয়া ঘণ্টাখানেক ধ্যান-জপ করিলেই সব হইয়া গেল না। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করা দরকার। এইভাবে চিন্তা করিলে মনের অবস্থা বিশেষভাবে বুঝা যায় এবং মনে যে সব ফুট উঠে সেগুলিকে ত্যাগ করিবার চেষ্টা করা যায়। এইরূপে একটি একটি করিয়া ত্যাগ করিবার পর মন যখন শান্ত হইয়া যাইবে তখনই ঠিক ঠিক ধ্যান জপ হইবে। ধ্যান-জপের উদ্দেশ্য মনকে শান্ত করা। ধ্যান-জপ করিয়া মন যদি শান্ত না হয়, আনন্দ যদি না পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে ধ্যান-জপ ঠিক ঠিক হইতেছে না।"

ব্রহ্মানন্দকে আরও বলিতে শুনা যাইত, "যারা সাধন-ভজন করে, সব অবস্থায়ই করে। যেখানে সুযোগ-সুবিধা বেশী হয় সেখানে তারা আরও জোরে সাধন-ভজন করে। এখানে সুবিধা হচ্ছে না, ওখানে সুবিধা হচ্ছে না ক'রে যারা বেড়ায়, তারা কোনো কালে কিছু করতে পারে না, ভ্যাগাবণ্ডের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে শুধু সময় নষ্ট করে।

১. পত্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ

"খুব জপ কর্ বাবা, খুব জপ কর্। কলিতে জপই হচ্ছে সহজ উপায়। এ যুগে যোগ-যাগ করা বড় কঠিন। জপ করতে করতেই মন স্থির হয়ে ইষ্টেতে লয় হয়ে যাবে। জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমূর্তি চিন্তা করতে হয়। তাতে জপ-ধ্যান দুই-ই একসঙ্গে হয়ে যায়। এভাবে জপ করতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়।

"স্মরণ-মনন খুব রাখতে হবে। জপ-ধ্যান করতে গেলে নানা সুযোগ সুবিধা খুঁজে নিতে হয়, কিন্তু স্মরণ-মননে কোনো অপেক্ষা রাখে না। খেতে-শুতে, উঠতে-বসতে, সব সময়ই স্মরণ-মনন হতে পারে। দিনরাত স্মরণ-মনন রাখতে পারিস্ তো জানবি, মন অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। রামানুজের মতে, ঐরূপ অবিশ্রান্ত চিন্তার নামই ধ্যান।"

তরুণ সাধকদের শুদ্ধতা, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও পবিত্রতার উপর ব্রহ্মানন্দ মহারাজ অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। কহিতেন, "ছাখো, ঠাকুর বলতেন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। তাই বলছি, যদি আমরা তার ভক্ত, তাঁর সেবক, তাঁর দাস বলে পরিচয় দিতে চাই, তা হলে আমাদের শুদ্ধ, পবিত্র হতে হবে। শুদ্ধ হৃদয়ই তাঁর আসন। অশুদ্ধ হৃদয় থেকে তিনি অনেক দূরে থাকেন। আমাদের হৃদয় যখন কাঁচের মতো স্বচ্ছ ও নির্মল হবে—কোনো দাগ থাকবে না, তখনই আমাদের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা হবে। তখনই আমরা তাঁর ভক্ত, সেবক, আশ্রিত বলবার অধিকারী।

"শুদ্ধ মনে তাঁর ছাপ সুন্দর পড়ে। আরশিতে ময়লা থাকলে যেমন মুখ দেখা যায় না, তেমনি অশুদ্ধ মনে ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে না। তোমাদের এখন অল্প বয়স, মনে কোনো রকম ময়লা ধরে নি, এখন থেকে তাঁর জন্য হৃদয়ে আসন পেতে রাখ—অন্য কোনো জিনিসের স্থান যেন সেখানে আর না হয়। শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন না হলে তাঁকে কখনো জানা যায় না। শুদ্ধ পবিত্র হও। তাঁকে লাভ করতেই হবে এ জীবনে।"

তপস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে এক নবীন সাধুকে তিনি লিখিতেছেন[১], "মনকে দুষ্ট অশ্বের সঙ্গে তুলনা করেছে। দুষ্ট অশ্ব বিপথে নিয়ে যায়। যে রাশ টেনে রাখতে পারে সেই ঠিক চলে। খুব লড়াই কর। কি কচ্ছ তোমরা? গেরুয়া নিলে আর সংসার ত্যাগ করলেই কি সব হয়ে গেল? কি হয়েছে তোমাদের?

"সময় শুধু চলে যাচ্ছে। এক মুহূর্তও নষ্ট ক'রো না। খুব জোর আর তিন চার বৎসর করতে পারবে, তারপর শরীর, মন দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন আর কিছুই করতে পারবে না। না খাটলে কি কিছু হয়? তোমরা বুঝি ভেবেছ যে আগে অনুরাগ ও ভক্তি বিশ্বাস হোক তারপর ডাকবে। তা কি কখনও হয়? অরুণোদয় না হলে কি আলো আসে? তিনি এলেই তবে প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে আসবে। তাঁকে জানবার জন্যই তপস্যা। তপস্যা ছাড়া কি কিছু হয়। ব্রহ্মা প্রথমে শুনেছিলেন, 'তপঃ, তপঃ, তপঃ।' দেখছ না অবতার পুরুষদের পর্যন্ত কত খাটতে হয়েছে! কেউ কি না খেটে কিছু পেয়েছে? বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য এঁদেরও কত তপস্যা করতে হয়েছে। আহা! কি ত্যাগ, কি তপস্যা!

"বিশ্বাস কি প্রথমে হয়? রিয়েলিজেশান বা অনুভূতি হলে তবে বিশ্বাস হয়। কিন্তু তার আগে শুধু গুরু মহাপুরুষদের বাক্যে বিশ্বাস ক'রে, এমন কি অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে এগুতে হয়। ঠাকুরের সেই ঝিনুকের কথা জানতো? স্বাতী নক্ষত্রের এক-ফোঁটা জলের জন্য হাঁ ক'রে থাকে, ফোঁটাটা পেলেই অতল জলে ডুবে যায়, গিয়ে মুক্তা তৈরি করে। তোমরাও তেমনি গুরুকৃপারূপ এক-ফোঁটা জল পেয়েছো। যাও, ডুবে যাও!

"তোমাদের একটা আত্মবিশ্বাস নেই। সাধন পথে পুরুষাকার দরকার। কিছু কর—চার বৎসর অন্ততঃ ক'রে দেখ দেখি। যদি কিছু না হয় তবে আমার গালে একটা চড় মেরো। তমঃ রজঃ

১ পত্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ

ছাড়িয়ে সত্ত্বে যেতে না পারলে ধ্যান-জপ কিছু হয় না। তারপর সত্ত্বকেও ছাড়িয়ে চলতে হবে। এমন জায়গায় যেতে হবে যে আর আসতে না হয়। মানুষ জন্ম কত দুর্লভ। অপর প্রাণীদের জ্ঞান হয় না। একমাত্র মানুষ জন্মেই ভগবান্ লাভ হয় এবং তা করতে হবে। এই জন্মে খেটে-খুটে মনটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেন আর জন্মাতে না হয়। প্রথমে মনকে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, পরে সূক্ষ্ম থেকে কারণ, কারণ থেকে মহাকারণ, মহাকারণ থেকে মহাসমাধিতে নিয়ে যেতে হবে।

"আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর পাদপদ্মে ছেড়ে দাও। তিনি ছাড়া যে আর কিছু নেই। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' তিনিই সব, সবই তাঁর। কিন্তু হিসেব ক'রো না। আত্মসমর্পণ কি একদিনে হয়? সেটা হ'লে তো সব হ'য়েই গেল। সেটার জন্য খুব চেষ্টা করতে হয়। অনন্ত জীবন রয়েছে। মানুষের আয়ু বড় জোর একশ বছর; যদি অনন্ত সুখ চাও তো এই একশ' বছরের সুখ ছেড়ে দিতে হবে।"

ভক্তদের প্রায়ই তিনি বলিতেন সময় থাকিতে সাধন-ভজনের কাজ গুছাইয়া নিতে—"এই জীবনের কিছুই ঠিক নেই। দশ বিশ বছর পরে শেষ হ'তে পারে বা আজই শেষ হ'তে পারে। কখন শেষ হবে তা যখন জানা নেই, তখন মনের সম্বল যত শীঘ্র করা যায় ততই ভাল। কি জানি কখন সে ডাক আসে। শেষে কি খালি হাতে অজানা, অচেনা দেশে যেতে হবে? খালি হাতে অজানা দেশে গেলে বড় কষ্ট পেতে হয়। যখন জন্মেছ তখন মৃত্যু নিশ্চয়ই হবে। মৃত্যু হ'লে অন্য এক দেশে যেতে হবে এটাও ঠিক। যো সো ক'রে পথের সম্বল ক'রে নিয়ে বসে থাকো। ডাক এলে হাসতে হাসতে চলে যাবে। কাজ গোছানো থাকলে আর কোনো ভয় থাকবে না। মনে ঠিক ঠিক জানা থাকে আমাদের পথের সম্বল আছে।

"সদ্বাসনা মনে যখন জেগেছে, সদ্ভাবে জীবন যাপন করবার, তাঁকে জানবার ও বোঝবার সুযোগ যখন হয়েছে, তখন খেটে-খুটে বস্তু লাভ ক'রে নাও। খুঁটি পাকড়াও। শরীর যাক্ থাক্, খুঁটি

পাকড়ানো চাই-ই চাই। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ। আমি মানুষ, আমি সব করতে পারি, এই রকম বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যাও—বস্তু পাবে, মনুষ্য জীবনের যথার্থ সদ্ব্যবহার হবে। আসা যাওয়া বড় কষ্ট। আসা যাওয়ার দফা শেষ ক'রে ফেল। তাঁর নিত্যসাথী হয়ে যাও।

"ভয় ও দুর্বলতা মন থেকে দূর করে দাও। পাপ পাপ ভেবে মন কখনও খারাপ করবে না। তাছাড়া, যত বড় পাপই হোক না কেন, লোকের চক্ষেই উহা বড়, ভগবানের দিক দিয়ে ওটা কিছুই নয়। তাঁর একটি কটাক্ষে কোটি কোটি জন্মের পাপ এক মুহূর্তে ছিন্ন হতে পারে।"

প্রেমপূর্ণ নয়নে, দৃপ্ত ভঙ্গীতে, ঈশ্বরের কৃপার প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "ওহে, তিনি যে অপেক্ষা করছেন, পাল তুলে ধরলেই নৌকা ঠিকানায় ঠিক পৌঁছে যাবে। পাল তোল, ওহে পাল তোল। শক্তি তোমাদের যথেষ্ট রয়েছে। এবার নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ—তাঁর নাম শুনেছি, তাঁর নাম করেছি, আমাতে ভয় দুর্বলতা থাকতে পারে না; তাঁর কৃপায় আমি তাঁকে লাভ করবই এ জীবনে। পিছনে ফিরে তাকিও না, এগিয়ে যাও—তাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে, মনুষ্য জন্ম সার্থক হবে, অপার আনন্দের অধিকারী হবে।"

মঠের ছেলেদের মহারাজ সকল সময় চোখে চোখে রাখিতেন, তাঁহার পরমাশ্রয়ে অবস্থান করিয়া নির্ভয়ে তাঁহারা গঠন করিত সাধনময় ও সেবাময় জীবন। মহারাজ বলিতেন, "তোদের এত বলি কেন জানিস? আমাদের যখন তোদের মতো বয়স ছিল, ঠাকুর আমাদের জোর ক'রে সাধনা করিয়ে নিতেন। ছেলেবেলা কাঁচা মাটির মতন স্বভাবটা থাকে কিনা, তাই যেটা সামনে পায় সেইটাকেই আঁকড়ে ধরে। নরম মাটিতে যা ইচ্ছে হয় গড়—সব জিনিসই তৈরি করতে পারা যায়। একটি জিনিস তৈরি কর, তাকে ভেঙে ফেলে

আবার অন্য জিনিস তৈরি কর। যতক্ষণ মাটি কাঁচা থাকে তাতে যেরূপ ইচ্ছে গড়ন করা যায়। কিন্তু এ মাটিকে আগুনে পোড়াবার পর আর কোনো রকম গড়ন হবে না। তোদের মন এখন কাঁচা মাটির মতো। এখন যে ভাবে গড়বি সে রকম হবে। মন এখন শুদ্ধ পবিত্র আছে—অল্প চেষ্টাতেই ভগবানের দিকে যাবে। মনটা এখন থেকে বেশ ক'রে ভগবানে লাগিয়ে রাখলে অন্য কোনো ভাব ঢুকতে পারবে না। তাঁর ভাবে মন যদি একবার পাকা হয়ে যায়, আর কোনো ভাবনা নেই।

"মন সরষের পুঁটুলির মতো। সরষের পুঁটুলি খুলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়লে কুড়িয়ে তোলা যেমন শক্ত, বয়স হলে মন যখন সংসারে ছড়িয়ে পড়বে তখন সে মনকে গুটিয়ে এনে ঈশ্বরীয় বিষয়ে লাগানও তেমনি শক্ত। তাই তোদের বলি, ছড়িয়ে যাবার আগে মনটা গড়ে নে। খুঁটি বেশ পাকা ক'রে নে। এরপর বেশী বয়স হলে মন যখন সংসারে ছড়িয়ে যাবে, তখন সদ্ভাবে মন লাগাতে খুব বেগ পেতে হবে—কষ্ট পেতে হবে। ষোল বৎসর থেকে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যা করবার ক'রে নিতে হবে।"

ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ এক ভক্তকে লিখিয়াছেন,[১] "ভগবানের জন্য যে সব ছেড়েছে, ভগবানের উপর তার একটা জোর আছে। বাপ-মার কাছে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে যেমন জোর করা যায়, আব্‌দার করা যায়, তাঁকেও তেমনি জোর ক'রে বলা যায়—দেখা দাও, দেখা দিতেই হবে। তখন তিনি দৌড়ে আসেন, কোলে তুলে নেন। তার কোলে উঠলে যে কি আনন্দ, তা সেই জানে যাকে তিনি কোলে তুলে নিয়েছেন। সে আনন্দের কাছে মানুষ যাকে আনন্দ বলে তা তুচ্ছ হয়—আলুনী লাগে। ঠাকুর আরও বলতেন, 'যাঁরা তাঁর জন্য ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করেছে, তারা বারআনা রাস্তা এগিয়ে গেছে।' দেহসুখ ত্যাগ করা কি সোজা রে? তাঁর অনেক

১ পত্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ

কৃপা থাকলে, পূর্ব জন্মের অনেক তপস্যা থাকলে তবে মানুষ সেই শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী হয়। মনটাকে এমনভাবে তৈরি করতে চেষ্টা কর যেন ওসব বাসনা মনে আদৌ উঠতে না পারে। এইভাবে জীবন কাটানো বড় শক্ত। এখন ছেলেমানুষ বলে যত সোজা মনে করছিস তত সোজা নয়। এ অবস্থাটা কি রকম জিনিস?—খোলা তরোয়ালের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। প্রত্যেক মুহূর্তে কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অথচ ব্রহ্মচর্য ছাড়া এ রাস্তায় চলা যায় না। ভগবানে ভালবাসা ও বিশ্বাস না হলে ব্রহ্মচর্য রাখা বড় শক্ত। ভোগ বিলাসপূর্ণ জগতে থাকতে হবে, চোখের সামনে শতকরা নিরানব্বই জনেরও বেশী লোক ভোগের পিছনে পিছনে দৌড়ুচ্ছে; এই সব নিত্য দেখতে হবে, এইসব দেখে শুনে মনের মধ্যে নানা রকম ছাপ পড়বার খুবই সম্ভাবনা। এই সব ছাপ যদি একবার কোনোরকমে পড়ে তার দফা শেষ। যারা ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করতে চায়, তাদের সদা সর্বদা নিজের মনকে সৎ বিষয়ে নিযুক্ত ক'রে রাখতে হবে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সৎ বিষয়ে আলোচনা, ঠাকুর সেবা, সাধু সেবা, সাধুসঙ্গ ও সদালাপ নিয়ে থাকতে হবে। একমাত্র এই উপায়েই নিজেকে তৈরি করা যেতে পারে।

"প্রথমে ব্রহ্মচর্য নিষ্ঠা পালন করবে—বাকী সব আপনি এসে যাবে। সাধনা না করলে ব্রহ্মচর্য ঠিক রাখা যায় না। ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই ভগবান্ লাভ হয়। ভগবান্ লাভ না হলে মনুষ্যজন্ম বৃথা গেল। তাঁর দর্শন হলে তবেই আনন্দ। ছেলেমানুষ তোরা, সৎ বুদ্ধি, সৎ মন তোদের। একটু চেষ্টা কর্। অল্প চেষ্টাতেই ভক্তি-বিশ্বাস জেগে উঠবে।"

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া মঠের কঠোর সন্ন্যাস জীবন তরুণেরা নিয়াছে, তাঁহাদের যাহাতে পরমার্থ লাভ হয় এজন্য ব্রহ্মানন্দের ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। তাহাদের কহিতেন[১], "ভগবান্ লাভের

---

১ পত্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ

জন্য ঘর-দোর ছেড়ে এসেছিস্, তাঁকে লাভ করবার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে প্রাণপণ চেষ্টা চাই। পাগলা কুকুরের মতন ভগবানের জন্য 'হন্যে' হতে হবে। চারটি ডাল ভাত খেয়ে মঠে শুধু পড়ে থাকা মানে অত্যন্ত হীনভাবে জীবন যাপন করা—না হল এদিক, না হবে ওদিক, একূল ওকূল দুকূল গেল! [illegible] হবে। [illegible] মন যদি তাঁকে বসতে [illegible] অধ্যায় ক'রে গীতাপাঠ কর্‌বি। [illegible] একটু গীতাপাঠ ক[illegible] [illegible]

"[illegible] [illegible] যা[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] মিত্র। [illegible] তার সম্যক্ নাশ করতে পারবে [illegible] যাবে।

"খুব জপধ্যান কর্‌বি। প্রথম প্রথম, মন স্থূল বিষয়ে পা[illegible]। ধ্যানজপ করলে তখন সূক্ষ্ম বিষয় ধরতে শিখে। শীতকালই [illegible] ধ্যানজপের সময়, আর এই-ই বয়স। 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং' —বলে বসে যা। সত্যই ভগবান্ আছেন কি না একবার দেখে নে না। একটু একটু তিতিক্ষা, যেমন অমাবস্যা একাদশীতে একাহার করা ভাল। বাজে গল্পটল্প না ক'রে সারাদিন তাঁর স্মরণ-মনন করবি। খেতে, শুতে, বসতে—সর্বক্ষণ। এইরূপ করলে দেখবি

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ক্রমে ক্রমে জাগবে। স্মরণ-মননের চেয়ে কি আর জিনিস আছে? মায়ার পর্দা একটার পর একটা খুলে যাবে। নিজের ভেতরে যে কি অদ্ভুত জিনিস আছে দেখতে পাবি—স্ব-প্রকাশ হবি।"

স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এই দুই গুরুভাই-এর আকৈশোর বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা ও প্রেম ছিল এক দর্শনীয় বস্তু। আবার দুইজনের মধ্যে কলহ, মান-অভিমান ও কান্নাকাটিও কম দেখা যাইত না। গোলযোগটা প্রায়ই স্বামীজীই শুরু করিতেন। শেষের দিকে, রোগে ভুগিয়া ও অতিরিক্ত শ্রমজনিত অবসন্নতার ফলে স্বামীজীর মেজাজ কিছুটা খিটখিটে হইয়া যায়। এ সময়ে তাঁহার ঝামেলা ও চেঁচামেচি ব্রহ্মানন্দকেই সহ্য করিতে হইত বেশী, আর ইহা তিনি করিতেন স্বামীজীর প্রেমের আকর্ষণে, নিজের ঔদার্য ও প্রশান্তির গুণে।

সে-বার বলরাম বসুর ভবনে স্বামীজী এবং ব্রহ্মানন্দ দুই জনেই অবস্থান করিতেছেন। ডায়াবিটিজ্ রোগে স্বামী বিবেকানন্দ তখন খুব পীড়িত। ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য গুরুভাইদের এজন্য উদ্বেগের অবধি নাই। রাত্রে স্বামীজী প্রায়ই ঘুমাইতে পারেন না, সেদিন ক্লান্ত হইয়া দুপুরে নিজের ঘরে শয়ন করিয়া আছেন। এমন সময় স্বামীজীর মাতার পুরানো দাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

ব্রহ্মানন্দকে সে প্রশ্ন করে, "হ্যাঁগা, আমাদের নরেন কোথায় রয়েছে, বল তো।"

ব্রহ্মানন্দ জানান, "তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন। শরীর অসুস্থ, কাল সারা রাত ঘুম হয় নি। তুমি বরং আর একদিন এসো। একথা শুনিয়া দাসী সেখান হইতে চলিয়া গেল।

নিদ্রাভঙ্গের পর বিবেকানন্দকে একথা জানানো হয়। ক্রোধে তিনি গর্জিয়া উঠেন, ব্রহ্মানন্দকে কহেন, "তোর কি কিছুমাত্র

কাণ্ডজ্ঞান নেই? ঝি কি এমনি শুধু শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো? নিশ্চয় মা তাকে কোনো জরুরী কাজের ভার দিয়ে এখানে পাঠিয়েছিলেন।"

সঙ্গে সঙ্গে বর্ষিত হয় প্রচুর তিরস্কার ও কটূক্তি। তখনি একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকাইয়া স্বামীজী তাঁহার জননীর সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়া গেলেন।

বাড়িতে পৌঁছিয়া শুনিলেন, মা ঐ ঝিকে তাঁহার নিকট পাঠান নাই। ও পাড়ায় তাহার কি যেন কাজ ছিল, সেই সুযোগে নরেনের সঙ্গেও সে দেখা করার চেষ্টা করিয়াছে।

একথা শোনামাত্র স্বামীজীর অনুতাপের আর সীমা রহিল না। তৎক্ষণাৎ জননীর নাম করিয়া ব্রহ্মানন্দের জন্য গাড়ি পাঠাইয়া দিলেন। ব্রহ্মানন্দ সেখানে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অনুতপ্ত স্বরে কহিলেন, "রাজা, আমি বড় অন্যায় করেছি। অযথা তোকে এত গালমন্দ দিয়েছি। কেবল তুই বলেই ওরকম কটু কথা আমি বলতে পেরেছি।"

ব্রহ্মানন্দের দুঃখ ও অভিমান ততক্ষণে দূর হইয়াছে। একগাল হাসিয়া এবার স্বামীজীকে প্রবোধ দিবার জন্যই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

স্বামীজীর ইচ্ছা, বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরের কিছুটা অংশে পোস্তা বাঁধানো হোক, এবং একটা ঘাট তৈরি করা হোক। বিজ্ঞানানন্দ প্রাক্তন ইন্‌জিনিয়ার, তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "দ্যাখো তাড়াতাড়ি এর একটা প্ল্যান আর খরচের এস্টিমেট দাও।"

বিজ্ঞানানন্দ ভয়ে ভয়ে কম করিয়াই ব্যয়বরাদ্দ স্থির করিলেন। কহিলেন, "তিন হাজার টাকাতেই এটা হয়ে যাবে।"

ব্রহ্মানন্দের উপর টাকা সংগ্রহ ও কাজকর্ম দেখাশুনার ভার, কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু দেখা গেল, পূর্বের ব্যয়বরাদ্দ আর ঠিক থাকিতেছে না। স্বামীজীর ভয়ে বিজ্ঞানানন্দ ভীত হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মানন্দ আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তা আর কি করা যাবে? কাজে

যখন হাত দেওয়া হয়েছে, খরচ বেশী হলেও শেষ করতেই হবে। এজন্য তুমি ভেবো না। কাজ যাতে ভালো হয় তাই করো।"

স্বামীজী একদিন খোঁজখবর নিতে গিয়া দেখেন, এস্টিমেটের চাইতে ব্যয় ইতিমধ্যে বেশী হইয়া গিয়াছে এবং কাজ এখনো অনেক বাকী। ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন; তীব্র ভাষায় ব্রহ্মানন্দকে করিতে লাগিলেন গালিগালাজ।

স্বামীজী সেখান হইতে চলিয়া গেলে মর্মাহত ব্রহ্মানন্দ নিজের ঘরে গিয়া দুয়ার বন্ধ করিলেন।

এবার স্বামীজীর হুঁশ হইল, প্রিয়তম গুরুভাইকে অযথা কি মনোব্যথাই না তিনি দিয়াছেন। অখণ্ডানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "শোন, শিগ্‌গীর যাও তো একবার, দেখে এসো রাজা কি করছে। আহা তাকে কি কটু কথাই না বলেছি।"

অখণ্ডানন্দ ঘরে ঢুকিয়া দেখেন ব্রহ্মানন্দ শয্যায় মুখ গুঁজিয়া অঝোর ধারে কাঁদিতেছেন। এ সংবাদ স্বামীজীর কাছে পৌঁছিল, তখনি উন্মাদের মতো তিনি ছুটিয়া আসিলেন ব্রহ্মানন্দের কক্ষে। তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন, "রাজা, রাজা, আমায় তুই ক্ষমা কর। কি ঘোর অন্যায় আমি করেছি। তোকে অনর্থক গালাগালি দিয়েছি। আমায় তুই ক্ষমা করলি কিনা বল।"

ব্রহ্মানন্দের মনের ক্ষোভ দুঃখ কোথায় চলিয়া গেল, ক্রন্দনরত স্বামীজীকে সান্ত্বনা দিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, "তুমি কেন এমন উতলা হয়েছো? আমায় গালাগাল দিয়েছো, তাতে কি হয়েছে? আমায় এত ভালবাসো বলেই তো গাল দিতে পেরেছো। তুমি শান্ত হও।"

স্বামীজীর অনুশোচনার অন্ত নাই। প্রবোধ বাক্য শোনার পরেও অশ্রু ছলছল নয়নে কহিতে থাকেন, "না, না রাখাল, তুই আমায় ক্ষমা কর। ঠাকুর তোকে কত আদর করতেন, কখনো একটা কড়া কথা তোকে তিনি বলেন নি। আর আমি কিনা ছাই কাজের জন্য তোকে এত গালাগালি করলুম—মনে কষ্ট দিলুম।

আমি আর তোদের সঙ্গে থাকার যোগ্য নই। চলে যাই হিমালয়ে। কোথাও নির্জনে গিয়ে থাকবো।”

ব্রহ্মানন্দ ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলেন, “ওসব কি কথা তুমি বলছো। তোমার গালাগালি যে আমাদের আশীর্বাদ। তুমি কোথায় চলে যাবে? তুমি যে আমাদের মাথা। তুমি চলে গেলে আমরা থাকবো কি নিয়ে?

বহিরঙ্গ জীবনের অন্তস্তলে এমনি এক গভীর প্রেমের ফল্গুধারা উভয়ের মধ্যে ছিল প্রবাহিত। এক একদিনের আকস্মিক ঘটনায় ইহার প্রকাশ দেখিয়া ভক্ত-শিষ্যেরা অবাক হইয়া যাইতেন।

আর একবার স্বামীজীর কঠোর তিরস্কারে ব্রহ্মানন্দ মনে নিদারুণ আঘাত পাইলেন। ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন, না এই ঝামেলা আর পোয়াইবেন না, দু চোখ যেদিকে যায়, চলিয়া যাইবেন।

মঠ-ত্যাগ করার সংকল্প নিয়া বাহিরে যাইতেছেন, বেলতলায় আসিয়া পা দুটি অচল হইয়া গেল। সেখানেই তিনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ‘এই মঠ, এই ভক্তমণ্ডল, এই সাধুর সেবাকর্ম, সব কিছুই তো ঠাকুরের। আমাদের কারুর ব্যক্তিগত তো কিছু নয়। ঠাকুরের এসব ফেলে কোথায় যাবো? কেনই বা যাবো? স্বামীজীর বকাবকিতে কি আসে যায়! বকেছে তো কি হয়েছে? তাছাড়া, স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়ার জন্যই তো তার এমন খিটখিটে মেজাজ।’

মন তাঁহার অমনি শান্ত হইয়া যায়, চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে আনন্দোজ্জ্বল হাসির আভা। ধীরপদে মঠে ঢুকিয়া শুরু করেন নিজের দিনচর্যা।

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহার সারা অন্তরের উপলব্ধি দিয়া জানিতেন, বিবেকানন্দ, তাঁহার আকৈশোর বন্ধু বিবেকানন্দ, তাঁহার প্রাণপ্রিয় ঠাকুরের লীলার প্রধান পার্ষদ—ঠাকুরের সহস্রদল কমল। আবার স্বামী বিবেকানন্দও জানিতেন, ব্রহ্মানন্দ শুধু তাঁহার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুই নয়, ঠাকুর নিজের চিহ্নিত সঙ্ঘনায়ক—রাখালরাজ। তাই বাহিরের

লোক এই দুইয়ের প্রীতি ও সখ্যের গভীরত্বের পরিমাপ করিতে সক্ষম হইত না। দুইজনেই ছিলেন গুরুগতপ্রাণ এবং গুরুসর্বস্ব। তাই গুরুর মাধ্যমেই দুইয়ের আত্মিক বন্ধন হইয়া উঠে এমনতর চির-অবিচ্ছেদ্য।

রামকৃষ্ণ লীলার ধারক ও বাহক এই দুই প্রধান শিষ্যের প্রণয়-কলহ ছিল মঠের তরুণ ব্রহ্মচারীদের এক দর্শনীয় বস্তু।

"মঠের বাগানের পার্শ্বে খোলা মাঠ জমিতে স্বামীজীর গাভী, ছাগল প্রভৃতি চরিয়া বেড়াইত। স্বামীজী ও মহারাজ এই মাঠ এবং বাগানের একটি সীমা বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। যদি স্বামীজীর গাভী, ছাগল প্রভৃতি ভক্ত-সীমা অতিক্রম করিয়া বাগানে আসিত তবে মহারাজ অনধিকার প্রবেশ লইয়া প্রবল আপত্তি তুলিতেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে তুমুল প্রেমকলহ উপস্থিত হইত। পরস্পরের এই অদ্ভুত বালকবৎ আচরণে তাঁহাদের গুরুভ্রাতারা এবং মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা আনন্দে আপ্লুত হইতেন। মনে হইত যেন দুইটি দিব্য ভাবাপন্ন বালক অপরূপ খেলায় মত্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের একজন বিশ্বজয়ী আচার্য শ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যজন মঠ-মিশনের সঙ্ঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দ। দুই জনেই প্রায় প্রৌঢ় সীমায় উপনীত। অথচ ইঁহাদের দুইজনের বালকের মতো বাহ্যিক প্রীতি-কলহের অন্তরালে কি গভীর প্রেম প্রকাশ পাইত[১]।"

মঠ ও মিশনের কাজ ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছে, মঠনায়ক ব্রহ্মানন্দের তাই কর্মতৎপরতার সীমা নাই। কিন্তু ব্রহ্মচারী ও কর্মীরা শুধু সেবাকর্ম নিয়াই ব্যস্ত থাকুক ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নয়। এই কর্মের পিছনে একটি সাধনভিত্তি গড়িয়া উঠুক, যে জন্য তাহারা

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন

ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে সেই ঈশ্বর-লাভের সঙ্কল্প সফল হোক, ইহাই তিনি মনেপ্রাণে সর্বদা চাহিতেন। তাই দেখা যাইত, মঠ পরিচালনার ব্যাপক কর্মসূচীর মধ্যেও এই তরুণ কর্মীদের আত্মিক উন্নতির ভিত্তি গঠনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ সদা তৎপর থাকিতেন। সাধন-নির্দেশ ও তত্ত্বের মীমাংসা তাঁহার কাছ হইতে জানিয়া নিয়া ভক্ত সাধকেরা কৃতার্থ বোধ করিতেন।

স্নেহপূর্ণ স্বরে ইঁহাদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেন, "খুব সকাল সকাল শয্যা ত্যাগ করা ভাল। রাত্রি যায় দিন আসে, দিন যায় রাত্রি আসে এই সময়টা সংযম সময়। এই সময় প্রকৃতি শান্ত থাকে, উহা ধ্যানজপের বিশেষ অনুকূল। এই সময় সুষুম্না নাড়ী চলে, তখন দুই নাক দিয়েই নিশ্বাস বয়। নচেৎ সর্বদা ইড়া পিঙ্গলী নাড়ী চলে, অর্থাৎ এক নাক দিয়ে নিঃশ্বাস বয়। তখন চিত্ত চঞ্চল হয়। যোগীপুরুষরা সর্বদা লক্ষ্য রাখেন, কখন সুষুম্না নাড়ী বইবে। সেই সময় তাঁরা যে কাজেই থাকুন না কেন, সব ছেড়ে দিয়ে ধ্যানে বসবেন।"

সাধান-ভজন সম্পর্ক ভক্ত ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা মহারাজের কাছ হইতে কত খুঁটিনাটি কথা, কত জটিল তত্ত্বের মীমাংসাই না জানিয়া নিতেন। তিনি বলিতেন, সাক্ষাৎ সাধন হচ্ছে সব চেয়ে উত্তম—সেই পরমাত্মা রয়েছেন, সর্বদা তার অনুভূতি হচ্ছে। তারপর হচ্ছে ধ্যান, সেখানে তিনি আছেন, আর আমি আছি, জপ-তপ সব কিছু বন্ধ। যখন ধ্যান জমবে তখন দেখবে শুধু ইষ্টের রূপ, তখন জপতপ সব আর চলে না। তার নিচে স্তবস্তুতি ও জপ-তপ করা যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ চিন্তা করা যাচ্ছে। আর তারও নিচে হচ্ছে বাহ্যপূজা—প্রতীক বা প্রতিমা-উপাসনা। এই সব হচ্ছে ক্রমোন্নতির নানা অবস্থা। যার মনের যে রকম অবস্থা, সে সেখানে থেকে সাধন আরম্ভ করে, আর ক্রমে বেড়ে যায়। একজন সাধারণ লোকের কথা ধর, তাহাকে একেবারেই যদি নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তা বা সমাধি সম্বন্ধে উপদেশ করা যায়, সে কিছুই ধারণা করতে পারবে না, তার

ভালও লাগবে না। দু-একদিন চেষ্টা ক'রে ছেড়ে দেবে। কিন্তু তাকে যদি ফুল-বেলপাতা নিয়ে পূজা করতে দেওয়া যায়, তাতে সে মনে করবে একটা কিছু করলুম। তার মনটাও খানিক ক্ষণের জন্য কতকটা স্থির হলো। এতে সে বেশ আনন্দও পায় তারপর ক্রমে সেই অবস্থা অতিক্রম করে।

"মন যত সূক্ষ্ম হতে থাকে, স্থূল জিনিসে আর সেই রকম রস পায় না। ধরুন আপনি প্রথমে পূজা আরম্ভ করলেন। কিছুদিন পরে দেখবেন, আপনা থেকেই মনে হবে—জপ করা ভাল, তখন জপটা বেড়ে যাবে। আবার কিছুদিন পরে মনে হবে ধ্যান করা ভাল, তখন শুধু ধ্যান করতে ইচ্ছা যাবে? এই রকমে মানুষ ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। একেই বলে—ন্যাচারাল গ্রোথ্ বা স্বাভাবিক উন্নতি। এই রকমে মন যেটুকু লাভ করে তা আর নষ্ট হয় না।

"মনে করুন, আপনি এই উঠানে আছেন, আপনাকে ছাদে উঠতে হবে। কোথায় সিঁড়ি আছে খুঁজে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তবে উঠতে পারেন। তা না হয়ে উঠান থেকে কেউ যদি আপনাকে ছুঁড়ে দেয়, তা হলে আপনার অনেক কষ্ট হবে এবং তাতে বিপদের আশঙ্কাও খুব আছে। এই বাইরের জগতে যেমন দেখছেন নিয়মকানুন আছে, অন্তর্জগতেও ঠিক সেই রকম সব ব্যবস্থা আছে"[১]।

ভক্তদের মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "দ্যাখো, দেহই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। সেইজন্য ধ্যান-ট্যান সব শরীরের ভিতর করতে বলে। সহস্রারে মন গেলে আর নামতে চায় না। 'যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।' 'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা' প্রভৃতির মানে হচ্ছে, হৃদয়ের ভিতর সেই পরমপুরুষকে দেখলে আর জন্ম হয় না। নিম্ন অধিকারীর জন্য বাহ্যরথ, মন্দির প্রভৃতির সৃষ্টি। রামপ্রসাদ যখন হৃদয়ে মাকে দেখলেন, তখন গান বানিয়ে বললেন—'তুমি মাতা

১ ধর্মপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ: কথোপকথন

থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।' উঃ, কি ভয়ানক কথা বল দেখি। বাস্তবিক সেই আস্বাদ পেলে আর অন্য কিছু কি ভাল লাগে?

"ঠাকুর বলতেন- দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে জ্ঞাননেত্র আছে, সেটা ফুটলে চারদিক আনন্দময় দেখায়।

—রাজার সাত দেউড়ি বাড়ি। কোনো গরীব নায়েবের কাছে রাজদর্শন প্রার্থনা করলে। নায়েব সঙ্গে ক'রে এক এক দেউড়িতে নিয়ে যায়, আর সে জিজ্ঞাসা করে—এই কি রাজা? উত্তর হয়—'না'। এই প্রকারে যখন সপ্তম দেউড়িতে প্রবেশ ক'রে রাজদর্শন করলে, তখন সেই অপরূপ রূপ দেখে আর জিজ্ঞাসা করলে না। সেই রকম গুরু এক এক দেউড়ি দিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষে ভগবানকে মিলিয়ে দেন।"

ধ্যানের পদ্ধতি ও চরম উপলব্ধি সম্পর্কে এক ব্যক্তি মহারাজকে সেবার প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি জানান,--"ধ্যানকালে ইষ্টমূর্তিকে জ্যোতির্ময় ভাবতে হয় যেন তাঁর জ্যোতিতে সব আলোকিত। চৈতন্যস্বরূপ ভাববে। এইরূপ ধ্যান পরে সহজেই নিরাকার ধ্যানে পরিণত হয়। তাতে বোধে বোধ হয়। তারপর আজ্ঞাচক্র খুলে গেলে তখন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। [illegible] এক জ্যোতি। [illegible] মন আলাদা। [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] (মহারাজ [illegible] [illegible]) [illegible] নির্বিকল্প [illegible] হয়ে যায়—তখন সমাধি। তার [illegible] এগিয়ে কি যে, তা মুখে বলা যায় না। [illegible] সীমা নাই, অনন্ত—অনন্ত। এই উচ্চ অবস্থায় [illegible] মনকে জোর ক'রে [illegible] নামাতে হয়। [illegible] কিছু [illegible] মনে হয়। 'দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত' সে অবস্থা [illegible] কেউ কেউ শরীরটাকে মস্ত বাধা মনে ক'রে সমাধিতে শরীরটা ছেড়ে দেন। যেন ঘটটা ভেঙে দেওয়া। ঠাকুর বেশ একটা দৃষ্টান্ত দিতেন—'দশটা সরায় জল আছে, তাতে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে।

এক একটা ক'রে সরা ভাঙতে ভাঙতে শেষে একটি সরা ও একটি সূর্য রইল। সেটাও ভেঙে দিতে যা রইল, তাই রইল—সত্য সূর্য রইল এ কথাও বলা চলে না। কে তখন বলবে?'

অধ্যাত্ম-আলোচনার প্রসঙ্গে একদিন তরুণ সাধকদের তিনি বলিলেন, "ঠিক পাকা বিশ্বাস, সেটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি না হলে হয় না। একবার যদি তাঁর দর্শন হয়, অনুভূতি হয়, তবেই ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়। তার পূর্বে সেই বিশ্বাসের খুব কাছাকাছি একটা হয়। খুব জোর ক'রে বিশ্বাস আনতে হয়। আর বারে বারে এই রকম করতে করতে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। অবিশ্বাস করতে নেই। যখন সন্দেহ উপস্থিত হবে, তখন ভাবতে হয়—ভগবান্ সত্য; আমার অদৃষ্টদোষে, আমার অশুভ সংস্কারের ফলে তাঁকে বুঝতে পারছি না। যখন তাঁর কৃপা হবে তখন হবে।

"এই মন কি তাঁর ধারণা করতে পারে? তিনি যে এই মনবুদ্ধির অনেক দূরে। এই যে সৃষ্টিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো মনের রাজত্ব? মনই হলো এর কর্তা। এই সব হচ্ছে মনেরই সৃষ্টি। এর পারে ওর যাবার জো নেই। ভগবানের নাম করতে করতে আর একটি সূক্ষ্ম মন জন্মায়। সেই মন এখন ক্ষুদ্র জীবাণুরূপে সকলেরই ভিতর রয়েছে, সাধনার দ্বারা সেই মন যখন বিকাশ লাভ করে তখন নানারকম সূক্ষ্ম অনুভূতি হয়। সেও ফাইনাল বা চরম কিছু নয়। এই সূক্ষ্ম মনও পরমাত্মার কাছ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে না, জগতের আর কিছু ভাল লাগে না। কেবল ভগবদ্‌ভাবে বুঁদ হয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়।

"তারপরে সমাধি। সে অবস্থা বর্ণনা করা যায় না, অস্তি-নাস্তির পার। সেখানে সুখ নেই, দুঃখ নেই, আনন্দ নেই, নিরানন্দ নেই, আলো নেই, আঁধার নেই—কি যে আছে মুখে বলা যায় না।"[১]

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ: কথোপকথন

এক ভক্ত সেদিন প্রশ্ন করেন, "মহারাজ, সাধন পথের শেষে তো আনন্দের স্রোত সদাই প্রবাহিত হচ্ছে, তাই না ?"

উত্তরে ব্রহ্মানন্দ বলেন, "আনন্দের কথা কি বলছো ? সেখানে আনন্দ-নিরানন্দ কিছুই নেই, সুখ-দুঃখ কিছুই নেই, ভাব-অভাব কিছুই নেই। আনন্দ তো সাধন অবস্থার কথা। তোমার নৌকাখানি যতক্ষণ লক্ষ্যস্থলে না পৌঁছায় ততক্ষণ অনুকূল বাতাস দরকার। পৌঁছে গেলে আর বাতাস-টাতাস দরকার নেই। আনন্দ ঐ অনুকূল বাতাসের মতো খুব সাহায্য করে। জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, সব লয় হয়ে যায়। শাস্ত্রে শুধু ঐ পর্যন্ত বলেছে। কিন্তু কি জান তারপর যা আছে তা আর বলতে পারে না। সাধন করলে সে সব নিজের অনুভব হয়। স্বয়ংবেদ্য হচ্ছে সেই ভূমা বস্তু। সেখানে কোনো অভাব নেই, কোনো ভয় নেই—শুধু ভাবলেই মনটা উঁচু হয়ে যায়। কি মজার জিনিস ! কেউ কেউ নিত্য আর লীলা—এই দুটোই দেখেন।

"নিত্যে পৌঁছে তারপরে তো লীলা"—এ প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বলিলেন—"তার কিছু মানে নেই, দুই-ই বটে। রাসলীলা যখন হচ্ছিল, তখন এক সখী আর এক সখীকে বলেছিল, সখি, বেদান্ত-সিদ্ধান্তো নৃত্যতি। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত কি না সেই পরব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। এখানে নিত্যে আর লীলা এক। আর, একটা আছে নিত্যলীলা দুইয়েরই পার।"

সাধনজীবনে মন্ত্র ও গুরুকরণের আবশ্যকতা সম্পর্কে তাঁহার মতবাদ ছিল অতিশয় স্পষ্ট—"মন্ত্র না নিলে একাগ্রতা আসে না। আজ হয়তো তোমার কালীরূপ ভাল লাগল, আবার কাল হরিরূপ ভাল লাগল, পরশু নিরাকারে মন হলো—ফলে কোনোটাতেই একাগ্রতা হবে না। মন স্থির না হলে ভগবান্ লাভ ত দূরের কথা, সাধারণ সাংসারিক কাজের মধ্যেও অনেক কিছু গোলমাল হবে।

ভগবান্ লাভ করতে হলে গুরুর একান্ত দরকার। গুরু তাঁর শিষ্যের ভাবানুযায়ী মন্ত্র ও ইষ্ট ঠিক ক'রে দেন। সেই গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে নিষ্ঠার সহিত সাধন-ভজন না করলে কিছুতেই কিছু হবে না। ধর্মপথ অতি দুর্গম। সিদ্ধগুরুর আশ্রয় না হলে যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, যতই চেষ্টা করুক না কেন, হোঁচট খেয়ে পড়তেই হবে। চুরি করতে পর্যন্ত একজন গুরুর দরকার হয়। আর এত বড় ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে গুরুর দরকার নেই ?"

সাধনা, সিদ্ধি ও ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এক মুমুক্ষু ভক্তকে ব্রহ্মানন্দ সেদিন বলিতেছেন, "মনের আসক্তি ত্যাগই ত্যাগ। হাজার জিনিস আসুক না কেন, আসক্তি না থাকলে কিছুই নয়। আবার কিছুই নেই কিন্তু আসক্তি থাকলে সবই রইল। সাধনার দ্বারা মনটাকে নির্মল করতে হয়। তা না হলে ভগবানের আসন পড়ে না। চাই চেষ্টা, চাই সংগ্রাম। সংগ্রাম করবার প্রবৃত্তি যার আসে নি সেতো মৃত। বুক পেতে এই সংগ্রাম বরণ ক'রে নিতে হবে তার পরের অবস্থা হচ্ছে শান্তি। সব চেয়ে সহজ সাধন— সর্বদা তাঁর স্মরণ-মনন। তাঁকে আপনার বলে জানতে হবে। বাইরে যেমন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ানো, পরানো এবং তাদের সঙ্গে আলাপ ব্যবহারাদি করা, মনোরাজ্যেও যখন এইরূপ হবে, অর্থাৎ সেই রাজ্যেও যখন আলাপ ব্যবহারাদি হবে তখনই শান্তি।

"তাঁর কার্য কি বুঝা যায় ? অনন্ত অথচ শান্ত। মানুষেও তিনি আসেন। কাকভূষণ্ডী প্রথম প্রথম রামচন্দ্রকে মানুষ বলে ধারণা ক'রে ত্রিলোকের কোথাও স্থান পেলে না। পরে তাঁর কৃপায় তাঁকে ভগবান্ বলে বুঝলে ও স্তবস্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করলে। ভগবান্ কাকে কোন্ পথ দিয়ে নিয়ে যান তা বুদ্ধির অগম্য। তিনি কখনও সুগম পথ দিয়ে, কখনও কাঁটার মধ্যে দিয়ে, কখনও দুর্গম পাহাড়-পর্বতের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যান। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।"

সে-বার এক জিজ্ঞাসু সাধকের প্রশ্নের উত্তরে ধ্যান এবং ধ্যানলব্ধ অনুভূতি সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলেন, "ধ্যানাদিতে কেবল যে মনের শান্তি হয় তা নয়। ওতে শরীরেরও উন্নতি হয়, ব্যারাম-স্যারাম কম হয়। শরীরের উন্নতির জন্যও ধ্যানাদি করা উচিত।

"প্রথম প্রথম ধ্যানও মনের সঙ্গে যুদ্ধ। দোলায়মান মনকে ক্রমাগত টেনে এনে ইষ্টপাদপদ্মে লাগাতে হয়। এতে কিছুক্ষণ পরে একটু মাথা গরম হয়। এজন্য প্রথম প্রথম বেশী ধ্যান-ধারণা ক'রে মস্তিষ্ককে খুব বেশী খাটাতে নেই, খুব আস্তে আস্তে বাড়াতে হয়। কিছুদিন এরূপ অভ্যাসের ফলে যখন ঠিক ঠিক ধ্যান হবে তখন এক আসনে বসে দুই-চার ঘণ্টা ধ্যান-ধারণা করলেও কোনো কষ্ট হবে না বরং সুষুপ্তির পর শরীর ও মন যেরূপ সতেজ ও স্বচ্ছন্দ হয়, সেরূপ বোধ হবে, আর ভিতরে খুব আনন্দ অনুভব হতে থাকবে।

"দেহটা যেন মন্দির, ঠাকুর তাতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। ধ্যান করতে করতে মন যখন স্থির হবে তখন যেখানে ইচ্ছা ইষ্টদর্শন হবে। পার্শ্বে, হৃদয়ে, পশ্চাতে বাহিরে সবখানেই ধ্যান করা যায়। ধ্যান করতে করতে প্রথমে জ্যোতি দর্শন হয়, কিন্তু ঐরূপ জ্যোতি দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বা একটু পরেই একটা নিবিড় আনন্দ আসে, তা ছেড়ে মন এগুতে চায় না। তারপর জ্যোতির্ঘন-দর্শন, তখন মন তাতে তন্ময় হয়ে যায়। কখনও কখনও বা দীর্ঘ প্রণব ধ্বনি শুনতে শুনতেও মন তন্ময় হয়। দর্শন, অনুভূতির রাজ্য ঐর কি ইতি আছে? যত এগোও অনন্ত! অনন্ত! অনেকে একটু জ্যোতিঃ-টোতি দেখে মনে ভাবে এই শেষ—তা নয়। যেখানে গিয়ে মনের বিকল্প শেষ হয়, কেউ কেউ বলেন ঐখানেই শেষ। আবার কেউ কেউ বলেন, ঐখান থেকেই আরম্ভ[১]।"

[১] ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ

ভগবান্ লাভ না হইলে মানবজীবন সফল হয় না, বন্ধ্যা বলিয়া গণ্য হয়। এ সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "ভগবান্ লাভের জন্য তিনটি জিনিসের দরকার। প্রথম মনুষ্য জন্ম, দ্বিতীয় মুক্তির কামনা, তৃতীয় মহাপুরুষের আশ্রয়। ভগবানের কৃপায় মনুষ্য জন্ম পেয়েছ, সৎসঙ্গও লাভ করেছ, মুক্ত হবার বাসনাও জেগেছে, এখন জীবনটাকে এমনভাবে গড়ে তোল যেন এই জন্মটা বৃথা না যায়। কি হবে ক্ষণস্থায়ী ভোগের পিছনে দৌড়ে? অনন্তের অধিকারী হও। আর একটা কথা মনে রেখো, মনুষ্যজন্ম আবার হয়তো হবে, মুক্তির বাসনা পরজীবনে আবার হয়তো আসবে, কিন্তু এবারের মতো সাধুসঙ্গ বার বার পাবে না। সব সময় মহাপুরুষের-সঙ্গ ভাগ্যে জোটা বড় দুর্লভ। জন্ম-জন্মান্তরের অনেক সুকৃতি ও তপস্যার ফলে এই সুযোগ হয়। ভাগ্যফলে যখন ঠাকুরের গণ্ডির ভিতর এসে পড়েছ, দেখো যেন জীবনটা গোলমালে কেটে না যায়।

"বিশ্বাস, বিশ্বাস, কেবল বিশ্বাস চাই। গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে পড়ে থাক। গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে পড়ে থাকলে সব হয়ে যাবে। গুরুবাক্যে যদি বিশ্বাস না থাকে শুধু মন্ত্রে-তন্ত্রে কিছু হবে না। বেড়ালের ছানার মতো পড়ে থাক। গুরু যখন যা দরকার করিয়ে নেবেন। নিজে তুমি কতটুকু বোঝ? তাঁর উপর ভার দিয়ে পড়ে থাক। যাঁকে ভার দিয়েছ, তাঁর একটা দায়িত্ববোধ আছে। তিনি তোমার নিজের চাইতে তোমার বিষয় ঢের বেশী ভাবেন। ষোল আনা তাঁতে নির্ভর করো, তিনি সকল আপদ-বিপদ থেকে তোমায় রক্ষা করবেন। এ জগতে কারও সাধ্য নেই গুরু আশ্রিত শিষ্যের অনিষ্ট করে। গুরুর কৃপায় তার চতুর্দিকে লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা। জীবনে অনেক ভুল হবার সম্ভাবনা, যতক্ষণ না ভগবান্ লাভ হয়। গুরুকে আশ্রয় ক'রে থাকলে ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। আলের উপর দিয়ে বাপ-বেটায় যাবার ঠাকুরের সেই গল্পটি মনে আছে তো? বাপ ছেলের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে না। ছেলে বাপের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে। সদ্গুরুর আশ্রয় যারা পেয়েছে, তারা

যদি তাঁকে আশ্রয় ক'রে পড়ে থাকে তবে তিনিই তাঁদের ভুলভ্রান্তি সব শুধরে নেবেন।"

গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া কহিতেন, "ঠাকুর বলতেন—'সদ্‌গুরু হলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে যায়।' গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। কাঁচা গুরুর হাতে পড়লে শিষ্যের অহঙ্কার যায় না, সংস্কার-বন্ধন ঘোচে না। যারা ঈশ্বরলাভ করে নি, তাঁর আদর্শ পায় নি, তাঁর শক্তিতে শক্তিমান্ হয় নি, তাদের সাধ্য কি যে অপরের সংসার বন্ধন মোচন করে? কানা কানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলে হিতে বিপরীত হয়। নিজে মুক্ত হলেই তবে অপরকে মুক্ত করা যায়—সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যায়।

"যদি কারো ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে, সাধনভজন করবার ইচ্ছে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন। গুরু লাভের জন্য সাধকের চিন্তা করবার কোনো দরকার নেই। যাদের সদ্‌গুরু লাভ হয়েছে তাদের আর ভাবনা কি? রাস্তা তো তারা পেয়েছে। সে রাস্তা ধরে এখন তারা চলুক।

সাধনা, সিদ্ধি ও ঈশ্বরীয় কর্ম, সর্ব দিক দিয়াই ব্রহ্মানন্দ ছিলেন একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ। একাধারে তিনি ছিলেন আপ্তকাম সাধক, দরদী আচার্য এবং মঠ ও মিশনের সংগ্রামকুশল অধিনায়ক। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত জীবনের এই বহুমুখী সাফল্যের কথাটি প্রত্যক্ষদর্শী, ভক্ত সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসুর লেখনীতে বড় সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।[১] তিনি লিখিয়াছেন, "মহারাজ অমিত ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার বহুমুখী শক্তি বর্ষার বারিধারার ন্যায় শতমুখে প্রবাহিত হইত। কিন্তু এত তেজ, এত শক্তি কিরূপে যে মৃন্ময় আধারে এত শান্ত হইয়া থাকিত, তাহার সন্ধান কেহ জানিত না।

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ: পরিচয়—দেবেন্দ্রনাথ বসু

বিদ্যুৎবাহী তার দেখিতে নির্জীব, কিন্তু স্পর্শ করিলে জানা যায় কি অমোঘ শক্তি তাহাতে নিহিত! শুনিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীর মৃন্ময় নয়—চিন্ময়। কিন্তু এই চিন্ময় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সে তথ্য সহজে বুঝা যাইত না। কি অলৌকিক ভালবাসায় তিনি সকলকে ভুলাইয়া রাখিতেন। সাধু, ভক্ত বা ব্রহ্মচারী নির্মল চিত্ত লইয়া অথবা ব্যথিত, তাপিত, পতিত, কলঙ্কিত জীবনের বোঝা বহিয়া যে-কেহ এই পুরুষোত্তমের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, তিনিই অন্তরে অন্তরে এই সত্যটি অনুভব করিয়াছেন—তিনি দেখিয়াছেন, যাহাকে সম্ভাষণ করিতে মন সঙ্কুচিত হয় সেই অনাদৃত জনকে মহারাজ কি আদরে আপ্যায়িত করিতেছেন। আত্মীয়স্বজন যাহার নাম শুনিতে কুণ্ঠাবোধ করে, কি স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে মহারাজ তাদের তত্ত্ব লইতেছেন। যে অভাগা সর্বজন পরিত্যক্ত, কি মমতায় মহারাজ তাহাকে বাঁধিয়াছেন। যার কোথাও স্থান নাই, মহারাজের দ্বার তাহার জন্য চির উন্মুক্ত।

"এই উদার বিশ্বপ্রেমের অমৃত-আস্বাদ পাইয়া কেহ ধারণা করিতে পারিত না যে, এই নিশ্চিন্ত শান্ত শিবময় পুরুষের কি মহান্ ত্যাগ, কঠোর বৈরাগ্য, অপরিমেয় তিতিক্ষা, কি জ্ঞান ভক্তি, নিষ্কাম কর্মানুরক্তি সংসার-মোহ-হারিণী এক মহাশক্তির উদ্বোধনের জন্য নিরুদ্বেগ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া থাকিত! ভিক্ষু তাঁহার অপ্রত্যাশিত করুণায় কৃতার্থ হইয়া ফিরিত; জ্ঞানী জ্ঞানচর্চায় তাঁহার ইতি করিতে পারিত না; ভক্ত সে ভক্তিসিন্ধু সন্তরণ করিয়া পার পাইত না; কর্মী কর্মকৌশলে তাঁহার কাছে হার মানিত; সংশয়ী বিশ্বাসের বল পাইত; সংসারী সংসারধর্মের নিগূঢ় মর্ম বুঝিত; রসিক তাঁহার রসস্ফূর্তিতে মহাহাস্যধারায় হাবুডুবু খাইত: সাধক তাঁহার কাছে সাধনার উচ্চতত্ত্ব লাভ করিয়া চরিতার্থ হইত; তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া হতাশ চিত্ত উৎসাহে, ভগ্ন হৃদয় আশার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিত, অথচ এই মহারাজ বালকের সঙ্গে যেন বালকটি হইয়াই খেলা করিতেন।

"মহারাজ যে মহারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন সেথায় দুঃখ, দৈন্য, শোকের প্রবেশ অধিকার ছিল না; রিপুদল সেথানে বল প্রকাশ করিতে পারিত না। সে রাজ্যের যাঁহারা প্রজা—মহারাজের অমায়িক ব্যবহারে তাঁহারা ভাবিতেন, আমি তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, অথচ আপন আপন অধিকার-সীমা লঙ্ঘন করিয়া প্রশ্রয় লইতে কেহ কখন সাহসী হইতেন না। এ রাজ্যে প্রবেশ করিলে মনে হইত সংসারের বহু উর্ধ্বে কোন্ এক অত্যাশ্চর্য আনন্দময় লোকে আসিয়াছি —যেখানে দ্বেষ দেশছাড়া, দ্বন্দ্ব স্পন্দনহীন, তাঁর আনন্দ অবাধ।"

সে-বার কাশীধামে অবস্থান করার সময় স্বামী বিবেকানন্দ গুরুতরভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন। সারা শরীরে শোথ দেখা দেয়, ডাক্তারেরা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া উঠেন।

বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে। তিনি স্থির করেন, কলিকাতায় আনিয়া স্বামীজীর চিকিৎসা করানো হইবে। অবিলম্বে স্বামীজীকে বেলুড় মঠে নিয়ে আসা হয় এবং অভিজ্ঞ কবিরাজের তত্ত্বাবধানে তাঁহার চিকিৎসা চলিতে থাকে। এ সময়ে ব্রহ্মানন্দ গুরুভাই ও তরুণ ব্রহ্মচারীদের বলিতেন, "তোমরা সবাই প্রাণপণে স্বামীজীর সেবা-যত্ন করো, তাঁকে সুস্থ ক'রে তোল। স্বামীজী আমাদের সব চাইতে বড় অবলম্বন।"

স্বামীজীর সেবা-পরিচর্যায় ব্রহ্মানন্দ নিজেও একান্তভাবে তাঁহার প্রাণ-মন ঢালিয়া দেন। এসময়ে দিনরাত রোগীর শয্যার পাশে চিন্তাকুল হইয়া তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। ক্রমে স্বামীজী কিছুটা সুস্থ হইয়া উঠেন, গুরুভাইরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন এবং ব্রহ্মানন্দের মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার আভা। এ সময়ে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে বলিতে শোনা যায়, "স্বামীজীর এই পীড়ার সময় কি ব্যস্ততা আর উদ্বেগেই না দিন কেটেছে। মনে হচ্ছে ঠাকুরের পীড়ার সময়ও এত সেবা করতে পারি নি।"

স্বামীজীর ভগ্নস্বাস্থ্য আর জোড়া লাগে নাই, কয়েকমাসের মধ্যেই আবার দেখা দেয় এক দারুণ সঙ্কট। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে তিনি মরধাম চিরতরে ত্যাগ করিয়া যান। ভক্ত ও গুরু-ভাইদের হৃদয়ে নামিয়া আসে বিষাদের অন্ধকার।

প্রিয়তম গুরুভাই, গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধানতম লীলাপার্ষদ বিবেকানন্দের শোকে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ উন্মত্তের মতো হইয়া যান, স্বামীজীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তিনি ক্রন্দন করিতে থাকেন। শোকের বেগ কিছুটা প্রশমিত হইলে মহারাজকে সাশ্রুনয়নে বলিতে শোনা যায়,—"সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড়টা আজ অদৃশ্য হয়ে গেল।"

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারা এসময়ে দিকে দিকে বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করিয়া তরুণ ছাত্রসমাজে সেবাধর্মের একটা জোয়ার বহিয়া যায়। আর্তত্রাণ, নিরক্ষরদের শিক্ষাদান, আর বন্যা-দুর্ভিক্ষের সঙ্কটে দেশের তারুণ্য শক্তি রামকৃষ্ণ মিশনের নেতৃত্বে অগ্রসর হইয়া আসে। সারা ভারতের জনজীবনে ইহার প্রভাব অনুভূত হয়।

মঠ ও মিশনের বিস্তার সাধিত হইতেছে আর ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্ব-শক্তিও হইতেছে দূরবিস্তারী। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণীবহরূপে, জীবন্ত ভাষ্যরূপে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

যুবক ভক্ত ও ব্রহ্মচারীদের কাছে ব্রহ্মানন্দের প্রথম ও শেষ কথা ছিল কর্ম ও উপাসনার যুগ্ম সাধনা। প্রায়ই বলিতেন, "রামকৃষ্ণ-ভক্তদের সেবাধর্ম মানুষের বা জীবের সেবা নয়, এটা হচ্ছে জীবন্ত ভগবানের পূজা—প্রেমে ও ভক্তিতে জীবরূপী নারায়ণের সেবা।"

ব্রহ্মানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ-রসের ঘনীভূত বিগ্রহ। মঠ মিশনের কাজে যখন যেখানে তিনি উপস্থিত হইতেন ভক্ত ও সেবকদের অন্তরে, নবাগত জিজ্ঞাসু তরুণদের অন্তরে জাগিয়া উঠিত আনন্দের

স্রোতধারা। মহারাজের প্রেম বিহ্বলতার স্মৃতি চিরতরে তাহাদের মনে অঙ্কিত হইয়া যাইত। ঐশ্বরীয় ভাবে তাহারা উদ্দীপিত হইয়া উঠিত।

মহারাজের প্রাণঢালা ভালবাসাই ছিল তরুণ কর্মীদের এবং সমগ্র রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরই সেবা ও উপাসনার এক বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিতে তিনি সক্ষম হন। "সকল প্রকার কাজকর্ম ও জাগতিক ব্যাপারের উর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় উচ্চ ভাবভূমিতে নিয়ত অবস্থান করিয়াও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে তিনি দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন করিয়াছিলেন। এইরূপ পরমহংসের ন্যায় বিরাজ করিয়াই তিনি সঙ্ঘের বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন। মঠ ও মিশনের যাবতীয় সদনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান এবং জনহিতকর কার্যের প্রেরণার মূলে থাকিয়াও তিনি ছিলেন অনাসক্ত, একক, নির্দ্বন্দ্ব এবং সমাহিত। বালকবৎ কোমল, সরল ও আনন্দময় হইয়াও তিনি ছিলেন প্রশান্ত, অচঞ্চল এবং গম্ভীর। এই অপূর্ব দিব্যভাবেই আধ্যাত্মিক তরঙ্গের প্রবাহে তিনি নীরবে সঙ্ঘের সম্প্রসারণ করিয়াছিলেন[১]।"

বঙ্গভঙ্গের পর সারা দেশে একটা বিরাট রাজনৈতিক আলোড়ন দেখা দেয়। রাজনৈতিক মুক্তি-সাধন এবং ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির উজ্জীবন সাধনের জন্য শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ জাগিয়া উঠে। এই সময়ে বিশেষ করিয়া বিবেকানন্দের ভাবধারা দেশের সর্বত্র বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। দলে দলে যুবক কর্মী ও মুমুক্ষুরা রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনে ভিড় করিতে থাকে। রামকৃষ্ণের ধারক ও বাহক ব্রহ্মানন্দের বাণী ও দিব্য সান্নিধ্য এই সময়ে অনেকের জীবনকে রূপান্তরিত করে।

কিছুসংখ্যক প্রাক্তন বিপ্লবী ও রাজরোষে পতিত রাজনৈতিক কর্মীও এই সময়ে সাধনপ্রয়াসী হন এবং ব্রহ্মানন্দের শরণ নেন। বিদেশী শাসকদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া মহারাজ মঠে

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন কর্তৃক প্রকাশিত

তাঁহাদের আশ্রয় দেন, পরমার্থ লাভের সুযোগ পাইয়া তাঁহারা ধন্য হয়।

নবাগত সাধনার্থী ও কর্মীদের মহারাজ বলিতেন, "ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখলে মনের একটা শক্তি জন্মে। বারো আনা মন ভগবানের দিকে রেখে, চার আনায় জগতের কাজ ভেসে যায়।"

ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সাধনের সঙ্কল্প স্থির থাকিলে এবং ঈশ্বরের আশ্রয় নিলে সাধনার সমস্ত কিছু সুযোগ, ঈশ্বর নিজেই পুরাইয়া দেন। ঈশ্বরের ধারক বাহক জীবন্ত মহাপুরুষেরাই শুধু নয়, সূক্ষ্মদেহী বিদেহী মহাপুরুষেরাও সাধনপথে সাধকদের নানাভাবে সাহায্য করেন। এই সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ তাঁহার নিজ জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা মাঝে মাঝে বলিতেন।

একবার তিনি বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। সে সময়ে রাত বারোটায় ঘুম হইতে উঠিয়া জপ-ধ্যানে নিবিষ্ট হইবার অভ্যাস তাঁহার ছিল। জপ করার সময় প্রায়ই চোখে পড়িত এক অলৌকিক দৃশ্য। কক্ষের দ্বার রুদ্ধ। কিন্তু, দেখা যাইত, এক সৌম্যমূর্তি বৈষ্ণব বাবাজী জপের মালা হাতে নিয়া শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রহ্মানন্দ বুঝিতেন, কোনো সূক্ষ্মদেহী মহাত্মা তাঁহাকে আশ্বাস ও প্রেরণা দিবার জন্যই রোজ প্রভাতে আবির্ভূত হইতেছেন।

একদিন শরীর বড় ক্লান্ত ছিল, অভ্যাসমতো বারোটার প্রাক্কালে ব্রহ্মানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। এমন সময়ে কে যেন তাঁহাকে ধাক্কা মারিয়া জাগাইয়া দিল। চোখ মেলিতেই দেখিলেন, সেই বিদেহী বাবাজী স্মিতহাস্যে শয্যার পাশে দণ্ডায়মান, জপমালাটি প্রসারিত করিয়া ব্রহ্মানন্দকে ইঙ্গিত করিতেছেন জপে বসিবার জন্য।

ভগবান্ লাভে বদ্ধপরিকর সাধুদের জন্য সাহায্য এমনিভাবে ভগবৎ কৃপায় জাগতিক ও সূক্ষ্ম স্তর হইতে নামিয়া আসে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের চেষ্টায় ও যত্নে মাদ্রাজের মঠ তখন দৃঢ়

ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা, মঠনায়ক ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একবার সেখানে পদার্পণ করেন। মহারাজের আগমনের প্রাক্কালে রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ মঠের সাধু ও কর্মীদের ডাকিয়া কহিলেন, "একথাটি তোমরা সবাই স্মরণ রেখো—স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের নিজের সন্তান। তোমরা তাঁকে যখন দর্শন করবে তখন ঠাকুর কেমন ছিলেন তার কতকটা আভাস পাবে। ব্রহ্মানন্দের অহংটি সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে। যা তিনি বলেন, যা তিনি করেন—তা ঠাকুরের প্রেরণায়। ঠাকুর তাঁকে ঠিক নিজের ছেলের মতোই দেখতেন। তিনি ঠাকুরের ঘরেই শুতেন, কখনো কখনো এক মশারীর ভেতরেই থাকতেন। রাখালের পরিধানে কোনো ছিন্ন বস্ত্র দেখলে তিনি কেঁদে ফেলতেন আর চেঁচিয়ে বলতেন, 'রাখালকে নূতন কাপড় দেবার কি কেউ নেই ?' ঠাকুরের জন্য কেউ কোনো ফল মিষ্টি বা খাবার জিনিস আনলে অনেক সময় তিনি তাদের বলতেন, 'ও সব রাখালকে দাও—আমি তার মুখে খাই।' একদিন রাত্রে ঠাকুরের পিপাসা পায়। তিনি রাখালকে খাবার জল দিতে বললেন। রাখাল বিছানায় শুয়ে তন্দ্রার ঘোরে বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে 'পারবো না' বলে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন। গুরু মহারাজের এতে আনন্দ যেন উথলে উঠল। পরের দিন তিনি আনন্দ ক'রে সবাইকে এই ঘটনাটি আনুপূর্বিক উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন, 'এখন বুঝেছি, রাখাল আমাকে ঠিক বাপ বলেই জানে।'

গুরুভাই ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের ধারণা ও মূল্যায়ন কি ছিল, এই ভাষণ হইতে তাহা উপলব্ধি করা যায়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাষায় রাখাল মহারাজ ছিলেন একটি বর্ণচোরা আম। সহজ সুন্দর অমায়িক আনন্দময় এই সাধকের ভিতরে যে গম্ভীর তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষটি বাস করিতেন তাহার সন্ধান অনেকের পক্ষেই পাওয়া কঠিন ছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে সে সময়ে ভক্ত-প্রবর গিরিশ ঘোষ এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "তুমি আমায় লিখিয়াছিলে, রাখালকে কেউ চিনতে পারে না। আমার ধারণা,

যে ভাগ্যবান্ রাখালকে চিনিবে, সে সেইদিনই মহারাজের (ঠাকুর রামকৃষ্ণের) কৃপা প্রাপ্ত হইবে—তাহার মনুষ্য জন্ম সফল।"

মাদ্রাজে মীনাক্ষী মন্দির দর্শন কালে ব্রহ্মানন্দের যে দিব্য ভাবাবেশ হয় তাহার স্মৃতি স্থানীয় ভক্তদের হৃদয়ে দীর্ঘদিন জাগ্রত ছিল। দর্শনের দিন ভোরবেলা হইতে মহারাজ গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দকে বলিতে থাকেন, "মনে কেমন একটা অপূর্ব ভাবের জোয়ার আসছে, যেন একটা কিছু আজ ঘটবে।"

মন্দিরের ভিতরে গিয়া দেবমূর্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ নীরব নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়েন, অতীন্দ্রিয় দর্শনের ফলে হারান তাঁহার বাহ্যজ্ঞান। গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার দেহটি বেষ্টন করিয়া থাকেন।

একঘণ্টা কাল ব্রহ্মানন্দের এই ধ্যানাবেশ চলিতে দেখা যায়, মন্দিরের তীর্থযাত্রী ও সাধু-সন্ন্যাসীরা দিব্যভাবে বিভাবিত এই মহাপুরুষের দিকে সবিস্ময়ে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে শত শত লোক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধন্য হয়।

সেদিনকার ভাবাবেশ সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ ভক্তদের বলিয়াছিলেন, "যখন মন্দিরে বিগ্রহের সামনে দাঁড়ালাম তখন দেখলাম, জগন্মাতার বিগ্রহ যেন জীবন্ত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন—তাই তো অমন সংজ্ঞাহারা হয়ে গিয়েছিলাম।"

বাঙ্গালোরে মঠ স্থাপিত হওয়ার পর সে-বার স্বামী নির্মলানন্দের আগ্রহাতিশয্যে ব্রহ্মানন্দ সেখানে গিয়া কিছুদিন অতিবাহিত করেন। তাঁহার উপস্থিতিতে আশ্রমে ও তাহার আশেপাশে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়, একটা অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ রচিত হয়।

এখানকার মুচি সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক ভক্ত রবিবারে মঠে আসিয়া-কীর্তন ও ভজনে অংশ গ্রহণ করিত। মহারাজ পরমানন্দে তাঁহাদের সহিত যোগ দিতেন, তাহারাও এই পুণ্যচরিত মহাত্মার

পদবন্দনা করিয়া ধন্য হইত। এই অস্পৃশ্য ভক্তদের আকর্ষণে মহারাজ একদিন তাহাদের পল্লীস্থিত ঠাকুরঘরে গিয়া উপস্থিত হন, সাধন-ভজনে উৎসাহ দান করিয়া এই মুচিদের আশীর্বাদ করিয়া আসেন। তাঁহার এই প্রেমপূর্ণ মনোভাব ও সমদর্শিতা দেখিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও ভক্ত-সাধকেরা প্রেরণা লাভ করেন, অন্ত্যজদের প্রতি সংস্কারজাত যে বৈষম্যবোধ ও বিদ্বেষ ছিল তাহা অনেকটা দূরীভূত হয়।

এই মঠের কর্মী ও সাধুদের আধ্যাত্মিক ভিত্তি যাহাতে দৃঢ় হয় এজন্য ব্রহ্মানন্দ সদাই তাহাদের উৎসাহিত করিতেন। কখনো কখনো মধ্য রাত্রে বা শেষ রাত্রে একজন লণ্ঠনধারী সেবককে সঙ্গে নিয়া নবীন সাধুদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেন, লক্ষ্য করিতেন জপতপে কাহারা রত, আর কাহারাই বা রহিয়াছে তামস ঘুমে অচেতন। পরের দিন ভোরবেলায় ছেলেরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিত, ক্ষুব্ধ গম্ভীর কণ্ঠে মহারাজ আলস্যপরায়ণ সাধুদের তীব্র তিরস্কার করিতেন—"এ কি কচ্ছিস্ তোরা? রাত্রিকাল সাধনের প্রশস্ত সময়। আর তোরা ঘুমিয়ে তা কাটিয়ে দিচ্ছিস্। এই জোয়ান বয়সে তোদের এত ঘুম? এখন যদি ভগবান্ লাভ করবার জন্য না খাটবি, তবে কবে আর তোদের সময় হবে? দিনের বেলা তো কাজকর্মে গল্পে-সল্পে সময় কেটে যায় তাঁকে ডাকবি কখন?"

স্বভাব গম্ভীর, শান্ত সমাহিত পুরুষ, ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ভিতরে বাস করিত একটি আনন্দময় বালক। এই বালকটি হঠাৎ এক একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিত, তখন আনন্দরঙ্গ ও হাস্য পরিহাসে মহারাজ চারিদিক মাতাইয়া তুলিতেন। তখন তাঁহার রকমসকম দেখিয়া কে ভাবিতে পারিত যে ইনিই রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের বহুভক্ত-সেবিত অধিনায়ক ব্রহ্মানন্দ মহারাজ।

মহারাজের, রহস্যপ্রিয়তার একটি কাহিনী এখানে বর্ণিত হইতেছে। সেবার দূরদেশ হইতে এক গুরুভাই বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দের

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। কয়েক দিন পরমানন্দে মঠে অতিবাহিত করার পর তিনি জানান, এবার তাঁহাকে নিজের কর্মকেন্দ্রে ফিরিতে হইবে, রাত্রির ট্রেনেই তিনি রওনা দিবেন।

অনেক দিন পরে গুরুভাইকে কাছে পাইয়াছেন, মহারাজের মন চাহিতেছে না যে তিনি চলিয়া যান। কহিলেন, "আরো দু'চার দিন থেকেই যাও না। কতকাল পরে দেখা।"

"তা কি ক'রে হয়। সেখানে যে নানা জরুরী কাজ রয়েছে। আজই আমার যাওয়া অত্যন্ত দরকার।" গুরুভাইটি উত্তরে বলেন।

ব্রহ্মানন্দ চুপ করিয়া গেলেন। গুরুভাইকে ধরিয়া রাখার জন্য গোপনে আঁটিলেন এক ফন্দী। তখনকার দিনে বেলুড় মঠ হইতে স্টেশনে যাইতে হইলে পাল্কী নিতে হইত। রাতের বেলায় পাল্কী নিয়া বেহারারা হাজির, যাত্রার প্রাক্কালে মহারাজ তাহাদের নিভৃতে ডাকিয়া ফিসফিস করিয়া কি যেন বলিয়া দিলেন। পাল্কী চলিতে শুরু করিল, গুরুভাইটি ভিতরে পা ছড়াইয়া তন্দ্রায় ঢুলিতেছেন আর মাঝে মাঝে কানে আসিতেছে বাহকদের হুম্‌হুম্‌ আওয়াজ। ক্রমে তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

অতি প্রত্যুষে দেখা গেল, বাহকেরা পাল্কীটি নিয়া মঠের মাঠেই বিচরণ করিতেছে, আর অবিশ্রাম হুম্‌-হুম্‌ শব্দ করিয়া চলিয়াছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া স্মিতহাস্যে গুরুভাইটিকে অভ্যর্থনা জানাইলেন।

বুঝা গেল, বাহকেরা পাল্কীটি নিয়া মোটেই স্টেশনের দিকে যায় নাই। আরোহীটি ভিতর হইতে বাহকদের মুখের আওয়াজ শুনিয়া নিশ্চিন্তে শুইয়া ভাবিতেছিলেন, পাল্কী যথারীতি তাহাদের গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। তারপর কখন হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়েন। আসলে সারারাত তিনি মঠের ময়দানেই চক্কর খাইতেছেন। মহারাজের এই রসিকতায় তিনি একেবারে বোকা বনিয়া গেলেন, চারিদিক হইতে হাসির রোল উঠিল।

গুরুভাইটি উপলব্ধি করিলেন, ব্রহ্মানন্দের এই রসিকতার মধ্যে

লুকায়িত রহিয়াছে পুরাতন ও অন্তরঙ্গ সখাকে আরো দুই চারদিন কাছে ধরিয়া রাখার ব্যাকুলতা। তাই দুই চোখ তাঁহার আনন্দের অশ্রুতে ছলছল হইয়া উঠে।

সে-বার ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও প্রবীণ ভক্তেরা কিছুদিনের জন্য কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে আসিয়াছেন। বিশেষ করিয়া মহারাজের আগমনে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, নানা স্থান হইতে কর্মী ও সাধুরা জমায়েত হইতেছেন। আশ্রম ও সেবায়তন দিন রাত আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ। মহারাজ তরুণ সাধুদের রোজ উৎসাহ দিতেছেন, "ক্ষেত্রের মধ্যে কাশীধাম শ্রেষ্ঠ। কাশীর মতো জায়গা নেই। কত সাধু ঋষি তপস্বী রাজর্ষির সাধনার ক্ষেত্র, সিদ্ধির স্থান। এখানে একটু জপ-ধ্যান করলেই জমে যায়।"

কখনো বা কাউকে বলিতেছেন, "খুব উঠে পড়ে লাগ্। এ এমন স্থান যে ধ্যান আপনা হতেই হয়। রাতদিন হর-হর বোম্-বোম্ শব্দ হচ্ছে। এখানকার হাওয়াই অন্যরকম। একটু করলেই হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়।

মা-সারদামণিও তখন কাশীতে রহিয়াছেন। একদিন ভক্তেরা পরম সমাদরে তাঁহাকে আশ্রম ও সেবায়তনে নিয়া আসিলেন।[১] পাল্কীতে করিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া তাঁহাকে সব দেখানো হইল। দেখিয়া শুনিয়া শ্রীমার আনন্দ আর ধরে না। তাঁহার নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তনের পর এক ভক্ত মায়ের পদবন্দনা করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "মা, কেমন দেখলেন আপনার ছেলেদের সেবাশ্রম।"

প্রশান্ত কণ্ঠে সারদামণি উত্তর দিলেন, "দেখলুম, ঠাকুর ওখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন। তাই এই সব কাজ হচ্ছে। এই সব যত কিছু তাঁরই কাজ।"

---

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা

ভক্তটি তখনি আশ্রমে গিয়া সোৎসাহে মহারাজকে মায়ের এই মন্তব্য জানাইয়া দিলেন। শিষ্য ও ভক্তেরা সবাই এ সংবাদে আনন্দে উৎফুল্ল। ঠাকুরের প্রবীণ ভক্ত, কথামৃতকার মহেন্দ্র গুপ্ত এসময়ে আশ্রমে আসিয়াছেন। রামকৃষ্ণ ভক্তদের মধ্যে একদল কহিতেন, 'ঠাকুরের উপদেশের সারমর্ম—প্রাণপণ প্রয়াসে ঈশ্বর লাভ করো। ত্রাণকার্য ও সেবাধর্মের কথা কখনো তিনি বলেন নাই। এসব পরিকল্পনা এসেছে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে।' মহেন্দ্র গুপ্ত এই মতবাদীদের অন্যতম। ব্রহ্মানন্দ ও ঠাকুরের অন্যান্য শিষ্য-ভক্তেরা তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন; কহিলেন, "মাষ্টারমশাই, মা'র কথা শুনেছেন তো? এখন আর না মানলে চলবে না যে ঠাকুরের সম্মতি আছে সেবাকর্মে। মা এই সেবাশ্রমে ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করলেন। মা বলেছেন—এ তাঁরই শ্রীমুখের কথা।"

মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সহাস্যে কহিলেন, "তা বটেই তো। আর এসব অস্বীকার করবার জো নেই।"

ব্রহ্মানন্দ-স্বামী বালকের মতো আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। স্বামীজীর আহ্বান কর্ম ও উপাসনার যে তত্ত্ব তাঁহারা প্রচার করিয়া চলিয়াছেন সে তত্ত্বের বিপুল সমর্থন যেন তিনি আদায় করিয়া ছাড়িলেন।

কাশীতে মা-সারদামণি অদ্বৈত আশ্রমের নিকট এক ভক্তের বাড়িতে অবস্থান করিতেন। ব্রহ্মানন্দ প্রতিদিনই সেখানে মা'কে দর্শন করিতে যাইতেন। নীচতলায় দাঁড়াইয়া এই দর্শনকার্য চলিত এক-একদিন বালকের মতো হাসি গানে তিনি মাতিয়া উঠিতেন, আর উপর হইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মা আনন্দ উপভোগ করিতেন।

মায়ের কাছে দর্শনার্থীদের নানা আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উত্থাপিত হইত। কোনো কোনোটির সমাধান তিনি নিজেই করিতেন, কখনো বা বলিতেন, "রাখালের কাছ থেকে এর উত্তর জেনে নিও।" কোনো কোনো মুমুক্ষু ভক্তকে গৈরিক দিয়া মা নির্দেশ দিতেন, "এবার রাখালের কাছ থেকে সন্ন্যাস নিও।"

একদিন মাতৃ দর্শনের জন্য ব্রহ্মানন্দ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। আশেপাশে আরো কয়েকজন উপস্থিত। মায়ের সেবিকা গোলাপ-মা দোতলা হইতে ডাকিয়া বলেন, "রাখাল, মা জিজ্ঞেস করছেন, আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন ?"

ব্রহ্মানন্দ যুক্তকরে উত্তর দেন, "মার কাছেই যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা ক'রে চাবি দিয়ে দোর না খুললে আর উপায় নেই।"

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহে মনে এক দিব্যভাবের তরঙ্গ খেলিয়া যায়। পরমানন্দে উদাত্ত স্বরে তিনি গান ধরেন :

শঙ্করী-চরণে মন মগ্ন হয়ে রওরে।
মগ্ন হয়ে রওরে সব যন্ত্রণা এড়াওরে।
এ তিন সংসার মিছে, মিছে ভ্রমিযে বেড়াওরে।
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধেয়াও রে
কমলাকান্তের বাণী শ্যামা মায়ের গুণ গাওরে।
এতো সুখের নদী নিরবধি ধীরে ধীরে বাওরে।

ভাবাবেশ মত্ত মহারাজ বালকের মতো নাচিয়া নাচিয়া করতালি দিয়া গানটি শেষ করেন। তারপর হো-হো-হো শব্দে অট্টহাস্য করিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলায়ন করেন।

মা-সারদামণি এতক্ষণ আড়াল হইতে এই স্বর্গীয় দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলেন। বালক ভাবে বিভাবিত তনয়ের এই আনন্দরঙ্গ দেখিয়া অন্তর তাঁহার অপার প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল।

বেলুড় মঠে আর একদিন মা-সারদামণির সম্মুখে ব্রহ্মানন্দ যেরূপ দিব্যভাবে আবিষ্ট হন, তাঁহার স্মৃতিও সেবকদের মনে দীর্ঘকাল জাগরূক ছিল।

মঠ প্রাঙ্গণে কালীকীর্তন হইতেছে, লোকে লোকারণ্য। শ্রীমা উপরের ঘরে বসিয়া কীর্তন শুনিতেছেন। প্রেমানন্দ স্বামী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মহারাজকে কীর্তনের আসরে ধরিয়া নিয়া বসাইলেন। ক্ষণপরেই দেখা গেল, ভাবতরঙ্গে উদ্বেল হইয়া মহারাজ নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছেন। ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হইল তিরোহিত।

ভক্তেরা প্রমাদ গণিলেন। অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে কীর্তন আসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া বসানো হইল মঠবাড়ির নিম্নতলের এক কক্ষে।

মহারাজ স্থাণুবৎ নিশ্চল নির্বাক হইয়া বসিয়া আছেন। বাহ্য চেতনার কোনো চিহ্ন নাই। সেবকদের বহু ডাকাডাকিতেও তাঁহার হুঁশ আসিতেছে না।

মা-সারদামণি মঠে আসিবেন, তাই মহারাজ ভোর হইতে রহিয়াছেন উপবাসী। দীর্ঘসময় ভাবাবিষ্ট থাকার পরও তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতেছে না দেখিয়া প্রবীণ গুরুভাইরা শঙ্কিত হইলেন।

এ সংবাদ মাকে জানানো হইল। তাঁহার চোখে মুখে প্রসন্নতার আভা, কহিলেন, "সেজন্য ভেবো না। নাও—এই প্রসাদ রাখালকে গিয়ে দাও।"

মায়ের প্রসাদ সামনে রাখিয়া অনেকবার উচ্চ স্বরে ডাকাডাকি করা হইল, কিন্তু ধ্যানস্থ ব্রহ্মানন্দের কানে কোনো কথাই পৌঁছিল না। নিমীলিত নয়নে, ঋজু হইয়া তিনি বসিয়া আছেন, মুখমণ্ডল দিব্য আনন্দের ছটায় উজ্জ্বল। এই বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার যেন আর কোনো যোগাযোগ নাই।

মা-সারদামণি এবার ধীরপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। ব্রহ্মানন্দের বাহু স্পর্শ করিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে কহেন, "ও রাখাল, এই যে আমি প্রসাদ দিয়েছি, তুমি খাও।"

সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের বাহ্য-চেতনা ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়। রোমাঞ্চিত কলেবরে মায়ের চরণ বন্দনা করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন, তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে।

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের বালকবৎ ভাব ও প্রেমঘন অন্তর্লীন অবস্থার উল্লেখ করিয়া স্বামী সারদানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, "আমাদের মধ্যে একমাত্র মহারাজের ভেতরেই ঠাকুরের পরমহংস অবস্থার

হাবভাব, চালচলন দেখতে পাওয়া যায়। মহারাজকে পেছন থেকে দেখলে তো ঠাকুর বলেই মনে হত।"

ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন বহুভাবের প্রমূর্ত রূপ। কর্ম, জ্ঞান ও প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ দেখা যাইত তাঁহার মহাজীবনে। "কোন সময়ে কোন্ ভাবের স্ফুরণ হইবে তাহা বাহির হইতে দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না। অনুভূতির বিশাল রাজ্য যেন তাঁহার করতলগত, অথচ তাহা যেন স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—'মন এখন লীলা হইতে নিত্য এবং নিত্য হইতে লীলায় আসে।' তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, তাঁহার দেহ-মন যেন কোনো অপার্থিব বস্তুতে গঠিত। প্রেম, পবিত্রতা, সরলতা ও সাধু প্রবৃত্তির তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিগ্রহ। মহারাজের মুখমণ্ডল প্রায়ই ভাবজ্যোতিতে পরিপূর্ণ থাকিত, সর্বদাই আনন্দময়—কখনও বালকের মতো হাস্যকৌতুক ও ক্রীড়ারঙ্গে মত্ত আবার কখনও নৃত্যবাদ্যে উৎফুল্ল। তাঁহার একদিকে সহজ বালস্বভাব, অপরদিকে অপূর্ব গম্ভীরভাব। তিনি যখন নিজের ভাবে মত্ত থাকিয়া ভাবগম্ভীর অবস্থায় বসিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার নিকট কেহ অগ্রসর হইতে সাহস পাইত না, এবং কেহ কোনো প্রশ্ন করিতে আসিলেও নীরব হইয়া থাকিত; আবার কেহ কিছু বলিতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া যাইত। যখন তিনি একাকী মঠের প্রাঙ্গণে বা কোনো উন্মুক্ত দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে গম্ভীরভাবে পাদচারণা করিতেন তখন তাঁহাকে দেখিলে তেজোদৃপ্ত নরসিংহের ন্যায় বোধ হইত[১]।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে গুরুভাই, প্রতিভাধর নাট্যকার ও নট, গিরিশ ঘোষের অতি উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁহার এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"রাখাল-টাখাল

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন

আমার কাছে ছেলেমানুষ, কালকের ছোকরা। ঠাকুরের কাছে আমি যখন যেতাম, তখন আর ওদের বয়স কত? এই রাখালকে আমি ঠাকুরের মানস-পুত্র বলে মানি। তা কি শুধু শুধুই মানি? যখন আমার প্রথম হাঁপানি হল, তখন খুব জ্বর, খুব দুর্বলও হয়ে পড়লুম। এখানে তো শান্তি স্বস্ত্যয়ন. চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ হচ্ছে। এদিকে আমার মনে এক সর্বনেশে ভাবের উদয় হল—ঠাকুর একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। তখনি মনে হল—গুরুতে মানুষজ্ঞান, মানুষ-বুদ্ধি, আমি বেটা গেছি। মনে এল দারুণ অশান্তি, কিছুতেই ঠাকুরের উপর ভগবদ্‌বুদ্ধি এল না। অনেককে বললাম, যে সব ত্যাগী গুরুভাইরা আমায় দেখতে আসতো, সবাইকে বলতাম। কিন্তু সবাই শুনে চুপ ক'রে থাক্‌তো। আমার মনে দিন দিন দারুণ অশান্তি বৃদ্ধি পেতে লাগলো। মনের সঙ্গে সর্বদা লড়াই করছি—তবু ঠাকুরের উপর মানুষবুদ্ধি যায় না। এই সময় একদিন রাখাল দেখতে এল। তাঁকে সব খুলে বলে, কাতরভাবে প্রশ্ন করলাম, 'এখন উপায় কি?'

"রাখাল সব কথা শুনে হোহো ক'রে হেসে উঠলো। বললে—'ও কিছু নয়, ঢেউ যেমন হুস ক'রে উঁচু হয় আবার তখনি নীচু হয়ে নেমে যায়, মনটাও তেমনি। ওর জন্য কিছু ভাববেন না। শিগগীরই আধ্যাত্মিক উন্নতির একটা উঁচু স্তরে আপনাকে নিয়ে যাবে, তাই মন এমনি হচ্ছে। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না'। ন'দিদি খাবার এনে দিলে। রাখাল খেয়ে উঠে গেল, যাবার সময়ে হেসে বললে, 'ব্যস্ত হবেন না। কোনো ভয় নেই, মন আবার তড়াক্ ক'রে লাফ দিয়ে কোথায় চলে যাবে।' এই বলে যেই রাখাল বাড়ির সামনের গলি পার হয়ে অন্য গলিতে মোড় ফিরলে, অমনি আমার কাঁধের ভূতটা যেন চলে গেল—ঠাকুরের উপর আগেকার মতো ভগবদ্‌বুদ্ধি এল। সাধ ক'রে কি ওকে মানি? রাখাল পিছন ফিরলে অনেক সময় ঠাকুর বলে আমারই ভুল হয়। ঠিক সেই রকম হাব-ভাব কথাবার্তা কতক কতক পেয়েছে।"

ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তির বিচ্ছুরণ আরো অনেক ভক্তের উপর পড়িয়াছে, তাহাদের জীবনে আনয়ন করিয়াছে শান্তি, স্থৈর্য ও আত্মিক সাধনার সাফল্য।

ত্যাগ বৈরাগ্যের সহিত সংগঠন পরিচালকের দৃঢ়তা ও দূরদৃষ্টি ব্রহ্মানন্দের জীবনে সমন্বিত হইয়াছিল। তাই মঠ মিশন ও ভক্ত শিষ্যেরা তাঁহার প্রজ্ঞা এবং সূক্ষ্ম স্বচ্ছ দৃষ্টির সাহায্য লাভ করিয়া সতত উপকৃত হইতেন।

সে-বার এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁহার একমাত্র পুত্রের দেহান্তের পর শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন। সাধুসঙ্গের ফলে প্রাণে শান্তি আসিবে এই আশায় কিছুদিন তিনি বেলুড় মঠের কাছাকাছি একটি বাড়িতে বাস করিতে থাকেন। দু'বেলা মঠে যাতায়াত এবং ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করার ফলে হৃদয়ের জ্বালা কিছুটা দূর হইল। মঠের প্রতি ক্রমে তিনি খুব আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

রামকৃষ্ণের উদার মত, বিবেকানন্দের সেবাধর্ম এবং ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের পূত চরিত্র তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এদিকে নিজের হৃদয়ে জাগিয়াছে নির্বেদ। সংসারে কে কাহার এবং বিত্ত ও পুত্র কলত্রের স্থায়িত্বই বা কতটুকু? স্থির করিলেন, নিজের সব কিছু বিষয়-আশয় ত্যাগ করিবেন, লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসাটিও অর্পণ করিবেন মিশনের জনহিতকর কাজে।

স্বামী প্রেমানন্দের কাছে এই প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করেন এবং সকাতর অনুনয় জানান এসব গ্রহণের জন্য। প্রেমানন্দ কোমল-হৃদয় সন্ন্যাসী, ধনী ব্যবসায়ীর কথায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়, তখনি ব্রহ্মানন্দকে গিয়া সব কথা খুলিয়া বলেন।

ব্রহ্মানন্দ কিন্তু বুঝিয়া নিলেন, শোকের আঘাতে ধনী ব্যক্তিটির সাময়িক বৈরাগ্য আসিয়াছে—ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাহাকে বলিতেন, মর্কট বৈরাগ্য। শোক দূরীভূত হইলেই পূর্ব-সংস্কার তাঁহার

জাগিয়া উঠিবে, তারপর মনে আসিবে তীব্র অনুশোচনা ও প্রতিক্রিয়া।

মহারাজ দুই হাত জোড় করিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু কহিলেন, "বাবুরামদা একি তুমি বলছো? ক'দিনের সাধুসঙ্গ ক'রে লোকটির মনে ত্যাগ বৈরাগ্যের উদয় হল, আর তার সঙ্গ করার ফলে আমাদের বিষয়বুদ্ধি জেগে উঠবে?"

প্রেমানন্দ মুহূর্তে ব্রহ্মানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারধারা বুঝিয়া নিলেন। ধনী ব্যক্তিটির প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ করিলেন প্রত্যাখ্যান।

আর একবার একজন বিত্তবান ভক্ত মঠকে বেশ কিছু জমি দান করিতে ব্যগ্র হয়। মঠের সাধু সন্ন্যাসীরা সর্বদাই অর্থাভাবে থাকে, তদুপরি সদাই এখানে রহিয়াছে ভক্ত দর্শনার্থীদের প্রসাদ নেওয়া। আবাদী জমিতে উৎপন্ন চাউল মজুদ করা থাকিলে সাধুদের অনেক ঝামেলা কমিয়া যায়।

ভক্তটির আগ্রহাতিশয্যে প্রেমানন্দ সসঙ্কোচে একদিন ব্রহ্মানন্দকে এই প্রস্তাবের কথা নিবেদন করেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সেদিনও উত্তর দিলেন, "বাবুরামদা, তোমরা সিদ্ধসংকল্প সাধুপুরুষ, তোমরা যা মনে করবে তা ফলবে। ঐরূপ সংকল্প ছেড়ে দাও।"

মঠ ও মিশনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিজের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দিয়া এমনিভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিচার করিতেন, নির্ধারণ করিতেন নিজেদের নীতি ও কর্মপন্থা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রভাব ও কর্মের পরিধি যেমন বাড়িতে থাকে, তেমনি দলে দলে এখানে আসিতে থাকে সাধনপ্রার্থী ও মুমুক্ষু নরনারী। রামকৃষ্ণ-তনয়, মিশনের অধিনায়ক, ব্রহ্মানন্দের কাছে সাধন ও আশ্রয় নিবার জন্য ইহাদের অনেকে ব্যাকুল হয়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের মতো ব্রহ্মানন্দও দীক্ষা এবং সাধনপ্রার্থীদের আগে হইতে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া নিতেন। তাহাদের আগ্রহ,

চরিত্রের ধৃতি ও পবিত্রতার দিকে তীক্ষ্ণ, সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তারপর দীক্ষার্থীর ইষ্ট এবং সাধনপথ ধ্যানবলে জানিয়া নিয়া দিতেন তাহাকে পরমাশ্রয়। দীক্ষা দানের পূর্বে প্রায়ই ঠাকুরের ইঙ্গিত বা নির্দেশ আসিত। তাই একবার তাঁহাকে স্পষ্টভাবে বলিতে শোনা যায়, "ঠাকুরের আদেশেই আমি সবাইকে নাম দিচ্ছি।"

ব্রহ্মানন্দ সেবার কয়েকদিনের জন্য বলরাম ভবনে আসিয়াছেন। একদিন দুপুরে শয়নকক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে ধনী ঘরের এক বিধবা কিশোরী ব্যাকুল হইয়া সেখানে উপস্থিত হয়, কাতর কণ্ঠে তাঁহার দর্শন প্রার্থনা করে।

সেবক ভক্তটি একথা জানাইলে মহারাজ উত্তরে বলেন, "এই বুড়ো বয়সে দিন রাত আর কত বক্‌বো বাবা?"

তদনুযায়ী মেয়েটিকে জানাইয়া দেওয়া হয়, "মহারাজ বড় ক্লান্ত, তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হবে না।"

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কান্নায় ভাঙিয়া পড়ে। আর্ত স্বরে জানায়, "আমি তাঁকে একটুও বিরক্ত করবো না। একটিবার শুধু দর্শন ক'রেই চলে যাবো।"

এবার মহারাজকে অনুমতি দিতেই হইল। মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করার পর আবার ক্রন্দন শুরু করে, অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়া যায়। এদিকে মহারাজেরও অর্ধবাহ্য অবস্থা, একটা দিব্য ভাবাবেশে আননখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে শান্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে ব্রহ্মানন্দ বলেন, "স্থির হও, মা, স্থির হও। কি হয়েছে আমায় বল।"

এ অভয় বাণী শুনিয়া মেয়েটি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়। তারপর দেয়ালস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোটির দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠে, "ঐ উনিই আমায় নির্দেশ দিয়েছেন আপনার কাছে শরণ নিতে। তাইতো আমি পাগলিনীর মতো ছুটে এসেছি।"

অতঃপর মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে মেয়েটি সবিস্তারে সব কথা খুলিয়া বলে। সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা সে, বাল্যকালেই বিধবা হইয়াছে। এখন

বয়স প্রায় চৌদ্দ বৎসর। দীর্ঘ জীবন সম্মুখে পড়িয়া আছে, অথচ নিজের মনের দিক দিয়া তাহার কোনো অবলম্বন নাই, আশ্রয় নাই। কিছুদিন যাবৎ সে বড় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, নিজের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া মন হইয়াছে নৈরাশ্যে অভিভূত। এই সঙ্কট সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কয়েকদিন আগে গভীর রাত্রে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়, চাহিদা দেখে শয্যার পাশে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন। কৃপাভরে তিনি কহিলেন, 'আমার ছেলে রাখাল বাগবাজারেই তো রয়েছে। তার কাছে তুই চলে যা।'

এই দৈবী আদেশ প্রাপ্তির পর অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া এখানে আসিয়া সে উপস্থিত হইয়াছে।

সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশের মর্ম বুঝিয়া নিতে মহারাজের দেরি হইল না। সেই দিনই কৃপাভরে এই বিধবা কিশোরীকে তিনি দীক্ষা দান করিলেন।

মহারাজের কৃপায় এই মহিলা অল্পকাল মধ্যে উন্নততর সাধনের অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং উত্তরকালে গ্রহণ করেন সন্ন্যাসজীবন।

ব্রহ্মানন্দের কৃপার ধারা ছিল সকলেরই জন্য উন্মুক্ত। এ কৃপা ধনী নির্ধন, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের কোনো তারতম্য করিত না। অভিনেত্রী তারাসুন্দরী এ সময়ে মহারাজের পরমাশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁহার নির্দেশিত সাধনপন্থা অনুসরণ করিয়া অপার শান্তি লাভ করেন।

একবার অক্সফোর্ডের কোনো বিশিষ্ট অধ্যাপকের কন্যা কলিকাতায় স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। এই সময়ে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দিব্য স্পর্শ এই বিদেশিনীর সম্মুখে এক অলৌকিক অনুভূতির দ্বার খুলিয়া দেয়। এ সম্পর্কে তিনি ভগিনী দেবমাতাকে এক পত্র লিখেন,—"ভগিনী, আমি যা আশা করেছিলাম তার চাইতেও অনেক বেশী বিস্ময়কর কাণ্ড! মাত্র পাঁচ মিনিট কাল দর্শন পেয়েছি, কিন্তু তাঁর দুটি হাতের ভেতর আমার হাতটি নিয়ে তিনি এমন কিছু উৎসাহপূর্ণ আশ্চর্যজনক কথা বলেছিলেন যাতে নিশ্চিতরূপে কিছু ঘটে গেল। যখন তাঁর ঘর থেকে বাইরে এলাম

আমার মনে হলো, আমার বয়স যেন বিশ বৎসর কমে গিয়েছে। আর নূতন আশা নিয়ে, নূতন বিশ্বাসের ধৃতি নিয়ে আত্মিক সংগ্রাম চালানোর জন্য আমি যেন প্রস্তুত হয়েছি। এ দিনটি আমার কাছে অপূর্ব, এদিন থেকে কত তৃপ্তি আর আনন্দ আমি বোধ করছি। এর জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, আর যাঁরা এই দর্শন লাভে আমায় সাহায্য করেছিলেন তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ[১]।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্যেরা জানিতেন, ব্রহ্মানন্দের মতো অপর কেহই ঠাকুরের নিয়ত সঙ্গ করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া দিনের পর দিন ঠাকুর অজস্র উপদেশ ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বিতরণ করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ শিষ্যদের অধ্যাত্মজীবন গড়িয়া তুলিতে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। নানা নিগূঢ় সাধন-নির্দেশ তিনি এ সময়ে তাঁহাদের দিতেন এবং কথাপ্রসঙ্গে নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির কাহিনীও অকপটে বিবৃত করিতেন। এই সব তত্ত্ব ও তথ্যের প্রধান ভাণ্ডারী ছিলেন তাঁহার আদরের পুত্র, নিত্যকার সঙ্গী, রাখালরাজ। তাই উত্তরকালে ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে শ্রুত এধরনের অনেক কিছু তথ্য সারদানন্দ স্বামী তাঁহার লীলাপ্রসঙ্গে পরিবেশন করিয়াছেন।

ঠাকুরের নিজমুখের উপদেশবাণী সঠিকভাবে সঙ্কলিত হয় এবং ভক্ত-সাধকদের উপকারে আসে, এ বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ উদ্যোগী হন এবং কাজ অনেকটা অগ্রসরও হয়। সে-বার কাশীতে থাকাকালে মহারাজ একদিন একটি সেবককে দিয়া তাঁহার নিজের কানে শোনা কয়েকটি উপদেশ লিখাইয়া রাখেন।

সেই দিনই নিশীথ রাতে হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। ব্যস্ত হইয়া সেবকটিকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দেন। সে আসিলে বলেন, "ওরে ছাখ্‌তো, উপদেশ সঙ্কলনের খাতাটা কোথায়।"

খাতাটি নিয়া আসিলে উহা হইতে একটি উপদেশ বাদ দিবার

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন কর্তৃক প্রকাশিত

নির্দেশ তিনি দেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে বলেন, "ঠাকুর নিজে এসে বলে গেলেন,—"রাখাল, ওটা কিন্তু আমার কথা নয়।"

এই অলৌকিক ঘটনাটি হইতে বুঝা যায়, অন্তর্ধানের পরও ঠাকুর তাঁহার প্রাণপ্রিয় শিষ্য রাখালরাজের প্রতিটি কার্যের উপর কি সতর্ক দৃষ্টিই না রাখিতেন।

অতীন্দ্রিয় দর্শনের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন, রাখাল ব্রজের রাখাল, কৃষ্ণ-সখা, সহস্রদল কমলের উপর কৃষ্ণের হাত ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে। এই সঙ্গে ঠাকুর এ সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেন, ব্রজের স্বরূপসত্তা যেদিন সে উপলব্ধি করিবে, মরদেহের ঘটিবে অবসান। ঠাকুরের গুরুভাইরা রাখালের কাছে একথাটি গোপন রাখিতেন। এ সময়ে স্বামী সারদানন্দ ঠাকুর-রামকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ লিখিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রেসে তাহা ছাপানো হইতেছে। গুরুভাই প্রেমানন্দ মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হন। আর সারদানন্দ পরম উৎসাহে পাণ্ডুলিপিটি তাঁহাকে পাঠ করিতে দেন।

সেদিন পাণ্ডুলিপির একটি অংশ পড়িতে গিয়া প্রেমানন্দ চমকিয়া উঠেন। রাখাল ব্রজের বালক কৃষ্ণ-সখা—এ সম্পর্কে ঠাকুরের যে অলৌকিক দর্শন ঘটিয়াছিল, সে কথাটি এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রেমানন্দ শঙ্কিত কণ্ঠে কহিলেন, "শরৎ, এ তুমি কি করেছো? ঠাকুরের কথা কি তোমার মনে নেই? এসব প্রকাশিত হলে যে মহারাজের দেহ চলে যাবে!"

সারদানন্দ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এখনি এ ভুল অবিলম্বে শুধ্‌রানো দরকার। তৎক্ষণাৎ প্রেসে লোক পাঠাইয়া দিলেন। পাণ্ডুলিপির সংশ্লিষ্ট পাতাটি ছিঁড়িয়া ফেলা হইল এবং কম্পোজ করা টাইপের অংশবিশেষও করা হইল অপসারিত।

বাগবাজারস্থিত বলরাম বসুর ভবনটি রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর অন্যতম পুণ্যতীর্থ। বলরাম, তাঁহার পুত্র রাম ও পুরনারীরা সবাই দীর্ঘদিন

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তদের আন্তরিক সেবা করিয়াছেন। ঠাকুর নিজে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় আসিলে প্রধানতঃ বলরামের ভবনেই অবস্থান করিতেন, এখানেই ভক্তদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ করিতেন। মা সারদামণির পুণ্যস্মৃতিও এস্থানে বিজড়িত। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এবং অন্যান্য রামকৃষ্ণ ভক্তদেরও প্রিয় বাসস্থান ছিল এই বলরাম ভবন।

সে-বার ব্রহ্মানন্দ কয়েকদিনের জন্য এখানে আসিয়াছেন। কলিকাতার ভক্তদের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী চলিতেছে। এসময়ে একদিন রাত্রে একটি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিল। গভীর রাত্রে কি এক কারণে মহারাজের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে, হঠাৎ দেখিলেন, তাঁহার বসিবার ছোট খাটটির সম্মুখে ঠাকুর নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। ক্ষণপরেই এই মূর্তি তেমনি আকস্মিকভাবে শূন্যে মিলাইয়া গেল।

সবিস্ময়ে মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন, 'ঠাকুরের এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের কারণ কি? কোনো কথা না বলে, কোনো কিছুর নির্দেশ না দিয়ে এমন নির্বাকভাবেই বা চলে গেলেন কেন? এই আবির্ভাব কি কোনো ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত বহন করছে?'

মনে নানা চিন্তার তরঙ্গ খেলিতেছে। উদাস দৃষ্টিতে ব্রহ্মানন্দ চুপচাপ শয্যায় বসিয়া আছেন। এমন সময়ে সেবক ভক্তটি তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মানন্দ মৃদুস্বরে ঠাকুরের এই অলৌকিক দর্শনের কথা তাঁহার কাছে বিবৃত করেন, সেই সঙ্গে উচ্চারণ করেন স্বগতোক্তি,—"এখন আমার মনে কোনো বাসনা নেই। এমন কি তাঁর নাম করবারও আর বাসনা নেই—এখন শুধু শরণাগত, শরণাগত।"

সেদিন ভোরবেলায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। রামলালকে দেখিলেই ব্রহ্মানন্দের মনে দক্ষিণেশ্বরের পুরাতন দিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিত, ঠাকুর হাসিয়া গাহিয়া যে মধুময় পরিবেশের সৃষ্টি করিতেন তাঁহার উল্লেখ করিয়া উভয়েই মুখর হইয়া উঠিতেন।

সদানন্দময় ঠাকুর যে রসালাপ করিতেন, যে ভঙ্গীতে নাচিতেন গাহিতেন, যে আখর দিতেন তাঁহার অনুকরণ করা হইত আর হাসির তুফান উঠিত।

সেদিনও দুজনের কথাবার্তা ও হাসি গান খুব জমিয়া উঠিল। প্রেমানন্দে মাতিয়া উঠিয়া মহারাজ আব্‌দার ধরিলেন, "রামলাল দাদা, এসো সবাই মিলে আনন্দ ক'রে ঠাকুরের পুরানো দিনের গান শুনা যাক্। আজ সন্ধ্যায় তুমি ঢপ্‌ওয়ালী সেজে আসর ক'রে বস্‌বে। হ্যাঁ, আজই।"

রামলাল বড সরল মানুষ ছিলেন, আর মহারাজের প্রতি তাঁহার ভালোবাসাও ছিল অতি গভীর, তাঁহার কোনো কথা তিনি অমান্য করিতে পারিতেন না। সলজ্জভাবে কহিলেন, "মহারাজ, আপনি বলছেন বটে, কিন্তু এতো মঠ নয়, এ যে গৃহস্থ বাড়ি। বিশেষত বাড়িতে মেয়েরা রয়েছেন। সবাই কি মনে করবেন, বলুন তো।"

মহারাজ তখন আনন্দের আবেশে মাতিয়া উঠিয়াছেন, কহিলেন, "না রামলালদা, তোমার কোনো ওজর-আপত্তিই আমি শুনছি না। কে কি মনে করবে তাতে বয়েই গেল। হ্যাঁ, আজ কীর্তনওয়ালীর মতো সেজেগুজে তোমায় ঠাকুরের গান সবাইকে শোনাতেই হবে। সে খুব মজা হবে, ঠাকুরকে ঘিরে যে পুরানো দিনগুলো আমরা কাটিয়েছি আবার তা মনে ঝলমল ক'রে ভেসে উঠবে।"

বৃদ্ধ রামলালদার কোনো কাকুতি-মিনতিতেই মহারাজ কান দিলেন না। ঢপ্ আজ তাঁহাকে গাহিতেই হইবে।

অগত্যা রামলালদাকে রাজী হইতে হইল। সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, তোমার কথা কে ফেল্‌তে পারে? বেশ তাই হবে।"

সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মানন্দ সেবক-ভক্তদের আদেশ দিলেন, "তোরা ভাল ক'রে রামলালদাদাকে সাজিয়ে নিয়ে আয়।"

বলরাম-গৃহের বধূদের কাছ হইতে রঙীন রেশমী শাড়ী ও গহনা আনিয়া রামলালদাদাকে নারীর বেশে সজ্জিত করা হইল। বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণের শরীর শুক্‌নো, সব গহনা পরানো যাইতেছে না। একথা শুনিয়া পুরনারীরা সোৎসাহে খিল্‌-দেওয়া গহনা পাঠাইয়া দিলেন। সারা বাড়িতে তখন আনন্দ কলরব পড়িয়া গিয়াছে।

বড় হলঘরে মহারাজ আসর জমকাইয়া বসিলেন, আশেপাশে ভক্ত, কৌতূহলী দর্শকবৃন্দ। বাড়ির মেয়েরাও চিকের আড়াল হইতে এই নাটকীয় দৃশ্য দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন।

ঢপ্‌কীর্তন শুরু হইল। কীর্তনওয়ালীর বেশধারী বৃদ্ধ রামলাল-দাদা নাচিয়া গান ধরিলেন,—

একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক ছুয়ের মত
(ও তোর) মন মানে তো থাক্‌বি সেথা নইলে আসবি দ্রুত।
আগে ছিল এক হেঁটো জল
এখন যমুনা অতল—
সাঁতার দিতে হবে।
নৈলে যমুনার তীরে বসে ব্রজ নিরখিবে।
(বল্‌লেও বল্‌তে পারো, আগে রাখাল ছিলে
—এখন রাজা হয়েছো)
না হয় ব্রজগোপীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে।

সভার শোভারূপে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ভক্ত এবং সেবকগণ সহ বসিয়া আছেন। রামলালদাদা তাঁহার নিকটে আসিয়া ঢপওয়ালীর ভঙ্গীতে অঙ্গভঙ্গী করিয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া গাহিতেছেন। বার বার দিতেছেন ভাবময় আখর—আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছো।

এই আখর শুনিয়া সহসা মহারাজের হাসি আনন্দ ও কৌতুক-চপলতায় ছেদ পড়িয়া যায়। মুহূর্তে তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে এক ভাবগম্ভীর মহিমময় মূর্তি। সমুন্নত দেহ ঋজু হইয়া উঠে। নয়ন দুটি স্থির নিষ্পলক, চোখে মুখে বিস্তারিত দিব্য জ্যোতির ছটা।

এই গুরুগম্ভীর ভাবমূর্তি দেখিয়া রামলালদাদা তাড়াতাড়ি তাঁহার কীর্তন সমাপ্ত করেন। চিকের আড়ালে পুরনারীদের মৃদু

গুঞ্জন স্তব্ধ হইয়া যায়। ভক্ত সাধু ও সেবকেরা নির্বাক হইয়া অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকেন মহারাজের দিকে। হঠাৎ ধ্যানের গভীরে কোন্ অতলে তিনি তলাইয়া গিয়াছেন।

আনন্দোজ্জল, হাস্য-কৌতুকে মুখর, কীর্তন-সভা ভাঙিয়া যায়। ধ্যানস্তিমিত নয়ন মহারাজকে ঘিরিয়া ভক্ত ও সেবকের উৎকণ্ঠার অবধি নাই। এক স্তব্ধ গম্ভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে সেখানে।

হঠাৎ কেন ব্রহ্মানন্দের এই অদ্ভুত ভাবান্তর! 'রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছো'—কি জাদু নিহিত আছে এই কথা কয়টিতে? রামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে দেখা ব্রজের রাখাল, রাখালরাজ, আজ কি তাঁহার জন্মান্তরের স্মৃতি খুঁজিয়া পাইয়াছে? 'ব্রজের খেলা—নিত্যলীলা'—এই নিত্যলীলার উদ্দীপনার মধ্য দিয়াই কি মহারাজ তাঁহার স্বরূপসত্তার অতলে এমনি করিয়া ডুবিয়া গেলেন?

অতঃপর আর বেশীদিন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহার মরদেহে অবস্থান করেন নাই। বলরাম ভবনে সে-বার গুরুতর পীড়ায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। চিকিৎসক ও সেবকদের সমস্ত কিছু প্রাণপণ প্রয়াস বিফল হয়। ভক্ত ও সুহৃদ্‌দের অশ্রুসজল নয়নের সমক্ষে এই আপ্তকাম সদানন্দময় মহাপুরুষের চিরবিদায়ের লগ্নটি হয় নিকটতর।

শয্যার পাশে দণ্ডায়মান বিষাদখিন্ন ভক্তদের দিকে চাহিয়া মহারাজ বলেন, "ভয় পেয়ো না। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।"

গুরুভাইদের কাছে বিদায় নিয়া কহিলেন, "রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই, আমি ব্রজের রাখাল,—দে দে আমায় ঘুঙুর পরিয়ে দে—,—আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচবো—ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্। কৃষ্ণ এসেছো। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। তোরা দেখতে পাচ্ছিস নে? তোদের চোখ নেই! আহা-হা কি সুন্দর!"

অন্তরঙ্গেরা স্মরণ করিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা—"ব্রজের স্বপ্নে ব্রজের রাখালের জীবনের অবসান হবে।" স্পষ্টতই বুঝা গেল শেষ মুহূর্তের আর বেশী দেরি নাই।

ক্ষণকাল বিরতির পর মহারাজ মৃদু স্বরে আবার বলিয়া উঠেন, "আমার কৃষ্ণ—কমলে কৃষ্ণ, পীতবসনে কৃষ্ণ! ব্রহ্ম সমুদ্রে বটপত্রে ভেসে যাচ্ছি। এবারের খেলা শেষ হল। ঠাকুরের পা-দুখানি কি সুন্দর! ছাখো—ছাখো, একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে—বলছে, আয়, চলে আয়।"

পরের দিনই ১৯২২ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মহাসাধক ব্রহ্মানন্দ মরলীলায় ছেদ টানিয়া দিলেন, প্রবেশ করিলেন চিদানন্দময় নিত্য ধামে।

যোগপ্রয়ানন্দজী

যোগীরাজ শিবরাম স্বামী সে-বার হাওড়ার উপকণ্ঠে বালীতে গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতেছেন। গুরুদেবের দেহ মোটেই সুস্থ নাই এবং এবার এটি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। তাই নানা স্থান হইতে শিষ্য ও ভক্তেরা আসিয়া জুটিতেছেন শেষ দর্শনের জন্য। দু বেলাই চলিতেছে সৎসঙ্গ ও তত্ত্ব আলোচনা।

প্রবীণ শিষ্য কালীনাথও বালীতেই থাকেন, গুরুদেবের এখানে নিত্য করেন আসা-যাওয়া। একদিন প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র শশীভূষণকে সঙ্গে নিয়া আসেন। গুরুর চরণে দণ্ডবৎ করার পর যুক্তকরে নিবেদন করেন, "প্রভু, আপনি শশীর প্রতি একটু কৃপা দৃষ্টি করুন। নয় বৎসর বয়সে ওর উপনয়ন হয়। তারপর থেকেই দেখা দেয় এক দুরন্ত মূর্ছা রোগ। ডাক্তার কবিরাজেরা সব হার মেনেছেন। এবার আপনার চরণতলে একে রেখে দিচ্ছি, এর প্রাণ রক্ষা করুন।"

বালক শশী ভূমিষ্ঠ হইযা প্রণাম নিবেদন করে, প্রসন্নমধুর হাস্যে যোগীবর তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করেন। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া স্পর্শ করেন তাঁহার মেরুদণ্ড। ধীরে ধীরে বালক সংবিৎহারা হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে।

কালীনাথ ও অপর ভক্ত-শিষ্যেরা এবার ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়েন। গুরুজী শিবরাম স্বামী কিন্তু রহিয়াছেন নির্বিকার। প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কক্ষের একধারে সন্তর্পণে ওকে সরিয়ে রাখো, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুক।"

আদেশ তখনি পালিত হয়। শিবরামানন্দ শুরু করেন তাঁহার তত্ত্ব-আলোচনা। কেনোপনিষদের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া ভক্তদের তিনি বুঝাইতে থাকেন।

ব্যাখ্যান শেষে যোগীবর বলেন, "এবার বালক শশীকে তোমরা

একটু ছাখো তো। তার বাহ্যজ্ঞান এতক্ষণে এসে গিয়েছে। এখানে আমার সম্মুখে নিয়ে এসো।"

বালককে তুলিয়া আনা হইল। শিবরামানন্দজী হাসিয়া কহিলেন, "শশী, এবার তুমি বলো তো, এতক্ষণ এখানে বসে আমি ভক্তদের কি বুঝাচ্ছিলাম।"

শশী ঋজু হইয়া উঠিয়া বসে, চোখে মুখে বিদ্যুতের দীপ্তি খেলিয়া যায়। শান্ত ধীর কণ্ঠে যোগীবরের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সারমর্ম সে বিবৃত করে। উপস্থিত ভক্ত-সাধকদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

কালীনাথের দিকে তাকাইয়া শিবরামানন্দজী কহিলেন, "বৎস, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের রোগ চিরতরে সেরে গিয়েছে, আর কোনো ভয় নেই। মূর্চা রোগে সে আক্রান্ত হতো না। আসলে এটা ছিল তার পূর্ব জন্মের সংস্কারজাত একটা ধ্যানাবেশ। বিস্মৃতির পাথরে এতকাল এটা চাপা পড়ে ছিল, আজ খুলে দিলাম।"

প্রসন্ন কণ্ঠে আরো কহিলেন, "কালীনাথ, শশীকে আমি দীক্ষা দেবো। বয়সে বালক হলেও, সে এর যোগ্য আধার।"

অতঃপর বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে কহিলেন, "আরে শশী, তুই তো আমার তত্ত্ব আলোচনার মর্ম চমৎকার বুঝিয়ে বলেছিস্। তুই তো তাহলে সত্যিকার পণ্ডিত। যা—আজ থেকে তোকে আমি পণ্ডিত বলেই ডাকবো।"

পরদিনই শশীভূষণের দীক্ষা সম্পন্ন হইয়া যায়। গুরুর কৃপায় দশ বৎসর বয়স্ক এ বালকের জীবনে ঘটিতে থাকে অমানুষী মেধা ও প্রতিভার বিকাশ। যে শাস্ত্রকথা, যে সাধনরহস্য বালক একবার শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ উহা তাহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। মহাসাধক, অশেষ শাস্ত্রবিদ্, সিদ্ধযোগী শিবরামানন্দজীর স্নেহাশিসে জীবন তাঁহার সার্থক হইয়া উঠিতে থাকে।

গঙ্গাতীরে দেহত্যাগের সঙ্কল্প যোগীবর নিয়াছেন। বিদায়ের লগ্নটি এবার তিনি ত্বরান্বিত করিতে চান। শিষ্য ও ভক্তদের সেদিন তাই জানাইয়া দিলেন, "আজ থেকে আমি গঙ্গাজল ছাড়া অপর

কোনো কিছু পানীয় বা খাদ্যরূপে গ্রহণ করবো না। অচিরে প্রাণের উৎক্রমণ ঘটবে, তখন এ দেহটিকে তোমরা পুণ্যতোয়া গঙ্গার গর্ভে বিসর্জন দিয়ো।"

আশ্রিত শিষ্যদের অন্তরে আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়া ঘনাইয়া আসে, অশ্রুসজল চক্ষে দুবেলাই তাঁহারা শিবকল্প গুরুদেবকে দর্শন করিতে আসেন।

ইতিমধ্যে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। উপবাসে যোগীরাজের তনু ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। শেষ শয্যায় শায়িত থাকিয়া ইষ্টধ্যানে সদা বিভোর হইয়া আছেন।

বালক-শিষ্য শশী সেদিন আসিয়া গুরুর পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়েন, আর্ত কান্নায় বক্ষ তাহার ভাসিয়া যায়।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে থাকেন, "প্রভু, এভাবে স্বেচ্ছায় কেন আপনি দেহ ছেড়ে দিচ্ছেন ? আমি প্রাণ পেয়েছি, পরমাশ্রয় পেয়েছি আপনার কৃপায়। সেই আপনি আজ কেন এমন নিষ্ঠুর হচ্ছেন ? আপনার বিহনে কি করে আমি জীবন কাটাবো ?"

গুরু কহিলেন, "পণ্ডিত, স্থির হও। বয়সে বালক হলেও সত্য বস্তু তোমার ভেতরে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। তুমি কেন এত ধৈর্য-হারা হবে ? আমি ধ্যানাসনে বসে দেহত্যাগ করবো আগামী কাল। এর কোনো নড়চড় হবার উপায় নেই।"

শশী ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, "আপনার অভাবে কে দেবে আমার মতো হতভাগ্যকে সাধনতত্ত্বের উপদেশ ? কে দেবে ইষ্টলাভে সহায়তা ?"

"তোমার ভবিষ্যতের জন্য ভেবো না পণ্ডিত, সে ভাবনা আমার। আমার আশীর্বাদে তোমার সাধনসত্তায় তত্ত্ব স্ফুরিত হয়ে উঠবে, শাস্ত্রজ্ঞান ও যোগ সিদ্ধি হবে তোমার করতলগত। আমি বিদেহী হয়েও তোমার সঙ্গে থাকবো চিরকাল, আমার আশীর্বাদে উত্তর-জীবনে হবে তুমি আপ্তকাম। আরও একটা কথা স্মরণ রেখো। আমার সার্থকনামা শিষ্য চিদ্‌ঘনানন্দ রইলো। তার কাছ থেকে শাস্ত্র ও সাধনসম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব কিছু সাহায্য তুমি পাবে।"

কালীনাথ ইতিমধ্যে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। গুরু তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস, আমার দেহান্তের সময় নিকটবর্তী। যাবার আগে তোমায় প্রাণভরে আশীর্বাদ ক'রে যাই। আর বলে যাই তোমায়, তোমার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র শশীর সম্বন্ধে আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী। উত্তরকালে সে কীর্তিত হবে এক শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্ সাধকরূপে। অমানুষী প্রতিভা, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি আর অসামান্য যোগসিদ্ধির হবে সে অধিকারী। যে দীক্ষা ও সাধন সে আমার কাছে লাভ করেছে তার পরিণত রূপ বিস্মিত করবে দেশবাসীকে।"

পরের দিনই তাঁহার পূর্ব নির্ধারিত লগ্নে স্বামী শিবরামানন্দ চিরসমাধিতে মগ্ন হন। সমবেত ভক্ত শিষ্যেরা তাঁহার মরদেহটি এক কাষ্ঠসম্পুটে স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে দেন গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন।

গুরু মরলীলায় ছেদ টানিয়া দিলেন বটে কিন্তু তাঁহার বিদেহী লীলায় ইহার পরেও ছেদ পড়ে নাই। উত্তরকালে তাঁহার কৃপাদত্ত বীজ শশীভূষণের জীবনে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া উঠে। মনীষা, প্রজ্ঞা ও লোকশক্তির বিস্ময়কর সমাহার দেখা যায় তাঁহার জীবনে। নাম হয়—যোগত্রয়ানন্দ। বাংলা ও কাশীর অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে এক করুণাঘন আচার্যরূপে ঘটে তাঁহার অভ্যুদয়।

শশীভূষণের জন্ম হয় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে। কলিকাতার ওপারে হাওড়া জেলার বালীতে তাঁহার পৈতৃক নিবাস। পিতা রামজীবন সান্ন্যাল ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। সরল ও সৎ প্রকৃতির লোক বলিয়া সবাই তাঁহাকে ভালবাসিত। আর শশীভূষণের জননী বিশ্বেশ্বরী দেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণা উদার স্বভাবা।

ঘরে কুলদেবতা নারায়ণ বিগ্রহ স্থাপিত ছিলেন, প্রতিদিন তাঁহার পূজা না করিয়া রামজীবন জলগ্রহণ করিতেন না। রামজীবনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালীনাথ ছিলেন সাত্ত্বিক ধরনের লোক। সাধনভজন, পূজা অর্চনা ও দেবদ্বিজের সেবাতেই দিনের বেশী সময় তিনি নিরত থাকিতেন। যোগীরাজ শিবরামানন্দ স্বামীর অনুগৃহীত ও অন্তরঙ্গ

শিষ্যদের তিনি অন্যতম। ইহারই মাধ্যমে বালক শশীভূষণ যোগীরাজের চরণতলে উপনীত হন, লাভ করেন তাঁহার কৃপা-প্রসাদ।

স্বামী শিবরামানন্দের আশিস ও ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হইতে দেরি হয় নাই। দুই দশকের মধ্যেই শশীভূষণ পরিচিত হইয়া উঠেন একজন অতুলনীয় শাস্ত্রবিদ্ ও শক্তিধর সাধকরূপে। শত শত আর্ত ও মুমুক্ষু তাঁহার শরণ নিয়া কৃতার্থ হয়।

গুরুর অন্তর্ধানের পর হইতে গুরুগতপ্রাণ সাধক নিজেকে শশীভূষণ নামে আর পরিচিত করেন নাই, নিজেকে আখ্যাত করেন শিবরাম-কিঙ্কর নামে। কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই তিন যোগেই ছিল তাঁহার অসামান্য অধিকার, তাই ভক্ত ও শিষ্যেরা তাঁহাকে অভিহিত করিতে থাকেন যোগত্রয়ানন্দ নামে। উত্তরকালে কলিকাতা এবং কাশীর সারস্বত ও সাধকসমাজে তাঁহার এই নামটিই বেশী প্রচলিত হইয়া উঠে। শশীভূষণের তখন কিশোর বয়স। এই বয়সে লোকে খেলাধূলা ও হাসি-আনন্দেই মত্ত থাকে। কিন্তু তাহার বেলায় দেখা যায় ভিন্ন রূপ। গঙ্গাস্নান, পূজা পাঠ ও শাস্ত্র অধ্যয়নেই বেশী সময় সে অতিবাহিত করে। তদুপরি রহিয়াছে গুরু প্রদত্ত মন্ত্রজপ ও ধ্যান-ধারণা। অসাধারণ শ্রুতিধর ও মেধাবী সে, যে কোনো গ্রন্থ একবার পাঠ করে, যে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শ্রবণ করে তখনি উহা তাহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। প্রতিভাধর কিশোরকে আশেপাশের লোকেরা স্বভাবতঃই কিছুটা সমীহ করিয়া চলে।

তখন শীতকাল। লাল রঙে ছোপানো একটি মোটা চাদর শশীভূষণকে কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেদিন এটিকে কাঁধে ফেলিতে গিয়া হঠাৎ একটা তামাশা করার ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠে। লাল চাদরটি নেংটির মতো পরিধান করিয়া জননীর সম্মুখে উপস্থিত হন, বলেন, "চেয়ে ত্যাখো মা, আমি কেমন সন্ন্যাসী সেজেছি।"

তামাশাটি জননী তখনকার মতো উপভোগ করেন বটে, কিন্তু মনে তাঁহার কি জানি কেন একটা দুর্ভাবনা জাগে। শশী তাঁহার আর পাঁচটা ছেলের মতো নয়, পূজাপাঠ জপ নিয়াই এ বয়সে বিভোর

হইয়া আছে। ভয় হয়, শেষটায় সত্যি সত্যিই ঘর ছাড়িয়া সে সন্ন্যাসী না হয়। স্বামীকে জানাইলেন তাঁহার দুশ্চিন্তার কথা, তারপর কহিলেন, "এ ছেলেকে ঘরে ধরে রাখা কিন্তু দায় হবে। তাড়াতাড়ি এর বিয়ে দাও, সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে যদিবা কিছুটা বদলায়।"

পত্নী বিশ্বেশ্বরীর কথা রামজীবনের মনঃপুত হইল, বড়ভাই-এর অনুমতি নিয়া পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ তিনি করিয়া ফেলিলেন।

গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণ করিয়া সংসারের জালে আবদ্ধ হইবেন, একথা শশীভূষণ কখনো কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বরং সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া ঈশ্বর লাভের জন্য তপস্যা করিবেন, ইহা ছিল মনের গোপন আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু পিতা ও মাতার আদেশকে তিনি জ্ঞান করেন দেবতার আদেশরূপে, তাই সেদিন কোনো প্রতিবাদ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

এক শুভ লগ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। শশীভূষণের বয়স তখন তের, আর পত্নী হরিদাসীর নয়।

যৌবনে উপনীত হওয়ার পর শশীভূষণের শাস্ত্রজ্ঞানের পিপাসা ও সাধননিষ্ঠা আরো তীব্র হইয়া উঠে। বেদ আগম স্মৃতি পুরাণের বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলেন. পাঠ করাই শুধু নয়, এই সব গ্রন্থের দুরূহ তত্ত্ব অবলীলায় তাঁহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। এই সঙ্গে সদ্‌গুরু শিবরাম স্বামীর প্রদত্ত সাধন ও তাঁহার জীবনে আনিয়া দেয় মূল্যবান্ অধ্যাত্ম সম্পদ। গুরু মহারাজের প্রধান শিষ্য চিদ্‌ঘনানন্দ-স্বামী মাঝে মাঝে এ অঞ্চলে আগমন করেন। তাঁহার শিক্ষাধীনে থাকিয়াও দিনের পর দিন শশীভূষণের সাধন প্রস্তুতি পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিতে থাকে।

পিতার আয় অতি নগণ্য, শশীভূষণ নিজে তখনও কোনো অর্থকরী বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। অথচ সংসারে অনটন সর্বদা লাগিয়াই আছে। এসময়ে কিছু উপার্জন অবশ্যই করা দরকার। ভাবিলেন, কবিরাজী চিকিৎসা শিখিলে মন্দ কি?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল পুরাতন দিনের এক দুঃখময় স্মৃতি। শশীভূষণ তখন মারাত্মক উদরাময় রোগে ভুগিতেছেন, কবিরাজী চিকিৎসা চলিতেছে, কিন্তু রোগ কিছুতেই সারিতেছে না। ঘরে টাকা-কড়ির অভাব, চিকিৎসককে কিছুদিন ঔষধের দাম দেওয়া যায় নাই। তিনি বাঁকিয়া বসিলেন, টাকা না পাইলে ঔষধপত্র আর দিতে পারিবেন না।

শশীভূষণ মিনতি করিয়া, সজল চক্ষে, কহিলেন, "কব্‌রেজ মশাই, আপনি দয়া ক'রে আমার রোগ দূর করুন, আমায় বাঁচিয়ে তুলুন। যে টাকা আপনার পাওনা থাকবে তা গণ্য হবে আমার নিজের ঋণ বলে। আমার উপার্জন শুরু হলে, এই ঋণ আমি অবশ্যই শোধ ক'রে দেবো।"

কবিরাজের হৃদয় গলিল না, ঔষধ দেওয়া তিনি বন্ধ করিলেন। তারপর নানা গ্রাম্য টোট্‌কা ঔষধ ব্যবহার করিয়া, দীর্ঘদিন ভুগিয়া, শশীভূষণ ঐ দুরন্ত রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান।

তখন তিনি ভাবিতে বসেন, 'চিকিৎসকের মনোভঙ্গী যদি এরূপ হয় তবে তা দরিদ্র জনসাধারণের কষ্টের অবধি নেই। দুবেলা যাদের অন্ন জোটে না, ঔষধের দাম ও চিকিৎসকের পাওনা টাকা কি ক'রে তারা মেটাবে? না—আমায় তবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পড়তেই হবে। চিকিৎসা-বৃত্তি আমি গ্রহণ করবো, সাধ্যমতো দূর করবো দরিদ্র জনগণের কষ্ট।'

এবার স্থির করিলেন, আগেকার ইচ্ছাটিকেই বাস্তব রূপ তিনি দিবেন, কবিরাজী শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়া চিকিৎসা শুরু করিবেন, ইহা দ্বারা সংসারের ব্যয় নির্বাহ এবং জনকল্যাণ দুই-ই সাধিত হইবে।

অলৌকিক মেধা ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন শশীভূষণ। তাই অল্পদিনের মধ্যেই প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সঙ্গে অথর্ব বেদের রোগনাশক মন্ত্র ও দ্রব্যগুণ সম্পর্কিত জ্ঞানও তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

বিদ্যাবত্তা ও প্রয়োগ নৈপুণ্য তাঁহার অসামান্য। তাই চিকিৎসক হিসাবে সুনাম অর্জন করিতে বেশী দেরি হয় নাই।

জটিল রোগে আক্রান্ত যে সব রোগীকে অভিজ্ঞ ডাক্তারেরা পরিত্যাগ করিতেন, তাহাদের অনেকেই শশীভূষণের চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইতে থাকে। ফলে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়ে।

চিকিৎসাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিলেও, শাস্ত্রপাঠ ও সাধন-ভজনেই দিনরাতের বেশী সময় তিনি ব্যয় করিতেন। এক একদিন দেখা যাইত, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া প্রায় সারা রাত অতিবাহিত করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বর গ্রামে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অভ্যুদয় তখন সবে শুরু হইয়াছে। তাঁহার অমৃতময়ী কথা শোনার জন্য, সাধন নির্দেশ নিবার জন্য, জড়ো হইতেছে কৌতূহলী দর্শক ও মুমুক্ষু ভক্তের দল। নবীন সাধক শশীভূষণও মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন, আপ্তকাম মহাসাধকের মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়া হইতেন কৃতকৃতার্থ।

বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব দিন দিন বাড়িতেছে, আয় অতিশয় সীমিত। কারণ যে সব রোগীরা শশীভূষণের কাছে চিকিৎসার জন্য আসে তাহাদের অধিকাংশই দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট—অন্ন বস্ত্রেরই সংস্থান নাই, চিকিৎসার ব্যয় কি করিয়া বহন করিবে? ইহার উপর আছে শশীভূষণের নানা গোপন দান। ফলে পরিবারে অভাব অনটন লাগিয়াই আছে।

অপর দিকে কঠোর সঙ্কল্প নিয়া শশীভূষণ সাধনভজন চালাইয়া যাইতেছেন, কিন্তু আশানুরূপ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি তো তাঁহার হইতেছে না। নৈরাশ্যে এক একদিন মুহ্যমান হইয়া পড়েন। সেদিন তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে ছুটিয়া আসেন।

ঠাকুর তখন ভবতারিণীর মন্দিরে। শশীভূষণ ধীর পদে অগ্রসর হইয়া সিঁড়ির নিচে অপেক্ষায় রহিলেন, নামিয়া আসার সময়

ঠাকুরকে ধরিবেন। আজ তাঁহার হৃদয়ের আগুন ঠাকুরকে নির্বাপিত করিতেই হইবে।

মন্দির হইতে অবতরণের সময় ঠাকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন, কহিলেন, "কে গো, আমাদের পণ্ডিত না?" শিবরামানন্দের দেওয়া ঐ উপনামটি ঠাকুরও ব্যবহার করিতেন।

যুক্তকরে শশীভূষণ উত্তর দেন, "আজ্ঞে হাঁ, আমিই বটে। আপনার কাছে নিভৃতে আমার কিছু বলার আছে।"

"তা, কি বলবে বল।"

"দেখুন, প্রাণের জ্বালা কিছুতেই নিবৃত্ত হচ্ছে না। আপনার কৃপা স্পর্শ চাই। পবিত্র চরণখানি আমার বুকে একবার রাখুন, তাহলে যদি শান্তি পাই।"

"পণ্ডিত, জ্বালায় জ্বলছো, এতো ভালো কথা। এর পরেই তো আসে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন, আসে পরম শান্তি, পরম অমৃত।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণের চরণখানি কিছুক্ষণ বক্ষে ধারণ করিয়া শশীভূষণ দিব্য আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে ঠাকুর কহিলেন, "পণ্ডিত, স্থির হও। এবার উঠে বসো। আমি ওপারে, তোমাদের বালীতেই যাচ্ছি বাবা-কল্যাণেশ্বর শিব দর্শন করতে। ভক্তেরাও সঙ্গে যাচ্ছে। তুমিও যাবে চল।"

শশীভূষণ সোৎসাহে রাজী হইলেন। শিব দর্শন উপলক্ষ করিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের পূত সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা পরম আনন্দে কাটিয়া গেল। ঠাকুরের ভাগবতী কথা শুনিয়া ও ধ্যানতন্ময় দিব্যোজ্জ্বল মূর্তি দেখিয়া শশীভূষণের যেন আর আশা মিটে না।

মন্দিরের দর্শনাদি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর নিজে যাচিয়া শশীভূষণের বালীস্থিত ভবনে পদার্পণ করিলেন। আনন্দরঙ্গে সেই অঞ্চলের সবাইকে মাতাইয়া ঠাকুর যখন ফিরিয়া চলিলেন তখন শশীভূষণের হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইয়াছে, দেহমনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে দিব্য আনন্দের রসধারায়।

বিদায় নিবার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ কহিলেন, "পণ্ডিত, তুমি

ব্রাহ্মণ, সদ্‌বংশীয়। চিকিৎসা বৃত্তি থেকে টাকা রোজগার করছো, —ও টাকা ভালো নয়। এ বৃত্তি ছেড়ে দাও।"

ক্ষণপরেই ঠাকুর আবার মন্তব্য করেন, "তাই তো এত বড় সংসারের দায়িত্ব রয়েছে। চিকিৎসার আয় না থাকলে চলবেই বা কেমন ক'রে? আচ্ছা, তুমি চিকিৎসা ক'রে টাকা নেবে, কিন্তু সংসার চালানোর জন্য ঠিক যতটুকু দরকার তাই নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের এই নির্দেশ শশীভূষণ সেদিন শিরোধার্য করিয়া নেন। অতঃপর নিজের দক্ষতায় বহু দুশ্চিকিৎস্য রোগ তিনি নিরাময় করিয়াছেন বটে, কিন্তু আয় বৃদ্ধি কোনোদিন করেন নাই। ফলে সংসারে দারিদ্র্যের কষ্ট রহিয়াই গেল।

ঈশ্বর-দত্ত প্রতিভা ও মনীষা নিয়া শশীভূষণ জন্মিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে প্রথম জীবনে নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান অধিগত করার স্পৃহাও ছিল প্রচুর। তাই শুধু সংস্কৃতে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়নেই তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজীতে ব্যুৎপন্ন হইয়া আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রধান গ্রন্থগুলিও তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন।

কিন্তু শশীভূষণের জীবনের মূল লক্ষ্য—ভারতীয় ঋষিদের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থের মর্ম উদ্‌ঘাটন করা, ঋষিদের জ্ঞানবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পন্থা অনুসরণ করিয়া ঋদ্ধি ও সিদ্ধি করায়ত্ত করা। তাই বেদ বেদান্ত, আগম, স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ ও সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি কোনো কিছুর অধ্যয়নই তিনি বাকী রাখেন নাই।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা করিতে গিয়া শশীভূষণ শুধু চরক সুশ্রুত প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের পন্থা যেমন অনুসরণ করিতেন, তেমনি করিতেন অথর্ব বেদের মন্ত্র ও ঔষধি প্রয়োগ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মন্ত্রশক্তির উপরই তিনি নির্ভর করিতেন বেশী।

শশীভূষণ তখন বরানগরে বাস করিতেছেন। এক ভদ্রলোক কয়েক বৎসর যাবৎ দুরারোগ্য বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া আছেন,

কলিকাতার প্রবীণ চিকিৎসকদের সব কিছু চেষ্টা বিফল হইয়াছে এবং রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহার প্রাণের আশা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমন সময়ে ঐ রোগীটি শশীভূষণের শরণ নেয়। আর্তস্বরে জানায়, "মরতে হয় তো আপনার চিকিৎসাধীনে থেকেই মরবো। শেষ চেষ্টা হিসেবে, যা কিছু করবার আপনি তা করুন।"

দ্রব্যগুণের সব পরীক্ষাই এ যাবৎ এই রোগীর উপর করা হইয়াছে। ডাক্তার ও কবিরাজেরা সাধ্যমতো সব কিছু করার পর হার মানিয়াছেন। এবার শশীভূষণ এই দুশ্চিকিৎস্য রোগের জন্য ব্যবস্থা করিলেন ঋষিদের উদ্ভাবিত মন্ত্রের প্রয়োগ। "শুধু বৈদিক মন্ত্রের অচিন্ত্য শক্তির আশ্রয় লইয়া তিনি এই রোগীর অসহ্য যন্ত্রণা স্বল্পকালের মধ্যেই পূর্ণভাবে শান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাধারণত তিনি ঋগ্বেদ অথবা অথর্ববেদের মন্ত্র প্রয়োগ করিতেন। বৈদিক মন্ত্রের উপর তাঁহার এইরূপ আধিপত্য ছিল যে তিনি যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারাই অল্পক্ষণের মধ্যে রোগের যন্ত্রণা ও উপসর্গের জটিলতা দূর করিতে সমর্থ হইতেন। এই ভদ্রলোকটির বেলায়ও তিনি সেইরূপ করিয়াছিলেন।

"ভদ্রলোকটিকে সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার মস্তক হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত নিজের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা সঞ্চালন করিতে করিতে বিধি অনুসারে তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চারণ ও সঞ্চালন ক্রিয়া কয়েকবার অনুষ্ঠিত হইলে রোগীর অসহ্য বেদনা আশ্চর্যরূপে শান্ত হইয়া যায়, তাঁহার দেহের মধ্যে একপ্রকার স্নিগ্ধ শান্তিময় ভাব অনুভূত হয়। সুদীর্ঘকাল স্থায়ী এই দেহের যন্ত্রণা নিবৃত্ত হইতে পাঁচ মিনিটের অধিক সময় লাগে নাই। ইহার পর বেদনার আর পুনরাবৃত্তি হয় নাই এবং কয়েকদিন পর্যন্ত ঐ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে রোগীর মুখ্য রোগও নির্মূলভাবে অপগত হয়[১]।"

এই রোগীটি উত্তরবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নের

১ সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ : ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

বন্ধু ছিলেন। তর্করত্ন মহাশয় রোগীর নিজ মুখ হইতে শশীভূষণের এই মন্ত্রচিকিৎসার কথা শুনিতে পান এবং এই তথ্যটি ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের কাছে প্রকাশ করেন।

গুরু মহারাজ শিবরামানন্দ স্বামীর কৃপায় ও জন্মান্তরের অর্জিত পুণ্যবলে শশীভূষণ অনেক সময় সূক্ষ্মলোকচারী মহাত্মা ও দেবদেবী-দের দর্শন পাইতেন. শাস্ত্রতত্ত্বের বহু দুরূহ বিষয় ইঁহাদের কৃপায় জানিতে সমর্থ হইতেন।

এক সময়ে তিনি ঋষি পাণিনির মহাভাষ্য (পতঞ্জলি-কৃত) অধ্যয়ন করার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। বাংলায় তখন পাণিনির চর্চা তেমন হইত না এবং উপযুক্ত শিক্ষাদাতারও অভাব ছিল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, দক্ষিণী পণ্ডিত গোবিন্দ শাস্ত্রী ভরদ্বাজের তখন খুব নামডাক। বিশেষ করিয়া পাণিনির অধ্যাপনায় তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। ভাবিয়া চিন্তিয়া শশীভূষণ তাঁহারই কাছে গিয়া উপস্থিত। প্রণাম নিবেদনের পর যুক্তকরে বলেন, "আমার একান্ত অভিলাষ, আপনার মতো মহাপণ্ডিতের কাছে পাণিনি পাঠ করি। আপনি আমায় কৃপা করুন।"

শাস্ত্রী মহোদয় তখন তাঁহার ছাত্রদের নিয়া তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন। কহিলেন, "এখানে যাদের দেখছো, এরা সবাই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। আমি তো বাইরের কোনো ছাত্রের অধ্যাপনা করিনে। সে ইচ্ছাও নেই, সময়ও নেই।"

শশীভূষণ কিছুতেই ছাড়িবেন না, বার বার মিনতি করিতে থাকেন, "আমায় পাণিনির মহাভাষ্যের পাঠ আপনাকে দিতেই হবে, একান্তভাবে আমি আপনার শরণ নিচ্ছি।"

শাস্ত্রীজী তাঁহার সঙ্কল্পে অটল। শশীভূষণকে বার বার মিনতি করিতে শুনিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। কটূক্তি করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন।

এই রূঢ় প্রত্যাখ্যান শশীভূষণের হৃদয়ে বড় বাজিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি অন্নজল ত্যাগ করেন, তীব্র মনোকষ্ট নিয়া বার বার ভাবিতে থাকেন নিজের ব্যর্থতার কথা। সঙ্গে সঙ্গে অন্তস্তল হইতে উদ্‌গত হয় আকুল প্রার্থনা, "হে প্রভু, হে দেবাদিদেব, তুমি তো জান, নিজ স্বার্থের জন্য আমি এমন ব্যাকুল হই নি, ঋষিশাস্ত্র অধ্যয়নের চাবিকাঠিই আমি হাতড়ে বেড়াচ্ছি, যাতে ত্রিতাপ তাপিত মানুষের কল্যাণ হয় তা-ই তো আমি সারা অন্তর দিয়ে চেয়েছি। প্রভু, এবার থেকে আর আমি মানুষের দ্বারে জ্ঞানার্জনের জন্য ভিক্ষা করতে যাবো না, থাকবো একান্তভাবে তোমারই সাক্ষাৎ কৃপার ওপর নির্ভর ক'রে।"

সারা দিনরাত অনাহারে কাটিয়া যায়। গভীর রাতে পূজার ঘরে বসিয়া শশীভূষণ জপে নিবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে চাহিয়া দেখেন ক্ষুদ্র কক্ষটি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে, আর অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন জটাজূটমণ্ডিত এক ঋষিকল্প মহাপুরুষ।

ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়াই তো শশীভূষণ পূজায় বসিয়াছিলেন, তবে কি করিয়া এই বৃদ্ধ তাপস ভিতরে ঢুকিলেন? বিস্মিত হইয়া একথা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে স্নেহপূর্ণ স্বরে মহাপুরুষ কহিলেন, "বৎস, তুমি এত মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছ কেন? সারাদিন অন্নজলই বা গ্রহণ করো নি কেন? শরীরকে কেন শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছ? শাস্ত্রী তোমার জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করে নি, এজন্যই কি তুমি এমন মর্মাহত? প্রকৃত জিজ্ঞাসু, তপস্যাপরায়ণ ও একনিষ্ঠ সাধকেরা ভগবানের কাছ থেকেই তো জ্ঞান আহরণ করে। তুমি হতাশ হ'য়ো না, আমিই তোমায় শিক্ষা দেবো ব্যাকরণ ভাষ্যের রহস্য। আমি যে গ্রন্থ রচনা করেছি, তা শিক্ষা দেবার সামর্থ্য কি আমার নেই?"

শশীভূষণ উপলব্ধি করিলেন, আবির্ভূত মহাত্মাটি হইতেছেন স্বয়ং পতঞ্জলি দেব, কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহাকে তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন।

আর কালবিলম্ব না করিয়া আগন্তুক ঋষিবর শশীভূষণের কাছে

পাণিনি মহাভাষ্যের ব্যাখ্যান শুরু করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সকল কিছু তত্ত্ব সকল কিছু রহস্য তিনি বুঝাইয়া দিলেন। শশীভূষণের মনের সংশয় এবার ঘুচিয়া গেল। দিব্য আনন্দে তিনি আপ্লুত হইলেন।

ঋষির আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের মধ্যে ব্যবধান বেশী ছিল না। এই অত্যল্প সময়েই মহাত্মা দুরূহ মহাভাষ্যটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল? এই চিন্তা মনে উঠার সঙ্গে সঙ্গে শশীভূষণ উপলব্ধি করিলেন, সাধারণ জীবজগৎ কালের যে মানে অবস্থিত থাকে, বিদেহী শক্তিধর মহাত্মার কালের মান তাহা হইতে সূক্ষ্মতর। মুহূর্তে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার তাঁহার কৃপায় যে কোনো মানুষ আয়ত্ত করিতে সক্ষম।

ঋষি প্রদত্ত জ্ঞান সত্য সত্যই তিনি ধারণ করিতে পারিয়াছেন কিনা, তখনই শশীভূষণ ইহা পরীক্ষা করিতে ব্যগ্র হন। দেখিলেন, ভাষ্য খুলিয়া পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে উহার নিহিতার্থ তাঁহার নিকটে স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে। ঋষির কৃপার বলে জন্মান্তরের প্রাক্তন বিদ্যা উৎসারিত হইতেছে ইন্দ্রজালের মতো। এই দৈবী বিদ্যা শশীভূষণ কিছু সংখ্যক উত্তম অধিকারীকে উত্তরকালে বিতরণ করিয়াছিলেন।

আর একবার, শিবরাত্রির মহানিশায় সাধক শশীভূষণ কৃপা লাভ করেন ঋষি গৌতমের। সমগ্র ন্যায়দর্শনের তত্ত্ব এসময়ে তিনি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন।

পবিত্রতা, ত্যাগ বৈরাগ্য ও তপঃশক্তির সহিত শশীভূষণের জীবনে মিলিত হয় ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের মর্ম উদ্‌ঘাটনের ব্যাকুলতা। ইহার ফলেই সূক্ষ্মলোকচারী মহাত্মাদের কৃপালীলা এভাবে তাঁহার জীবনে বিস্তারিত হয়।

দৈবী শক্তিসম্পন্ন শাস্ত্রবিদ্‌ ও সাধকরূপে তাঁহার খ্যাতি এবার কলিকাতা ও শহরতলিগুলিতে প্রচারিত হয়। ধীরে ধীরে তাঁহার চারিপাশে গড়িয়া উঠে একটি জিজ্ঞাসু ভক্তগোষ্ঠী। প্রায়ই তাঁহারা শাস্ত্র পাঠের জন্য সাধক শশীভূষণের কুটিরে সমবেত হইতেন। এই

জিজ্ঞাসুদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভক্ত নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ (উত্তরকালের বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ) এবং প্রেমানন্দ ভারতীকেও দেখা যাইত।

শশীভূষণের তপস্যাময় জীবনে দেখা গিয়াছিল কর্ম, শক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব মিলন। জীবন যুদ্ধের জয় পরাজয় ও লাভ-ক্ষতিতে তিনি ছিলেন নির্বিকার ও নিরাসক্ত। ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, একনিষ্ঠ ভক্তি নিয়া, অযাচকভাবে তিনি তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতেন। বহু ত্যাগী ভক্তের পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না। এই সঙ্গে অধ্যাত্মজ্ঞান ও প্রাচীন শাস্ত্রতত্ত্বের তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট ধারক বাহক। তাঁহার সাধনজীবনে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের এই সমাহার লক্ষ্য করিয়া বিশিষ্ট ভক্ত ও অনুরাগীরা তাঁহার নাম দেন—যোগত্রয়ানন্দ। এখন হইতে দর্শনার্থী ও সাধনকামী ভক্তদের মধ্যে এই নামেই প্রধানত তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

জননী অনেক দিন হয় কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছেন, আর যে আরোগ্যলাভ করিবেন এমন আশা নাই। পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "শশী, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে বাবা, এবার তুই আমায় কাশীধামে নিয়ে যা সেখানে প্রভু বিশ্বনাথের পুণ্যভূমিতে শেষ নিঃশ্বাস আমি ত্যাগ করতে চাই। তাড়াতাড়ি এর একটা ব্যবস্থা তোকে করতে হবে।"

মায়ের কথা শিরোধার্য করেন যোগত্রয়ানন্দ, তাঁহাকে আশ্বাস দেন, "মা, তুমি নিশ্চিত হয়ে থাকো। যে ক'রেই হোক তোমার কাশীবাসের বন্দোবস্ত আমি করবোই।"

জননীকে তো কথা দিলেন, এখন উপায়? সংসারে যত্র আয় তত্র ব্যয়, হাতে টাকা-কড়ি কোনো সময়েই কিছু থাকে না। অনেক চেষ্টা করিয়া এক অর্থবান্ রোগীর নিকট হইতে একশত টাকা ধার করিলেন।

রাস্তায় কাশী প্রত্যাগত এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার দেখা। যোগত্রয়ানন্দকে তিনি কহিলেন, "কাশীতে যাচ্ছো যাও, কিন্তু সেখানে গুণ্ডার বড় উৎপাত। বটুক পাঁড়ে নামে এক বড় পাণ্ডা আছে, সেখানে তার খুব প্রতিপত্তি। আমার অনেক দিনের চেনা। তাকে আমার নাম ক'রে আগে থাকতে চিঠি দিয়ে দাও। তার বাড়িতেই উঠবে। কোনো ভয় ভাবনা থাকবে না।"

সবাইকে নিয়া যোগত্রয়ানন্দ বটুক পাঁড়ের হাবেলীতেই আশ্রয় নিলেন। মোক্ষদায়িনী কাশী, বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার পুণ্যধাম কাশী। জননীকে নিয়া এই মহাতীর্থে পৌঁছিবার পরই মন তাঁহার আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে।

গঙ্গাস্নান ও বাবা বিশ্বনাথের দর্শন শেষ করিয়া বাসায় ঢুকিতেছেন, এমন সময় মহল্লার কয়েকটি বাসিন্দা যোগত্রয়ানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া নেন, বলেন, "মশাই, এ আপনি কি করেছেন? শেষটায় বটুক পাঁড়ের বাড়িতে উঠেছেন সপরিবারে! পাঁড়ে যে এখানকার এক গুণ্ডা—ডাকাত বিশেষ। শিগ্‌গীর অন্য কোথাও উঠে গিয়ে সবার প্রাণ বাঁচান।"

যোগত্রয়ানন্দের ললাটের একটি রেখাও কুঞ্চিত হইল না, কথাগুলি শোনার পরও রহিলেন পূর্ববৎ ধীর স্থির অকুতোভয়।

যুক্তকর শিরে ঠেকাইয়া শুধু কহিলেন, "বাবা বিশ্বনাথের শরণ নিতেই আমরা এসেছি। সেস্থলে তুচ্ছ এক বটুক পাঁড়ের ভয়ে ভীত হলে চলবে কেন? তাছাড়া বটুক গুণ্ডামী করছে তার নিবুর্দ্ধিতা বশত। আমি তার সঙ্গে দেখা করবো, তার দোষত্রুটি বুঝিয়ে বলবো। এজন্য আপনারা ভাব্‌বেন না।"

প্রতিবেশী শুভানুধ্যায়ীরা বুঝিয়া নিলেন, এ নবাগত ব্রাহ্মণের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, ইহার সঙ্গে তর্ক করিয়া কোনো লাভ নাই। একে একে তাঁহারা সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিকালবেলায় যোগত্রয়ানন্দ পাঁড়েজীর ছড়িদারকে ডাকাইয়া আনেন। হাসিয়া বলেন, "বাবার স্নান তর্পণ ও দর্শন হয়েছে, এবার

তো বাবার পাণ্ডাকে একবার দর্শন করা চাই। চলুন একবার বটুক পাঁড়েজীকে ভেট ক'রে আসবো।"

ছড়িদার তখনি সোৎসাহে যোগত্রয়ানন্দকে পাঁড়ের কাছে হাজির করিলেন। তেতলার ছাদের উপর বটুক পাঁড়ে একটা চৌপাই-র উপর উপবিষ্ট। ভাঁটার মতো চোখ ছুইটি সিদ্ধির শরবতের প্রভাবে ঢুলুঢুলু। নিচে মাছুরে বসিয়া কয়েকজন বয়স্য ও সেবক হাণ্ডিতে সিদ্ধি ঘোঁটিতেছে। অদূরে ছাদের উপর ছুইজন পালোয়ান ল্যাঙ্গট পরিয়া কুস্তী কসরত করিতে ব্যস্ত।

নূতন যজমান কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, পাঁড়ে সৌজন্য সহকারে যোগত্রয়ানন্দকে বসিতে বলিল। সম্মুখের আসনটিতে উপবেশন করিয়াই যোগত্রয়ানন্দ পাঁড়ের দিকে সঞ্চালিত করিলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "মহল্লার অনেকে বলে, তুমি নাকি একজন ছুর্ধর্ষ গুণ্ডা? ধর্মক্ষেত্রে আছো, বাবা বিশ্বনাথের সেবার অধিকার পেয়েছো, তবে গুণ্ডামী করো কেন?"

বটুক পাঁড়ের ভাঙের নেশা এই আকস্মিক আঘাতে অনেকটা টুটিয়া গিয়াছে। ভাঁটার মতো চোখ ছুইটি যোগত্রয়ানন্দের দিকে সে নিবদ্ধ করে, কিন্তু ক্ষণপরেই তাহা সরাইয়া নেয়, কি জানি কেন মাথা নিচু করিয়া নীরব নিস্পন্দ হইয়া সে বসিয়া থাকে। যোগত্রয়ানন্দের চোখে মুখে কোন্ অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ সে দেখিয়াছে, তাহা কে বলিবে?

পাঁড়ের ইয়ার-বন্ধু এবং সেবকেরা এই আকস্মিক তিরস্কারে চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, আর কসরত-রত পালোয়ান ছুইটি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যোগত্রয়ানন্দের ঠিক পিছনে। অর্থাৎ, পাঁড়েজীর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে তাহারা প্রস্তুত, হুকুম মিলিলেই কলিকাতার এই বেকুব আদমীকে তাহারা নিচে ছুঁড়িয়া ফেলিবে।

ইতিমধ্যে গুণ্ডারাজ বটুক পাঁড়ের মুখভাব প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে। যুক্তকরে, ধীর কণ্ঠে সে বলিতে থাকে, "আমার

ভেতর থেকে কে যেন কেবলি ডেকে বলছে—আপনি আমার জন্ম-জন্মান্তরের গুরু। আমি তা বিশ্বাস করেছি, মেনেও নিয়েছি। নইলে দুনিয়ায় এমন কোন্ মানুষ আছে যে বটুক পাঁড়েকে গুণ্ডা বলে গালি দেবার হিম্মত রাখে ?”

সঙ্গে সঙ্গেই বটুক পাঁড়ে যোগত্রয়ানন্দজীর চরণতলে লুটাইয়া পড়ে। অনুশোচনায় হৃদয় তাহার দগ্ধ হয়। তারপর অকপটে যোগত্রয়ানন্দের কাছে বিবৃত করে তাহার এতদিনকার অনেক কিছু দুষ্কৃতি ও পাপাচারের কাহিনী। তত্ক্ষণে দিব্য আনন্দের আভায় যোগত্রয়ানন্দের চোখ মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম ও করুণায় আপ্লুত হইয়া অতঃপর পাঁড়েকে তিনি নানা উপদেশ ও আশ্বাস দেন ; ধর্ম-জীবন গঠনে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করেন।

পাঁড়ে একান্তভাবে যোগত্রয়ানন্দের শরণ নেয় এবং সেই দিন হইতে ঘটে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল পাপময় জীবনের অবসান।[১]

হাতের টাকা কয়েক দিনের মধ্যেই ফুরাইয়া গেল। এবার যোগত্রয়ানন্দ কাশীধামে বসিয়াই শুরু করেন তাঁহার আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা। বহু সঙ্কটাপন্ন রোগীকে তিনি এ সময়ে আরোগ্য করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি খ্যাতনামা হইয়া পড়েন। ভাল উপার্জনও হইতে থাকে। কিন্তু দরিদ্র রোগীদের কাছ হইতে তিনি কোনো অর্থ গ্রহণ করেন না, আর গৃহে সদাব্রত লাগিয়াই আছে, তাই অর্থের অভাব তাঁহার ঘুচিতে চায় না।

জননীর দেহের অবস্থা ক্রমে অবনতির দিকে যাইতেছে, এবার শেষের দিনটি সমাগত হয়। মাতৃভক্ত যোগত্রয়ানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, “মা, তুমি আদেশ দিয়েছিলে—তাই কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথের চরণতলে তোমায় নিয়ে এসেছি। আমার কথা আমি রেখেছি। তোমার মনের আর কি ইচ্ছে আছে, আমায় খুলে বল। আমি তা পূরণ করবো।”

১ সাধক শশীভূষণ : সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যু-পথ যাত্রিণী জননী বলেন, "বাবা শশী, তোকে আমার একটা শেষ অনুরোধও রাখতে হবে।"

"বল মা, কি তুমি চাও।"

"বাবা, তুই যে অবস্থায় আছিস্ তাতে সংসারে থাকা কষ্টকর তা আমি বুঝি। কিন্তু এই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হলে পরিবারের এতগুলো লোক যে অনাহারে মরবে। তুই আমায় কথা দে—গৃহস্থ থেকেই তুই সাধনভজন করবি, সন্ন্যাসী কখনো হবিনে।"

"তাই হবে মা। তোমার কথাই রাখবো। গৃহীযোগী রূপেই চালিয়ে যাবো আমার সাধনা। গুরুকৃপায় ও তোমার আশীর্বাদে পরম প্রাপ্তি যেন আমার ঘটে।"

এবার অপার সন্তোষে পুত্রকে আশীর্বাদ জানাইয়া জননী ত্যাগ করেন তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস।

এ সময়কার কাশীর পরিবেশটি বড় আনন্দময়। কয়েক জন শিবকল্প মহাত্মার আবির্ভাবের ফলে জনজীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে নূতন আধ্যাত্মিক চেতনা। এই সিদ্ধপুরুষদের অলৌকিক জীবন শক্তি বিভূতি ও করুণা-লীলার কাহিনী নিয়া সর্বত্র সোৎসাহ আলোচনা চলিতেছে। দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থীদের ভিড় এই সব বিরাট পুরুষদের আস্থানে লাগিয়াই আছে।

যোগত্রয়ানন্দ অবসর পাইলেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ প্রভৃতি মহাত্মাদের কাছে গিয়া উপস্থিত হন, পুণ্যময় সান্নিধ্যে বসিয়া দেহ মন প্রাণ তাঁহার জুড়াইয়া যায়। একদিন তিনি ভাস্করানন্দ সরস্বতী মহারাজের আশ্রমে তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন। শহরের উপান্তে এক বিস্তীর্ণ বাগিচায় তাঁহার আশ্রম। যোগবিভূতিসম্পন্ন এই মহাপুরুষকে দর্শনের জন্য দর্শনার্থীদের উৎসাহের সীমা নাই।

প্রথম দিন জনতার ব্যূহ ভেদ করিয়া যোগত্রয়ানন্দ কোনো মতে মহাত্মার নিকটস্থ হইলেন। প্রণাম করার পর তিনি শুধু কহিলেন, "দর্শন হো গিয়া, আভি চলা যাও।"

বড় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়েন যোগত্রয়ানন্দ। পর পর আরো দুই দিন ভাস্করানন্দ মহারাজের কাছে গেলেন, কিন্তু মহাত্মা তাঁহাকে তেমন আমলই দিলেন না।

এবার তিনি দুঃখিত চিত্তে ভাবিতে থাকেন, 'কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে তো আমি সরস্বতীজীর কাছে যাই নি, গিয়েছি জ্ঞান আহরণের জন্য। তবে কেন তিনি এমনভাবে আমায় উপেক্ষা করলেন?"

কয়েক দিনের মধ্যেই ঘটনার গতিপ্রকৃতি বিস্ময়কররূপে পরিবর্তিত হইয়া গেল। প্রবীণ গুরুভ্রাতা চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামী এসময়ে কিছুদিনের জন্য কাশী আসিয়া উপস্থিত। গুরু শিবরামানন্দ স্বামীর হাতে গড়া মানুষ তিনি, গুরুকৃপায় ও আপন সাধন-বলে অশেষ-শাস্ত্রবিদ্ রূপে তিনি পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন, যোগবিভূতি অর্জনে হইয়াছেন সফলকাম। এই গুরুভ্রাতাকে যোগত্রয়ানন্দ নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতোই শ্রদ্ধা করেন, প্রয়োজনমতো দুরূহ শাস্ত্রতত্ত্ব তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া নেন, নিগূঢ় যোগসাধনের নির্দেশাদি গ্রহণ করেন। কাশীতে আসিয়া চিদ্‌ঘনানন্দজী তাঁহার পরম স্নেহভাজন যোগত্রয়ানন্দের গৃহেই অবস্থান করিতে থাকেন।

চিদ্‌ঘনানন্দের নিকট ভাস্করানন্দ সরস্বতী মহারাজ নানাভাবে উপকৃত, তাঁহার আগমনের বার্তা শুনিয়াই তাড়াতাড়ি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। স্বামীজীকে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য দেখানোর জন্য প্রচুর পুষ্পমাল্য ও ফলমূল নিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে রহিয়াছে কতিপয় ভক্ত-শিষ্য।

সরস্বতী মহারাজের আগমনের সংবাদ শুনিয়াই চিদ্‌ঘনানন্দজী চাদর মুড়ি দিয়া কম্বলাসনে শুইয়া পড়িলেন। ভান করিলেন, তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। সরস্বতী মহারাজ নীরবে কক্ষের একপাশে বসিয়া বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। তারপর হঠাৎ চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামীর কপট নিদ্রা টুটিয়া গেলে নিযুক্ত হইলেন তাঁহার পদসেবায়।

"ওকে, ভাস্কর এসেছো ? তা বেশ, তা বেশ, তোমায় দেখে খুব আনন্দ হলো। কখন এলে ?"—বলিয়া চিদ্‌ঘনানন্দ সাদরে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, জানাইলেন তাঁহার আশীর্বাদ।

এবার গৃহস্বামী যোগত্রয়ানন্দের দিকে সরস্বতী মহারাজের দৃষ্টি পতিত হয়। সোৎসাহে বলেন, "ধন্য তুমি। কি সৌভাগ্য তোমার। অতুলনীয় শ্রদ্ধা আর প্রেমের ডোরে অনায়াসে তুমি এই শিবকল্প মহাপুরুষকে বেঁধে ফেলেছো। অথচ আমরা কত চেষ্টা ক'রেও এঁকে আমাদের কাছে ধরে রাখতে পারিনে। কেবলই তিনি দূরে দূরে পালিয়ে বেড়ান।"

চিদ্‌ঘনানন্দ স্মিতহাস্যে বলেন, "ভাস্কর, তুমি এই সমর্থ গৃহী-যোগীকে, আমার গুরুর আশিস্‌পূত এই সাধককে, ঠিকমতো চিনতে পারো নি। একে ভেবেছিলে সংসারাবদ্ধ জীব বলে। তাই তোমার সকাশে দু-তিনবার গিয়েও ইনি তোমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পান নি।"

ভাস্করানন্দ সরস্বতী নিজের ভুল বুঝিতে পারেন, এবার আনন্দে যোগত্রয়ানন্দকে জড়াইয়া ধরেন, বার বার করেন সাধুবাদ।

আনীত ফলমূল চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামীর সম্মুখে ধরিতেই তিনি বলেন, "না ভাস্কর, আগে তুমি আমার এই গুরুভাইর আতিথ্য গ্রহণ করো, তারপর আমি তোমার উপহার করবো অঙ্গীকার।"

যোগত্রয়ানন্দের গৃহে বসিয়া দুই চারিটি ফল ভাস্করানন্দ ভোজন করিলেন। তারপর চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামীর সহিত নানা নিগূঢ় শাস্ত্রতত্ত্ব সাধনপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা সারিয়া নিজের আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। গুরুভ্রাতা চিদ্‌ঘনানন্দের কৌশলে যোগত্রয়ানন্দের মনের ক্ষোভ সেদিন এভাবে তিরোহিত হইল[১]।

যোগত্রয়ানন্দের বৃহৎ পরিবারে ব্যয় অনেক। অথচ আয় অতি সামান্য। ত্বকচিকিৎসায় বহু রোগী তিনি আরোগ্য করিতেছেন বটে,

১ সাধক শশীভূষণ : সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু পারিশ্রমিক নেন যৎসামান্য। দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসায় অর্থ গ্রহণ তো করেনই না বরং পথ্য ও অন্নবস্ত্রের জন্য অনেক সময় তাহাদেরই সাহায্য করিতে হয়। তাছাড়া, কোনো প্রার্থীকে যোগত্রয়ানন্দ ফিরাইতে পারেন না, তাই ছোটখাটো আর্থিক সাহায্য মাঝে মাঝে দুঃস্থদের দিতে হয়। ফলে সংসার প্রায় অচল, ঋণের বোঝা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামী এ পরিস্থিতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন। ভাবিলেন, দেবপ্রতিম এই গুরুভাইকে তো এবার রক্ষা করা দরকার। অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করিয়া এত বড় পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন কি করিয়া চলিবে?

আমেটির রাজা চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামীর খুব ভক্ত। স্বামীজী তাঁহার কাছে যোগত্রয়ানন্দের কথা বিশদ করিয়া লিখিলেন, "আমার এই গুরুভাইটি বৈরাগ্যবান্ সাধক, শাস্ত্রজ্ঞান এবং যোগৈশ্বর্যও তাঁহার প্রচুর। নিস্পৃহ ও অনাসক্ত হইয়া সংসারে আছেন তাই অর্থাভাবে তাঁহার বৃহৎ সংসারটি ক্লিষ্ট হচ্ছে। আমার ইচ্ছা তুমি একে তোমার কাছে রাখ এবং এর সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়ে একে ভারমুক্ত করো। এতে তোমার কল্যাণ হবে।"

উত্তরে রাজা জানান, "আজ্ঞা পালন করতে পারলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করবো। যোগী মহারাজের পরিবারের খরচ চালানোর জন্য প্রতি মাসে আমার এস্টেট তিনশত টাকা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনি অবিলম্বে তাঁকে পাঠাবেন এবং তাঁকে সেবা করার সুযোগ দিয়ে আমায় কৃতার্থ করবেন।"

রাজার এই স্বীকৃতি পাইয়া স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দের আনন্দের অবধি নাই। চিঠিটি যোগত্রয়ানন্দকে দেখাইয়া কহিলেন, "যাক্ এবার থেকে একটা বড় দুশ্চিন্তা দূর হলো। এই বৃহৎ পরিবারের দায়িত্বের কথা আর তোমায় ভাবতে হবে না। যত সত্বর পার, সবাইকে নিয়ে তুমি আমেটি যাত্রা করো।"

যোগত্রয়ানন্দ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকেন। তারপর যুক্তকরে

নিবেদন করেন, "স্বামীজী এভাবে কোনো ধনী ব্যক্তির গলগ্রহ হয়ে থাকাটা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করিনে। গুরুদেবের কৃপায় এবং আপনার আশীর্বাদে সংসারের ব্যয় নির্বাহ কোনোমতে হয়েই যাবে। আপনার চরণে আমি মার্জনা ভিক্ষা করি।"

চিদ্‌ঘনানন্দজী প্রসন্ন হইয়া উঠেন, গুরুভাইকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া কহেন, "আত্মজ্ঞান পেতে হলে চাই এমনি অনাসক্তি, এমনি ত্যাগ বৈরাগ্য। অচিরে তোমার তপস্যা জয়যুক্ত হোক, আন্তরিক ভাবে এই আশীর্বাদ আমি করছি।"

বহু কঠিন রোগী যোগত্রয়ানন্দ আরোগ্য করিতেছেন, মৃত্যুপথ-যাত্রী কত লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। মারাত্মক রোগে আক্রান্ত নরনারী প্রথমেই তাঁহার কাছে চিকিৎসার জন্য চলিয়া আসে। কাশীর কয়েকজন প্রবীণ ডাক্তার কবিরাজের এজন্য খেদের অন্ত নাই।

একদিন এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার যোগত্রয়ানন্দকে প্রণাম জানান, প্রশ্ন করেন, "বাবা, মায়ের তো গঙ্গা-প্রাপ্তি হলো, এবার আপনি কবে কোলকাতায় ফিরছেন?"

"কেন বলুন তো"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন যোগত্রয়ানন্দ।

ডাক্তার মৃদুহাস্য করিয়া বলেন, "ভাবছি, তাহলে আমাদের আরো রোগী জুটবে এবং আমরা দুমুঠো খেতে পাবো। আর ওদিকে আপনি ফিরে গেলে আপনার কোলকাতার রোগীরাও বাঁচবে।"

যোগত্রয়ানন্দ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "ভয় নেই আপনাদের। সময় এসে গেছে। শিগ্‌গীরই আমি কাশী ত্যাগ করবো।"

অল্পদিনের ব্যবধানেই বৃহৎ পরিবারটি সঙ্গে নিয়া তিনি বরানগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কয়েক মাস পরে এক নিদারুণ দুঃসংবাদ পৌঁছিল যোগত্রয়ানন্দের কাছে। কাশী ত্যাগ করার পর স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া তীর্থরাজ প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হন এবং হঠাৎ প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হন। শেষ সময় সমাগত জানিয়া স্বামীজী ভক্তগণ-

সহ পবিত্র সঙ্গমস্থলে উপনীত হন, তারপর পদ্মাসনে আসীন অবস্থায় স্বেচ্ছায় বরণ করেন জল-সমাধি!

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ শুধু যোগত্রয়ানন্দের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ গুরুভ্রাতাই নন, গুরু শিবরামানন্দ স্বামীর পাণ্ডিত্য ও যোগপন্থার এক শ্রেষ্ঠ ধারকবাহক তিনি। গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর হইতে যোগত্রয়ানন্দকে সাধনা ও শাস্ত্রতত্ত্ব সম্পর্কে নানা নিগূঢ় উপদেশ এতকাল তিনি দিয়া আসিতেছিলেন। তাই তাঁহার এই আকস্মিক অন্তর্ধানে যোগত্রয়ানন্দ শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন।

শুধু একজন অশেষ শাস্ত্রবিদ্‌রূপেই নয়, মহাজ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষরূপেও কলিকাতা এবং কাশীর সাধকসমাজে যোগত্রয়ানন্দ পরিচিত ছিলেন।

বরানগরে ও বালীতে থাকাকালে তাঁহার গৃহটি হয় তরুণ শাস্ত্রবিদ্যার্থী ও সাধকদের এক মর্মকেন্দ্র। বহু প্রবীণ সাধু-সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ ভক্তেরা এসময়ে তাঁহার কাছে উপনীত হইতেন, অধ্যাত্ম জীবনের নানা জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া নিতেন।

তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যে-সব প্রতিভাধর এবং তরুণ জিজ্ঞাসুরা আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসাদ চন্দ্র, প্রেমানন্দ ভারতী প্রভৃতি। প্রথমোক্ত দুই জন উত্তরকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ নামে। প্রেমানন্দ ভারতীও পরবর্তীকালে সাধনমার্গে উন্নতি লাভ করেন এবং আমেরিকায় ধর্ম প্রচারে উদ্বুদ্ধ হন।

যোগত্রয়ানন্দের কাছে পাণিনির মহাভাষ্য ও ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যা শুনিয়া বিবেকানন্দ সোৎসাহে একবার বলিয়াছিলেন, "আমার ইচ্ছে হয়, কোনো নির্জন পাহাড়ের গুহায় গিয়ে, আপনার চরণতলে বসে, ঋষিদের শাস্ত্রগুলো একান্ত মনে পাঠ করি।"

একদিন যোগত্রয়ানন্দ দিব্যভাবে উদ্দীপিত হইয়া ঋষিদের ধ্যানলব্ধ

বৈদিক জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন। নিবিষ্ট মনে দীর্ঘসময় তাঁহার ভাষণ শোনার পর বিবেকানন্দ উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠেন, "বেদের পরমতত্ত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব যদি এমনি হয়, তবে এই পৃথিবীতে এমন কোন্ মানুষ আছে যে এই মহাপবিত্র গ্রন্থের কাছে মাথা নিচু করবে না ?"

জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, ডন পত্রিকার সম্পাদক, মনীষী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একবার মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনে বরাবরই বর্তমান ছিল। উত্তর জীবনে তিনি গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং কাশীধামে কঠোর সাধনায় ব্রতী হইয়া এক উচ্চকোটির সাধকে পরিণত হন। যোগত্রয়ানন্দের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সতীশচন্দ্র দর্শনতত্ত্বের কয়েকটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

মহাত্মা এই সব প্রশ্নের মীমাংসা করেন গণিতের সাহায্যে। প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও আধুনিক গণিতের তত্ত্ব ও প্রয়োগ কৌশল যেরূপ নৈপুণ্যের সহিত তিনি বুঝাইয়া দেন, তাহাতে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া যান।

বিদায় নিবার সময় তিনি বলেন, "গণিতের সাহায্যে ধর্ম ও দর্শনের মর্ম যে এমন ক'রে উদ্‌ঘাটন করা যায়, তা আমার ধারণায় ছিল না। আমার প্রার্থনা, আপনি এ ধরনের ব্যাখ্যাযুক্ত একটি গ্রন্থ কৃপা ক'রে রচনা করুন। আধুনিক যুগের মানুষ এর দ্বারা অশেষ-ভাবে উপকৃত হবে।"

যোগত্রয়ানন্দ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "সবই প্রভুর ইচ্ছা।"

অভেদানন্দ মহারাজ এসময়ে শাস্ত্রপাঠের জন্য আগ্রহাকুল। প্রায়ই তিনি যোগত্রয়ানন্দের সকাশে উপস্থিত হইতেন, অলৌকিকী প্রজ্ঞা ও যোগসিদ্ধির অধিকারী এই মহাত্মার কাছ হইতে বহু শাস্ত্রীয় প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা তিনি জানিয়া নিতেন। সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে যোগত্রয়ানন্দের সমান ব্যুৎপত্তি ছিল, কাজেই আধুনিক

শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণেরা তাঁহার সৎসঙ্গ ও আলোচনায় তৃপ্তি পাইতেন, তাঁহাদের নানা সন্দেহের নিরসন ঘটিত।

যোগত্রয়ানন্দ এসময়ে অযাচক বৃত্তি নিয়া বাস করিতেছেন। বহু দুরারোগ্য রোগী তাঁহার চিকিৎসার ফলে বাঁচিয়া উঠিতেছে বটে কিন্তু এজন্য কোনো পারিশ্রমিক নিতে তিনি অপারগ। ভগবৎ কৃপায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যখন যে যাহা দেয় তাহাতেই তাঁহার সংসারের ব্যয় নির্বাহ হয়।

এমন বহুদিনই গিয়াছে, ঘরে শিশুপুত্রের জন্য দুধটুকুও যোগাড় করা যায় নাই। গৃহিণী গোপনে নিজের আঁচলে চোখের জল মুছিতেছেন। চাল ডাল ফুরাইয়াছে, হাট-বাজার করার কোনো সঙ্গতি নাই, অথচ দশ-বারোটি প্রাণীর অন্ন যোগাইতে হইবে। নিজের পরিবারের লোক তো ছিলই, তদুপরি দুঃস্থ রোগী এবং আত্মীয়-অভ্যাগতেরাও অনেক সময় তাঁহার গৃহে আশ্রয় নিতেন। এই গুরু সাংসারিক দায়িত্বের সকল কিছু তিনি সমর্পণ করিয়াছিলেন ভগবানের চরণে। আর লোকে প্রায়ই অবাক হইয়া দেখিত, শরণাগত সাধকের সকল কিছু প্রয়োজন ভগবান্‌ই দিনের পর দিন মিটাইয়া দিতেছেন।

সে-বার রাধানাথ নামে একটি ছাত্র মরণাপন্ন কাতর হইয়া যোগত্রয়ানন্দের গৃহে আশ্রয় নেয়। রোগীর শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধানের জন্য তাহার পত্নী ও মাতাপিতাও আসিয়া উপস্থিত। রোগীর ঔষধের ব্যয় তো মহাত্মাকে বহন করিতে হইতেছেই, তদুপরি রহিয়াছে রোগীর পরিবারের সবাইর ভরণপোষণ।

বহু চেষ্টা ও যত্নে যোগত্রয়ানন্দ রোগীকে ভাল করিয়া তুলিলেন। রোগমুক্ত হইবার পর মাঝে মাঝে সে যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গে ভগবৎ তত্ত্বের আলোচনা করিতে বসিত।

রাধানাথের মা ইহা লক্ষ্য করিতেছেন আর বিরক্তিতে তাঁহার মন

ভরিয়া উঠিতেছে। অবশেষে একদিন তিনি ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন। যোগত্রয়ানন্দকে গালাগালি দিয়া বলিতে থাকেন, "আমার একটি মাত্র ছেলে, এবার এম-এ পরীক্ষা দেবে, রোজগার ক'রে সংসারের সব দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে, তাকে কিনা আপনি সাধু বানিয়ে ফেলছেন। আপনার এ বাহাদুরিতে আর কাজ নেই।"

ক্রোধভরে মহিলাটি সেইদিনই সবাইকে নিয়া প্রস্থান করেন। মহাত্মা যে তাঁহার পুত্রের প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, তাঁহার পরিবারের সবাইকে এতদিন ভরণ-পোষণ করিয়াছেন এবং এজন্য যে চিরকাল তাঁহার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এসব কোনো কিছুই তাঁহার অন্তরে ঠাঁই পায় নাই। যোগত্রয়ানন্দ কিন্তু একটি কথাও ইহাদের বলেন নাই। নির্বিকার, অভিমানশূন্য মহাপুরুষ তখন বহির্বাটীতে বসিয়া জিজ্ঞাসুদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন।

এই সময়ে যোগত্রয়ানন্দ একদিন গুরুদেব শিবরামানন্দের প্রত্যাদেশ লাভ করেন। গুরু বলেন, "বৎস, অযাচক বৃত্তি নিয়ে সংসার করছো, ত্যাগ তিতিক্ষাময় তপস্যায় আপ্তকাম হয়েছো, ভাল কথা। কিন্তু সাধু যদি জনসমাজে বাস করে, জনকল্যাণের জন্য কিছু করতে হয়। ভগবৎ কৃপায় বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি দ্বারা ঋষিদের তত্ত্ব তুমি উপলব্ধি করেছো। সেই তত্ত্ব এ যুগের মানুষের উপযোগী ক'রে প্রকাশ করো। বেদ, আগম, ভক্তিশাস্ত্র সব কিছুর নির্যাস নিয়ে তুমি রচনা করো একটি মহান্ গ্রন্থ।"

যে চিন্তা মাঝে তাঁহার হৃদয়ে দোলা দিত, বিদেহী গুরুদেব আজ দিলেন তাহারই সুস্পষ্ট নির্দেশ। সঙ্কল্প তাঁহার তখনি স্থির হইয়া গেল, যোগত্রয়ানন্দ শুরু করিলেন তাঁহার মহান কালজয়ী গ্রন্থের রচনা। এই গ্রন্থ হইতেছে বহু খ্যাত—আর্যশাস্ত্র প্রদীপ। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডার খুঁজিয়া, সাধনজাত স্বচ্ছ দৃষ্টির আলোকে, এই অপূর্ব মনীষা-দীপ্ত মহাগ্রন্থ রচিত। সাত্ত্বিক বিচারনৈপুণ্য যেমন

ইহাতে আছে, তেমনি আছে চিরন্তন ও সর্বজনীন পরমতত্ত্বের উদ্‌ঘাটন, বিশেষ করিয়া ঋষি-রচিত শাস্ত্রের তত্ত্ব নিরূপণ।

এই গ্রন্থ রচনার সময় যে ত্যাগ তিতিক্ষা ও ধৈর্য যোগত্রয়ানন্দ স্বীকার করিয়াছেন, সমগ্র পরিবারকে যে চরম দুর্গতি ও অর্থকষ্টের পরীক্ষায় টানিয়া নিয়াছেন তাহা অকল্পনীয়। কোনো দিন অর্ধাহার জুটিয়াছে, কোনো দিন তাহাও জুটে নাই, বেলপাতার রস পান করিয়া বাড়ির সবাই দিনাতিপাত করিয়াছে। ঠাকুরঘরে ধ্যান-ভজনের পর যোগত্রয়ানন্দ রত হইতেন তাঁহার এই শাস্ত্রগ্রন্থের রচনায়। প্রতিদিন চৌদ্দ-পনের ঘণ্টা করিয়া অবিরাম পরিশ্রম তাঁহাকে করিতে হইত। হাতে অর্থ নাই, প্রাচীন দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহের কোনো ব্যবস্থা নাই, অথচ গুরু কৃপায়, সিদ্ধ মহাত্মাদের সাহায্য ও দৈবী যোগাযোগের ফলে প্রয়োজনমতো সব কিছুরই ব্যবস্থা যেন আপনা হইতেই সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে।

গৃহে যাঁহার অন্নের সংস্থান নাই, তাঁহার পক্ষে এই সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করা কি করিয়া সম্ভব? অথচ এ অসম্ভব সম্ভব হইল, প্রয়োজনমতো সব কিছুই ভগবান্ মিলাইয়া দিলেন।

আর্যশাস্ত্র প্রদীপ প্রকাশিত হইলে সাধকমহলে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের সাধনোজ্জ্বল প্রজ্ঞা, মনীষা ও বিদ্যা বর্তায় সকলে বিস্মিত হন।

এই গ্রন্থের পরিচয় পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন,—এমন একটি বহুমুখীন তত্ত্ব-সংবলিত মহাগ্রন্থ যে মানুষ রচনা করতে পারেন, তাঁর মেধা ও প্রতিভার পরিমাপ আমি করতে পারছি না। আমার মনে হয়, এই গ্রন্থ ইংরেজীতে রচিত হলে সারা পৃথিবীতে এর প্রচার হতো, সত্যকার আদর হতো।

মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ তাঁহার যৌবনকালে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "এই মহান্ গ্রন্থে এমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতার নিদর্শন ছিল যাহা দেখিয়া তৎকালে আমার মন স্তব্ধ

হইয়া গিয়াছিল এবং নীরবভাবে মহাজ্ঞানী ঋষিকল্প গ্রন্থকারের চরণে পুনঃপুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছিলাম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন এবং নবীন দর্শন, বিজ্ঞান সর্ব শাস্ত্রেরই পূর্ণ জ্ঞানের পরিচয় এই গ্রন্থমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া আমার একান্ত ইচ্ছা যে ইঁহাকে দর্শন করিব এবং ইঁহার চরণে বসিয়া জ্ঞানের অনুশীলন করিব। গ্রন্থপাঠে মনে হইতেছিল যে গ্রন্থকার কর্ম, ভক্তি জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সকল মার্গেই সমরূপ অধিকারী; তিনি ঋষিকল্প এবং বিজ্ঞান মদগর্বিত বর্তমান ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের গুরু স্বরূপ।"

যোগত্রয়ানন্দজীর উত্তুঙ্গ সারস্বত প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়া ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ আরও লিখিয়াছেন, "তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সর্বপ্রথম ও প্রধান গ্রন্থ—আর্যশাস্ত্র প্রদীপ। এই মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে পৃথিবীর বিশেষ কল্যাণ হইত সন্দেহ নাই। ইহার ভূমিকায় যে অংশটুকু প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাও অতি বিশাল ও অপূর্ব। হার্বার্ট স্পেন্সার যেরূপ 'সিন্থেটিক ফিলসফির' পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার চেয়েও বিরাট কল্পনা ছিল আর্যশাস্ত্র প্রদীপকারের। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য; ইহা হইয়া উঠে নাই। তাঁহার মানবতত্ত্ব ও বর্ণ বিবেক অপূর্ব গ্রন্থ। তাঁহার পরলোক তত্ত্ব, পরলোক ও আবশ্যকীয় যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে বিপুল গ্রন্থ। ইহা বড় বড় চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার তিন খণ্ড আমি দেখিয়াছি, চতুর্থ খণ্ড দেখি নাই। প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা জানি না। তাঁহার ভূত ও শক্তি, আয়ুস্তত্ত্ব, গণিতের দার্শনিক রহস্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক আলোচনা-প্রধান গ্রন্থও আছে। এই সব গ্রন্থ তাঁহার কাশী আসিবার পূর্ব সময়কার রচনা। কাশী আসিবার পর কাশী অবস্থানের শেষ দিকে এবং কাশী ত্যাগের পর তাঁহার আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে[১]।"

অযাচক বৃত্তির উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া যোগত্রয়ানন্দ

১ সাধু দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ : ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। তদুপরি ছিল শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়, এজন্য তাঁহাকে বহুতর কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কিন্তু সুখে দুঃখে, জয়-পরাজয়ে, লাভ ক্ষতিতে সমজ্ঞানী মহাপুরুষ সর্বদা হাসি মুখে এই সব পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন।

সেদিন গৃহিণী জানাইয়া দেন, গৃহে এক মুষ্টি তণ্ডুল নাই। মুদি বাকিতে মাল দিতে অস্বীকার করিয়াছে। একটি টাকা কোথাও হইতে সংগ্রহ করা যায় নাই। এখন উপায়?

মহাত্মা আকাশের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া কহিলেন, "আমরা তাঁর চরণে শরণ নিয়ে আছি, রাখতে হয় তিনি রাখবেন, মারতে হয় মারবেন। ধৈর্য ধর, একটু কিছু হবেই।"

তারপর তাঁর আদেশে বাড়ির সবাই বিল্বপত্রের রস পান করিয়া সেদিনটি অতিবাহিত করিলেন। আরো প্রায় দুই দিন অনশনে কাটিয়া গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে যে এই চরম দুর্গতি চলিয়াছে—শিষ্য, ভক্ত, দর্শনার্থীদের কেহই তাহা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে নাই। পাঠকক্ষে বসিয়া যোগত্রয়ানন্দ যথারীতি গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, কখনো বা ভক্ত ও সাধনার্থীদের নিয়া তত্ত্ব আলোচনায় রহিয়াছেন বিভোর।

তৃতীয় দিনের অপরাহ্ণ। কালীপ্রসাদ (অভেদানন্দ) প্রভৃতি জিজ্ঞাসু ভক্ত গৃহে সমবেত হইয়াছেন। আর যোগত্রয়ানন্দ প্রশান্ত কণ্ঠে একটি জটিল দার্শনিকতত্ত্ব তাহাদের বুঝাইতেছেন। এমন সময়ে ডাকপিওন আসিয়া একটি রেজেস্ট্রী করা ইনসিওরড্ খাম বিলি করিয়া গেল।

খামটি খুলিয়া যোগত্রয়ানন্দ উহার ভিতরকার চিঠিটি পাঠ করেন। তারপর উর্ধ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিস্পন্দ হইয়া যান। কপোল বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরিতে থাকে।

ভক্ত ও শিক্ষার্থীরা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া মহাত্মার দিকে নীরবে নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া আছেন। এমন দৃশ্য আর কখনো তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই।

প্রায় পনের মিনিট কাল এইভাবে কাটিয়া যায়। অতঃপর কালী-মহারাজ (অভেদানন্দ) প্রশ্ন করেন, "বাবা, ব্যাপারটি কি, আমরা কেউ তা বুঝতে পারছিনে। আপনার চক্ষে অশ্রুজল তো আমরা কখনো দেখি নি। সমস্ত কিছু শোক দুঃখের অতীত আপনি। এমন কি দুর্দৈব ঘটেছে যার জন্যে আপনি এত অভিভূত হয়ে পড়েছেন? আপনার চোখে জল কেন? আর ঐ চিঠি পড়েই বা এমন স্তব্ধ হলেন কেন আপনি? আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি।"

যোগত্রয়ানন্দ এবার মুখ খুলিলেন। কহিলেন, "তোমরা আজ আমার চক্ষু থেকে যে অশ্রু ঝরতে দেখেছ তা শোকের নয়, আনন্দের। শোক আমায় কখনো অভিভূত করতে পারে না, কাঁদাতে পারে না। আমি কেঁদেছি শ্রীভগবানের করুণার কথা মনে ক'রে। এই পত্রটা তোমরা পড়ে দেখতে পারো।"

সবাইর সম্মুখে এটি পাঠ করা হইল। লিখিয়াছেন কাশীর চৌখাম্বা মহল্লার অধিবাসী এক সম্ভ্রান্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁহার চিঠির মর্ম এইরূপ:

আগের দিন রাত্রে তিনি এক স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বাবা বিশ্বনাথ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন—আমি উপবাসী রয়েছি, অন্নজল কিছুই গ্রহণ করি নি শিগ্‌গীর আমার জন্যে অন্নের ব্যবস্থা কর। আমার এক পরম ভক্ত উপবাসী রয়েছে, তাই আমায়ও কাটাতে হচ্ছে উপবাসী হয়ে। আমার প্রতি তোমার যদি বিন্দুমাত্র ভক্তিশ্রদ্ধা থাকে তবে আমার ঐ ভক্তের অন্ন গ্রহণের ব্যবস্থা ক'রে দাও। এতে তিলমাত্র বিলম্ব যেন না হয়।

শুধু তাহাই নয়, প্রভু বিশ্বনাথ কাশীধামের ঐ ভদ্রলোকটিকে উপবাসী ভক্তের নাম ঠিকানা জানাইয়া দিতেও ভুল করেন নাই—ঐ নাম ঠিকানা স্বপ্নের মধ্যেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় অক্ষরে প্রকট হইয়া উঠে এবং প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিটি তদনুযায়ী যোগত্রয়ানন্দের ঠিকানায় এই খাম পাঠান। ইহার মধ্যে রহিয়াছে বিস্তৃত একটি চিঠি এবং পাঁচশত টাকার নোট।

পত্রপ্রেরক আরো লিখিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাস প্রভু বিশ্বনাথের স্বপ্নাদেশ ব্যর্থ হইবে না এবং প্রেরিত অর্থ যথাস্থানে এবং যথাসময়ে পৌঁছিবে।

অতঃপর যোগত্রয়ানন্দ তাঁহার গৃহের অবস্থা সবিস্তারে বিবৃত করেন। প্রায় তিনদিন যাবৎ তাঁহার পরিবারের সবাই উপবাসী রহিয়াছেন। তিনি খুব ভালভাবে জানেন, তাঁহার এমন বহু ভক্ত আছেন যাঁহারা এ সম্পর্কে একটু মাত্র ইঙ্গিত পাইলে তৎক্ষণাৎ সব ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কিন্তু ক্ষুণাক্ষরেও একথা কাহারও নিকট তিনি প্রকাশ করেন নাই। একান্তভাবে শ্রীভগবানের উপরই তিনি নির্ভর করিয়াছেন। যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী এবং সর্ব করুণার উৎস, তিনি তো সব কিছুই দেখিতে পাইতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে মুহূর্তে তাঁহার এ অভাব মোচন হইতে পারে। তবে কেন যোগত্রয়ানন্দ অপরের উপর নির্ভর করিতে যাইবেন?

আজ করুণাময়ের এই দিব্য লীলা দেখিয়া তিনি অভিভূত হইয়াছেন, নয়ন হইতে নামিয়া আসিয়াছে পুলকাশ্রুর ধারা।

এ কাহিনী শুনিয়া সবাই আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন, শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যায় বিরতি দিয়া শুরু করিলেন শ্রীভগবানের নাম কীর্তন।

মহেন্দ্র দাস নামে এক ধনী প্রতিবেশী সেখানে ছিলেন। লোকটি শিক্ষিত, অমায়িক ও ধর্মপ্রবণ। যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গে কোনোদিনই তাঁহার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু দূর হইতে মহেন্দ্রবাবু তাঁহাকে প্রায়ই লক্ষ্য করিতেন এবং গণ্য করিতেন একজন উঁচুদরের মহাত্মারূপে।

তখন যোগত্রয়ানন্দের খুব অর্থ-সঙ্কট চলিয়াছে। প্রায়ই পাওনাদারেরা বাড়িতে তাগাদা দিতে আসে। মহেন্দ্রবাবু সেদিন নিজে যাচিয়া কহিলেন, "বাবাজী, আমার কিছু নিবেদন করার আছে, অভয় দেন তো বলি।"

"বল বাবা, কি তুমি আমায় বলতে চাও"—স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেন যোগত্রয়ানন্দ।

"দেখুন, আমার বাবা জীবিত থাকতে প্রায়ই বলতেন, 'ভগবান্‌কে বেঁধে রাখবার কৌশল আমি জানি।' আমরা ব্যগ্র হয়ে তাঁকে ধরে বসতাম, 'বলতাম, বেশ তো, তাহলে সে কৌশলটা আমাদের শিখিয়ে দিন।' তিনি এড়িয়ে যেতেন, বলতেন, মৃত্যুর সময় বলে যাবো।'

"বলে যেতে পেরেছেন তো তিনি ?" কৌতুকভরে প্রশ্ন করেন যোগত্রয়ানন্দ।"

"হ্যাঁ, তিনি তাঁর দেহান্তের আগে শোনালেন সে কৌশলের কথা। বললেন, 'প্রথমে তোরা প্রচুর টাকাকড়ি রোজগার ক'রে নিবি।' তা' দিয়ে গঙ্গাতীরে তৈরী করবি দেয়াল-ঘেরা বাগান। তারপর সন্ধান নিতে হবে এমন সাধুপুরুষের যিনি সাধনা আর শাস্ত্র চর্চায় সব সময় রত, যিনি সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানী, যিনি লোভমোহের অতীত হয়ে ভগবৎ-ভাবে সদা বিভোর হয়ে আছেন। ভগবান্‌কে পাওয়া কঠিন, কিন্তু ভগবানের কৃপা আর অন্তরঙ্গতা পেয়েছেন এমন সাধু পাওয়া তেমন কঠিন নয়। খুঁজলে পাওয়া যায়। এমনতর সাধু ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরের ঐ বাগানে রেখে সেবা করবি। তাঁর মধ্যে দিয়ে ভগবান্‌ও বাঁধা পড়ে যাবেন।"

"বুঝতে পারছি, তোমার বাবা সত্যিকার চতুর লোক ছিলেন। ভগবান্‌কে বাঁধবার কৌশল যে বার করে, তার চাইতে চতুর আর কে ? কিন্তু, আমায় একথা শোনাচ্ছো কেন, বল তো ?"

"আপনাকে দর্শন করার পর থেকে বাবার সেই কথাগুলো বার-বার আমায় মনে পড়ছে। আপনার সেবার অধিকার আমায় কিছুটা দিন, আমি কৃতার্থ হই। আপনার ওপর ঋণের বোঝা চেপে গিয়েছে। আমি তা লাঘব করতে চাই। আপনি ঋণমুক্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে মানুষের উপকার করতে থাকুন।"

মহাপুরুষের সম্মতি নিয়া এই নূতন ভক্তটি একটা মোটা অঙ্কের ঋণ এ সময়ে পরিশোধ করিয়া দেন।

যোগত্রয়ানন্দের চিকিৎসা পদ্ধতির মূলে ছিল প্রাচীন ভারতের ভেষজ বিদ্যা, অথর্ব বেদোক্ত মন্ত্র প্রয়োগ এবং তাঁহার যোগবিভূতি। জীবনের গোড়ার দিক হইতে রোগ-নিরাময়কে তিনি তাঁহার এক মহান্ ব্রতরূপে গ্রহণ করেন এবং এই ব্রতসাধনে অর্থ-উপার্জনকে কোনোদিনই গুরুত্ব দেন নাই। রোগমুক্তির পর রোগী ও তাহার পরিজনের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিলেই নিজেকে তিনি কৃতার্থ বোধ করিতেন। শ্রীভগবানের করুণালীলার জন্য বার বার করিতেন কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

বালীর অন্যতম জমিদার রাজেন্দ্রবাবুর সহিত যোগত্রয়ানন্দের বেশ হৃদ্যতা ছিল। তাঁহার পরিবারের চিকিৎসায় প্রায়ই তাঁহাকে আহ্বান করা হইত। সে-বার রাজেন্দ্রবাবুর মাতার মস্তকে এক ক্ষত হয় এবং ক্রমে তাহাতে দেখা যায় নিক্রোসিস্ বা অস্থিক্ষয় রোগের আক্রমণ। বিখ্যাত সার্জন, ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারীকে আনিয়া রোগিণীকে দেখানো হয়, তিনি শলাকা ঢুকাইয়া দেখেন, ক্ষত অত্যন্ত গভীর। প্রায় মস্তিষ্কে গিয়া পৌঁছিয়াছে। এ অবস্থায় অস্ত্রোপচার অত্যন্ত বিপজ্জনক—এই মত প্রকাশ করিয়া সার্জন চলিয়া গেলেন। রোগিনী ও তাঁহার ছেলে কান্নায় ভাঙিয়া পড়েন, এবং সেইদিন হইতে যোগত্রয়ানন্দ গ্রহণ করেন চিকিৎসার দায়িত্ব।

অথর্ব বেদোক্ত কয়েকটি নিগূঢ় প্রক্রিয়া এই রোগিনীর উপর যোগত্রয়ানন্দ প্রয়োগ করিলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল, ক্ষত প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে এবং রোগিনীর সুনিদ্রা হইতেছে। অচিরে এই রোগিনী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

সতীশ পাল শুধু যোগত্রয়ানন্দের ভক্তই নয়, সে তাঁহার সমগ্র পরিবারের একজন একনিষ্ঠ সেবক। অল্প বয়সে সতীশের মনে

তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং বেলুড়ে থাকিয়া মঠ ও স্বামীজীদের সেবায় সে আত্মনিয়োগ করে। অতঃপর এক সময়ে মঠে বাবুরাম মহারাজ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং যোগত্রয়ানন্দ দীর্ঘদিন চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। এই সময়ে সাধক যোগত্রয়ানন্দের তেজোময় ব্যক্তিত্ব ও ত্যাগপূত জীবনের প্রতি সতীশ আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার আশ্রয়েই চলিয়া আসে। সে-বার সতীশ তাঁহার নিজের বাড়িতে গিয়া মারাত্মক রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। ডাক্তারদের সমস্ত যত্ন ও চেষ্টা বিফল হয় এবং বাড়ির লোক তাঁহার প্রাণের আশা ছাড়িয়া দেন।

যোগত্রয়ানন্দের কাছে এ সংবাদ পৌঁছিল। সতীশ যে তাঁহার অতি প্রিয় সেবক। তাড়াতাড়ি তখনই সতীশের বাড়ি আলমবাজারে তিনি ছুটিয়া যান। তাঁহাকে দেখিয়াই সতীশ ক্রন্দন করিয়া উঠে, বলিতে থাকে, "বাবা, এবার আর আমি বাঁচবো না, আশীর্বাদ করুন, জন্মে জন্মে যেন আপনার সেবার অধিকার পাই।"

সতীশের অস্থিচর্মসার দেহটি দেখিয়া যোগত্রয়ানন্দ হতাশ হইয়া পড়েন। সেদিনকার মতো কিছু ওষুধপত্র ব্যবস্থা করিয়া বাড়ির দিকে ফিরিতেছেন, সঙ্গে রহিয়াছেন এক তরুণ ভক্ত, তাঁহার দিকে তাকাইয়া শোকার্ত স্বরে যোগত্রয়ানন্দ বলিয়া উঠেন, "সতীশের যে অন্তিম অবস্থা দেখলুম রে। এখন একমাত্র ভগবান যদি কৃপা ক'রে বাঁচান।"

ভক্তটি দৃঢ় স্বরে উত্তর দেয়, "বাবা, এজন্য আপনি এত উতলা হয়েছেন কেন? আপনি ভগবান্‌কে একটু চেপে ধরুন, তাহলেই তো সতীশ বেঁচে যায়।"

যোগত্রয়ানন্দ সমস্তটা পথ একেবারে মৌনী হইয়া রহিলেন। বাড়িতে ফিরিয়াই প্রবেশ করিলেন ঠাকুরঘরে। দ্বার রুদ্ধ অবস্থায় প্রহরের পর প্রহর প্রার্থনা ও ধ্যান-জপে কাটিয়া গেল। পূজাকক্ষ হইতে বাহিরে আসিলে দেখা গেল, বদনমণ্ডল দিব্য প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রভাতে সংবাদ নিয়া জানা গেল, সতীশের রোগ-সঙ্কট

অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। তীব্র যন্ত্রণারও হইয়াছে উপশম। অতঃপর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সে সুস্থ হইয়া উঠে।

যোগত্রয়ানন্দের শাস্ত্রজ্ঞান ও যোগবিভূতির কথা শুনিয়া রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এক সময়ে তাঁহার প্রতি খুব আকৃষ্ট হন। স্বয়ং তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করেন, "বাবা, আপনি লোকের কল্যাণের জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ক'রে শাস্ত্রগ্রন্থ লিখছেন। অর্থের অভাবে অনেক সময় এই কাজে কত ব্যাঘাত হচ্ছে। আপনি অনুমতি দিলে, আমি আপনার সংসার চালানোর ভার নিতে পারি।"

যোগত্রয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "গুরুর আদেশে শাস্ত্রতত্ত্ব প্রচারে আমি ব্রতী। বেশ, যতদিন গ্রন্থ ছাপানোর কাজ চলবে ততদিন আপনার প্রস্তাবিত অর্থ আমি নেব। কিন্তু এটা গণ্য হবে আমার ঋণ রূপে। গ্রন্থ ছাপানো হবার পর বিক্রির টাকা থেকে এই ঋণ পরিশোধ করা হবে।"

কালীকৃষ্ণ এ কথায় রাজী হন এবং তাঁহার প্রদত্ত টাকায় কোনো-মতে প্রতিমাসে মহাত্মার সংসার ব্যয় নির্বাহ হইতে থাকে।

কিছুদিন পরের কথা। যোগত্রয়ানন্দ নিজ গৃহে নিভৃতে বসিয়া ধ্যান-জপ করিতেছেন, হঠাৎ এক সময়ে মানসপটে ভাসিয়া উঠে এক দুর্ঘটনার দৃশ্য। দেখেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর নিজের ঠাকুরঘরে সহসা পা ফস্‌কাইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। উঠিয়া দাঁড়ানোর সামর্থ্য নাই। 'আহা! আহা!' বলিয়া যোগত্রয়ানন্দ আর্তস্বরে চেঁচাইয়া উঠেন। নয়ন দুটি করুণায় অশ্রুসজল হইয়া উঠে।

কিছুক্ষণ পরে ধ্যানকক্ষ হইতে বাহির হইতেই দেখিলেন, ঠাকুর-বাড়ির এক কর্মচারী গাড়ি নিয়া আসিয়াছে।—কর্তা বড় অসুস্থ। এখনই একবার বাবার সেখানে যাওয়া আবশ্যক।

সেখানে উপস্থিত হইয়া যোগত্রয়ানন্দ দেখেন, কালীকৃষ্ণের পা হঠাৎ জখম হইয়াছে তাহা নয়, ব্যাপার আরও গুরুতর। আকস্মিক-

ভাবে পক্ষাঘাতের আক্রমণ ঘটে তাঁহার দুই পায়ে, ফলে তিনি ভূতলে পড়িয়া আহত হন। এই পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্য করা বড় সহজসাধ্য নয়।

কালীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া অসহায়ের মতো কাঁদিয়া ফেলেন। যোগত্রয়ানন্দ সস্নেহে তাঁহার পিঠে কল্যাণময় হস্তটি বুলাইয়া দেন, আশ্বাস দিয়া বলেন, "ভয় কি? ভালো হয়ে যাবেন। শ্রীভগবান্ নিশ্চয় কৃপা করবেন।"

মহাপুরুষের মঙ্গল হস্তের স্পর্শে তখনি এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, কালীকৃষ্ণের পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত আর নাই। ধীরে ধীরে লাঠিতে ভর দিয়া তিনি দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। এবারও যোগত্রয়ানন্দের কৃপায় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পরিবার এক মর্মান্তিক দুর্দৈব এড়াইতে সক্ষম হয়।

ঠাকুরের এক ভাইঝির হাতে নিক্রোসিস্ বা অস্থিক্ষয় রোগ দেখা দেয়। প্রবীণ শল্য চিকিৎসক ডাঃ মাউয়াট রোগিনীর ভার নিয়াছেন। ইতিমধ্যে কয়েকবার অস্ত্রোপচারও হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রোগ সারে নাই। কেবলই চলিয়াছে বৃদ্ধির পথে। অবশেষে অভিজ্ঞ সার্জন বলিয়া দিলেন, কনুইয়ের নিচেকার অংশ কাটিয়া বাদ দিতে হইবে, নতুবা রোগিনীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হইবে না।

কালীকৃষ্ণ বড় ঘাবড়াইয়া যান, তৎক্ষণাৎ গাড়ি পাঠাইয়া যোগত্রয়ানন্দকে বাড়িতে নিয়া আসেন। কাতর স্বরে বলেন, "বিজ্ঞ সার্জনের বিদ্যা বুদ্ধি সব হার মেনেছে। এবার আপনি কৃপা ক'রে এ মেয়েটিকে বাঁচান।"

যোগত্রয়ানন্দ কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে রোগিনীকে পরীক্ষা করেন, তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, "ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি বলছি, দুশ্চিকিৎস্য হলেও এ রোগ অচিরে আরোগ্য করা যাবে। দু সপ্তাহের বেশী সময় লাগবে না।"

কার্যকালে তাহাই ঘটিতে দেখা যায়। প্রাচীন আয়ুর্বেদোক্ত ভেষজের গুণে প্রাণঘাতী অস্থিক্ষয় নিবারিত হয়।

অতঃপর ঠাকুর ভবনের চিকিৎসার সব কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত হইল যোগত্রয়ানন্দের উপর। এইসব চিকিৎসার পারিশ্রমিক বাবদ বহু টাকা তাঁহার পাওনা হয়। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ভাবিতেছিলেন, এই বাবদ একটা মোটা টাকা একসঙ্গে তাঁহাকে দিয়া দিবেন। কিন্তু যোগত্রয়ানন্দ তাহাতে বাধ সাধিলেন। তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "গ্রন্থ ছাপানোর সময় আপনি প্রতি মাসে আমার সংসারের ব্যয়ের জন্য টাকা দিয়েছেন। সে টাকা আমি ঋণ বলেই এতকাল গণ্য ক'রে আসছি। চিকিৎসার খাতে আমার যে টাকা পাওনা হয়েছে, তা থেকে পূর্বেকার ঐ ঋণ শোধ হয়ে যাক্।"

এই ব্যবস্থাই কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে সেদিন মানিয়া নিতে হইল।

ঠাকুরবাড়ির উপর যোগত্রয়ানন্দের কৃপা দীর্ঘদিন ছিল। সে-বার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের দৌহিত্রীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে। বিবাহের দিন সারা আকাশ জুড়িয়া মেঘের ঘনঘটা দেখা গেল। সকলেই মহা চিন্তিত, ঝড়-জল বেশী হইলে চরম অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। কালীকৃষ্ণের নাতনী বিবাহের কনে, আতঙ্কিত হইয়া বলে, "দাদু, সব যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, এখন উপায়?"

কালীকৃষ্ণ চিন্তিত হইয়া কহিলেন, "তাই তো, এ যে মহাবিপদ দেখ্‌ছি। একমাত্র বাবাজীই এ বিপদে রক্ষা করতে পারেন। তিনি পাশের ঘরেই বসে আছেন। তোকে তো খুব স্নেহ করেন, তুই তাঁকে চেপে ধর না!"

কালীকৃষ্ণের নাতনী আবদারের সুরে যোগত্রয়ানন্দকে বলিতে থাকে, "আজকের ঝড়-বাদল থামাতেই হবে, নইলে বাবাজী, আপনার মাহাত্ম্য বুঝা যাবে না।"

যোগত্রয়ানন্দ হাসিয়া কহিলেন, "ঝড় বৃষ্টিও চলবে, তোমার বিয়েতে কোনো বাধা হবে না, এই ব্যবস্থাই বরং ভালো।"

নীরবে বারান্দায় বসিয়া, দূর আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া

যোগত্রয়ানন্দ মৃদুস্বরে কতকগুলি মন্ত্র পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইল প্রবল বর্ষণ। এই বর্ষণের শেষে আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া গেল। তারপর সে রাত্রে আর বৃষ্টি হয় নাই, বিবাহ সভার কোনো ক্ষতিও সাধিত হয় নাই।

প্রাচীন আয়ুর্বেদ অথর্ববেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী যোগত্রয়ানন্দ যেমন চিকিৎসা করিতেন, তেমনি অতি আধুনিক ডাক্তারী বিদ্যায়ও তাঁহার ব্যুৎপত্তি কম ছিল না। ইংরেজীতে রচিত দেহতত্ত্ব ও চিকিৎসা সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ এক সময়ে তিনি অধ্যয়ন করেন। এগুলি আয়ত্তও করেন আপন সহজাত মেধা ও প্রতিভার বলে। প্রয়োজনবোধে কোনো কোনো রোগীর ক্ষেত্রে তাঁহাকে অভিজ্ঞ ইউরোপীয় ডাক্তারদের পদ্ধতি অনুসরণ করিতে দেখা যাইত এবং আধুনিকতম চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া প্রবীণ ডাক্তারেরাও বিস্মিত হইতেন।

কাশীপুরে থাকা কালে একটি জ্বরের রোগী তাঁহার হাতে আসে। স্থানীয় এক বিজ্ঞ ডাক্তারও রোগীটির দেখাশুনা করিতেছেন। জ্বর বড় অদ্ভুত ধরনের, কোনোমতেই ইহার গতি-প্রকৃতি সঠিকভাবে বুঝা যাইতেছে না। রোগীর অবস্থা ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে।

যোগত্রয়ানন্দ রোগ নির্ণয় করেন, সহযোগী ডাক্তারকে বলেন, আসলে এ রোগটি হচ্ছে বিলিয়াস নিউমোনিয়া। লিভারকে আরো বেশী সক্রিয় না করতে পারলে রোগীকে বাঁচানো যাবে না।"

অতঃপর রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা তিনি করিলেন।

সহযোগী ডাক্তারটি অভিজ্ঞ ও প্রবীণ। তিনি মন্তব্য করিলেন, "ইউরোপে এই রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি বার করা হয়েছে বলে শুনেছি। ভারতবর্ষে অনেক ডাক্তারের কাছে তা অজ্ঞাত।"

সেদিন ঠাকুরঘর হইতে যোগত্রয়ানন্দ বাহিরে আসিতেছেন,

হঠাৎ তাঁহার পায়ে আসিয়া ঠেকিল একটি পুরাতন কাগজের ঠোঙা। হাতে তুলিতেই দেখিলেন, ইউরোপীয় গবেষক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের রচিত কতকগুলি গ্রন্থের বিজ্ঞাপন উহাতে দেওয়া রহিয়াছে। এই বিজ্ঞাপন-তালিকা হইতে একটি গ্রন্থ বাছিয়া নিয়া তখনি ভক্ত সতীশকে কলিকাতায় পাঠাইলেন। নির্দেশ দিলেন, যে কোনো মূল্যে এটি যেন সংগ্রহ করা হয়।

ঐ ডাক্তারী গ্রন্থটি কিনিয়া আনা হইল, গভীর রাত অবধি যোগত্রয়ানন্দ উহা পাঠ করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসা ঠিক পথেই চলিয়াছে। পরের দিনই রোগীর জ্বর ছাড়িয়া গেল, বাড়ির সবাই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

যোগত্রয়ানন্দ এবার সহযোগী প্রবীণ ডাক্তারটিকে ডাকিয়া নূতন কিনিয়া-আনা ইউরোপীয় চিকিৎসা-গ্রন্থের নির্দেশ দেখাইয়া দিলেন।

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, "আপনি যত কিছুই বলুন না কেন, আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির যত বই-ই দেখান না কেন, আমি বলবো, আপনার যোগশক্তিই এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনাকে পথ দেখিয়েছে, সঠিক রোগনির্ণয়ের দিকে টেনে এনেছে।"

একবার এক পশ্চিম দেশীয় সাধু শহরে আসিয়া উপস্থিত হন। লোক পরম্পরায় যোগত্রয়ানন্দের কথা তাঁহার কানে যায় এবং তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন।

সাধুকে যথেষ্ট সমাদর করা হইল এবং উভয়ের মধ্যে নানা ধর্ম-প্রসঙ্গের আলাপ-আলোচনা চলিল। এবার যোগত্রয়ানন্দ যুক্তকরে কহিলেন, "মহারাজ, বেলা হয়ে গিয়েছে, আমার একান্ত ইচ্ছে আপনি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমার কয়েকটি ভক্ত নিকটেই এক বাড়িতে বসবাস করেন। চলুন, সেখানে আপনার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে।"

সাধুটি গর্বিতভাবে বলিলেন, "আমি তো কোনো গৃহীর আতিথ্য গ্রহণ করিনে। লোকালয়ের বাইরে গিয়ে কোনো একটা জায়গা দেখে নেবো। এজন্য ভাবনার প্রয়োজন নেই।"

"প্রয়োজন আছে বলেই তো ভাবছি মহারাজ। শুধু ভাবছিনে, দুর্ভাবনারই পড়েছি আপনাকে নিয়ে।"—সবিনয়ে নিবেদন করেন যোগত্রয়ানন্দ।

"তার মানে? ওসব অবাস্তর কথা রাখুন। আমার ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না।"—বলিয়া সাধুটি বাড়ির বাহিরে আসিলেন, রাস্তা দিয়া আপন মনে চলা শুরু করিলেন।

যোগত্রয়ানন্দ তাঁহার পিছনে পিছনে চলিয়াছেন, আর বার বার জানাইতেছেন অনুরোধ। অবশেষে দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "মহারাজ, আপনি অবুঝের মতো ব্যবহার করছেন। আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, একটা মারাত্মক ব্যাধি আপনার দেহে প্রবেশ করেছে। এখন কিছুকাল আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। সুচিকিৎসার ব্যবস্থা তো করতেই হবে।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সাধু পূর্ববৎ পথ চলিতে থাকেন। অগত্যা যোগত্রয়ানন্দকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।

কিন্তু দেখা গেল, রাস্তার মোড় পার না হইতেই সাধুটি প্রবল জ্বরের ঘোরে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। যোগত্রয়ানন্দ তখনি আবার ছুটিয়া যান। ধরাধরি করিয়া সাধুটিকে পূর্বকথিত বাড়িতে নিয়া তোলা হয়। যোগত্রয়ানন্দের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ভক্ত-সেবকেরা গ্রহণ করেন তাঁহার সেবার ভার।

রোগীর জ্বরটি বড় মারাত্মক ধরনের। যোগত্রয়ানন্দ রোজই তাঁহাকে দেখিতে যান, ওষুধপত্রাদি দিয়া আসেন। সেদিন খাওয়ার ওষুধের সঙ্গে বুকে-পিটে মালিশ করার জন্যও একশিশি ওষুধ পাঠানো হইয়াছে। পূজার ঘরে ঢুকিয়া যোগত্রয়ানন্দ জপে বসিতে যাইবেন, এমন সময় শুনিলেন এক দৈবী আওয়াজ। কে যেন বলিতেছেন, 'শিগ্‌গীর পীড়িত সাধুটিকে দেখে এসো। শুশ্রূষাকারী

ভুল ক'রে তাকে মালিশের ওষুধ খাওয়াতে যাচ্ছে। খাওয়ানোর পরই বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।"

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যোগত্রয়ানন্দ ত্রস্তপদে সাধুর কাছে গিয়া উপস্থিত হন। সেবক ভক্তটির হাত হইতে ওষুধের গ্লাসটি সাধু নিতে যাইবেন এমন সময় যোগত্রয়ানন্দ উহা কাড়িয়া নিলেন। গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "এটা খাবার ওষুধ নয়, মালিশ।"

এ কথা শুনিয়াই সাধুর মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া যায়। সক্রোধে মালিশ এবং খাবার ওষুধ সব কিছুই তিনি বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলেন।

যোগত্রয়ানন্দ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন, "অনর্থক আপনি রাগ করছেন। ভুল ক'রে আপনাকে মালিশ খেতে দেওয়া হচ্ছে, ঠাকুর একথা আমায় জানিয়ে দিলেন। তাই তো হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলাম। আর একটু দেরি হলেই আপনাকে আর বাঁচানো যেতো না।"

এবার সাধুর চৈতন্যোদয় হইল। অনুতপ্ত হইয়া কহিলেন, "নিজের অভিমান বশতঃ মহাত্মাকে আমি চিনতে পারি নি। আপনি আমার জীবনদাতা। আমায় ক্ষমা করুন, কৃপা করুন।"

প্রায় তিন সপ্তাহ মারাত্মক জ্বরে ভুগিবার পর ঐ সাধুটি সুস্থ হইয়া উঠেন, তারপর নিজের দেশে ফিরিয়া যান।

আশ্রিত ভক্ত-শিষ্যদের মধ্যে যাহারা প্রকৃত অধিকারী তাঁহাদের অনেকে যোগত্রয়ানন্দের যোগবিভূতি ও অলৌকিক শক্তির সহিত পরিচিত ছিলেন। সিদ্ধ মহাপুরুষের এই শক্তির প্রকাশ ঘটিত নানা ভঙ্গীতে এবং নানা মাধ্যমের ভিতর দিয়া।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার পত্নী যোগত্রয়ানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত। ব্যবহারিক জীবন এবং সাধনময় জীবনের অনেক কিছু সমস্যায়ই এই শক্তিধর মহাত্মার কৃপার উপর তাঁহারা নির্ভর করিতেন।

গোপালবাবু বিচার বিভাগের একজন অফিসার। সে-বার তিনি বদলী হইয়া নূতন চাকুরিস্থল ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ শহরে আসিয়াছেন। খড়ের চালযুক্ত একটি বাংলো বাড়িতে তাঁহারা বাস করিতেছেন। একদিন গভীর রাতে কি এক অজ্ঞাত কারণে চালে আগুন লাগিয়া যায় এবং অল্পকাল মধ্যে বাড়ির চারিদিকে তাহা ছড়াইয়া পড়ে। হঠাৎ এক দৈবী কণ্ঠস্বর শুনিয়া গোপালবাবু ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠেন। দেখেন, লেলিহান আগুনের শিখা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। তখনি পত্নীকে জাগাইয়া তুলিলেন। ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র উভয়ে মিলিয়া উঠানে স্থানান্তরিত করার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত ছাদটি নিচে ধসিয়া পড়িল। আর একটু বিলম্ব হইলে দু'জনেই এই অগ্নিদাহে দগ্ধ হইতেন।

গোপালবাবুর পত্নী সবিস্ময়ে দেখিলেন, জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর মূর্তিতে যোগত্রয়ানন্দ ঐ জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার প্রশান্ত কৃপাদৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে আশ্রিত ভক্ত দম্পতির উপর।

সাশ্রুনয়নে এই ভক্তিমতী মহিলা তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত হয়ে স্বয়ং বাবাই আজ আমাদের দু'জনের প্রাণ রক্ষা করলেন। তাঁকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয় নি।"

১৯০৬ সাল। যোগত্রয়ানন্দ স্থির করিলেন, এবার তিনি কাশীতে বাস করিবেন, প্রভু বিশ্বনাথের পাদপদ্মে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া শুরু করিবেন অধ্যাত্ম জীবনের নূতন পর্যায়। স্বজনবর্গ এবং দুই চারিটি সেবক-ভক্ত সঙ্গে নিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁহার বহু আকাঙ্ক্ষিত শিবধামে।

অধ্যাত্ম জগতে সুপরিচিত, উৎসব সম্পাদক অধ্যাপক রামদয়াল মজুমদার এ সময়ে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীতে বাস করিতেছেন। শক্তিধর মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের আগমনে তিনি মহা পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

প্রত্যূষে উঠিয়া যোগত্রয়ানন্দ গঙ্গাস্নান করিতেন, তারপর রুদ্ধ কক্ষে দীর্ঘসময় কাটাইতেন যোগসাধনায় ও নিত্যকার পূজা ও জপতপে। বিশ্বনাথ দর্শন, গঙ্গাভ্রমণ ও নামকীর্তনও ছিল তাঁহার প্রাত্যহিক দিনচর্যার অঙ্গ।

রামদয়াল মজুমদার প্রায়ই গঙ্গাভ্রমণের সময় যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গী হইতেন। মহাত্মার পুণ্যসঙ্গ ও অমৃতময় বচনসুধা পান করিয়া মন তাঁহার দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিত। উত্তরকালে কথা প্রসঙ্গে মজুমদার মহাশয় যোগত্রয়ানন্দের মহনীয় চরিত্র ও অন্তরঙ্গ আচরণের নানা কাহিনী বর্ণনা করিতেন।

তখন শীতকাল। একদিন বিকালে তিনি যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গী হইয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিয়াছেন। পথের পাশে একটি ভিখারী ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে আসিতেই কাতরকণ্ঠে সে সামান্য কিছু ভিক্ষা চায়। যোগত্রয়ানন্দ করুণ নেত্রে তাঁহার অর্ধনগ্ন বেশের দিকে তাকাইয়া নিজের কাঁধের পশমী আলোয়ানটি তাহাকে দিয়া দিলেন। সম্প্রতি এক ধনী ভক্ত এই মূল্যবান বস্তুটি মহাত্মাকে উপহার দিয়াছিলেন।

রামদয়ালবাবু মন্তব্য করেন, "এই দামী আলোয়ানটি না দিয়ে ওকে বাজার থেকে আর একটা গায়ের চাদর কিনে দিলেই হতো।"

স্মিতহাস্যে মহাপুরুষ কহিলেন, "ভগবান্ যদি দামী শীতবস্ত্র আমায় পরাতেই চান, তবে তো নিজেই কৃপা ক'রে পাঠিয়ে দেবেন। এ নিয়ে ভাব্‌বার কি আছে?"

সেইদিনই গঙ্গাভ্রমণ হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিলে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগত্রয়ানন্দের হাতে একটি পার্শেল দিয়া কহিলেন, "দাদা, এটি কলকাতা থেকে এসেছে।"

পার্শেলটি খুলিয়া দেখা গেল, এক ভক্ত শীতে ব্যবহারের জন্য বাবাকে একটি মূল্যবান পশমী শাল পাঠাইয়াছেন। রামদয়াল বিস্ময়ে মহাত্মার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যোগত্রয়ানন্দের রচিত আর্যশাস্ত্র প্রদীপের খ্যাতি তখন সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বহু শিক্ষিত এবং জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা এই মহান্ গ্রন্থের রচয়িতার সহিত পরিচিত হইতে আসিতেন। তত্ত্ব ও সাধনপ্রণালী সম্পর্কে তাঁহারা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাধক মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ তখন তরুণবয়স্ক। আর্যশাস্ত্র প্রদীপকারের প্রতিভা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাই তাঁহাকে একবার দর্শন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। যোগাযোগ অচিরে ঘটিয়া গেল, কাশীতে একদিন যোগত্রয়ানন্দের গৃহে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিলেন।

মহাত্মা তাঁহাকে স্নেহাশিস্ জানাইলেন, স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন, "বাবা, তোমার কোনো সংশয় বা প্রশ্ন যদি থাকে বল।"

তরুণ বিদ্যার্থী গোপীনাথ একটি সুন্দর প্রশ্ন—যাহা বহু জিজ্ঞাসু সাধকের প্রশ্ন—উত্থাপিত করিলেন। কহিলেন, "বাবা, গুরুজনদের মুখে শুনেছি, সত্য এক ও অখণ্ড। মুনি ঋষিরা যদি সত্যের সাক্ষাৎকার ক'রে থাকেন তবে তাঁদের মতে মতবৈষম্য হয় কেন? নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্—একথার অর্থ কি? নানা মুনির নানা মত কেন হবে? ব্রহ্মবিদ্ মুনিরা কি একমত হতে পারে না? এর তাৎপর্য আমায় বুঝিয়ে বলুন। এ তাৎপর্য বুঝতে পারলে সাধারণ জিজ্ঞাসুরা উপকৃত হবে। নানা পথ ও মতবৈষম্যের মধ্যে পড়ে তাদের বিভ্রান্ত হতে হবে না।"

এই প্রশ্নের এক অপরূপ মীমাংসা যোগত্রয়ানন্দ করিয়া দিলেন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের ভাষাতেই এখানে উহা বর্ণিত হইতেছে। "বাবাজী কহিলেন, বৎস, তোমার প্রশ্নের অঙ্গীভূত বাক্যের মধ্যেই উহার সমাধান রহিয়াছে। মুনি কাহাকে বলে? যিনি মননশীল তিনিই মুনি-পদবাচ্য। মত কাহাকে বলে? মনের দ্বারা যাহা অঙ্গীকৃত হয় অর্থাৎ অখণ্ড সত্যের যে অংশটুকু খণ্ড মনের দ্বারা গৃহীত হয় তাহাই মত। যতক্ষণ পর্যন্ত মনকে অবলম্বন করিয়া সত্যের সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করা যাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত অখণ্ড

সত্যের দর্শন লাভ সুদূর পরাহত। অখণ্ড সত্যের ধারণা করিতে হইলে মনকে নিরুদ্ধ করিয়া এবং শুধু মনকে নয় অন্তঃকরণের যাবতীয় বৃত্তিকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া অন্তঃকরণের বাহিরে যাইতে হইবে। অন্তঃকরণের পৃষ্ঠভূমিতেই আত্মার স্বয়ংপ্রকাশ আলোক অবস্থিত। বিকল্প শক্তির দ্বারা মন ঐ আলোককে ভাগ করিয়া পৃথক পৃথক ভাবরূপে পরিণত করে। মনের ইহা দোষ নহে, ইহাই মনের স্বভাব।

"বিকল্পশূন্য পরম সত্যকে পাইতে হইলে মনের ঊর্ধ্বে উত্থিত হইতে হইবে। এই অবস্থায় মতামতের কোনো প্রশ্নই উঠে না। কারণ মনই যেখানে নাই সেখানে মত কোথায়? কিন্তু ঐ সত্যের প্রকৃত চিত্র অজ্ঞানীকে প্রদর্শন করানো যায় না, কারণ উহার সংক্রমণ হয় না। যাহার চিত্ত ঐ স্বয়ংপ্রকাশ ভূমিতে প্রবিষ্ট হইবে তাহার নিকট উহা আপনিই প্রকাশিত হইবে। কিন্তু অজ্ঞান জগতের জ্ঞানলাভের কোনো উপায় উহা হইতে হয় না। ঐ অবস্থা যাহার হয়, শুধু তাহারই হয়। ঐ জ্ঞান অজ্ঞানী পরন্তু অনুরাগী ও আশ্রিত জিজ্ঞাসু-জনকে দিতে হইলে মনের আশ্রয় গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। মনের ধর্মই কল্পনা বিকল্প বৃত্তি। ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞানকে বিকল্পের সঙ্গে যুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসুর নিকট উপস্থাপিত করা হয়। বিকল্প নানা প্রকার। জিজ্ঞাসুর চিত্তের প্রকৃতি, বাসনা ও অনুভব প্রভৃতি বিচার করিয়া তত্ত্বজ্ঞ গুরু তদনুরূপভাবে শব্দের সাহায্যে তাঁহাকে ঐ জ্ঞান দান করেন।

"এইখানেই মনের সার্থকতা। এইখান হইতেই মতের উদ্ভব হয়। যিনি পূর্ণ সত্যকে মনের দ্বারা ধারণা করিতে যান তাঁহার তো মত থাকিবেই, কিন্তু যিনি মনকে ত্যাগ করিয়া পূর্ণ সত্যকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারও মত থাকে। তখন তিনি মনো-ভূমিতে বিদ্যমান, বিশিষ্ট অধিকার সম্পন্ন জিজ্ঞাসুর নিকট ঐ জ্ঞান সঞ্চার করেন। এই জন্যই উভয় জ্ঞানীতে স্বরূপতঃ পার্থক্য না থাকিলেও অধিকার ভেদে তাঁহাদের উপদেশের মধ্যে পার্থক্য.

আসিয়া পড়ে। এই জন্যই বলা হইয়াছে—নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।

"ইহাই মুনিদের মতভেদের রহস্য। সাধারণ লোকের অর্থাৎ অজ্ঞ লোকের মতভেদ এই প্রকার নহে। কারণ মুনিদের মতভেদ সত্ত্বেও মূলে আছে জ্ঞান, কেবল অন্যের উপদেশের জন্য বিকল্পের আশ্রয় নেওয়া হয়। সাধারণ লোকের মতভেদের মূল অজ্ঞান[১]।"

প্রশান্ত বদনে সৌম্যভাবে বাবাজী এই দুরূহ প্রশ্নটিকে সরল ও সহজবোধ্য করিয়া দিলেন। প্রজ্ঞা ও করুণার প্রতিমূর্তি এই মহাসাধকের চরণধূলি নিয়া তরুণ জিজ্ঞাসু হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিলেন।

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন তখন কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পুত্র বৃন্দাবন এসময়ে এক মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত হয়, ক্রমে তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টাই করিয়াছেন, কিন্তু কোনো ফল হয় নাই। এবার দৈব কৃপা ছাড়া গতি নাই।

তর্করত্ন মহাশয় স্থির করিলেন, বৃন্দাবনকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা তিনি এবার করিবেন,—যোগত্রয়ানন্দজীর কাছে মাগিবেন তাহার জীবনভিক্ষা।

গোপীনাথ কবিরাজ তর্করত্ন মহাশয়ের অতিশয় স্নেহের পাত্র, আবার যোগত্রয়ানন্দ বাবার সঙ্গেও গোপীনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তাই তর্করত্ন মহাশয় সেদিন ভোরবেলায় লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন। কহিলেন, "গত রাতে বৃন্দাবনের অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে। আর বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই বাবাজীর এবার শরণ নিতে যাচ্ছি। তুমি আমায় এখুনি সেখানে নিয়ে চল।"

গোপীনাথ জানেন, বাবাজী সকালবেলায় দীর্ঘ সময় রুদ্ধদ্বার

১ সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ—যোগত্রয়ানন্দজী : ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

কক্ষে একান্তে সাধনভজন করেন। কোনো বাহিরের লোকের সঙ্গে তখন দেখাশুনা করেন না। অন্তরঙ্গ সেবকেরাও এসময়ে তাঁহার ঘরে ঢুকিতে সাহস পায় না। কাজেই এখন তর্করত্ন মহাশয়কে নিয়া সেখানে গেলে, হয়তো বাবাজীর কাছে তাঁহার আগমন সংবাদ পৌঁছিবেই না, সাক্ষাৎও হইবে না।

তর্করত্ন মহাশয়কে কহিলেন, "বাবাজী অপরাহ্নেই দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখাশুনা করেন, তাই ঐ সময়টাই তাঁর কাছে যাওয়া প্রশস্ত সময়।"

তর্করত্ন মহাশয় অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া শয্যাশায়ী বৃন্দাবনকে দেখাইয়া দিলেন। দীর্ঘদিন ভুগিয়া ভুগিয়া সে কঙ্কালসার হইয়াছে, পড়িয়া আছে মৃতের মতো অসাড় হইয়া। শিয়রে বসিয়া তাহার জননী অসহায়ভাবে কাঁদিতেছেন।

গোপীনাথ বুঝিলেন, বৃন্দাবনের জীবনের কোনো আশাই নাই। তর্করত্ন মহাশয় করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "না গোপীনাথ, আর সময় ক্ষেপণ করা যায় না। চল, এখনি গিয়া বাবাজীর কাছে আমার প্রার্থনা নিবেদন করি।"

যোগত্রয়ানন্দ তখন কাশীর রাজঘাটে বাস করিতেছেন। উভয়ে তাঁহার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইতেই, বাবাজীর প্রিয় সেবক সতীশ কহিল, "এই যে আপনারা এসে গেছেন দেখ্‌ছি। বাবা একটু আগেই আমায় ডেকে বললেন, 'গোপীনাথ আর তর্করত্ন মশাই এখনই এখানে আসবেন। বৃন্দাবনের শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। দেখো, ওরা যেন ফিরে না যান। তুমি নিচে গিয়ে অপেক্ষা করবে এবং ওরা এলেই আমার ঘরে নিয়ে আসবে। আমি ওদের জন্য প্রতীক্ষা করবো আর একলাটিই থাক্‌বো। যদিও এসময়ে আমি কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনে, তবুও ওদের সঙ্গে করতেই হবে। কেউ যেন ওদের বাধা না দেয়।"

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীর কৃপার কথা ভাবিয়া তর্করত্ন মহাশয়ের দুই চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

বাবাজীর সহিত তখনি উভয়ে সাক্ষাৎ করিলেন। তর্করত্ন মহাশয় মহাত্মার প্রশস্তিসূচক এবং ভক্তি-অর্ঘ্য স্বরূপ কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া আনিয়াছিলেন, উহা পাঠ করিয়া ও প্রণাম নিবেদন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

যোগত্রয়ানন্দ স্নেহপূর্ণ স্বরে তর্করত্নকে কহিলেন, "গত রাতে ধ্যানাসনে বসবার পরই দেখতে পেলাম, বৃন্দাবনের অবস্থা সঙ্কট-জনক, আর আপনি চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন। আপনারা আসবেন, তাও জানতে পারলাম। তাই সতীশকে বলে রেখেছি, আপনাদের যেন ফিরিয়ে দেওয়া না হয়।"

তর্করত্ন মহাশয় পুত্রের রোগমুক্তির জন্য বাবাজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন, আর তিনি যে কৃপাভরে তাঁহার জন্য এতটা চিন্তা করিয়াছেন সেজন্য বার বার জানান কৃতজ্ঞতা।

কথা প্রসঙ্গে তর্করত্ন মহাশয় প্রশ্ন করেন, "বাবা, এসব কি আপনার যোগশক্তির ব্যাপার?"

যোগত্রয়ানন্দ স্মিতহাস্যে উত্তর দেন, "যোগশক্তি ছাড়া আর কি? হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হলে স্বভাবতঃ এই রকমই ঘটে থাকে। তখন দূরকেও নিকটে দেখা যায় এবং ভবিষ্যৎকেও বর্তমানস্বরূপে জানা যায়।"

কিছুকাল মৌনী থাকিয়া আবার বলিলেন, "আপনি বৃন্দাবনের জন্য আর চিন্তা করবেন না। যখন সে আমার দৃষ্টিতে পড়েছে তখন সে অবশ্যই ভাল হয়ে যাবে। আপনারা বাড়ি ফিরে গেলেই দেখতে পাবেন—তার অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে।"

বাবাজীর এই অহেতুক করুণায় তর্করত্ন মহাশয় একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। ছলছল নেত্রে বাবাজীকে প্রণাম করিয়া তিনি ঘরে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর বৃন্দাবনের অবস্থার দ্রুত উন্নতি দেখা গেল এবং অনতিবিলম্বে সে সুস্থ হইয়া উঠিল।

যোগত্রয়ানন্দ প্রায়ই ভক্ত এবং দর্শনার্থীদের বলিতেন, "সাধন-জীবনের উন্নতি সাধন করতে হলে চাই আন্তরিক বিশ্বাস। এই

বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় না হলে শুধু যুক্তি-তর্কের সাহায্যে এ পথে এগোনো যায় না।"

আরো বলিতেন, "ছাখো, বিশ্বাসের বলে সবই হতে পারে। যা লৌকিক দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়, বিশ্বাসের বলে তাও অনায়াসে সংঘটিত হতে পারে। কিভাবে, কোন্ শক্তির দ্বারা কোন্ কাজ সাধিত হয়, তা মানুষ বুঝে উঠতে পারে না।

কলিকাতার এক ইন্‌জিনিয়ার ভদ্রলোকের মাতা যোগাত্রয়ানন্দের খুব ভক্ত ছিলেন, বাবার যে কোনো কথার উপর তাঁহার অটুট আস্থা ছিল। এই বৃদ্ধা মহিলা তখন হৃদ্‌রোগে খুব ভুগিতেছেন। ডাক্তারদের মতে, যে কোনো সময়ে এই পীড়া আরো বাড়িতে পারে এবং তাঁহার মৃত্যু ঘটিতে পারে। তাঁহার পক্ষে বেশী নড়াচড়া করা ভাল নয়, এ সতর্কবাণীও তাঁহার উচ্চারণ করিয়াছেন।

বৃদ্ধা মহিলা একদিন করজোড়ে যোগত্রয়ানন্দকে কহিলেন, "বাবা, আমার এই অবস্থা। বাইরে কোথাও যাওয়া ডাক্তারদের নিষেধ। কিন্তু প্রাণে বড় ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর আগে কয়েকটা তীর্থ দর্শন করবো। এ ইচ্ছা পূর্ণ হয়, যদি আপনি আমায় কৃপা করেন। আরো একটা ইচ্ছে আছে, কাশীতে যেন আমার দেহান্ত হয়।"

বাবা সহাস্যে কহিলেন, "বেশ, আপনার দুটো আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হবে। কাশীপ্রাপ্তি আপনার অবশ্যই ঘটবে। আর আপনাকে তীর্থ দর্শনও করাবো। আপনার কোনো ভয় নেই। কিন্তু আমি অনুমতি দেবো, একটা সর্তে।"

"বলুন বাবা, আমি তা মেনে নিতে রাজী।"

"আমি যে যে স্থানে যেতে নির্দেশ দেবো, যে যে দৃশ্য দেখতে বলবো, তা-ই আপনি করবেন। অতিরিক্ত কোথাও যাবেন না, বা দেখবেন না। আমার কথামতো চললে আপনার জীবনহানির কোনো আশঙ্কা নেই। অন্যথায় বিপদ হবে।"

বৃদ্ধার ধর্মবিশ্বাসের আঁট ছিল, বাবাজীর প্রতিও ছিল অবিচল নিষ্ঠা। অনুমতি পাইয়া কয়েকটি তীর্থ দর্শন তিনি সমাপ্ত করিলেন।

কিন্তু হঠাৎ ঝোঁকের বশে তিনি এক মস্ত ভুল করিয়া বসিলেন। যোগত্রয়ানন্দের নির্দেশ ছিল, গির্ণার পাহাড়ে বৃদ্ধা যাইবেন না। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে বাবার কথা বিস্মৃত হইয়া তিনি পাহাড়ে উঠিয়া গেলেন। তারপর শুরু হইল হৃৎপিণ্ডে তীব্র যন্ত্রণা ও স্পন্দন।

সর্বশরীর ঘর্মাক্ত, পা দুটি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা আকুল কণ্ঠে বাবাকে ডাকিতে লাগিলেন। কহিলেন, "বাবা, তোমার কথা না শুনে কি অন্যায়ই না আমি করেছি। যা হোক্ তুমি কৃপাময়, কৃপাই তোমার স্বভাবগত ধর্ম। এবারটি আমায় বাঁচাও। তাছাড়া, বাবা, তুমি তো বলেছো, কাশীতে আমার মৃত্যু হবে, এখন এই গির্ণার পাহাড়ে, বিদেশ-বিভুঁই-এ মৃত্যু হলে যে তোমারই দুর্নাম হবে। দয়া ক'রে আমায় রক্ষা করো।"

বৃদ্ধার কাতর ক্রন্দনের ফল অচিরে ফলিল। দেখিলেন, একটি গৌরকান্তি প্রৌঢ় সাধু, দেখিতে অনেকটা যোগত্রয়ানন্দেরই মতো, তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আর তাঁহাকে আশ্বাস বাক্য বলিতেছেন।

এই সাধুটিই এবার বৃদ্ধাকে কোলে তুলিয়া নিয়া পাহাড়ের উপরকার মন্দির ও অন্যান্য দর্শনীয় সব কিছু দেখাইয়া দিলেন। অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে নিচে নামাইয়াও আনিলেন। ততক্ষণে তাঁহার হৃৎপিণ্ডের বেদনা ও কাঁপুনিও একেবারে থামিয়া গিয়াছে, তিনি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। অতঃপর বৃদ্ধাটি সঙ্গিগণসহ নিরাপদে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

যোগত্রয়ানন্দকে এই অলৌকিক ঘটনার রহস্য সম্পর্কে জনৈক অন্তরঙ্গ ভক্ত এক সময়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, "আসল কথাটা কি জানো? ভগবান্ হচ্ছেন বিশ্বরূপ স্বরূপ। তাঁর যে ভক্ত তাঁকে যে রূপ দর্শন করতে ইচ্ছে করে—সেই রূপেই ভগবান্ তাকে দর্শন দিয়েই কৃতার্থ করেন। গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করাই শাস্ত্রের উপদেশ। বৃদ্ধা তা-ই করেছিলেন। আমি তো পাষাণ—কিন্তু পাষাণেও ভক্তির প্রভাবে শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি হয়।"

কিছুদিন পরে ঐ বৃদ্ধা ভক্তটির হৃদ্‌রোগ আবার বৃদ্ধি পায়, তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। তাঁহার চিরদিনের ইচ্ছা, অন্ত্যকালে যেন কাশীপ্রাপ্তি হয়। তাই অবিলম্বে কাশীতে যাওয়ার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর, এল, দত্ত বৃদ্ধার চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "এ অবস্থায় রোগিণীকে যেন নড়াচড়া করতে দেওয়া না হয়। কাশীতে যাওয়া দূরের কথা, দোতলা থেকে একতলায় নামতে গেলেই ঘোর বিপদের সম্ভাবনা। বৃদ্ধার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরাও ডাক্তারের কথা মানিয়া নিলেন, বাধা দিলেন কাশী যাওয়ার প্রস্তাবে।

অবশেষে বৃদ্ধার আগ্রহাতিশয্যে কাশীতে যোগত্রয়ানন্দের কাছে তাঁহার মত চাহিয়া তার করা হইল। উত্তরে তিনি নির্দেশ দিলেন, "যে যা বলুক, কোনো ভয় নেই, অবিলম্বে এখানে চলে এসো।"

অতঃপর স্বজনগণসহ বৃদ্ধা কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে কিছুদিনের মধ্যেই ঘটে তাঁহার অভিলষিত কাশীপ্রাপ্তি।

বহু মুমুক্ষু নরনারীকে যোগত্রয়ানন্দ দীক্ষা দিয়াছেন এবং এই সব দীক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেকে উচ্চতর সাধনমার্গে প্রবিষ্টও হইয়াছেন। দীক্ষাদানের আগে আপন যোগশক্তি সহায়ে তিনি শিষ্যের জন্মান্তরের সংস্কার এবং তাঁহার সাধনেচ্ছার আসল গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে নির্ণয় করিতেন। তারপর স্থির করিতেন তাঁহার সাধনমার্গ ও ইষ্টতত্ত্ব। শিষ্যের বহিরঙ্গ জীবনের ঝোঁক বা রুচিকে এই প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহাপুরুষ কোনোদিনই গুরুত্ব দিতে চাহিতেন না।

খড়দহের এক ভদ্রলোক কাশীতে থাকিয়া সাধনভজন করিতেন। এখানে আসিয়া একটি হরিসভার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। ভক্তিভাবের উদ্রেক হয় তাঁহার হৃদয়ে এবং ক্রমশ বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাকথা শুনিতে তাঁহার প্রবল উৎসাহ। নিত্য সন্ধ্যায় কীর্তন ও ভাগবত পাঠের

আসরে গিয়া না বসিলে মনে তিনি শান্তি পান না। সে-বার এই ভদ্রলোকটি এক সময়ে যোগত্রয়ানন্দের সন্ধান পাইয়া তাঁহার কাছে যাতায়াত শুরু করেন, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও যোগৈশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া যান।

ভদ্রলোকটি মনে মনে স্থির করেন, এই মহাপুরুষের নিকট হইতেই দীক্ষা নিবেন, তাঁহার চরণেই নিবেন একান্ত শরণ। একদিন যোগত্রয়ানন্দের কাছে নিজের প্রার্থনা তিনি নিবেদন করিলেন।

বাবাজীও সম্মতি দিলেন, "বেশ তো, তোমার যখন তীব্র ইচ্ছে হয়েছে, দীক্ষা আমার কাছে পাবে। কিছুদিনের মধ্যেই একটা দিন স্থির করতে হবে।"

দুই চারদিন পরে কথাপ্রসঙ্গে যোগত্রয়ানন্দ তাঁহাকে কহিলেন, "ওহে, তোমার তো দেখছি—শক্তিমন্ত্র। মহাশক্তিকে মাতৃরূপে উপাসনা ক'রে সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। এখন থেকেই এজন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নাও। নিজের ভেতর সন্তান ভাবটি জাগিয়ে তুলে জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করো। সব নারীমূর্তি জগজ্জননী মহামায়ার প্রকাশ, এটা অভ্যাস করো।"

ভদ্রলোকটি নীরবে কথাগুলি শুনিলেন কিন্তু কোনো উৎসাহ দেখাইলেন না। মনে তখন তাঁহার একটা ঘোরতর সংশয় আসিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবভাবে তিনি ভাবিত, বৈষ্ণবীয় রুচি তাঁহার। অথচ বাবা তাঁহাকে শক্তিমন্ত্র দিতে চাহিতেছেন। যিনি শিষ্যের অন্তরের গতিপ্রকৃতি বুঝিতে পারেন না, তাহার সংস্কার কি তাহা ধরিতে পারেন না, তিনি আবার কেমন মহাপুরুষ ?

বাবাকে তিনি অন্তর্যামী ও সর্বশক্তিমান্ বলিয়া ধরিয়া নিয়াছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে তাঁহার প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি নাই। প্রকৃত সাধন-বৈভব যাঁহার নাই এমন সাধকের কাছে তো আত্মসমর্পণ করা যায় না!

ভদ্রলোকটি যোগত্রয়ানন্দের কাছে যাওয়া-আসা প্রায় বন্ধ করিয়া দিলেন, ফলে দীক্ষার ব্যাপারটিও চাপা পড়িয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি কাশী ত্যাগ করিয়া খড়দেহে ফিরিয়া আসেন। এখানে আসার পর জীবনধারার পরিবর্তন ঘটে এবং কাশীতে হরিসভায় যাতায়াত করার ফলে যে ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল তাহা ক্রমে স্তিমিত হইয়া আসে।

দেশে থাকার সময় সে-বার ভদ্রলোকটি ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অভিজ্ঞ ডাক্তারদের বহু চেষ্টায় ফলেও তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেছেন না। বরং এই ব্যাধি ক্রমে মারাত্মক হইয়া উঠে এবং দেহের যন্ত্রণায় তিনি মৃতকল্প হইয়া পড়েন।

সেদিন গভীর রাতে অসহায়ভাবে রোগশয্যায় শুইয়াছেন, হঠাৎ দেখিলেন—শিয়রে দণ্ডায়মান এক জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি; এই মূর্তি নির্নিমেষে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন, আর আয়ত নয়ন দুইটি হইতে ঝরিতেছে দিব্য স্নেহ আর করুণার ধারা।

যেমন আকস্মিকভাবে এই মাতৃমূর্তির আবির্ভাব ঘটে, তেমনি তাহা হয় অন্তর্হিত। কিন্তু পরমবিস্ময়ের কথা, এই অন্তর্ধানের পর হইতেই ভদ্রলোকটির রোগ যন্ত্রণার উপশম ঘটে। শুধু তাহাই নয়, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

এবার যোগত্রয়ানন্দের কথা সম্পর্কে তাঁহার চৈতন্যের উদয় হয়। বাবা কেন তাহাকে শক্তিমন্ত্র দিতে চাহিয়াছেন, মাতৃরূপিণী ইষ্টের উপাসনায় কেন উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মর্ম তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন। বুঝিলেন, নিজের বহিরঙ্গ জীবনের ঝোঁক ও রুচি দিয়া নিজের আভ্যন্তরীণ সত্তাকে চিনিবার চেষ্টা করিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন। বাবার সাধনালব্ধ অন্তর্দৃষ্টি অভ্রান্ত, তাই উহা সঠিক-ভাবে তাঁহার মন্ত্র ও ইষ্ট নির্ণয় করিয়া দিয়াছে।

অতঃপর ভদ্রলোকটি কাশীতে গিয়া যোগত্রয়ানন্দের চরণতলে পতিত হন। কাতর কণ্ঠে বলেন, "বাবা, আমার অপরাধের সীমা নেই। আপনার বাক্যে আমার সংশয় এসেছিল। আপনার কৃপায় মা নিজে এসে আমার রোগযন্ত্রণা সারিয়ে দিয়েছেন, প্রাণ রক্ষা

করেছেন। আর এই কৃপালীলার মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন আপনার কথার সত্যতা। আপনি আমায় মার্জনা করুন।"

বাবাজী তাঁহাকে সস্নেহে কাছে টানিয়া নেন, নানা প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করেন। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই ভক্তটি অতঃপর সাধনজীবনে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন।

যোগত্রয়ানন্দ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ভারতের সারস্বত সমাজের মুকুটমণি ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন—"নিবৃত্তরাগস্য গৃহ তপোবনং—এই শাস্ত্রবাক্য তাঁহার ন্যায় রাগদ্বেষহীন, পূর্ণ বৈরাগ্য-সম্পন্ন কর্তব্যনিষ্ঠ গৃহস্থ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।"

আশেপাশের সাধকজনের উপর যোগত্রয়ানন্দের দূর বিস্তারী প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়া ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ লিখিতেছেন :

"বাবাজী জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। বহু দূর দেশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উচ্চাঙ্গের বিভিন্ন সাধক তাঁহার নিকট সদ্-উপদেশের জন্য উপস্থিত হইতেন। যতি, সন্ন্যাসী, অবধূত, যোগী, কর্মী, ভক্ত অনেকেই তাঁহার নিকট আসিতেন। সকলেই তাঁহার নিকট নিজ নিজ সমস্যার প্রকৃত সমাধান প্রাপ্ত হইতেন। সকল সম্প্রদায়কেই তিনি আপন বলিয়া মনে করিতেন এবং সকলকেই যথাযোগ্য উপদেশ দান করিতেন। গৃহস্থের নিকট সন্ন্যাসীর জ্ঞানলিপ্সাতে আগমন অপূর্ব, সন্দেহ নাই। কিন্তু জনক ও শুকদেবের কিংবদন্তী এই দেশে এখনও জাগরূক রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও কাশীনিবাসী মহাত্মা ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ীর সান্নিধ্যে বহুসংখ্যক জিজ্ঞাসু ও সাধনপ্রার্থী সন্ন্যাসীর ভিড় প্রায় সর্বদাই লাগিয়া থাকিত।

"আমার ব্যক্তিগত জীবনে বাবাজীর প্রভাব যে কতটা পড়িয়াছিল আজ তাহা ঠিক ঠিক নির্দেশ করা সহজ নহে, তবে তাঁহার সাহত আমার সম্বন্ধ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিব। তাঁহার কৃপাতে অনেক সময় অলৌকিকভাবে আমি দৈহিক রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। তাঁহার অযাচিত করুণায়

প্রতিদান আমি দিতে পারি নাই এবং কোনোদিন দিতে পারিব না। বুদ্ধি-সংক্রান্ত জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁহার সাহায্য অতুলনীয়— শুধু তাঁহার জ্ঞানময় জীবনের আদর্শ নহে, সাক্ষাৎভাবেও তিনি বহু জ্ঞান এই আধারে সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ জীবন, পবিত্র হৃদয়, অমায়িক স্বভাব এবং কর্মে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান-ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় আমার প্রথম যৌবনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বুদ্ধির অতীত ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান আমি নত শিরে স্বীকার করিতে বাধ্য।"

১৯২৫ সাল। স্বেচ্ছায় যোগত্রয়ানন্দ এবার কাশীধামের লীলায় ছেদ টানিয়া দিলেন। কহিলেন, "এবার বিরতির পালা। শিবের কিঙ্কর, রামের কিঙ্কর, এবার থেকে ভাব্‌বে শুধু কৈঙ্কর্যের কথা আর মুখে জপ্‌বে সুধাময় নাম।"

কলিকাতার ভক্তেরা সাগ্রহে বাবাজীর এই প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা শিরোধার্য করিলেন। প্রথমে উত্তর পাড়ায় কিছুদিন তিনি অবস্থান করেন, তারপর বরানগরের গঙ্গাতীরের এক উদ্যানে তাঁহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

কথাপ্রসঙ্গে ভক্তদের একদিন বলেন, "সর্ব তীর্থ সার এই গঙ্গাতীর। জীবনের সব কিছু চাওয়া-পাওয়া দেবো এবার বিসর্জন।

কিছুদিনের মধ্যে বাবাজী আতুর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গঙ্গার পবিত্র জল ছাড়া আর কিছু গ্রহণে তাঁহার আর রুচি নাই, ইচ্ছা নাই। পুত্র ইন্দুভূষণ ও ভক্ত-শিষ্যদের আবেদন ও মিনতি ব্যর্থ হয়। স্বেচ্ছায়, পরম আনন্দে দিনের পর দিন বাবাজী অগ্রসর হন তাঁহার বিদায় লগ্নের দিকে।

একদিন উদাস নয়নে নিস্তরঙ্গ ভাগীরথীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভক্তদের কহিলেন, "যেখানে শ্রীগুরু বাবাকে জলসমাধি দেওয়া হয়েছে, দেহত্যাগের পর এ খোলসটাকে সেখানেই তোমরা রেখে দিও।"

ভক্ত-শিষ্যেরা সাশ্রুনয়নে অনুরোধ জানান, "বাবা, আর কিছুদিন থেকে গেলে হতো না? কৃপা ক'রে তাই করুন

মৃদু হাসিয়া যোগত্রয়ানন্দ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "শ্রীগুরু বাবার চরণে নিজেকে এবার একেবারে সঁপে দিয়েছি। আর থাকা যায় না। আমায় এবার যে যেতেই হবে।"

১৯ ৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর। সেদিন গভীর রাতে মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দ সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হন, তারপর এদিক ওদিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন।

পুত্র ইন্দুভূষণ বাহিরের বারান্দায় নিদ্রিত ছিলেন, কে যেন তাঁহাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়া গেল, "আর বিলম্ব না ক'রে বাবার কাছে যাও।"

পুত্র ও ভক্তেরা নিকটে দাঁড়াইতেই প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "এখনি আমায় তোমরা গঙ্গায় নিয়ে চল।"

সবাই মিলিযা দেহটি বহন করিয়া আনিলেন গঙ্গাতটে। পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া যোগত্রযানন্দ কিছুক্ষণ ধ্যানাবিষ্ট রহিলেন। তারপর ভক্ত ও শিষ্যদের শোকসাগরে ভাসাইয়া মগ্ন হইলেন চিরসমাধিতে।

অবধূত নিত্যানন্দ

বীরভূমের একচক্র গ্রাম। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সেদিন ধীর পদে এ গ্রামের হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মস্তকে জটার ভার, গৌরকান্তি দীর্ঘবপু এই অভ্যাগতকে দেখিয়া পণ্ডিতের আনন্দের সীমা নাই। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া যুক্তকরে কহেন, "প্রভু, কৃপা করে দর্শন যখন দিয়েছেন, আজ আমাদের সেবার অধিকার দিন। এখানেই রাত্রি যাপন করুন।"

স্মিতহাস্যে হস্ত উত্তোলন করিয়া সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ জানান। বুঝা গেল, এ রাত্রির মত আতিথ্য গ্রহণে তাঁহার আপত্তি নাই। হস্ত পদ প্রক্ষালনের জল-দেওয়া হইলে তিনি আসন বিছাইয়া বসিলেন।

পণ্ডিতের বালক-পুত্র কুবের। খেলাধূলা সাঙ্গ করিয়া সবে মাত্র বাড়ী ফিরিয়াছে। ছুটিয়া আসিয়া অতিথির চরণে সে দণ্ডবৎ করিল।

সন্ন্যাসীর চোখে এ কোন্ বিদ্যুতের ঝলক? স্থির, প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে তিনি এই বালকের দিকেই চাহিয়া আছেন। কাঁচা সোনার মত তাহার রং, সুন্দর সুঠাম অঙ্গখানি লাবণ্যে ঢলঢল। চোখে-মুখে দিব্য আনন্দের আভা। হাড়াই পণ্ডিতের এ পুত্রটি মায়ামুক্ত সন্ন্যাসীকে আজ কোন্ আকর্ষণে ফেলিতে চাহিতেছে? এ কোন্ জন্মান্তরের সম্বন্ধ? আজিকার এ সাক্ষাতের অন্তরালে কোন্ গূঢ় দৈবী ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা কে বলিবে? সর্ব্বত্যাগী পরিব্রাজকের দৃষ্টি বালকের দিকে বার বার নিবদ্ধ হইতে থাকে।

পণ্ডিত ও তাঁহার স্ত্রীর সেবা-যত্নের অবধি নাই। অতিথি পরম পরিতুষ্ট হইলেন, ভগবৎ কথা প্রসঙ্গে ও আনন্দে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইল

পরের দিন প্রভাতে পণ্ডিতকে ডাকিয়া সন্ন্যাসী যাহা বলিলেন তাহাতে তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কহিলেন, "ছাখো বাবা, আমি নানা তীর্থ পর্য্যটনের জন্ম বার হয়েছি, বয়স যথেষ্ট

হয়েছে, দেখাশুনো করবার মত সঙ্গে কেউ নেই। আমি ভাবছি কি, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবেরকে আমার সঙ্গে নেব। তোমাদের কোন ভয় নেই, পুত্রাধিক স্নেহে তাকে আমি রক্ষণাবেক্ষণ করবো, তীর্থ ও ধর্ম্ম উভয়ই তার লাভ হবে—কুল পবিত্র হবে। এতে তোমার সম্মতি চাই।"

হাড়াই পণ্ডিত নিস্তব্ধ নতশির। ভাবিয়া আকুল হইলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবের তাঁহাদের নয়নমণি, তাহাকে বিদায় দিতে গেলে যে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। আবার সম্মতি না দিয়াই বা উপায় কি? সন্ন্যাসীর ক্রোধে হয়তো ইহকাল পরকাল উভয়ই যাইবে। হাড়াই নিজে ভগবদ্ভক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মপরায়ণ। কিছুটা স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, মানুষ তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তিতে পুত্রের কতটুকু কল্যাণ সাধন করিতে পারে? তবে এ শক্তিধর সন্ন্যাসীর হাতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিই না কেন? এমন যে পরাক্রমশালী রাজচক্রবর্ত্তী দশরথ, তিনিও ঋষি বিশ্বামিত্রের হাতে প্রাণপ্রিয় পুত্র দুইটিকে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

চিন্তাকুল হৃদয়ে পণ্ডিতপ্রবর পত্নী পদ্মাবতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। এ বিষয়ে তাঁহার মতও যে নেওয়া চাই। সন্ন্যাসীর এ অনুরোধের কথা তাঁহাকে জানাইলেন।

পদ্মাবতীর মনে পড়িল কয়েকদিন আগেকার এক ঘটনা। বালক কুবের হঠাৎ সেদিন এক ভাবের ঘোরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তারপর শুশ্রূষার ফলে তাহার সংজ্ঞালাভ হয়। উৎকণ্ঠিতা মায়ের প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়, "মাগো, হঠাৎ কি জানি কেন আমার চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল। তারপর সে অবস্থায় আমি স্বপ্ন দেখলাম—এক দিব্যকান্তি মহাপুরুষের সঙ্গে আমি দূর-দূরান্তের তীর্থস্থানে বেড়াচ্ছি। তারপর যে সব দৃশ্য ভেসে এল তা মনে নেই।"

মায়ের মনে পুত্রের সেই কথারই স্মৃতি আজ আলোড়ন তুলিয়া দেয়। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার তাঁহার সীমা নাই। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে স্বামীকে শুধু কহিলেন, "ওগো, ধর্ম্মের দিকে চেয়ে যা তুমি স্থির করবে, তাতেই আমার মত।"

পণ্ডিত তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব এই পুত্রকে সন্ন্যাসীর করে অর্পণ করেন। সারা গ্রামে ঘনাইয়া আসে বিষাদের ছায়া। দ্বাদশ বৎসরের বালক কুবের দণ্ড-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেদিন ঘরের বাহির হইয়া পড়েন, আর সেখানে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। পর্য্যটন, পরিব্রাজন ও অবধূত জীবনের নানা পর্যায় অতিক্রম করিয়া কুবের একদিন ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু একচাকায় নয়—নবদ্বীপে, প্রেমভক্তি প্রচারের এক প্রেরিত পুরুষরূপে। নাম তখন—নিত্যানন্দ অবধূত। শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তন নর্ত্তনে নদীয়া তখন টলমল, শক্তিধর নিত্যানন্দের আবির্ভাবে এই আনন্দের স্রোতে জোয়ার জাগিয়া উঠে। অদ্বৈত প্রভু ইঁহারই স্তুতি সেদিন গাহিয়া উঠেন :

তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি
তুমি সে চৈতন্যের বক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি।

হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে সন্ন্যাসী সেদিন বুঝিবা এক ঐশী ইঙ্গিতেই আসিয়া আবির্ভূত হন, বালক কুবেরের জীবনধারাটিকে অর্গলমুক্ত করিয়া দেন। দেশ-দেশান্তর অতিক্রম করিয়া চৈতন্য-প্রেমের সমুদ্রে আসিয়া একদিন তাহা ঝাঁপাইয়া পড়ে।

চতুর্দ্দশ শতকের কথা। একচাকা গ্রামে তখন এক সম্পন্ন ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেন। গৃহস্বামীর নাম সুন্দরমল্ল। বংশের উপাধি বাঁড়ুরী। লোকে ডাকিত ওঝা বলিয়া। যজনযাজন ও অধ্যাপনায় তাঁহার সংসার চলে, বিত্ত ও প্রতিপত্তি কোন কিছুরই তাহার অভাব নাই। কিন্তু পণ্ডিতের মনে বড় কষ্ট, সন্তান হইয়া প্রায়ই বাঁচে না। বহু পূজা আরাধনা ও শান্তি স্বস্ত্যয়নের পর এক পুত্র জন্মিল, উমা মহেশ্বরের চরণে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া নাম রাখিলেন, হাড়াই। পোষাকী নাম মুকুন্দ বাঁড়ুরী।

বিদ্যাবত্তা ও চরিত্রগুণে এ পুত্র ক্রমে খ্যাতিমান হইয়া উঠেন। বংশের তিনি একমাত্র পুত্র, বাপ-মা তাই আদর করিয়া অল্প বয়সে

তাঁহার বিবাহ দেন। সম্ভ্রান্ত বংশের সুলক্ষণা কন্যা পদ্মাবতীকে পুত্রবধূ রূপে তাঁহারা ঘরে আনেন। ইহার অল্পকাল পরেই সুন্দরমল্ল ও তাঁহার স্ত্রী লোকান্তরে চলিয়া যান।

হাড়াই পণ্ডিত নিজে শাস্ত্রবিদ্ ও ধর্ম্মপরায়ণ, পত্নীও বড় ভক্তি-মতী। ব্রত-পূজা, দান-ধ্যান ও অতিথি সৎকারে তাঁহাদের অত্যন্ত নিষ্ঠা। কিন্তু দীর্ঘদিন কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায় মনে তাঁহাদের সুখ নাই, শান্তি নাই। কিছুদিন পরে পদ্মাবতী রাত্রিতে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেন। তাঁহার নয়ন সমক্ষে যেন এক সুদীর্ঘ জ্যোতির্ম্ময় বর্ত্ম খুলিয়া গেল। জটাজুটধারী, আজানুলম্বিত-বাহু এক দিব্যপুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। প্রসন্নমধুর হাস্যে তিনি কহিলেন, "বৎসে, তোমার মনস্তাপের আর প্রয়োজন নেই। পাপী তাপী উদ্ধারের জন্য এক মহাশক্তিধর পুরুষ তোমার গর্ভে শীঘ্র জন্মগ্রহণ করবেন। তুমি দুশ্চিন্তা ক'রো না।" স্বপ্নবার্ত্তা কিন্তু সত্য হইয়া উঠে। ১৩৯৫ শকাব্দের মাঘ মাসে, শুক্লপক্ষে, ত্রয়োদশী তিথির এক শুভক্ষণে এক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এই শিশুই উত্তর কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের অন্যতম নায়ক, নিত্যানন্দ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তিন প্রভুর অন্যতম।

অনিন্দ্যসুন্দর শিশু। যে দেখে সেই তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া যায়। পিতামাতার আদরের নাম, কুবের। যথাকালে হাড়াই পণ্ডিত খুব ধুমধাম করিয়া পুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসব করিলেন। এ শিশু শুধু পিতামাতারই নয়, পাড়া-প্রতিবেশীরও যে আনন্দ-ধন। রূপে ভুবন-মোহন, মুখে আধ আধ মধুর বুলিতে ভুবন-মঙ্গল হরিনাম। সহচর-দের সঙ্গে শিশু খেলিতে যায়, মা পদ্মাবতী মোহন সাজে তাহাকে সাজাইয়া দেন, সে যেন তাঁহার এক মস্ত বড় কাজ। নিজের লালপেড়ে নীলাম্বরী শাড়ীটি কোঁচা দিয়া পরাইয়া দেন, কপালে আঁকেন শ্বেতচন্দনের ফোঁটা, চোখে মাখাইয়া দেন কালো কাজল। কুবের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়, যে একবার দেখে লাবণ্য ঢল-ঢল শিশুকে কোলে তুলিয়া বার বার আদর জানায়।

কুবের ক্রমে বড় হইয়া উঠিতে থাকে। সহচরদের সহিত যে খেলাধূলা সে করে তাহার ভঙ্গী বড় বিচিত্র। শাস্ত্র পুরাণের কথা ও কাহিনী শুনিতেই বেশী উৎসাহ। তাই আমোদপ্রমোদ ও ক্রীড়ায়ও তাহাই রূপায়িত হইয়া উঠে, কখনো রামলীলা কখনো কৃষ্ণলীলা তিনি সঙ্গীদের নিয়া অভিনয় করিয়া বেড়ান।

প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের সন্তান। শাস্ত্র বিশারদ না হইলে চলিবে কেন? মান-সম্মান ও অর্থোপার্জ্জন, সবই যে নির্ভর করে ইহার উপর। হাড়াই ওঝা পুত্র কুবেরকে তাই টোলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। মেধা ও প্রতিভার দিক্ দিয়া বালকের জুড়ি নাই, অল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণে তাঁহার ব্যুৎপত্তি হয়। বয়স যখন মাত্র বার বৎসর তখনই দুরূহ ন্যায়শাস্ত্রে কুবের পারঙ্গম হইয়া উঠে। পণ্ডিতেরা সস্নেহে তাঁহাকে ন্যায়চূড়ামণি উপাধি প্রদান করেন। অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে ইহারই উল্লেখ করিয়া লেখা হইয়াছে—"ন্যায় চূড়ামণি ইহার শাস্ত্রের আখ্যাতি, নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি।"

সবে মাত্র বার বৎসর বয়স। কিন্তু কুবেরের জীবনে যেন তখনই এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত হইতে চাহিতেছে। খেলাধূলা ও অধ্যয়নের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ কি জানি কেন সে গম্ভীর হইয়া বসে, পরিপার্শ্ব হইতে আপনাকে অবলীলায় বিচ্ছিন্ন করিয়া নেয়। গত জন্মের সাত্বিক সংস্কার এবার জীবনের দোরগোড়ায় বার বার আঘাত করিয়া ফিরে। সংসারের কোন আকর্ষণই যেন আর তাহার নাই।

পুত্রের এ পরিবর্ত্তন দেখিয়া জনক-জননীর দুশ্চিন্তার অবধি নাই। এ কি অদ্ভুত ভাবান্তর ও উদাসীনতা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে? উভয়ে ভাবিতে বসেন—পুত্রকে কি তবে তাড়াতাড়ি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিবেন? তাহাতে কি সংসারের দিকে মন একটু ফিরিবে?

ঠিক এই সময়েই হাড়াই ওঝার গৃহে ঘটে সন্ন্যাসীর আকস্মিক আবির্ভাব। কুবেরের বিবাগী মনের শিথিল বোঁটায় এ যেন দমকা হাওয়ার একটা বড় আঘাত।

সন্ন্যাসীর সঙ্গীরূপে এবার তাঁহার পরিব্রাজন শুরু হয়। দূর-দূরান্তের অরণ্যে পর্ব্বতে, দুর্গম তীর্থস্থলগুলিতে দিনের পর দিন উভয়ে পরিক্রমা করিয়া বেড়ান। পরিব্রাজক জীবনের কঠোরতায় কুবের ক্রমে অভ্যস্ত হইতে থাকেন। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও পবিত্রতার মধ্য দিয়া তাঁহার সাধনজীবনের ভিত্তিটি দৃঢ়তর হইয়া উঠে। বৎসরের পর বৎসর এরূপে অতিবাহিত হইয়া যায়। অবশেষে কুবের একদিন তাঁহার অভিভাবক-সন্ন্যাসীকে হারাইয়া ফেলেন। কিশোর সাধকের জীবনে শুরু হয় নিঃসঙ্গ পর্য্যটনের পালা।

কিছুদিন যাবৎ কুবেরের অন্তর দীক্ষা গ্রহণের জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় তাঁহার চিহ্নিত গুরু, কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে অধ্যাত্ম-জীবনের বীজটি তিনি রোপণ করিয়া দিবেন, আর জীবন তাঁহার ধন্য হইবে, এই চিন্তায় অন্তর দিনের পর দিন আলোড়িত হইতে থাকে।

নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে সেবার তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলেন। কৃষ্ণলীলার মুখ্যভূমিতে আসা মাত্র মনপ্রাণ কৃষ্ণাবেশে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। কুঞ্জগলির পথে পথে, জঙ্গলাকীর্ণ লীলাস্থলীর আনাচে-কানাচে, দিনরাত ঘুরিয়া বেড়ান। আর্ত্তিভরে খেদোক্তি করিতে থাকেন, জীবন-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণধন কোথায়? কে তাঁহাকে এ পরম সম্পদ মিলাইয়া দিবে? উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের মত সারা বৃন্দাবন তখন তিনি ঢুঁড়িয়া বেড়াইতেছেন।

সহসা একদিন নয়ন পথে পড়িল বহু শিষ্য পরিবৃত পরমভাবগত এক সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি। কৃষ্ণরসে তনুমন সদা রসায়িত। এই সন্ন্যাসী হইতেছেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী। শ্রীচৈতন্য-লীলার সহায়ক ঈশ্বরপুরী ও অদ্বৈত আচার্য্য ইঁহারই কৃপাপ্রাপ্ত।

মহাত্মার দর্শন মাত্রেই তরুণ সাধক কুবেরের সর্ব্ব অঙ্গে ভক্তি-রসের জোয়ার জাগিয়া উঠিল। ভাব-প্রমত্ত হইয়া কিছুক্ষণ মধ্যে তিনি সম্বিৎ হারাইলেন।

মাধবেন্দ্রপুরীর চোখে মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠে। কে এই বৈষ্ণব

যে সদা করে কৃষ্ণরসে অবগাহন? এই তরুণ বয়সে এমন কৃপাধন্য হইয়া উঠিয়াছে! সর্ব্বদেহে তাঁহার অষ্টসাত্ত্বিক ভাববিকার, বদন-মণ্ডলে ফুটিয়া উঠিয়াছে অপরূপ জ্যোতির আভা। ভূতলে পতিত দেহটির দিকে মাধবেন্দ্র নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন।

দীর্ঘকাল পর তরুণ সম্বিৎ পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। নয়ন-জলে বক্ষ ভাসাইয়া কহিলেন, "প্রভু, বহু ভাগ্যবলে আজ আপনার দর্শন মিলেছে। কৃপা করে এ অভাজনকে উদ্ধার করুন, আশীর্ব্বাদ করুন, আমার যেন কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।"

মহাপ্রেমিক মাধবেন্দ্রপুরী দু'হাত প্রসারিয়া তাঁহাকে করেন আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

তারপর এক শুভলগ্নে কৃষ্ণমন্ত্রে এই নবীন সাধককে করিলেন দীক্ষিত। নামকরণ হইল, নিত্যানন্দ। উভয়ের নর্ত্তন কীর্ত্তনে বৃন্দাবনে আনন্দরস উথলিয়া উঠিল। প্রেমভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ মাধবেন্দ্রের পূতসান্নিধ্য লাভ করিয়া সেদিন নিত্যানন্দের আনন্দের আর সীমা নাই। গদ্‌গদস্বরে বার বার তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তকবি এই পুরীমহারাজের প্রেম-শক্তির প্রশস্তি গাহিয়া বলিয়াছেন—

মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর,
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর।
কৃষ্ণরস বিনে আর নাহিক আহার,
মাধবেন্দ্র পুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার।[১]

মাধবেন্দ্রের কৃপাদীক্ষা[২] এ সময়ে সাধক নিত্যানন্দের জীবনে

---

১ বৃন্দাবন দাস : চৈতন্য ভাগবত

২ ভক্তিরত্নাকর ও অন্যান্য গ্রন্থে মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্য্য লক্ষ্মীপতি কর্ত্তৃক নিত্যানন্দকে দীক্ষা দানের কথা আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য-প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। মাধ্বদের দর্শন ও সাধন প্রণালীর সহিত কিন্তু শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাদৃশ্য নাই। (দ্রঃ ঃ সাধক ৮ম খণ্ড, মধ্বাচার্য্য) কাজেই নিত্যানন্দের মাধ্ব-দীক্ষার কথা যুক্তিসঙ্গত নয়।

এক নূতন রসতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দেয়। কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করিয়া আবার তিনি পর্য্যটনে বাহির হন। এবার তিনি এক স্বেচ্ছাবিহারী অবধূত। ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া কখনো রঙ্গনাথে, রামেশ্বরে, কখনো বা নীলাচলে ও গঙ্গাসাগরে ঘুরিয়া বেড়ান। কৃষ্ণরসের ঐন্দ্রজালিক মাধবেন্দ্রপুরীর স্পর্শ তাঁহার সারা সত্তাকে আজ উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। যে দেব-দেউলেই তিনি যান, আকুল হইয়া কেবলই খুঁজিয়া বেড়ান, কোথায় প্রাণ-সর্ব্বস্ব শ্রীনন্দ-নন্দন, কবে তাঁহার দর্শন লাভে এ জীবন শীতল হইবে, সার্থক হইবে?

কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল নিত্যানন্দ কিন্তু আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। এবার নিরন্তর থাকেন ভাবসাগরে নিমজ্জিত। দিবারাত্র জ্ঞান নাই, আহার নিদ্রার প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে। প্রেম সাধনার গভীর স্তরে ধীরে ধীরে হইতেছেন প্রবিষ্ট।

একান্তে প্রচ্ছন্নভাবে বৃন্দাবনে তিনি দিন যাপন করিতেছেন। হঠাৎ এ সময়ে কৃষ্ণ একদিন স্বপ্নযোগে কহেন, "অবধূত, কেন আর বৃথা এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করা? গৌড়দেশে নবদ্বীপে যাও। প্রেমভক্তির সুধাভাণ্ড হাতে করে নিমাই পণ্ডিত সেখানে আচণ্ডালে পরম সম্পদ বিতরণ করছে, তাঁর কর্ম্মে তনুমনপ্রাণ ঢেলে দাও। ভাগবতধর্ম্ম, ভগবৎপ্রেম প্রচারের তুমি যে চিহ্নিত পুরুষ। তোমার ভেতর দিয়ে এ মহাব্রত উদ্‌যাপিত হয়ে উঠুক।"

ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দ তৎক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছেন। প্রেমভক্তির উৎস-সন্ধান এবার মিলিয়াছে। সোৎসাহে তাহারই উদ্দেশে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নিত্যানন্দ সেদিন নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রথমেই নন্দন আচার্য্যের সহিত তাঁহার দেখা। দেবদ্বিজ সন্ন্যাসীর উপর আচার্য্যের অগাধ ভক্তি, অপূর্ব্ব তাঁহার

বৈষ্ণবীয় নিষ্ঠা। নিত্যানন্দের দেবদুর্লভ কান্তি, আজানুলম্বিত বাহু ও আয়তনেত্র দেখিয়া তিনি মোহিত হন এবং সযত্নে নিজ গৃহে রাখিয়া দেন। নীরবে প্রচ্ছন্ন জীবনযাপনেই অতিথির অভিলাষ। তাই তাঁহার নির্দ্দেশে আচার্য্য কাহাকেও এ সংবাদ দেন নাই।

নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গের কাছে অজানা রহে নাই। কয়েকদিন হয় প্রভু কেবলই ভক্ত পার্ষদদের বলিতেছেন, "তোমরা সবাই দেখবে, শিগ্‌গীরই নবদ্বীপ ধামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে।"

ভক্তেরা জিজ্ঞাসু হইয়া এ উহার মুখের দিকে তাকায়। কে এই মহাপুরুষ? কি তাঁহার পরিচয়? কিছুই বুঝা যাইতেছে না।

কৌতুকী প্রভু এবার ব্যাপারটিকে আরও কিছুটা স্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। কহিলেন, "তোমরা এক আনন্দের সংবাদ শোনো। কাল রাতে চমৎকার এক স্বপ্ন আমি দেখলাম। মোহন বেশধারী, অনিন্দ্যসুন্দর এক অবধূত পুরুষ আমার সম্মুখে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বদনমণ্ডল থেকে জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। তিনি বললেন, আমি আর তিনি নাকি অভিন্নহৃদয়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানালেন, আজই তিনি আমাদের দর্শন দান করবেন।"

মহাপুরুষের এ প্রসঙ্গটি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুর একি বিচিত্র রূপান্তর! ভাবাবিষ্ট হইয়া বারংবার তিনি হুঙ্কার ছাড়িতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কহেন, "ছাখো, তোমরা শিগ্‌গীর নবদ্বীপ ধামের চারিদিকে সন্ধান নাও। সেই মহাপুরুষকে অবিলম্বে বার করতে হবে। তাঁকে দেখবার জন্য আমার মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।'

ভক্তেরা ত্রস্তব্যস্ত হইয়া বাহির হন। কিন্তু বহু খোঁজখবর করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

গৌরাঙ্গ এবার নিজেই পার্ষদগণ-সহ নগরে বাহির হইলেন। স্বপ্নে দৃষ্ট মহাপুরুষকে দর্শন না করিয়া তাঁহার স্বস্তি নাই। নয়নে প্রেমাশ্রুর ধারা, সারা দেহখানি পুলকাঞ্চিত—প্রভু যন্ত্রচালিতবৎ

নবদ্বীপের রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে জুটিয়াছে বহুতর ভক্ত। নন্দন আচার্য্যের গৃহের সম্মুখে আসিবামাত্র প্রভু থামিয়া পড়িলেন। তারপর ঢুকিয়া পড়িলেন অঙ্গনে। সম্মুখে তাঁহার দণ্ডায়মান শুভ্র-কান্ত প্রেমিক পুরুষ—নিত্যানন্দ। দর্শনমাত্র প্রভু তাঁহাকে স্বগণসহ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন।

একি মহা বিস্ময়! যে পরম বস্তুর জন্য তীর্থে তীর্থে অরণ্যে পর্ব্বতে নিত্যানন্দ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়াছেন, আজ তাহা নিজে যাচিয়া আসিয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত। শুধু তাহাই নয়, প্রভু সাগ্রহে এতদিন নিত্যানন্দেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। এবার তাঁহার নিভৃতির আড়াল ঘুচাইয়া দিয়া এক মুহূর্ত্তে তাঁহাকে করিলেন আত্মসাৎ।

আনন্দাবেশে নিত্যানন্দ অধীর। অপার ঔৎসুক্যে প্রভুর ভুবন-ভুলানো রূপ দেখিতেছেন। এ রূপ দেখিয়া তাঁহার নয়ন যেন আর ফিরিতে চাহে না। বৃন্দাবন দাস এ অপরূপ রূপমাধুর্য্যের ভাণ্ডটি উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন—

বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যেন
মদন সমান।
দিব্য গন্ধ মাল্য
দিব্য বাস পরিধান॥
কি হয় কনক দ্যূতি
সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে
চাঁদের সাধ লাগে॥
দেখিতে আয়ত দুই
অরুণ নয়ন।
আর কি কমল আছে
হেন হয় জ্ঞান॥

সে আজানু দুই ভুজ
হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে যজ্ঞসূত্র
অতি সূক্ষ্ম ক্ষীণ॥

গৌরসুন্দরের পদ্মপলাশ নেত্রের দিকে চাহিয়া নিত্যানন্দ ভাবের গভীরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছেন। নির্নিমেষ নয়নে, ঋজু দেহে, তিনি একেবারে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান। প্রভু এবার ভক্তপ্রবর শ্রীবাসকে সোৎসাহে কহিলেন, "পণ্ডিত, দিব্য প্রেমাবেশ যদি দেখতে চাও, তবে নিত্যানন্দের উদ্দীপনা জাগিয়ে তোল, শিগ্‌গীর ভাগবত থেকে শ্রীনন্দনন্দনের রূপ বর্ণনা কর।"

প্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র শ্রীবাসও শ্লোক পড়িতে লাগিলেন পরম আনন্দে। —বর্হাপীড়ম্ নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্…। শ্যামসুন্দরের রূপমাধুর্য্যের বর্ণনায় নিত্যানন্দের আনন্দতরঙ্গ চকিতে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। সর্ব্বশরীরে আত্মপ্রকাশ করে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি প্রেমবিকারের চিহ্ন।

কিছুটা বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্তির পর তাঁহার নর্ত্তন কীর্ত্তন শুরু হয়, হুঙ্কার ধ্বনিতে নন্দন আচার্য্যের গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে। এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া ভক্তদের হৃদয় হয় আনন্দে উদ্বেলিত।

নিত্যানন্দ ক্রমে শান্ত হন। এবার শুরু হয় পরস্পরের কুশল-প্রশ্ন ও প্রশস্তির পালা।

পুলকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে নিত্যানন্দ কহিলেন, "প্রভু, এত তীর্থ, এত জনপদ আমি ঘুরেছি আর তোমার সন্ধান করেছি, কোথায়ও তোমায় পাই নি। অবশেষে জানলাম, তুমি নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছো, জীবের উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করেছো। তাই তো দর্শনের আশায় এখানে ছুটে এলাম।"

প্রভুও হটিবার পাত্র নহেন। সমাগত ভক্তদের সম্মুখে নিত্যানন্দের মর্য্যাদা বাড়াইয়া কহিলেন—

মহাভাগ্য দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন॥ (চৈঃ ভাঃ)

প্রেমাবেশে বিহ্বল দুই প্রভু অতঃপর পুলকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন। এখন হইতে নিত্যানন্দ হইলেন গৌরাঙ্গের প্রধান পার্ষদ, নবদ্বীপে প্রেমভক্তি আন্দোলনের অন্যতম নিয়ন্তা। বৈষ্ণব ভক্তেরা তাঁহাদের প্রাণসর্ব্বস্ব গৌর-নিতাইকে দেখিয়াছেন এক সম্মিলিত ভাবঘন বিগ্রহরূপে। বৈষ্ণব তাই কবিও প্রেমভরে গাহিয়াছেন—

দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।

পরের দিন ব্যাসপূজা হইবে। স্থির হইল, শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনেই নিত্যানন্দ এ পূজার অনুষ্ঠান করিবেন। সন্ধ্যার পরই গৌরাঙ্গ শ্রীবাস অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদিনই ভক্তগণ-সহ এখানে তিনি কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হন। আজ যেন তাঁহার উৎসাহ শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। দুয়ারে কপাট লাগাইয়া দেওয়া হয়। গৌর-নিতাইকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হয় বৈষ্ণব ভক্তদের উদ্দণ্ড কীর্ত্তন।

আজ গৌরাঙ্গের যেন উদ্দীপনার সীমা নাই। প্রেমাবেশে দেহ থর থর কাঁপিতেছে। মুখে উচ্চারিত হইতেছে সঘন হুঙ্কার। উদ্দাম নৃত্যেরও যেন আর বিরাম নাই। দিব্য লাবণ্যময় বিশাল দেহটি ভূমিতে বার বার আছাড়িয়া পড়ে—ভক্তেরা হাহাকার করিয়া উঠেন। অশ্রু কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারের প্রকাশ দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। যে কথা এতকাল লোকে শুধু শুনিয়াছে, ভক্তিশাস্ত্রে পড়িয়াছে, শ্রীবাস অঙ্গনে আজ তাহারই অপূর্ব্ব রূপায়ণ। নৃত্য শেষে ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দকে শান্ত করিয়া গৌরাঙ্গ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাত্রিযোগে নিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরেই রাহিয়া গিয়াছেন। গৌরাঙ্গের অদ্ভুত নৃত্যলীলা, ভক্তদের এই কীর্ত্তন ও জয়ধ্বনি—আজ

তাঁহাকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। হৃদয়ের প্রেম যেন উৎসটি যেন শতধারে আজ উৎসারিত, বিশ্বের সমস্ত কিছু প্লাবিত না করিয়া উহা নিরস্ত হইবে না।

প্রেমাবিষ্ট নিত্যানন্দ রাত্রিতে এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসেন। সন্ন্যাসী জীবনের পরম ধন—দণ্ড ও কমণ্ডলু দুইটি অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। অরণ্য প্রান্তরে, তীর্থে তীর্থে কম কঠোর জীবন এযাবৎ তিনি যাপন করেন নাই। চিরবাঞ্ছিত নিধি আজ বহুদিন পরে মিলিয়াছে। এবার তাঁহার নূতন জীবনের পালা। প্রেমের ঠাকুরের পাশে দাঁড়াইয়া প্রেমভক্তির প্রচারে তাঁহাকে ব্রতী হইতে হইবে। তাই তো দণ্ড কমণ্ডলুর বোঝা তিনি এমন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত সবিস্ময়ে দেখেন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ভাবাবেশে সম্বিৎহারা, সন্ন্যাস-দণ্ড ও কমণ্ডলুটি ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেছে।

সংবাদ পাইয়া গৌরাঙ্গ দ্রুতপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলেন, নিত্যানন্দ অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন, সুস্মিত আনন হইতে দিব্য আনন্দের জ্যোতি ঝরিয়া পড়িতেছে। সস্নেহে শ্রীপাদের হস্তটি ধারণ করিয়া প্রভু তাঁহাকে স্নানের ঘাটে আনয়ন করিলেন। ভগ্ন দণ্ড কমণ্ডলু তখনই গঙ্গায় বিসর্জ্জিত হইল। অবধূত নিত্যানন্দ হইলেন মহাপ্রেমিক নিত্যানন্দ—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রধান পার্ষদ।

ভাবরাজ্যের মানুষ, আনন্দ চঞ্চল নিত্যানন্দকে নিয়া ভক্তদের বিপদ বড় কম নয়। গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছেন, শিশুর মত শুরু করিলেন জলকেলি, আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। অথচ এদিকে ব্যাসপূজার সময় প্রায় হইয়া গিয়াছে।

গৌরাঙ্গ কোনমতে তাঁহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া পণ্ডিতের গৃহে নিয়া আসিলেন। সেখানে ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন করা হইয়াছে। অঙ্গন মধ্যে প্রভু ভক্তগণ-সহ কীর্ত্তনানন্দে বিভোর, আর

ঘরের ভিতরে নিত্যানন্দ ব্যাসপূজার আসনে বসিয়া গিয়াছেন। পূজা শেষে মালা অর্পণ করিয়া প্রণাম নিবেদন করিতে হইবে, কিন্তু নিত্যানন্দের সেদিকে কোন হুঁসই নাই। আবেশ-বিহ্বল হৃদয়ে মালাখানি হাতে নিয়া তিনি বসিয়া আছেন।

শ্রীবাস বার বার ব্যগ্রভাবে কহিতেছেন, "শ্রীপাদ, ব্যাসদেবের উদ্দেশে মাল্য অর্ঘ্য দিয়ে আপনি পূজা এবার সাঙ্গ করুন।"

তাঁহার একটি কথাও কিন্তু নিত্যানন্দের কানে পৌঁছে নাই। ভাবাবিষ্ট তিনি। এদিক ওদিক তাকাইয়া কেবলই কাহাকে যেন খুঁজিতে চাহিতেছেন।

উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত তখন গৌরাঙ্গকে ডাকিয়া আনিলেন। কহিলেন, "প্রভু, ত্থাখো তোমার নিত্যানন্দ পূজা সমাপ্ত করতে দিচ্ছেন না। এবার মাল্য অর্ঘ্য দেবার কথা, কিন্তু তা তাঁর হাতেই রয়ে গিয়েছে। তুমি এসে যা করবার হয় কর।"

প্রভুকে নৃত্যগীত থামাইতে হইল, তাড়াতাড়ি পূজার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। বেদীর সম্মুখে গিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, একি করছো তুমি? মালাগাছ হাতে তুলে নিয়ে এমন চুপচাপ বসে কেন? এবার ব্যাসদেবের উদ্দেশে ভক্তিভরে অর্ঘ্য দাও।"

ভাববিভোর হইয়া আছেন অবধূত নিত্যানন্দ, চোখে মুখে এক অপূর্ব্ব আনন্দের দ্যুতি খেলিয়া গেল। বহুবাঞ্ছিত প্রভু তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, হাতের এ মালা তাঁহার গলায় না পরাইয়া আর কাহার উদ্দেশে নিবেদন করিবেন? পরমানন্দে তিনি গৌরসুন্দরের গলায় পুষ্পমালাটি পরাইয়া দিলেন। সমবেত ভক্ত কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে সে অঞ্চল মুখরিত হইয়া উঠিল।

মাল্যপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই নিতাই আনন্দ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া যান। প্রভুর সে প্রেমমধুর নয়নাভিরাম রূপের বদলে একি অলৌকিক ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তি! এ ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর বিভূতিলীলা সংবরণ করিয়া গৌরাঙ্গ তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন,—

যে কীর্ত্তন নিমিত্ত করিলা
অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল
কিবা চাহ আর॥
তোমার সে প্রেমভক্তি
তুমি প্রেমময়।
বিনে তুমি দিলে কারো
ভক্তি নাহি হয়॥
আপনা সংবরি উঠ,
নিজ জন চাহ॥
যাহারে তোমার ইচ্ছা
তাহারে বিলাহ॥

প্রভু গৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্ম প্রচারের প্রধান ও চিহ্নিত পরিকর উপস্থিত! এবার তিনি স্বেচ্ছামত নাম-প্রেমধন বিলাইয়া ফিরিবেন।

করজোড়ে ভক্তি গদগদকণ্ঠে অবধূত নিত্যানন্দ সর্ব্বসমক্ষে গৌরাঙ্গের স্তবগান করিতে লাগিলেন।

এমনিতেই নিত্যানন্দ এক মহাপ্রেমিক পুরুষ—তদুপরি অন্তরে লাগিয়াছে প্রেমাবতার গৌরাঙ্গের দিব্যস্পর্শ। দিব্য ভাবের প্রবাহ তাই উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, নিত্য নূতন লীলাছন্দে নিত্যানন্দকে নাচাইয়া তুলিতেছে। এ প্রমত্ত অবস্থায় তাঁহাকে স্থির করিয়া রাখিবে কে? চৈতন্য ভাগবতের ভাষায়, এখন তিনি—

অহর্নিশ ভাবাবেশে
পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নদীয়ায় বুলে
জ্যোতির্ম্ময় ধাম॥

সেদিন অপরাহ্ণে নিমাই স্বগৃহে বিশ্রাম করিতেছেন। এমন

সময় অবধূত নিত্যানন্দ একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত। প্রেমাবেশে তিনি তখন মাতোয়ারা, দুই চোখে দরদর ধারে পুলকাশ্রু নির্গত হইতেছে। কখনো অট্টহাসি হাসিতেছেন, কখনো বা পরম উল্লাসভরে প্রভুর অঙ্গনে নৃত্য করিতেছেন। নৃত্যপরায়ণ এই দিগম্বর পুরুষকে দেখিয়া বাড়ীর মেয়েরা লজ্জায় পলায়ন করিল। নিমাই বিশ্রামরত ছিলেন, দ্রুতপদে শয়নমন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রেমোন্মাদ নিত্যানন্দকে শান্ত করিতে তাঁহার বেশী সময় লাগিল না। নিজের মস্তকের আচ্ছাদন-বস্ত্রটি তাঁহার কোমরে সযত্নে জড়াইয়া দিলেন, স্বহস্তে তাঁহাকে চন্দন চর্চ্চিত করিলেন, গলে দিলেন গন্ধপুষ্পের একগাছি মালা। অতঃপর শুরু করিলেন অবধূতের অপূর্ব্ব স্তুতি—

নামে নিত্যানন্দ তুমি
রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ
রাম মূর্ত্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ—পর্য্যটন
ভোজন ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু
নাহিক তোমার॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি
মনুষ্যের কোথা?
পরম সুসত্য—তুমি
যথা কৃষ্ণ তথা॥

প্রভু শুধু এখানেই থামিলেন না। ভিক্ষা মাগিলেন, "শ্রীপাদ, আমার বড় অভিলাষ—তোমার একটি কৌপীন কৃপা ক'রে আমায় দান কর।"

নিত্যানন্দের কৌপীনটি আনানো হইল। গৌরাঙ্গ এটি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ভক্তেরা আগ্রহ-ব্যাকুল হইয়া

প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছেন। এবার তিনি সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা সবাই এ পবিত্র বস্ত্রখণ্ড শিরে ধারণ কর। নিত্যানন্দ কৃষ্ণরসময়—তাঁর কৃপায় তোমাদের প্রকৃত কৃষ্ণভক্তির উদয় হবে।"

প্রভুর নির্দ্দেশে ভক্তেরা সোল্লাসে কাড়াকাড়ি করিয়া নিত্যানন্দের পাদোদক পান করিলেন। অবধূত কিন্তু পূর্ব্ববৎ প্রেমাবিষ্ট ও মৌনী হইয়াই আছেন, আর স্মিত হাসি হাসিতেছেন।

নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সেদিন নিত্যানন্দের মহিমার তত্ত্বটি এমনিভাবে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছিলেন। ভক্তদের বুঝিতে বাকি রহিল না—অবধূত নিত্যানন্দ শুধু প্রভুর প্রধান পার্ষদই নহেন, অভিন্নহৃদয় সখা এবং প্রধান সহকর্ম্মীও বটেন।

গৌরাঙ্গ প্রেমধর্ম্ম ও নামকীর্ত্তন যজ্ঞের প্রবর্ত্তক। জীব উদ্ধারের ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। নিবেদিত-প্রাণ ভক্তদলও চারিপাশে কম জুটে নাই। কিন্তু তাঁহার প্রেমধর্ম্ম-বাহিনীর প্রস্তুতি এতদিন সম্পূর্ণ হয় নাই—অভাব ছিল অভিযাত্রা পথে তাঁহার প্রধান এই সহকারীর। অবধূত নিত্যানন্দের আবির্ভাবে সে অভাব আজ দূর হইয়াছে। এবার যাত্রা শুরুর পালা।

নবদ্বীপের পথে পথে নিতাই এবার প্রবল উৎসাহে নাম প্রচার শুরু করিয়াছেন। নগরের লোকে বলাবলি করিতে থাকে—একে নিমাই পণ্ডিত ও তাঁহার সঙ্গীদের কীর্ত্তন-নর্ত্তনে লোকের রক্ষা নাই, তারপর এই দিব্যকান্তি, শক্তিধর তরুণ সাধক কোথা হইতে আসিয়া জুটিল? প্রেমঘনমূর্ত্তি কে এই অবধূত?

নিত্যানন্দ এখন হইতে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই বাস করেন। সর্ব্ববন্ধনমুক্ত আনন্দময় মহাপুরুষ—সদাই যেন বালকবৎ ভাব। বালচাপল্য আর আনন্দরঙ্গে সদা উচ্ছল হইয়া ফিরেন। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী দেবীকে নিতাই মা বলিয়া ডাকেন। এই বত্রিশ বৎসরের বালককে লইয়া মালিনী দেবীরও ঝঞ্ঝাটের সীমা নাই।

চাঞ্চল্য ও আবদারের নানা অত্যাচার তাঁহাকে সহিতে হয়। নিতাই নিজের হাত দিয়া কিছু খান না—মালিনী দেবীকেই তাই তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। ভক্তিনিষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিতের দৃষ্টিতে নিতাই যে পরম দুর্লভ ধন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন। তাছাড়া প্রভুর মুখে নিত্যানন্দের স্বরূপ মাহাত্ম্য তিনি শুনিয়াছেন। এ গৃহে এই মহাপুরুষ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, এ যে তাঁহার পরম সৌভাগ্য।

প্রভু একদিন কৌতুক করিয়া শ্রীবাসকে কহিলেন, "পণ্ডিত, তুমি এসব কি করছো বলতো? অজ্ঞাত-কুলশীল এ অবধূতকে তুমি ঘরে রেখেছ কেন? এর কি জাত কুল কিছুর ঠিক আছে? শিগ্‌গীর ভালোয় ভালোয় একে বিদেয় কর।"

এ যে প্রভুর এক পরীক্ষা তাহা বুঝিতে শ্রীবাসের দেরী হয় নাই। হাসিয়া কহেন, "প্রভু, তোমার ছলনা বুঝতে আমার বাকী নেই। যে তোমায় একদিনের তরেও ভালোবাসে, ভক্তি করে, সে হয় আমার প্রাণতুল্য। আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যে তোমারই অভিন্ন-স্বরূপ, তিনি যে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। আমাকে আর এসব পরীক্ষায় ফেলা কেন প্রভু?"

নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য শ্রীবাস কিছুটা বুঝিয়াছেন, একথা জানিয়া প্রভুর সেদিন আনন্দের সীমা রহিল না। স্মিত হাস্যে বর প্রদান করিলেন, "শ্রীবাস, আমি আজ তোমার প্রতি বড় প্রসন্ন হয়েছি। আমি বলছি, তোমার গৃহে দারিদ্র্য কখনো থাকবে না, আর তোমার স্বজনদের থাকবে আমার উপর অচলা ভক্তি!"

শচীমাতার কাছেও নিতাই এক অমূল্য নিধি। গৌরাঙ্গ নিজে নিতাইকে পরিচিত করিয়া দিয়া বলেন, "মা, এই তোমার হারানো ছেলে বিশ্বরূপ।" বহুদিনের চাপা দীর্ঘশ্বাস মায়ের বুক হইতে নিঃসারিত হয়, অশ্রুসজল চোখে নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁ বাবা, সত্যিই কি তুই আমার বিশ্বরূপ?"

বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিয়া নিতাই বলেন, "হ্যাঁ মা, আমিই যে তোমার সন্তান।"

নিমাই আর নিতাই—এ দুটিকে নিয়া শচীর আনন্দ ও গর্ব্বের সীমা নাই। নিতাই নূতন আসিয়াছেন বটে, কিন্তু দুইদিনেই তাঁহার পরম প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

গৌরাঙ্গ পরিকরদের সংখ্যা তখন কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে, ভক্ত সমাজের বিস্তৃতি ঘটিতেছে। প্রভু এবার নিতাই ও হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, "আজ থেকে তোমরা দু'জন জীব উদ্ধারের কাজে আমার সহায় হও। পাপ, অনাচার আর শুষ্ক ধর্ম্মাচরণে দেশ ছেয়ে গেছে। সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তোমরা কৃষ্ণনাম বিলাও। এ কাজ তোমরা ছাড়া আর কে করবে, বল? পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু সবাইর কাছে এই ভুবনমঙ্গল নাম তোমরা পৌঁছে দাও।"

প্রভুর নির্দ্দেশ পাইয়া নিত্যানন্দ মহাখুসী, ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ব্রতরূপে এ কাজকে তিনি গ্রহণ করিলেন। নবদ্বীপের পথে পথে ঘরে ঘরে সকলকে সাধিয়া বিলাইতে লাগিলেন হরিনাম। তাঁহার প্রধান সহায়ক হইলেন নামাচার্য্য যবন হরিদাস।

দুই জনেরই পরনে সন্ন্যাসীর বেশ। দেহ দীর্ঘায়ত, দিব্য লাবণ্যে ভরা রূপ প্রাণমন কাড়িয়া নেয়। উদাত্ত কণ্ঠের নাম শুনিয়া ভক্তজনেরা ধন্য হয়।

অধার্ম্মিক ও বৈষ্ণব-দ্বেষীর সংখ্যা তখন নদীয়ায় প্রচুর। নাম প্রচারক এই সন্ন্যাসীদুটিকে দেখিয়া কেহ অবজ্ঞা দেখায়, কেহ বা টিটকারী দেয়, কেহ বা মারমুখী হইয়া তাড়াইতে আসে। পরম ভাগবত নিত্যানন্দের তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া নগরময় ঘুরিয়া বেড়ান, সাধিয়া সাধিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলকে বলেন, "ভাই কৃপা করে একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কর, আমায় বিনামূল্যে কিনে নাও।"

জগন্নাথ ও মাধব নবদ্বীপের দুই প্রতাপশালী ব্যক্তি, নগরের শান্তিরক্ষার ভার রহিয়াছে ইহাদের উপর। অর্থ ও সামর্থ্যের যেমন

অভাব নাই, পাপাচার ও অত্যাচারেও তেমনি ইহাদের জুড়ি মেলানো ভার। দুই ভাই মদের নেশায় সর্ব্বদা চুর হইয়া থাকে, ভক্ত বৈষ্ণব দেখিলে উপহাস করে, অসম্মান অত্যাচার করিতেও কিছুমাত্র তাহাদের বাধে না। সমস্ত নদীয়া এই দু'জনের ভয়ে সন্ত্রস্ত।

নিতাই ও হরিদাস ইহাদের নানা কুকীর্ত্তির কথাই শুনিতে পান। দূর হইতে দুই মাতালের হুড়াহুড়িও মাঝে মাঝে তাহাদের চোখে পড়ে।

নিতাই ভাবিতে থাকেন, পাতকী উদ্ধারের জন্য গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। কিন্তু কৃপার যোগ্য এমন পাতকী প্রভু আর কোথায় পাইবেন? তাঁহার কোন শক্তি বিভূতির লীলা না দেখিয়া তো লোকে এমনিতেই উপহাস করে। জগাই মাধাইর পরিবর্ত্তন সাধন যদি করা যায়, তবে তো সকলে প্রভুর প্রভুত্ব বুঝিবে, তাঁহার জয় গাহিবে।

নিতাই সেদিন পরম ভাগবত হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভাই হরিদাস, এ দুই পাতকীর দুর্গতি তো দেখতেই পাচ্ছো। হরিনাম করার অপরাধে, মুসলমান কাজীর আদেশে, তোমার উপর কি দুঃসহ অত্যাচারই না হয়েছিল, কিন্তু তুমি তো তাদের জন্য সেদিন শুভ ইচ্ছাই জানিয়েছিলে। এবার তুমি মনে মনে একবার জগাই মাধাইর উদ্ধারের সঙ্কল্প কর, অচিরে প্রভু এদের কৃপা করবেন। তাতে দেশবাসী বুঝতে পারবে প্রভুর মাহাত্ম্য ও প্রভাব।"

হরিদাস হাসিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, একথা তোমার মুখে সাজে না। তোমার ইচ্ছা যে প্রভুরই ইচ্ছা, একথা যে আমার অবিদিত নয়। তুমি যখন একবার ভেবেছ—জগাই মাধাই উদ্ধার হলে ভাল হয়, তবে প্রভুর কৃপা থেকে তাদের আর বঞ্চিত করে কে?"

উভয়ে মিলিয়া সেদিন জগাই মাধাইর বাসগৃহের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উদাত্ত স্বরে হরিনাম কীর্ত্তন শুরু হইল। কাণ্ড দেখিয়া সকলের তো চক্ষুস্থির। এ দুই সন্ন্যাসী কি পাগল, না—মরিতে বাসনা হইয়াছে ইহাদের? কোন হিংসার কাজ, ঘৃণিত কাজ করিতে

এ দুরাত্মাদের বাধে না। কেহ কেহ সম্মুখে আসিয়া সতর্ক করিয়াও দিল—"কেন ভাই সাধ করে এ দুর্ব্বৃত্তদের ক্ষেপিয়ে তুলছো? তোমাদের কি প্রাণের মায়া নেই?"

হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া নিত্যানন্দ অগ্রসর হইয়া চলেন। সম্মুখে মূর্ত্তিমান যমদূতের মত জগাই মাধাই দণ্ডায়মান। মদের ঘোরে চক্ষু আরক্তিম, হস্তে যষ্ঠি। উত্তেজিত হইয়া কৃষ্ণনামরত দুই সন্ন্যাসীর দিকে দু'জনে ধাইয়া আসিল। কৌতুকী নিত্যানন্দের রঙ্গ বুঝিয়া উঠা ভার। বৃদ্ধ হরিদাসকে টানিয়া নিয়া উর্দ্ধশ্বাসে তিনি সেখান হইতে পলায়ন করিলেন।

রাজপথে ততক্ষণে চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী দুইটি কোনমতে প্রাণ বাঁচাইয়া ফিরিতে পারিয়াছে—একদল লোক ইহাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বিদ্রূপ করিবার লোকেরও অভাব নাই, তাহারা বলিতে থাকে, "এ পাপিষ্ঠ দুটোকে এমন করে ঘাঁটিয়ে কি লাভ বাপু, এদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে আবার এমন পালিয়ে যাওয়াই বা কেন?"

লীলাময় নিত্যানন্দের আসল স্বরূপ তাঁহার সহকারী হরিদাসের অজানা নয়। এবার কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত সয়েছি, জলে ডুবেও আবার ভেসে উঠেছি। এতদিন এতো অত্যাচার সহ্য করেও প্রাণটা কোন মতে ছিল। কিন্তু আজ দেখছি চঞ্চল অবধূতের সঙ্গী হয়ে তাও খোয়াতে হবে!"

কৌতুকী নিত্যানন্দ জগাই-মাধাই উদ্ধার লীলার ভূমিকাটি রচনা করিতেছেন। এ লীলায় গৌরাঙ্গের আবির্ভাব চাই, করুণা চাই। নইলে তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় লোকে কি করিয়া পাইবে? তাঁহার প্রভুত্বই বা জনসমাজে কি করিয়া হইবে প্রতিষ্ঠিত? প্রভুর কানে এ দুই দুরাত্মার অত্যাচারের কথা তিনি প্রথমে পৌঁছাইয়া দিতে চান। তারপর এক বড় সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে এই পাতকীতারণ লীলায় অবতরণ করাইতে চান।

আপন মনোভাব নিতাই গোপন রাখিলেন, হরিদাসের ঐ প্রণয়-কোন্দলের জের টানিয়া কহিলেন, "আমার চঞ্চলতার দোষ ধরলে কি হবে। একবার তোমার প্রভুর কথাটাও ভেবে দেখ। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে ধরেছেন তিনি রাজসিক বৃত্তি। পরিকরদের ওপর আদেশ জারি করেছেন—ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম বিতরণ করে বেড়াতে হবে। তাঁর এ আজ্ঞা পালন না করলে চলবে না, আবার দুরাত্মাদের কাছে গিয়েও আমাদের প্রাণ হবে বিপন্ন। হরিদাস, তাই বলছি, আমার দোষ না ধরে, তোমার প্রভুর কাণ্ডটাও একবার দেখে নাও।"

ভক্তজনসহ গৌরাঙ্গ সেদিন ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস দুই ভগ্নদূতের মত সেখানে আসিয়া উপস্থিত। নিত্যানন্দ জগাই-মাধাইর নানা দুষ্কর্ম্মের কথা, আজ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবনের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। তারপর কহিলেন, "প্রভু, তুমি নবদ্বীপের এই দুই মহাপাতকীকে আগে কৃষ্ণনাম নেয়াও, তবে তো লোকে তোমার মাহাত্ম্য বুঝবে। যে ধার্ম্মিক সে তো তার আপন স্বভাবেই নাম কীর্ত্তন করতে এগিয়ে আসছে। চরম পাপী যে, তাকে ভক্তি পথে নিয়ে এসো, তবে তো তোমার পাতকীপাবন নাম সার্থক হবে।"

প্রেমাবতার নিত্যানন্দের এই অনুরোধ এড়ানোর উপায় নাই। [illegible]াই উদ্ধারের জন্য কথা দিতে হইল :

হাসি বোলে বিশ্বম্ভর—
হইল উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন
পাইল তোমার॥
বিশেষে চিন্তহ
তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তার
করিবে কুশল॥

প্রেম-ভিখারী নিত্যানন্দ নদীয়ার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান, সাধু-অসাধু, ভক্ত-অভক্ত সবাইর দুয়ারে গিয়া যাচিয়া যাচিয়া নাম-প্রেম দান করেন। সেদিন কীর্ত্তন-টহল হইতে ফিরিতেছেন। সঙ্গে রহিয়াছেন সহকারী হরিদাস। দুজনেই দেখিলেন, অদূরে পানোন্মত্ত দুই ভাই জগাই মাধাই ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ ইহাদের উদ্ধারে নিতাই কৃতসঙ্কল্প। দুই বাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া তিনি উচ্চ স্বরে নামকীর্ত্তন শুরু করিলেন।

দুই পাপী প্রচণ্ড ক্রোধে ও উত্তেজনায় লাফাইয়া উঠে। এই তো নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গী সেই অবধূত—দিন নাই রাত নাই তারস্বরে হরিনাম গাহিয়া লোকের শান্তি ভঙ্গ করে। জগাই-মাধাই হরি-নামের বিরোধী, একথা সে ভালভাবেই জানে, তবুও তাহার ভয়-ডর নাই! এত বড় স্পর্দ্ধা তো নবদ্বীপের কাহারও নাই। মাধাই ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়, নিতাইর মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারে এক ভাঙ্গা কলসী।

আঘাতের ফলে নিতাইর মস্তক হইতে দরদর ধারে রক্ত ঝরিতেছে। এক হাতে তিনি আহত স্থানটি চাপিয়া ধরিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে গাহিতেছেন কৃষ্ণনাম। পথচারীর দল করুণ নেত্রে এ অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে যাইবে, এমন দুঃসাহস কাহার? দুর্ব্বৃত্তদের কোপে একবার পড়িলে যে আর নিস্তার নাই। মাধাইর এ হঠকারিতায় জগাই কিন্তু বড় চঞ্চল হইয়া পড়ে। তাই তো, এ সন্ন্যাসী তো তেমন কিছু অপরাধ করে নাই। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের দু'ভাইর তেমন কি ক্ষতি সে করিয়াছে? মাধাই এতটা নির্ম্মম না হইলেই পারিত। নিতাইর বুক বাহিয়া রক্ত ঝরিতেছে, কিন্তু দেহে মনে কোন বিকার, কোন বৈলক্ষণ্যই যেন নাই। দিব্যকান্তি পুরুষের দুই চোখে অতলস্পর্শী করুণার মহিমা! কি যেন এক অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি এই প্রেমিক সন্ন্যাসীর রহিয়াছে, জগাই তাহার অমোঘ আকর্ষণে সেই মুহূর্ত্তে বাঁধা পড়িয়া যায়।

উত্তেজিত মাধাই আবার নিতাইকে আঘাত করিতে যাইবে এমন সময় জগাই তাহাকে ধরিয়া ফেলে। দৃঢ়স্বরে কহে, "ওরে, কেন শুধু শুধু এই বিদেশী সন্ন্যাসীকে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারছিস্? এবার থাম্ তো।" মাধাইকে নিরস্ত হইতে হইল, নিত্যানন্দ একটা প্রাণঘাতী আঘাতের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন।

ইতিমধ্যে গৌরাঙ্গের নিকট এ চাঞ্চল্যকর সংবাদ পৌঁছে—নিত্যানন্দ আহত হইয়াছেন, মাধাইর নিষ্ঠুর আঘাতে তাঁহার মস্তক হইতে হইতেছে রক্তপাত। স্বগণসহ তখনি তিনি ত্বরিৎগতিতে ঘটনা-স্থলে আসিয়া উপস্থিত।

প্রাণপ্রতিম নিতাই আহত। ক্ষতস্থান হইতে দরদর ধারে রক্ত ঝরিতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া গৌরাঙ্গের ধৈর্য্যের বাঁধ সেদিন ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রোধে হুঙ্কার ছাড়িলেন, এই পাপিষ্ঠদের আজ দিবেন তিনি চরম দণ্ড।

নিতাই অগ্রসর হইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার হস্ত ধারণ করেন। প্রেম বিগলিত কণ্ঠে কহেন, "প্রভু, ক্ষান্ত হও, মাধাইর যেন দোষ হয়েছে, কিন্তু জগাই তো নিরপরাধ। বরং তার সহায়তায়ই আমার জীবন রক্ষা হয়েছে। সত্যি বল্‌ছি প্রভু, এ আঘাত ও রক্তপাতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি। কৃপা করে জগাই আর মাধাইকে আমায় তুমি ভিক্ষে দাও।"

ততক্ষণে জগাইর প্রতি প্রভুর করুণা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই তো পরম প্রিয় নিত্যানন্দের জীবন সে রক্ষা করিয়াছে। তবে তো তাহাকে প্রভুর আজ অদেয় কিছু নাই। প্রেমভরে দুবাহু বাড়াইয়া জগাইকে আলিঙ্গন করিয়া কহেন, "জগাই, তুমি আমার প্রাণসর্ব্বস্ব নিত্যানন্দের জীবন রক্ষা করেছো আজ আমায় তুমি কিনে নিয়েছ। আশীর্ব্বাদ করি, কৃষ্ণ-কৃপা তোমার ওপর বর্ষিত হোক্। আজ হতে তোমার ভক্তি লাভ হোক্।"

অপূর্ব্ব প্রভুর মহিমা, অপূর্ব্ব তাঁহার এই বর দান। সমবেত পার্ষদ ও ভক্তগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠেন। গৌরাঙ্গের দিব্য

স্পর্শে জগাইর দেহে দেখা যায় অদ্ভুত প্রেমাবেশ। মূর্চ্ছিত হইয়া তখনি সে ভূতলে পতিত হয়।

মাধাইর অন্তরেও ইতিমধ্যে তীব্র অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠে। আর সে ধৈর্য্য ধরিতে পারে না, সাশ্রুনয়নে সেও প্রভুর চরণ জড়াইয়া ধরে। বলে---এক সঙ্গে দুই ভাই এতদিন পাপ করিয়াছে, আজ কেন কৃপা বিতরণের বেলায় দুই রকমের ফল? তাছাড়া, মাধাই হয়তো অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, কিন্তু দয়াময় প্রভু তাঁহার নিজের ধর্ম্ম, দয়া-ধর্ম্ম, ছাড়িবেন কিরূপে?

মাধাইর এ ক্রন্দন ও মিনতিতে কিন্তু প্রভু টলিতেছেন না। তাহাকে কহিলেন, "মাধাই, তোমার অপরাধেব যে সীমা নেই। পরম ভাগবত নিত্যানন্দের—আমার অভিন্নহৃদয় নিত্যানন্দের রক্ত-পাত তুমি করেছ। শ্রীপাদ কৃপা করে যদি তোমায় ক্ষমা করেন তবেই তোমার রক্ষা। তুমি তাঁর চরণে ধরে পড়।"

মাধাই পদতলে পড়া মাত্রই নিতাই তাহাকে দুই হাতে টানিয়া তুলিলেন, প্রেমালিঙ্গন দিয়া তাহার সর্ব্ব অপরাধ করিলেন মার্জ্জনা। এবার প্রভুর কৃপা বর্ষণ করাইয়া দুই মহাপাপীকে শুদ্ধ করিয়া নিতে হইবে। নিতাই তাই সানুনয়ে কহিলেন—

কোন জন্মে থাকে যদি
আমার সুকৃতি।
সব দিনু মাধাইরে
শুনহ নিশ্চিত॥
মোরে যত অপরাধ
কিছু তার নাই।
মায়া ছাড় কৃপা কর
তোমার মাধাই॥ (চৈঃ ভাঃ)

অবধূত নিত্যানন্দের একি ক্ষমাসুন্দর রূপ, একি পরমমধুর প্রেমলীলা! ভক্তেরা পুলকাঞ্চিত দেহে অনিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে

চাহিয়া আছেন। মিলিত কণ্ঠের আনন্দধ্বনির মধ্যে গৌরাঙ্গ এবার মাধাইকেও করিলেন আলিঙ্গনাবদ্ধ, প্রেমভক্তি দানে তাহাকে করিলেন কৃতার্থ। জগাই-মাধাই আত্মসাৎ-এর এ লীলাটি অবধূত নিত্যানন্দের প্রভাবে সেদিন এমনি করিয়াই নবদ্বীপের ভক্তজন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল।

ক্ষমা ও আশ্বাস পাইলে কি হয়, অনুশোচনার তীব্র দহনে মাধাইর অন্তর নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। নিত্যানন্দের পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া একদিন সে কহিল, "প্রভু, আমি এমন মহাপামর যে তোমার দিব্য অঙ্গে আঘাত করেছি, রক্তপাত করেছি। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি করে হবে, কৃপা করে তাই আমায় বলে দাও।" নিত্যানন্দের চরণে একান্ত শরণ নিয়া বার বার সে তাঁহার মহিমার স্তুতি গাহিতে থাকে।

দয়াল নিতাই প্রেমপূরিত নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, দিব্য দেহের আলিঙ্গনে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া কহেন—

শিশুপুত্রে মারিলে কি
বাপে দুঃখ পায়।
এই মত তোমার
প্রহার মোর গায়॥
তুমি যে করিলে স্তুতি,
ইহা যেই শুনে।
সেই ভক্ত হইবেক
আমার চরণে॥
আমার প্রভুর তুমি
অনুগ্রহ পাত্র।
আমাতে তোমার দোষ
নাহি তিলমাত্র॥

যে জন চৈতন্য ভজে
সেই মোর প্রাণ।
যুগে যুগে আমি তার
করি পরিত্রাণ॥ (চৈঃ ভাঃ)

প্রেমাবতার নিত্যানন্দের আলিঙ্গন ও আশ্বাসবাণী পাইয়া মাধাই যেন আজ প্রাণ পায়। তাহার বুকের উপর হইতে এক বিরাট পাষাণভার নামিয়া যায়। নিতাইর চরণে নিবেদন করেন, "দয়াল প্রভু, তুমি তো আজ আমায় কোল দিয়ে উদ্ধার করলে। কিন্তু দীর্ঘ বৎসর ধরে যে কত লোকের হিংসা করেছি, কত অপরাধ করেছি, তার কোন সীমা সংখ্যা নেই। আমি তাদের আজ চিনতে পারবো কি করে? তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনাই বা জানাবো কি করে? কৃপা করে তাই আমায় বলে দাও, প্রভু।"

নিত্যানন্দ উপায় কহিয়া দিলেন, "মাধাই, তুমি আজ থেকে সর্ব্ব অপরাধ ভঞ্জনকারিণী গঙ্গার সেবা-কার্য্য শুরু কর। গঙ্গার ঘাটে সহস্র সহস্র মুক্তিকামী ভক্তের সমাবেশ হয়। তাদের জন্য ঘাট নির্ম্মাণ কর, দিনরাত গঙ্গাতীরে বাস করে ভক্তদের পদরেণু ও আশিস গ্রহণ কর।"

মাধাই এই উপদেশ পালন করিতে বিলম্ব করে নাই। স্বহস্তে এক কোদালি নিয়া সে ঘাট নির্ম্মাণে ব্রতী হয়, গঙ্গাতীরে আগত ভক্তজনের সেবায় করে জীবন উৎসর্গ। নিজের নির্ম্মিত এই ঘাটে মাধাই প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া গঙ্গা স্নান করে, দুই লক্ষ নাম জপ সমাপ্ত করে। তারপর স্নানার্থীদের চরণে ভক্তিভরে সে প্রণত হয়, কাতরে নিবেদন করে—

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত করিনু অপরাধ
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ।

এই ঘাটে বসিয়াই এক কঠোরতপা ব্রহ্মচারীরূপে সে খ্যাতি লাভ করে। আজিও নবদ্বীপে 'মাধাইর ঘাট' পাষণ্ডী মাধাইর এই দিব্য রূপান্তরের পবিত্র স্মৃতিটি বক্ষে ধরিয়া আছে।

জগাইর জীবনেও লাগে গৌর নিতাইর পুণ্য স্পর্শ, জীবনে তাহার আসে মহা পরিবর্ত্তন। উভয় ভ্রাতার একি অপূর্ব্ব বৈষ্ণবীয় আর্ত্তি আর দৈন্য। নবদ্বীপের যে কেহ ইহাদের দর্শন করে, তাহারই তু'চোখ অশ্রু সজল হইয়া উঠে। লোকে বলাবলি করিতে থাকে, ধন্য পুরুষ এই নিমাই পণ্ডিত আর তাঁহার প্রধান পরিকর, অবধূত নিত্যানন্দ। ঐশ্বরীয় শক্তি ধারণ না করিলে তুর্ব্বৃত্ত জগাই মাধাইর এমন পরিবর্ত্তন তাঁহারা কি করিয়া সম্ভব করিলেন?

এমনি করিয়া সেদিন নিত্যানন্দের কৌশল ও রঙ্গলীলা সারা নদীয়ায় গৌরাঙ্গের প্রভাবকে বিস্তারিত করিয়া দেয়।

শ্রীবাসের কুটিরে প্রতিদিন কীর্ত্তন ও অভিনয়ের নব নব রঙ্গ অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রভু গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ, এই তুই প্রেমঘন বিগ্রহকে ঘিরিয়া ভক্ত-গোষ্ঠীর আনন্দের আর সীমা নাই। নবদ্বীপে বৈষ্ণবের সংখ্যা ও শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। গৌর হইয়াছেন তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ, আর নিতাই বিরাজমান তাঁহাদের শক্তি ও প্রতিষ্ঠার উৎসরূপে। প্রভু নিতাইকে পরিকরদের সম্মুখে তাঁহার দ্বিতীয় বিগ্রহ-রূপে স্থাপন করিয়াছেন। ভক্তগোষ্ঠী ও ভক্ত সংগঠনের মধ্যে তাঁহাকে প্রধান প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে হইবে, তাই বার-বারই অন্তরঙ্গ মহলে নূতন করিয়া অবধূতের স্বরূপ ও লীলা মাহাত্ম্য তিনি তুলিয়া ধরিতেছেন।

সেদিন সন্ধ্যায় গৌরসুন্দর ভক্তজন পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণকথায় মত্ত রহিয়াছেন। অন্যতম প্রধান পার্ষদ মুরারি গুপ্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদিনকার অভ্যাসমত মুরারী প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ করিলেন। তারপর প্রণত হইলেন পার্শ্বে উপবিষ্ট অবধূত নিত্যানন্দের পদতলে।

প্রভু সব কিছু লক্ষ্য করিতেছেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠেন, "মুরারি, প্রণাম নিবেদন করতে গিয়ে তোমার কিন্তু একটা ব্যতিক্রম

ঘটলো। তোমার মত ভক্তবীরের কাছে সবাই প্রকৃত তত্ত্ব জানবে, প্রকৃত আচরণ শিখবে, এই তো আমি আশা করি। কিন্তু সেই তোমারই দেখছি সব কিছু গোলমাল হয়ে গেছে।"

মুরারি গুপ্তও হটিবার পাত্র নহেন। করজোড়ে কহেন, "প্রভু আমার যা কিছু আচার-আচরণ, সবই তো তোমারই প্রভাবে, তোমারই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আর প্রণামের যে ক্রম তুমি ভেতর থেকে শিখিয়ে দিচ্ছ, বাইরের ব্যবহারে যে তা-ই প্রকাশ পাচ্ছে।"

"ভাল, ভাল মুরারি। আজ আর বৃথা বাক্যব্যয় করে কাজ নেই। আগামী কালই সব কিছু তোমার ভেতর হয়তো স্ফুরিত হবে, প্রকৃত তত্ত্ব হবে তোমার বোধগম্য।"

সেদিনকার সভা ভঙ্গের পর মুরারি চলিয়া গেলেন। অন্তরে তাঁহার যুগপৎ হর্ষ ও ভয়ের দোলা লাগিতেছে। প্রভুর ইঙ্গিতের মর্ম্ম বুঝিয়া উঠা ভার। কি ভাবে, কোন্ তত্ত্ব তিনি স্ফুরিত করিবেন কে জানে ?

সেই রাত্রিতে মুরারি গুপ্ত এক স্বপ্ন দর্শন করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। গৌর ও নিতাই দুই প্রভু দিব্যোজ্জ্বল মূর্তিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গৌরসুন্দর এসময়ে স্পষ্টভাবে তাঁহার উপলব্ধিতে আনিয়া দিলেন—নিত্যানন্দ শুধু তাঁহার দ্বিতীয় বিগ্রহই নয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রতিম। কহিলেন, গৌরকে প্রণাম নিবেদনের আগে পরম ভক্ত মুরারি যেন নিতাইয়ের চরণে প্রণতি জানায়।

অস্ফুটকণ্ঠে বার বার নিত্যানন্দ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মুরারি গুপ্তের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভোরে উঠিয়াই তিনি প্রভুর গৃহের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। প্রভু ভক্ত-পারিষদদের মধ্যে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। মুরারি সম্মুখে গিয়া প্রথমেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, তারপর গ্রহণ করিলেন গৌরাঙ্গ প্রভুর চরণধূলি।

কৌতুকী প্রভু ভক্তদের সমক্ষে অবধূত নিত্যানন্দের মহিমা প্রচারের জন্য ব্যগ্র। স্মিতহাস্যে তিনি কহেন, "মুরারি, তোমার প্রণামের ক্রম আজ যেন অন্য রকম দেখছি।"

"প্রভু, সবই তোমার লীলা। তুমি যেমন দেখালে ও বুঝালে, সেই অনুযায়ীই তো আমায় আচরণ করতে হ'লো। তুমি স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে যে দেখিয়ে দিলে— নিত্যানন্দ তোমার জ্যেষ্ঠ।

সমবেত ভক্তদের শুনাইয়া সস্নেহে গৌরাঙ্গ কহেন, "মুরারি, তুমি আমার বড় প্রিয়, তাই তো নিত্যানন্দ-তত্ত্ব বুঝবার অধিকার তুমি পেয়েছ।"

প্রভুর কর্ম্মলীলার, কৃপালীলার প্রধান সহকারী নিত্যানন্দ। অক্রোধ পরমানন্দরূপী এই বিরাট পুরুষের কীর্ত্তন-তাণ্ডবে নদীয়া তখন টলমল। মানুষের দ্বারে দ্বারে তিনি প্রেম-ভক্তির পসরা নিয়া ফিরেন, প্রভুর প্রবর্ত্তিত মণ্ডলীর সংগঠনকে ধীরে ধীরে পূর্ণায়ত করিয়া তুলেন। এই বিরাট সংগঠন শক্তি গৌরাঙ্গের কাজীদলন লীলার পরম সহায়ক হইয়া উঠে, মুসলমান শাসনকর্ত্তার আদেশ অমান্য করিয়া এই দেশে প্রকাশ্যে ও সর্ব্বপ্রথমে কীর্ত্তন-অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়।

বহুতর লোক এখন হইতে প্রভু গৌরাঙ্গের চরণে শরণ নিতে আরম্ভ করে, বৈষ্ণব ভক্তগোষ্ঠীর আয়তনও ক্রমেই বিস্তৃততর হইতে থাকে। কিন্তু পাষণ্ড, পাপাচারী ও বৈষ্ণব বিরোধীদের সংখ্যা দেশে তখন নিতান্ত কম নয়। প্রেম ভক্তিধর্ম্মের নেতা নিমাই পণ্ডিতকে তাহারা স্বীকৃতি দিতে চাহে না। প্রকাশ্যে বৈষ্ণবদের করে নানা লাঞ্ছনা ও উপহাস, অত্যাচার করিতেও অনেক সময় দ্বিধা করে না।

প্রভু একদিন সঙ্গোপনে নিত্যানন্দকে নিকটে ডাকাইলেন। কহিলেন, "শ্রীপাদ, আমার প্রাণের ইচ্ছা— পাপক্লিষ্ট জীবকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করবো, আর তারা উদ্ধার পাবে। কিন্তু তা সফল হতে

পারছে কই? হিংসা ও দ্বেষের আগুন ছড়িয়ে নিন্দুকেরা আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে বেড়াচ্ছে। এর একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে আমার সন্ন্যাস গ্রহণ। সংসারের ভোগ সুখ একেবারে ত্যাগ না করলে সংসারের জীব আমায় তো প্রীতির চোখে তেমন দেখবে না, আমার কথারও মূল্য তারা দেবে না।"

নিত্যানন্দের শিরে এ যেন এক আকস্মিক বজ্রাঘাত। রুদ্ধবাক্ হইয়া করুণ নয়নে তিনি প্রভুর দিব্য মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আছেন।

প্রভু বুঝিলেন, তাঁহার বিচ্ছেদের এ পূর্ব্বাভাস নিত্যানন্দের প্রাণে কি তীব্র আঘাত হানিয়াছে। সান্ত্বনার সুরে, প্রেমপূরিত কণ্ঠে তাঁহাকে কহিলেন,—"শ্রীপাদ, ভেবে ছাখো, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কোন শত্রু নেই। আমি সেই সন্ন্যাসী হয়ে কেঁদে কেঁদে লোকের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম ভিক্ষে করবো। তাহলে তো আর তারা নাম প্রচারে বাধা জন্মাতে আসবে না? কাজেই আমার সন্ন্যাসের কথায় তুমি এমন ভেঙে পড়ো না।"

নিত্যানন্দ তবুও নিরুত্তর। একি মহা দুর্দ্দৈবের কথা আজ তাঁহাকে শুনিতে হইতেছে? কোন মুখে তিনি প্রভুর এ নিষ্ঠুর প্রস্তাবে সম্মতি দিবেন?

প্রভু এবার তাঁহার শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, স্বীয় আবির্ভাবের নিগূঢ় কারণটি জানাইয়া অবধূতকে কহিলেন—

ইথে তুমি কিছু দুঃখ
না ভাবিও মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে
সন্ন্যাস কারণে॥
... ...
জগৎ উদ্ধার যদি
চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি
করিবে আমারে॥

এতক্ষণে নিত্যানন্দ মুখ খুলিলেন। সজল চক্ষে প্রেম গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "প্রভু, তুমি স্বেচ্ছাময়। যে সিদ্ধান্ত তুমি মনে মনে স্থির করেছ তার অন্যথা করবে এমন শক্তি কার আছে? তোমার বিহনে ভক্তদের কি গতি হবে, শচী-মা আর বিষ্ণুপ্রিয়ার কি মর্ম্মান্তিক অবস্থা হবে, তাই আমি কেবল ভাবছি। তোমার এই জীব-উদ্ধারলীলার গতিপ্রকৃতি অবশ্য শুধু তুমিই জানো। সন্ন্যাস নেওয়া যখন স্থির করেই ফেলেছ, তখন তাই হোক। কিন্তু তোমার মনের কথাটি অন্তরঙ্গ ভক্তদের একবারটি জানাও, তারা অন্ততঃ প্রস্তুত হয়ে নিক্।"

নিত্যানন্দের এ অনুরোধ গৌরাঙ্গ অগ্রাহ্য করেন নাই। তাই পার্ষদদের মধ্যে কয়েকজন এ আসন্ন বিচ্ছেদের কথা সেদিন জানিতে পারিয়াছিলেন।

প্রভুর গৃহত্যাগের দিনটি অবশেষে আসিয়া যায়। ভক্তদের প্রেম-বন্ধন, স্নেহময়ী জননীর আকর্ষণ ও পত্নীর প্রণয়পাশ ছিন্ন করিয়া তিনি পথে বাহির হইয়া পড়েন। কাটোয়া নগরে পরম ভাগবত সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর আশ্রম। এই মহাপুরুষের নিকট তিনি সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। নব নামকরণ হইল—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। এ সময়ে তাঁহার সঙ্গী হইবার অধিকারী হন অবধূত নিত্যানন্দ, গদাধর ইত্যাদি পঞ্চ পার্ষদ।

কাটোয়ায় গিয়া দীক্ষা গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যের প্রেমসিন্ধু যেন উত্তাল, দুর্ব্বার হইয়া উঠে। মহাভাবরসে সদা তিনি মাতোয়ারা। হৃদয়ে তাঁহার নিরন্তর পশিতেছে নীলাচলনাথ দারুব্রহ্মের অমোঘ আহ্বান। তাই ব্যাকুলভাবে এবার তিনি মহাধাম নীলাচলের দিকে ধাবমান হইলেন।

চির বিদায়ের আগে জননী ও ভক্তদের সহিত প্রভু একবার সাক্ষাৎ করিতে চান। তাই নিত্যানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, আমি আর নবদ্বীপে ফিরবো না, শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের ভবনে অপেক্ষা করবো। তুমি নিজে গিয়ে জননী ও ভক্তদের সংবাদ দাও।"

নিত্যানন্দ নবদ্বীপে পৌঁছা মাত্র ভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া যায়। প্রভুর সংবাদের জন্য সকলেই মহা ব্যগ্র। সকলকে আশ্বস্ত করিয়া নিতাই শচীমাতার চরণ বন্দনা করিতে যান। প্রভুর গৃহের দৃশ্য দেখিয়া সেদিন তাঁহার পক্ষে আত্মসম্বরণ করা কঠিন হয়। পুত্রশোকে মাতা উন্মত্তা-প্রায়, নিরন্তর তিনি বিলাপ করিতেছেন, বারো দিন যাবৎ কোন আহার্য্যই গ্রহণ করেন নাই। বিরহবিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ মূর্ত্তি দেখিয়া অশ্রুরোধ করা যায় না। নিত্যানন্দ উভয়কে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তারপর শচীমাতাকে কহিলেন, "মাগো, তোমার উপবাসে যে কৃষ্ণও উপবাসে থাকেন। তুমি স্থির হয়ে উঠে ব'স, ভোগান্ন প্রস্তুত কর। আমি ক্ষুধার্ত্ত, তোমার হাতের প্রসাদান্ন খেতে আমার বড় অভিলাষ হয়েছে। আমার সঙ্গে আজ ভক্তেরাও তোমার এখানে প্রসাদ পাবেন।"

নয়নাশ্রু মুছিয়া শচী রন্ধন শুরু করিলেন। সেদিন প্রভুর গৃহে নিত্যানন্দ ও ভক্তদের আহার সম্পন্ন হইল, শচীদেবীও উপবাস ভঙ্গ না করিয়া পারিলেন না। তারপর শচীমাতা ও ভক্তগণসহ নিত্যানন্দ অদ্বৈতের গৃহে উপনীত হইলেন। শান্তিপুরে সেদিন আনন্দের বান ডাকিয়া উঠিল।

জননী ও ভক্তদের নানাভাবে প্রবোধ দিয়া চৈতন্য এবার পুরীর পথে পা বাড়াইলেন। সঙ্গী শুধু অন্তরঙ্গ ভক্ত ও পার্ষদগণ।

নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে সুবর্ণরেখার তটে আসিয়া পৌছিলেন। প্রভু তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, আর ভক্তেরা আসিতেছেন কিছুটা পিছনে। এ সময়ে নিত্যানন্দ এক দুঃসাহসী কাজ করিয়া বসেন।

প্রভু প্রায়ই ভাবাবিষ্ট ও অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় থাকেন, সন্ন্যাসদণ্ডটি ঠিকমত হাতে রাখিতে পারেন না। এজন্য পণ্ডিত জগদানন্দকেই এটি সন্তর্পণে বহন করিতে হয়। সেদিন পণ্ডিত ভিক্ষায় বাহির হইবেন, প্রভুর দণ্ডটি নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, প্রভুর এ সন্ন্যাসদণ্ড তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, এটা কিন্তু খুব সাবধানে রাখতে হবে। আমি গ্রাম থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করে এখনই ফিরে আস্‌ছি।"

নিত্যানন্দ তখন ভাবাবেশে বিভোর, কখনো বা থাকেন অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায়। প্রভুর দণ্ডটি হাতে আসিতেই চেতনা ফিরিয়া আসে, চিন্তা করিতে থাকেন, জীব উদ্ধারের জন্য প্রেমাবতার প্রভুর আবির্ভাব। তাঁহার আবার এ দণ্ড কমণ্ডলু বহন করা কেন? হঠাৎ কি এক অদ্ভুত উদ্দীপনা তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত হয়, হস্তস্থিত দণ্ডটি তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন, নদীর জলে দেন তাহা বিসর্জ্জন।

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত জগদানন্দের তো চক্ষুস্থির! ভাবপ্রমত্ত অবস্থায় নিত্যানন্দ এ কি সাংঘাতিক কাজ করিয়া বসিয়াছেন? প্রভুর সন্ন্যাসদণ্ড যে এক পরম পবিত্র বস্তু। এটি ভগ্ন হইয়াছে দেখিলে যে তিনি তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিবেন। পণ্ডিত সঙ্কোচে ভয়ে জড়সড় হইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই প্রভুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ। দণ্ডটি ভগ্ন দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "কার এমন সাহস, কে আমার দণ্ডের এই দুরবস্থা করেছে?"

নিত্যানন্দ তখনও ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "প্রভু, এ কাজ আমারই। যদি ইচ্ছা হয়, তুমি দণ্ড বিধান কর!"

নিত্যানন্দের একথা শুনার পর প্রভুকে রোষ সম্বরণ করিতে হইল। সর্ব্ব পাশমুক্ত অবধূতের এ আবার কোন্ বিচিত্র লীলা, কে বলিবে? তাছাড়া, চৈতন্য যে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মান

দিয়া থাকেন। তাই ভাবের ঘোরে দণ্ড ভাঙ্গার জন্য তাঁহাকে ভৎর্সনা করারই বা উপায় কই?

প্রভু শুধু কহিলেন, "এ পৃথিবীতে একমাত্র এ দণ্ডটিই ছিল আমার প্রধান অবলম্বন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় আজ তাও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ভালই হ'লো। এবার আর কারুর সঙ্গেই আমার কোন সম্পর্ক রইলো না। এখন থেকে আমি একলাই পথ চলবো, আর তোমরা সবাই যদি নীলাচলে যেতে চাও—পৃথকভাবে এসো।"

এ ব্যবস্থাই ভক্তদের আপাতত মানিয়া নিতে হইল। প্রভুকে আগে যাইতে দিয়া ভক্তেরা তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন।

জলেশ্বর গ্রামে শিবের এক জাগ্রত বিগ্রহ বর্ত্তমান। এখানে পৌঁছিয়াই প্রভু নবভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। কীর্ত্তন ও উদ্দণ্ড নর্ত্তনের ফলে সেখানে লোকের ভীড় জমিয়া যায়।

ইতিমধ্যে অনুসরণকারী পরিকরগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভক্তপ্রবর মুকুন্দের সুললিত কীর্ত্তন ও ভাবাবিষ্ট প্রভুর নৃত্যে এক আনন্দের হাট বসিয়া গেল।

শ্রীচৈতন্যের অন্তর পরম প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠে। সন্ন্যাসদণ্ডটি ভাঙ্গার ফলে যা কিছু উষ্মার সঞ্চার হইয়াছিল, এতক্ষণে তাহা দূর হইয়াছে। এবার নিত্যানন্দকে নিকটে আহ্বান করিয়া প্রেমপূরিত কণ্ঠে অনুযোগ দিলেন—

কোথা তুমি আমারে
করিবে সংবরণ।
যেমতে আমার হয়
সন্ন্যাস রক্ষণ॥
আরো আমা পাগল
করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর তবে
মোর মাথা খাও॥

যেন কর তুমি আমা
তেন আমি হই।
সত্য সত্য এই আমি
সভাস্থানে কই ॥

প্রভুর শ্রীমুখের এ কথা কয়টিতে অবধূত নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য ও তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চৈতন্য একাকী সবার আগে নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিলেন। জগন্নাথ মন্দিরে সেদিন দেখা গেল অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। শ্রীবিগ্রহ দর্শন মাত্রেই প্রভু প্রেমোদ্বেল হইয়া উঠিয়াছেন, সর্ব্বদেহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বল্পকাল মধ্যেই দিব্যকান্তি দেহখানি সম্বিৎহারা হইয়া ধূলায় লুটাইতে থাকে। রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম এই সময়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে উপস্থিত। তরুণ সন্ন্যাসীর অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। পরিহারীদের সাহায্যে তাঁহাকে তিনি সযত্নে নিজ আলয়ে নিয়া গেলেন।

নিত্যানন্দ ও অপর সঙ্গীরা পিছনে পড়িয়াছিলেন, এবার প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। চৈতন্য ও তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তদের পরিচয় পাইয়া সার্ব্বভৌমের আনন্দের অবধি রহিল না। চৈতন্য ও নিত্যানন্দ এই উভয়কেই তিনি পরম যত্নে তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করাইলেন।

ভাবের মানুষ নিত্যানন্দকে সামলাইয়া চলা বড় কঠিন। কখনো তাঁহার প্রেমাবেশ উদ্দাম হইয়া উঠে, কখনো বা উদ্দণ্ড নর্ত্তন-কীর্ত্তন ও হুঙ্কারে তিনি সকলকে সচকিত করিয়া তুলেন। একদিন তো ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি জগন্নাথ মন্দিরে এক প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াই বসিলেন। মন্দিরের গর্ভগৃহে দাঁড়াইয়া নিত্যানন্দ সেদিন সঙ্গীগণ সহ কীর্ত্তন করিতেছেন। অকস্মাৎ মহাভাবে উদ্দীপিত হইয়া পড়িলেন। প্রেম-প্রমত্ত অবধূতের হুঙ্কারে সবাই ভীত চকিত হইয়া উঠিল। ভাবের ঘোরে প্রচণ্ড বিক্রমে তিনি ছুটিলেন জগন্নাথ-

বলরাম বিগ্রহদ্বয়কে আলিঙ্গন করিতে। মন্দির পরিহারীরা সবাই ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিল, কিন্তু তাঁহাকে ঠেকানো গেল না। বেদীর উপর আরোহণ করিয়া অবধূত নিত্যানন্দ বলরাম-বিগ্রহকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন, আর তাঁহার মালাগাছ তুলিয়া নিয়া নিজের গলায় পরিলেন। ঈশ্বরীয়ভাবে তিনি তখন উদ্দীপিত, আননখানি দিব্য আনন্দের ছটায় উদ্ভাসিত। ভক্ত ও পরিহারীদের জয়ধ্বনিতে শ্রীমন্দির মুখরিত হইয়া উঠিল।

নিত্যানন্দের এই প্রেম-প্রমত্ত ভাব এ সময়ে নীলাচলবাসীর বিস্ময় উদ্রেক করিতে থাকে। চৈতন্যের প্রধান পার্ষদরূপে সর্ব্বত্র তিনি হন অসামান্য মর্য্যাদার অধিকারী।

চৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন; ভক্ত পার্ষদদের কাহাকেও সঙ্গে নিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। সবাইকে কহিলেন, সেতুবন্ধ হইতে তিনি না ফিরিয়া আসা অবধি তাঁহারা সবাই যেন নীলাচলেই অপেক্ষা করেন। নিত্যানন্দ প্রমাদ গণিলেন। কহিলেন, “সে কি কথা প্রভু, একাকী তোমার যাওয়া কি করে হয়? তোমার প্রায়ই কোন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, কখন কি বিপদ ঘটে তা কে জানে? কাউকে তোমায় সঙ্গে নিতেই হবে। দক্ষিণের পথঘাট সব আমার চেনা, সেখানকার তীর্থগুলো আমি পরিক্রমণ করে বেড়িয়েছি। আমাকেই তোমার সঙ্গে যেতে দাও।”

চৈতন্য এ প্রস্তাবে রাজী নন, এই ভ্রমণ সময়ে তাঁহাকে বহুতর কার্য্য সাধন করিতে হইবে, বহুলোককে উদ্ধার করিতে হইবে, এ সময়ে মুক্ত ও স্বতন্ত্র হইয়াই তিনি চলিতে চাহেন। নিত্যানন্দের স্নেহবন্ধনে নিজেকে জড়িত রাখা তাঁহার মনঃপূত নয়—

প্রভু কহে আমি নর্ত্তক
তুমি সূত্রধার।
যৈছে তুমি নাচাহ
তৈছে নর্ত্তন আমার॥

সন্ন্যাস করি আমি
চলিলাম বৃন্দাবন।
তুমি আমা লৈয়া
আইলা অদ্বৈত ভবন॥
নীলাচল আসিতে তুমি
ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড।
তোমা সবার গাঢ় স্নেহে
আমার কার্য্য ভঙ্গ।

সঙ্গীরূপে অন্য কোন ভক্তকে গ্রহণের প্রস্তাবও তিনি উড়াইয়া দিলেন। এবার নিত্যানন্দ মিনতি করিয়া কহিলেন, "বেশ কথা, আমরা অন্তরঙ্গের দল না হয় নাই গেলাম, কিন্তু পরিচারক ও সঙ্গী হিসাবে একজন কাউকে তোমায় নিতেই হবে। তুমি সদাই থাকবে প্রেমাবেশে বিভোর, দুই হস্ত থাকবে কীর্ত্তন বা নামজপে ব্যাপৃত, কৌপীন-বহির্ব্বাস ও জলপাত্রই বা বহন করবে কে, কে-ই বা এসব দেখাশুনা করবে? ভক্তসরলপ্রাণ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস এখানে রয়েছে ও তাকেই আমরা তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, অন্ততঃ একে নিতেই হবে।"

নিত্যানন্দের এ অনুরোধ এড়ানোর উপায় রহিল না। অগত্যা প্রভু স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, তবে তাই হোক, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।"

প্রভু দাক্ষিণাত্য ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের পর শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সেদিনকার এই দীর্ঘ পরিক্রমার উদ্দেশ্যটি কম তাৎপর্য্যপূর্ণ ছিল না। ব্রজরসতত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ রামানন্দ রায়কে তিনি এ উপলক্ষে আত্মসাৎ করিলেন, প্রেমধর্ম্মের বীজ সারা দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতে বপন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

মহাধাম নীলাচলে চৈতন্যের লীলানাট্যের মঞ্চটি ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছে। ভারতের দূর-দূরান্তে পাদ-পরিক্রমা করিয়া তিনি লক্ষ লক্ষ লোককে কৃষ্ণনামে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, এবার তাঁহার দৃষ্টি

পড়িল মাতৃভূমি গৌড়ের উপর। এখানকার জনসমাজে তান্ত্রিক প্রভাব বড় প্রবল। নব্যন্যায়ের তর্ক ও কচকচিতে পণ্ডিতসমাজ সদাই থাকে অতিমাত্রায় মুখর। সাধারণ মানুষের জীবনে নীতিধর্ম্ম ও শরণাগতির চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া ভার। তাই নিজের এই আবির্ভাবভূমিতে তাঁহার নব-ধর্ম্ম প্রচার না করিলে চলিবে কেন? সারা গৌড়দেশকে মন্থন করিয়া প্রেমভক্তির অমৃত উৎসারিত করিতে প্রভু ব্যগ্র হইলেন।

কিন্তু এই বিরাট কাজের ভার তিনি কাহাকে দিবেন? প্রভু নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে পুরীধামে বাস করিতেছেন। উচ্চকোটির ভক্ত ও সাধকদের অনেকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হইয়াছেন সন্ন্যাসী। অনেকেরই ধারণা, প্রভুর প্রকৃত অনুগামী হইতে হইলে বুঝি গার্হস্থ্য অবলম্বন না করাই ভাল।

অদ্বৈত অবশ্য গৃহীরূপেই গৌড়ে অবস্থান করিতেছেন। প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্ম্মজ্ঞ ও ব্যাখ্যাতা রূপে তিনি পরিচিত। গৌড়ীয়া ভক্তসমাজ তাঁহার মত মহাপুরুষকে পাইয়া ধন্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অদ্বৈত বৃদ্ধ হইয়াছেন, এই বিরাট বৈষ্ণব সংগঠনের ভার নিবার মত বয়স তাঁহার নাই। তাছাড়া, গৌড়দেশে জ্ঞানপন্থী পণ্ডিতের ছড়াছড়ি। ইহাদের আত্মসাৎ করিতে হইলে প্রেমঘন মূর্ত্তি নিতাইর মতন নেতারই প্রয়োজন। প্রভু তাই মনে মনে ভাবিলেন, এ গুরুভার নিত্যানন্দকেই দিবেন।

নিতাই প্রভুর অভিন্নহৃদয় সহকারী। ভক্তগণ তাঁহাকে প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর বলিয়া ভাবিয়া নিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। নব ভাবের উদ্বোধন ঘটাইতে, নবগঠিত বৈষ্ণবসমাজে নূতন উদ্দীপনা নূতন রসতরঙ্গ সৃষ্টি করিতে, তাঁহার মত সমর্থ পুরুষ আর কে আছে? বলা বাহুল্য সিদ্ধান্ত স্থির করিতে প্রভুর দেরী হইল না।

নিত্যানন্দকে একদিন বিরলে ডাকিয়া নিয়া কহিতে লাগিলেন, "শ্রীপাদ, আমার দুঃখের অবধি নেই। আমি নিজমুখে ঘোষণা করেছি, বিদ্বান মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, ধনী দরিদ্র সবাইকে কোলে টেনে

নেব, হরিভক্তি ও প্রেমধর্ম্ম বিতরণ করবো। কিন্তু তার তো উপায় দেখছিনে। আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, গৃহস্থদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আর রইলো না। তুমিও যদি সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ ছেড়ে দিয়ে উদাসীন হয়ে থাকো, তবে পতিত অভাজনদের গতি কি হবে? তাদের উদ্ধার কে করবে? তুমি নিজেকে এমন করে সম্বরণ করে রাখলে তো চলবে না। শ্রীপাদ, আমার কথা রাখো। তুমি গৌড়দেশে ফিরে যাও, সেখানে গিয়ে সংসারী হও, সংসারের উষর ক্ষেত্রে প্রেমভক্তির অমৃত প্রবাহ নামিয়ে আনো।"

এ কি নির্ম্মম আদেশ! প্রভুর কথা কয়টি শুনা মাত্র নিত্যানন্দ মর্ম্মাহত ও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এ যেন এক আকস্মিক বজ্রাঘাত। অতি অল্প বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াছেন। সন্ন্যাস ও অবধূত জীবনের মধ্য দিয়া ভাগবত প্রেমের পরম মাধুর্য্য খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। পূর্ব্বতন জীবনের সমস্ত কিছু মহান আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়া শেষকালে বিবাহ করিতে হইবে, গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করিতে হইবে?

একথাও নিতাই বুঝিয়া নিয়াছেন, প্রভুর জীব উদ্ধার ব্রতের তিনি এক বড় সহায়ক। এ ব্রত সাধনের জন্য যে কোন প্রকার দুঃখ-বরণে বা ত্যাগ স্বীকারে তিনি পরাঙ্মুখ নন, ইহাও সত্য। প্রভুর আজিকার আদেশ সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন। নিতাইর কাছে ইহা যতই অনভিপ্রেত হোক, তাহা অমান্য করার প্রশ্ন উঠে না। তাই অবনত শিরে এ নির্দ্দেশ তিনি গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বজনবন্দিত অবধূত নিত্যানন্দ সেদিন প্রভুর দেওয়া শৃঙ্খল বন্ধন স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

নিতাই এবার গৌড়ের পথে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে তাঁহার রহিয়াছেন প্রেমধর্ম্ম প্রচারের উপযুক্ত ভক্তদল—রামদাস, গদাধরদাস, সুন্দরানন্দ, পরমেশ্বর দাস, পুরুষোত্তম দাস ইত্যাদি।

নিত্যানন্দ নূতন উদ্দীপনায় উন্মত্ত, রসাবেশে আনন্দচঞ্চল। ভক্ত পরিকরদের মধ্যেও তিনি এসময়ে এক বিস্ময়কর অলৌকিক

শক্তি সঞ্চারিত করেন। তারপর ভাববিহ্বল সঙ্গীদলসহ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে গৌড়ে আসিয়া উপস্থিত হন।

গৌড়দেশে সেদিন নিত্যানন্দের প্রকাশ ঘটে প্রেমদাতা 'দয়াল নিতাই' রূপে। ভুবনমোহন তাঁহার দিব্যকান্তি, উল্লাসময় তাঁহার নর্ত্তন-কীর্ত্তন, প্রেমে বিগলিত ঘন তাঁহার নয়নের অশ্রু আর অদ্ভুত তাঁহার সাত্ত্বিক বিকার। এই অলৌকিক পুরুষের সান্নিধ্যে আসিয়া ভক্তেরা সাক্ষাৎভাবে ভাগবত প্রেমের স্পর্শ অনুভব করে, তাঁহার দিব্য প্রেম দর্শনে নরনারী সেদিন উদ্বেল হইয়া উঠে, তাঁহার দৃষ্টি সম্পাতে ও করস্পর্শে হয় প্রেম প্রমত্ত। সেদিনকার গৌড়ে প্রেমাবতার নিত্যানন্দ-প্রভু যেন ভাগবতী সাধনার এক শতদলরূপে বিরাজিত, আর তাহার মধুলোভে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে দূর দূরান্তের ভক্তদল।

নিত্যানন্দের এ সময়কার বর্ণনা দিতে গিয়া, তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও করুণার কথা তুলিয়া বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

যাহারে করেন দৃষ্টি
নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া
পড়েন পৃথিবীতে॥

এ এক অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারণ। নাচিয়া গাহিয়া কাঁদিয়া ও হুঙ্কার ছাড়িয়া নিত্যানন্দ সেদিন সারা গৌড়ে অপূর্ব্ব প্রেমতরঙ্গের সৃষ্টি করিলেন।

সেদিন তিনি পানিহাটি গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। চারিদিকে বহুসংখ্যক পার্ষদ ও ভক্তদলের ভীড়। অবিরাম ধারায় কীর্ত্তনানন্দ চলিয়াছে। হঠাৎ তিনি ঈশ্বরীয় ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। ভক্তদের আদেশ দেন, এখনি তাঁহাকে সাড়ম্বরে অভিষেক করাইতে হইবে। ভারে ভারে গঙ্গাজল আনয়ন করিয়া নিত্যানন্দের অভিষেক সম্পন্ন হয়। বনমালা গলে, চন্দনচর্চ্চিত দেহে

খট্টার উপর তিনি উপবিষ্ট, আর রাঘব পণ্ডিত তাঁহার শিরে ছত্র ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তদের কীর্ত্তন ও উল্লাস ধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রাঘব পণ্ডিতের গৃহে লীলাকৌতুকী নিত্যানন্দ সেদিন এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটান বলিয়া জনশ্রুতি আছে। পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া সহাস্যে স্মিত হাস্যে কহেন, "পণ্ডিত, শিগ্‌গীর আমার জন্য এক ছড়া কদম্বমালা গেঁথে আনো, কদম্ব যে আমার সব চাইতে প্রিয়।"

রাঘব মহা বিপদে পড়িলেন। এ অসময়ে কদম্বপুষ্প কোথায় পাইবেন? জোড়হস্তে বার বার একথা নিবেদন করিয়াও নিষ্কৃতি পাইলেন না। নিত্যানন্দ গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, "পণ্ডিত, ছাখোনা একবার বাড়ীর ভেতর গিয়ে। খোঁজ নাও। হঠাৎ কোথাও এ ফুল ফুটে থাকতেও তো পারে।"

সত্যই তো। রাঘব পণ্ডিত দেখিলেন, গৃহকোণের এক লেবুগাছে গুটিকয়েক কদমফুল ফুটিয়া আছে। বিস্ময় বিমূঢ় রাঘব কোনমতে আত্মসম্বরণ করিয়া মালা গাঁথা শেষ করিলেন, তারপর সর্ব্বসমক্ষে এটি পরাইয়া দিলেন নিত্যানন্দের গলায়।

সেদিনকার কীর্ত্তনে নিত্যানন্দ আরও একটি অলৌকিক লীলা বিস্তার করেন বলিয়া শোনা যায়। কীর্ত্তনরত ভক্তদের নাসিকায় হঠাৎ দমনক পুষ্পের তীব্র সুবাস প্রবেশ করিতে থাকে। বিস্মিত হইয়া সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতেছেন। নিত্যানন্দ এ রহস্যের মর্ম্ম কহিলেন—

চৈতন্য গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন॥
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা॥
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য দমনক গন্ধে।
চতুর্দ্দিক পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে॥

তোমা সবাকার নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে।
আপনে আইসে প্রভু নীলাচল হৈতে॥
এতেকে তোমরা সর্ব্ব কার্য্য পরিহরি।
নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপনা পাসরি॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে।
সভার শরীর পূর্ণ হউক প্রেমরসে॥

নিত্যানন্দের প্রেমদৃষ্টিপাতে সেদিন সমবেত ভক্তদের মধ্যে এক অপরূপ দিব্য ভাবের সঞ্চার হয়, কীর্ত্তনক্ষেত্রে স্বর্গীয় আনন্দের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠে। তাঁহার অপরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশের ফলে প্রতিটি লোক সেদিন অলৌকিক প্রেমাবেশে আত্মহারা হয়—

অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম,
পুলক, হুঙ্কার।
স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ, গর্জ্জন
সিংহসার॥
শ্রীআনন্দ মূর্চ্ছা আদি
যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত
কৃষ্ণ অনুরাগ॥
সভার শরীরে পূর্ণ
হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দস্বরূপের
প্রেম-বল॥
যে দিকে দেখেন
নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেই দিকে মহাপ্রেম-
ভক্তি বৃষ্টি হয়॥

পানিহাটিতে প্রায় তিন মাস কাল নানা লীলাবিলাসের পর

নিত্যানন্দ খড়দহে চলিয়া আসেন। সেখানেও আনন্দের হাট বসিয়া যায়। এ হাটের ক্রেতা আপামর জনসাধারণ, বিক্রেতা নিত্যানন্দ, পণ্য চৈতন্যপ্রভু। সুরধুনীর তীরে তীরে নিতাই কীর্ত্তন ধরেন—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ
লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ
সে হয় আমার প্রাণ॥

'প্রেমদাতা দয়াল নিতাই'র সে এক অপরূপ রূপ। গুরুগম্ভীর তত্ত্বের আড়ম্বর নাই, সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ নাই, আছে শুধু ভাবোদ্বেল কীর্ত্তন-নর্ত্তন আর নয়নাশ্রুর ধারা। আচণ্ডালে তিনি প্রেম বিতরণ করিতে থাকেন, কখনো ভূমিতলে লুটাইয়া, কখনো লোকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহেন, "ভাই, দয়া করে একবার কৃষ্ণ ভজ, গৌরাঙ্গ ভজ। বিনামূল্যে চিরতরে আমায় কিনে নাও। আমায় তোমাদের দাসানুদাস কর, ভাই।"

দেবপ্রতিম মহাসাধকের এ কি হৃদয়বিদারক দৈন্য ও আর্ত্তি! যে-ই এ দৃশ্য দর্শন করে, নয়নাশ্রু সম্বরণ করা তাহার পক্ষে কঠিন হয়। নিত্যানন্দকে কিনিয়া নেওয়া তো দূরের কথা, মুহূর্ত্তে সে নিজেই তাঁহার চরণে বিক্রীত হইয়া বসে। প্রেমিক অবধূতের প্রেম যেমন অতি-মানুষিক, তাঁহার এই প্রচার পদ্ধতিও তেমনি অভিনব। ভাগীরথীর দুই তীরে এমনিভাবে হরিনাম-প্রেমের মহোৎসব তিনি জাগাইয়া তোলেন।

দিক্‌বিদিকে সংবাদ রটিয়া যায়, পতিতপাবন রূপে গৌড়দেশে নিত্যানন্দের প্রকাশ ঘটিয়াছে। আচণ্ডালে নাম-প্রেমসুধা বিতরণ করিয়া তিনি জীবের উদ্ধার সাধন করিতেছেন। অলৌকিক তাঁহার শক্তি, অপরিমেয় তাঁহার জীবপ্রেম, আর প্রভু চৈতন্যের তিনি দ্বিতীয় কলেবর। দলে দলে লোক প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এই বিরাট পুরুষকে দর্শনের জন্য ভীড় জমায়।

প্রেম সরোবরে নিতাই সদা ভাসমান—প্রেম-রসেরই তরঙ্গভঙ্গে তিনি সদা টলমল। হৃদপদ্মে তাঁহার নব নব ভাবের দল বিকশিত হইয়া উঠে, উদ্বোধন ঘটে নব নব লীলারঙ্গের।

সর্ব্বত্যাগী এই অবধূতের হঠাৎ কি এক খেয়াল হয়, মনোহর নাগর সাজে তিনি সজ্জিত হইবেন, সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া দেশের যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইবেন। এই অদ্ভুত ইচ্ছা জাগিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে বসনভূষণ সংগ্রহে দেরী হইল না। এমনিতেই দেহখানি সুগৌর সুঠাম, এবার নীল বসনে মণ্ডিত হইয়া এটি আরও নয়না-ভিরাম হইয়া উঠিল। কণ্ঠে তাঁহার রত্নহার, হস্তে সুবর্ণ বলয়, অঙ্গুলি কয়টিতে রত্ন খচিত অঙ্গুরীয়—চরণে রমণীয় রৌপ্য নূপুর। অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, ললাটে অঙ্কিত তিলক চিহ্ন, আর গলে বিলম্বিত রহিয়াছে মল্লিকা-মালতীর শুভ্র সুগন্ধ মালা। এই দিব্য রূপ, এই মোহন সাজ, আর তাঁহার নৃত্যের ছাঁদ একবার যে দেখে সে মোহিত হয়। নিত্যানন্দের ভুবনমঙ্গল নামকীর্ত্তন একবার যে শ্রবণ করে—মন প্রাণ তাঁহার চিরতরে বাঁধা পড়িয়া যায়।

তাঁহার পারিষদ দলও কম রঙ্গিয়া নন। মনোহর ব্রজরাখাল বেশে তাঁহারা সদাই সজ্জিত থাকেন। বসন ভূষণের পারিপাট্য তাঁহাদেরও যথেষ্ট। গলে গুঞ্জামালা, হাতে শিঙ্গা, বেত্র ও বংশী নিয়া তাঁহারা শহরে জনপদে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ান। এই পরিকরদের এক একটি যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, অলৌকিক প্রেম ও শক্তির নানা প্রকাশ দেখাইয়া, ভক্তিরসের প্রবাহ উদ্বেলিত করিয়া সারা গৌড় দেশে তাঁহারা চাঞ্চল্য তুলিয়া দিলেন।

খড়দহ প্রভৃতি অঞ্চল পরিক্রমা করিয়া নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে উপনীত হন। এখানে ত্রিবেণীর ঘাটে পরম ভক্ত উদ্ধারণ দত্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। সাক্ষাৎ মাত্রই ঘটে তাঁহার আত্মসাৎ। উদ্ধারণ সর্ব্বমনপ্রাণ নিত্যানন্দের চরণে নিবেদন করেন, অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি হন তাঁহার পার্শ্বচর। সপ্তগ্রামে নিরন্তর অবধূতের নর্ত্তন-কীর্ত্তন ও আনন্দলীলা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

এখানকার বণিকসমাজের নেতা হইতেছেন উদ্ধারণ দত্ত। ইঁহারই প্রভাবে গৌড়ীয় বণিকেরা নিত্যানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়। বাংলার হিন্দুসমাজে ইহারা তখনও জলচল ছিল না। নিত্যানন্দ ইহাদের নূতন মর্য্যাদা দান করিলেন, নবধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে সুবর্ণ বণিকেরা হইয়া উঠিল তাঁহার পরম সহায়ক।

নাম-প্রেমের ঝঙ্কারে সপ্তগ্রাম অঞ্চল মাতাইয়া তুলিয়া নিতাই শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার দর্শনে অদ্বৈতের আনন্দের অবধি রহিল না। সোৎসাহে দুই বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে তিনি আলিঙ্গনে করিলেন। ভাবমত্ত দুই মহাপ্রেমিকের হুঙ্কারে ও ক্রন্দনে শান্তিপুরে সেদিন এক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা হইল।

বৃদ্ধ আচার্য্য অদ্বৈত প্রভুর কণ্ঠে সেদিন নিত্যানন্দের স্তুতি উচ্চারিত হইতে শোনা যায়—

তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তি
নিত্যানন্দ নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি
চৈতন্যের গুণগ্রাম॥
সর্ব্বজীব পরিত্রাণ
তুমি মহা সেতু।
মহাপ্রলয়েতে তুমি
সত্য-ধর্ম্ম সেতু॥
তুমি সে বুঝাও
চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্য-বৃক্ষে
ধর পূর্ণ শক্তি॥
(চৈঃ ভাঃ)

নবদ্বীপের ভক্তেরা মাঝে মাঝে নিত্যানন্দের দর্শন পান এবং আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন, গৌর-লীলাভূমিতে প্রেমভক্তি রসের

নূতন জোয়ার জাগিয়া উঠে। প্রধানত মহাবলী নিত্যানন্দের প্রেরণাতে গৌরাঙ্গ ভজন বিস্তার লাভ করিতে থাকে।

একবার নিত্যানন্দ নবদ্বীপে হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিত দরিদ্র হইলেও বড় শুদ্ধসত্ত্ব ও ভক্তিমান। পরম আগ্রহে অবধূত নিত্যানন্দের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। নিজে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব হইলে কি হয়, এসময়ে তাঁহার গৃহের উপরই পড়ে ডাকাতদের দৃষ্টি। নিত্যানন্দের বেশভূষায় খুব আড়ম্বর। কণ্ঠে ও হাতে পায়ে রহিয়াছে নানা সোনা রূপার অলঙ্কার। ভক্তদের উপহারও ভারে ভারে কম আসিতেছে না। অবশ্য এসব কোন কিছুতেই নিত্যানন্দের হুঁস নাই। দিনরাত নামপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন।

এই ডাকাতদলের নেতা এক তরুণ ব্রাহ্মণ। নরহত্যা গৃহদাহ প্রভৃতি এমন কোন কুকাজ নাই যাহা করিতে সে পশ্চাদপদ হয়। দলবল সঙ্গে নিয়া এক রাত্রিতে সে হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহের পিছনে লুকাইয়া থাকে। সুযোগ মত নিত্যানন্দকে মারিয়া তাঁহার অলঙ্কার ও টাকাকড়ি সে লুট করিবে।

রাত্রি তখনও গভীর হয় নাই। ডাকাতেরা ঠিক করিল, মধ্যরাত্রে তাহারা আক্রমণ শুরু করিবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে কেমন এক অদ্ভুত ঘুমে সবাই অচেতন হইয়া পড়ে। এ রহস্যময় ঘুম টুটিয়া যায় ভোরবেলায়, তখন সূর্য্যালোক ছড়াইয়া পড়িতেছে। তখন তাড়াতাড়ি তাহারা সরিয়া পড়ে।

দস্যুদলের জেদ কিন্তু বাড়িয়া যায়। আবার একদিন তাহারা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়া সেখানে হানা দিতে আসে। কিন্তু কি বিস্ময়কর ব্যাপার! বাড়ীর চারিদিকে এবার কাহারা পাহারা দিতে শুরু করিয়াছে। দীর্ঘ সুঠাম সুন্দরবপু এই রক্ষীদল, আর ইহাদের হাতেও রহিয়াছে নানা মারাত্মক অস্ত্র। এদিনও লুণ্ঠনের সুযোগ হইল না। ভীত হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয়দিন নিশাযোগে আবার তাহারা আসিয়া উপস্থিত। সোর-

গোল করিয়া অঙ্গনে ঢুকিবামাত্র দেখা গেল কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে তাহাদের সকলেরই দৃষ্টিশক্তি হঠাৎ লোপ পাইয়া বসিয়াছে। ভীত বিভ্রান্ত ডাকাতদের নিজেদের মধ্যেই জড়াজড়ি হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। ইহার উপর আবার আরম্ভ হয় প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি। অতিকষ্টে পথ হাতড়াইয়া কোনমতে তাহারা পণ্ডিতের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

এবার দস্যুদের সত্যই ভয় হইয়াছে। নাম কীর্ত্তনে প্রমত্ত এই নিত্যানন্দটি তবে তো নিতান্ত সাধারণ সাধক নন। নিশ্চয় তাঁহারই শক্তিবলে এ তিন দিন এত কিছু অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাগ্যে তাহাদের প্রাণ যায় নাই। দস্যু দলপতি তাঁহার অনুগামীদের সহ নিত্যানন্দের চরণে আসিয়া আত্মসমর্পণ করে। এ কয় দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া সে বলে, "প্রভু, আমি মহাপাষণ্ড, আপনার অলঙ্কারের লোভে পড়ে পণ্ডিতের বাড়ী লুঠ করতে এসেছিলাম। আমার পাপের আর সীমা নেই। আপনি কৃপাময়, এ অধমকে চরণে স্থান দিন।"

দস্যু ব্রাহ্মণটিকে আলিঙ্গন করিয়া অবধূত নিত্যানন্দ কহিলেন, "বাবা, তোমায় ক্ষমা করবো না তো করবো কাকে? তুমি যে মহা ভাগ্যবান। কৃষ্ণ কৃপার ফলে তুমি কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ এই তিন দিন এমন করে দেখতে পেয়েছো। এ বস্তু ক'জনের চোখে পড়ে, ভাই? তুমি এবার লুণ্ঠন আর নরহত্যা ছেড়ে দিয়ে পাষণ্ডদের ধর্ম্মপথে টেনে নিয়ে এসো।"

আপন গলার মালাটি দস্যুদলপতির কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া দয়াল নিতাই তাঁহাকে সানন্দে জড়াইয়া ধরেন। নিত্যানন্দের প্রসাদে উত্তরকালে সে এক পরম ভাগবত রূপে পরিণত হয়, অশ্রুকম্প পুলকাদি সাত্বিক বিকার তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইতে থাকে।

গৌড়ে আসিবার পর হইতে নিত্যানন্দ যে সব বৈপ্লবিক কাণ্ড শুরু করেন তাহাতে চারিদিকে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। সুবর্ণবণিকেরা

গৌড়ীয় সমাজে তখন অপাংক্তেয় ছিল, তিনি তাঁহাদের কোলে তুলিয়া নেন। বণিক উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন মহাভক্ত, ইঁহারই উপর ছিল নিত্যানন্দের ভোগ রন্ধন ও সেবার ভার। বৈষ্ণবীয় উদারতা ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান নিত্যানন্দ, অব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদেরও ধর্ম্ম-গুরুর ভূমিকা গ্রহণের অধিকার দেন। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, নিরক্ষর, অন্ত্যজ হিন্দু তাঁহার কৃপায় শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবে পরিণত হয়। সম-কালীন সমাজের অনুদারতা, প্রাণহীন ধর্ম্মাচরণ ও অজস্র বিধি-নিষেধের নিগড় ভাঙ্গিয়া নিতাই আনয়ন করেন নূতনতর মুক্তির প্রাণপ্রবাহ।

অগণিত লোক তাঁহার এই উদ্দীপনা ও মুক্তিমন্ত্রে সেদিন মাতিয়া উঠে, উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গোঁড়া ব্রাহ্মণদের বিরোধিতাও এ সময়ে তাঁহাকে কম সহ্য করিতে হয় নাই। নিতাইর নামে তাঁহারা নানা নিন্দাবাদ ও কলঙ্ক রটাইতে ছাড়েন নাই। একদল বৈষ্ণবও তাঁহাকে ভুল বুঝিতে আরম্ভ করে। শুধু তাহাই নয়, নিত্যানন্দের সাজসজ্জার পারিপাট্য, তাঁহার রঙ্গীন ও মনোহর ক্ষৌম বস্ত্র, অঙ্গের অলঙ্কারও একদল লোকের নিন্দা-সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠে।

প্রভুর দর্শনের জন্য নিতাই সেবার নীলাচলে গিয়াছেন। সেখানে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার বড় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। সবাই জানে, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী চৈতন্য-প্রভুর প্রধান অনুগামী তিনি। কিন্তু আপন প্রেমাবেশ ও আনন্দে মত্ত হইয়া একি চঞ্চলের ন্যায় ব্যবহার তিনি করিতেছেন? বৈরাগ্য ও অবধূতবৃত্তি তো অনেক দিন হইল বিসর্জ্জন দিয়াছেন। উত্তম বেশভূষায় সাজিয়া সদাই তিনি আনন্দরঙ্গে দিন কাটাইতেছেন। এজন্য সমাজের ও সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোকের সমালোচনাও তাঁহাকে মাঝে মাঝে সহ্য করিতে হয়।

পুরীধামের প্রান্তে একটি ফুল বাগিচায় নিতাই সেদিন বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন। বেশ কিছুটা ভয়ও হইয়াছে—প্রভু এবার তাঁহাকে কিভাবে গ্রহণ করিবেন, তাঁহার প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের পদ্ধতি

ও আচার আচরণ সম্বন্ধে তিনি কি মনোভঙ্গী অবলম্বন করিবেন, তাহা কে জানে?

সদানন্দময় নিত্যানন্দ মনোদুঃখে, একাকী চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, একথা প্রভুর কানে পৌঁছিল। ভক্তবৎসল প্রভু তখনি দলবল সহ সেখানে ছুটিয়া আসিলেন।

এখানে তিনি এক বিচিত্র কাণ্ড করেন। নিত্যানন্দকে মুখে কিছু না বলিয়া যুক্তকরে প্রভু তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। ভক্তেরা তখন দলে দলে আসিয়া চারিদিকে ভীড় জমাইয়াছে। চৈতন্য সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া নিতানন্দের স্তুতি গাহিতে শুরু করিলেন। কিন্তু এ যে বড় অসহনীয় দৃশ্য! নিত্যানন্দ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বিহ্বল হইয়া প্রভুর সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ছাড়িয়ে তুমি আমায় এ কি অবস্থায় রাখলে? আমি আমার ভাব-স্রোতে স্বেচ্ছামতই চলেছি। আমার আচার আচরণ, আমার বেশভূষা দেখে কতজনে কত পরিহাস ও বক্রোক্তিও করে। আমার প্রকৃত কর্ত্তব্য কি তা তুমি এবার আমায় বলে দাও।"

নিত্যানন্দকে প্রবোধ দিয়া প্রভু কহিতে লাগিলেন, "শ্রীপাদ, তুমি কি জান না, তুমি সঙ্কল্প করে আমায় যা করাও তাই আমি করে থাকি। আর তোমার মত মহামুক্ত পুরুষের আচরণে আবার নিন্দনীয় কি থাকতে পারে? তোমার দেহে যে অলঙ্কার শোভা পাচ্ছে সে যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিরই প্রতীক। তুমি আপামর জনসাধারণে যে ভক্তিসম্পদ বিতরণ করে যাচ্ছো তার তুলনা কোথায়? জীব উদ্ধারে তুমি অবতীর্ণ, সাধারণ বিধিবিধান তো তোমার জন্য নয়।"

ত্রিজগতে এই প্রভু ব্যতীত নিতাইর আর কে আছে? এই প্রভুর চরণেই যে তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাই তাঁহার এ প্রবোধ বাক্যে নিতাই স্থির হইয়া উঠিয়া বসিলেন, শান্ত হইলেন।

গদাধরকে নিত্যানন্দ বড় ভালবাসেন। গৌড় হইতে নীলাচলে আসিলেই তিনি তাঁহার সেবা-কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হন, উভয়ের মিলনে অপূর্ব্ব আনন্দ তরঙ্গ উত্থিত হয়। গদাধরের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ গোপীনাথের জন্য এবার তিনি গৌড়ের সূক্ষ্ম আতপ চাল ও রঙ্গীন বস্ত্র আনিয়াছেন। টোটাগোপীনাথে উপস্থিত হইয়া নিতাই আদেশ দেন, "গদাধর, আজ তোমার মনোমত করে প্রভুর ভোগ লাগাও।"

গদাধর পরম উৎসাহে উদ্যোগ আয়োজনে লাগিয়া যান। উৎকৃষ্ট ভোগান্ন প্রস্তুত হয় এবং উহা শ্রীগোপীনাথকে ভক্তিভরে নিবেদন করা হয়।

হঠাৎ দ্বারদেশে মধুর কণ্ঠের ধ্বনি শোনা যায়, 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ'। চৈতন্য প্রভু হাসিতে হাসিতে এ সময়ে গোপীনাথ মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত। গদাধর ত্রস্তে ছুটিয়া গিয়া দণ্ডবৎ হইলেন। প্রভু স্মিতহাস্যে কহিলেন, "গদাধর, তোমার এ কি আচরণ, বলতো? আজ এই আনন্দের দিনে আমায় তুমি ভিক্ষা নেবার জন্য বল নি? শ্রীপাদ নিত্যানন্দ এনেছেন ভোগের উপকরণ, পরম নিষ্ঠাভরে তা রন্ধন করেছ তুমি, আর শ্রীগোপীনাথের মুখামৃতের স্পর্শ রয়েছে এ প্রসাদে। এতে আমার ভাগ যে নিশ্চয়ই রয়েছে।"

নিত্যানন্দ দর্শনে গদাধর ও অন্যান্য ভক্তদের যে আনন্দ হইয়াছে প্রভুর আগমনে তাহা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

নিতানন্দ নীলাচলে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর চৈতন্য তাঁহাকে একদিন নিভৃতে নিকটে ডাকাইয়া আনেন। প্রভুর আয়ত নয়ন দুইটি করুণায় ছলছল, কণ্ঠে মিনতির সুর। মৃদু স্বরে কহেন, "শ্রীপাদ, আর কেন এভাবে সময় ক্ষেপণ করছো? জীব উদ্ধারের জন্য, সমাজকে ধারণ করে রাখবার জন্য অবিলম্বে তোমার দারপরিগ্রহ করা প্রয়োজন। তোমার গৃহজীবনকে কেন্দ্র করে, তোমার বংশের ধারাকে অবলম্বন করে, গৃহে গৃহে বৈষ্ণব জীবন গড়ে উঠুক—তোমার প্রচারিত নামগানে সবাই নূতন মানুষ হয়ে উঠুক। আমি তো বিবাগী, সংসারত্যাগী হয়ে রয়েছি। জীব উদ্ধারের জন্য জী-

জীবনের বন্ধন স্বীকার—এ যে তোমাকেই করতে হবে। আর দেরী নয়, তুমি আজই গৌড়ে চলে যাও।”

নিতাই একথায় ক্ষুণ্ণ হন। উত্তরে বলেন, “প্রভু, ছলনার তোমার অন্ত নেই। নিবেদিতপ্রাণ ভক্তদের বিচ্ছেদের আগুনে জ্বালিয়ে মারতেই যেন তোমার পরম আনন্দ। বেশ, আমি তোমার দেওয়া দুঃখকেই মাথা পেতে নিলাম। কিন্তু সত্য করে আজ বল, তোমার সাক্ষাৎ আমি কখন্ কিভাবে পাবো।”

প্রভুর অধরে দেখা দেয় স্মিত হাসির আভা। চৈতন্যের যিনি অভিন্নহৃদয়, অভিন্ন কলেবর বলিয়া পরিচিত তাঁহার মুখে বহিরঙ্গ দর্শনের এ ব্যাকুলতা কেন? কিন্তু নিতাইকে আশ্বস্ত করিয়া অবিলম্বে গৌড়ে না পাঠাইলেও চলিবে না—

প্রভু কহে প্রতিবর্ষে এখানে আসিবা।
ইচ্ছামাত্র আমাকে যে দেখিতে পাইবা॥
তোমার নর্ত্তনে আর মাতার রন্ধনে।
নিঃসন্দেহে আমারে পাইবে দুইস্থানে॥
(নিঃ বংশবিস্তার)

অতঃপর আরম্ভ হয় উভয়ের প্রেমার্ত্তি ও ক্রন্দন। নয়নাশ্রুর ধারায় বসন তিতিয়া যায়। কৃষ্ণকথার রসভুঞ্জনে, আর নিজ নিজ মর্ম্মকথার উদ্ঘাটনে সারারাত্রি অতিবাহিত হয়।

প্রভাতে উঠিয়া চৈতন্য ও নিত্যানন্দ সমুদ্র স্নান সমাপন করেন—উভয়ে মিলিয়া দর্শন করেন দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ। সেই দিনটি হইতে দেখা দেয় চৈতন্য প্রভুর বিরাট ভাবান্তর। ভক্তদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া নিমজ্জিত হন কৃষ্ণ বিরহের মহাসাগরে। ভক্তকবি বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ভাষায়—

সেদিন হইতে প্রভুর
হৈল কোন্ দশা।
নিরন্তর কহে কৃষ্ণ
বিরহের ভাষা॥

চৈতন্য এইদিন হইতে প্রবেশ করিলেন গম্ভীরার গর্ভে। আর তাঁহার প্রতিনিধি নিত্যানন্দ বাহির হইলেন সমাজ-জীবনের উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে—প্রেমধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম ধারক ও বাহকরূপে। চৈতন্যের শক্তি যেন অবধূতের জীবনে নূতন করিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে—নব প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম আজ তাঁহার মধ্যেই যেন হইয়াছে বিগ্রহীভূত।

নিত্যানন্দ সেবার পানিহাটিতে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে আসিয়াছেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি ও উল্লাসের অন্ত নাই। সেদিন নদীতীরে এক গাছের নীচে পার্ষদদের নিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। এমন সময় এক তরুণ আসিয়া তাঁহার চরণে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানায়। সেবকেরা কহেন, "প্রভু, ইনি সপ্তগ্রামের জমিদারের পুত্র রঘুনাথ। আপনার কৃপাপ্রার্থী হয়ে এসেছেন।"

রঘুনাথের কথা নিত্যানন্দ শুনিয়াছেন। এই বৈরাগ্যবান্ ভক্ত ইতিপূর্ব্বে শান্তিপুরে চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রভু ইহাকে আশীর্ব্বাদ করেন, কিন্তু আরও কিছুকাল সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে উপদেশ দেন। সেই দেবদুর্লভ মূর্ত্তি দর্শনের পর হইতে ভক্ত রঘুনাথের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, কবে সংসার ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণতলে আশ্রয় লাভ করিবেন, সেই চিন্তায়ই দিন গুণিতেছেন।

দয়াল নিতাইচাঁদের কথা, তাঁহার জীবোদ্ধার লীলার নানা কাহিনী, রঘুনাথদাস শুনিয়াছেন। চৈতন্যপ্রভুর এই প্রতিভূকে দর্শনের অভিলাষ তাঁহার বহুদিন হইতেই হইয়াছে। আজ সুযোগ পাইয়া এখানে ছুটিয়া আসিয়াছেন।

পরম ভক্ত রঘুনাথের আগমনে নিত্যানন্দের অন্তর প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠে। রঘুনাথ কিন্তু ইতিমধ্যে সরিয়া গিয়া দৈন্যভরে দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নিতাই তাঁহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আনেন, পদদ্বয় করেন তাঁহার শিরে সংস্থাপন। তারপর কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহেন "হাঁরে চোরা, তুই নিকটে না এসে এতদিন দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্ কেন? আয়, আজ আমি তোর দণ্ড

বিধান করবো। আমার সব ভক্তদের, সব বৈষ্ণবদের তুই দই-চিড়ে ভোজন করিয়ে দে তো।”

এ যে রঘুনাথের পরম সৌভাগ্য। এ আদেশ যে প্রভু নিতাইর দণ্ডদান নয়, এ তাঁহার বরদান। সমকালীন গৌড়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমিদারের সন্তান রঘুনাথ, ধনজনের তাঁহার অভাব নাই। নির্দেশ দেওয়া মাত্র অমনি দিকে দিকে লোক ছুটিয়া যায়। অবিলম্বে চিড়া মহোৎসবের সমস্ত কিছু উপকরণ সংগ্রহ করা হয়।

ভারে ভারে চিড়া, দধি, গুড়, কলা ও মিষ্ট দ্রব্যাদি আসিয়া উপস্থিত। পানিহাটির গঙ্গাতীরে বৈষ্ণব-সমাজের আনন্দমেলা বসিয়া গেল। লক্ষ লোকের সমাবেশ সেখানে, আর চারিদিকে কেবল দীয়তাং ভুজ্যতা রব। ঘনিষ্ঠ পরিকরদের সঙ্গে নিত্যানন্দ তাঁহার এই পুলিন-ভোজন রঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন।

শুনা যায়, মহাবলী নিতাই সেদিনকার এই মহোৎসবে মহাপ্রভু চৈতন্যকেও আকর্ষণ করিয়া আনেন—চিড়া, দধি তাঁহাকে ভোজন করান। কয়েকটি ভাগ্যবান্ ভক্ত সেদিন গৌর ও নিতাই এই দুই প্রভুর লীলাকৌতুকী রূপ দেখিয়া ধন্য হন।

পুলিন ভোজনের পর শুরু হয় রাঘব পণ্ডিতের গৃহে নৃত্য ও কীর্ত্তন। নিত্যানন্দ আজ যেন প্রেমতরঙ্গভঙ্গে উদ্বেল। মনের আগলটি কোন্ মুহূর্ত্তে খুলিযা গিয়াছে। রাঘবের গৃহে তিনি সেদিন আরো একটি অলৌকিক লীলা বিস্তারিত করিলেন।

উদ্দণ্ড কীর্ত্তনের পর প্রসাদ গ্রহণের ডাক পড়ে। নিত্যানন্দের আসনের দক্ষিণে স্থাপন করা হইয়াছে চৈতন্য প্রভুর জন্য এক আসন। রাঘব পণ্ডিত সবিস্ময়ে দেখেন, নিত্যানন্দের পাশে প্রভু চৈতন্যও প্রসাদ পাইতে বসিয়া গিয়াছেন। কোথায় সুদূর নীলাচল আর কোথায় পানিহাটি! ভক্তের আকর্ষণ প্রভুকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে, আর অলৌকিক দিব্যদেহ ধরিয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। দুই প্রভুর ভোজনাবশিষ্ট তুলিয়া নিয়া রাঘব পণ্ডিত ভক্ত রঘুনাথকে অর্পণ করিলেন।

পরদিন গঙ্গাস্নানের পর নিত্যানন্দ সাঙ্গোপাঙ্গসহ কৃষ্ণকথা শুরু করিয়াছেন। রঘুনাথ এসময়ে দীনভাবে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, বামন হয়ে আমার চাঁদ ধরবার সাধ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের চরণ পেতে আমি অভিলাষী হয়েছি। কিন্তু বার বারই আমার যাত্রাপথে বাধা এসে পড়ছে।"

"রঘুনাথ, তুমি যে মহাভক্ত। বাধা পেয়ে তুমি পশ্চাদ্‌পদ হবে কেন? আরো দৈন্য, আরো আর্ত্তি নিয়ে এগিয়ে পড়।"

কিন্তু অভিজ্ঞ বৈষ্ণবদের কাছে রঘুনাথ যে শুনেছেন, নিতাইর কৃপা না হলে গৌরকৃপা লাভ করা বড় কঠিন। তাই তাঁহার কৃপার জন্য সর্ব্বসত্তা আজ উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—

তোমার কৃপা বিনা কেহ
চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তারে
অধমেও পায়॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন
করিতে করো ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঁই
হইয়া সদয়॥
মোর মাথে পদ ধরি
করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাই,
কর আশীর্ব্বাদ॥

রঘুনাথের শিরে চরণ রাখিয়া নিত্যানন্দ তাঁহাকে আশিস্ প্রদান করিলেন। সঙ্গীয় পার্ষদদের কহিলেন, "ভক্ত রঘুনাথের বিষয়-বাসনা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর, প্রার্থিত চৈতন্যপদ সে যেন অচিরে প্রাপ্ত হয়।"

মুমুক্ষু রঘুনাথের দুই নয়নে তখন অঝোর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে। নিত্যানন্দ সস্নেহে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহেন, "রঘুনাথ, তুমি যে মহাভাগ্যবান্। তোমার প্রতি কৃপা করে গৌরসুন্দর নীলাচল থেকে এসে পুলিন-ভোজনে যোগ দিয়েছিলেন, তোমার মহোৎসবের দধি চিড়া তিনি ভোজন করেছেন, রাত্রে আমাদের পংক্তিতে বসে প্রসাদ ভক্ষণও বাদ দেন নি। তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে এমন করে যিনি ছুটে আসতে পারেন, তিনি কি তোমার বিষয়-বন্ধন মোচন করতে পারেন না? ভয় নেই। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, শীগ্‌গীরই তুমি চৈতন্যচরণ পাবে, তাঁর অন্তরঙ্গ পরিকর রূপে অবশ্য গণ্য হবে।"

নিত্যানন্দের কথায় রঘুনাথ আশ্বস্ত হন, ভক্তদের চরণ বন্দনা করিয়া তিনি সপ্তগ্রামে চলিয়া যান। নিত্যানন্দের পুণ্যস্পর্শ পাইবার পর হইতে রঘুনাথের বিষয়-বিরক্তি চরমে উঠে। এ সময় হইতে তিনি বাড়ীর ভিতরে যান নাই, শয়ন মন্দিরেও প্রবেশ করেন নাই। যে কয়দিন সংসারে ছিলেন, বহির্ব্বাটিতে চণ্ডীমণ্ডপে বাস করিতেন, কৃষ্ণনাম জপ আর গৌরাঙ্গ চরণের ধ্যানে থাকিতেন সদা নিবিষ্ট। নিত্যানন্দের কৃপায় অচিরে এই বৈরাগ্যবান্ সাধক লাভ করেন দুর্লভ চৈতন্যচরণ।

সপ্তগ্রামের জমিদার পুত্র রঘুনাথের এই রূপান্তরের মধ্য দিয়া সেদিন নিত্যানন্দের মহিমা নূতন করিয়া ঘোষিত হয়। এই সঙ্গে সারা গৌড়দেশের বৈষ্ণব সংগঠনও দৃঢ়তর ও বিস্তৃততর হয়। নিত্যানন্দ ও ভক্ত রঘুনাথের অনুষ্ঠিত এই চিড়া মহোৎসবের স্মৃতি দীর্ঘকাল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উদ্দীপিত করিয়াছে। আজিও এদেশে উহার স্মৃতি ম্লান হয় নাই।

নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে নিত্যানন্দ সেবার অম্বিকা কাল্‌নায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সঙ্গে প্রিয় শিষ্য ও সেবক উদ্ধারণ দত্ত।

চৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্ত গৌরীদাস পণ্ডিতের বাস এই নগরে। পণ্ডিতের ভ্রাতা সূর্য্যদাস তৎকালীন রাজসরকারের এক বিশিষ্ট কর্ম্মচারী, সজ্জন ও ভক্তিমান্ বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি সে অঞ্চলে যথেষ্ট। বসুধা ও জাহ্নবী নামে তাঁহার বিবাহযোগ্যা দুইটি কন্যা রহিয়াছে। উভয়েই সুলক্ষণা ও রূপবতী।

নিতাই বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করুন, ইহাই চৈতন্যপ্রভুর ইচ্ছা। তাই নিতাই নিজ সিদ্ধান্তও এবার তিনি স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে আসার পর কন্যার সন্ধানও পাওয়া গেল। পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠা কন্যা বসুধার পাণিপ্রার্থী হইলেন নিত্যানন্দ।

বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দের তখন অতুল প্রতাপ। চৈতন্যের অভিন্নহৃদয় ভক্ত ও প্রতিনিধিরূপে সর্ব্বত্র তাঁহার অসামান্য মর্যাদা। সূর্যাদাস পণ্ডিতের কাছে তাঁহার এ প্রস্তাব মোটেই ফেলিবার মত নয়। কিন্তু পণ্ডিত বড় দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। সামাজিক বিধিনিষেধের গণ্ডি কি করিয়া অতিক্রম করিবেন? অবধূত-জীবনে নিত্যানন্দ জাতি বিচার করেন নাই, যত্রতত্র আহার বিহার করিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহার হাতে কন্যা সম্প্রদান করিলে সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে যাইতে হইবে, জ্ঞাতি ও আত্মীয়স্বজনেরাও ইহা অনুমোদন করিতে চাহিবে না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সূর্য্যদাস পণ্ডিত যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু, আপনি উপযাচক হয়ে আমার গৃহে কন্যাপ্রার্থী, এ আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আপনি নিজেই বলুন, জাতিবর্ণ যিনি ত্যাগ করেছেন, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ হয়ে তাঁর ঘরে আমি কি করে কন্যা সম্প্রদান করবো? আপনি আমায় মার্জ্জনা করুন।"

ভক্তসমাজের যুক্তিজাল, বণিকশ্রেষ্ঠ উদ্ধারণ দত্তের অনুনয় বিনয় কোন কিছুই সেদিন সূর্য্যদাস পণ্ডিতের সম্মতি আদায় করিতে পারিল না। এ বিবাহ-প্রস্তাব সম্বন্ধে সকলে হাল ছাড়িয়া দিলেন। নিত্যানন্দ এ বিষয়ে তখন আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই।

সেবক-ভক্ত উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে নিয়া তিনি গঙ্গাতীরে চলিয়া যান, এক নিভৃত কুটিরে বাস করিতে থাকেন।

এদিকে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে দেখা দিল এক আকস্মিক বিপদ। বসুধা এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, বহু চেষ্টায়ও তাঁহাকে নিরাময় করা যাইতেছে না। অবস্থা ক্রমে চরমে পৌঁছিল, মুমূর্ষু রোগিণীকে বাঁচানোর আর কোন উপায় নাই।

ভক্ত গৌরীদাস সেদিন সেখানে উপস্থিত। ভাইকে কহিলেন, "সব চেষ্টাই তো করলে, এবার প্রভু নিত্যানন্দকেই আহ্বান কর, তাঁর শরণাপন্ন হও। নইলে বসুধাকে বাঁচাবার কোন উপায় আমি দেখছিনে। আমার মনে হয়, অবধূতের কথা অগ্রাহ্য করায়, তাঁর অবমাননা করায়, এ বিপদ উপস্থিত হয়েছে।"

উপয়াস্তর নাই, সূর্য্যদাস অশ্রু সজল চোখে কহিলেন, "তবে তাই হোক, অবধূতের কাছে ক্ষমা চেয়ে, চরণ ধরে তাঁকে নিয়ে এসো। কন্যা যদি তাঁর কৃপায় জীবন পায় তবে তাঁর করেই তাকে সমর্পণ করবো।"

গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া নিত্যানন্দ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। সবাই তাঁহার কাছে গিয়া মার্জ্জনা চাহিলেন। মিনতি করিয়া তাঁহাকে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে নিয়া আসা হইল।

মুমূর্ষু বসুধার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবধূত নিত্যানন্দ সেদিন যে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখান তাহা বড় বিস্ময়কর। 'অদ্বৈত-প্রকাশ' গ্রন্থে ঈশান নাগর এ দৃশ্যের এক মনোরম বর্ণনা দিয়াছেন। নিত্যানন্দ কহিতেছেন—

এই কন্যায় যদি মুঞ
জীয়াইতে পারি।
তবে মোরে কন্যা দিবা
কহ সত্য করি॥
শুনিয়া পণ্ডিত কহে
আর বন্ধুগণ।

জীয়াইলে কন্যা দিব,
করিলাম পণ ॥
তাহা শুনি নিত্যানন্দ
আনন্দিত মনে।
মৃত সঞ্জীবন নাম
দিলা কানে ॥
হরিনামামৃত পিয়া
বসুধা উঠিলা।
অলৌকিক কার্য্যে সবে
বিস্ময় মানিলা ॥

বসুধা সুস্থ্য হইয়া উঠিলে সূর্য্যদাস সানন্দে নিতাইর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন ইহার কিছু দিন পরে পণ্ডিত তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা জাহ্নবীকেও তাঁহার করে অর্পণ করেন। চির উদাসীন, সর্ব্ব-পাশমুক্ত অবধূত চৈতন্য-কৃপায় হইয়া উঠেন প্রেমধর্ম্মের প্রধান উদগাতা—কৃষ্ণনাম রসের প্রধান ভাণ্ডারী। আবার সেই প্রভুরই প্রেরণায় এবার তাঁহাকে হইতে হয় সংসারী।

নিতাই এখন হইতে পত্নীদ্বয়সহ খড়দহে বাস করিতে থাকেন। এখানে প্রেমের ঠাকুর শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করিয়া গার্হস্থ্যের পরিমণ্ডলকে করিয়া তুলেন অমরার আনন্দ-কানন।

তাঁহার প্রথমা পত্নী বসুধা দেবীর গর্ভে পরম বৈষ্ণব বীরভদ্রের জন্ম হয়। খড়দহের গোস্বামীরা ইঁহাদেরই বংশের সন্তান-সন্ততি। দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবী দেবীর পোষ্যপুত্র রামাই গোস্বামী বিস্তারিত করেন আর এক গোস্বামী-শাখা। বাংলার সমাজ-জীবনের নানা স্তরে প্রেমধর্ম্মের প্রবাহ বেশ কিছুকাল নিত্যানন্দ ধারার এই গোস্বামীরা বিস্তারিত করিয়া যান।

নিতাই ভাবের মানুষ। ভাবপ্রমত্ত ঝঞ্ঝার মত কখনো তিনি সম্মুখের সমস্ত কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উড়াইয়া নিয়া যান, কখনো বা

অপার প্রেম ও করুণায় বিগলিত হইয়া সহস্রধারায় আপনাকে বিস্তারিত করিয়া দেন। সর্ব্বপাশমুক্ত অবধূতের জীবন আধারে দিনের পর দিন চলে প্রেমরসের এই অপরূপ লীলা। ভাবের মানুষ, রসের মানুষ নিতাইকে তাই অনেক সময় দেখা যাইত উদ্দাম ও স্বাতন্ত্র্যবাদী মহাপুরুষরূপে। কোন কোন কঠোরী, বৈরাগ্যবান্ সাধকের চোখে এ স্বাতন্ত্র্য, এ চাঞ্চল্য, কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকিত। এ সম্পর্কে নিন্দা সমালোচনাও মাঝে মাঝে দেখা দিত।

নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ ছিলেন চৈতন্যের সহপাঠী। প্রভুর এবং তাঁহার প্রেমধর্ম্মের তিনি খুব অনুরাগী। কিন্তু গৌড়ে আসিয়া নিতাই যে আচার আচরণ করিতেছেন তাঁহার মর্ম্ম তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। অচ্ছুৎ অন্ত্যজের হাতে ভোজন, তাহাদের নিয়া নাচানাচি, সর্ব্বোপরি স্বর্ণালঙ্কার ধারণ, মাল্য গন্ধ এবং বিলাসের উপকরণ ব্যবহার—এসবেরই বা তাৎপর্য্য কি? সেবার নীলাচলে থাকার সময়, সুযোগ বুঝিয়া একদিন এই ব্রাহ্মণ চৈতন্যের কাছে এসব কথা পাড়িলেন।

প্রভু সহাস্যে কহিলেন, "সে কি কথা ভাই, তুমি কি জান না, অধিকারী পুরুষ ও মহাসমর্থ সাধকেরা যে সর্ব্ব দোষগুণের অতীত। ভাগবতে ঠাকুর তো নিজেই বলেছেন—

ন ময্যেকান্তভক্তানাং
গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং
বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম।

—যাঁরা রাগাদি দোষ শূন্য, যাঁরা সকলের প্রতি সমদর্শী হ'য়ে প্রকৃতির অতীত হ'য়েছেন ও পরমেশ্বরকে পেয়েছেন—বিধিনিষেধ-জনিত পুণ্যপাপের সঙ্গে আমার সেই একান্ত ভক্তদের সম্পর্ক নেই।

সন্দিগ্ধচেতা ব্রাহ্মণটিকে প্রভু আরো স্পষ্টরূপে বলিয়া দিলেন, "ভাই, পদ্মপত্রে যেমন জল স্পর্শ করে না, আমার নিত্যানন্দেও তেমনি পাপের স্পর্শ লাগতে পারে না।"

সর্ব্বজন আরাধ্য প্রভুর কণ্ঠে নিত্যানন্দ মাহাত্ম্যের এই ব্যাখ্যা শুনে ব্রাহ্মণটির বিস্ময় চরমে উঠিল, তিনি নির্ব্বাক হইয়া গেলেন প্রভু বলিয়া চলিলেন—

নিত্যানন্দ স্বরূপ
পরম অধিকারী।
অল্প ভাগ্যে তাঁহাকে
জানিতে না পারি॥
অলৌকিক চেষ্টা যেবা
কিছু দেখি তান।
তাহাতেও আদর করিলে
পাই ত্রাণ॥
পতিতের ত্রাণ লাগি
তাঁর অবতার।
তাঁহা হৈতে সর্ব্বজীব
পাইবে উদ্ধার॥
তাঁর আচার বিধি-
নিষেধের পার।
তাঁহারে বুঝিতে শক্তি
আছয়ে কাহার॥

পরবর্ত্তীকালে প্রভু একবার গৌড় আগমন করেন। দিকে দিকে সেদিন ছড়াইয়া পড়ে এই আনন্দের বার্ত্তা। সহস্র সহস্র ভক্তের হৃদয়-সাগর প্রেমে ভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া ওঠে। জাহ্নবীর তীরে তীরে আনন্দের মেলা বসিয়া যায়। এই সময়ে পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের ভবনে বসিয়া প্রভু একদিন তাঁহার নিকট নিত্যানন্দতত্ত্ব বর্ণনা করেন। পণ্ডিতকে বলেন—

রাঘব তোমারে আমি
নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাই
নিত্যানন্দ বই॥

এই নিত্যানন্দ যেই
করায়েন আমারে।
সে-ই করি আমি, এই
বলিল তোমারে॥
আমার সকল কর্ম্ম
নিত্যানন্দ দ্বারে।
এই আমি অকপটে
কহিল তোমারে॥
যে-ই আমি সে-ই নিত্যানন্দ
ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব
জানিবা হেথাই॥

প্রভু চৈতন্যের এই ইঙ্গিতপূর্ণ চাবি-কাঠিটি দিয়া রাঘব পণ্ডিত নিত্যানন্দতত্ত্বের মঞ্জুষা উন্মুক্ত করেন—গৌর ও নিতাইর অভেদত্ব তাঁহার সাধনসত্তায় স্ফুরিত হইয়া উঠে।

খড়দহকে কেন্দ্র করিয়া নিতাই তাঁহার প্রেম-ভক্তির রসস্রোত তখন দিকে দিকে ঢালিয়া দিতেছেন। সারা গৌড়দেশ জুড়িয়া তখন অপূর্ব্ব প্রাণ চাঞ্চল্য, প্রেমার্ত্তি ও উন্মাদনা। আপামর জনসাধারণ দয়াল নিতাইর জীয়নকাঠির স্পর্শে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রেমনাট্যের এ রঙ্গমঞ্চে নিতাইকে কিন্তু বেশী দিন ধরিয়া রাখা যায় নাই। ধীরে ধীরে এক দিব্য ভাবান্তর তাঁহার জীবনে আত্ম-প্রকাশ করিতে থাকে। কোথায় সে নিতাই যিনি 'মাতা হাতীর' মত নৃত্যের তাণ্ডবে ধরণী কম্পিত করিয়া তোলেন? প্রেমে বিগলিত অশ্রু ধারায় যিনি শত শত পাষণ্ডীকে অবলীলায় ভাসাইয়া নিয়া যান, তিনি আজ ধীরে ধীরে আপন মর্ম্মতলের কোন্ গোপন নীড়ে আশ্রয় নিতে যাইতেছেন?

ভক্ত ও পার্ষদদের অন্তরে এজন্য বিষাদের অন্ত নাই। নিত্যানন্দের

এই অন্তর্মুখীনতায় তাঁহারা বড় বেদনা পান, বড় অসহায় বোধ করেন।

ইহার পর গৌড়ীয়াদের জীবনে আসে চরম মর্ম্মান্তিক আঘাত। নীলাচলধাম হইতে সংবাদ প্রেরিত হয় প্রভু শ্রীচৈতন্য ভক্তদের শোকসাগরে ভাসাইয়া অপ্রকট হইয়াছেন।

নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে আপনাকে আরও সংহত করিয়া নেন। প্রায়ই থাকেন বাহ্যজ্ঞানহীন। আর অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় উচ্চারিত হয় কেবল কৃষ্ণকথা আর গৌর-গুণগান।

বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের এ সময়কার এক আলেখ্য আঁকিতে গিয়া বলিয়াছেন—

চৈতন্য বিচ্ছেদে সদাই প্রভুর বিলাপ।
কদাচিৎ বাহ্য হইলে চৈতন্য আলাপ॥
কায়মনোবাক্যে সদা চৈতন্য ধেয়ায়।
উচ্চ শব্দ করি সদা গৌরাঙ্গ গুণ গায়॥
আপনে গৌরাঙ্গ গাই গাওয়ায় জগতে।
গৌরাঙ্গের গুণ গাও পাবে নন্দ স্নুতে॥

চিরদিনের আনন্দ-চঞ্চল নিতাই ক্রমে হইয়া উঠেন ভাবগম্ভীর এবং দুরবগাহ। নয়টি বৎসর এভাবে অতিবাহিত হয়।

১৪৬৪ শকাব্দের এক প্রভাত। শ্যামস্থন্দর মন্দিরে মঙ্গলারতির পর নৃত্য ও কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইতেছে। অবধূত নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাতের জন্য অদ্বৈত প্রভু সেদিন খড়দহ মন্দিরে উপস্থিত। দুই প্রভুর মিলনে ভক্তদের আনন্দের অবধি নাই।

নিতাইও সেদিনকার কীর্ত্তনে দিব্য ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। ক্রমে দেখা দেয় মহাভাবের গাঢ় আবেশ। এ আবেশ সেদিন আর ভাঙ্গে নাই। সুমহান জীবনলীলার শেষ অঙ্ক সমাপ্ত করিয়া নিত্যানন্দ চিরতরে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। শুধু খড়দহে নয়, শুধু গৌড়ে নয়, সারা ভারতের ভক্তসমাজে নামিয়া আসে বিষাদের অন্ধকার।

ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষরূপে আবির্ভূত হন নিত্যানন্দ। তাঁহার প্রকাশ ঘটে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রধান সহকারীরূপে, প্রেমভক্তির উত্তাল রসতরঙ্গ তিনি দিকে দিকে উৎসারিত করেন। কর্ম্মমুখর লীলাচঞ্চল জীবনের চমকপ্রদ অধ্যায়গুলি একের পর হয় অতিক্রান্ত। যতটা নিজেকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেন, অনুদ্‌ঘাটিত থাকে তার চাইতে অনেক বেশী, যে পরিমাণে জীবকে তিনি কাঁদান, কাঁদিয়া যান তার চাইতে বহু গুণ। নিত্যানন্দের মর্ম্ম বুঝিতে গিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্তকবিকে তাই হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিতে হইয়াছে—

বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখান যারে সে দেখিতে পারে॥

বীরশৈব বসভেশ্বর

দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদে দক্ষিণ ভারতের কানাড়ায়, বর্ত্তমানের মহীশূরে, আবির্ভূত হন মহাসাধক বসভেশ্বর। ভক্তিধর্ম্মী শৈব-সাধনার এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেন এই সিদ্ধপুরুষ—সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সঞ্চারিত করেন উদার, সার্ব্বভৌম ও বৈপ্লবিক ধর্ম্মবোধ।

বসভেশ্বরের বীরশৈববাদ এবং তাঁহার সংগঠিত লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের অবদান এ দেশের ধর্ম্ম সংস্কৃতিতে আনিয়া দেয় নূতনতর মহিমা, নূতনতর সমৃদ্ধি। শুধু তাহাই নয়, জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির এক অপরূপ সমন্বয় সাধিত হয় এই সিদ্ধ শিবযোগীর ধ্যান-ধারণা, জীবন সাধনা ও ধর্ম্ম-আন্দোলনের ফলে।

১১০৫ খৃষ্টাব্দে কানাড়ার বাগওয়াড়ী[১] নামক স্থানে বসভেশ্বর ভূমিষ্ঠ হন। পিতা মাদিরাজ ছিলেন এই অঞ্চলের সরকারী প্রধান—'গ্রামনিমণি'। ধনবান্ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বসভের মাতার নাম মাদাম্বা। মহা ভক্তিমতী এই মহিলা নিজের দিনান্তের কাজ সমাপ্ত হইলেই রোজ তিনি নন্দীশ্বরের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হন, দীর্ঘ সময় শিবের পূজা ও ধ্যান-জপে কাটাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন।

কন্যা আক্কা নাগাম্মার জন্মের পর কয়েক বৎসর গত হইয়াছে, কিন্তু কোন পুত্রসন্তান এযাবৎ হয় নাই। জননী মাদাম্বার মনে তাই শান্তি ও স্বস্তি নাই, নন্দীশ্বরের মন্দিরে গিয়া প্রভুর কাছে বার বার সাশ্রুনয়নে নিবেদন করেন তাঁহার অন্তরের আকুতি।

১ দ্রঃ—ডঃ পি. বি. দেশাই : বসভ অ্যাণ্ড হিজ টাইমস, পৃঃ ১৬৮ ; আর. সি. সি কার্ : মনোগ্রাফ অন লিঙ্গায়েৎস, পৃঃ ৩ ; ই, থারস্টন : কাস্ট অ্যাণ্ড ট্রাইবস অব ইণ্ডিয়া, ভল্যু ৪, পৃঃ ২৩৯।

দেবতা অবশেষে একদিন প্রসন্ন হইয়া উঠেন। মৃদু-মধুর কণ্ঠের দৈববাণী ধ্বনিত হয় মন্দিরের অভ্যন্তরে—“সুতপা মাদাম্বা, এমন করে আর তুমি অশ্রুপাত করো না। তোমার দুঃখ-রজনীর অবসান হবে এবার, কোল জুড়ে আসবে কুলপাবন পুত্র। শিবাংশে হবে তার জন্ম। শিব-আরাধনার নূতন পন্থা সে করবে উদ্ভাবন। শিবভক্ত মানুষের হবে দিক্-দিশারী—হাজার হাজার আর্ত্ত, দীনজনের হবে আশ্রয় স্বরূপ।”

আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠেন মাদাম্বা। স্বামীর কাছে সোৎসাহে বিবৃত করেন এই অলৌকিক ঘটনার কথা।

দম্পতির আশা পূর্ণ হয়, বৎসরান্তে মাদিরাজের গৃহে ভূমিষ্ঠ হয় সুলক্ষণযুক্ত, প্রিয়দর্শন এক পুত্রসন্তান।

নন্দীমন্দিরের অধীশ্বরের কৃপায় জন্ম, তাই তাহার নাম রাখা হয়, বসভেশ্বর।[১]

মাদিরাজ গ্রামের প্রধান, বিত্ত-বিষয়ও তাঁহার যথেষ্ট। তাই এই পুত্রের জন্মকে কেন্দ্র করিয়া সেদিন তাঁহার ভবনে শুরু হয় আনন্দ উৎসব। আত্মীয়-কুটুম্বদের সাড়ম্বরে আপ্যায়ন করা হয় আর সেই সঙ্গে চলে দরিদ্রদের অন্ন বিতরণ।

গ্রামের উপান্তে রহিয়াছে নন্দীশ্বরের প্রাচীন মন্দির। কয়েকদিন হয় এখানে আশ্রয় নিয়াছেন জাতবেদমুনি নামে এক প্রখ্যাত শৈব সাধক।[২] সিদ্ধপুরুষ এবং শিবভক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা বলিয়া লোকে তাঁহাকে যথেষ্ট সমীহ করিয়া চলে। এই সাধক সেদিন আপনা হইতেই মাদিরাজের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। অভ্যর্থনা ও পদবন্দনার পর মাদিরাজ যুক্তকরে নিবেদন করেন, “প্রভু, আপনার সাধনস্থান পবিত্র কুড়ল-সঙ্গম ছেড়ে কবে এখানে

---

১ কানাড়ী ভাষায় 'বসভ' শিবের বাহন বৃষভেরই প্রতিশব্দ।

২ লিংগিরাজ পুরাণ : ভল্যু ৭৪

এলেন তা তো জানিনে। যদি কৃপা করে দর্শন দিয়েছেনই আমার নবজাত পুত্রটিকে একটিবার আশীর্ব্বাদ করে যান।"

"বৎস, সেই জন্মেই যে আমার বাগওয়াড়ী গ্রামে আসা। আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন নেই। কোথায় তোমার নবজাত পুত্র?"

শিশুটিকে তখনই মহাপুরুষের সম্মুখে নিয়া আসা হয়। বর্ষীয়ান সাধকের দুই চোখ দিব্য আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাড়াতাড়ি ঝুলি হইতে একটি ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ বাহির করিয়া বালকের কণ্ঠে তিনি স্পর্শ করান। অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করেন শিব মহিমার স্তোত্রমালা।

গৃহে সমাগত নরনারী সবাই বিস্মিত হইয়া মহাত্মার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছেন। এবার মাদিরাজের দিকে তাকাইয়া তিনি কহিলেন, "বৎস, তুমি পরম ভাগ্যবান্ তাই এ শিশু তোমার গৃহে আবির্ভূত হয়েছে। কয়েকটি দিব্য লক্ষণ রয়েছে এর অঙ্গে। দেখবে, উত্তরকালে এক শক্তিধর শৈব মহাপুরুষ বলে এ কীর্ত্তিত হবে। বহু সাধকজনের হবে পথ প্রদর্শক। ধ্যানযোগে এর সংবাদ আমি জেনেছি, তাই দ্রুতপদে চলে এসেছি এই গ্রামে।"

শিশুকে আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইয়া বৃদ্ধ সাধক ধীর পদে মাদিরাজের ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণের সন্তানকে উপনয়নের পর শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী হইতে হয়। পিতা তাই বসভেশ্বরের শিক্ষার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বালকের মেধা ও প্রতিভা অমানুষী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভৃতি একের পর এক সে আয়ত্ত করিতে থাকে। অভ্যাসমতো শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী থাকিলেও মনে কিন্তু তাহার তৃপ্তি নাই, প্রসন্নতা নাই। জন্মগত সংস্কার কেবলই তাহার মনকে উধাও করিয়া নেয় কোন্ এক অজানার আকর্ষণে। এই কচি বয়সেই সাধন-ভজন ও ধ্যান-ধারণার দিকেই মন বেশী ঝুঁকিয়া পড়িতে চায়।

বাগওয়াড়ীতে বহু অগ্রহার[১] ব্রাহ্মণের বাস। বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়া-কর্ম্মে ইহারা সবাই ছিলেন পারদর্শী। কিন্তু বালক বসভের কাছে কি জানি কেন এগুলি ছিল অর্থহীন ও প্রাণহীন বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। বরং ইহার চাইতে মাতুলালয় ইংগলেশ্বরের ভক্তিময় পরিবেশ আর শিবভক্ত সাধু সজ্জনদের সান্নিধ্য তাঁহার কাছে ছিল অনেক বেশী আকর্ষণীয়। বালক বয়সে মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁহাকে ইংগলেশ্বরে গিয়া বাস করিতে হইত। তাই এখানকার প্রভাব ছোটবেলা হইতেই তাঁহার জীবনে বড় হইয়া দেখা দেয়।

ইংগলেশ্বরের শিব বিগ্রহ রেবন-সিদ্ধেশ্বরের খ্যাতি বহুদিনের।[২] স্থানীয় জনসাধারণের পরম শ্রদ্ধার বস্তু এটি। একটি প্রাচীন গুহায় এ বিগ্রহটি অধিষ্ঠিত। পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে দূর-দূরান্ত হইতে শত শত নরনারী এই পবিত্র গুহায় আসিয়া সমবেত হয়, রেবন-সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের উদ্দেশে জানায় অন্তরের যত কিছু আকুতি। এই বিগ্রহের কাছে ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী নির্ধনের কোন ভেদ-বৈষম্য ছিল না। উদার সার্ব্বভৌম শিব সাধনা ছিল এখানকার বিশেষত্ব।

ইংগলেশ্বরের দিব্য মণ্ডপ বা মহামনে-তে জড়ো হইতেন দেশ-বিদেশের শৈব সাধু-সন্ন্যাসীরা, ইহাদের সান্নিধ্যে আসিয়া তত্ত্ব ও সাধনের উপদেশ নিয়া গৃহস্থ নরনারীরা উপকৃত হইত। বসভেশ্বরের মাতুল বলদেব এবং মাতা মাদাম্বা স্বভাবতঃই ভক্তিভরে এই সব সাধু সন্ন্যাসীদের সেবা-যত্ন করিতেন, ধন্য হইতেন তাঁহাদের উপদেশ ও কৃপালাভে। বালক বসভেশ্বরের মানসপটে এই সব শৈব সন্ন্যাসীর স্মৃতি চিরতরে মুদ্রিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই পরিবেশে তাঁহার জীবনে শিবভক্তির উদয় হয় অতি স্বাভাবিকভাবে।

বসভেশ্বর তখন অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। পিতা মাদিরাজ তাঁহার উপনয়ন সংস্কারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গ্রামের

১ বসভেশ্বরের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন অগ্রহার ব্রাহ্মণ, কাম্যকুল ও সাংখ্যায়ন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। (সিংগিরাজ পুরাণ—১২শ খণ্ড)

২ হরিহর: বসভরাজ দেবর রগলে, পৃঃ ১-১০

স্বগোত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সবাই অগ্রহার-যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠানে তাঁহারা দক্ষ ও উৎসাহী, আর এদিকে মাদিরাজও সমাজে ধনবান্ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। তাই উপনয়নের অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার সঙ্গে সামাজিক উৎসব-আনন্দও সেদিন কম দেখা গেল না।

অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যেই বালক বসভের জীবনে ঘটিয়া যায় চরম দুর্দ্দৈব। পিতা ও মাতা গৃহের সবাইকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। ইহার অল্প কিছুদিন পরেই জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নাগলাম্বের সঙ্গে বসভ চলিয়া যান তাঁহার মাতুলালয় ইংগলেশ্বরে। ফলে বসভেশ্বর কিছুদিনের মধ্যেই রেবন-সিদ্ধেশ্বরে সমাগত সাধকদের প্রভাব গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়েন।

শৈব সাধনার এক নূতনতর, উদারতর পন্থার দিকে অতঃপর তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন।[১]

মাতুল বলদেব রাজসরকারে কাজ করেন। বৎসরের বেশীর ভাগ সময় কল্যাণ শহরে (তৎকালীন মঙ্গলওয়াড়া) তাঁহাকে বাস করিতে হয়। তাই মাতামহীর অভিভাবকত্বে এবং আদরযত্নে তিনি ও তাঁহার ভগ্নী নাগলাম্ব লালিত হইতে থাকেন।

মাতামহী ছিলেন এক খ্যাতনামা শিবভক্তি-সিদ্ধা সাধিকা। স্থানীয় মহামনে বা ধর্ম্মসভায় যে সব সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন ঘটিত তাঁহারা সবাই এই বৃদ্ধা মহিলাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন; তাঁহার সেবা-যত্নে আপ্যায়িত হইতেন। বালক বসভও পরমানন্দে ঘোরা-ফেরা করিতেন এই সব সাধু-সজ্জনদের সঙ্গে। রেবন-সিদ্ধেশ্বর এখান হইতে খুব বেশী দূরে নয়। লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন

১ গবেষকদের মতে, বীরশৈব সম্প্রদায়ের পূর্ব্বসূরীরা রেবন-সিদ্ধেশ্বরের প্রভাবেই অনেকাংশে প্রভাবিত হন এবং বেদাচার বহির্ভূত শিব-আরাধনার এক নূতনতর বৈপ্লবিক ধারার প্রবর্তন করেন। উত্তরকালে বসভেশ্বর এই সাধকদের ধ্যান-ধারণাকেই রূপায়িত করেন।

সাধু-সন্ন্যাসী, বহু শক্তিধর সিদ্ধপুরুষ এ অঞ্চলে যাওয়া-আসা করিতেন। বেদাচারের বাহিরে এক সর্ব্বজনীন শিবভক্তির আন্দোলন ইঁহাদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেখানে গড়িয়া উঠিতেছিল।

এ অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শৈব তীর্থ কুড়ল-সঙ্গম খুব বেশী দূরে নয়। লিঙ্গায়েৎ সাধু ও শৈব যোগীদের কয়েকটি সিদ্ধ-গুহা ও সাধনকেন্দ্র প্রাচীনকাল হইতেই সেখানে রহিয়াছে। সেখানকার সাধকেরা অনেক সময় ইংগলেশ্বরের মহামনে বা ধর্ম্মসভায় আসিয়া জুটিতেন। মাতামহী ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নাগলাম্বের সহিত বসভও এই সব সাধুদের সান্নিধ্য উপভোগ করিতেন প্রাণ ভরিয়া। শৈব ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধনক্রম তিনি এই সুযোগে শ্রদ্ধাভরে তাঁহাদের নিকট হইতে জানিয়া নিতেন।

ইংগলেশ্বরে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়। বসভ এবার পদার্পণ করেন ষোল বৎসরে। কৈশোর ও যৌবনের এই সন্ধিক্ষণেই তাঁহার জীবনে ফুটিয়া উঠে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মননশীলতা। শৈব ধর্ম্মের, বিশেষতঃ লিঙ্গায়েৎদের সর্ব্বজনীন উদার মতবাদের গভীরে প্রবেশ করার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া পড়েন।

বালককাল হইতেই ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক দিক্‌টি তাঁহাকে আকৃষ্ট করে নাই। বাগওয়াড়ীর আত্মীয়-স্বজনেরা খ্যাতনামা কর্ম্মকাণ্ডী পণ্ডিত। যে কোনো পূজা-পার্ব্বণে উৎসবে তাঁহারা বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড ও যাগযজ্ঞ নিয়া মাতিয়া উঠেন, ধর্ম্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠার চাইতে বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানই যেন তাঁহাদের কাছে বড় হইয়া উঠে। এ অনুষ্ঠানে আত্মিক সংবেদন তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ যে শুধু ধর্ম্মের প্রাণহীন কাঠামো বা খোলস নিয়া অকারণ মাতামাতি করা।

তরুণ বসভেশ্বরের অন্তর এবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসে। উপনয়নের সংস্কার তিনি অগ্রাহ্য করেন, আর উপবীত ছিন্ন করিয়া আসিয়া দাঁড়ান লিঙ্গায়েতী সাধু-সন্ন্যাসীদের আস্তানায়। এখন হইতে সেই পরম শিবেরই আরাধনা ও সাধনা তিনি করিবেন, যাঁহার কৃপায় পণ্ডিত মূর্খ ও ব্রাহ্মণ অন্ত্যজের ভেদবৈষম্য ঘুচিয়া যায়, ধনী

নিধন আচারী অনাচারীর পার্থক্য হয় দূরীভূত। খণ্ড বুদ্ধির পরপারে যে দেবাদিদেব বিবাজিত, যাঁহার অখণ্ড পরমসত্তায় বিশ্বসৃষ্টির স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছু ওতপ্রোত, সেই পরমপুরুষের কাছেই নিজেকে করিবেন তিনি উৎসর্গীত।

অধ্যাত্ম-জীবনের এই বিপ্লব-সূচনায় বসভের সারা অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠে শৈব সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র কুড়ল-সঙ্গমে গমনের জন্য। সেখানে গিয়া কঠোর সাধনায় ব্রতী না হওয়া অবধি জীবনে যে তাঁহার শান্তি নাই, স্বস্তি নাই।

দেবাদিদেব বুঝি তাঁহার ভক্তের অন্তরের এই আকুতি শুনিতে পাইলেন। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটানোর জন্য অচিরে পরম সুযোগ মিলিয়া গেল। বসভের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নাগলাম্বে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, ভক্তিমতী সাধিকা বলিয়া তাঁহার সুনামও এ অঞ্চলে ইতিমধ্যে রটিয়া গিয়াছে। মাতামহী ঠিক করিলেন এবার তাঁহার বিবাহ দিবেন। কুড়ল-সঙ্গমের এক ধনবান্ ও ভক্তিমান্ বংশের ছেলে শিবদাস। রূপে গুণে সব দিক দিয়াই সে নাগলাম্বের বর হইবার উপযুক্ত। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সাড়ম্বরে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। বসভেরও সুযোগ আসিল তাঁহার বহু ঈপ্সিত তীর্থ কুড়ল-সঙ্গমে যাওয়ার জন্য।

মাতামহীকে কহিলেন, "কুড়ল-সঙ্গম সাধু তপস্বীদের স্থান তো বটেই, তাছাড়া সেখানে রয়েছে শাস্ত্রপাঠের ও আত্মিকজীবন গঠনের পরম সুযোগ। ঠিক করেছি, আমি এবার সেখানে থেকেই শাস্ত্রপাঠ করবো, সাধন-ভজনে রত হবো।"

দিদি নাগলাম্বের তো উৎসাহের অবধি নাই। ছোট ভাই তাঁহার কাছাকাছি থাকিবে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে? তিনিও মাতামহীকে চাপিয়া ধরিলেন। এবার বসভের কুড়ল-সঙ্গমে যাওয়ার পক্ষে আর কোন বাধা রহিল না। অচিরে সেখানে পৌঁছিয়া একটি বিদ্যাকেন্দ্রে তিনি আশ্রয় নিলেন, তারপর ব্রতী হইলেন আত্ম-উজ্জীবনের সাধনায়।

কুড়ল-সঙ্গম এ সময়ে খ্যাত ছিল বেদ, উপনিষদ, আগম এবং কাব্য পুরাণ প্রভৃতির পঠন-পাঠনের জন্য। ১১৬০ খৃষ্টাব্দে এ স্থানে যে চারিটি বিশাল শিলালেখ পাওয়া যায়, তাহাতে বলা হইয়াছে,—'কুড়ল-সঙ্গম সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণদের আবাস স্থল, আর এখানকার সন্ন্যাসী সাধক বা মহাজনেরা সারা কানাড়ায় প্রসিদ্ধ তাঁহাদের বিদ্যাবত্তার জন্য। ঈশানীয়-গুরু এই মহান্ বিদ্যাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ।'

বসভের মেধা প্রতিভা ও জ্ঞানতৃষ্ণার পরিচয় পাইয়া এই ঈশানীয়-গুরুই গ্রহণ করিলেন তাঁহার শিক্ষাগুরুর স্থান।

বসভের মনের স্বাভাবিক ঝোঁক কিন্তু শৈবশাস্ত্র ও শৈবসাধকদের তথ্য আহরণের দিকে। অল্প দিনের মধ্যে দাসিমায়. রেবনসিদ্ধ, মাদরণ, কেশিরাজ প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষদের কথা ও তাঁহাদের তত্ত্ব-উপদেশ তিনি জানিয়া নিলেন। তেষট্টি পুরাণ বা তামিলী নাইনারদের কাহিনী অধ্যয়ন শেষ করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

শাস্ত্র ও ধর্ম্মসাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তরুণ বসভের হৃদয়ে শিবভক্তির ধারাস্রোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

এখানকার নির্জ্জনতা, নিসর্গ-সৌন্দর্য্য ও আনন্দময় পরিবেশ স্বতঃই মনকে রসাবিষ্ট করিয়া তোলে। সব চাইতে বড় কথা, এখানে আসিয়া বসভ লাভ করেন জাগ্রত বিগ্রহ সঙ্গমেশ্বরের সান্নিধ্য।

প্রতিদিন প্রত্যূষের আগেই বসভ শয্যাত্যাগ করেন। কৃষ্ণা ও মলপ্রভার পুণ্য সঙ্গমে গিয়া সমাপন করেন তাঁহার অবগাহন স্নান। তারপর নিজহাতে রাশি রাশি পুষ্প চয়ন করিয়া উপনীত হন প্রভু সঙ্গমেশ্বরের মন্দির দ্বারে। ধ্যান ভজন ও স্তবগানে প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হয়। দিনে রাতে এমনি করিয়া চলে ইষ্টদেবের আরাধনা।

সেদিন পূজা ধ্যান সারিয়া সবে তিনি মন্দির চত্বর হইতে বাহিরে আসিয়াছেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে অদূরে দণ্ডায়মান জটাজুটধারী এক

শৈব সন্ন্যাসীর উপর। বসভের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

বসভ শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন করিতেই সন্ন্যাসী প্রসন্ন মনে আশীর্ব্বাদ করেন, স্নিগ্ধ স্বরে কহেন, "বৎস, আমি যে তোমারই জন্য এতদিন অপেক্ষা করে আছি। তুমি প্রভু সঙ্গমেশ্বরের চরণতলে এসে গিয়েছো, ভালই হয়েছে।"

বসভের সারা দেহ-মন-প্রাণ স্বর্গীয় আনন্দে আবিষ্ট হইয়া উঠে। মনে হয়, এ সন্ন্যাসী যেন তাঁহার অতি পরিচিত, অতি আপনার জন। কিন্তু কে তিনি, কি তাঁহার পরিচয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

সন্ন্যাসী এবার তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিযা কহেন, "বসভ, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের। আমি তোমায় ঘনিষ্ঠভাবে জানি, বৎস। কিন্তু তোমার পক্ষে আমার পবিচয় জানা সম্ভব নয়। এ অঞ্চলের ভক্ত-সাধকেরা সবাই আমায় জানে জাতবেদমুনি বলে। তোমার পিতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তোমাদের গ্রাম বাগওয়াড়ীতেও আমি গিয়েছি।"

"তাহলে, তখনই কি আপনাকে দেখেছি, প্রভু?" করজোড়ে বসভ নিবেদন করেন।

"না বৎস, তুমি তখন সদ্যপ্রসূত শিশু মাত্র। আমার স্মৃতি ধরে রাখবার মতো বয়স তখন তোমার কই? বাগওয়াড়ীর নন্দীমন্দিরে কয়েকটা দিন অতিবাহিত করতে গিয়েছিলাম—আর তা তোমারই কারণে। প্রভু সঙ্গমেশ্বরের প্রত্যাদেশ পেয়ে তোমায় আমি দিয়েছিলাম লিঙ্গায়েৎ শৈবদের প্রথা অনুযায়ী লিঙ্গ-দীক্ষা, তোমার কণ্ঠে স্থাপন করেছিলাম লিঙ্গ প্রতীক। প্রভু সঙ্গমেশ্বরের চিহ্নিত ভক্ত তুমি, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক কিছু কাজ তোমায় করতে হবে। পরে জানতে পারবে সব।"

"প্রভু, আমি বালক মাত্র। শৈশব থেকেই অজানিতভাবে ইষ্টরূপে গ্রহণ করেছি দেবাদিদেব মহাদেবকে। কিন্তু এই ইষ্টের

দর্শন কি করে হবে, কি করে তাঁর সেবায় মন-প্রাণ ঢেলে দেবো, তা আমার জানা নেই। এই অবোধ অজ্ঞান বালককে আপনি কৃপা করে আশ্রয় দিন, পরম পথের সন্ধান দিয়ে কৃতার্থ করুন।"

"সেইজন্যেই তো এ স্থানে আমার আগমন। বৎস, তোমায় আমি নূতন করে লিঙ্গ-দীক্ষা দেবো, আর দেবো নিগূঢ় সাধনার গভীরে প্রবেশ লাভের উপদেশ, কিন্তু এ সবই প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র। এই সঙ্গে তোমায় প্রাচীন ও নবীন শাস্ত্রে পারঙ্গম হতে হবে। শৈবধর্ম্মের প্রচারে, জন-জীবনের উন্নয়নে, তোমার একটা বিধি-নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কাজেই সাধনা ও সিদ্ধির সঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞানও তোমায় আয়ত্ত করতে হবে।"

সেদিন এমনি আকস্মিকভাবে ঐশী কৃপার দ্বার উন্মোচিত হয় বসভের জীবনে। জাতবেদমুনির প্রভাবে এখন হইতে অতি সহজে কুড়ল-সঙ্গমের বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রবিদের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিতে থাকে।

সহজাত শুভসংস্কার ও সাধননিষ্ঠা বসভের রহিয়াছে, তদুপরি রহিয়াছে শক্তিধর গুরুর নির্দ্দেশ ও পরিচালনা। তাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার সাধনজীবনে যেমন রূপান্তর ঘটে, তেমনি তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠেন প্রাচীন বেদ-বেদাঙ্গ আগম এবং আধুনিক শাস্ত্র ও প্রকরণ গ্রন্থের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে।

সাধনা ও শাস্ত্র অধ্যয়নের মধ্য দিয়া বসভের মনে ইষ্টভাবনা ও শিবতত্ত্বের একটা নূতনতর উপলব্ধি ফুটিয়া উঠে। পরমতত্ত্ব হিসাবে শিব অনাদি ও অনন্ত, অবিনশ্বর। বিশ্ব সৃষ্টির সব কিছু তাঁহা হইতেই উদ্ভূত-- আবার লয় হয় তাঁহাতেই। চেতন, অচেতন, স্থাবর জঙ্গম সবই শিবের শরীর, শিবময়। তবে তাঁহার সৃষ্ট এই বিশ্ব-সংসারে উচ্চ-নীচের ভেদবৈষম্য কেন থাকিবে?

পৌরাণিক যুগের শিবের ক্ষেত্রেও দেখা যায়—তিনি আশুতোষ, পরম কারুণিক। আর্য্য-অনার্য্য, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, পণ্ডিত-মূর্খের ভেদ

তাঁহার কাছে নাই। হিমালয় শিখরের গলিত তুষারের মতো তাঁহার কৃপার ধারা সতত সর্ব্বত্র ঝরিয়া পড়িতেছে। শিবের বৈশিষ্ট্য—তাঁহার মহা করুণা। তবে এই করুণার ধারাকে সমাজের সর্ব্ব স্তরে কেন ছড়াইয়া দেওয়া হইবে না? জাতিভেদের প্রাচীর কেন মাথা উঁচাইয়া থাকিবে শিবভক্ত জঙ্গমদের মধ্যে? কৃত্রিম বর্ণভেদের বিলোপসাধন করিয়া, স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য দূর করিয়া কেন শিব-আরাধনা ও শিবলোকের কল্যাণধারাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হইবে না?

গুরু জাতবেদমুনির কাছে বসভ মাঝে মাঝে তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করেন। গুরু সুস্পষ্ট কোন নির্দ্দেশ দেন না. প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে দুই চারিটি কথা বলিয়া উঠিয়া যান।

সেদিন দুজনে এ বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ হইল। বসভ সবিনয়ে কহিলেন, "গুরুদেব, শৈবযোগ ও শিবভক্তি আজ যে পর্য্যায়ে রয়েছে তাতে আমার মনে শান্তি খুঁজে পাচ্ছি না।"

"কি ব্যাপার, খুলে বলতো।"

"শৈবধর্ম্ম করুণার ধর্ম্ম, সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম। একদল আচার্য্য ও সাধুমণ্ডলীর গণ্ডীর মধ্যে একে এমন করে সীমাবদ্ধ করে রাখা কেন? বৈদিক অবৈদিক, আর্য্য দ্রাবিড়, ব্রাহ্মণ শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলের মধ্যেই শিবের আরাধনাকে ছড়িয়ে দেওয়া হোক না কেন?"

"বেশ তো, বৎস, এতো অতি উত্তম কথা।"

"প্রভু, আজকের দিনের সমাজের দিকে চেয়ে দেখুন। ধর্ম্ম, ন্যায়নীতি বলতে কিছু নেই। স্বার্থের কলুষে দেশ ভরে গিয়েছে। এ সময়ে শৈবধর্ম্মেরই বা কি দুর্দ্দশা। সাধকেরা নেমে গিয়েছে গোপন বীভৎস পাপাচারের পথে। আজ এ ধর্ম্মের উজ্জীবন চাই। প্রকৃত শিবভক্তির মধ্য দিয়ে এ উজ্জীবনকে সার্থক করে তুলতে হবে, নিয়ে যেতে হবে দীন হীন প্রতি মানুষের দ্বারে, দেবাদিদেব আশুতোষের প্রসন্নতা লাভ করবে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সবাই।"

"বসভ, কানাড়ায়, শুধু কানাড়া কেন সারা দক্ষিণ ভারতে, এক নূতন শৈব আন্দোলন আসন্ন, তা আমি জানি। এই আন্দোলন সফল হবে তোমার সাধনা ও সিদ্ধিতে। কিন্তু বৎস, এজন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি তো চাই।"

"আদেশ করুন, এই মুহূর্ত্তে আমি সকল কিছু ত্যাগ করে শৈব সন্ন্যাস গ্রহণ করি। সারা দেহ মন নিয়োজিত করি ঈশ্বরের এই মহান্ কর্ম্মে।"

"না বৎস, এজন্য তোমার সন্ন্যাস নেবার প্রয়োজন নেই। বরং গৃহে থেকে, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকেই তোমায় করতে হবে এই নূতন শৈব আন্দোলনের নেতৃত্ব।"

"আপনার কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে, প্রভু। আমায় একটু বুঝিয়ে বলুন।"

"জানতো কর্ণাটী শৈব সাধকদের কথা—'কায়কভে কৈলাস', অর্থাৎ কায়ক বা কর্ম্ম হচ্ছে মানব-জীবনের কৈলাস। এই কায়ক সাধনা তোমায় গ্রহণ করতে হবে, কৈলাসপতির সংসারকে করে তুলতে হবে কৈলাসস্বরূপ। কায়কের মূল কথা, দেহ মনকে ব্যবহারিক কর্ম্মে নিয়োজিত রাখতে হবে এবং এই ব্যবহারিক কর্ম্মকেই বিশ্বাস করতে হবে ঐশ্বরীয় কর্ম্ম বলে। দেহ মনের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সাধনায় যে ঐকতান বেজে উঠবে, তার ফলে মানবসমাজে নেমে আসবে মুক্তির স্বর্গ। আরও একটা কথা আছে। ব্যবহারিক কর্ম্মজাত সমস্ত অর্থ নিবেদন করতে হবে শিবভক্ত ও শিবযোগী জঙ্গমদের সেবায়। স্মরণ রাখবে এই সঙ্গে, শিবে পূর্ণ আসক্তি ছাড়া কর্ম্মে অনাসক্তি জন্মে না। শিবে পূর্ণ আত্মোৎসর্গ ছাড়া এ সাধনা সম্ভব নয়।"

"বেশ, আপনার অনুমতি পেলে এই সাধন-পথই আমি আজ থেকে বেছে নেবো।"

"তাই নাও বৎস। আর এ সঙ্গে তৈরী হও গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করার জন্য। অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যের প্রশাসনের ভারও তুমি

পাবে। শৈবধর্ম্মের নব জাগৃতির জন্য তার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বসভ, মূল কথাটি কোনদিন যেন বিস্মৃত হয়ো না, তা হচ্ছে—কায়কভে কৈলাস।”

“কর্ম্মজীবনের মধ্য দিয়ে আত্মার মুক্তিসাধন, এ বড়ো কঠিন কাজ প্রভু। আপনার আদেশে সঙ্কল্প আমি গ্রহণ করেছি, কিন্তু এই সঙ্গে মনে ভয়ও হচ্ছে, এই কঠিন ব্রত উদযাপন করে দেবাদিদেবের পরম পদে আমি পৌঁছুতে পারবো তো।”

“ভয় নেই বসভ, তোমার দিকে আজ শুধু আমার স্নেহদৃষ্টি রয়েছে তাই নয়, অল্লাম প্রভুদেবের প্রসন্ন দৃষ্টিও রয়েছে তোমার উপর নিবদ্ধ।”

“প্রভুদেবের নাম আমি শুনে আসছি, এখনো তাঁর দর্শন পাবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। প্রকৃত পরিচয়ও জানা নেই।”

“মনে রেখো, প্রভুদেব অল্লাম হচ্ছেন শিবসাধনা ও শিবসিদ্ধির ঘনীভূত বিগ্রহ। দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শৈবযোগী বলে তিনি সাধক সমাজে স্বীকৃত। যোগবিভূতির দিক্ দিয়ে অনেকে তাঁকে তুলনীয় মনে করেন মহাযোগী গোরখনাথের সঙ্গে। ধর্ম্ম ও সমাজের দুর্গতিতে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছে, শৈবধর্ম্মের একটা পুনরুত্থান তিনি চান। তোমার মতো শক্তিমান্ সাধকের উপর তাঁর দৃষ্টি তাই রয়েছে।”

“তার দর্শনের সৌভাগ্য কি আমার হবে না?”

“এখনো সময় হয় নি বৎস। যথাসময়ে তুমি তাঁর সান্নিধ্য ও সহায়তা পাবে।”

স্মিত হাস্যে বসভকে আশিস্ জানাইয়া জাতবেদমুনি ধীর পদে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কূড়ল-সঙ্গমের মঠ মন্দিরে, সাধক ও পণ্ডিতসমাজে বসভ ক্রমে সুপরিচিত হইয়া উঠেন। যে কোন মহামনে-তে বা ধর্ম্মসভায় যান, এই নবীন শিবভক্তের ব্যক্তিত্ব ও মতবাদ জনগণকে সচকিত করিয়া তোলে। তাঁহার উদার দৃষ্টিভঙ্গী, সর্ব্বজনীন শৈববাদ, ধারালো যুক্তিতর্ক সবাইকে মুগ্ধ করিতে থাকে।

গুরুর আদেশ, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিয়া করিতে হইবে। কিন্তু কোথায় এ কাজ শুরু করিবেন? মঙ্গলওয়াড় চালুক্যদের শাসনকর্ত্তা বিজ্জলের রাজধানী, সেখানেই জীবিকার উদ্দেশ্যে গিয়া উপস্থিত হন। প্রথমটায় কিছুটা অসুবিধায় পড়িলেন। প্রভু সঙ্গমেশ্বর ঠিক কোথায় তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন তাহা জানা নাই। যাই হোক যে কোন একটা কাজ তাড়াতাড়ি না জুটাইতে পারিলে বিপদ। কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর রাজকোষাগারে হিসাবরক্ষকের এক শিক্ষানবীশী কাজ তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

আত্মিক সাধনা আর ব্যবহারিক কর্ম্ম দুইয়েতেই বসভের সমান নিষ্ঠা। যথাসাধ্য শ্রম ও দক্ষতার সহিত তিনি কাজে রত হইলেন। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝিলেন, কর্ম্মচারীরা সবাই বড় অলস প্রকৃতির। সরকারী কাজে শৈথিল্য যেমন রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে অজস্র ভুলভ্রান্তি। একটি বড় হিসাবের ভুল তাঁহার নজরে পড়িল। সিদ্ধ-দণ্ডাধিপ তখন কোষাগারের অধ্যক্ষ। বসভ তখনই সরাসরি তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত।

হিসাবের খাতায় এ ধরনের মারাত্মক ভুল দেখিয়া তো অধ্যক্ষের চক্ষুস্থির। তখনই উহা সংশোধনের আদেশ দিলেন।

বসভের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এবার তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন স্থায়ী চাকুরীতে।

তরুণ কর্ম্মচারীর পরিচয় নিতে গিয়া সিদ্ধ-দণ্ডাধিপের আনন্দের অবধি রহিল না, কহিলেন, "দেখ্‌ছি, তোমার পিতা মাদিরাজ আমার জ্ঞাতি, তুমি আমার আত্মীয় হয়ে অন্যত্র কেন থাকবে? এখন থেকে আমার গৃহে এসে বাস করতে থাকো।"

সিদ্ধ-দণ্ডাধিপের সস্নেহ পৃষ্ঠপোষকতায় ও নিজের দক্ষতার গুণে উপর্য্যুপরি বসভের পদোন্নতি ঘটিতে থাকে। ক্রমে এই সুদক্ষ, ন্যায়নিষ্ঠ, তরুণ কর্ম্মচারীর প্রতি প্রদেশের শাসক বিজ্জলের দৃষ্টিও

আকৃষ্ট হয়। বসভকে সরকারী কোষাগারের দায়িত্বপূর্ণ কাজে তিনি নিযুক্ত করেন।

কয়েক বৎসর পরে সিদ্ধ-দণ্ডাধিপ লোকান্তরে চলিয়া যান এবং বিজ্জল তরুণ বসভকেই প্রদান করেন অধ্যক্ষের পদ। বসভ একজন শৈবসাধক, কুড়ল-সঙ্গমের সাধু-সন্ন্যাসী ও ঈশানীয়-গুরু প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার গুণমুগ্ধ একথা বিজ্জল শুনিয়াছেন। বসভ ইতিমধ্যে মঙ্গলওয়াড়-এ অবস্থান করিয়া একটি শিবভক্ত গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়াছেন, একথাও তাঁহার জানা আছে। তাই এই তরুণ ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ম্মচারীকে রাজকোষাগারের অধ্যক্ষ পদে বরণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইলেন।

ভাণ্ডারী বা অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের পর বসভ গুরুর আদেশে বিবাহ করেন। সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা, পরম ভক্তিমতী, গঙ্গাম্বি পত্নীরূপে তাঁহার গৃহে অধিষ্ঠিতা হন। স্বামীর সংসার এবং শিবভক্ত শরণদের সেবা, দুইই তিনি আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরিয়া তোলেন।

গুরু জাতবেদমুনির উপদেশ বসভ মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, কর্ম্মজীবনকে কৈলাসে পরিণত করিতে হইবে আর আত্মিক সাধনাকে ছড়াইয়া দিতে হইবে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে। তাই মঙ্গলওয়াড়ে থাকিয়া রাজস্ব বিভাগের কার্য্যে যেমন দক্ষতা ও তৎপরতা তিনি দেখাইতেন, কুড়ল-সঙ্গমে গেলেও তেমনি ফুটিয়া উঠিত তাঁহার অপরিসীম ইষ্টনিষ্ঠা ও ধ্যান-ভজনের দিব্য আবেশ।

বিজ্জল ছিলেন শৈবসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। বসভের শৈব দীক্ষা ও সাধনার খ্যাতি তিনি শুনিয়াছেন, সচিব তাঁহারই ধর্ম্মপথের পথিক, ইহাতে তিনি মনে মনে মহা আনন্দিত। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বিজ্জল বুঝিলেন, বসভ প্রাচীন শৈববাদের অনুগামী নহেন, বেদাচার বহির্ভূত, সংস্কারপন্থী, এক নূতন শৈবধর্ম্ম তিনি স্থাপন করিতে উৎসুক। বিজ্জলের মনে সচিব সম্বন্ধে দ্বিধা ও সংশয় জাগিয়া উঠে। কিন্তু আবার ভাবেন, এই তরুণ সাধক কুড়ল-সঙ্গমের

সাধু-সন্ন্যাসীদের পরমপ্রীতিভাজন, তা ছাড়া, কানাড়ার শিবভক্ত সাধু ও গৃহস্থেরা দলে দলে তাঁহার কাছে আসা-যাওয়া করিতেছে। তাঁহার এই জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনের মধ্যে আপত্তি করার তো কিছু নাই। বরং শাসনকর্ত্তা হিসাবে বিজ্জলের কাজের পক্ষে ইহা কিছুটা সহায়কই হইবে।

ব্যবহারিক কর্ম্ম আর শিব-সাধনার অপরূপ সমন্বয় সাধন করিয়াছেন বসভ, তাঁহার নূতন সুসংস্কৃত শৈববাদ প্রচারেও হইয়াছেন উদ্বুদ্ধ। এ সময়ে একবার তিনি কুড়ল-সঙ্গমে গিয়া উপস্থিত হন।

গুরু জাতবেদমুনির সহিত সাক্ষাৎ হইতেই স্মিতহাস্যে তিনি কহিলেন, "বৎস বসভ, তোমার ভাগ্য আজ বড় সুপ্রসন্ন। অল্লাম প্রভু এ সময়ে এখানে উপস্থিত। তোমার প্রসঙ্গ উঠিতেই কহিলেন, —তোমার সাধনা সিদ্ধির পথে এগিয়ে এসেছে। তাই ভাবছি, বড় সুসময়েই তুমি এসে পড়েছো।"

অল্লাম প্রভুর চরণে প্রণাম নিবেদন করিতেই বসভকে তিনি প্রাণ ভরিয়া করিলেন আশীর্ব্বাদ। তারপর স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "বসভ, দেখতে পাচ্ছি তোমার কায়ক-সাধনা ও ইষ্টনিষ্ঠা ঠিক পথেই চলেছে। কিন্তু বৎস, ইষ্টদর্শন না হলে তো তোমার কায়ক-সাধনা দৃঢ়ভূমিতে স্থাপিত হবে না। কর্ম্মক্ষেত্রকে কৈলাসে পরিণত করার সঙ্কল্প তুমি গ্রহণ করেছো, কিন্তু কৈলাসপতির দর্শন না পেলে তো সে সাধনায় সহজে তুমি জয়যুক্ত হবে না। ইষ্টদর্শন লাভ করে ইষ্টের আশীর্ব্বাণী নিয়ে অগ্রসর হও, তবেই তো শৈবধর্ম্মের পুনর্গঠনের ব্রত তোমার সফল হয়ে উঠবে।"

সেদিন গভীর রাত্রে সঙ্গমেশ্বর মন্দিরে গিয়া বসভ ধ্যান-জপে বসিয়াছেন। ভাবাবেশে দীর্ঘ সময় নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ মন্দিরগৃহ স্নিগ্ধ-শুভ্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বর আবির্ভূত হইলেন তাঁহার নয়নসমক্ষে। দৈবীকণ্ঠের বাণী শুনা গেল, "বৎস বসভ, শিবভক্তি ও শিবযোগের উজ্জীবনের

জন্য, প্রচার ও প্রসারের জন্য, যে সঙ্কল্প তুমি করেছো, তা অবশ্য সিদ্ধ হবে। সহস্র সহস্র সাধকজন, শিবভক্ত নরনারী তোমার সহায়তার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে, তাদের ভেতর তোমার সাধনা ও সিদ্ধির কল্যাণ-ধারা তুমি বিস্তারিত করে দাও।"

জ্যোতির্ম্ময় দিব্য মূর্ত্তিটি ধীরে ধীরে এবার মন্দিরের লিঙ্গ প্রতীকে মিলাইয়া যায়। সাধক বসভের অন্তরে বার বার অনুরণিত হইতে থাকে দৈবী কণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার। দ্রুতপদে তখনই তিনি ছুটিয়া যান যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভুর কাছে। যুক্তকরে, কাতর কণ্ঠে, অনুনয় করেন, "প্রভুদেব, আপনার কৃপায় এ দাস ধন্য হয়েছে। কিন্তু কৃপার ধারা একবার উন্মুক্ত করে আর যেন আমায় বঞ্চিত করবেন না।"

"বৎস, তুমি শান্ত হও, স্থির হয়ে বসো"—স্নিগ্ধ-মধুর হাস্তে অল্লাম প্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দেন।

"প্রভু, আমার প্রার্থনা আপনাকে পূর্ণ করতেই হবে। নিজের সম্বন্ধে আমার মূল্যবোধ রয়েছে, আমার শক্তি যে সীমাবদ্ধ সে সম্বন্ধে আমি সচেতন। শৈবধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় এক বিরাট কাজ, অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐশ্বরীয় কাজ। সাক্ষাৎভাবে আপনি আমায় সহায়তা না করলে আমার পক্ষে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।"

"বসভ, আমি যাঁকে জীবনভর ধ্যেয়াই সেই ইষ্টের দর্শন তুমি লাভ করেছো। তাঁর আশীর্ব্বাদও পেয়েছো। শিবের আদিষ্ট কাজে, শিব স্মরণ করে, তুমি অগ্রসর হও। পাপাচার আর কলুষে শৈব-সম্প্রদায় ভরে উঠেছে, এর সংস্কার সাধন কর সর্ব্বাগ্রে। লিঙ্গ-দীক্ষার ভেতর দিয়ে সহস্র সহস্র বীরশৈব সাধক সৃষ্টি কর দেশের দিকে দিকে। এই পুনর্গঠিত শৈবেরা পরিচিত হবে বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎ বলে। আর একাজে আমার সাহায্য অদূর ভবিষ্যতে, প্রয়োজনমতো, অবশ্যই তুমি পাবে, বৎস।"

অল্লাম-প্রভু ও সমবেত শিবযোগীদের পদবন্দনা করিয়া হৃষ্টচিত্তে বসভ মঙ্গলওয়াড়ে ফিরিয়া আসেন।

নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শৈবধর্ম্মের সংস্কার সাধনে ও প্রচারে

তিনি ব্রতী হন। তারপর অচিরে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত হইয়া উঠেন ভক্তি-ভাণ্ডারী বসভেশ্বর নামে।

বসভেশ্বরের প্রচারিত বীরশৈববাদ এবং তাঁহার জীবন ও সাধন-পন্থার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে কানাড়ার ধর্ম্ম আন্দোলনের পশ্চাৎপট অনুধাবন করা দরকার।

বৌদ্ধধর্ম্ম এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল দীর্ঘদিন। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ মহাবংশে দেখা যায়, মহারাজ অশোক বনবাসী (উত্তর কানাড়া) এবং মহিষমণ্ডলে (মহীশূর) ধর্ম্ম প্রচারকদের প্রেরণ করেন। কয়েক শতক ব্যাপিয়া এখানকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বৌদ্ধ মতবাদের প্রতাপ দেখা যায়, তারপর ক্রমে তাহা নিস্তেজ হইয়া আসে। একাদশ শতকেও বল্লিগাভের বৌদ্ধকেন্দ্রের স্মৃতি জনমানব হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। কানাড়ায় জৈনধর্ম্মের প্রভাব অতঃপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রকূট ও গঙ্গবংশের রাজারা সোৎসাহে এ ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, তাই অষ্টম হইতে দশম শতক অবধি এই ভূখণ্ডে দেখিতে পাই জৈন সাধুদের প্রবল প্রতিপত্তি। কোপন ও শ্রবণবেলগোলার জৈনমন্দিরগুলি তখনকার জনসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠে। চালুক্যরাজের সেনাপতি নাগদেবের ভক্তিমতী পত্নী সত্তিমবে প্রায় পনের শত জৈনমন্দির স্থাপন করিয়া যান। এজন্য জনগণ তাঁহাকে আখ্যা দেয়—দান-চিন্তামণি।

কানাড়ায় বৈষ্ণব ও শৈবের সংখ্যা ও একসময়ে নিতান্ত কম ছিল না। চালুক্য রাজারা ছিলেন বিষ্ণুভক্ত, ইষ্টরূপে তাঁহারা বরাহ অবতারের পূজা করিতেন। বাদামীর মনোরম গুহা, মন্দির আজিও এই ইষ্টপূজার স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

মহাত্মা মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগ এবং তন্ত্রের সাধনাও এক সময়ে মহারাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানের মধ্য দিয়া কানাড়ায় ছড়াইয়া পড়ে। শক্তিমান সাধক ও সিদ্ধদের মাধ্যমে জনসমাজে এ সাধনা বিস্তারিত হয়।

ভারতের শৈবধর্ম্ম অতি প্রাচীন। ঋক্‌বেদের রুদ্রের উল্লেখ হইতে এই ধর্ম্ম ও উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরাণিক ও মধ্যযুগে এই শাস্ত্রানুগ শৈবধর্ম্মের বিস্তার সাধিত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে শৈবসম্প্রদায় কতগুলি উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং এক শ্রেণীর সাধকদের মধ্যে মানসিক বিভ্রান্তি ও নৈতিক অধঃপতনের প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়। একাদশ শতকের কানাড়ায় ও শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে নানা পাপাচার ও নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়। পাশুপত (লাকুল), কালামুখ, কাপালিক সবাইর ভিতরেই ছড়াইয়া পড়ে পাপাচার এবং স্খলন পতনের ক্রটি।

বহুলখ্যাত তরুণ বীরশৈব, বসভেশ্বরের ভাগিনেয় ও হাতে-গড়া সাধক, চন্নবসভেশ্বর সমকালীন ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে একটি দোঁহাতে বলিয়াছেন[১] :

শৈব রয়েছে বিমূঢ় হতবাক্ হয়ে,
পাশুপত খুঁজে পাচ্ছেনা পথের সন্ধান,
কালামুখীর দুই চোখে অন্ধত্বের কালো,
মহাব্রতী ঘুরছে তার ঔদ্ধত্য আর অহংকার নিয়ে!
সন্ন্যাসী আজ ঈশ্বরবিমুখ,
কৌল হয়েছে উন্মাদ রোগগ্রস্ত,
ভক্তিমার্গে এই ছয় জনার কাকে আনবে টেনে?

দ্বাদশ শতকে শৈবধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়াস পান তিনটি স্বনামখ্যাত সাধক; সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইঁহাদের প্রভাব ছিল অসামান্য। ইঁহাদের নাম—একান্তদ রামাইয়া, মহামণ্ডলেশ্বর বিরূপরস এবং বীর গাগ্যিদেব। কিন্তু শৈব সাধনা ও সিদ্ধির সহিত সামাজিক উদারতার সমন্বয় সাধনে ইঁহারা সক্ষম হন নাই। এ সমন্বয়ের জয়ধ্বনি সর্ব্বপ্রথমে উচ্চারিত হয় বীরশৈব বসভেশ্বরের

১ ডক্টর পি. বি. দেশাই : বসভেশ্বর অ্যাণ্ড হিজ্ টাইম্‌স

ইষ্টদেব মঙ্গলময় শিবকে বসভ গুরুকৃপায় ও স্বীয় সাধনশক্তি বলে দর্শন করিয়াছেন, উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যময় পরমসত্তা। আর অনুভূতি রাজ্যের এই শিখরে উঠিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, গুরুর কৃপায় অপার করুণায় হইয়াছেন উদ্বেল, শিবতত্ত্বকে জনগণের মধ্যে বিস্তারিত করিতে হইয়াছেন বদ্ধপরিকর। শুধু তাহাই নয়, এই করুণা ও জনকল্যাণের সঙ্কল্প নিয়া বসভেশ্বর কানাড়ায় যে সামাজিক বিপ্লব ও সর্ব্বজনীন মুক্তির সূচনা করেন, ভারতের ধর্ম্মসংস্কৃতির ইতিহাসে আজো তাহা স্মরণীয় হইয়া আছে।

বসভেশ্বর উপলব্ধি করিয়াছেন—তাঁহার ইষ্ট সঙ্গমেশ্বর যে বিভু, তাঁহার সর্ব্বব্যাপী পরমসত্তায় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে ওতপ্রোত, সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময় তাঁহার অস্তিত্ব বসভ অনুভব করিয়াছেন মনপ্রাণ দিয়া। একটি বচনে এ পরম অনুভূতির আভাস পাই[১] :

হে প্রভু, যেখানেই নয়ন দুটি আমি মেলে দিই,
তোমার মাধুর্য্য করি নিরীক্ষণ,
অনাদি অনন্ত মহাকাশের যে দিকেই তাকাই—
নয়ন আমার ভরে ওঠে তোমার রূপে।
তুমিই যে এই বিশ্বসৃষ্টির নয়নের জ্যোতি,
তুমিই যে এর লাবণ্যময় প্রদীপ্ত আনন,
তোমার নিঃসীম হস্ত দুটিই প্রসারিত দিগন্ত জুড়ে,
ওগো কুড়ল-সঙ্গমের দেব,
তোমারই চরণচিহ্ন ছড়ানো দেখি যে দিকে দিকে।

দেবাদিদেবের সীমাহীন ব্যাপ্তি ও অনন্ত ঐশ্বর্য্যের প্রশস্তি গাহিয়া বসভেশ্বর আর একটি অনুপম বচনে বলিতেছেন :

এই বিশ্বসৃষ্টির মতোই
সীমাহীন তুমি প্রভু, স্বর্গের মতোই
তুমি ঊর্দ্ধায়িত, মহীয়ান—

১ দাস্ স্পেক্ বসভ—অনুবাদ : এ. সুন্দররাজ থিয়োডোর

প্রপঞ্চের চাইতেও তুমি বৃহত্তর,
তোমার রাতুল চরণ দুটি স্থাপিত রয়েছে
পৃথিবীর নিম্নতম স্তরে,
আর তোমার উজ্জ্বল কিরীট
ধক্ ধক্ করে জ্বলছে অবিরত
এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি ছাড়িয়ে।

সাধক বসভের আর একটি বড় পরিচয় তাঁহার মানবপ্রীতি—শিবশরণ, শিব-ভক্তদের প্রীতি। সর্ব্বজনীন প্রেম দিয়া যেমন নিজ সাধনাতে তিনি জয়যুক্ত হন, তেমনি ইহারই মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ উদারবুদ্ধি ও ভক্ত মানুষের সঙ্গে তিনি বাঁধা পড়েন নিবিড় বন্ধনে। বসভের অনুভূতিলব্ধ 'বচনে' তাঁহার এই করুণাঘন স্বরূপটি ফুটিয়া উঠিতে দেখি:

করুণার রসধারা আর সঞ্জীবনী শক্তি
নেই যাতে—কি করে তা
অভিহিত হবে ধর্ম্ম বলে ?
করুণার অমৃতধারা পড়বে ঝরে অজস্র ধারায়,
আর লক্ষ কোটি মানুষের জীবনে
করুণার রস সতত হবে উৎসারিত
ধর্ম্ম বিশ্বাসের মূল দেশ থেকে—
তবেই না রক্ষা পাবে এই বিশ্বসংসার।
ওগো, করুণা নেই যেখানে
সেখানে নেই আমার প্রভু দেবাদিদেব কুড়ল-সঙ্গম।

ধর্ম্মজীবনে এবং ব্যবহারিক জীবনে বসভেশ্বরের এখন বিপুল প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি।

দিকে দিকে খ্যাতি রটিয়া যায়—বসভ শিব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কুড়ল-সঙ্গমের শৈব সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রকারেরা তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিবযোগী অল্লাম-প্রভু, সাধক

সমাজে যিনি প্রভুদেব বলিয়া খ্যাত, বসভেশ্বরকে কৃপা করিয়াছেন অকৃপণ করে, আখ্যা দিয়াছেন তাঁহাকে – ভক্তিভাণ্ডারী।

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বিজ্জলের দরবারেও বসভেশ্বর প্রথম সারির সচিব। রাজ্যের রাজস্বের হিসাব ও কোষাগারের পরিচালন-ভার তাঁহারই উপর। বিজ্জলের তিনি দক্ষিণ হস্ত।

ঋদ্ধি ও সিদ্ধির এই সমাহার বসভেশ্বরকে রাজ্যমধ্যে করিয়া তুলিয়াছে অনন্যসাধারণ। শত শত শিব-শরণ এবং শিবভক্ত গৃহী ও সন্ন্যাসী সাধক প্রতিদিন তাঁহার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। ধর্ম্ম, দর্শন ও সাধন সম্পর্কে সোৎসাহ আলোচনা চলে। আর চলে সাধু-সম্বর্দ্ধনা ও সাধু ভোজন—দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে সারা নগরী মুখরিত হইয়া উঠে।

ভক্তজন ও সাধকদের সমাবেশে বসভেশ্বর যে শৈবধর্ম্মের কথা, বীরশৈববাদের কথা বলেন—তাহা কিন্তু বেদানুগ শৈবধর্ম্ম নয়। কর্ম্মকাণ্ডের কথা ইহাতে নাই, নাই বর্ণাশ্রমের সমর্থন। বেদাচার বহির্ভূত এ এক বৈপ্লবিক ও সংস্কারপন্থী নবতর শৈবধর্ম্ম। বসভেশ্বর ঘোষণা করেন, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে, স্ত্রী-পুরুষের ভেদ বৈষম্য না মানিয়া, প্রত্যেক নবজাত শিশুকে দিতে হইবে লিঙ্গদীক্ষা। এই দীক্ষার বলে সাধনক্ষেত্রে সকল শিবভক্তই হইবে সমপর্য্যায়ভুক্ত, সমান অধিকারযুক্ত। বসভেশ্বর আরও কহেন, শিব-শরণ বা শিবে শরণাগত সন্ন্যাসী মাত্রেই শিবের প্রতিভূ। প্রত্যেক ভক্তের প্রধান কর্ত্তব্য এই শিব-শরণদের আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জানানো এবং ইঁহাদের সেবা ও ভোজনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা।

বীরশৈববাদের দার্শনিক ভিত্তিও বসভেশ্বর এই সময়ে রচনা করেন। তাঁহার সৃষ্ট স্থায়ী ধর্ম্মসভা অনুভব-মণ্ডপেও দার্শনিকতা ও সাধনপদ্ধতির উপকরণ সংগৃহীত হয়।

এই মত অনুযায়ী শিব হইতেছেন অনাদি অনন্ত পরমপুরুষ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। শক্তি শিবের ক্রিয়াশীল সত্তা, শিব

হইতে শক্তিকে কোনমতে পৃথক করা যায় না। তাই দার্শনিক মহলে বীরশৈববাদকে বলা হয় শক্তি-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

এই মতের সাধকেরা লিঙ্গ ও অঙ্গ এই দুইটি তত্ত্বের উপর জোর দেন। লিঙ্গ হইতেছেন শিব, আর অঙ্গ—জীবাত্মা। আসলে এই দুইটিতে কোন পার্থক্য নাই। অজ্ঞানতার জন্য আমরা অন্তর্নিহিত ঐক্যকে উপলব্ধি করিতে পারি না, এই অজ্ঞানতার মল দূর হইলেই শিবশক্তির অখণ্ড পরমসত্তা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। একের সাথে, অখণ্ডের সাথে, সাধকের ঘটে মহামিলন। এই মহামিলনই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। এই মিলনকে শৈবযোগের ভাষায় বলা হয়—লিঙ্গাঙ্গ সামরস্য।

এই সামরস্য সাধিত হয় দীর্ঘ দিনের সাধনার ফলে এবং ছয়টি স্তরের ভিতর দিয়া সাধককে অগ্রসর হইতে হয়। এগুলিকে বলা হয় ষট্‌স্থল। অষ্টাবরণ বা আটটি সূক্ষ্ম মানসক্রিয়ার উপরও বীর-শৈব সাধকেরা গুরুত্ব আরোপ করেন।

লিঙ্গাঙ্গ সামরস্য বা পরম প্রাপ্তির পথে চলিতে হইলে সাধকের নৈতিক চরিত্র এবং সামাজিক আচার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। বসভেশ্বরের অনুগামী সাধকেরা এগুলিকে বলেন—পঞ্চাচার। কায়ক বা শিবে উৎসর্গীত ব্যবহারিক কর্ম্ম বীরশৈববাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। কায়কের মূল কথা—প্রত্যেক মানুষকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে হইবে। এই কর্ম্ম শিবেরই কর্ম্ম, এই সঙ্গে বজায় রাখিতে হইবে 'দাসোহং' মনোভাব। কায়কের উপার্জ্জিত অর্থে শিবভক্তের কিন্তু কোন অধিকার নাই, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট অর্থ তাহাকে দান করিতে হইবে। বীরশৈববাদের প্রচারক জঙ্গম সাধুরা এই অর্থ ব্যয় করিবেন সমাজের কল্যাণে।

কায়ক বা নিবেদিত কর্ম্ম সম্বন্ধে বসভেশ্বর অত্যন্ত উদারপন্থী। যে কোন বর্ণের লোক স্বেচ্ছানুযায়ী তাহার বৃত্তি নির্ব্বাচন করিবে, এই বিধি তিনি দিয়াছেন।

অনুভব মণ্ডপ বা সাধক-সভা বসভেশ্বরের এক বিশিষ্ট অবদান। এই সভায় পণ্ডিত অপণ্ডিত, উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্য সবাই মিলিত হইতেন। নিজেদের সাধনজীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা যেমন সবাই দিতেন, বিতর্কেও তেমনি করিতেন অংশ গ্রহণ।

এই অনুভব মণ্ডপকে শিবানুভব মণ্ডপও বলা হইত। এখানকার আলোচিত তত্ত্ব বিশেষ করিয়া বসভেশ্বর ও অন্যান্য সিদ্ধ সাধকদের উপদেশ ও অনুভূতি-জাত তত্ত্ব শ্লোকবদ্ধ হইত 'বচন'-রূপে।[১] তারপর অগণিত শিবভক্তের জন্য এগুলি বিভিন্ন শহরে ও জনপদে বিতরণ করা হইত।

সঙ্কলিত বচনগুলিতে বসভেশ্বর শুধু তত্ত্বের ব্যাখ্যান করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। এই তত্ত্বকে রূপায়িত করিতেন নিজের ব্যবহারিক জীবনে। শাসনকর্ত্তা বিজ্জলের সচিব ও কোষাগারের অধ্যক্ষরূপে তিনি ছিলেন সমাজের এক অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কিন্তু নিজ গৃহে, অনুভব মণ্ডপে, দরিদ্র অস্পৃশ্যদের সঙ্গে উপবেশন করিতে তাঁহার বাধিত না। সরকার হইতে যে উচ্চ বেতন তিনি পাইতেন, সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য তাহা হইতে সামান্য কিছু রাখিয়া দিয়া অধিকাংশ অর্থ ব্যয় করিতেন শিব-শরণ ও শিবযোগীদের জন্য। তাঁহার ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন, সিদ্ধ জীবন, তাই সে সময়ে আকৃষ্ট করে সহস্র সহস্র সাধারণ নরনারীকে। জনমনে তিনি পরিগ্রহ করেন শিবকল্প মহাপুরুষের আসন।

সেদিন অনুভব মণ্ডপে ভক্ত আর শিব-শরণেরা জড়ো হইয়াছেন। আত্মিক সাধনার নানা সমস্যা নানা জটিলতার হইতেছে সমাধান। এক সাধক বসভকে প্রশ্ন করেন "প্রভু-প্রভু বলে আকুল হয়ে কতো ডাকছি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। কিন্তু কই একান্ত আপনার জন হয়েও, প্রাণপ্রভু হয়েও, তিনি তো সাড়া দিচ্ছেন না। বলে দিন এবার আমি কি করি ?"

১ বসভেশ্বর কমেমোরেশন্ ভল্যুম: কায়ক—ভি. কে. জাবলি।

বসভ অন্তর্লীন হইয়া যান। ভাবাবেশে নির্গত হয় আশ্বাসভরা এক 'বচন'—[১]

মুখে শুধু প্রভু-প্রভু বললে হবেনা কোন কাজ,
বিশ্বাসের ভিত্তি যেখানে নেই
'প্রভু' ডাক যে সেখানে শূন্যগর্ভ।
একবার বিশ্বাসে ভর করে দাঁড়াও,
অমনি হৃদয় তাঁর যাবে গলে,
এগিয়ে আসবেন প্রভু সঙ্গমেশ্বর—
এই যে আমি, এই যে আমি, ব'লে

এক নবীন সাধক সেবার বসভকে প্রশ্ন করেন, "ইষ্টদেব শিবে আত্মসমর্পণ করলে সাধকের কোন্ অবস্থা হয়, পরিপূর্ণতা ও আনন্দে কি তার হৃদয় ভরে ওঠে চিরতরে ?

বসভেশ্বর উত্তর দেন তাঁহার সদ্য রচিত এক 'বচনের' মধ্য দিয়া, সাধনা ও সিদ্ধির পথে দান করেন দিব্য প্রেরণা :

প্রভুর প্রতি সত্যকার প্রেম যখন জাগে,
মানুষের কামনা বাসনা হয় নিষ্কাশিত।
প্রভুর পদে যে নেয় আশ্রয় ও শরণাগতি.
অন্তরে তার থাকেনা ভেদ বৈষম্যের রেখা।
প্রেমের কারবারে যে হয় ধনী,
অপর ধনকে তুচ্ছ করে সে অবলীলায়।
পরা শান্তি লাভ করেছে যে সাধক,
ভ্রান্তি আর চাঞ্চল্য নেই তার জীবনে—
ঈর্ষা অহঙ্কারের গণ্ডী সে করেছে অতিক্রম,
পরম প্রভু আসন পেতেছেন তাঁর হৃদয়ে।

নব দীক্ষিত অপরিণত সাধকদের উদ্দেশ করিয়া ব একস্থলে বলিতেছেন : "তোমার সাধনার বৈরীরা লুকিয়ে আছে

১ বচনস্ অব বসভন্না : অনুবাদ—মেনজেস্ অ্যাণ্ড অঙ্গাডি।

তোমারি দেহে মনে। তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে বিপন্ন পশুর মতো আর্ত্ত চীৎকার করতে হবে, উদ্ধারকে করতে হবে ত্বরান্বিত।”

একটি ‘বচনে’ এই আর্ত্ত ভঙ্গিটি তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শৈবধর্ম্মের তিনটি তত্ত্ব—পশু, পাপ ও পশুপতির তত্ত্ব এখানে আভাসিত :

হতভাগ্য পশু মুমূর্ষু হয়েছে খাদে পড়ে,
কি করে নিজেকে বাঁচাবে সে,
নিরুপায় হয়ে কতই বা ছুঁড়বে সে চারটে পা ?
নিজের প্রভুকেই ডাকতে হবে তাকে—
মৃত্যু থেকে উদ্ধাব পাবার আশায়।
তেমনি করে হে সাধক, হে পশু,
আর্ত্ত হয়ে ডাকো তোমার পশুপতিকে,
বলো—হে প্রভু, হে কৃপাময়,
টেনে তোল আমায় এই গহ্বর থেকে,
পাপ আর কলুষ আমায় চেপে ধরবার আগে
তোমার পুণ্যহস্তে করো আমায় উদ্ধার।

সঙ্গমেশ্বরের কৃপাই সাধকপবব বসভের প্রধান উপজীব্য, এই কৃপাই তাঁহার পরমাশ্রয়। এ সম্বন্ধে তিনি প্রভুকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন :

তোমার কৃপায় অসম্ভব হয়ে ওঠে সম্ভব
শুষ্ক শাখায় নামে সবুজের স্নেহ—
জীর্ণপাতায় জাগে নূতন প্রাণের জোয়ার।
তোমার কৃপায় উষর ভূমিতে আসে স্নিগ্ধ সরসতা,
আব প্রাণঘাতী বিষ হয় অমৃত।
কৃপা তোমার এনে দেয় প্রাচুর্য্যের সমারোহ
হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গম দেব।

১১৫৩ খৃষ্টাব্দের কথা। মঙ্গলওয়াড়-এর রাজনৈতিক জীবনে এ সময়ে ঘটে এক চাঞ্চল্যকর পটপরিবর্ত্তন। চালুক্যরাজ তৃতীয় তইলো এ সময়ে দুর্ব্বল হস্তে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। নিজের সেনাধ্যক্ষ ও শাসনকর্ত্তাদের আয়ত্তে রাখার শক্তি তাঁহার নাই। শত্রুর আক্রমণ ও সামন্তরাজদের বিদ্রোহের ভয়ে তিনি সদা সন্ত্রস্ত।

ইতিমধ্যে রাজা এক মহাসঙ্কটে পড়িলেন। বিদ্রোহী কাকতীয় বংশের সামন্ত দ্বিতীয় প্রোলকে দমন করিতে গিয়া নিজেই হইলেন তাঁহার হস্তে বন্দী। বিজ্জল ও অন্যান্য অমাত্যদের হস্তক্ষেপের ফলে রাজা বন্দীদশা হইতে উদ্ধার পাইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় আর রাজধানী কল্যাণে ফিরিয়া আসিলেন না।

ইহার ফলে সারা রাজ্যে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা, প্রশাসন ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হয়। শক্তিমান শাসনকর্ত্তা বিজ্জল তখন মঙ্গলওয়াড়-এ বসিয়া ঘটনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেছেন, অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ভাবিতেছেন, দুর্ব্বল হস্ত হইতে যে রাজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িতেছে শক্তিধর বিজ্জল কেন তাহা অধিকার করিবেন না?

কলচুরি সম্রাটবংশে বিজ্জলের জন্ম। দুই-তিন পুরুষ যাবৎ চালুক্যরাজদের সামন্ত বা শাসনকর্ত্তা হিসাবে তাঁহারা কাজকর্ম্ম করিতেছেন। এবার সুযোগ আসিয়াছে রাজসিংহাসন অধিকারের, কলচুরি সাম্রাজ্য আবার প্রতিষ্ঠা করার। বিজ্জল ভাবেন, সেনা ও যুদ্ধ উপকরণ তাঁহার আছে, নিজে তিনি কুশলী যোদ্ধা, কুশাগ্রবুদ্ধি। রাজনীতিজ্ঞতায় তাঁহার জুড়ি নাই। অধিকাংশ অমাত্য ও সামন্ত মেরুদণ্ডহীন চালুক্যরাজার উপর আস্থা হারাইয়া বসিয়াছে, বরং তাঁহারা বিজ্জলেরই পক্ষপাতী। প্রজারাও উন্নততর শাসন ও আইন-শৃঙ্খলার প্রবর্ত্তনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এই সুবর্ণ সুযোগ বিজ্জল কেন হেলায় হারাইবেন? ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে কেন

তিনি গ্রহণ করিবেন অসহায় দর্শকের ভূমিকা? না, আর দেরী করা নয়, রাজদণ্ড তাঁহাকে ছিনাইয়া নিতেই হইবে।[১]

অচিরে সুযোগও মিলিয়া গেল। রাজা তইলো বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইয়া রাজধানী কল্যাণে আর ফিরিয়া আসেন নাই। অমাত্য ও সেনাধ্যক্ষদের ষড়যন্ত্রের ভয়ে তিনি দূরে সরিয়া আছেন। নিজেই বরং তিনি আদেশ দিলেন তাঁহার প্রতিনিধিরূপে বিজ্জলই কল্যাণে অবস্থান করিবেন, গ্রহণ করিবেন সারা রাজ্যের শাসনভার।

বিজ্জল এবার সাড়ম্বরে কল্যাণে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই একদল সামন্ত ও শাসনকর্ত্তার সমর্থন নিয়া নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন।

মঙ্গলওয়াড় হইতে অন্যান্য সচিব ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে বসভেশ্বরকেও কল্যাণে আসিতে হয়। বিজ্জল রাজসিংহাসনে আসীন হইয়াই বসভেশ্বরকে নিযুক্ত করেন রাজ্যের কোষাগার-অধ্যক্ষরূপে।[২] আয়-ব্যয়ের সমস্ত কিছু দায়িত্বও তাঁহার উপর অর্পিত হয়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাগিদ ও তাঁহার নিজস্ব যুক্তিতর্ক যাহাই থাকুক, চালুক্য সিংহাসন বিজ্জল অন্যায়ভাবে জোর করিয়াই দখল করিয়াছেন। মনে মনে তিনি ঠিকই জানেন, ন্যায়নীতির দিক দিয়া কাজটা ভাল হয় নাই। অমাত্য ও সামন্তের মধ্যে একদল ঈর্ষা-পরায়ণ হইয়াছে, আর জনসাধারণের মধ্যে জাগিয়াছে অসন্তোষ। এ সময়ে বসভেশ্বরের মত একজন জনপ্রিয় ধর্ম্মনেতা তাঁহার পাশে থাকেন, ইহা তিনি চাহেন। কিন্তু বসভেশ্বরের উপরও আজকাল তিনি তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না।

১ বিজাপুর জেলার মুত্তগী নামক স্থানে একটি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বিজ্জলের তৎকালীন মনোভাব ও পরিকল্পনার চিত্র পাওয়া যায়। শিলালেখটি বিজ্জলের উত্তরাধিকারী রাজা রায়মুরারী সোভিদেবের আমলে উৎকীর্ণ হয়। দ্রঃ ডক্টর পি. বি. দেশাই : বসভ অ্যাণ্ড হিজ টাইম্‌স, পৃ : ২৯-৩০

২ চন্নমল্লিকার্জ্জুন : লাইফ টাইম অব বসভেশ্বর

বিজ্জল সনাতনী শৈব, বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপর তাঁহার তীব্র অনুরাগ। অপর দিকে দেখা যাইতেছে বসভ একজন সংস্কারবাদী বীরশৈব। ব্রাহ্মণ শূদ্রের তারতম্য তিনি মানেন না, শিবভক্ত ও লিঙ্গদীক্ষায় দীক্ষিত মানুষ মাত্রকেই সানন্দে কোল দেন। তাছাড়া, বিজ্জলের রাজসিংহাসন দখল করার কাজ-টাকেও বসভেশ্বর তেমন সুচক্ষে দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। তবুও সাময়িকভাবে বসভের প্রতিষ্ঠা, জনপ্রিয়তা ও লক্ষ লক্ষ বীরশৈবের নেতৃত্বকে রাজা কাজে লাগাইতে মনস্থ করিলেন।

রাজধানী কল্যাণে আসার পর হইতে বসভেশ্বরের মনে কিন্তু শান্তি নাই। কুচক্রী বিজ্জল হঠাৎ নিতান্ত অন্যায়ভাবে চালুক্য সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। অথচ তাঁহারই অধীনে বসভেশ্বরকে কাজ করিতে হইবে। নৈতিকতার দিক দিয়া মনে তিনি একটুও সায় পাইতেছেন না। বিপুল সংখ্যক শিব-ভক্তেরাই বা এ সম্পর্কে কি ভাবিতেছে? এ পরিস্থিতিতে কি তাঁহার কর্ত্তব্য, অচিরেই তাহা স্থির কবিতে হইবে। মন তাই বড় চঞ্চল হইয়া

এই সঙ্কটময় সময়ে সেদিন তাঁহার ভবনে আবির্ভূত হন মহা-সমর্থ শিবযোগী অল্লাম প্রভু। ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিয়া বসভেশ্বর কহেন, "প্রভুদেব, আপনার আগমনে এ ভবন আজ পবিত্র হয়েছে, আর আমিও অন্তরে পেয়েছি পরম শান্তি। রাজা বিজ্জলের অধীনে কাজ করার ইচ্ছা আর আমার নেই। কল্যাণনগর ত্যাগ করে আর কোথাও চলে যাবো বলে ভাবছি। কিন্তু তাতেও রয়েছে এক বড় বাধা। শৈবধর্ম্মের উজ্জীবন ও পুনর্গঠনের পবিত্র কাজটি আজ এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছেছে যে এ সময়ে এ নগর ছেড়ে গেলে সমূহ ক্ষতি হবে। আন্দোলন শিথিল হয়ে পড়বে। আমায় বলুন, এ সঙ্কটে কোন্ পথ আমি অবলম্বন করবো।"

"বৎস, 'কায়কত্তে কৈলাস' এই কানাড়ী বাণীর রহস্য তুমি কি ভুলে গিয়েছো?"

"না, প্রভু। এক মুহূর্ত্তের তরেও তা ভুলি নি।"

"তোমার ব্যবহারিক জীবনের কাজ তো শিবেরই কাজ। রাজ্যে, সমাজে যা ঘটবার তা ঘটুক। তোমার তাতে কি হয়েছে? নিজের কাজের পরিমণ্ডলকে কৈলাস বলে জ্ঞান কর, নিষ্ঠাভরে তুমি তোমার কাজ করে যাও।"

"কিন্তু প্রভু, বিশ্বাসহন্তা পররাজ্য-অপহারক বিজ্জলের সান্নিধ্যটা যেন……।"

"তেমন ভালো লাগছে না, এই তো?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"রাজা বিজ্জল কি করেছেন না করেছেন তা দেখবেন শিব স্বয়ং। তুমি এ নিয়ে বৃথা কেন চঞ্চল হয়েছো? বিজ্জলের ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল অপেক্ষা তোমার সিদ্ধ জীবনের পরিমণ্ডল অনেক বেশী শক্তিশালী, অনেক বেশী জ্যোতির্ময়। তাঁর সান্নিধ্যে থাকলে তোমার মতো সাধকের আবার কি অপকার হবে?"

"বুঝতে পারছি প্রভু, এ-ও আমার একটা বড় রকমের পরীক্ষা।"

"হ্যাঁ, বৎস, এই পরীক্ষাই তোমার শিবসাধনার শেষ পরীক্ষা। ঘৃণ্য পাপীর সান্নিধ্যে থেকেও তুমি অবিচল ও অনাসক্ত থাকো কিনা, সহজ সমাধি তোমার অধিগত হয় কিনা, তাই আমি দেখতে চাই।"

"বেশ প্রভু, তাই হবে, আপনার এ আদেশ সদাই হবে আমার শিরোধার্য্য।"

"একটা কথা মনে রেখো, বৎস। বিজ্জলের পাপের ভরা পূর্ণ হতে আর দেরী নেই। শিব সত্বরই তাঁর শাস্তি বিধান করবেন।"

"কিন্তু প্রভু, একটা বিশেষ নিবেদন আমার রয়েছে। অভয় দেন তো বলি।"

"বল বসভেশ্বর, তোমায় আমার অদেয় কিছুই নেই।"

শিব-ভক্ত শরণদের জন্য এক বিশাল অনুভব-মণ্ডপের প্রতিষ্ঠা আমি করেছি। আমি চাই, অধ্যক্ষ ও নিয়ন্তা হিসাবে আপনার নাম এর সঙ্গে যুক্ত হোক। এই পবিত্র মণ্ডপে আপনি মাঝে মাঝে

উপস্থিত হবেন, শিবযোগী ও শিবভক্তদের দান করবেন নিগূঢ় সাধনের উপদেশ। এই আমার প্রার্থনা।”

“বৎস, আমি তো সদাই তোমার ধর্ম্ম-আন্দোলনকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি, সাহায্যও করছি। তবে, শুধু শুধু আমার নামটি এর সঙ্গে যুক্ত রাখার কি সার্থকতা আছে, বলতো?”

“প্রভু, আমার সাধনা ও সিদ্ধি যাই থাক্, রাজমন্ত্রী বলেই সবাই আমায় জানে। আর আপনার পরিচয়—আপনি মহামুক্ত সিদ্ধ-পুরুষ, এ দেশের শ্রেষ্ঠ শিবযোগী। তাছাড়া, বিস্ময়কর শক্তি-বিভূতি রয়েছে আপনার করায়ত্ত। আপনার পুণ্যময় নামটি বীরশৈবদের অনুভব-মণ্ডপের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দিন। তার ফলে আমাদের আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে বিপুল পরিমাণে।”

“বেশ বৎস, তাই যদি হয়, আমার নাম এতে যুক্ত করে দিয়ো। আমি স্বেচ্ছামত তোমাদের মণ্ডপে মাঝে মাঝে এসে উপস্থিত হবো, তোমাদের সমস্যার সমাধানে সাহায্যও করবো।”

বসভেশ্বরকে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ জানাইয়া অল্লাম-প্রভু ধীরপদে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কল্যাণ দাক্ষিণাত্যের এক শ্রেষ্ঠ নগর এবং বিজ্জলের রাজধানী। এই নগরই এখন হইতে বীরশৈব আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। বসভেশ্বরের ভবনে, তাঁহার অনুভব-মণ্ডপে, হাজার হাজার শিবভক্ত গৃহস্থ, যোগী, জঙ্গম আসিয়া ভীড় করে। আর সমদর্শী সাধক বসভ এই সব ভক্তদের জ্ঞান করেন ইষ্টদেব শিবের প্রতিভূ বলিয়া, তাঁহাদের ডাকেন—‘মহেশ্বর’ নামে।

রাজমন্ত্রীরূপে বসভেশ্বর প্রচুর বেতন পান, কিন্তু এই বেতনের সামান্য কিছু নিজ পরিবারের জন্য রাখিয়া আর সবই ব্যয় করেন অভ্যাগত ‘মহেশ্বর’দের অশন-বসনের জন্য। প্রতিদিন শত শত নরনারী পংক্তি ভোজন করে বসভেশ্বরের অঙ্গনে। উৎসবে পার্ব্বণে যেদিন ভাণ্ডারা দেওয়া হয় সেদিন তো অগণিত ভক্ত, সাধু ও সন্ন্যাসী

ভোজনে বসিয়া যায়। ভক্তি-ভাণ্ডারী বসভেশ্বরের অর্থভাণ্ডারও হয় সেদিন সাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

তাঁহার গৃহের এই অন্নসত্রের খ্যাতি প্রচারিত হয় দেশের দিক্-বিদিকে। কিন্তু এ খ্যাতিই এক অনর্থ ডাকিয়া আনে।

সনাতনপন্থী শৈবেরা কোনদিনই বসভের উপর তেমন প্রসন্ন নন। তাঁহার উদার বৈপ্লবিক মতবাদ এসময়ে বহু নরনারীকে আকৃষ্ট করিতেছে, বীরশৈবদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় রাজধানী হইতেছে কম্পিত। বসভেশ্বরের গৃহের এই জনসংঘট্ট প্রাচীনপন্থী শৈব আচার্য্যদের আর সহ্য হইতেছে না। রাজা বিজ্জল তাঁহাদের মতোই সনাতনী শৈব। এবার তাঁহার দরবারে মন্ত্রী বসভেশ্বরের নামে এক অভিযোগ উত্থাপিত হইল। অভিযোগকারীদের সমর্থন জানাইলেন বসভের বিরোধী একদল অমাত্য।

সবাই কহিলেন, "মহারাজ, অর্থমন্ত্রী ও কোষাগারের অধ্যক্ষ বসভেশ্বরের উপর সমস্ত কিছুর ভার দিয়া আপনি পরম নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু আপনার মন্ত্রী যে তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন সে খবর আপনি রাখেন না।"

রাজা বিজ্জল চমকিয়া উঠেন, প্রশ্ন করেন, "কি তাঁর অপরাধ, রাজ-সরকারের কি ক্ষতি তিনি করেছেন তা কি আপনাদের জানা আছে? তবে সব আমায় খুলে বলুন।"

"মহারাজ, আপনি কি জানেন, বসভেশ্বরের ভবনে রোজ কয়েক হাজার বীরশৈব প্রসাদ পায়? কিন্তু টাকা আসে কোত্থেকে? আপনার কোষাগার থেকেই এ টাকা ব্যয়িত হচ্ছে।"

"না-না, তা হতে পারে না, বসভেশ্বর তেমন লোক নয়। উচ্ছৃঙ্খল ধরণের একটা শৈবধর্ম্ম নিয়ে যতই মাতামাতি করুক, সরকারী তহবিল তছরূপ কখনো সে করবে না।"

"সুচতুর মন্ত্রী বসভেশ্বর আপনার চোখে ধুলো দিচ্ছে। আপনি অবিলম্বে হিসাব পরীক্ষা করুন, তার অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ নিশ্চয় পেয়ে যাবেন।"

রাজা মনে মনে ভাবিলেন, 'বেশ তো, একদল সম্ভ্রান্ত আচার্য্য কথাটা যখন তুলেছেনই, রাজকোষ পরীক্ষা করে দেখা যাক্ না কেন?'

তৎক্ষণাৎ রাজার সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে হিসাব-নিকাশ নেওয়া হইল, কোষাগারের নগদ অর্থ-গণনাও বাদ গেল না। কিন্তু তহবিল ভাঙ্গার কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

রাজা বিজ্জল এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন, "মন্ত্রীবর, বলুন তো আপনার ভবনে রোজ হাজার হাজার লোকের পাত্ পড়ে, তার ব্যয় সঙ্কুলান কি করে হয়?"

বসভেশ্বর সবিনয়ে নিবেদন করেন, "মহারাজ, বীর শৈবদের কায়ক তত্ত্বে আমি বিশ্বাস করি। পরিশ্রম দ্বারা যে অর্থ আমি উপার্জ্জন করি তার নগণ্য অংশ পরিবারের জন্য রেখে দিয়ে আর সব উৎসর্গ করি শিবের প্রতিভূ শিবভক্তদের জন্য। আমার মত এই তত্ত্বে অনেকেই বিশ্বাসী, তাঁদের প্রদত্ত অর্থও ভক্ত জঙ্গমদের সেবায় যথেষ্ট সাহায্য করে। শিবের কাজে অর্থের অভাব হবার তো কথা নয়, মহারাজ।"

রাজা বিজ্জল, তখন বেশ কিছুটা অপ্রস্তুত। অভিযোগকারী পণ্ডিতেরাও অতঃপর ক্ষুন্ন মনে ফিরিয়া গেলেন।

বসভেশ্বরের দৃষ্টিতে শিবভক্ত মাত্রেই 'মহেশ্বর'। তাঁহার ভবনের ভৃত্য ও রক্ষীরা তাঁহারই শৈব মতবাদে বিশ্বাসী, তাই এই সব ভৃত্য ও রক্ষীদের তিনি গণ্য করেন ইষ্টের বিভূতি রূপে। গৃহের একটি ভৃত্যের, প্রতিবেশী একটি ভক্তের, আহার সমাধা না হওয়া অবধি বসভ নিজে কোন আহার গ্রহণ করেন না। এমনি ছিল তাঁহার ধর্ম্মানুশীলনের নিত্যকার রীতি।

একদিন গভীর রাতে বসভেশ্বরের গো-গৃহে চোর আসিয়া উপস্থিত হয়। দুগ্ধবতী, সুপুষ্টা কয়েকটি গাভী নিয়া চোরেরা তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে সরিয়া পড়ে।

রাত্রি প্রভাত হইলে ভৃত্যেরা চুরির ঘটনা জানিতে পারে এবং তাড়াতাড়ি মনিবকে তাহারা সংবাদ দেয়।

গো-গৃহে পৌঁছিয়া বসভেশ্বর দেখেন, মাতৃহারা গো-বৎসগুলি করুণনয়নে চাহিয়া আছে, কোন আহার্য্য গ্রহণে তাহাদের রুচি নাই। বসভেশ্বর মহাউদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন, মা-হারা হইয়া কিরূপে ইহারা প্রাণে বাঁচিবে? দুই চোখ তাঁহার জলে ভরিয়া উঠে।

ব্যগ্রস্বরে পরিচারকদের কহেন, "এক্ষুনি তোমরা সবাই চোরদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো। তোমরা ফিরে না আসা অবধি আমার পক্ষে আহার নিদ্রা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। চোরদের ঠিকানা পেলে তক্ষুনি এই বৎসগুলোকে তাদের মায়েদের কাছে পৌঁছে দাও।"

আদেশমত সন্ধান তখনই শুরু হইয়া যায়। তস্করদের ধরিয়া আনা হইলে বসভেশ্বর কহেন, "ভাই, দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ তা বজায় থাক। তোমাদের ঘরে দধি দুগ্ধের সরবরাহ বেড়ে যাক, শিবভক্তদের সেবা হোক বোধ হয় এটাই প্রভুর ইচ্ছা। তোমরা গাভীগুলো রেখেই দাও আর এই বৎসগুলোকে এখনি নিয়ে যাও তোমাদের ঘরে। আহা! মা-হারা হয়ে কি দুঃখে এরা রয়েছে।"

শিবপ্রতিম সাধকের এই অদ্ভুত আচরণে তস্করদের চোখে জল আসিয়া যায়। বসভেশ্বরের চরণে শরণ মাগিয়া সেইদিন হইতেই তাঁহারা শুরু করে উন্নততর জীবন। কৃপালু বসভেশ্বর উত্তরকালে ইহাদের লিঙ্গদীক্ষা দান করিয়াছিলেন।

বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের নেতার পদে বসভেশ্বর এখন সমাসীন। এই সম্প্রদায়ের জন্য দরকার সুসম্বদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের। সাধনা ও সিদ্ধির ক্রমিক পর্য্যায় নির্ণয় করা, পুরাতন শৈবপন্থার সংস্কার-সাধন, নবদীক্ষিত বীরশৈবদের আচার বিচার ও নৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ—এই সব গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্ম তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে।

তাঁহার নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির সহিত, সংস্কারপন্থী আদর্শ ও আচরণের সহিত যুক্ত হয় অনুভবমণ্ডপে আগত শিবভক্ত ও সিদ্ধযোগীদের মতবাদ। এই সংযুক্তি ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়া বীরশৈব সম্প্রদায়ের ভাবধারা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, আচার-ব্যবহারের নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়।

বসভেশ্বরের ধর্ম্ম-আন্দোলনের প্রধান সহায়ক তাঁহার প্রতিভাধর ভাগিনেয় চেন্ন-বসভ, বালককাল হইতেই চেন্ন-বসভের জীবনে দেখা দেয় আত্মিক মুক্তির ব্যাকুলতা, শৈব দর্শন ও শৈব যোগসাধনায় অতি অল্পকাল মধ্যে তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠেন। বীরশৈববাদের প্রচার ও সংস্কারধর্ম্মী মতবাদ সংস্থাপনে তিনি মাতুল বসভেশ্বরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠেন।

এই সঙ্গে তাঁহাদের শক্তি বৃদ্ধি করেন, শোলাপুরের ভক্ত সিদ্ধরাম, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও উচ্চকোটির শৈব সাধক মদিভাল মচ্ছইয় প্রভৃতি। বসভেশ্বরের ধর্ম্ম-আন্দোলন ইঁহারা শক্তি সঞ্চার করেন, দিকে দিকে ছড়াইয়া দেন তাঁহার বাণী ও আদর্শবাদ। সর্ব্বোপরি তাঁহার বীর শৈববাদ উপকৃত হয় এবং সাধক ও দার্শনিক সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভুর আশীর্ব্বাদ ও সহযোগিতার ফলে।

বসভেশ্বরের ধর্ম্ম-আন্দোলনে সিদ্ধ নারী-সাধিকাদের অবদান কম নয়। তাঁহার অনুভবমণ্ডপে ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদবৈষম্য যেমন ছিল না, তেমনি পুরুষ ও নারীর ছিল সমান মর্য্যাদা এবং সমান অধিকার। ধর্ম্মীয় উদারতার দিক দিয়া এটি বসভের এক অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি। বহুকাল আগে গৌতম বুদ্ধ তাঁহার মণ্ডলীতে নারী সাধিকাদের প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে তিনি ও তাঁহার শিষ্যেরা নারীদের এই অধিকার দানে তেমন ইচ্ছুক ছিলেন না। বসভেশ্বরের বেলায় কিন্তু দেখি, নারীদের সমমর্য্যাদা দিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বা দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং সাধনজীবন গঠনের ব্যাপারেও দেখা গিয়াছে তাঁহার অসামান্য নিষ্ঠা ও তৎপরতা।

বীরশৈব সাধিকা লকম্মা ছিলেন ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ। কল্যাণনগরে সাধক বসভেশ্বরের তখন বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। প্রতিদিন তাঁহার অনুভবমণ্ডপে শিবভক্ত ও শিবযোগীদের সমাবেশ হয়। ধর্ম্মালাপ ও বিচার বিশ্লেষণের শেষে হাজার হাজার ভক্ত নরনারী আনন্দ কলরবের মধ্যে ভোজনপর্ব্ব সমাধা করে।

লকম্মা ও তাঁহার স্বামী একদিন কৌতূহল ভরে অনুভবমণ্ডপে আসিয়া হাজির হন। বসভ তখন শিবযোগীদের কাছে কায়ক-এর তত্ত্ব বুঝাইতেছেন। কি করিয়া মানবজীবন ও ব্যবহারিক কর্ম্মকে ইষ্টদেব শিবের চরণে উৎসর্গ করিতে হয়, কি করিয়া গার্হস্থ্য জীবনকে পরিণত করা যায়। পুণ্যময় কৈলাসরূপে তাহার ব্যাখান চলিতেছে। বসভের ব্যক্তিত্বে ও আন্তরিকতায় লকম্মা ও তাঁহার স্বামী মুগ্ধ হইলেন, ভাষণ শেষে আশ্রয় নিলেন তাঁহার চরণতলে, বসভেশ্বরের কাছে লিঙ্গদীক্ষা নিয়া এই দম্পতি শুরু করিলেন ত্যাগ তিতিক্ষাময় সাধনা।

লকম্মার বৈরাগ্য ও সংযম ছিল অসাধারণ। কথিত আছে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে প্রতিদিন যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক তণ্ডুল ভোজনের জন্য রন্ধন করিতেন, তাহা অপেক্ষা বেশী হইলে লকম্মা তৎক্ষণাৎ স্বামীকে দিয়া ভিখারীদের মধ্যে উহা বিতরণ করাইতেন। পরবর্ত্তী বেলার জন্য একটি তণ্ডুলকণাও তিনি নিজের কুটিরে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে দিতেন না।

বসভেশ্বর নারী-ভক্ত শিষ্যাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন অক্কা মহাদেবী।[১] এই শিষ্যার প্রশংসায় বসভেশ্বর নিজে ছিলেন পঞ্চমুখ। তা ছাড়া, তাঁহার শিষ্য ও সহকর্ম্মী সিদ্ধরাম, মাদিভায়ল, চেন্ন-বসভ হইতে শুরু করিয়া যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভু অবধি অনেকেই এই সাধিকার যোগসিদ্ধি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।

মহাদেবী ছিলেন দাক্ষিণাত্যের একটি রাজ্যের রাজা কৌষিকের

---

১ সরোজিনী শিনৃত্রি: বসভ অ্যাণ্ড উওম্যান হুড, সেন্টিনারী মেমোরিয়াল ভল্যুম, গবর্নমেন্ট অব মাইসোর।

মহিষী। তরুণ বয়স হইতেই এই ভক্তিমতী মহিলার জীবনে আসে অজানা লোকের আহ্বান, শিববিগ্রহের সেবা-পূজার জন্য অন্তরে জাগে আকুল আগ্রহ। স্বামী কিন্তু স্ত্রীর ধর্ম্মানুরাগ তেমন সুচক্ষে দেখেন নাই; সুযোগ পাইলেই শিবের নিন্দা সমালোচনায় তিনি মুখর হইয়া উঠিতেন।

মহাদেবীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই, ইষ্টদর্শনের আকাঙ্ক্ষা বরং দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিতেই থাকে। ইতিমধ্যে হঠাৎ রাজভবনে আগমন ঘটে এক বীরশৈব সন্ন্যাসীর। ইঁহার কাছে বসভের কথা, কল্যাণের অনুভবমণ্ডপ ও বীরশৈবদের সমাবেশের কথা তিনি জানিতে পারেন। প্রাণে জাগিয়া উঠে মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ভিতর হইতে বার বার কে যেন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতে থাকে—"ওরে, মহাসাধক বসভেশ্বরই তোমার চিহ্নিত গুরু, তাঁর কৃপা পেলে তবেই পূর্ণ হবে তোর ইষ্ট দর্শনের সঙ্কল্প।"

অতঃপর আর একদিনও মহাদেবী স্বামীর প্রাসাদে বাস করেন নাই। গোপনে রাজ-অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া চলেন কল্যাণ নগরীর দিকে। প্রভু বসভেশ্বরের চরণে স্থান না নেওয়া অবধি জীবনে তাঁহার শান্তি নাই, স্বস্তি নাই।

তাঁহার মতো রূপসী তরুণীর পক্ষে একাকিনী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা সহজ কথা নয়। বিঘ্ন বিপদ, দুঃখ দুর্দ্দশা, দিনের পর দিন এ সময়ে কম আসে নাই। কিন্তু মহাদেবী যে ইষ্টদেবের কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন, তাঁহারই কৃপায় সফল হইল এই অভিযাত্রা। অচিরে বসভেশ্বরের দর্শন তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

তীব্র মুমুক্ষা ও আর্ত্তি নিয়া মহাদেবী গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। সর্ব্বস্ব ছাড়িয়াছেন সর্ব্বময় পরম শিবকে লাভ করার জন্য। ত্যাগ-বৈরাগ্যময় সাধনার প্রস্তুতি তাঁহার জীবনে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। নিষ্ঠা ও পবিত্রতায় ভরা এই নারী সাধিকাকে দর্শন মাত্রেই বসভেশ্বর তাঁহাকে সেদিন মা বলিয়া ডাকিলেন,

দিলেন তাঁহাকে শৈব যোগের নিগূঢ় সাধনা। উত্তরকালে এই তরুণী শিষ্যার সঙ্গে তিনি ব্যবহার করিতেন অল্পবয়স্ক পুত্রেরই মতো।

দিব্যদৃষ্টি সহায়ে বসভ বুঝিলেন, এই নবাগতা শিষ্যার সাধন-জীবনে রহিয়াছে বিরাট সম্ভাবনা। তাই শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনতত্ত্ব দুই-ই তিনি অকৃপণ করে ঢালিয়া দিলেন তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব আধারে। অল্পকাল মধ্যে অক্কা মহাদেবী বীরশৈব সাধনার এক স্তম্ভরূপে গণ্য হন, চিহ্নিত হন এক সিদ্ধ সাধিকা রূপে। শত শত নারী তাঁহার সান্নিধ্য ও উপদেশ লাভে কৃতার্থ হয়।

এই শিষ্যার সিদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বসভেশ্বর বরাবরই অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। মহাদেবী যে উচ্চকোটির সাধিকা তাহা সবাইকে জানানোর জন্য সেবার তিনি এক কৌশল অবলম্বন করেন।

অল্লাম প্রভু এ সময়ে কয়দিনের জন্য কল্যাণে আসিয়াছেন। অনুভবমণ্ডপে তাই ভক্ত, যোগী ও সাধু-সন্ন্যাসীর ভীড়ের অন্ত নাই। বসভেশ্বর সেদিন অক্কা মহাদেবীকে এই বিরাট গুণীজন সমাবেশের সমক্ষে দাঁড় করাইয়া দেন। আর অল্লাম প্রভুকে অনুরোধ করেন, তাঁহার এই নবীনা শিষ্যার সাধনা ও সিদ্ধি কোন্ স্তরে অবস্থিত তাহা যেন তিনি নির্ণয় করিয়া দেন।

অল্লাম ও অপরাপর যোগীদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া অক্কা মহাদেবী সবাইকে সেদিন বিস্মিত করেন। অতঃপর শুধু বীরশৈব মহলেই নয়, দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন ধর্ম্মমণ্ডলীতে এই মহিয়সী নারী সাধিকার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে।

বসভেশ্বরের কাছে ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শূদ্র, স্ত্রী-পুরুষের যেমন ভেদবৈষম্য নাই। তেমনি নাই নবীন প্রবীণ সাধকদের। অনুভব মণ্ডপের সভায় নিত্য নূতন কত সাধনেচ্ছু ভক্তেরা আসে। বসভেশ্বর অপার প্রেম ও স্নেহ নিয়া সাহায্য করেন তাঁহাদের আত্মিক জীবন গঠনে। এই সময়ে বেদী হইতে বীরশৈবদের নির্দ্দেশ দিতে গিয়া যে সব বচন তিনি রচনা করেন, উত্তরকালের সাধকদের কাছে তাহা গণ্য হইয়া রহিয়াছে অমূল্য সম্পদ রূপে।

বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎরা কণ্ঠে লিঙ্গ-ধারণ করে দীক্ষার দিন হইতে। মন্দির বা বিগ্রহ পূজা তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। এই সম্পর্কিত একটি 'বচনে' বীরশৈবদের মতবাদ পরিস্ফুট :

যাদের আছে বিপুল বিত্ত বিভব
হে প্রভু, তারা তৈরী করুক তোমার মন্দির,
কিন্তু আমার মত বিত্তহীন তা করবে কি দিয়ে ?
আমার নিজের চরণ দুটিই হচ্ছে স্তম্ভ,
তার ওপর স্থাপিত রয়েছে আমার দেহরূপ মন্দির—
আমার শিরোদেশে এই মন্দিরের গম্বুজ।
হে প্রভু, ইঁট কাঠ দিয়ে গড়া যে মন্দির
তাতো একদিন ধ্বসে পড়ে গুঁড়ো হয়ে যায় ;
কিন্তু আমার এই সিদ্ধ কায়া—
চলমান মন্দির রূপে ছড়াবে তোমার দিব্য নাম,
বেঁচে থাকবে, আর অটুট থাকবে দীর্ঘকাল।

বীরশৈবদের সাধনায় কায়কের কথা, ইষ্টদেব শিবের চরণে নিবেদিত কর্ম্মের কথা, রহিয়াছে। কিন্তু কায়াকে ক্লিষ্ট করিয়া যে সাধনা অনুষ্ঠিত হয় তাহার কথা নাই। দেহের উপর নির্য্যাতন না চালাইয়া মনকে নিয়ন্ত্রিত কর, সম্পূর্ণরূপে বশীভূত কর—ইহাই যে প্রভু সঙ্গমেশ্বর চাহেন। তাই বসভেশ্বর বলিতেছেন :

প্রকাণ্ড এক উই-এর ঢিবির নীচে
লুকিয়ে আছে বিষাক্ত গোখ্‌রা সাপ,
উই ঢিবির ওপরে যদি ক'র লাঠির আঘাত
গভীরে লুকানো সাপ হয় কি নিহত ?
তেমনি বাইরের এই দেহের অস্থি মজ্জা মাংসে
যতই চালাও কৃচ্ছ্র আর নির্য্যাতন—
হৃদয়ের যদি না হয় কোন শোধন,
পাপ আর অজ্ঞানতার না হয় মৃত্যু,

তবে মিলবেনা আমার প্রভুর অনুমতি,
এই দেহের নিপীড়ন করবেন না তো সমর্থন।

নবীন শিষ্যেরা বসভকে প্রশ্ন করেন, "প্রভু, পিচ্ছিল মনকে নিয়ে তো আর পারছিনে। ইষ্টধ্যানে একে কেন্দ্রীভূত করা যে এত দুঃসাধ্য তা তো জানতেম না। এর প্রতিবিধান কি বলুন তো।"

এই সব নবীন শিষ্যদের সতর্ক করার জন্য বসভেশ্বর একটি 'বচনে' বলিতেছেন :

মন বশ করার কথা বল্‌ছো, হে সাধক,
হিংস্র ক্রূর কেউটে সাপের মত যে এই মন।
যতক্ষণ থাকে সাপুড়ের মোহনিয়া বাঁশীর বশ,
ততক্ষণ হিংসা আর খলতা যায় ভুলে,
সুরে সুরে ফণা নাচিয়ে কত খেলাই না খেলে,
আর ক্রীতদাসের মত করে সে আত্মসমর্পণ।
কিন্তু সাপুড়ের একটি মুহূর্ত্তের ভুল
এনে দেয় অভাবনীয় বিপদ আর বিনষ্টি,
ক্ষিপ্রবেগে কেউটে হঠাৎ ছোবল্ মেরে বসে—
ঢেলে দেয় তার প্রাণঘাতী বিষ।
তাই জানাও তোমার আকুল প্রার্থনা,
বল, হে মোর প্রভু, হে কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর
সাধন-জীবন আমার সদাই যেন থাকে
সদা সতর্ক, থাকে যেন সংযমের কঠিন বন্ধনে—
মন ভুজঙ্গ তাকে যেন না করে দংশন।

দুর্ব্বল, নিষ্ঠাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ সাধনা ও সিদ্ধির কথা ভাবিয়া ভয় পায়। ক্ষুদ্র শক্তি নিয়া অনাদি অনন্ত দেবাদিদেবকে কি কখনো লাভ করা যায়, এই প্রশ্ন তাঁহার আত্মিক অভিযাত্রাকে সংশয়াকুল করিয়া তোলে। এই সব সাধকের জন্য বসভেশ্বর উচ্চারণ করেন আশ্বাসের বাণী :

ক্ষুদ্র ও বৃহতের প্রশ্ন নিয়ে
কেন শুধু নিজেকে কর হতাশ আর উদ্‌ভ্রান্ত ?
বিশালকায় হস্তী—বিপুল সামর্থ্য তার দেহে,
অথচ ছাখো. অঙ্গুলি প্রমাণ একটি অঙ্কুশ
অবলীলায় করছে তার নিয়ন্ত্রণ।
আকারে ক্ষুদ্র বটে এই অঙ্কুশ
কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণের পরিধি কি বিস্তৃত।
গগনচুম্বী প্রস্তরীভূত ঐ যে পাহাড়,
ওর গর্ভে রয়েছে ক্ষুদ্র এক টুকরো হীরে,
তীব্র দ্যুতির ছটায় করছে ঝলমল.
আকারে ক্ষুদ্রতা, না দ্যুতির ঝলক্ --
কি দিয়ে করবে তার মূল্য নিরূপণ ?
দূরবিস্তারী সূচীভেদ্য অন্ধকার—
ক্ষুদ্র একটি মোমের আলোয় মহূর্তে হয় দূর,
এই মোমের আলো কি তুচ্ছ হবে ক্ষুদ্র বলে ?
হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গম দেব,
ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ যে মন আমার
তোমার মত ভূমাকে, বিভুকে ধারণ করে হয় ধন্য—
সে মনকে কি ক্ষুদ্র বলে করবো হেলা ?

এক সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠীর পুত্র বসভেশ্বরের কাছ হইতে নিয়াছেন লিঙ্গ-দীক্ষা। তারপর শুরু করিয়াছেন তাঁহার আত্মিক সাধনা। এই সঙ্গে বীরশৈব আন্দোলনকে দিকে দিকে বিস্তারিত করার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ও তৎপরতার অবধি নাই। নিজের প্রচুর ধন-সম্পদ ও লোকলস্করও এই মহান কর্মে তিনি নিয়োজিত করিয়াছেন। কিন্তু সাধন-জীবনে তেমন কিছু উন্নতি এযাবৎ তাঁহার হইতেছে না। অনুভবমণ্ডপের সম্মেলনে একদিন এই শিষ্যটি তাঁহার এই সাধনদৈন্যের কথা নিয়া খেদোক্তি করিলেন। বসভেশ্বর কহিলেন :

হাতীর পিঠে কিংখাব-মোড়া হাওদায় ব'সে
চলেছো তুমি রাজার মতো,
শরীরে লেপন করেছো সুগন্ধী প্রসাধন।
কিন্তু এই রাজকীয় বিলাসিতার ভীড়ে
সত্যকে জান্‌বে কি করে বলতো ?
অহং-এর বিলয়ে নিহিত রয়েছে পরমধর্ম্ম—
সে ধর্ম্মের বীজ তো আজও করনি বপন ?
অহমিকার হাতীতে চড়ে স্ফীত হয়েছো গর্ব্বে,
এই গর্ব্বই তোমায় ফেলবে টেনে ভূমিতলে।
প্রভু সঙ্গমেশ্বরকে জানতে চাওনি তুমি—
জানতে চেয়েছো নরকের আস্বাদ।

হিংসা, পাপ আর কদাচারে সারা দেশ তখন ভরিয়া গিয়াছে। সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্য, সংস্কারবাদী নূতন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি গঠনের জন্য বহু তরুণ এসময়ে উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু বসভেশ্বরের মূল কথা—আগে নিজেকে কর শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, মোহাচ্ছন্ন মনকে করাও মুক্তিস্নান, তারপর শিবশক্তিতে শক্তিমান হইয়া অগ্রসর হও জগতের কল্যাণে। তিনি বলিতেছেন :

কুটিলতার জটিল ঘৃণ্য জালে
ছেয়ে গেছে আমাদের এই পৃথিবী—
সেই জাল তুমি ছিন্ন করতে চাও,
চাও এই পৃথিবীকে সরল করতে, সুন্দর করতে ?
কিন্তু কে তুমি ? কে দিয়েছে তোমায় এ কর্ত্তৃত্ব ?
নিজের জটিলতাকে আগে সরল করে নাও,
দেহ আর মনকে শুদ্ধ কর, ঋজু কর—
তবে তো করবে অপরকে কলঙ্কমুক্ত।
প্রভু সঙ্গমেশ্বরের কাছে কপটতার নেই স্থান,
নিজের জন্য সবার আগে কর অশ্রু বিসর্জ্জন,
কুটিলতা আর মলিনতা দাও ধুয়ে মুছে,

তবেই প্রভুর কাছ থেকে পাবে অনুমতি,
অপরের কলঙ্ক তখন করবে বিমোচন।

সিদ্ধ শিবযোগী অল্লাম প্রভুর শ্রীমুখ হইতে বসভেশ্বর প্রাপ্ত হইয়াছেন পরা-ভক্তি ও মহা-প্রেমের পরমতত্ত্ব। এই তত্ত্বটি বীরশৈব সাধকদের অন্তর পটে সদাই তিনি উৎকীর্ণ করিয়া দিতেন। কহিতেন, "ইষ্টের প্রতি প্রেম থাকবে সারা প্রাণমন জুড়ে, সারা জীবন জুড়ে, তবে তো আত্মিক সাধনায় আসবে সিদ্ধি, হবে পরম প্রাপ্তি। এই তত্ত্বটি বসভের একটি 'বচনে' চমৎকাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে[১] :

খেলার আনন্দে নিশ্চয়ই মেতে ওঠো তুমি,
গান গাও সুরে ছন্দে তাল-লয়ে,
গ্রন্থপাঠ হয়তো এনে দেয় কতই পাণ্ডিত্য,
কিন্তু সব কিছুই যে হয়ে যায় ব্যর্থ,
যদি না দাসোহং ব'লে একান্ত নিষ্ঠায়
আশ্রয় নাও প্রভুর রাতুল চরণে।
পেখম ধরে ময়ূরী কত নাচই তো নাচে,
বীণার তারে বেজে ওঠে কত না মধু ঝংকার
তোতার কণ্ঠে কতনা শেখানো বুলি ঝরে,
কিন্তু তাতে হৃদয়ের পেলব স্পর্শ কোথায়?
প্রাণে তোমার প্রেমের বাতি জ্বালিয়ে
যদি না ডাকো আকুল হয়ে, তবে কি করে
প্রভু তোমায় করবেন অঙ্গীকার?

বসভেশ্বর এখন সাধনা ও ধর্ম্মজীবনের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। তাঁহার বীরশৈব মতবাদ দেশের অসংখ্য পণ্ডিত ও সাধকের সমর্থন লাভ করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ শিবযোগী অল্লাম-প্রভুর মূল্যবান সহযোগিতা এবং অনুভবমণ্ডপের অধ্যক্ষতাও বসভেশ্বরের খ্যাতি প্রতিপত্তি কম বাড়ায় নাই। লক্ষ লক্ষ সংস্কারপন্থী শিবভক্ত এখন তাঁহাকে অনুসরণ

১ সিলেক্‌টেড্ সেইং অব বসভ : বাসি

করিতেছে, শিবকল্প গৃহী-যোগীরূপে দিতেছে তাঁহাকে অভাবনীয় শ্রদ্ধা ও সম্মান।

বলা বাহুল্য, বসভের এই মর্য্যাদা ও জনপ্রিয়তায় সনাতনী শৈবেরা মোটেই খুসী নয়। বরং তাহাদের ঈর্ষা দিন দিন আরো বাড়িতেছে। রাজা বিজ্জলও আজকাল মন্ত্রী বসভেশ্বরের অসাধারণ প্রতিপত্তিতে বেশ কিছুটা চিন্তিত। তাছাড়া, ব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্যকে একাকার করিয়া দিয়া বসভ বেদাচার বিরোধী কাজ করিতেছেন, ইহাও রাজার মনঃপুত নয়। অথচ হঠাৎ তাঁহাকে পদচ্যুত করাও সমীচীন হইবে না। জনসাধারণের বিশাল অংশ তাঁহাকে দেবতার মতো জ্ঞান করে। তাঁহার বা তাঁহার ধর্ম্মান্দোলনের উপর কোন হস্তক্ষেপ এইসব ভক্ত অনুগামীরা সহ্য করিবে না। বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ হয়তো শুরু করিয়া দিবে। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তোইলোকে সিংহাসনচ্যুত করার পর হইতেই অমাত্য ও সচিবদের মধ্যে একটা বিরোধী দল গজাইয়া উঠিয়াছে। গোপনে বেশ কিছুটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে, এ সংবাদও বিজ্জলের অজানা নয়। তাই এ সময়ে বসভেশ্বরকে ঘাঁটানো কুটনীতির দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁহার অনুগামী বিপুল সংখ্যক বীরশৈবদের ক্ষেপাইয়া তোলাও হইবে এক চরম নির্ব্বুদ্ধিতা। তাই বিজ্জল এখনই তাঁহাকে আঘাত করিতে ইচ্ছুক নন। অদূর ভবিষ্যতে কোন সময়ে এ সুযোগ হয়তো আসিবে, এই প্রতীক্ষায়ই দিন গুণিতেছেন।

এ সময়ে বসভেশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহার ফল হয় দূরপ্রসারী।

কম্বলিয় নাগিদেব নামে অন্ত্যজ সাধক এক শহরের প্রান্তে বাস করিতেন। একজন সাধননিষ্ঠ বীরশৈব বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। অনুভবমণ্ডপের সভায় প্রবীণ শৈব সাধকেরাও ইঁহার মতামতের গুরুত্ব দিতেন, সবাই তাঁহাকে দেখিতেন সম্মানের চোখে।

ঘুরিতে ঘুরিতে বসভ সেদিন নাগিদেবের বাড়ীর সম্মুখে গিয়া

উপস্থিত। একটি ক্ষুদ্র ভক্তগোষ্ঠী সেখানে সমবেত হইয়াছে এবং শিব-উপাসনার নানা নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ চলিয়াছে।

বসভেশ্বরকে দেখিয়া গৃহস্বামী ও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা তো মহা আনন্দিত। সোৎসাহে অভ্যর্থনা জানাইয়া তাঁহাকে গৃহের ভিতরে আনা হইল। শ্রদ্ধাভরে তাঁহার উপদেশ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে ধন্য হইলেন।

বেলা বাড়িয়া গিয়াছে। বসভ এবার ভক্তদের কাছে বিদায় নিবেন। নাগিদেব যুক্ত করে কহিলেন, "প্রভু, আমাদের পরম সৌভাগ্য, এই দীনের কুটিরে আপনার মতো সিদ্ধ মহাপুরুষের পায়ের ধূলি পড়লো। আজ এখানে ইষ্টগোষ্ঠী করা হয়েছে, প্রসাদান্ন নিবেদন করা হয়েছে ইষ্টদেবকে। আমাদের একান্ত ইচ্ছে, আপনি এখানে প্রসাদ গ্রহণ করুন। অবশ্য যদি আপনার এতে কোন আপত্তি না থাকে।"

"আপত্তির তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, নাগিদেব। জান তো, শিবভক্ত মাত্রেই আমার চোখে 'জঙ্গম'—মহেশ্বর। শিবের মন্দির, শিবের বিগ্রহ প্রতিটি ভক্তসাধকের দেহে ও অন্তরে প্রতিষ্ঠিত—এ আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আর এই বিশ্বাসই তো আমাদের সাধনার প্রধান অঙ্গ।"

ভক্ত শিষ্যদের আনন্দের অবধি নাই। বসভকে নিয়া সবাই পংক্তি ভোজনে বসিয়া যান, আনন্দ কলরব আর জয়ধ্বনিতে অন্ত্যজ পাড়া মুখরিত হইয়া উঠে।

বসভেশ্বরের বিরোধী কয়েক ব্যক্তি নিকটেই ছিলেন। ছুটিয়া গিয়া তাঁহারা রাজা বিজ্জলের গুরু আচার্য্য নারায়ণ ভট্টকে ইহার বিবরণ দিলেন। সনাতন শৈব মতের ধারক-বাহক ক্রমিত, কুচিগ প্রভৃতি বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধকদের কাছেও তখনি সংবাদ পাঠানো হইল। বসভেশ্বরের বিরোধী একদল প্রতিপত্তিশীল রাজ অমাত্যও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সবাই মিলিয়া রাজা বিজ্জলের প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত।

উত্তেজিত কণ্ঠে তাঁহারা কহিলেন, "মহারাজ, আপনি নিজ হাতে রাজদণ্ড গ্রহণ করার পর থেকে, সারা দেশে আশা ভরসা জেগে উঠেছে। আপনাদের প্রাচীন কলচুরীয় বংশ যেমনি শিবভক্ত তেমনি বেদাচার ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষণে তৎপর। কিন্তু এ রাজ্যে ধর্ম্মের যে সব অনাচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে তো কলচুরী বংশের কল্যাণ হবে না।"

"আপনারা আমায় খুলে বলুন, কিসের অনাচার, আর কোথায় এটা ঘটছে।"

রাজগুরু নারায়ণ ভট্ট এবার দৃঢ়কণ্ঠে কহেন, "মহারাজ, পাপমতি বসভেশ্বর যে ধর্ম্ম সমাজ সব কিছু উচ্ছন্ন দিতে বসেছে। এর কোন প্রতিকার কি আপনি করবেন না?"

"বসভেশ্বর ধর্ম্ম সংস্কারে মত্ত, যাকে তাকে দীক্ষা দিচ্ছে। এ তো সবাই আমরা জানি। কিন্তু হঠাৎ এমন কি ঘটলো যে দলবদ্ধ হয়ে আপনারা ছুটে এসেছেন?"—গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেন রাজা বিজ্জল।

"সে কথা বলার জন্যই তো আমরা এসেছি। শুনুন মহারাজ। বসভেশ্বর তার নিজ গৃহে, নিজের অনুভবমণ্ডপে অন্ত্যজ অস্পৃশ্যদের নিয়ে কত কিছু পাপাচারই তো করে যাচ্ছে, তাতে আমরা এতকাল কিছু বলি নি। কিন্তু এমন সাহস হয়েছে তার যে অবলীলায় নগরের যত্রতত্র অধর্ম্ম অনাচার সে করে যাচ্ছে।"

"ব্যাপার কি খুলে বলুন, আচার্য্য দেব।"

"মহারাজ, নগরের প্রান্তে, নাগিদেব নামে এক অস্পৃশ্য ব্যক্তির ঘরে গিয়ে বসভেশ্বর সবার সঙ্গে বসে ভোজন করেছে। প্রকাশ্যে বহু লোকের দৃষ্টির সম্মুখেই একাজ সে করেছে। অথচ সে জানে, রাজ্যের রাজা বেদাচার মানেন, জাতিভেদ বর্ণভেদ মেনে চলেন। কোন্ সাহসে প্রকাশ্যে সে তার বিরোধিতা করছে? এতে আপনার সনাতন শৈব ধর্ম্মকে সে যেমন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে, তেমনি অপমান করেছে আপনাকে। না—মহারাজ, এ অন্যায়ের শাস্তি আপনাকে

দিতে হবে কঠোরভাবে। নইলে লোকে বুঝবে, আপনি দুর্ব্বল হস্তে শাসন করছেন।"

রাজা বিজ্জল মন দিয়া কথাগুলি শুনিলেন, তারপর ধীর স্বরে কহিলেন, "আচার্য্যদেব, আপনি ও রাজপণ্ডিতেরা এখানে রয়েছেন। বিশিষ্ট অমাত্যদেরও আমি দেখতে পাচ্ছি। আপনারা সবাই অতি বিশ্বস্ত, আমার কল্যাণের জন্যও সদা যত্নবান। তাই খোলাখুলি ভাবেই এ ব্যাপারটা আমি আলোচনা করতে চাই।"

"হ্যাঁ, তাই করুন মহারাজ, সেটাই তো আমদের কাম্য।"

"তবে শুনুন আপনারা। বসভেশ্বরের কোন কথাই আমার অজানা নাই। তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে আমি তাঁকে দিনের পর দিন লক্ষ্য করে আসছি, আজকের ঘটনার সব বিবরণও চরমুখে আমি শুনেছি।"

"তবে সত্বর তার দণ্ডবিধান করুন।"

"হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা একটা করতেই হবে, তা ঠিক। কিন্তু আজই, এখনই নয়।"

"সে কি মহারাজ, আপনি কি বসভেশ্বরের চেয়ে শক্তিমান নন? এ রাজ্যের রাজদণ্ড কি আপনার হাতে নেই? পাপাচার আর অন্যায়ের সব কথা জেনেও আপনি চুপ হয়ে তা সহ্য করবেন।"—নারায়ণ ভট্ট ক্ষুব্ধ কণ্ঠে, এক নিঃশ্বাসে কথা কয়টি বলেন।

"তবে শুনুন, রাজদণ্ড আমি ধারণ করি এবং শক্ত হাতেই করি। এ কয় বৎসরে কল্যাণ রাজ্যকে সামরিক শক্তির দিক দিয়ে আমি অজেয় করে তুলেছি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো তা ভালো ভাবেই জানে। বসভেশ্বরকে সমুচিত দণ্ড দেবার শক্তি আমার নিশ্চয় আছে।"

"তবে?"

"সেই কথাই তো আমি বুঝিয়ে বলছি। বসভেশ্বর শুধু আমার একজন সুদক্ষ মন্ত্রী হলে কথা ছিল না। কিন্তু সে এখন কানাড়া রাজ্যের, শুধু কানাড়া কেন সারা দাক্ষিণাত্যের, অন্যতম প্রধান ধর্ম্মনেতা। ধীরে ধীরে সে অতি মাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ আজ তাকে সম্মান করে, ভালবাসে। তার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তুত। বসভেশ্বরকে কঠোর দণ্ড দিলে, গণবিক্ষোভ ও গণবিদ্রোহের আশঙ্কা রয়েছে।”

“তবে কি তাঁকে আপনি শাস্তি দেবেন না, আর তার শক্তি দিন দিন বেড়েই চলবে?”—হতাশভাবে বলে উঠেন আচার্য্য।

“আঘাত আমি তার ওপর হানবোই। কিন্তু সে হবে চরম আঘাত। কূটনীতি ও প্রশাসনের দিক দিয়ে বসভেশ্বরের প্রভাব প্রতিপত্তির এই বৃদ্ধি মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু এখনই তাঁর দণ্ড বিধান করে জটিলতার সৃষ্টি করতে আমি চাই না। আপনারা জানেন, চালুক্য-রাজ তোইলো-তৃতীয়ের দুর্ব্বল শাসনে সারা দেশ খণ্ড বিখণ্ড হচ্ছিল, ধর্ম্ম যাচ্ছিল রসাতলে। নিজে এ সিংহাসন ভোগ করবো বলে আমি তার হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিই নি, নিয়েছি দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য।”

“মহারাজ, তা তো বটেই”—পণ্ডিত ও অমাত্যেরা তোষামোদের সুরে বলিয়া উঠেন।

“কিন্তু এই সহজ সত্যটি রাজ্যের একদল লোক এখনো স্বীকার করে নিতে পারছে না। গোপনে সদাই তারা ষড়যন্ত্র করছে আমার রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্য। ঠিক এ সময়ে বসভেশ্বর ও তার বৃহৎ সংগঠনকে বিদ্রোহী করে তোলা যুক্তিযুক্ত হবে না। বসভেশ্বরকে আমি অবশ্যই ডেকে পাঠাবো। অস্পৃশ্যদের নিয়ে প্রকাশ্যে যেভাবে সে ঢলাঢলি করছে সেজন্য কঠোর ভাষায় তাকে তিরস্কার করবো। সতর্ক করে দেবো, আর যেন এই অনাচার সে বা তার সংস্কারপন্থী বীরশৈবেরা না করে। অন্যথায় কঠোর দণ্ড দেওয়া হবে।”

আচার্য্য ও তাঁহার দলবল ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিছু পরেই বসভেশ্বরকে রাজার সকাশে ডাকিয়া আনা হইল। বিজ্জল তাঁহাকে কাছে বসিতেও দিলেন না, দূরস্থিত এক আসনে স্থান গ্রহণ করিতে বলিলেন। তিনি যেন এক অস্পৃশ্য।

এবার রাজা বিরক্তি ও উষ্মার সঙ্গে প্রশ্ন করেন, “বসভ, এ

তোমার কি দুর্ম্মতি, বলতো? ঘরে বসে ভাঙ্গী, চামার চণ্ডালদের নিয়ে কত পাপাচারই তো করছো। কিন্তু অস্পৃশ্যের সঙ্গে প্রকাশ্যে তুমি পংক্তি ভোজন করলে কোন্ সাহসে! এতে যে আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভেঙে পড়বে, প্রজারা হয়ে উঠবে দুর্নীতিপরায়ণ, স্বেচ্ছাচারী। রাজ শাসনের ভয় যাবে ভেঙে। তোমার এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়। তাছাড়া, অস্পৃশ্যের সঙ্গে একসাথে বসে খেয়েছো, তাই তোমাকেই আমি গণ্য করছি অস্পৃশ্য বলে। রাজা ও তাঁর মন্ত্রীর ভেতর এই ব্যবধান তুমিই সৃষ্টি করলে, বসভ, তোমার হঠকারিতা দিয়ে।"

বসভেশ্বর এবার শান্ত স্বরে উত্তর দেন, "মহারাজ, আমার ধর্ম্মীয় মতবাদ তো মোটেই আপনার অজানা নয়। আমার আচার-ব্যবহারে গোপনতা কিছু নেই, রাজা ও ধর্ম্মের বিরোধিতা করা তো দূরের কথা তাঁদের সেবাতেই আমি নিযুক্ত রয়েছি। কিন্তু শিবের জগতে শিব-সন্তানদের মধ্যে ভেদজ্ঞান থাকবে, এ আমি চাইনে। ব্রাহ্মণ শূদ্র সবাই মিলে হবে একটি একান্নবর্ত্তী পরিবার, পাপ-তাপে ভরা এই পৃথিবীকে করে তুলবে কৈলাস ধাম। এটা আমার নবতর শৈব ধর্ম্মের মূল কথা। এতে পাপাচার কিছুমাত্র নেই, কারুর অকল্যাণের প্রয়াসও নেই।"

"না বসভ, তুমি এসব অবাস্তব, ভাবাবেগময় কথায় আমায় বিভ্রান্ত করতে পারবে না। তোমার সংস্কারপন্থী ধর্ম্মে গণ-বিদ্রোহের বীজ নিহিত রয়েছে। বেদধর্ম্ম ও বেদাচার ধ্বংস করার কু-অভিসন্ধি নিয়েই তুমি কাজ করছো, অন্ত্যজদের সমর্থনে নিজের শক্তি বাড়িয়ে তোলার স্বপ্ন দেখছো।"

"এ আপনি কি বলছেন, মহারাজ?"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আর শোন, এর ফল কিন্তু তোমার পক্ষে মোটেই ভালো হবে না। যাক্, আর যা-ই করো, প্রকাশ্যে অন্ত্যজদের সঙ্গে বসে তুমি বা তোমার দলের লোকেরা যেন কখনো ভোজন ক'রো না. সমাজের বুকে স্বেচ্ছাচার ও বিদ্রোহের সূচনা

ক'রো না। প্রথম অপরাধ আমি মার্জ্জনা করলাম। কিন্তু তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি, এর পর কেউ প্রকাশ্যে এরূপ অপরাধ করলে তার আমি চরম দণ্ড বিধান করবো।"

ক্রুদ্ধ বিজ্জল দৃঢ়স্বরে কথা কয়টি বলিয়া বসভেশ্বরকে বিদায় দিলেন। সেই দিন হইতে রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে গড়িয়া উঠিল এক বিরোধের প্রাচীর।

কয়েক মাস পরের কথা। রাজধানী কল্যাণে এবার আর একটি ঘটনা ঘটে যাহার ফলে এক বৃহত্তর সঙ্কট ঘনাইয়া আসে।

হরলয় নামক এক অন্ত্যজের পুত্রের সঙ্গে মধুবায় নামক এক ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ সেদিন অনুষ্ঠিত হয়। উভয়েই বীরশৈব সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু এ ঘটনায় সনাতনী আচার্য্যেরা গর্জ্জিয়া উঠেন। একে অস্পৃশ্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিবাহ, তদুপরি ব্রাহ্মণের কন্যা যাইতেছে অস্পৃশ্যের ঘরে। এ যে প্রতিলোম বিবাহ। শাস্ত্র কখনো ইহার সমর্থন করে না। প্রভাবশালী সনাতনপন্থীরা রাজা বিজ্জলের দরবারে অভিযোগ পেশ করিলেন।

হরলয় ও মধুবায় উভয়কেই ডাকাইয়া আনা হইল। বিজ্জল উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "দ্যাখো, এ প্রতিলোম বিবাহ দেশের শাস্ত্র বিধানের বিরোধী। সরকারী আইন এটা কখনো সমর্থন করবে না। এজন্য গুরুতর কারাদণ্ড তোমাদের পেতে হবে। ভালো চাও তো এ বিবাহ এখনই নাকচ করে দাও।"

অভিযুক্তেরা একটুও ভীত নয়। স্পষ্ট ভাষায় তাহারা নিবেদন করে, "মহারাজ, আমাদের বীরশৈব মত অনুযায়ীই এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, এতে তো কারুর কিছু হানি হয় নি। কারুর কিছু বলারও নেই।"

"তবে কি রাজ-রোষের ভয়ও তোমরা করছো না"—বিজ্জল ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন।

"মহারাজ, কারুর রোষের পরোয়া আমরা করিনে। মাথার

ওপরে দেবাদিদেব শিব, আর চোখের সামনে মহাসাধক বসভেশ্বর। এই দুই ছাড়া আর কাউকে আমরা জানিনে।”

রোষে উত্তেজনায় রাজা বিজ্জলের সারা দেহ কম্পিত হইতেছে। দৃঢ় স্বরে আদেশ দিলেন, “এরা রাজদ্রোহী, সমাজদ্রোহী। চরমদণ্ডই এদের প্রাপ্য। দুষ্টদের চোখ উপড়ে ফেলে দেওয়া হোক। দেশের লোক বুঝুক, সমাজ ও রাজশক্তির বিরোধিতা করলে কোন্ দণ্ড পেতে হয়।”

আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হয়। এক মর্ম্মান্তিক স্তব্ধতা নামিয়া আসে রাজধানীর জন-জীবনে।

বসভেশ্বর শিহরিয়া উঠেন এ সংবাদে। সাধন কুটিরে একান্তে গিয়া উপবেশন করেন। করুণ আর্ত্তি জাগিয়া উঠে সারা অন্তরে। যুক্ত করে নিবেদন করেন, “হে দেবাদিদেব, হে প্রভু সঙ্গমেশ্বর, সারা জীবন ধরে আমি এগিয়ে চলেছি তোমারি নির্দ্দেশে। সাধন ভজন, বীরশৈবদের সংগঠন ও সংস্কার সব কিছুতেই পেয়েছি তোমারই সমর্থন ও প্রেরণা। আজ আমায় বলে দাও, অতঃপর কি আমার কর্ত্তব্য।”

কিছুক্ষণের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া বসভেশ্বর গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যান। তারপর ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বরের ঘটে আবির্ভাব। প্রশান্ত কণ্ঠে প্রভু কহেন, “বৎস বসভেশ্বর, কায়কের সাধনা তোমার শেষ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকে তোমার সাধনার বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে মুক্তির দীপশিখা। শিবভক্তির জোয়ার এসেছে লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনগণের জীবনে। তোমার ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কাজ তুমি সমাপন করেছো। এবার এসে পড়ো তোমার প্রাণপ্রিয় কুড়ল-সঙ্গমে। সেখানে তোমাতে আমাতে কি আনন্দেই না কাটবে।”

সিদ্ধান্ত স্থির করিতে বসভের একদিনও দেরী হইল না। রাজা বিজ্জলের কাছে পদত্যাগ পত্র তিনি পেশ করিলেন।

যোগীবর অল্লাম-প্রভু তখন বল্লিগাভেতে অবস্থান করিতেছেন। তাড়াতাড়ি সেখানে এক পত্র পাঠাইয়া বসভ সঙ্গমেশ্বরের নির্দ্দেশ

তাঁহাকে জানাইয়া দেন। তারপর সর্ব্বত্যাগী জঙ্গমের বেশে শুরু করেন কুড়ল-সঙ্গমের দিকে পদযাত্রা।

ভক্তেরা কাঁদিয়া বলে, "প্রভু, আমাদের প্রতি কি নির্দ্দেশ রইলো আপনার? কি করেই বা আমাদের দিন কাটবে, তা বলে দিন।"

প্রশান্ত কণ্ঠে বসভেশ্বর বলেন, "শিবময় ধর্ম্মজীবন, আর শিবের মতন ত্যাগপূত তপস্যা নিয়ে দিন যাপন কর। অনুভব-মণ্ডপ আর বীরশৈব সংগঠনের কাজ পূর্ব্ববৎ চালিয়ে যাও তোমরা। ভুলবে না, তোমরা সবাই শিবভক্ত, শিবস্বরূপ হওয়াই তোমাদের সাধনার চরম লক্ষ্য। প্রভু সঙ্গমেশ্বর আমায় ডাক দিয়েছেন। তাঁর পুণ্যধামেই আমি এবার যাচ্ছি। তাঁর প্রেরণায় তোমাদের ভেতর এসেছিলাম, তোমাদের সেবা যথাসাধ্য করেছি। এবারে তাঁরই আদেশে ফিরছি কুড়ল-সঙ্গমে।"

সহস্র সহস্র মানুষের আর্ত্তি ও ক্রন্দন পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, বসভেশ্বর ধীর পদে অগ্রসর হইলেন প্রভুর ধামের দিকে।

সঙ্গমেশ্বর তীর্থে পৌঁছিয়া তাঁহার আনন্দের আর অবধি নাই। জীবনে এবার আসিয়াছে চির-বিরতির পালা। এবার শুধু প্রভু আর তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের আনন্দ-রঙ্গ, আনন্দ-মিলন।

প্রভুর চরণকমল ধ্যানেই বাকিটা দিন বসভেশ্বর অতিবাহিত করিবেন। যতদিন এ দাসকে তিনি আত্মসাৎ না করেন, ততদিন চলিবে তাঁহার আরাধনা ও ধ্যান জপ। সঙ্গমেশ্বরের চরণে সেদিন সাশ্রুনয়নে নিবেদন করিলেন :

তোমার চরণ-কমলের মধুকর আমি,
হে প্রভু, চেয়ে ছাখো, তাইতো জিহ্বা আমার
তোমার নামের সুধায় হয়েছে মিঠে,
তোমার মুখশশীর জ্যোতির ছটায়
প্রদীপ্ত হয়েছে আমার এই নয়ন যুগল।
তোমার নিরন্ধ্র ভাবনা আর অনুধ্যানে
আমার দিনরাতের ব্যবধান গেছে ঘুচে,

তোমার স্তুতিগানের পবিত্র ঝঙ্কারে
আমার এ শ্রবণ দুটি সদাই রয়েছে ভরপুর।

পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যে যে একটি নিবিড় আনন্দময় অনুভূতি রহিয়াছে, তাহা বসভেশ্বরের এ সময়কার একটি বচনে পরিস্ফুট। তাঁহার মতে—সাধক দেহ যেন একখানি রম্য বীণা, পরম প্রভু লীলাভরে এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আবার নিজ হাতেই সুরে তালে লয়ে তাহা সানন্দে বাজাইয়া চলিয়াছেন। এই রূপকটির বর্ণনা দিতে গিয়া বসভ গাহিয়াছেন:

দয়াল প্রভু, আমার এই দেহকে
কর তোমার বীণা যন্ত্রের দেহ।
আমার এই শির হোক তার শীর্ষচক্র,
স্নায়ু-শিরাগুলোর হোক রূপান্তর
সেই বীণার মধু-নিঃস্যন্দী তারে,
আমার এই হাতের আঙুলগুলো হয়ে উঠুক্
বীণার তার-জড়াবার কান,
হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর!
আমার এ দেহবীণার তারে তারে
কর আঘাত, আর বাজাও তোমার দিব্য সুর।

এ সময়ে হঠাৎ একদিন রাজধানী কল্যাণের এক দুঃসংবাদে কুড়ল-সঙ্গমে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। জানা যায়, বিরোধীদের আকস্মিক আক্রমণে রাজা বিজ্জল নিহত হইয়াছেন এবং আততায়ীরা বীরশৈব দলেরই অন্তর্ভুক্ত চরমপন্থীদল।

হরলয় ও মধুবায়ের চক্ষু উৎপাটন করার পর বিজ্জলের বিরুদ্ধে জনরোষ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। বসভেশ্বরের অন্তরঙ্গ সাধকেরা শান্ত থাকিলেও একদল উগ্র বীরশৈব রাজার এই নৃশংস কার্য্যের সমুচিত দণ্ড বিধান করিতে উদ্যত হয়। এই দলের প্রধান নেতা জগদেব। সহকারীদ্বয় মোল্ল ও বোময়কে নিয়া রাজা বিজ্জলের নিধনের জন্য

তিনি এক গোপন চক্রান্ত গড়িয়া তোলেন। তারপর সুযোগ বুঝিয়া হঠাৎ একদিন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজাকে তাঁহারা হত্যা করেন। রাজধানী কল্যাণে অতঃপর চলিতে থাকে সরকারী দমন-অভিযান আর উত্তাল হইয়া উঠে গণ-বিক্ষোভ ও গণ-সংঘর্ষ।

কুড়ল-সঙ্গমের ভক্তেরা বসভেশ্বরকে এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির কথা জানাইলেন, চাহিলেন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ।

ধ্যানাবিষ্ট বসভেশ্বর শুধু কহিলেন, "বিজ্জলের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। তাই বুঝি তাকে বিদায় নিতে হলো। তবে জগদেব ভুল করেছে, নিজ হাতে নিধনের অস্ত্র তুলে না নিয়ে তাঁর ওপরই নির্ভর করা উচিত ছিল, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ন্তা হয়ে যিনি রয়েছেন সদা জাগ্রত। এ সম্পর্কে আমার নিজের কিছু বলার নেই, করারও নেই। এখন প্রভুর লীলার আমি দর্শক মাত্র।"

গুরু জাতবেদমুনি বহুদিন যাবৎ গত হইয়াছেন। কিন্তু কুড়ল-সঙ্গমের শৈব সাধক ও সন্ন্যাসীর সমাবেশ পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। বসভেশ্বর কিন্তু আজকাল কাহারও সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করেন না, আপন মনে দিনের বেলায় ঘুরিয়া বেড়ান সঙ্গমস্থলে, আর রাত্রে ধ্যান জপে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন।

এখন কেবলই তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন পরিপূর্ণতার পথে, দেবাদিদেব মহেশ্বরের পরম সঙ্গমের দিকে। দেহ, মন, আত্মা সব কিছুই আজ ভরিয়া উঠিয়াছে তাঁহার প্রভুর প্রেমে, আর অবদানে। এ সময়কার একটি বচনে তিনি গাহিয়াছেন[১] :

হে প্রভু, যত কিছু কথা আমার
ভরে তুলবো তোমার নামের সুধায়,
নয়ন দুটি জুড়ে উঠবে ফুটে
তোমার নয়নাভিরাম রূপ।
তোমার রম্য স্মৃতিতে পূর্ণ হবে আমার অন্তর,

[১] ভচন্‌স্‌ অব বসভন্ন—অনুবাদ : মেনজেস্‌ অ্যাণ্ড অংদি

শ্রবণ দুটি উঠবে ভরে তোমার যশোগানে,
হে কুড়ল-সঙ্গম দেব,
তোমার চরণকমল দুটি ছুঁয়ে
সার্থক করে তুলবো আমার এ জীবন।

সাধনার চরম স্তরে পৌঁছিয়াছেন বসভেশ্বর। ধ্যান দৃষ্টিতে সদাই হইতেছে অপরূপ দর্শন। পরম শিব আর তাঁহার অনাগ্তন্ত সৃষ্টি দুইই হইয়া গিয়াছে একাকার। বসভের মুখনিঃসৃত একটি বচনে, এই দিব্য অভিজ্ঞতাটি বর্ণিত :

যে দিকেই করি নয়নপাত, হে প্রভু,
নিরন্তর হয় শুধু তোমারই দর্শন।
এই সীমাহীন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড
বিলসিত রয়েছে তোমারি অপরূপ রূপে—
তুমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের আয়ত নয়ন,
বিকচ কমল সদৃশ আনন তুমিই,
স্কন্ধ, হস্ত ও চরণদ্বয় তাও যে প্রভু তুমি,
বিশ্ব নিয়ন্তা হে কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর,
কোটি কোটি নক্ষত্রে খচিত তোমার এই মহাকাশ—
তোমার এই বিরাম বিহীন সুমহান সৃষ্টি—
তোমারই মত অনাদি আর অনন্ত,
তোমারই মত অপরূপ মহিমায় তারা সমুজ্জ্বল।

সাধনার এই পরম অবস্থার পর দেহবোধ তাঁহার বিলুপ্ত হয়, ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বরও প্রাণপ্রিয় ভক্ত বসভেশ্বরের দেহ মন আত্মাকে করেন আত্মসাৎ।

১১৬৭ খৃষ্টাব্দের বসভের মহাপ্রয়াণের এই মর্ম্মান্তিক দিনটি বীরশৈব সাধকেরা কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

লাটু মহারাজ

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেদিন ভক্ত লাটুকে নিয়া মহাব্যস্ত। এই নূতন অবাঙ্গালী শিষ্যটি নিরক্ষর, কোনমতে বর্ণ পরিচয় করাইয়া দিলে যদি বা লেখাপড়ার দিকে তাহার মনটা ঘোরে। আজ ঠাকুর তাই স্থির করিয়াছেন, লাটুর অক্ষর পরিচয় শেষ করিয়া তবে ছাড়িবেন।

ঠাকুর যতবার পড়ান 'ক', ছাত্র ততবার বলে 'কা'। পশ্চিমদেশীয় ভক্তের জিহ্বায় সহজে অকারান্ত উচ্চারণ আসে না। ঠাকুর মহা সমস্যায় পড়িয়াছেন, আর বলিতেছেন "শালা, 'ক'কে যদি 'কা' বলিস, তবে এতে আকার দিলে তখন কি বলবি ?" বহু চেষ্টার পর রামকৃষ্ণ শিক্ষাদানে ক্ষান্ত হইলেন। বলিলেন, "যা শালা, তোর পড়েই আর কাজ নেই।"

উত্তরকালে এই নিরক্ষর শুদ্ধসত্ব শিষ্যের আধারে ঠাকুর অকৃপণ করে কৃপার ধারা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিজের সাধন-জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—পবিত্রতা, সরলতা ও ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা। তাঁহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই অধ্যাত্ম-শিল্পী রামকৃষ্ণের এই বিহারী ভক্ত লাটু মহারাজের মধ্যে।

ব্যবহারিক শিক্ষা ও লেখাপড়ার অভাব যে ভগবৎ-প্রাপ্তির অন্তরায় ঘটাইতে পারে না, তাঁহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ঠাকুর নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন ; উত্তরকালে লাটু মহারাজের অলোকসামান্য অধ্যাত্ম-জীবনেও দেখা গিয়াছে তাহারই অনুকৃতি।

ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রয়াস সেদিন বিফল হইয়া গেল। লাটু তারপর পরমানন্দে গঙ্গাতীরের বাগানে গিয়া প্রাণ খুলিয়া গান শুরু করিলেন, 'মনুয়ারে—সীতারাম ভজন করলিজিয়ে।'

স্মিতহাস্যে ঠাকুর দূর হইতে ইহা শুনিতেছেন। লাটুকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, তোর ওতেই হবে।" সত্যিই ইহাতেই তাঁহার

হইয়াছিল। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া বৈরাগ্যবান্ স্বভাবসরল লাটু সদ্গুরুর নির্দ্দেশিত শ্রদ্ধা-ভক্তির পথেই অগ্রসর হন। এই পথেই তাঁহার ভাগবত জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। লীলাময় রামকৃষ্ণের আনন্দ-কাননের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া লাটু মহারাজ ফুটিয়া উঠেন একটি দিব্য সৌগন্ধবিস্তারী পুষ্পরূপে।

লাটু মহারাজ তাঁহার উত্তর জীবনে ঠাকুরের একটি গল্প প্রায়ই ভক্তদের কাছে বলতেন। গুরু-নিষ্ঠার দিক দিয়া এ গল্পটি কিন্তু লাটু মহারাজকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

রামচন্দ্রের সভায় সর্ব্বজনসমক্ষে ভক্ত বীর হনুমান যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভু রামচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া এ সময়ে হনুমানকে একছড়া বহুমূল্য মুক্তামালা উপহার দেন। হনুমান উহা প্রথমে নাড়িয়া-চাড়িয়া কি যেন পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাহার পর প্রত্যেকটি মুক্তা নখাঘাতে বিদীর্ণ করেন, ভেতরকার বস্তুটি বুঝি আবিষ্কার করিতে চাহেন। তাহার পর ঐ মালা ছুঁড়িয়া ফেলেন ভূতলে।

প্রভু রামচন্দ্রের মালার এই অপমান! লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্ব্বাণ উদ্যত করিয়াছেন, এমন সময় শ্রীরাম বাধা দিয়া কহেন, "আসল কথাটা কি জানো, মুক্তামালাতে 'রামনাম' কোথাও ক্ষোদিত নেই, তাই পরমভক্ত হনুমানের কাছে এটা মূল্যহীন, পরিত্যজ্য।

গুরু রামকৃষ্ণের প্রতি এমনই একনিষ্ঠ ভক্তি লাটু মহারাজেরও ছিল। জীবনে প্রাপ্ত সমস্ত কিছু তত্ত্ব ও শিক্ষাই তিনি সদ্গুরু রামকৃষ্ণের কষ্টিপাথরে সতর্করূপে যাচাই করিয়া নিয়াছেন।

লাটু মহারাজের গুরুভাইরা বলিতেন, ভক্তবীর পবন-তনয় যেমন রামচন্দ্রের লীলার এক উজ্জ্বল রত্ন, রামকৃষ্ণের লীলায় লাটু মহারাজও তেমনই একটি বড় সম্পদ। তাই বুঝি কাশীতে স্থাপিত স্মৃতি-মন্দিরে হনুমানজীর প্রস্তরমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে এই নৈষ্ঠিক ভক্তের প্রেম-ভক্তির স্মারকরূপে।

লাটু মহারাজের গুরুকৃপার সৌভাগ্য ও অধ্যাত্ম-সিদ্ধির পরিমাপ করা যায় তাঁহার গুরুভাই বিবেকানন্দের একটি মন্তব্যের

মধ্য দিয়া। ঠাকুর ও ঠাকুর-সন্ততির আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আমাদের মধ্যে লেটোটাই ঠাকুরকে ঠিক ধরেছিল।" সদ্‌গুরুর অনুসরণে, নিরন্তর অনুধ্যানে, লাটু মহারাজের অন্তর-সত্তা তাঁহারই ভাবে ও ভাবনায় হইয়াছিল বিভাবিত। দেহেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল রামকৃষ্ণেরই ছাপ। তাই প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের আকৃতির সহিত লাটু মহারাজের সাদৃশ্য দেখিয়া একবার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

লাটু মহারাজের জীবন ছিল ত্যাগবৈরাগ্যময়। এ জীবন ভক্তিময় ভজনের নিরালা পথটি ধরিয়াই অগ্রসর হয়। রামকৃষ্ণ-মণ্ডলী তাঁহার প্রাণপ্রিয় হইলেও বিবেকানন্দের প্রবর্ত্তিত সঙ্ঘে তিনি যোগ দেন নাই। প্রিয় গুরুভ্রাতাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও তিনি মঠে রাত্রিবাস কখনো করিতেন না। বলিতেন, "হামরা সাধু। হামাদের আবার জমি, বাড়ী, বাগান, ঐশ্বর্য্য এ সব কি বাবা? এ সবের মধ্যে হামি থাক্‌বে না।"

তবুও মঠের বাহিরে, একান্তচারী এই মহাপুরুষের রামকৃষ্ণময় জীবন হইতে, মণ্ডলীর কত সাধু-সন্ন্যাসী যে অধ্যাত্ম-পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছে, আপ্তকাম হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রায়ই লাটু মহারাজের কাছে নবীন ভক্তদের পাঠাইতেন। আর এই কঠোরী মহাপুরুষের কাছে পাঠানোর সময় আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "লাটুর কাছে ঘেঁষতে ভয় কিসের রে? ওর বাইরে একটু রুক্ষভাব—সেটা লোকসঙ্গ এড়ানোর জন্য, কিন্তু ওর ভেতরটা একেবারে ক্ষীরে ভরপুর।'

ভক্তপ্রবর গিরিশ ঘোষ তো লাটু মহারাজ সম্পর্কে ছিলেন উচ্ছ্বসিত, সবাইকেই তাঁহার আশীর্ব্বাদ চাহিয়া নিতে তিনি উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন, "এমন বেদাগ্‌ সাধু আমি জীবনে কখনো দেখি নি।"

দক্ষিণেশ্বরে একদিন সমাধির পরে অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ লাটুকে বলিয়াছিলেন, "ওরে লেটো, দেখবি একদিন তোর মুখ দিয়ে বেদ-বেদান্ত ফুটে বেরোবে।"

এই অমোঘ বাক্যের ফল ফলিয়াছিল এবং নিরক্ষর লাটু মহারাজ প্রখ্যাত হইয়াছিলেন রামকৃষ্ণের এক অসামান্য সৃষ্টিরূপে।

লাটু মহারাজের বাল্যকালের নাম রাখতুরাম। বিহারের ছাপরা জেলায় এক কৃষকের পরিবারে তাঁহার জন্ম। গরীব ঘরের ছেলে, ভেড়া-ছাগল চরানো অর্দ্ধনগ্ন রাখাল, এই রাখতুরাম যে একদিন রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক হইবেন, তাহা কে জানিত? জানিতে পারিলে কেহ হয়তো তাঁহার জন্মের সাল তারিখ সতর্কতার সহিত লিখিয়া রাখিত। তবে মোটামুটিভাবে অনুমান করা যায়, রাখতুরাম পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে।

বাল্যকালেই রাখতু পিতামাতাকে হারায় এবং তারপর সে পিতৃব্যের সংসারে থাকিয়া মেষপালন করিতে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা লাভেরও কোন সুযোগ তাহার ঘটে নাই। আর্থিক দুরবস্থায় পড়িয়া পিতৃব্য সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং এখানে রামকৃষ্ণ-ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে পরিচারক হিসাবে রাখতুরাম কাজ করিতে থাকে। বাড়ীর সকলে আদর করিয়া তাহাকে ডাকিত লালটু নামে। তেজস্বী, সৎ ও ঈশ্বরভক্ত এই নূতন ভৃত্যটিকে রাম দত্ত ও তাঁহার পরিবারের সবাই স্নেহ করিতেন। অকপট ও উচিতবক্তা এই বালক কিন্তু মাঝে মাঝে সমস্যার সৃষ্টি করিয়া বসিত, রাম দত্ত সস্নেহে তাহাকে মানাইয়া চলিতেন।

গৃহে ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ প্রায়ই চলে। বালক উৎকর্ণ হইয়া এই আলোচনা শুনিতে চেষ্টা করে। কি এক অমোঘ আকর্ষণ যে সে অনুভব করে, কিছুই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না।

এক একদিন কম্বল চাপা দিয়া শুইয়া লালটু গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠে। অহৈতুক কান্নায় দুই চোখ ভাসিয়া যায়।

সাধক নিত্যগোপাল অবধূত এই সময়ে রাম দত্তের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। ধর্ম্মালোচনা ও নামগান তাই মাঝে মাঝে হয়, আর

লালটুর অন্তরের গভীরে রহস্যময় শিহরণ জাগে, নূতন জীবনোন্মেষের ইঙ্গিত সারা দেহমন চঞ্চল করিয়া তুলে।

রামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রায়ই আলোচিত হয় আর এসব তাহার কানে পেঁাছে। দিনরাত চলে তাহার গুঞ্জরণ—'যে সদা ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই কাছে ঈশ্বর হন প্রকাশিত।'

প্রভু রামকৃষ্ণের কথাগুলি লালটু মনে রাখিয়াছে। মন তাই অজানা পরম বস্তুর জন্য বার বার চঞ্চল হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে কেনই বা সে ফুঁপাইয়া কাঁদে আর চক্ষুর জল ফেলে বাড়ীর কেহ সে রহস্যের সমাধান করিতে পারে না।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দটি লালটুর জীবনের এক স্মরণীয় বৎসর। একদিন মনিব রাম দত্তের সঙ্গে গিয়া সে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে। ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া লালটু প্রণাম করে, করজোড়ে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া থাকে।

সমবেত ভক্তদের উদ্দেশ করিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠেন, "গ্যাখো, যারা নিত্যসিদ্ধ তাদের কিন্তু জন্মে জন্মে জ্ঞানচৈতন্য হয়েই রয়েছে। তারা যেন পাথরচাপা ফোয়ারা। মিস্ত্রী এখানে-সেখানে ওস্কাতে ওস্কাতে যেই এক জায়গার চাপটা সরিয়ে দেয়, অমনি ফোয়ারার মুখ থেকে ফর্‌ফর্‌ করে জল বেরুতে থাকে।"

কথা কয়টি শেষ করিয়া হঠাৎ ঠাকুর লাটুকে স্পর্শ করিলেন।[১] এই দিব্য স্পর্শে ঘটে তাহার বিস্ময়কর ভাবান্তর। গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, সমস্ত শরীর কম্পমান, দেহের রোমরাজী কণ্টকিত। আর তার অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইতেছে কান্না।

রাম দত্ত বিপদ গণিলেন। ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন, "ব্যাপার তো বুঝলুম। তা, ছেলেটি কি সারাক্ষণ কাঁদতেই থাকবে?"

১ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়: শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা

ঠাকুর আবার স্পর্শ করা মাত্র লালটুর ক্রন্দন থামিয়া যায়। অধ্যাত্ম-জীবনের অলৌকিক শক্তিধর শিল্পী ছিলেন রামকৃষ্ণ। সে'দিন লালটুর অন্তস্তলে কোন্ পাথরচাপা নির্ঝরের মুখ তিনি নিপুণ হস্তে খুলিয়া দিলেন তাহা তিনিই জানেন।

ইহার পর লালটুর জীবনে এক বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটে। তাঁহার সমস্ত চঞ্চলতা ও কলরব হয় অন্তর্হিত—সে যেন তখন একটি কলের পুতুল। ঠাকুরের জন্য ফল-মূল নিয়া আবার একদিন লালটু পরমোৎসাহে দক্ষিণেশ্বরে যায়। ঠাকুরের মিষ্টি কথা শুনিয়া ও প্রসাদ পাইয়া নিজেকে জ্ঞান করে কৃতকৃতার্থ।

ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বাস করার জন্য লালটু বদ্ধপরিকর। কিন্তু এই সময়ে ঠাকুর হঠাৎ কিছুদিনের জন্য স্বগ্রামে চলিয়া যান। তীব্র ব্যাকুলতা নিয়া চাতক পক্ষীর মতো দক্ষিণেশ্বরে লালটু মাঝে মাঝে বসিয়া থাকে। তাঁহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ দেশে গেলেও অলক্ষিতে এখানে সদাই বর্ত্তমান আছেন। তবে লালটু তাঁহার সূক্ষ্মদেহের সান্নিধ্য ছাড়িবে কেন?

একদিন ভক্তবৎসল ঠাকুরের কৃপায় তাহার মনোবাঞ্ছা কিন্তু পূর্ণ হয়, অলৌকিকভাবে ঠাকুর তাঁহাকে দর্শন দান করেন। লালটুর অধ্যাত্ম-জীবনে সদ্গুরুর আশীর্ব্বাদটি এই দর্শনের মধ্য দিয়া সক্রিয় হইয়া উঠে।

পরমহংসদেব কামারপুকুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মনিবের প্রদত্ত ফল-মূল ও মিষ্টান্ন নিয়া আবার একদিন লালটু দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছে। ঠাকুর সস্নেহে এবার কহিলেন, "ওরে আজ তুই এখানেই থেকে যা। মায়ের প্রসাদ পাবি।"

লালটু দক্ষিণেশ্বরে রহিয়া গেল। রাত্রে প্রসাদ পাইবার পর সে ঠাকুর রামকৃষ্ণের পদসেবার ভার পাইয়াছে। তাই আনন্দ আর ধরে না। অকস্মাৎ তাহার সারা দেহে মনে একটা দিব্য ভাবের ঘোর নামিয়া আসে, তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। চোখে নামে অশ্রুর বন্যা।

ঠাকুর নীরবে লক্ষ্য করিতেছেন। এবার রহস্য করিয়া হাসিয়া বলেন, "কিরে, তোর আবার একি হল ?"

কম্পিত কণ্ঠে লালটু উত্তর দেয়, "হামে কি জানে ?"

সবাই বুঝিলেন, পরমহংসদেবের সামান্যতম কৃপা কটাক্ষে এই নবাগত শিষ্যের দেহে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার ভাব হইয়াছে এমন ঘনীভূত।

লালটুকে দিয়া আর বাড়ীর পরিচারকের কাজ করাইতে রাম দত্তের মন এবার সরে না। ঠাকুরের কাজের জন্যেই তাঁহাকে তিনি নিয়োজিত রাখিতে চান। লালটু আজকাল ঠাকুরের উৎসব অনুষ্ঠানে কর্ম্মী হিসাবে ঘোরাঘুরি করিতে থাকে। অবশেষে ঘটনাচক্রে দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরের সেবক হৃদয় মুখুয্যে অপসারিত হন, রাম দত্ত নিজেই উৎসাহ করিয়া লালটুকে স্থায়ীভাবে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দেন।

ঠাকুরের সেবায় লালটু এবার কায়-মন-প্রাণ ঢালিয়া দেয়। সদ্গুরুর সস্নেহ ও সতর্ক দৃষ্টিও তাহার উপর থাকে নিবদ্ধ। মাঝে মাঝে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন, "দেখিস রে লেটো, তুই যেন ইখানকার বাইরেটা দেখে ভুলে যাস নি। ওরে এটার (হাড় মাসের খাঁচা) সেবায় কিছু পাওয়া যায় না। এর ভেতরে যে বাস করে, তার সেবা করলে সব পাবি।"

সাধক লাটু সারা জীবন ভরিয়া এই নির্দ্দেশটি পালনে চেষ্টিত ছিলেন। ঠাকুরের দেহাবসানের পরেও তাঁহার মুখ্য ভাব ছিল —'তাঁকে যেন না ভুলি।' ঠাকুরকে জীবন-সর্ব্বস্ব করিবার এই সাধনায় লাটু মহারাজ যে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি কৃতী গুরুভাইরা অকুণ্ঠ চিত্তে ইহা স্বীকার করিতেন।

লাটুর সাধনা ছিল আত্মসমর্পণের সাধনা। সদ্গুরু চরণে তিনি বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন তাঁহার দেহ-মন-প্রাণ, সর্ব্বসত্তা।

আত্মসমর্পণের এই সাধনায় লাটু মহারাজের নিরক্ষরতা ও শুদ্ধা-ভক্তির বেগ তাঁহাকে অশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

শিষ্য নিজেকে সমর্পণ করিতেছেন; তাঁহার যেমন সব কিছু দিয়াও মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিত না, গুরুরও তেমনি চাওয়ার অন্ত ছিল না। শিষ্যের আত্মসমর্পণকে নিরন্ধ্র ও নিখুঁত করিবার জন্য তাঁহার কি ব্যাকুলতা, কি সতর্ক প্রহরা!

শরৎ মহারাজের মাতা একদিন লাটুকে আদর করিয়া চচ্চড়ি রাঁধিয়া খাওয়ান। লাটু তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে বলিতেছেন, "আজ এমন চচ্চড়ি রসুই হয়েছে যে হামনে জীবনে খায় নি, মোশাই।"

ঠাকুর যেন তাঁহার সঙ্গী অবোধ বালকটি। ব্যথিত স্বরে তিনি বলিলেন, "বলিস্ কিরে। তুই একা সে-সব খেয়ে এলি! ইখানকার জন্যে কিচ্ছু আনলি নে?"

ঐ চচ্চড়ি পরের দিন আনানো হয়। সর্ব্বপাশমুক্ত, সর্ব্ব-লোভমুক্ত ঠাকুর তাহা ভোজন করেন। গুরুগতপ্রাণ শিষ্য সামান্য চচ্চড়িটুকু খাইতে গিয়াও ঠাকুরের কথা স্মরণে রাখুক, নিজের তৃপ্তির সহিত ঠাকুরের তৃপ্তির অন্বয় সাধন করুক, আত্মবৎ সেবার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝুক—ইহাই ছিল রামকৃষ্ণের চচ্চড়ি-ভক্ষণে উৎসাহের প্রকৃত মর্ম্ম। শিষ্য গুরুকে যেমন আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন, গুরুও তেমনি তাঁহাকে দিয়াছিলেন সর্ব্বাত্মক আশ্রয়।

যদু মল্লিকের বাড়ীতে সেদিন সিংহবাহিনীর পূজা হইতেছে। সংবাদ পাইয়া রামকৃষ্ণ লাটু প্রভৃতি ভক্তদের নিয়া দেবীকে প্রণাম করিতে গেলেন। মল্লিক মহাশয় তখন মহাব্যস্ত, এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছেন, ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করা তো দূরের কথা, একবার বসিতেও বলিলেন না।

রামকৃষ্ণ দেবী প্রতিমা প্রণাম করিয়া সঙ্গী ভক্ত-শিষ্যদের নিয়া বাহিরে আসিলেন। লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা এবার রামকৃষ্ণকে চাপিয়া ধরিলেন। শুধু শুধু অপমানিত হইবার জন্য এই অভদ্র বড়লোকের বাড়ীতে কেন তিনি আসেন?

ঠাকুর স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁরে, তোরা কি তবে বাড়ীর

বড়লোক কর্ত্তাকে দেখতে গিয়েছিলি যে, বসতে বলেনি বলে অভিমান করছিস্। সাধু হতে চাইলে অভিমান ত্যাগ করতে হবে, কেউ মানলো কি না মানলো, এসব দেখলে চলবে না, বুঝলি ?"

এমনি করিয়াই ঠাকুর লাটু প্রভৃতি ভক্তদের অহমিকার অঙ্কুর সযত্নে দিনের পর দিন উৎপাটন করিতেন।

গিরিশ ঘোষ একদিন মদ্যপানের পর মত্ত অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ঠাকুর লাটুকে কহিলেন, "ওরে, যা তো গাড়ীতে গিরিশবাবু কিছু ফেলে এসেছে কিনা ছাখ্।"

লাটু গাড়ীর ভিতরে উঁকি মারিয়া তো অবাক্। তারপর সেখান হইতে একটি মদের বোতল ও গ্লাস উদ্ধার করিয়া আনিলেন। উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল।

ঠাকুর প্রশান্ত কণ্ঠে বাললেন, "ওগুলো রেখে আয়। শেষ খোঁয়াড়ীর কাজে লাগবে।"

উদ্দাম গিরিশবাবুকে রামকৃষ্ণ কিভাবে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। ভক্তের জন্য এই উদার আশ্রিতবাৎসল্য ও সহনশীলতা দেখিয়া লাটুর চোখে সেদিন অশ্রুধারা নামিয়া আসে।

লাটু প্রথম বয়সে খুব ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়াছিলেন, কুস্তী কসরতও কম করিতেন না। স্বভাবতঃই সে সময়ে তিনি বেশী পরিমাণে আহার করিতে পারিতেন এবং ইহাতে প্রচুর উৎসাহও তাঁহার ছিল।

"ওরে, কখনো ভুলিসনে, তপস্যা করতে গেলে কম খেতে হয়"—ঠাকুরের এই সতর্কবাণী লাটুর মর্ম্মমূলে গিয়া প্রবিষ্ট হয় এবং তাঁহার এই একদিনের কথায় তিনি আহারের কৃচ্ছ্র সাধনে রত হন।

ক্লান্ত হইয়া প্রথম প্রহর রাত্রে একদিন তিনি ঘুমাইতেছিলেন। ঠাকুর তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "সে কিরে, এত ঘুমুলে সাধনভজন করবি কখন ? লাটু গুরুবাক্যের তাৎপর্য্য তখনি বুঝিলেন, নিজেকে করিলেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। এখন হইতে রাত্রির অধিকাংশ সময়ই ধ্যান-জপে কাটাইতেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি এই নিয়ম পালন করিয়া গিয়াছেন।

লাটু অন্তরঙ্গভাবে ঠাকুরের সেবা করিতেন আর দিন রাতের অবসর সময়টা কাটাইতেন সাধনকর্ম্মে। পরে ঠাকুর এই শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তকে শ্রীমা সারদামণির সেবায়ও নিয়োজিত করেন।

মায়ের সম্বন্ধে কথা উঠিলে ভক্তির আবেগে লাটুর কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইত। তিনি বলিতেন, "মা'র মতো বৈরাগ্য হামনে ত দেখি নি! আউর তাঁর দয়ার কি তুলনা আছে? মায়ের কৃপায় আমার জীওন সার্থক হয়েছে। হামি তাঁকে পেয়েছি।'

গুরুভাইরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন, মায়ের পরিপূর্ণ আশীর্ব্বাদ তাঁহার ভক্ত সন্তান লাটুর উপর বর্ষিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ-সর্ব্বস্ব ছিলেন লাটু মহারাজ। গুরু-দর্শন, গুরুপরিচর্য্যা গুরুদত্ত সাধনা তাঁহার জীবনে আবর্ত্তিত হইত পবিত্র অক্ষমালার মতো।

প্রতিদিন ভোরবেলায় শয্যাত্যাগের আগে ঠাকুরের দিব্য আনন-খানি না দেখিয়া তিনি কার্য্যারম্ভ করিতেন না। একদিন ঠাকুর বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, লাটুও তাঁহার প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। দুই হাতে চক্ষু আবরিত করিয়া তিনি শুধু চেঁচাইতেছেন "মোশাই, আপনি কুথায়!"

লাটু যতই চীৎকার করিয়া ডাকেন পরমহংসদেব দূর হইতে ততই ব্যস্ত হইয়া উত্তর দেন, "যাচ্ছি রে যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি।"

যতক্ষণ ঠাকুর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত না হইলেন লাটু তাঁহার চক্ষু হইতে হাতদুটি অপসারিত করিলেন না।

এক ভক্ত সেদিন লাটুকে একজোড়া নূতন চটি দিয়াছিলেন। পরদিনই উহার একপাটি কোথায় হারাইয়া যায়। রামকৃষ্ণ এ সংবাদ শুনিয়া বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই নিজে বাগানে উপস্থিত হইয়া শুরু করিলেন ঐ চটির সন্ধান।

লাটু ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসেন। কাতর স্বরে কহেন,

"ওখানে কি খুঁজছেন, মোশাই? আপুনাকে হামার চটি খুঁজে বেড়াতে হোবে না, আমার যে পাপ হবে।"

ঠাকুর চটিজুতা খুঁজিতেছেন এবং পরিতাপের সুরে বলিতেছেন, "তাই তো রে। নতুন জুতো জোড়া তোর ভোগে এলো না।"

লাটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, "হামার জুতোর জন্য আপুনি কষ্টো কচ্ছেন, হামার আজ দিনটাই খারাপ যাবে।"

ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া উত্তর দিলেন, "ওরে, দিন কি ওতে খারাপ যায়? যেদিন ভগবানের নাম নেওয়া হয় না সেইদিনই খারাপ যায়।"

ঠাকুরের এই অপূর্ব্ব ভক্তবাৎসল্যের রসে সাধক লাটু মহারাজ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। এই সৌভাগ্যের তুলনা কোথায়?

লাটু গুরু-কৃপায় জপসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার অন্তর সত্তায় নিরন্তর নাম-সাধনা চলিত। উত্তরকালে তিনি বলিতেন, "নাম করতে করতে নাম মনের মাঝে আপন বাসা বেঁধে নেয়।… একমাত্র নামের শক্তিতে মনের ধর্ম্ম পাল্টে যায়, মনের সঙ্কল্প-বিকল্প সব বন্ধ হয়ে যায়। মনে যখন ঢেউ থাকে না, তখনই মত 'নিসপিওর' হয়। তখনই ভগবানের শক্তি নামতে থাকে, সৎ বস্তুকে চেনা যায়।"

নিরন্তর নাম-জপের অভ্যাস চালাইয়াই প্রথম জীবনে লাটু মহারাজ কামজয়ের সাধনায় জয়ী হইয়াছিলেন, এই কথা উত্তর-কালে তিনি সাধন প্রয়াসীদের প্রায়ই বলিতেন।

ব্রহ্মচারী সাধক লাটুকে ডাকিয়া রামকৃষ্ণ সেদিন বলিলেন, 'ছাখ্, নামের সঙ্গে নামীর ধ্যান করবি।'

ভাব-ভেদে ইষ্টভেদ হইয়া থাকে। লাটু নিজ ধ্যেয়ের আসনে কাহাকে বসাইবেন? সম্মুখে সদ্‌গুরুর প্রেমঘন বিগ্রহ বর্ত্তমান। প্রধানতঃ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই লাটুর কঠোর তপস্যা এযাবৎ অগ্রসর হইয়াছে। রামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে সেদিন তরুণ সাধকের

সকল সমস্যা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়া যায়। ভাবগ্রাহী ঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন, "দ্যাখ, ধ্যান করতে বসবার আগে ইখান্‌কে (আপনার বক্ষে অঙ্গুলি সঙ্কেতে) একবার ভেবে নিবি। এঁকে ভাবলেই তাঁকে মনে পড়ে যাবে।"

ঠাকুরের সমাধিমগ্ন অবস্থার দিব্য জ্যোতির্ময় রূপটি লাটুর ইষ্টের বেদীতে চিরদিনে জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

লাটু মহারাজ বলিতেন, "গুরু—সচ্চিদানন্দ। সাধনপথে গুরু করা ভাল। তুমি ভগবানকেও গুরু করে নিতে পার—বাকী ভগবানের ভক্তদেরই গুরু করা ভাল। কেন জান? তোমার যখন পিয়াস লাগে—তুমি কি কর? কাছাকাছি যেখানে পানি মিলবে সেখানকেই যাও তো?"

সর্ব্বজ্ঞ আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের চালনা করিতেন নিজ নিজ প্রবণতা ও প্রস্তুতি অনুযায়ী। লাটুর ভক্তি ও ভাবময়তা গোড়ার দিকে গুরু সেবা ও নাম-জপ ধরিয়াই অগ্রসর হয়। ঠাকুর তাঁহাকে সংকীর্ত্তনের রসেও রসায়িত করিয়া নিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কীর্ত্তন-অনুষ্ঠানের সময় ঠাকুর মাঝে মাঝে লাটু ও অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করিতেন। এই শক্তি সঞ্চারের কালে লাটুর ভাব-তরঙ্গ উদ্বেলন হইয়া উঠিত। তাঁহার অশ্রুপাত, সর্ব্বাঙ্গের কম্পন, উদ্দণ্ড নৃত্য ও হুঙ্কার এক অপার্থিব ভাব-ঘন পরিবেশের সৃষ্টি করিত। লাটুর ভাবময়তাকে ঠাকুর যেমন প্রশংসা করিতেন। তেমনি আবার উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য সতর্কবাণীও উচ্চারণ করিতেন। তরুণ সাধককে বলিতেন, "ভাব যেন মাতা হাতী। ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে, সব তোলপাড় করতে থাকে। কিন্তু ওরে, বেশী নাচুনি-কাঁদুনি ভাল নয়। ওতে সময় সময় ভাব ভঙ্গ হয়ে যায়। ভাবকে গোপন করতে না পারলে তা অন্তর্মুখী হয়ে চায় না।"

গুরুর এই নির্দ্দেশের পরে ভাবাবেশের পরবর্ত্তী স্তরে লাটুর মধ্যে ধীরে ধীরে অপূর্ব্ব সংযম ও প্রশান্তি আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণের নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, "আমি সারেও আছি, মাতেও আছি।" নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও রূপ-ব্রহ্ম তাঁহার নিকট একাকার। সাধন পদ্ধতির দিক দিয়াও ঠাকুর সর্ব্ব ভাবধারার সমন্বয়কে উৎসাহিত করিতেন। লাটু প্রভৃতি ভক্তদের তিনি তাহাদের নিজ নিজ মানসিক গঠনভঙ্গী ও প্রস্তুতি অনুযায়ী চালিত করিতেন। আবার বিভিন্ন সাধনধারার সমন্বয় দেখানোর জন্য, এই সমন্বয়ের রসাস্বাদন করাইবার জন্য, বলিতেন, "ওরে তোবা একঘেঁয়ে হোস্‌নি। একঘেঁয়ে ইখানকার ভাব নয়। ইখানে ঝোলেও খাবো, ঝালেও খাবো, অম্বলেও খাবো—এই ভাব।"

লাটু মহারাজ ঠাকুরের সাধন সমন্বয়ের মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন, তাই ভাব ও জ্ঞান তাঁহার জীবনে সমভাবে স্ফুরিত হইয়া উঠে। গুরু-কৃপা এবং তাঁহার নিজস্ব সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও সাধনভজন লাটু মহারাজের সম্মুখে ধীরে ধীরে পরমবোধের ইন্দ্রিয়াতীত দ্বার খুলিয়া দেয়।

এই মহাসাধকের তপস্যার বিষয়ে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, "কি ঠাকুরের সঙ্গে, কি তাঁহার দেহত্যাগের পর, তিনি আজীবন প্রায় সারা রাত্রি জাগিয়া ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন এবং দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন।...এইরূপে সারা রাত্রি ধ্যান-ধারণায় রত থাকিলেও তিনি নিয়মিতভাবেই ঠাকুরের সেবা করিয়া যাইতেন।"[১]

সারদানন্দজী একান্তচারী লাটু মহারাজের সাধন সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ কাহিনী ভক্তদের বলিতেন। ঠাকুরের তখন দেহান্ত ঘটিয়াছে। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সবাই নিজ নিজ সাধনায় রত। এই সময়ে গুরু-ভ্রাতাদের মধ্যে লাটুকে কেন্দ্র করিয়া একদিন কৌতুককর ঘটনা সংঘটিত হয়। লাটু দিবাভাগে নিদ্রা যান এবং রাত্রেও কাহারো সঙ্গে বসিয়া তেমন ধ্যান-জপ কবিতে তাঁহাকে দেখা যায় না। গুরু-ভ্রাতা শরৎ মহারাজ প্রায়ই গভীর রাত্রে শায়িত থাকা কালে ঠক্‌ঠক্ শব্দ শুনিতে পান। প্রথমটায় সকলে মনে করেন যে

১ সারদানন্দ : লীলাপ্রসঙ্গ

ঘরে ইঁদুরের উপদ্রব বাড়িয়াছে। শেষটায় কিন্তু লাটুর উপরই সন্দেহ ঘনীভূত হয়।

শরৎ মহারাজ ও অপর সবাই সেদিন মধ্য-রাত্রিতে নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া আছেন। সবাইকে ঘুমন্ত মনে করিয়া লাটু মহারাজ চুপি চুপি নাম-জপের মালা হাতে নিয়া সাধনে বসিলেন।

জপের মালা আবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুভাইরা একযোগে চড়াও হন, "তবে রে শালা" বলিয়া লাটু মহারাজকে জড়াইয়া ধরেন। বমাল সহ চোর ধরা পড়াতে মধ্যরাত্রে মঠে এক হৈচৈ পড়িয়া গেল।[১]

এমনই ছিল লাটু মহারাজের তপস্যার সুমধুর গোপনতা ও অন্তর্লীন ভঙ্গিমা।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকৃষ্ণ জপ-ধ্যান নিরত লাটুর সমগ্র সত্তায় একটি প্রচণ্ড নাড়া দিয়া দিলেন। ব্যাপারটি রাখাল মহারাজ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলিয়াছেন, "একদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে ঠাকুরের আদেশে লাটু আমাদের সকলকে ডেকে তুলল। ঠাকুর আমাদের বললেন, 'তোরা আজ খুব জপ করতে থাক্।'

"তারপর তিনি 'জাগো মা কুল-কুণ্ডলিনী' গানখানি বেড়াতে বেড়াতে গাইতে লাগলেন। হঠাৎ কি জানি দেহটা কেঁপে উঠলো আর লেটো উহুঁ উহুঁ করে চাৎকার করে উঠলো। ঠাকুর তার কাঁধ দুটো চেপে ধরে বললেন, 'ঠিক বসে থাকবি। আসন থেকে উঠতে পাবি নি।'

"কিছুক্ষণ পরে লেটো বেহুঁশ হয়ে পড়লো। ঠাকুর তখনো সেই গান গেয়ে তাঁর শক্তি সঞ্চারিত করে দিচ্ছিলেন।"

১ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়: লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা।
মহেন্দ্রনাথ দত্ত: তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান।

লাটু মহারাজ তখন কৃচ্ছ্র ও তপশ্চর্য্যায় রত। নিজের অভীষ্ট সাধনে দিনের পর দিন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। একদিন তিনি শিব মন্দিরে ধ্যানমগ্ন—অচৈতন্য-প্রায় হইয়া আছেন। কৃপালু রামকৃষ্ণ ধ্যানী শিষ্যের অবস্থাটি সম্যক্ অনুধাবন করিলেন। একটি হাতপাখা ও এক গ্লাস জল নিয়া ঠাকুর তখনি লাটুর নিকট গিয়া উপস্থিত। শিষ্যের ঘর্ম্মাক্ত কম্পমান দেহে ব্যজন করিতে করিতে কহিলেন, "ওরে বেলা যে গড়িয়ে এল, সন্ধ্যেটন্ধ্যে সাজাবি কখন?"

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে লাটুর লজ্জার সীমা রহিল না। আপত্তি জানাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আপুনি একি করছেন? এতে যে হামার অকল্যাণ হোবে! কুথায় আপুনাকে হামি সেবা করবে, না— আপুনি হামার জন্য কষ্ট করছেন।"

স্মিতহাস্যে ভক্ত-বৎসল ঠাকুর উত্তর কহিলেন, "ওরে তোর কে সেবা করছে? তোর ভেতরে যে উনি (শিবলিঙ্গকে দেখাইয়া) এসেছিলেন। তাঁর সেবা করবো না, সেকি কথারে! এত গরমে ওঁর যে কষ্ট হচ্ছিল।"

কি ঘটিয়াছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে লাটু বলিলেন, "হামি তো কুছু জানে না, বাকী তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সামনে একটা জ্যোতি দেখতে পেলুম, সব ঘরখানা ভরে গেল, আর কুছু হামার মনে নেই।"

একদিন কি এক কারণে লাটু তাঁহার ধ্যানে মনটি নিবিষ্ট করিতে পারিতেছেন না। রামকৃষ্ণকে বিপদের কথা নিবেদন করিলেন। ঠাকুরের নানা প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইলেন, "আজ মন্দিরে যাবার আগে মনে হয়েছিল— মা যদি বর দিতে আসেন তবে হামি কি চাইবো?"

গুরু তখনি ব্যগ্র হইয়া শিষ্যকে সতর্ক করিয়া দিলেন, "ঐ হয়েছে রে! কামনা আশ্রয় করলে কখনো কি জপ-ধ্যানে মন বসে? ওসব করবি নি। ধ্যানে বসে বর চাইতে নেই।"

দেব-দেবীর দর্শন লাভ হইলে সাধক সাধারণতঃ বর প্রার্থনা

করিয়া নেয়, এই কথাই সরল লাটুর জানা আছে। এবার তাঁহার সর্ব্ব সমস্যার সমাধান করিয়া ঠাকুর নির্দ্দেশ দিলেন, "নারে না, বর চাইতে নেই। একান্তই মা যদি তোকে বর নিতে বলেন, তবে বলবি,—মা আমি ধন-জন দেহসুখ চাইনে, আমার কেবল শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

এমনই করিয়া সাধনের প্রতি স্তরে, প্রতি গ্রন্থিতে কৃপাসিন্ধু ঠাকুর আশ্রিতদের সযতনে রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার অধ্যাত্ম-সন্তানদের সাধনজীবনের কোন রন্ধ্রপথেই তাঁহার সদাজাগ্রত দৃষ্টিকে এড়াইয়া অবিদ্যার প্রবেশ সম্ভব ছিল না।

লাটুর পরবর্ত্তী সাধনজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্বামী অদ্বৈতানন্দ বর্ণনা করিয়াছেন একদিন ধ্যানতন্ময় অবস্থায় লাটু অচৈতন্য হইয়া পড়েন। মুখ থুবড়িয়া মাটিতে পড়িয়া তিনি গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে থাকেন।

এ সংবাদ পাওয়া মাত্র ঠাকুর সেখানে গিয়া উপস্থিত। তিনি তাঁহাকে চিত করিয়া শোয়াইয়া দিলেন আর তাঁহার বুকে নিজের হাঁটু দিয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে লাটুর সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই বুঝি আজ মা কালীকে দেখেছিস্? চুপ কর শালা! চুপ কর্, শুনতে পেলে এখনই একটা হৈচৈ পড়ে যাবে!" স্বভাব-শান্ত সাধক লাটু চুপ করিয়া গেলেন। ইহার পর হইতে ধ্যানকালে গুরুভাইরা তাঁহার রূপান্তরের নানা বিশিষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাইতেন।

গুরু কৃপায় ও নিজের কঠোর-তপস্যার ফলে লাটুর নানা দিব্য দর্শন হইতে থাকে। ধ্যানে তিনি রামচন্দ্র, মহাবীরজী, বিশ্বনাথ, মা-কালী, কিষণজী ও যোগমায়ার দর্শন তিনি প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন ঐশী প্রকাশের, বিভিন্ন লীলামূর্ত্তির আনন্দধারায় স্নাত হইয়া সাধক লাটু তাঁহার চরমসিদ্ধির দিকে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকেন।

একদিন নিশীথ রাত্রে রামকৃষ্ণ লাটুকে বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসনে ধ্যান করিতে পাঠাইলেন। দৃঢ় ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, নির্ভীক

ও শক্তিধর সাধক ছাড়া ঠাকুর পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সহসা কাহাকেও বসিতে দিতেন না।

সিদ্ধ আসনে গিয়া লাটু মহারাজ উপবেশন করেন বটে, কিন্তু ঠাকুরের সিদ্ধি-পূত এই পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিবার পূর্ব্বক্ষণে এই বীর সাধকের অন্তর কাঁপিয়া উঠে।

ধ্যানে দর্শনাদির পরে লাটু এক বিপদে পতিত হন। কোনমতেই আসন ছাড়িয়া তিনি উঠিতে পারিতেছেন না। পঞ্চমুণ্ডী আসনের চারিদিকে লাটু বীভৎস ভীতিপ্রদ দৃশ্যাদি দেখিতেছেন, একেবারে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অজানা কিছুই নাই। তিনি নিকটেই ছিলেন, এবার সঙ্কটমোচনের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন। উচ্চকণ্ঠে অভয় জানাইয়া বলিলেন, "কিরে ভয় পেয়েছিস নাকি? এত ভয় কিসের? আয় আয়, আমার সঙ্গে চলে আয়!"

আর একদিনের কথা। বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর সিদ্ধাসনে লাটু মধ্যরাত্রে ধ্যান শুরু করিয়াছেন। একনিষ্ঠ সাধকের নিশ্চল নিস্পন্দ দেহে বাহ্য চৈতন্যের চিহ্নমাত্র নাই। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তখনো লাটু ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় বেলতলায় বসিয়া আছেন। প্রিয় শিষ্যকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ঘরে দেখিতে না পাইয়া ঠাকুর বেলতলার দিকে অগ্রসর হইলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন, লাটু ধ্যানাবিষ্ট, বাহ্যজ্ঞান নাই। বেলতলার অদূরে দুইটি কুকুর স্থির নিষ্পলক নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঠাকুর কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, ক্রমে সাধক চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। সম্মুখে করুণাঘন সদ্‌গুরুর দিব্যমূর্ত্তি। আনন্দাপ্লুত লাটু ঠাকুরের পাদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন।

ঘরে ফিরিবার পথে রামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওরে তোর মহা-সৌভাগ্য!" মা তোর রক্ষার জন্য দুটো ভৈরবকে পাঠিয়েছিলেন। কুকুরের বেশ ধরে দুটো ভৈরব তোকে এতক্ষণ পাহারা দিচ্ছিল, দেখলুম।"

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের চিহ্নিত ভক্তেরা তখন একে একে আসিয়া জুটিয়াছেন। প্রায় দিনরাত্র ঠাকুরের নির্দ্দেশে শিষ্যদের নাম-জপ, কীর্ত্তন ও ধ্যান চলিতেছে। গৃহী-শিষ্যের দলও ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসিয়া ধীরে ধীরে হইতেছেন রূপান্তরিত। এসময়ে একদিন ঠাকুর সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "লেটো চড়েই রয়েছে। ক্রমে লীন হবার যো।"

যুবক নরেন্দ্রনাথ (উত্তরকালের বিবেকানন্দ) তখন মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন। দ্বিধা ও সংশয়ে তখনো তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া আছে। তাই বুঝি সেদিন ধ্যানাবিষ্ট লাটুর ধ্যান ভাঙ্গানোর জন্য রামকৃষ্ণ নরেনকেই তাঁহার কাছে পাঠাইলেন। নিকটেই রহিয়াছে একটি বড় গাছ। লাঠি দিয়া এই গাছের গুঁড়িতে নরেন বার বার আঘাত করিতে লাগিলেন। এই শব্দে লাটুর ধ্যান টুটিয়া যাক, ইহাই তিনি চান। কিন্তু লাটুর কোন হুঁশই নাই।

এমন সময় ঠাকুর ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "থাক, ওকে আর বিরক্ত করিস নি।"

নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "ওর হুঁশ থাকলে তো বিরক্ত করবো। একেবারেই যে বেহুঁশ।" শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "এরকম বেহুঁশ না হতে পারলে কি ধ্যান জমেরে!"

অন্যান্য দিন পরমহংসদেব লাটুকে দিয়াই নরেনের খোঁজখবর করাইতেন। আজ ধ্যান-বিভোর লাটুর অবস্থাটি দেখানোর জন্যই বুঝি তাঁহার সন্নিধানে নরেনকে পাঠাইলেন।

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালেই স্পর্শমণি ঠাকুরের স্পর্শ-প্রভাবে লাটু এক উচ্চতর অধ্যাত্ম-স্তরে আরূঢ় হন। তাঁহার ধ্যানতন্ময়তা এমন বাড়িয়া যায় যে এসময়ে প্রায়ই, ঠাকুর নিজের হাঁটু দিয়া শিষ্যের বক্ষ ঘর্ষণ করিতেন, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতেন।

সদগুরু রামকৃষ্ণের নিকট হইতে লাটু যে সাধনা ও সিদ্ধি লাভ

করিয়াছিলেন, সারা জীবন তাহা ঠাকুরের নাম করিয়া, ঠাকুরের উপদেশ হিসাবে, মুমুক্ষুদের মধ্যে তিনি বিলাইয়া গিয়াছেন।

সাকার ও নিরাকার ধ্যান সম্বন্ধে লাটু মহারাজ বলিতেন, "ভক্ত নামরূপ নিয়ে ধ্যেন করে, আর জ্ঞানী জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ নিয়ে ধ্যেন করে। বাকী যা নিয়েই ধ্যেন করনা কেনো, শেষে দুজনাই এক জায়গায় পৌঁছায়। জানবে ধ্যেন জম্‌লে নামও ছুটে যায়। তখন একটা রেশ থাকে। বাকী, সেটা যে কি তা মুখে বলতে পারা যায় না। ধ্যেন জমলেই অখণ্ডের বোধ এসে যায়। এ বেপার মুখে বলা যায় না। সেই বোধে দেহজ্ঞান থাকে না, মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প কুছু থাকে না, বুদ্ধিভি চলে যায়, তখন শুধু বোধ থাকে।"

আপন অধ্যাত্ম জীবনের অভিজ্ঞতার কথা লাটু মহারাজ তাঁহার প্রজ্ঞা-প্রোজ্জ্বল সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন,—"জানো, সাধনকালে জ্যোতি-ট্যোতি দেখা কুছু নয়—ওসব দেখলে শুধু বিশ্বাস দৃঢ় হয়। যখন দেহবোধ চলে যায় আর অন্তর শুদ্ধ, পবিত্র হয়, তখনই বুঝতে পারা যায় যে, জ্যোতির পারে এক মুল্লুক আছে—যে মুল্লুকের খবর বুদ্ধি-বিচার দিয়ে মেলে না। একদিন তো কাশীপুরে ওনার (শ্রীরামকৃষ্ণের) মাথায় হাত বুলুচ্ছিলুম; তখন তো হামার সামনে সেই মুল্লুক খুলে গেলো। সেই মুল্লুকে যা দেখেছি তা চোখ ধরতে পারে নি, যা আস্বাদন করেছি তা জিব নিতে পারে নি। কিন্তু সব কুছু হামি অনুভব করেছি।"

কাশীপুরের বাগানে রামকৃষ্ণের সেবায় ভক্তগণ প্রাণ-মন ঢালিয়া দেন। নিরন্তর গুরু পরিচর্য্যার মধ্যেই তাঁহারা অধ্যাত্ম সাধনার মূল ধারাটির সন্ধান প্রাপ্ত হন। এ সময়ে সবাই ঠাকুরকে নিয়াই দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁহাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার অবসর বড় একটা মিলিত না।

কেউ কেউ এ সময়ে মন্তব্য করেন, "তাই তো ভজনের সুযোগ আর তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। যারা সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এসে তপস্যা শুরু করেছে, তাদের দশা কি হবে?"

লাটু মহারাজ উত্তেজিত হইয়া বলেন, "ছাখো, আস্‌লি উপাসনা হচ্ছে তাঁর সেবায়। তিনি (ঠাকুর) হামাদের বলতেন, 'উপাসনা করবার সময় ভাবতে হয় যেন তিনি (ইষ্টদেব) সামনে রয়েছেন আর তুমি তাঁর পা ধুয়ে দিচ্ছো, তাঁকে নাওয়াচ্ছো, তাঁকে খাওয়াচ্ছো, তাঁকে সাজাচ্ছো গোছাচ্ছো, হৃদয়ে বসাচ্ছো, যেন ফুল দিয়ে পূজা করছো'—হামাদের তো সেখানে ঠাকুরের সেবায় তাই হোত।"

গুরু-অন্ত প্রাণ-সাধকের নয়নযুগল এই সেবাধর্ম্মের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে দিব্য জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত।

একদিন রামকৃষ্ণ বাগানে বেড়াইতে নামিয়াছেন। পরমভক্ত গিরিশের স্তুতিতে তাঁহার মধ্যে দেখা গেল দিব্য ভাবাবেশ।

"তোমাদের চৈতন্য হোক্" বলিয়া কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন সম্মুখস্থ ভক্তদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। পুণ্যময় দেহের স্পর্শে সবাই ধন্য হইল। লাটু কিন্তু সেই সময়ে সোরগোল শুনিয়া এবং ভক্তদের আহ্বান পাইয়াও ছুটিয়া আসেন নাই। কল্পতরুরূপী ঠাকুরের কাছে সেদিন তিনি কেন আশিস্‌-প্রার্থী হন নাই, এ প্রশ্নের উত্তরে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "তিনি তো আশীর্ব্বাদ দিয়ে হামাদের ভরপুর করে দিয়েছেন। আবার হামি কি চাইবো তাঁর কাছে?"

অহৈতুক গুরুকৃপার রসধারা যাঁহার সারা সত্তাকে অভিসিঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, প্রাণ-সর্ব্বস্ব সেই ঠাকুরের নিকট লাটুর নূতন করিয়া আর কি-ই বা চাহিবার ছিল?

লাটুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণ এবং ঘনিষ্ঠ মহলের কাছে 'অদ্ভুত' রূপেই চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাই তাঁহার সন্ন্যাস নাম হইয়াছিল অদ্ভুতানন্দ স্বামী। বহুর মধ্যে লাটু মহারাজ ছিলেন একক, সাধারণের মধ্যে ছিলেন অসাধারণ— এবং রহস্যময়।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকৃষ্ণ শুদ্ধসত্ত্ব কিশোর লাটুকে সারদা-

মণির সম্মুখে উপস্থিত করেন। সারদামণির নানা গৃহকর্ম্মে সহায়তা করিয়া ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া লাটু তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে চিহ্নিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা-সারদামণির স্নেহরসে যেমন লাটু বর্দ্ধিত হন, তেমনি উভয়ের সঙ্গে এক স্বাভাবিক অপত্য-সম্বন্ধের যোগেও নিজেকে তিনি যুক্ত করিয়া নেন। মমত্ব ও নির্ভরতার দিক দিয়া এ যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন।

বরানগরের মঠে একদিন ভোরবেলায় শশী মহারাজ দেখিতে পান যে ঠাকুরের হালুয়াভোগ রান্নার কড়াইটি অপরিচ্ছন্ন রহিয়াছে। গত রাত্রে লাটু মহারাজ তাহাতে ছোলা সিদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহা পরিষ্কার করিতে ভুল হইয়াছে। ঠাকুরের সেবার ত্রুটি হইলে একান্ত ভক্ত শশী মহারাজের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত। তিনি লাটু মহারাজকে গালি দিতে লাগিলেন।

তিরস্কারের উত্তরে বালকের মতো লাটু মহারাজ ভয় দেখাইয়া বলিলেন, "তোমার বাবা-মা আর হামার বাবা-মা কি আলাদা আছে? হামি মাকে আজই পত্র দিব।"

ঠাকুরের লোকান্তরের পর শ্রীমার সঙ্গে লাটু মহারাজ বৃন্দাবন ধামে তীর্থ ভ্রমণে যান। খামখেয়ালী সাধক-পুত্রকে নিয়া এই সময়ে মার ঝামেলা কম পোহাইতে হইত না। আহারে বসিয়া লাটু সমস্ত খাবার বানরদের বিলাইয়া দিতেন। আবার অসময়ে আসিয়া মা ও তাঁহার সঙ্গিনীদের কাছে নিজের খাবার চাহিতেন, তাঁহাদের বিব্রত করিতেন। যমুনার তীরে কখনো বা সারা দিনমান ঘুরিয়া আসিয়া বালকবৎ লাটু মায়ের নিকট আব্দার করিতেন, "বড় খিদে পেয়েছে মা, জলদি হামায় কিছু খাবার দিন।"

"আমার লাটুর সবই অদ্ভুত", এই মন্তব্য করিয়া শ্রীমা তাঁহার সমস্ত স্নেহের দাবী স্মিতহাস্যে মানিয়া নিতেন।

শ্রীমার উপর লাটু মহারাজের শাসনেরও এক মনোরম বিবরণ আছে। বলরামবাবুর ভবনে মা সেদিন আসিয়াছেন। বহির্ব্বাটিতে

লাটু তখন অবস্থান করিতেছেন। সাগ্রহে তাড়াতাড়ি এই খেয়ালী পুত্রের সঙ্গে তিনি দেখা করিতে আসিলেন।

লাটু বাড়ীর অভ্যন্তরে মেয়ে মহলে ইচ্ছা করিয়াই এতক্ষণ যান নাই। এবার মা নিজেই বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ জুড়িলেন—"কি বাবা লাটু, কেমন আছ?"

লাটু বিপদে পড়িলেন। উষ্মা-জড়িত কণ্ঠে মাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি ভদ্দর ঘরের মেইয়া, সদর বাটিতে তুমি কেন? ভেতরে যাও। হামি তো তোমার গোলাম আছি! হামি সেখানে গিয়ে তোমার সাথে দেখা করছি।'

অদ্ভুতানন্দের অদ্ভুত খেয়াল সারদাদেবীর জানা ছিল। তাই হাসিতে হাসিতে তখনি লাটুর অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি চলিয়া যান। এবার অন্দরমহলে বাড়ীর ভিতরে গিয়া মায়ের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া লাটু যুক্তকরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।[১]

বরানগর মঠে নরেন্দ্রনাথ লাটুকে বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাস নিবার নির্দ্দেশ দেন। এই হোমের পূর্ব্বে পিণ্ডদান করিতে হয়। লাটু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক ভঙ্গীতে পিতৃ-পুরুষকে আহ্বান করিলেন। তারপর সরল অনাড়ম্বর গ্রাম্য ভাষায় কহিতে লাগিলেন, "এ মেরা বাপজী, হিয়া আয়, হিয়া বৈঠ্। ইয়ে পূজা লে, পিণ্ড লে, পানি লে।"

অদ্ভুত চরিত্র, অদ্ভুত ভাবময়তা ও ধ্যানানুরাগের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ লাটুর নামকরণ করিলেন অদ্ভুতানন্দ। সন্ন্যাস গ্রহণের পর লাটু মহারাজের ত্যাগ বৈরাগ্য আরও বাড়িয়া যায়। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপদেশটি অধিকতর নিষ্ঠার সহিত আঁকড়াইয়া ধরেন।

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা

মুক্ত বিহঙ্গের মতো স্বেচ্ছাবিহার করিতেন লাটু মহারাজ, আর গঙ্গার তীরে বসিয়া করিতেন জপ-ধ্যান। বেশভূষা বা আহার্য্যের দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নাই—কঠোরতপা তপস্বীর একাগ্র সাধনসত্তার সম্মুখে বিরাজিত শুধু তাঁহার ইষ্টদেব।

বলরাম মন্দিরে বা উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাপাখানায় আপন খেয়াল মতো কখনো কখনো কিছুদিন তিনি বাস করিতেন, আবার কোথায় হইতেন অদৃশ্য।

অর্থের প্রতি তাঁহার তীব্র বিতৃষ্ণা যেমন তাঁহার ছিল, চিরজীবন নারী সান্নিধ্য এড়াইয়া চলার ঝোঁকও ছিল তেমনই প্রবল।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে লাটু মহারাজ সেবার কাশ্মীরে বেড়াইতে গিয়াছেন। হাউস বোটে সকলে উঠিতে যাইবেন, লাটু অকস্মাৎ লাফাইয়া মাটিতে পড়িলেন। বোটের মাঝি সপরিবারে এককোণে বাস করে। নৌকায় নারীরা রহিয়াছে দেখিয়া লাটু বাঁকিয়া বসিলেন, এই হাউস বোটে তিনি কিছুতেই উঠিবেন না। স্বামীজী তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তবে নৌকায় তোলেন।

একান্তচারী, আত্মগোপন প্রয়াসী লাটু মহারাজ কোন অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করেন নাই। উচিত-বক্তারূপেই সর্ব্বত্র তিনি পরিচিত ছিলেন।

একবার এক প্রবীণ গৃহী ভক্ত বরানগর মঠে আসেন এবং মাতব্বরী চালে তরুণ সন্ন্যাসীদিগকে আঘাত দিয়া কথা বলিতে থাকেন। বয়সে বড় বলিয়া সকলে ইঁহার অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইতেছেন। লাটু মহারাজের কাছে আসিয়া ভদ্রলোকটি তাঁহার বৈরাগ্য-প্রবণতাকেও উপহাস করিতে ছাড়িলেন না।

এক মুহূর্ত্তে লাটু জ্বলিয়া উঠিলেন। সরোষে কহিলেন, "আঁশ-চুপড়ীর গন্ধ না হলে মেছোনীদের ঘুম হয় না, শুনেছি। আপুনারও যে সেই অবস্থা! আপুনি ত্যাগের পথে না এসে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা কি বুঝবেন? জনক রাজার কথা বলছেন, বাকী, জনক রাজা কি সবাই হোতে পারে?"

অভিভাবকত্ব-প্রয়াসী প্রবীণ ব্যক্তিটি লাটুর তিরস্কারে একেবারে চুপ্ সাইয়া গেলেন।

বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে নিয়ম করেন যে ভোর চারটায় ঘণ্টা বাজানো হইবে এবং সবাই তখন ধ্যান-জপ শুরু করিবে। এ আদেশ জারীর পরদিনই দেখা গেল, লাটু মহারাজ তাঁহার কাপড়-গামছা নিয়া মঠ ত্যাগ করিতেছেন।

সবাই তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে লাটু বলেন, "হামি তোমার ওসব কানুন মানতে পারবো না। ঘড়ি ধরে হামার মন ধ্যোনে বসে যাবে না।"

স্বামীজী তাঁহাকে বুঝান, "নূতন সাধকদের জন্যই এই বিধি, লাটু, তোর জন্য এসব নয়।" অনেকক্ষণ পরে লাটু নিরস্ত হন।

আপ্তকাম, রামকৃষ্ণময়, এই ত্যাগী সন্ন্যাসীর নিজের মানসিক ও আধ্যাত্মিক গঠনের সহিত মঠ স্থাপনা ও কর্ম্মানুষ্ঠানের সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে নাই। তাই মঠের গুরুভাইদের সহিত আত্মিক যোগ রাখিয়া লাটু নিভৃত ও নিজস্ব আবেষ্টনীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকিতেই ভালবাসিতেন।

অথচ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল চিরজাগ্রত। নরেন্দ্র যে ঠাকুরের চিহ্নিত শিষ্য ও প্রতিনিধি একথা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন। তাই উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দের সংগঠন হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখিলেও লাটু মহারাজ গুরুভাইদের প্রতি ও মঠের প্রতি গভীর মমত্ব চিরদিন পোষণ করিয়া গিয়াছেন।

লাটু মহারাজ স্বেচ্ছামত বিচরণ করেন, যত্রতত্র ভিক্ষা গ্রহণ করেন, ইহা অনেকের মনঃপূত নয়। এদিকে মঠের অধ্যক্ষ রাখাল মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি গোপনে কয়েকজন

ভক্তকে নিয়োজিত করেন, তাঁহারা যেন লাটু মহারাজকে বুঝাইয়া ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত করেন।

লাটু মহারাজ বুঝিলেন, তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তিতে মঠের সুনাম নষ্ট হইবে বলিয়া রাখাল মহারাজ আতঙ্কিত হইয়াছেন। আগত ভক্তদের তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ঠিকই তো, রাজাকে অনেক দিক ভেবে চলতে হয়। মঠের সুনাম তাকেই যে রক্ষে করতে হবে। তাই সে হামাকে এমন অনুরোধ জানিয়েছে তোমাদের থ্রু দিয়ে।"

ইহার পর তিনি বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসীর অবশ্য করণীয় মাধুকরী বা ভিক্ষা-বৃত্তি ত্যাগ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁহার ভাবাবেগ ও উৎসাহ বশে বলিতেছিলেন "ওরে দেখছিস্ কি? যা করে গেলুম, পরে তার ফল বুঝতে পারবি। এর পরে দেখবি—লোকের পর লোক আসছে। তখন বুঝবি এই বিবেকানন্দটা কি করে গেছে।"

তেজস্বী, উচিত-বক্তা, লাটু মহারাজ চট্ করিয়া উত্তর দিলেন, "ভাই, তুমি আর কি নোতুন করেছো? শঙ্কর বুদ্ধ এঁরা যা করে গেছেন, তুমি তো তার উপর শুধু দাগা বুলিয়েছ। এর বেশী কুছু করেছ কি?"

উদারচেতা স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন, কথাটি অপ্রিয় হইলেও সত্য। উত্তরে কহিলেন, "ঠিক বলেছিস লেটো! ঠিক! শুধু দাগাই আমি বুলিয়েছি।"

একবার লাটু মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হন। কয়েকটি পণ্ডিত লাটু মহারাজকে প্রশ্ন করিতে গেলে, স্বামীজী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠেন, আপনারা "আগে আমায় প্রশ্ন করুন। আমি যদি সদুত্তর না দিতে পারি তবেই আমার এই প্রবীণ গুরুভ্রাতাকে বিরক্ত করবেন।"

বলা বাহুল্য, স্বামীজীকে ডিঙ্গাইয়া লাটুর নিকট কাহাকেও পৌছিতে হইল না। দেশে ফিরিয়া আসিয়া লাটু মহারাজ সবাইকে

বলিলেন, "হাঁ, গুরুভাই হচ্ছে লোরেন, আমি যে শালা এক মুখ্খু, তা কাউকে জানতেই দিলে না।"

গুরুকৃপায় কাশীপুরে লাটু মহারাজের প্রথম সমাধির আস্বাদন লাভ হয়। ইহার পর তিনি মহাধাম জগন্নাথ পুরীতে গমন করেন। লাটু বলিতেন, "হামনে দারু-ব্রহ্মের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম—যে রূপ দেখে মহাপ্রভু চোখের জলে ভেসে যেতেন, হামাকে আপুনি তাই দেখান। এমনি শরণ নেবার পর তিনি হামার প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের আট বৎসর পর লাটু মহারাজের আবার একবার সমাধি হয়। এ কথাটি তিনি তাঁহার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, "হামার উপর তাঁর অশেষ কৃপা, তাই সাত-আট বছর মেহনতি করিয়ে তিনি ফিন্ সেই ওবস্থায় হামাকে তুলে দিলেন। একদিন গঙ্গাতীরে বসে ধ্যেন করছি, আকাশ-বাতাস ছেয়ে একটি জ্যোতি এলো, তার মাঝে অসংখ্য জ্যোতি, নিজেকে হারিয়ে ফেল্লুম। বাকী, সে মুল্লুক থেকে নেমে এসে যে কি আনন্দে রইলুম—তখন সব কুছু আনন্দময় হয়ে গিয়েছে।"

সারা অস্তিত্বে বিস্তারিত পরমানন্দের এই ধারাটি লাটু মহারাজ শুধু নিজের জীবনেই ধরিয়া রাখেন নাই, মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এই অমৃত তিনি মুক্তিকামী সাধকদের মধ্যে বিলাইয়া গিয়াছেন।

জীবনের শেষ আটটি বৎসর লাটু মহারাজ কাশীধামে যাপন করেন। ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ এই রামকৃষ্ণ সন্তান অল্পকাল মধ্যে কাশীর সাধকসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠেন। নিভৃতে আপন সাধনভজন নিয়া রত থাকিলেও বহু গৃহী ও সন্ন্যাসী সাধক

তাঁহার উপদেশ লাভে ধন্য হন, নিজেদের আত্মিক জীবন গঠনে অনেকে সমর্থ হন।

দেহান্তের এক বৎসর আগে লাটু মহারাজের পায়ে একটি গ্যাংরিন্ হয় এবং বার বার ইহাতে অস্ত্রোপচার করিতে হয়। প্রতি অস্ত্রোপচারের সময়ই সার্জ্জনেরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেন, মহাপুরুষের চোখে মুখে দুঃসহ যন্ত্রণার কোন চিহ্নই নাই। নির্ব্বিকার চিত্তে ইষ্টধ্যানে তিনি রহিয়াছেন সদা বিভোর, আর দেহবোধ হইয়াছে তিরোহিত।[১]

কাশী হাড়ারবাগের বাড়ীতে শরৎ মহারাজ রোগ শয্যাশায়ী লাটু মহারাজকে দেখিতে আসিয়াছেন।[২] সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সাধু, কেমন আছো ?"

"শরীর ধারণ বিড়ম্বনম্"—সহাস্যে উত্তর দেন লাটু মহারাজ।

লাটু মহারাজকে প্রণাম করিয়া শরৎ মহারাজ বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। এমন সময়ে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর এক সন্ন্যাসী প্রশ্ন করেন, "আপনি লাটু মহারাজকে প্রণাম করেন কেন ?"

"সে কি ! সাধু যে আমাদের সবাইর আগে ঠাকুরের চরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমাদের সন্ন্যাসী গুরুভাইদের মধ্যে লাটু মহারাজই জ্যেষ্ঠ। তাঁকে প্রণাম করবো না, বলিস্ কিরে !"

সেদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দের একজন ভক্ত মৃত্যু পথযাত্রী লাটু মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, জগৎ কি এখন আর আপনাদের কাছে ভার-বোঝা বলে মনে হয় ?"

লাটু স্মিতহাস্যে কহিলেন, "ত্যাখো, গঙ্গার জলে ডুব দিলে, মাথার ওপর হাজার মণ জল থাকলেও ভারটা বুঝা যায় না। তেমনি ভগবানের সংসারে ভগবানকে ধরে ডুব দিলে, সংসারের বোঝা আর

১ দ্য ডিসাইপল্‌স্ অব রামকৃষ্ণ—অদ্ভুতানন্দ
২ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা।

বোঝা বলে মনে হয় না, সংসার তখন আনন্দের খেলা বলে মনে হয়। তুলসীদাসের একটা কথা মনে রেখো—'যো যাকো শরণ লিয়ে, সে রাখে তাকো লাজ। উলট্ জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ।' আরো একটি কথা জেনে রাখ্‌বে—'তোম জ্যায়সা রাম পর, তোমসে ত্যয়সা রাম। ডাহিনে যাও তো ডাহিনে যায়, বামে যাও তো বাম।"

১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল লাটু মহারাজের বিদায়ের লগ্নটি আসিয়া গেল। পরম সন্তোষের সহিত প্রভু বিশ্বনাথের চরণামৃত পান করিয়া চিরতরে তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেন। রামকৃষ্ণময় মহাসাধকের জীবনধারাটি এবার মিশিয়া গেল সচ্চিদানন্দ সাগরে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

রামকৃষ্ণের মানসপুত্র ও ঘনিষ্ঠতম লীলাপার্ষদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জীবন যেন রামকৃষ্ণেরই এক ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমাহার দেখা গিয়াছিল তাঁহার সাধনজীবনে, সেই সঙ্গে অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল গুরুর উদার ধর্ম্ম-সমন্বয়ের বাণী। চরিত্র, আচরণ ও ব্যক্তিত্বের এই ঐক্য ছিল গুরু ও শিষ্যের মধ্যে, ফলে উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল অপূর্ব্ব একাত্মকতাবোধ। প্রাণপ্রিয় ভক্ত ও সহচর রাখাল সদাই থাকিতেন ঠাকুরেরই রসে অভিসিঞ্চিত।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবী ভবতারিণীর কাছে স্বগতোক্তি করিতে শুনা যায়,—"মা. তোমার কাছে কাতর হয়ে বলেছিলাম, আমারই মতো আর একজনকে সঙ্গী করে দাও, তাই বুঝি রাখালকে হেথায় পাঠিয়েছো।"

শুধু সঙ্গী নয়, রাখাল ছিলেন ঠাকুরের লীলাসঙ্গী। ঠাকুরের ঐহিক জীবন ও অধ্যাত্মজীবনের অন্তরঙ্গ জন।

রামকৃষ্ণ ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিকরেরা রাখালকে আদর করিয়া ডাকিতেন—রাখালরাজ। আর উত্তরকালে তিনিই হন রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর রাজা। এই পদগৌরব ও নেতৃত্বের ইঙ্গিত ঠাকুর নিজেই দিয়া গিয়াছিলেন।

ঠাকুরের এই ইঙ্গিতের নিহিতার্থ বুঝিতে বিবেকানন্দের ভুল হয় নাই। তাই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষের পদে এই প্রিয়তম গুরুভাইকেই তিনি বরণ করিয়াছিলেন। এই পদের গুরু-দায়িত্ব রাখালও অবলীলায় পালন করিয়া গিয়াছেন।

মঠের কাজের সংগঠন ও প্রসার, জনসেবা এবং আর্ত্তত্রাণ, সাধনপ্রয়াসী ভক্ত-শিষ্যদের পরিচালনা—এ ধরণের বহুমুখী অনেক

কিছু কর্তব্য কর্ম্মই তাঁহাকে করিতে হইত, আর এগুলি তিনি সম্পন্ন করিতেন অসাধারণ দক্ষতায়, স্মিতমুখে, প্রশান্ত চিত্তে।

মঠ পরিচালনার নিত্যকার সমস্ত কিছু জটিল ও বহুমুখী কাজ শেষ হইলেই রাখাল মহারাজ আপন মনে ডুব দিতেন আত্মিক সাধনার গভীরে। বহিরঙ্গ জীবন হইতে অন্তরঙ্গ লোকে উত্তরণের মধ্য দিয়া 'রাজা' হইতেন 'রাজর্ষি'। তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যকে উদ্দেশ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভাইদের বলিতেন, "রাখাল হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার একটা বিরাট আধার। লক্ষ লক্ষ ভোল্টের শক্তি ওর ভেতর সুপ্ত রয়েছে।"

রাখালের অধ্যাত্ম সাধনা ও সিদ্ধির কেউ প্রশংসা করিলে স্বামীজী উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, বলিতেন, "রাজার স্পিরিচ্যুয়েলিটি আঁকড়ে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে কোলে করতেন, আদর করে খাওয়াতেন, একসঙ্গে শয়ন করতেন, তার সঙ্গে কি কারো তুলনা হয় রে! রাজা আমাদের মঠের প্রাণ—আমাদের রাজা।"

রামকৃষ্ণের আদরের ধন, গুরুভ্রাতাদের মধ্যমণি, ধীর গম্ভীর সার্থক সাধক এই রাখাল মহারাজই উত্তরকালে বহুখ্যাত হইয়া উঠেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে।

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত গণ্ডগ্রাম শিকরা। এই গ্রামেরই এক সম্পন্ন গৃহস্থ আনন্দমোহন ঘোষের পুত্ররূপে উত্তরকালের বহুজন বন্দিত রাখাল মহারাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দ আবির্ভূত হন। মাতা কৈলাসকামিনী ছিলেন পরম ভক্তিমতী মহিলা। পূজা-অর্চনা ধ্যান-ধারণায় সদাই তাঁহার ঝোঁক ছিল। ভাগবত ও কৃষ্ণলীলার গ্রন্থাদি পাঠেও ছিলেন পরম উৎসাহিনী। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী তাঁহার অঙ্ক আলোকিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হয় এক সুদর্শন শিশু। আদর করিয়া জননী ও পরিজনেরা নাম রাখেন রাখাল।

পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাখাল তাঁহার জননীকে হারান,

অতঃপর বিমাতা হেমাঙ্গিনী দেবীই তাঁহাকে পুত্র জ্ঞানে পালন করিতে থাকেন, সযত্নে মানুষ করিয়া তোলেন।

শিশু রাখালের স্বভাব বড় অদ্ভুত। সঙ্গীদের নিয়া প্রায়ই পূজার খেলায় থাকেন মত্ত। কখনো ঘোষেদের পূজা মন্দিরে, কখনো বা বোধন তলায় মা-কালীর বিগ্রহ নিয়া আনন্দ করেন। এই পূজা-খেলার মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে কোন্ এক অজানা ভাব-গম্ভীর তন্ময়তায় শিশুচিত্ত তলাইয়া যায়, কখনো বা সঙ্গীদের সাথে শ্যামা-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে রাখাল বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। আত্মজনেরা শিশুকে নিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।

ছেলে বড় হইতেছে, লেখাপড়ার সুবন্দোবস্ত করা দরকার। অভিভাবকেরা ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিলেন, রাখাল কলিকাতার ভাল স্কুলে পড়াশুনা করিবে। বিমাতা হেমাঙ্গিনী দেবীর পিত্রালয় কলিকাতায়। স্থির হয়, সেখানে থাকিয়াই ছেলে পড়িবে। ইংরেজী স্কুল ট্রেনিং একাডেমিতে তিনি ভর্ত্তি হইলেন।

সঙ্গেই সুন্দর একটি ব্যায়ামাগার। রাখাল সেখানে সোৎসাহে শরীর-চর্চ্চা করেন। স্কুলের সহধ্যায়ী নরেনও সেখানে যাওয়া-আসা করেন। প্রিয়দর্শন তেজস্বী এই যুবক যেন এক আগুনের ফুল্‌কি। অনতিকালমধ্যে রাখাল তাঁহার প্রতি খুব আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং দুজনের মধ্যে গড়িয়া উঠে অপূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতা। যে অমোঘ আকর্ষণে দুজনের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা জন্মে, যেভাবে তাহা পরিণত হয় অচ্ছেদ্য আত্মিক সম্পর্কে, তাহার তাৎপর্য্য কে সে সময়ে বুঝিতে পারিয়াছিল ?

বাংলার শিক্ষিত তরুণ সমাজে তখন কেশবচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রভাব। এই ব্রাহ্ম নেতার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাঁহার আদর্শ চরিত্র ও বাগ্মিতা, প্রভাব বিস্তার করে রাখালের তরুণ জীবনে। কেশবের সংস্কারপন্থী আন্দোলনে রাখাল আকৃষ্ট হন।

উন্নততর নৈতিক জীবন এবং ব্রহ্ম উপাসনার আহ্বানও রাখালের অন্তর্জ্জীবনে গভীরভাবে করে রেখাপাত

অবসর ও সুযোগ পাইলেই ব্রাহ্মসমাজ গৃহে গিয়া বসেন, উপনিষদের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। আর প্রাণে জাগে তীব্র আকুলতা, কি করিয়া পরমার্থ লাভ করা যায়? দিনরাত এই ভাবনাতেই থাকেন বিভোর।

পড়াশুনায় ছেলের অমনোযোগ দিন দিন বাড়িতেছে। পিতা আনন্দমোহন চিন্তিত হইয়া পড়েন। বিবাহ দিলে সংসারের আকর্ষণ বাড়িবে মনে করিয়া তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। কোন্নগরের ডাক্তার ভুবনমোহন মিত্রের কন্যাটি বড় সুলক্ষণা, পছন্দ করিয়া এই মেয়েটিকেই রাখালের বধূরূপে ঘরে আনা হয়। এই বিবাহ সম্বন্ধকে সূত্র করিয়াই রাখালের অধ্যাত্ম-জীবনের সম্মুখে আসে এক পরম সুযোগ। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সান্নিধ্য তিনি প্রাপ্ত হন, ধীরে ধীরে পরিণত হন নূতন মানুষে।

রাখালের শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সাধক রামকৃষ্ণের অনুরাগী, ইঁহাদের মাধ্যমেই হঠাৎ একদিন তিনি ঠাকুরের পাদমূলে আসিয়া পৌঁছেন।

পূত সলিলা গঙ্গা তটে, দক্ষিণেশ্বরে, ভবতারিণী মন্দিরে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। কিছুদিন যাবৎ সিদ্ধ মহা-সাধকের অন্তরে জাগিয়াছে শুদ্ধসত্ত্ব আধার, ভক্তদলের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। জগন্মাতার নিকট তাই মাঝে মাঝে ব্যাকুল প্রার্থনা জানান—"মাগো, বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে জিভ যে আমার জ্বলে গেল।"

মা আশ্বাস দেন, "তোর ভয় নেই। ত্যাগী শুদ্ধাত্মা ভক্তেরা সব এবার আসছে।"

বালকবৎ ঠাকুর আর একদিন আব্দারের সুরে মাকে জানান, "মা, আমার তো সন্তান-টন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছে করে, একটি পরম শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে আমার সঙ্গে সব সময়ে থাকে। তেমনি একটি ছেলে আমায় এনে দে।"

এই প্রার্থনা জগজ্জননী পূর্ণ করিয়াছিলেন, জুটাইয়া দিয়াছিলেন পুত্রপ্রতিম শিষ্য রাখালকে।

বিবাহের পর রাখাল কোন্নগরে তাঁহার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। এই পরিবারটি ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরমভক্ত। রাখালের শ্যালক নিজেই সেদিন ভগ্নীপতিকে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণের জন্য দক্ষিণেশ্বরে নিয়া যান।

উভয়ে দেবপ্রতিম ঠাকুরকে প্রণাম করেন। কুশল প্রশ্নাদির পর ঠাকুর একদৃষ্টে রাখালের দিকে তাকাইয়া থাকেন—একি, এ ছেলেটি তো তাঁহার অচেনা নয়! অল্প কিছুদিন আগের কথা। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রহিয়াছেন। হঠাৎ দেখিলেন, বটতলায় একটি দিব্য লাবণ্যময় বালক দাঁড়াইয়া আছে। ঠাকুরের দিকে সে তাকাইয়া আছে সতৃষ্ণ নয়নে।

হৃদয়কে ডাকিয়া এই অলৌকিক দর্শনের কথা কহিতেই সে বলিয়া উঠিল, "মামা, আমি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝেছি। তোমার ছেলে হবে, তাই এটা তুমি দেখেছো।"

ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "সে কিরে? আমার তো মাতৃযোনি! আমার ছেলে কখনো হবে না।"

ইহার পরই আবার একদিন স্পষ্টতর রূপে দেখিলেন, একটি দিব্য শিশু জগন্মাতার কোলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার দিকে ইঙ্গিত করিয়া মা সানন্দে কহিলেন, "এই গ্যাখ্ তোর ছেলে।"

রামকৃষ্ণ কিন্তু বড় ভয় পাইয়া গেলেন। দেবী এ আবার কি বলিতেছেন! গার্হস্থ্য জীবন তিনি চিরতরে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই জীবনেই কি আবার প্রবেশ করিতে হইবে? পুত্র জন্ম নিবে তাঁহার ঘরে?

অন্তর্য্যামিনী মা সহাস্যে কহিলেন, "না গো তা নয়। এটি হচ্ছে তোর মানসপুত্র।"

একথা শোনার পর তবে রামকৃষ্ণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচেন।

আর একদিন আসে এই মানস সন্তানের বিষয়ে নূতন সঙ্কেত। ঠাকুর মানসনেত্রে দেখিতে পান, গঙ্গাবক্ষে মনোরম একটি পদ্মের উপর গোষ্ঠবিহারী কৃষ্ণ বিরাজিত, আর তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া আছে এক রাখাল-সখা—নূপুর পায়ে মনোহর ভঙ্গীতে সে নৃত্য করিতেছে।

এই দিব্যদর্শন যখন হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই ভক্ত মনোমোহনের সঙ্গে রাখাল গঙ্গা অতিক্রম করেন, উপস্থিত হন দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র ভূমিতে। বিস্ময় ও কৌতুকভরা নয়নে ঠাকুর দেখিলেন—এই তো সেই পূর্ব্বদৃষ্ট গোপ বালক। জগজ্জননীই বুঝি এবার তাহাকে পাঠাইয়াছেন।

ঠাকুর অনেকক্ষণ রাখালের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর হইল—শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ।

মুহূর্ত্তমধ্যে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন। গদ্‌গদ কণ্ঠে, অস্ফুট স্বরে বলিতে থাকেন, "সেই নাম—রাখাল। ব্রজের রাখাল!"

সাক্ষাতের পর বেশ কিছুক্ষণ পরমানন্দে কাটিয়াছে। এবার রাখালকে সস্নেহে সুধাস্নিগ্ধ স্বরে বলেন, "আবার শিগ্‌গীরই এসো একদিন। বুঝলে? শিগ্‌গীর এসো।"

তরুণ রাখালের জীবনে ঠাকুরের এই দর্শন জাগাইয়া তোলে অভূতপূর্ব্ব আলোড়ন। এ আলোড়ন সহজে নিবৃত্ত হইতে চাহে না। ঠাকুরের মোহন মূর্ত্তি, মধুর কণ্ঠ, আর সস্নেহ আহ্বান বার বার মনে পড়িতে থাকে। কেবলই মনে হয়, এ যে কত জন্মের চেনা জন, এ যে আত্মার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়। জন্মান্তরের ধারা বাহিয়া এই আত্মিক যোগ যেন চলিয়া আসিয়াছে।

রাখাল কলিকাতায় ফিরিলেন বটে, কিন্তু মন পড়িয়া রহিল ঠাকুরের কাছে। ব্যাকুল হইয়া আর একদিন একলাই দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া যান। ঘনিষ্ঠ আত্মজনের মতো স্নেহের সহজ ও স্বাভাবিক

দাবী নিয়া ঠাকুর প্রশ্ন করেন—"তোর এখানে আসতে এত দেরী কেন রে? তোর জন্য যে আমি ভেবে ভেবে এ ক'দিন অস্থির।"

রাখাল তো অবাক। শুধু একটি দিনের দেখা, এরই মধ্যে ঠাকুর তাঁহাকে এমন আপনার করিয়া নিয়াছেন। মন তাঁহার অজানা আনন্দে ভরিয়া উঠে। নিঃশব্দে ঠাকুরের পদপ্রান্তে বসিয়া থাকেন—ভাবসমুদ্র অন্তরে কেবলি তরঙ্গায়িত হইতে থাকে।

ইহার পর হইতে রাখাল মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হন। আর ঠাকুরকে দেখিলেই হইয়া যান একটি আনন্দোজ্জ্বল শিশু। ঠাকুর যেমন তাঁহাকে আদর করেন, যুবক রাখালও তেমনি সহজ অধিকারের বলে তাঁহার কোলেই কখন কখন চড়িয়া বসেন। আব্দারের যেন সীমা নাই, ভুলিয়া যান যে তিনি একটি পূর্ণ বয়স্ক যুবক। ঠাকুরের এ বাৎসল্য লীলা চলে অব্যাহত ধারায়—স্নেহে, প্রেমে, মমতায় শিশুপ্রতিম পবিত্রচেতা রাখালকে সদা অভিসিঞ্চিত করেন।

রাখাল ঠাকুরকে কখনো দেখেন স্নেহময় পিতা রূপে, কখনো সখারূপে, কখনো বা দেখেন তাঁহাকে করুণাময়, মুক্তিদাতা সদ্গুরু-রূপে। গোড়া হইতেই এক সহজ সম্পর্কের মধ্য দিয়াই উভয়ের আত্মিক বন্ধনটি দৃঢ় হইতে থাকে।

আত্মীয়স্বজন কিন্তু রাখালকে নিয়া বড় বিপদে পড়েন। সে সদ্য বিবাহিত যুবক। নবজীবনের আনন্দ-আস্বাদ গ্রহণ করিবে, লেখা-পড়ায় কৃতকার্য্য হইবে, উন্নতির জন্য হইবে যত্নবান—ইহাই তো তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আচরণ দেখা যাইতেছে বিপরীত। সুযোগ পাইলেই সে দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া যায়। ভাবপ্রমত্ত ঠাকুরের সান্নিধ্যে থাকিয়া নিজেও হয় ভাববিহ্বল। সংসারের সব বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া উঠিতে থাকে।

পিতা আনন্দমোহন বড় দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। কি করিয়া এ ছেলেকে সংশোধন করা যায়? কয়েকদিন তাঁহাকে ঘরের ভিতর জোর করিয়া আবদ্ধও রাখেন। একদিন পিতা বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত

রহিয়াছেন, এই অবসরে রাখাল পলায়ন করেন, তারপর সোজা ঠাকুরের পদপ্রান্তে গিয়া নিপতিত হন। উত্তেজিত আনন্দমোহনও দক্ষিণেশ্বরে আসেন পুত্রের পিছু পিছু। ঘরে তাহাকে ফিরাইয়া নিতেই হইবে। কিন্তু ঝগড়া বা বিতর্ক করিবেন কাহার সঙ্গে? রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব বড় অদ্ভুত, দর্শন মাত্রেই প্রাণ কাড়িয়া নেয়। আর, কি সুমধুর প্রাণগলানো ব্যবহার! রাখালের প্রশস্তিও পিতার হৃদয়ে করে গভীর রেখাপাত। পুত্রের নবতর জীবনের সহিত সাময়িক সন্ধি স্থাপন করিয়া পিতা ফিরিয়া আসেন, তাহার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিতে থাকেন।

রাখাল দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া সাধনভজন করিতেছেন। সেদিন তাঁহার শাশুড়ী নিজের কন্যাকে নিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত। কন্যা ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুক, আর রাখালও হোক সংসারী, ইহাই তাঁহার অন্তরের কামনা।

নানা মধুর বাক্যে রামকৃষ্ণ তাহাদের প্রবোধ দেন, প্রসন্ন করেন। হঠাৎ মনে তাঁহার প্রশ্ন জাগে—রাখালের বধূটি সুলক্ষণা তো? তাহার সংস্পর্শে আসিয়া মানসপুত্র রাখালের অধ্যাত্ম-জীবনের ক্ষতি হইবে না তো?

ঠাকুর তখনি মেয়েটিকে নিকটে ডাকিয়া নেন, দেহের লক্ষণগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখেন। তারপর প্রসন্ন মনে মন্তব্য করেন, "নাঃ, ভয়ের কোন কারণ নেই—দেবী শক্তি। স্বামীর ধর্ম্মপথের বাধা হবে না কোনদিন।"

সারদামণি তখন নহবৎখানায় বাস করিতেছেন। খানিক বাদে ঠাকুর রাখালের স্ত্রীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন, নির্দ্দেশ দেন, "ওকে বল্‌বে, টাকা দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।"

রাখাল দিবারাত্র রামকৃষ্ণের কাছে অবস্থান করেন সহচররূপে। প্রাণ ভরিয়া করেন তাঁহার সেবা পরিচর্য্যা। এখন হইতে ঠাকুর

যখনি ভাবাবিষ্ট হন, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, রাখালই তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। মমতাভরে বুক দিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখেন।

নিত্যসঙ্গী নবীন সাধক রাখালকে ঠাকুর পরম যত্নে ও সতর্কতায় গড়িয়া তুলিতেছেন। যখনি যেখানে যান, তরুণসুলভ যে চপলতাই রাখাল করুন না কেন, সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুরের চোখ এড়ায় না। চরিত্রের সামান্যতম ত্রুটি দেখিলেই নামিয়া আসে তাঁহার শাসন ও তিরস্কার।

নূতন উৎসাহে রাখাল সাধনভজন করিতেছেন। ঠাকুরের কৃপায় মাঝে মাঝে মিলিতেছে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আলোর ঝলক। সেদিন একটি বিশেষ ধরণের অনুভূতি লাভের জন্য মন তাঁহার বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিল, ঠাকুরকে তাই খুব চাপিয়া ধরিলেন।

সব কিছু অন্তর্য্যামী ঠাকুরের নখদর্পণে। শান্ত স্বরে বুঝাইলেন, "ওরে, এখনো তার সময় হয় নি, আর একটু সবুর কর্।"

রাখাল কিছুতেই ছাড়িবেন না, বার বার একথা নিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বড় বিরক্ত হইলেন। এ কি রকমের একগুঁয়েমি তার। তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

এবার রাখালের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। রুখিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "বেশ তো, আপনার কাছে কিচ্ছু চাইনে। আপনার এখানে থাকারও আমার কোন দরকার নেই। আমি আজই, এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

কিন্তু কি পরম আশ্চর্য্য। রাখাল যতই চেষ্টা করুন না কেন, দক্ষিণেশ্বরের বহির্দ্বারটি তিনি কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না। পদদ্বয় কি জানি কেন অসাড় হইয়া আসিতে থাকে। ধীরে ধীরে তাঁহার ক্রোধ পরিণত হয় বিস্ময়ে।

ভূমিতলে অসহায়ভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় করুণাময় প্রভু নিকটে আসিয়া জানাইলেন স্নেহ-আহ্বান।

ঠাকুরের চোখে মুখে কৌতুকোজ্জ্বল হাসি। স্নিগ্ধ স্বরে মন্তব্য

করিলেন, "কিরে, গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারলি? তবেই এবার বুঝে নে।"

রাখাল বুঝিলেন, ঠাকুরের শক্তি ও কৃপার এই গণ্ডীকে ভেদ করিয়া দূরে যাইবার শক্তি তাঁহার নাই। পরম কারুণিক সদ্‌গুরু তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। আর তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পরিধির ভিতরে রাখালকে থাকিতে হইবে, করিতে হইবে আত্মসমর্পণ। আর এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই মিলিবে পরম কাম্য ধন।

আর একবারের কথা। কি এক কারণে ঠাকুর রাখালকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। ফলে রাখালের অভিমান উদগ্র হইয়া উঠে, ক্রোধভরে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

কৃপালু প্রভু অতঃপর নিজেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রাখালের সঙ্গে আসিয়া দেখা করিলেন। এইদিন যে কথা কয়টি বলিলেন, তাহা তাঁহার মতো শক্তিধর অধ্যাত্ম-শিল্পীরই উপযুক্ত।

রাখালকে বলিলেন, "ওরে এখানকার কিন্তু শ্রাবণ মাসের জল নয়। জানিস্ তো, শ্রাবণ মাসের জল হুড়হুড় করে আসে আর বেরিয়ে যায়। এখানে পাতালফোঁড়া শিব। বসানো শিব নয়। তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে এলি, আমি মাকে বল্লুম—'মা, এতে ওর অপরাধ নিসনি, ও যে নিতান্ত বালক।"

রাখাল অতঃপর তাঁহার স্বস্থান অর্থাৎ ঠাকুরেরই চরণ প্রান্তে ফিরিয়া আসিলেন।

অল্প কিছুকাল পরেই রাখালের সাধনজীবনে জাগ্রত হয় এক অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-অনুভূতি। সেদিন তিনি ঠাকুরের পদসেবায় নিরত আছেন, হঠাৎ এক দিব্য জ্যোতির ছটায় সারা দেহ মন তাঁহার উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তারপর সর্ব্বসত্তা প্লাবিত করিয়া নামিয়া আসে ভাবাবেশের জোয়ার। ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান হয় তিরোহিত। সম্বিৎ ফিরিয়া পাইবার পর বুঝিলেন, এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি ঠাকুরেরই কৃপা-প্রসাদের ফল। যে বস্তু লাভ করার জন্য সামান্য কিছুদিন আগে তিনি আন্দোলন করিয়াছেন, রোষভরে ঠাকুরের সঙ্গে

বাতবিতণ্ডা করিয়াছেন, এ যে তাহাই। এই দিনকার অভিজ্ঞতাটি উত্তর জীবনে তাঁহার স্মৃতিতে চিরজাগরূক ছিল।

রাখালের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের প্রায় ছয় মাস পরে নরেনের সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। প্রিয়বন্ধু নরেনের প্রতি ঠাকুরের রহিয়াছে অপার স্নেহ, দুর্ব্বার আকর্ষণ। নরেনও ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসেন, হৃদয়ের জ্বালা জুড়ান। উভয়ের এই ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া রাখালের আনন্দের অবধি নাই।

সেদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ মন্দিরের বিভিন্ন বিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম করিতেছেন। রাখাল তাঁহার সঙ্গে, তিনিও ভক্তিভরে হইতেছেন প্রণত। নরেন তখনো তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের মনোভাব ও ধরণধারণ বর্জ্জন করেন নাই। রাখালের এই ভক্তি গদ্‌গদ ভাব, এই দৈন্যময় প্রণাম নিবেদন তাঁহার মোটেই ভাল লাগিল না। ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।

রাখাল নরেনেরই সঙ্গে একত্রে ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকার পত্রে সহি করিয়াছেন, তারপর আর দেবদেবী বিগ্রহকে প্রণাম করার তাঁহার অধিকার কই? সত্যসন্ধ তেজস্বী নরেনের মনে হইল, এতো সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। রাখালকে ডাকিয়া নিয়া কঠোর ভাষায় তিনি তিরস্কার করিলেন।

রাখাল স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, নরেনের এ আক্রমণের সম্মুখে বড় জড়সড়ো হইয়া পড়িয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার সাহায্যে আগাইয়া আসিলেন। নরেনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ওরে, সকলেরই প্রথমটায় নিরাকার বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া, রাখালের সাকারে বিশ্বাস হয়েছে—নিজের বিশ্বাস অনুযায়ীই তো ও চলবে। ওর যে সাকারেরই ঘর।"

ঠাকুরের এই বিশ্বাসদৃপ্ত কথায় নরেনকে নিরস্ত হইতে দেখা যায়। নূতন জামাই—তাই শ্বশুরবাড়ী হইতে রাখালের মাঝে মাঝে

নিমন্ত্রণ আসে। কিন্তু সংসারের আকর্ষণ তাঁহার শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাই নূতন দাম্পত্যজীবন আস্বাদনের জন্যও আর যেন উৎসাহ পান না। সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানও তাঁহার কাছে আজকাল বিরক্তিকর।

অন্তর্যামী ঠাকুরের কিন্তু হিসাবে ভুল নাই। দিব্য দৃষ্টি সহায়ে বুঝিতে পারেন, রাখালের অবচেতন মনে সূক্ষ্ম ভোগেচ্ছা কিছু কিছু রহিয়াই গিয়াছে, এগুলি ক্রমে ক্রমে উৎসাদিত করিতে হইবে। এ সম্পর্কে তিনি উত্তরকালে বলিতেন, "রাখাল যে আমার উপর সব নির্ভর করেছিল বাড়ী-ঘর ছেড়ে। তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতুম—একটু ভোগ বাকী ছিল কিনা।"

রাখাল মাঝে মাঝে নিজের গৃহে চলিয়া যান, দুই চারদিন অবস্থান করিয়া আবার ফিরিয়া আসেন দক্ষিণেশ্বরে। আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবেরা তর্ক করেন, "রাখাল, তুমি সাধনভজনে মেতেছো, মুক্তির জন্য অভিলাষী হয়েছো, তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোমার স্ত্রীর তাতে কি? সে বেচারা অসহায়া, কোন দোষই তো সে করে নি। তাকে ত্যাগ করলে কোন্ ধর্ম্ম লাভ হবে, বল তো?"

পত্নীর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া মাঝে মাঝে রাখালের দুশ্চিন্তা হয়। একদিন তো সরল মনে ঠাকুরকেই বলিয়া বসিলেন, "তাই তো, আমার স্ত্রীর কি উপায় হবে? তার দুর্দ্দশার জন্য শেষটায় কি আমিই দায়ী হবো? পাপের ভাগী হবো?"

ঠাকুর যেন কথাটি কানেই নেন না, নীরব নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া থাকেন। পলকহীন নয়ন দুটিতে বিরাজিত পরম নির্লিপ্তি। রাখাল বড় বিস্মিত হইয়া যান। নিজ জীবনের জটিল প্রশ্নটি তিনি ঠাকুরের কাছে উত্থাপন করিয়াছেন, সিদ্ধান্তের জন্য একান্ত মনে নির্ভর করিতেছেন তাঁহারই উপর। অথচ এদিকে ঠাকুরের মনোযোগ দিবার অবসরই যেন নাই। এ বড় রহস্যময়।

কয়েকদিন পরেই কিন্তু রাখাল তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হন, এই উত্তর আসে ঠাকুরের কৃপায় এক অদ্ভুত অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায়

মধ্য দিয়া। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে বসিয়া রাখাল ধ্যান করিতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন, শয্যাপরি উপবিষ্ট ঠাকুরের মূর্ত্তিখানি দিব্য আলোক-ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণপরেই দেখা গেল আর এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। জগজ্জননী মহামায়া সেখানে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন তারপর ধীরে ধীরে দেবীর ঐ মূর্ত্তি রামকৃষ্ণের অঙ্গে মিশিয়া গেল।

সেদিনকার এই দিব্যদর্শন রাখালের সর্ব্বসত্তায় এক প্রচণ্ড নাড়া দিয়া গেল। রামকৃষ্ণের স্বরূপ ও মাহাত্ম্যের কিছুটা তিনি উপলব্ধি করিলেন। সদ্‌গুরুর উপর আসিল মনের দৃঢ়তর বিশ্বাস। পরমাশ্রয়রূপে একান্তভাবে তাঁহাকে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক জীবনের উপর আসিল প্রবল বিতৃষ্ণা। স্ত্রীর প্রতি যেটুকু মোহ অবশিষ্ট ছিল, সেদিনকার অতীন্দ্রিয় দর্শনের পর সেটুকুও যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

ঠাকুর প্রায়ই উচ্চ ভাবভূমিতে আরূঢ় থাকেন, আপনভোলা মহা-পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রেরও কিছু ঠিক থাকে না, অনেক সময় দিগম্বর হইয়াই বসিয়া থাকেন। কিন্তু যত ভাবতন্ময়ই থাকুন না কেন, রাখাল প্রভৃতি তরুণ শিষ্যদের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনে একটুও তাঁহার ভুল ত্রুটি হয় না। বিশেষ করিয়া সদাসঙ্গী রাখালের উপর নিবদ্ধ থাকে তাঁহার সদা জাগ্রত দৃষ্টি। প্রতিদিনকার ধ্যান-জপের প্রেরণা ও নির্দ্দেশ দানের সঙ্গে ঠাকুরের নিজের সেবার কাজ ও গৃহকাজের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি রাখালকে দিয়া করানো হয়। সব কিছু যাহাতে নিখুঁত হয় সেজন্য ঠাকুরের সতর্কতার অবধি নাই। আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক এই উভয় জীবনের সতর্ক নিয়ন্ত্রণের ফলেই উত্তরকালে রাখাল মহারাজ রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের নেতৃত্ব এবং দুরূহ দায়িত্বের ভার অনায়াসে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন। সিদ্ধকাম সাধকের জীবনে দেখা যায় জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমাহার।

মানসপুত্র রাখালের উপর ঠাকুরের প্রহরা ছিল অতন্দ্র, নিরবচ্ছিন্ন। সেদিন রাখালকে চিন্তিত দেখিয়া নিকটে ডাকিলেন,

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "তোর মুখ অমন দেখাচ্ছে কেন রে? কি যেন একটা গুরুতর অন্যায় করেছিস। ঠিক করে বলতো।"

রাখাল বড় থতমত খাইয়া যান। ভাবিয়া পান না, অজ্ঞাতসারে কোন্ অপকর্ম্ম তিনি করিয়াছেন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ঠাকুর আবার কহিলেন, "ভাল করে ভেবে দ্যাখ্ তো, কোন মিথ্যে কথা বলেছিস কিনা।"

এবার রাখালের মনে পড়িল, সত্যিই তো, সেই দিনই রহস্যছলে এক বন্ধুর কাছে তিনি একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। ভক্তবৎসল রামকৃষ্ণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই তথ্যটি এড়ায় নাই। সাধকের পক্ষে ঠাট্টা-বিদ্রূপের ছলেও যে অসত্য বলা অন্যায়, এ তত্ত্বটি চিরতরে তাঁহার অন্তরে গ্রথিত হইয়া যায়।

উত্তরকালে সত্যসন্ধ আপ্তকাম সাধক রাখাল মহারাজ বলিতেন "যে মিথ্যা কথা বলে বা মিথ্যাচার করে, তার জপতপ সাধন সবই বৃথা। সত্যের প্রতি ঠাকুর আমাদের এমন ধারণা করে দিয়েছেন যে, আমরা বুঝেছি—অন্য অপরাধের বরং ক্ষমা আছে কিন্তু মিথ্যা-বাদীর বা মিথ্যাচারীর পাপ থেকে নিষ্কৃতি নেই।"

সেবার ব্রাহ্মদের এক উৎসবে ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে কয়েকটি ঘনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্য। উৎসব অনুষ্ঠানের শেষে ধনী গৃহস্বামী তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী বন্ধুদের নিয়া মহাব্যস্ত, ঠাকুর বা তাঁহার সঙ্গীদের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসরই তাঁহার নাই।

অন্তরঙ্গ ভক্তগণসহ ঠাকুর এক কোণে দাঁড়াইয়া আছেন, মাঝে মাঝে বালকের মতো প্রশ্ন করিতেছেন, "কই রে, কেউ যে আমাদের ডাকৃছে না রে।"

রাখাল এতক্ষণ নীরবে গৃহস্বামীর এই অবহেলা সহ্য করিতে-ছিলেন। এবার ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন। কহিলেন, "চলুন মশাই! আমরা এক্ষুনি চলে যাই। এ অভদ্র জায়গায় আর থাকা নয়।"

ঠাকুরের কিন্তু নড়িবার মোটেই লক্ষণ দেখা যায় না। উত্তরে বরং অভিমানাহত রাখালকে ভয় দেখাইয়া বলেন, "আরে রোস্। এত ফোঁস ফোঁস করিস্ নে। বলি, গাড়ী ভাড়া তিন টাকা দু আনা কে দেবে? আছে তোর ট্যাঁকে? তাছাড়া, এত রাত্রে তোরা সব খাবিই বা কোথায়?"

রাখাল নিরস্ত হইয়া ভিতরে ভিতরে গর্জ্জিতে থাকেন। অবশেষে গভীর রাতে একটি অপরিচ্ছন্ন কোণে বসিয়া সবাই ভোজন সমাধা করিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পথে কিন্তু রাখালের মনশ্চক্ষু হইতে একটি পর্দ্দা অকস্মাৎ সরিয়া গেল। নিমন্ত্রণকারী গৃহস্বামীর উপেক্ষার মধ্য দিয়া ঠাকুরের কি অপরূপ ক্ষমাসুন্দর রূপই না আজ ফুটিয়া উঠিল। এই সঙ্গে রাখাল ধন্য হইলেন নিরভিমানতা ও সরলতার মূর্ত্ত বিগ্রহ-রূপে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া।

রাখালের মনোভাব ঠাকুরের কাছে অজ্ঞাত রহে নাই। তরুণ শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিতে লাগিলেন, "দ্যাখ্, গৃহস্থেরা অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞানতার জন্য সাধুর সঙ্গে ঠিকমতো আচরণ করতে পারে না, প্রকৃত মর্য্যাদা দিতে ভুলে যায়। কিন্তু সাধুর উচিত তাদের নিতান্ত অবোধ বলে ভাবা, দোষ না দেখে তাদের কল্যাণ কামনা করা। আমরা আজ ও-বাড়ী থেকে না খেয়ে চলে এলে, গৃহস্থের যে অমঙ্গল হতো রে।"

নীরব বিস্ময়ে রাখাল ঠাকুরের করুণাঘন মূর্ত্তির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন।

অন্তরঙ্গ ভক্ত সাধকের কাহারো কাহারো নানা দিব্য অনুভূতি ও দর্শনাদি হইতেছে। রাখালের অন্তরে এজন্য মাঝে মাঝে ক্ষোভ জাগিয়া উঠে। এত সাধন-ভজন করিতেছেন, কিন্তু কই, ঠাকুরের কৃপা ও দাক্ষিণ্যের পরিচয় তো তিনি তেমন পাইতেছেন না।

ঠিক এই সময়ে ঘটিল এক দিব্য দর্শন। ভবতারিণীর মন্দিরের এক কোণে বসিয়া রাখাল সেদিন জপ করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন, সারা কক্ষটি এক অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, এই জ্যোতির প্রবাহ ক্রমে আরো তীব্র হইয়া উঠে, তারপর অগ্রসর হয় জপনিরত রাখালের দিকে।

একি অদ্ভুত দৃশ্য! রাখাল কি জানি কেন ভয় পাইয়া গেলেন। ছুটিয়া গিয়া আশ্রয় নিলেন ঠাকুরের কক্ষে। বিস্মিত ও বিমূঢ় হইয়া অনেকক্ষণ সেখানে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন।

ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিলেন। তারপর হাসিয়া কহিলেন, "কিরে, তুই না ক্ষোভ করিস দর্শন-টর্শন তেমন কিছু হচ্ছে না। আবার তা যখন হয়, ভয়ে পালিয়ে আসিস্। তা হলে কি করবি, বল্?"

রাখাল বুঝিলেন, ভ্রান্ত বুদ্ধিবশতঃ নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি বড় বেশী ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠাকুর সদ্‌গুরু, অন্তর্য্যামী, তাঁহার কাছে তিনি চিরতরে আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন। কাজেই সকল দায়িত্বভার যে তাঁহারই। এ কথাটি বিস্মৃত হওয়া তো রাখালের পক্ষে শোভন হয় নাই।

অপর একদিনের কথা। রাখাল মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে বসিয়া একান্তমনে জপ করিতেছেন। ধীরে ধীরে সারা সত্তায় নামিয়া আসিল ধ্যানের স্রোত, তরুণ সাধক তাহার গভীরে সত্তায় নিমজ্জিত হইয়া গেলেন।

এমন সময় সেখানে ঘটিল রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। ভাবতন্ময় অবস্থায় টলিতে টলিতে উপস্থিত হইলেন রাখালের সম্মুখে। দৃপ্তস্বরে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "ওরে, এই যে তোর মন্ত্র। আর এই ছাখ্ তোর ইষ্ট।"

ঠাকুর, এ কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে রাখালের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল জ্যোতির্ম্ময় ইষ্টমূর্ত্তি।

ঠাকুর যেন অধ্যাত্ম-রাজ্যের মহান্ ঐন্দ্রজালিক, প্রতীক্ষিত লগ্ন

উপস্থিত হওয়া মাত্র কোথা হইতে হঠাৎ আবির্ভূত হইলেন, শিষ্যের জীবনে ঢালিয়া দিলেন কৃপার প্রসাদ।

সেদিনকার এই অতীন্দ্রিয় দর্শন রাখালের সারা দেহে মনে জাগাইয়া তোলে অপূর্ব্ব আনন্দ শিহরণ। ভাববিহ্বল হইয়া ঠাকুরের চরণতলে তিনি পতিত হন।

রাখালের সাধন পথের বাঁকে বাঁকে আসে নানা বাধা বিঘ্ন। তরুণ হৃদয় এক এক সময়ে অশান্ত, বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। মনে উঠে চিন্তার তরঙ্গ, ঠাকুরের পরমাশ্রয়ে তিনি বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু যে পরম প্রাপ্তির জন্য মন এত আকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহা এখনো রহিয়াছে সুদূরপরাহত। মাঝে মাঝে অতীন্দ্রিয় দর্শন ও উচ্চতর উপলব্ধি কিছু কিছু হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা তো স্থায়ী হইতেছে না।

সেদিন জপ করিতে বসিয়া মনে বড় অনুশোচনা জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আসিল আত্মধিক্কার। ভাবিলেন, নাঃ আর এমন করিয়া এখানে পড়িয়া থাকা নয়। যেদিকে দুই চোখ যায় সেদিকে বাহির হইয়া পড়িবেন।

ভক্তের অন্তরের এই আলোড়ন অমনি উচ্চকিত করে অন্তর্য্যামী শ্রীরামকৃষ্ণকে। দ্রুত পায়ে চটি ঠক ঠক করিয়া তখনি রাখালের কাছে আসিয়া তিনি উপস্থিত। তরুণ ভক্তকে আশ্বাস দেন, "ভয় কিরে? আমি তো আছি। আচ্ছা হাঁ করে জিবটা বার কর দেখি।

আদেশ পালনে রাখালের বিলম্ব হয় না। ঠাকুরও তখনি আপনমনে অস্ফুট স্বরে কি এক মন্ত্র উচ্চারণ করেন, নিজের আঙ্গুল দিয়া রাখালের জিহ্বাতে অঙ্কিত করিয়া দেন তিনটি সাঙ্কেতিক রেখা।

তরুণ সাধকের অন্তরের সর্ব্ব কিছু চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ মুহূর্ত্তের মধ্যে শান্ত হইয়া যায়, দিব্য আনন্দের পাথারে এবার তিনি ভাসিতে থাকেন।

প্রয়োজন মতো এমনি করিয়া শক্তিধর রামকৃষ্ণ মানসপুত্র রাখালের সাধনপথের বাঁকে বাঁকে দর্শন দেন, উচ্চারণ করেন অজস্র

অভয়বাণী। সাধনের প্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগাইয়া তোলেন অবিরাম ধারায়, শিষ্যের জীবনকে গড়িয়া তুলিতে থাকেন এক সার্থক অধ্যাত্ম-সৃষ্টিরূপে।

সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া সাধন-ভজন করার ফলে রাখালের সাধনজীবনে আসে পরম প্রশান্তি, দেখা দেয় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমাহার। নিরন্তর সাহচর্য্য ও উপদেশাদি দিয়া ঠাকুর প্রিয় ভক্তের সাধনজীবনকেও ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে থাকেন। এ সময়ে ধ্যানজপের উচ্চতর প্রণালী শিক্ষা দিবার সঙ্গে ঠাকুর তাঁহাকে আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামের যৌগিক প্রক্রিয়াও কিছু কিছু দিয়াছিলেন।

সেদিন ভবতারিণীর মন্দিরে ঠাকুর অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাখাল অদূরে বসিয়া জপধ্যানে নিরত। ঠাকুর হঠাৎ তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন। এক গৃহস্থ ভক্ত খানিক আগে ষোড়শোপচারে কারণবারি সহ দেবীর ভোগ দিয়া গিয়াছে। নিবেদিত পাত্র হইতে কারণবারি আঙ্গুলে তুলিয়া রাখালের ভ্রূ-যুগলের মধ্যে ঠাকুর একটি ফোঁটা দিয়া দিলেন। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন নিগূঢ় মন্ত্র। দেবী ভবতারিণীর সম্মুখে অনুষ্ঠিত সেদিনকার ঐ ক্রিয়ার পর রাখালের জীবনে উন্মোচিত হইতে থাকে সাধনার এক একটি নূতন স্তর। বলা বাহুল্য এই তরুণ শিষ্যের প্রত্যেকটি অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার উপরেই সতত নিবদ্ধ থাকিত শক্তিধর সদ্‌গুরুর সদা-জাগ্রত দৃষ্টি।

এসময়কার সাধনকালে, নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই রাখাল একটি বিশেষ শক্তির অধিকারী হইয়া উঠেন। দিব্যদৃষ্টি সহায়ে প্রত্যেক মানুষের অন্তস্তল তিনি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেন। ঠাকুরের দর্শনাভিলাষী হইয়া এ সময়ে নানা শ্রেণীর লোক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইত। নব অলৌকিক শক্তির অধিকারী রাখাল ভাবিতেন, যে কেহ আসিয়া উপস্থিত হইলেই ঠাকুরের কাছে তাঁহাকে টানিয়া নেওয়া কেন? বরং কে কেমন স্তরের লোক আগে হইতে তাহা সঠিকভাবে

নির্ণয় করিয়া নেওয়া ভাল। নবলব্ধ অলৌকিক দৃষ্টি বলে তিনি সকলেরই মনের অভ্যন্তরভাগ আগে হইতে খানিকটা দেখিয়া নিতেন। তারপর যে কটি দর্শনার্থীকে তাঁহার মনে হইত শুদ্ধসত্ত্ব, বাছিয়া বাছিয়া তাহাদেরই উপস্থিত করিতেন ঠাকুরের কক্ষে।

শিষ্যদের আচার-আচরণ সম্পর্কে ঠাকুর অতিমাত্রায় সজাগ। রাখালের এই কাণ্ড তাঁহার চোখ এড়ায় নাই। সেদিন তাঁহাকে ডাকিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিরস্কার করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "আচ্ছা, তোর এসব কি হীনবুদ্ধি বল্ তো? কোথায় মায়ের চরণে শুদ্ধাভক্তি নিয়ে পড়ে থাকবি, তা না—কেবলই অষ্টসিদ্ধির দিকে মন দিচ্ছিস্। বিভূতির দিকে নজর দিলে কি কখনো ঈশ্বর লাভ হয় রে? ছিঃ ছিঃ ওদিকে মন রাখিস্‌নে—ওসব একেবারে ঝেড়ে ফেলে দে।"

রাখাল লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলেন, অন্তর্য্যামী ঠাকুরের অমোঘ দৃষ্টি সদা নিবদ্ধ রহিয়াছে নগণ্যতম ভক্ত-সাধকের প্রতিটি আচার-আচরণের দিকে। আজ তাই কৃপা করিয়া তরুণ সাধক রাখালের বিভূতি প্রয়োগের ইচ্ছাটিকে অঙ্কুরে এমনভাবে বিনষ্ট করিয়া দিলেন। এই দিনের তিরস্কারের পর হইতে রাখালের কাছে অতীন্দ্রিয় দর্শন ও সিদ্ধাই ইত্যাদি একেবারে তুচ্ছ হইয়া গেল। মনকে তিনি কেন্দ্রীভূত করিলেন ইষ্টের পাদপদ্মের দিকে।

রামকৃষ্ণের কক্ষে ধ্যান করিতে বসিলেই রাখাল স্বল্পকাল মধ্যে অন্তর্মুখীন হইয়া যান, তলাইয়া যান চৈতন্যময় সত্তার অতল গভীরে। এভাবে ধ্যানাবস্থায় রাখালকে দেখিলেই ঠাকুরের হৃদয়ে জাগে দিব্য উদ্দীপনা। এক একদিন ভাবপ্রমত্ত হইয়া অস্ফুটস্বরে রাখালকে কহিতে থাকেন, "আমি তো সেখান থেকে এসেছি অনেক দিন। হ্যাঁরে, তুই কবে এলি? বল্ দেখি, কবে এলি?"

অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবকেরা অবাক বিস্ময়ে ভাবিতে থাকেন, রাখালের সৌভাগ্যের অন্ত নাই। জন্মান্তরের পুরানো সম্পর্কের ধারাটি বাহিয়াই তাঁহার জীবনতরী আজ ঠাকুরের চরণতলে আসিয়া

ঠেকিয়াছে। প্রিয় পার্ষদের এই নিত্য সম্বন্ধের গূঢ় ইঙ্গিতটিই যে ভাবমত্ত সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হইতে হঠাৎ আজ প্রকাশিত হইল।

ইতিমধ্যে ঠাকুরকে ঘিরিয়া দক্ষিণেশ্বরে জড়ো হইয়াছে চিহ্নিত শিষ্যগোষ্ঠী। দিব্য স্পর্শ, সান্নিধ্য ও সাধননির্দ্দেশ দিয়া ঠাকুর ইহাদের জীবনে প্রজ্বলিত করিয়াছেন অধ্যাত্ম চেতনার আলো। তাই বুঝি এবার লীলামঞ্চ হইতে নিজেকে অপসৃত করিয়া নিতে চান। এ উদ্দেশ্যে নিজ দেহে সৃষ্টি করিয়াছেন মারাত্মক ক্যান্সার রোগ। আর তাঁহার শুশ্রূষাকে উপলক্ষ করিয়া শিষ্যেরা হইতেছে দিনের পর দিন ঘনিষ্ঠতর, গুরুগতপ্রাণ। সবার অলক্ষ্যে গুরুভাইদের মধ্যেও গড়িয়া উঠিতেছে এক দৃঢ় আত্মিক বন্ধন। ঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে রাখালও নিবিড়ভাবে যুক্ত হইলেন তাঁহার সঙ্গে, অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িলেন তাঁহার প্রত্যেকটি পরিকরের সঙ্গে।

রাখাল প্রায়ই মনে মনে পীড়া বোধ করেন—ঠাকুরের দেহ সিদ্ধ দেহ, তাহাতে কেন এই মারাত্মক রোগের আক্রমণ? সাধন বলে অপরিমেয় শক্তি বিভূতি অর্জ্জনে তবে কি তিনি সমর্থ হয় নাই? জগজ্জননীর সাধনায়ই বা কতটা তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন? কি তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ? জিজ্ঞাসু তরুণ সাধকের মনে বার বার এই সব প্রশ্ন আসিয়া ভীড় করে।

শ্যামপুকুরে ঠাকুর রোগশয্যায় থাকা কালে এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হয় যাহার ফলে রাখালের মনের সংশয় ঘুচিয়া যায়, ঠাকুরের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তিনি কৃতার্থ হন।

সেদিন শ্যামাপূজা। অন্তরঙ্গ ভক্ত-শিষ্যেরা সকাল হইতেই পূজার আয়োজনে রত। ঠাকুর স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের পূজা সম্পন্ন করিবেন। পূজার লগ্ন উপস্থিত হইলে ভক্তদের মনে জাগিয়া উঠে এক আকস্মিক ভাবের জোয়ার। আদ্যাশক্তি মহাকালী জ্ঞানে সবাই তখন সমস্বরে ঠাকুরের জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। শুরু হয় তাঁহারই অর্চ্চনা। সচন্দন

রক্তজবা ঠাকুরের চরণে অঞ্জলি দিয়া ভক্তেরা আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠেন।

সকলের সাথে রাখালও সেদিন যোগ দেন ঠাকুরের এই অভিনব অর্চ্চনায়। হৃদয় তাঁহার দিব্য আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। বার বার ভাবিতে থাকেন, শ্যামাপূজার এই আয়োজনে ঠাকুর নিজেই আজ কত উৎসাহ দিয়াছেন। অতঃপর একি কাণ্ড! লগ্ন উপস্থিত হইলে দেখা গেল, নিজেই নিজের পূজা তিনি অঙ্গীকার করিলেন, আর দিব্য আবেশে হইলেন অভিভূত।[1]

রাখাল বিশ্বাস করিলেন, এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তদের ঠাকুর বুঝাইয়া দিলেন, মহাকালী আর মহাকালীর বরপুত্র রামকৃষ্ণের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। ভক্তদের পূজার অঞ্জলি পরম লক্ষ্যে গিয়াই পৌঁছিয়াছে।

সেদিন হইতে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রাখালের চেতনায় জাগিয়া উঠে নূতনতর এক উপলব্ধি। সদ্‌গুরুর সর্ব্বব্যাপী মহিমার আলো নূতন করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাঁহার হৃদয়াকাশে।

সে-বার ঠাকুরের বর্ষীয়ান ভক্ত বুড়ো গোপাল (উত্তরকালের অদ্বৈতানন্দ) উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করিয়া কাশীপুরে ঠাকুরের সকাশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তীর্থদর্শনের পর সাধু সেবা করাইতে হয়, বুড়ো গোপালের অভিলাষ—একদল ভাল সাধুকে ডাকিয়া আনিয়া পরিতোষ সহকারে ভোজন করান।

শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "ওরে কোথায় আর সাধু খুঁজতে যাবি? এখানেই সব রয়েছে—এই ছোক্‌রাদের খাওয়ালেই তোর কাজ হবে।"

বুড়ো গোপাল তখনি সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজী হন। ঠাকুর তাঁহাকে দিয়া কতকগুলি গেরুয়া বসন ও মালা-চন্দন আনাইয়া নেন। নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ত্যাগী তরুণ ভক্তেরা সবাই সেখানে উপস্থিত।

১ লীলাপ্রসঙ্গ—সারদানন্দ

ঠাকুর একে একে তাঁহাদের কাছে ডাকিলেন, প্রত্যেককে দান করিলেন একটি করিয়া গৈরিক বস্ত্র ও মালাচন্দন। সহজ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য বড় গভীর। সেদিন ইহারই মধ্য দিয়া রামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসী সঙ্ঘের বীজ ঠাকুর তাঁহার নিজ হস্তে রোপন করিলেন।

বৈরাগ্য ও শুদ্ধাভক্তির সহিত ভাগবত প্রেমের অমৃতধারা ঠাকুর এই ভক্তদের জীবনকুম্ভে ঢালিয়া দেন। এই কৃপাপ্রসাদ উত্তরকালে তাঁহার চিহ্নিত সন্ন্যাসী পার্ষদদের সাধনজীবনকে রসসমৃদ্ধ করিয়া তোলে, মানবীয় প্রেম ও ভাগবত প্রেমের অপূর্ব্ব সমাহার সম্ভব হয় তাঁহাদের জীবনে। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, এই রামকৃষ্ণ শিষ্যদের কেহই শুষ্ক সন্ন্যাসীতে পরিণত হন নাই।

রামকৃষ্ণ প্রায়ই শিষ্যদের বলিতেন, "শুক্‌নো সাধু হবি কেন শুধুশুধু? তোরা জেনে রাখ্‌বি, এখানকার ভাব হচ্ছে রসে-বসে।" রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সাধকদের মধ্যে যে কয়জনের জীবনে সাধনরসের এই সমন্বয় দেখা গিয়াছে, রাখাল মহারাজ তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। সুখে দুঃখে মঠ মিশনের কর্ম্মের ভীড়ে বা ভাগবত-প্রসঙ্গে সদাই দেখা যাইত তাঁহার প্রশান্ত, প্রসন্নমধুর মূর্ত্তি।

এই সময়ে ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে তীর্থ পর্য্যটনের ঝোঁক প্রবল হইয়া উঠে। কেহ যাইতেছেন বুদ্ধগয়াতে, কেহ ছুটিতেছেন পুরী, বারাণসীতে। রাখাল কিন্তু ঠাকুরের সান্নিধ্য ছাড়িয়া কোথাও যাইতে রাজী নন, অটল হইয়া ঠাকুরেরই পদপ্রান্তে বসিয়া আছেন, অবিচল নিষ্ঠায় করিতেছেন তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা। কাশীপুরের বাগানে এ সময়ে তরুণ সাধক রাখালের যে মহিমোন্নত চরিত্র ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাই, উত্তরকালে রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের নায়করূপে দেখা যায় তাঁহারই পরিণত অভিব্যক্তি।

ঠাকুরের রুগ্নাবস্থায় নরেন একদিন অকস্মাৎ গয়াধামে চলিয়া যান। উদ্দেশ্য, সেখানে থাকিয়া কয়েকদিন তপস্যায় অতিবাহিত করিবেন। নরেনের অনুপস্থিতিতে ঠাকুরের সেবার অসুবিধা হইবে বলিয়া রাখাল কিন্তু বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এ দুর্ভাবনার কথা অন্তর্য্যামী রামকৃষ্ণের অগোচর রহিল না। রোগশয্যায় বসিয়া স্মিতহাস্যে সেদিন রাখালকে কহিলেন, "কেন তুই মিছে ভেবে মরছিস্? কোথায় যাবে সে? কদিন বাইরে থাকতে পারবে? ছাখ্না এল বলে। চার খুঁট ঘুরে আয়, দেখবি কোথাও কিচ্ছু নেই।"

খানিক বাদে নিজের বক্ষ স্পর্শ করিয়া ঠাকুর কহিলেন, "মনে রাখ্বি, যা কিছু আছে সব এইখানে।"

ঠাকুরের শ্রীমুখের এই আশ্বাস-বাণী শ্রবণে রাখাল বিস্ময়ে আনন্দে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুরের কথাই ঠিক হইল। কয়েকদিনের মধ্যে নরেন ও অন্যান্য ভক্তেরা ফিরিয়া আসিলেন, উপবেশন করিলেন ঠাকুরের চরণতলে।

সাধন করিতে করিতে এসময়ে রাখালের অন্তর্দৃষ্টি স্বচ্ছতর হইয়া আসে। উপলব্ধি করেন, প্রভু রামকৃষ্ণ শুধু তাঁহাদের মতো গুটিকয়েক ভক্ত-শিষ্যেরই প্রভু নহেন। জগৎগুরুরূপে তিনি অবতীর্ণ। ঐশী লীলার এক চিহ্নিত পুরুষ তিনি। জগতের কল্যাণে প্রেমভক্তি বিতরণের জন্যই তিনি আসিয়াছেন।

একদিন সঙ্গী ভক্তদের কাছে রাখাল ঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার উপলব্ধির কথা স্পষ্টরূপে বলিয়া ফেলিলেন। দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "উনি নিজে কৃপা করে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'সদ্গুরু জগদ্গুরু'। তোমরা কি ভেবেছো, উনি কেবল আমাদের ক'জনার জন্যই আবির্ভূত হয়েছেন?"

নরেন একথা শুনিলেন। অসামান্য প্রতিভা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল তাঁহার। তাই যে কোন তত্ত্ব ও তথ্য তাঁহার সম্মুখে আসিত, বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া ছাড়িতেন না। সেদিন রাখালের এই কথাটি সোৎসাহে তিনি সমর্থন করিলেন। পরমশ্রদ্ধায় ঠাকুরের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন শুরু করিলেন।

রাখাল হৃষ্টচিত্তে ঠাকুরকে গিয়া কহিলেন, "আজকাল নরেন আপনাকে খুব বুঝতে শিখছে।"

ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। নরেনকে ডাকিয়া কথা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা বল্‌তো আমার ভেতরে কি ভাব রয়েছে।"

নরেন তৎক্ষণাৎ একথায় উত্তর দিলেন, "বীরভাব, সখীভাব— সমস্ত কিছু ভাব।"

রামকৃষ্ণ এবার নিজের বুকটি হাত দিয়া স্পর্শ করিলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, "দেখছি, এর ভেতরে যা কিছু।"

তারপর ইশারায় নরেনকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন, "ওরে, কি বুঝলি বল্‌তো?"

"যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভেতর থেকে।"

হর্ষভরে ঠাকুর রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কহিলেন, "দেখছিস্ কেমন বুঝ্‌ছে?"

ঠাকুরের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য সেদিন তাঁহার সহিত কথা প্রসঙ্গে এমনিভাবে রাখালের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, চিরতরে তাঁহার অন্তরে গ্রথিত হইয়া যায়। রোগশয্যায় শায়িত থাকার সময় ঠাকুর প্রায়ই নরেনের সঙ্গে একান্তে বসিয়া নানা নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করিতেন, আশ্রিত ভক্ত-শিষ্যদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে ইঙ্গিত বা নির্দ্দেশাদিও দিতেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন, "জানিস্, আমাদের রাখালের কিন্তু রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছে করলে একটা প্রকাণ্ড রাজ্য সে চালাতে পারে।"

ঠাকুরের সামান্য একটি মন্তব্য। কিন্তু ইহার নিহিতার্থ বুঝিয়া নিতে তীক্ষ্ণধী নরেনের একটুও দেরী হইল না। ঠাকুরের অভিপ্রায়, ভক্ত-শিষ্যদের যে সঙ্ঘ পরবর্ত্তীকালে গঠিত হইবে, তাহার নায়ক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন রাখাল। বিনা দ্বিধায় তখনি মনে মনে নরেন ইহা মানিয়া নিলেন।

তারপর সুযোগমতো একদিন গুরুভাইদের কাছে রাখালের গুণগান করিতে করিতে কহিলেন, "রাখালরাজকে আজ থেকে আমরা রাজা বলেই ডাক্‌বো।

ভক্তেরা জানেন, রাখাল ঠাকুর রামকৃষ্ণের মানসপুত্র, পরম

আদরের ধন। কাজেই সবাই তাঁহার এই নূতন নামকরণ সোৎসাহে সমর্থন করিলেন।

ঠাকুরের কানে একথা উঠিল। নরেন এবং অন্যান্য ভক্তদের ডাকিয়া আনন্দ সহকারে তিনি কহিলেন, "বেশ করেছিস্ তোরা। রাখালের রাজা নামই ঠিক বটে।"

ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নায়ক সেদিন এভাবে ঠাকুর ও তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে চিহ্নিত হইয়া রহিলেন।

রামকৃষ্ণ ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছেন। তরুণ শিষ্যেরা প্রাণপণে দিন রাত তাঁহার সেবা করিয়া চলিয়াছেন, এই সময়ে এক পাগলী মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত। নানা অনাচার উপদ্রবও করিত।

শশী মহারাজ একদিন অতিষ্ঠ হইয়া কহিলেন, "পাগলীকে আর আস্‌করা দেওয়া ঠিক নয়। এবার এলে ধাক্কা মেরে তাড়াতে হবে।"

কৃপালু ঠাকুরের কানে একথা গেল। রাখালকে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "না—না সে আসবে। আর আমায় দেখেই চলে যাবে। ওকে তোরা তাড়াস্ নে।"

ঠাকুরের আদেশ শশী মহারাজকে শুনাইয়া দিয়া রাখাল কহিলেন, "ঠাকুরের ওপর উপদ্রব সবাই করে, আর তিনি তা অসীম করুণায় সহ্য করে যান। সকলেই কি খাঁটি হয়ে ওঁর কাছে এসেছে? ওঁকে আমরা কষ্ট দিই নি? নরেন্দ্র-টরেন্দ্র আগে কি রকম ছিল—কত তর্ক করতো। ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছেন। ধরতে গেলে আমরা কেউই নির্দ্দোষ নই।"

উদারবুদ্ধি রাখালের কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর বার বার সানন্দে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"প্রেমে, আনন্দে, সেবায় এবং নিয়ত সাধনভজনে রাখাল এক অপূর্ব্ব উদার প্রেমদৃষ্টিতে সকলকে নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহার ঈশ্বরলুব্ধ চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও তাঁহার প্রেমমূর্ত্তি দিন

দিন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইতে লাগিল। ঠাকুর রাখাল প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের সম্বন্ধে বলিতেন, 'আমি কে আর ওরা কে, এই জানলেই হল।' কাশীপুর উদ্যানে তাঁহাদের মধ্যে এই তত্ত্বই দিন দিন স্ফুরিত লইয়া উঠিল। দক্ষিণেশ্বরে যাহা বীজাকারে অন্তরঙ্গদের মধ্যে ছিল, কাশীপুর উদ্যানে তাহা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। অলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের লইয়া একটি মহাশক্তির সঙ্ঘ ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। যে প্রেমসূত্রে ইঁহারা পরস্পর আনন্দে আবদ্ধ হইতেছেন—সেই প্রেমসূত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ[১]।"

ভক্তদের প্রাণের ঠাকুর ও পরমাশ্রয় শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগস্ট মহাপ্রয়াণ করিলেন। নরেন রাখাল প্রভৃতি ভক্তরা শোকে হইলেন মুহ্যমান। যাঁহার প্রেরণায় ঐহিক জীবনের সব কিছু তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার চরণতলে বসিয়া আত্মিক সাধনার ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন, তিনি আজ কোন্ অদৃশ্যলোকে চলিয়া গেলেন? ত্যাগ বৈরাগ্যে দীপ্ত তরুণ সাধকদের জীবনে নামিয়া আসিল এক সীমাহীন শূন্যতা।

নরেনের হৃদয়ে এখন একমাত্র চিন্তা, ঠাকুরের ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্তদের কি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, ঠাকুরের আদর্শ কি করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করা যায়।

রামকৃষ্ণ নিজেই বুঝি একদিন সুযোগ মিলাইয়া দিলেন। ভক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র একদিন ঠাকুরঘরে বসিয়া ধ্যান-জপ করিতেছেন। হঠাৎ ছায়া মূর্ত্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। কহিলেন, "তুই করছিস্ কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার আগে একটা ব্যবস্থা কর্।" নির্দ্দেশটি দিয়া তখনই ঠাকুর অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ: জীবন কথা—দেবেন্দ্রনাথ বসু

সুরেশ মিত্র ছুটিয়া আসিয়া সাশ্রুনয়নে নরেনের কাছে এই দর্শনের কথা বর্ণনা করিলেন। কহিলেন, "ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদের জন্য একটা আস্তানার বন্দোবস্ত কর, একত্রে তারা সাধন-ভজন করুক। প্রতি মাসে আমি অর্থ সাহায্য করবো।"

নরেনের আনন্দ আর ধরে না, সোৎসাহে বরানগরের গঙ্গাতীরে একটা জীর্ণ বাগানবাড়ী ভাড়া করিয়া ফেলেন। তারপর রাখাল তারককে সঙ্গে নিয়া সেই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে শুরু করেন বসবাস।

ক্রমে অপর ভক্তেরাও এখানে আসিয়া মিলিত হন এবং তাঁহাদের এখানকার সাধনা ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের মধ্য দিয়া সূত্রপাত হয় মঠ প্রতিষ্ঠার। রামকৃষ্ণের কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী এই ভক্তেরা প্রত্যেকেই এক একটি বিশুদ্ধ আধার। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী মূলে, ভবতারিণীর মন্দিরে ও কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর আপন হস্তে এই সব আধারে মুমুক্ষার আলো জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এবার সে আলো আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

নরেন রাখাল প্রভৃতি ভক্তদের ঈশ্বর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হইয়া উঠিল। ধ্যান-জপ, কীর্ত্তন ও শাস্ত্রব্যাখ্যার জোয়ার বহিয়া চলিল।

রাখালের বাবা আনন্দমোহন মাঝে মাঝে পুত্রের সঙ্গে দেখা করিতে বরানগরে আসিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, রামকৃষ্ণের বিরহে যুবক ভক্তেরা স্বভাবতঃই শোকে অভিভূত হইয়াছে, কিছুদিন পরে এই শোক কমিয়া গেলে যে যাহার বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল অন্যরূপ। ভক্তদের জীবনে ত্যাগ তিতিক্ষা ও তপস্যা যেন আরো তীব্র হইয়া দেখা দিল।

পিতা বার বার কষ্ট করিয়া মঠে আসেন, আর বিষাদখিন্ন হৃদয়ে ফিরিয়া যান। অবশেষে রাখাল একদিন তাঁহাকে নিজের সিদ্ধান্ত অকপটে জানাইয়া দিলেন, "কেন আপনারা কষ্ট করে এখানে আসেন? আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদেব ভুলে যাই।"

দৃঢ়, প্রশান্ত কণ্ঠে যে ভাবে রাখাল এই সঙ্কল্পের কথা কহিলেন তাহাতে পিতা বুঝিয়া নিলেন, আর তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া নেওয়া সম্ভব নয়।

বৈরাগ্যবান্ সাধক রাখাল মায়িক সম্বন্ধ ত্যাগের কথা শুধু মুখেই উচ্চারণ করেন নাই, অন্তরেও ইহা প্রতিফলিত করিতে তিনি সক্ষম হন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী বিশ্বেশ্বরীর দেহান্ত ঘটে, কিন্তু নিরাসক্ত ত্যাগী সাধক রাখাল এজন্য একটুও বিচলিত হন নাই। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক বালক পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শোনার পরও তিনি ছিলেন পরম প্রশান্ত ও নির্ব্বিকার।

১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে বরানগর মঠের ত্যাগী ভক্তদের জীবনে সংযোজিত হয় এক নূতন অধ্যায়। নরেনের নেতৃত্ব ও প্রেরণায় বিরজা হোম সম্পন্ন করিয়া সবাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রাখালের নব নামকরণ হয়—স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

তপস্যা সম্পর্কে অন্তরঙ্গ ভক্তদের রামকৃষ্ণ বলিতেন, "ওরে, আমি ষোল ট্যাং করেছি, তোরা অন্তত এক ট্যাং তো কর্।" মুমুক্ষু ভক্তদের একথা স্মরণ আছে। সবাই এবার নব ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন, কৃচ্ছ্রময় সাধনার পথে দৃঢ়পদে তাঁহারা অগ্রসর হন।

এ সময়ে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় নবীন সন্ন্যাসীদের। ভিক্ষা কোন দিন জুটে, কোনদিন জুটে না। পাড়াপড়শীরা পরমহংসের ফৌজ বলিয়া টিটকারী দেয়, অনেকে নানা কুৎসা ছড়ায় আর গালাগালি দেয়। কিন্তু তপস্বীদের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সদাই সাধন-ভজনে তাঁহারা বিভোর হইয়া আছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরকালে এসময়কার কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "বরানগরে কতদিন গিয়াছে যে খাবার কিছু নেই, ভাত জোটে তো নুন জোটে না। কয়েকদিন হয়তো শুধু নুনভাতই চললো, কিন্তু

কারুর তাতে গ্রাহ্য নেই। জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা ভাসছি। কখন কখন শুধু তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ ও নুনভাত—এই মাসাবধি চলেছে। আহা, সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেতো, মানুষের কথা কি ?”

বরানগরের এই দিনগুলির স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরবর্ত্তীকালে একবার রহস্যভরে বলেন, “যখন খাবার শক্তি ছিল তখন তেলাকুচো সিদ্ধ ভাত জোটাই মুশকিল হতো, আর এখন খাবার সামর্থ্য নেই তাই উপাদেয় আহার জুটছে।”

পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে বরানগরের তরুণ সাধুদের মধ্যে তীর্থদর্শন ও নিভৃত তপস্যার প্রেরণা জাগিয়া উঠে। অন্যান্য গুরুভাইদের মতো ব্রহ্মানন্দ মহারাজও কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন পরিব্রাজন ও তীর্থ পরিক্রমায়। উত্তর ও মধ্য ভারতের নানা পবিত্র পীঠে তিনি দিনের পর দিন ঘুরিয়া বেড়ান, কখনো বা গভীর ধ্যান-ভজনে থাকেন বিভোর।

সে-বার ব্রহ্মানন্দ নর্ম্মদা তীরে ওঁকারনাথ তীর্থে আসিয়াছেন। পুণ্যতোয়া নর্ম্মদার সহিত আচার্য্য শঙ্করের নানা স্মৃতি জড়িত, তাই এখানে পৌঁছিয়া ব্রহ্মানন্দ আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে রহিয়াছেন গুরুভাই সুবোধানন্দ, উভয়ে একটি স্থানীয় মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

নর্ম্মদার আকর্ষণ ব্রহ্মানন্দ বহুদিন যাবৎই বোধ করিতেছিলেন। এবার এখানে পৌঁছানোর পর তাঁহার প্রাণমন ভরিয়া উঠিল।

এখানকার আকাশ, বাতাস, পবিত্র নদী-নীর সবই তপস্যার অনুকূল। কত প্রাচীন সাধুরা ঝুপড়ি বাঁধিয়া, গুম্ফা তৈরী করিয়া, নিভৃত সাধনায় বসিয়া আছেন। নদীতীরের এক বৃক্ষস্থলে ব্রহ্মানন্দ সেদিন ধ্যানাসনে বসিয়া পড়িলেন। তারপর এখানে ধ্যানস্থ অবস্থায় একাদিক্রমে ছয় দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, অতীন্দ্রিয় পরম

বোধে সর্ব্বসত্তা রহিল নিমজ্জিত। এই সময়ে গুরুভাই সুবোধানন্দ পরম যত্নে তাঁহার দেহের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

গোদাবরী তীরের দণ্ডকারণ্য অঞ্চল প্রভু রামচন্দ্রের লীলাস্থল। এখানকার পঞ্চবটি ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসীদের অতি প্রিয় তীর্থ। এই তীর্থে আসিয়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এক দুর্লভ অধ্যাত্ম-অনুভূতি লাভ করেন।

সেদিন পম্পা সরোবরের তীরে বসিয়া রাম সীতার পুণ্যস্মৃতির অনুধ্যান করিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল জটা-কম্বল পরিহিত ধনুর্ধারী রামচন্দ্র ও মা জানকীর দিব্য মূর্ত্তি। তরু-লতার পুষ্পাঞ্জলি আর পাখীর সেখানে কুজনে এক স্বর্গীয় আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে।

'জয় সীতারাম, জয় সীতারাম,' বলিয়া ব্রহ্মানন্দ ভাবাবেগে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন, তারপর বাহ্যজ্ঞান হইল তিরোহিত। চেতনা ফিরিয়া আসার পরও দীর্ঘকাল তাঁহার কণ্ঠে রামনামের গুঞ্জরণ চলিতে থাকে। এই সময়ে প্রায়ই ভাবতন্ময় হইয়া তিনি আত্মহারা হইতেন এবং সুবোধানন্দ সতর্কভাবে সদাই তাঁহাকে আগুলিয়া রাখিতেন।

দ্বারকা, গির্ণার, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দ ও সুবোধানন্দ সেবার বৃন্দাবনে পৌছিয়াছেন। এখানে আসিবার পর হইতেই মন তাঁহার কঠোর তপস্যার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। দিনের পর দিন ধ্যানাসনে তিনি বসিয়া থাকিতেন, নিমজ্জিত হইতেন অগাধ ভাব-সমুদ্রে। এক কুঠিয়াতে বাস করিয়াও কোন কোন দিন সঙ্গী গুরুভাই সুবোধানন্দের সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত হইত না। সুবোধানন্দ ভিক্ষা করিয়া যে আহার্য্য আনিতেন, প্রাই দেখা যাইত ব্রহ্মানন্দ তাহা স্পর্শ করেন নাই।

এই ধ্যানতন্ময়তা ও কৃচ্ছ্রসাধন দেখিয়া সুবোধানন্দ মনে মনে

ভীত হইয়া উঠিলেন। সত্যিই তো, এভাবে চলিলে শরীর আর কয়দিন টিকিবে? সেদিন গোবিন্দ মন্দিরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত তাঁহার দেখা। কথা প্রসঙ্গে জানাইলেন, ব্রহ্মানন্দ বৃন্দাবনে আসিয়াছেন এবং কঠোর তপস্যা শুরু করিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গোসাঁইজী প্রায়ই যাতায়াত করিতেন, তাই ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। পরদিনই ধ্যানরত ব্রহ্মানন্দের কুটিরে গিয়া তিনি উপস্থিত হন। দুজনে দুজনকে দেখিয়া মহাখুসী, পুরানো দিনের নানা কথার আলোচনা শুরু হইল।

কথাপ্রসঙ্গে গোসাঁইজী কহিলেন, "পরমহংসদেব তো আপনাকে সব রকম সাধন-ভজন, অনুভূতি, দর্শনাদি করিয়ে দিয়েছেন। তবে আপনি এখন কেন আবার কঠোর সাধনা করছেন?"

ব্রহ্মানন্দ প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "তাঁর কৃপায় যে সব অনুভূতি বা দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলো আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছি মাত্র।"

গোসাঁইজী বুঝিলেন, ঐশী প্রেমের দুর্ব্বার আবেগে ব্রহ্মানন্দ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, এখন তাঁহাকে নিরস্ত করা সম্ভব নয়।

এই সময়ে বৃন্দাবনে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ শুরু হইয়াছে। কয়েক দিন পরে ব্রহ্মানন্দও এই রোগে শয্যাশায়ী হন। সংবাদ পাইয়াই গোসাঁইজী তাঁহার কুটিরে ছুটিয়া আসেন। কুটিরে কোন মশারী নাই দেখিয়া তখনি উহা কিনিয়া আনেন এবং নিজ হস্তে রোগীর শয্যায় তাহা টানাইয়া দেন। গোসাঁইজীর প্রদত্ত ঔষধ খাইয়াই ব্রহ্মানন্দ এ সময়ে তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করেন।

কিছুদিন পরে সঙ্গী সুবোধানন্দ উত্তরাখণ্ডে চলিয়া যান এবং ব্রহ্মানন্দ তখন নিভৃতে বসিয়া কঠোরতর তপস্যায় ব্রতী হন। যেদিন ইচ্ছা হয় মাধুকরী করেন বা কোন কুঞ্জে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, কখনো বা উপবাসে দুই একদিন কাটাইয়া দেন, ধ্যান-জপে সময় কোথা দিয়া অতিবাহিত হয় তাহা জানিতে পারেন না।

এ সময়ে একদিন ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি চকিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হয়; তারপর এই মূর্ত্তি প্রসন্ন হাসি হাসিয়া

অদৃশ্য হইয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ প্রথমটায় চমকিয়া উঠেন, তারপর সারা অন্তর বিষাদে ভরিয়া উঠে। তবে তো ঠাকুরের ভক্ত-সেবক বলরাম আর ইহলোকে নাই। কয়েক দিন পরেই সংবাদ আসিল, বলরাম বসু মহাশয় সত্য সত্যই পরলোকে গমন করিয়াছেন। বলরামের ব্রহ্মানন্দের সম্বন্ধ মায়িক নয়, আত্মিক। ঠাকুরের পরমভক্ত ও অন্যতম প্রধান সেবক বলিয়াই বলরামের অন্তর্ধান সেদিন এমন করিয়া বাজিয়াছে।

অতঃপর কনখল, আবু পাহাড়, জ্বালামুখী প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল সাধন-ভজন করিয়া ব্রহ্মানন্দ তাঁহার গুরুভাই তুরীয়ানন্দ সহ আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। এবার তপস্যা শুরু করেন ব্রজমণ্ডলের কুসুম সরোবরে।

তুরীয়ানন্দ পরমপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে কখনো ভিক্ষা করিতে দিতেন না, নিজেই গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। একদিন ভিক্ষায় মিলিল কয়েকটি শুক্‌নো রুটি, একটু গুড় বা ব্যঞ্জনও যোগাড় করা গেল না। ঐ রুটিই কুয়োর জলে ভিজাইয়া তিনি ব্রহ্মানন্দের সম্মুখে ধরিলেন। দুই চোখ তাঁহার অশ্রুসজল হইয়া উঠিল, কম্প্রকণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ, আপনাকে ঠাকুর কত আদর-যত্ন করতেন। ক্ষীর, সর, ননী খাওয়াতেন, আর আমার কি দুর্ভাগ্য, আজ ঠাকুরের এত আদরের রাখালকে আমি খাওয়াচ্ছি শুক্‌নো রুটি।"

বলিতে বলিতে কান্নায় তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। গুরুভাইদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মানন্দ ছিলেন এমনি সমাদর ও শ্রদ্ধার বস্তু।

১৮৯২ সালের প্রথমার্ধ। রামকৃষ্ণ ভক্তদের মঠ এ সময় বরানগর হইতে আলম বাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সেখানকার চিঠি হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এক বিস্ময়কর আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হন। সুদূর আমেরিকায়, চিকাগোর বিশ্ব-ধর্ম্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। এই গৈরিক পরিহিত তরুণ সন্ন্যাসীর মুখে বেদান্তের তত্ত্ব ও ধর্ম্ম সমন্বয়ের উদাত্ত বাণী

শুনিয়া পাশ্চাত্যের মানুষ উচ্চকিত হইয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকায় শুরু হইয়াছে ভারতের ধর্ম্ম সংস্কৃতির নব মূল্যায়ন।

বিবেকানন্দের এই সাফল্য ভারতেও আনিয়া দিয়াছে অভূতপূর্ব্ব উদ্দীপনা, জাতি ও ধর্ম্ম সম্পর্কে নূতনতর গর্ব্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়া উঠিয়াছে। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে দশ দিক হইয়াছে পরিপূরিত।

কলিকাতা হইতে আরো সংবাদ আসিয়াছে, মঠে রামকৃষ্ণের জন্ম দিনের উৎসবে এবার যে আনন্দ উৎসব হয় তাহা অভূতপূর্ব্ব। এবার দক্ষিণেশ্বরে প্রায় বিশ হাজার লোক প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দের হৃদয় তাই আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ঠাকুরের মাহাত্ম্য এবার তবে জগৎবাসী উপলব্ধি করিবে, তাঁহার উদার ধর্ম্মীয় আদর্শ ও সাধনপথ গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিবে।

ইতিমধ্যে ব্রহ্মানন্দ স্বামী একবার লখ্‌নৌতে গিয়া উপস্থিত হন। গুরুভাইদ্বয় তুরীয়ানন্দ ও শিবানন্দের সহিত দীর্ঘদিন পরে তাঁহার মিলন ঘটে, সবাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন।

ব্রহ্মানন্দের সাধন পিপাসা তখনো পূর্ব্ববৎ তীব্র রহিয়া গিয়াছে। মনে সঙ্কল্প করিয়াছেন, ঠাকুরের সহিত অবস্থানের কালে যে দিব্য আনন্দের স্রোতে সদা নিমগ্ন থাকিতেন, সাধনার ফলে সেই প্রেম-মধুর অনুভূতি জাগ্রত না হওয়া অবধি বৃন্দাবন তিনি ত্যাগ করিবেন না। আবার তাই সেই বৃন্দাবনেই ফিরিয়া আসিলেন, শুরু করিলেন কঠোর তপশ্চর্য্যা।

ধ্যান-ভজনের মধ্য দিয়া দিনের পর দিন তাঁহার কাটিয়া যায়। মাধুকরী বা ভিক্ষার জন্য কুটির হইতে এক পা-ও বাহিরে যাইতে মন সরে না। একেবারে অজগর বৃত্তি। ঈশ্বরের কৃপায় যে দিন যে আহার্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই হয় তাঁহার ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি।

একদিন আসনে বসিয়া নিভৃতে একমনে তিনি জপ করিতেছেন। এসময়ে পুণ্যকামী এক শেঠ অযাচিতভাবে একখানি কম্বল তাঁহার গায়ে চড়াইয়া দিয়া চলিয়া যায়। ক্ষণপরেই সেখানে উপস্থিত হয়

এক তস্কর। কোন কিছু না বলিয়া অতি সন্তর্পণে সেই কম্বলটি খুলিয়া নিয়া দ্রুতপদে সে সরিয়া পড়ে। ব্রহ্মানন্দ মৌন হইয়া জপ করিতেছেন। তস্করের কুকর্ম্ম সবই লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু একেবারে রহিলেন নির্ব্বিকার। মনে মনে ভাবিলেন, ইহা মহামায়ার লীলা ছাড়া আর কিছু নয়, এক হাতে দান করিয়া আর এক হাতে তিনিই এটি করিলেন অপসারিত।

রামকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করার পর হইতেই ব্রহ্মানন্দ বিরহ-বেদনায় অধীর হইয়া রহিয়াছেন। হৃদয়ের মধ্যে অহর্নিশ গুমরিয়া উঠিতেছে একটা বিরাট আর্ত্তি ও হাহাকার। এই আর্ত্তি এই হাহাকার কি করিয়া দূর হইবে, দিব্য আনন্দে দেহ-মন-প্রাণ কবে হইবে পরিপ্লাবিত তাহা জানেন শুধু জীবনবিধাতা। নিজ জীবনের নৈরাশ্য ও অব্যক্ত বেদনার অবসান ঘটানোর জন্যই দিনরাত ধ্যান-ভজনের মধ্যে তিনি নিমজ্জিত থাকিতে চাহিতেছেন। বৈরাগ্যময় তপস্যাকে তাই এমনভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন।

বৃন্দাবন ধামে তখন রাসযাত্রার বড় ধুমধাম। ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রহ্মানন্দ লালাবাবুর কুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছেন। সুসজ্জিত রাসমঞ্চে কৃষ্ণ-রাধার বিগ্রহ বিরাজিত। ভক্ত ও সেবকেরা ভাবাবেশে মত্ত হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। দূর হইতে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে ব্রহ্মানন্দ সেদিকে তাকাইয়া আছেন, প্রেমভক্তি-রসের ধারায় হৃদয় হইতেছে অভিসিঞ্চিত।

হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, মঞ্চের সম্মুখে উপবিষ্ট প্রধান বাবাজীটি ইশারা দিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন।

কাছে যাইতেই বাবাজী তাঁহাকে পরমযত্নে নিজের পাশে বসাইয়া দিলেন। ব্রহ্মানন্দ তখন কীর্ত্তনের আনন্দে আত্মহারা, অন্যদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর তাঁহার নাই। এক একবার ভাব-তন্ময়তার ফলে বাহ্য চেতনা লোপ পাইবার মতো হইতেছে।

রাস উৎসবের ভক্তদের এত হৈ-চৈ ও নর্ত্তন-কীর্ত্তনের মধ্যেও বাবাজী কিন্তু প্রশান্ত মনে তাঁহার জপে নিরত রহিয়াছেন। শুধু

তাহাই নয়, অপরিচিত তরুণ সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দের দিকেও তাঁহার সস্নেহ দৃষ্টি রহিয়াছে নিবদ্ধ। যতবারই ব্রহ্মানন্দের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়, ততবারই বাবাজী নিজের জপমালার মেরুটি তাঁহার ললাটে স্পর্শ করাইয়া দেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ উদ্দীপিত হইয়া উঠেন দিব্য আনন্দের তরঙ্গে।

ব্রহ্মানন্দের এবারকার বৃন্দাবন-বাস ও তপস্যার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে তাঁদের ভক্তেরা লিখিয়াছেন, "এইরূপ কঠোর সাধন-ভজন ও তন্ময়ভাবে থাকিতে থাকিতে একদিন তাঁহার অন্তরলোক সহসা দিব্য আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া আনন্দরসে প্লাবিত হইয়া উঠিল। মনের যে অশান্তি, যে অভাব, যে দুঃখ-নৈরাশ্য তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল তাহা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল। গভীর প্রশান্তি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পাইল এবং আনন্দের নির্ঝর যেন নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চাবিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমগ্র বিশ্ব এক অতীন্দ্রিয় ভাবস্পন্দনে স্পন্দিত হইল[১]।"

ব্রহ্মানন্দের সাধনজীবনে সহজ আনন্দের স্রোত আবার ফিরিয়া আসে। আনন্দময় ঠাকুরের কথা, তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভক্ত-শিষ্যদের কথা, ভাবিয়া হৃদয় হয় নবভাবে উদ্দীপিত। অতঃপর বৃন্দাবন ছাড়িয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়া সারা দেশে এক নূতন প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছে, নূতন আধ্যাত্মিকতার জোয়ার বহিতেছে। বিশেষ করিয়া কলিকাতার আকাশ-বাতাস তখন বিবেকানন্দের জয়গানে ভরপুর। আলম বাজারে তখন কত লোকজনের আনাগোনা। কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী রামকৃষ্ণভক্তদের দর্শনের জন্য। তাঁহাদের উপদেশ নিয়া জীবন গঠনের জন্য, আদর্শবাদী যুবকেরা দলে দলে আসিতেছে।

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দৃশ্যপটের এ পরিবর্তন দেখিয়া ব্রহ্মানন্দের আনন্দের সীমা নাই। বুঝিলেন, লগ্ন উপস্থিত—প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণ মুষ্টিমেয় ভক্ত-শিষ্যদের জীবনে যে দীপালোক জ্বালাইয়া গিয়াছেন, এবার তাহা ছড়াইয়া পড়িবে দিগ্‌বিদিকে। যাঁহারা ঠাকুরের কৃপাধন্য, অনন্য নিষ্ঠায় যাঁহারা ঠাকুরকে জ্ঞান করিয়াছেন পরমাশ্রয়রূপে, এবার তাঁহাদের প্রস্তুত হইতে হইবে চরম ত্যাগের জন্য, তাঁহার কাজে দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য।

সেদিন বলরাম বসুর ভবনে বসিয়া গুরুভাই যোগানন্দ ও প্রেমানন্দকে কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "ঠাকুরের কৃপায় বৃন্দাবনে পরম আনন্দে ছিলুম। এবার যাতে মঠের সবাকার ভেতর ঠাকুরের সেই প্রেমভক্তির ভাব বিকাশ পায়, যাতে তাদের দেখে ঠাকুরের কথা সবাই স্মরণ করতে পারে, তাই তো বৃন্দাবন ছেড়ে তাদের সেবা করতে এলুম। এমন সময়, এই যুগ তো আর সহজে মিলবে না।"

আন্তরিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ে ভরা ব্রহ্মানন্দের এই কথাকয়টি। শুধু তাহাই নয়, তিনি যে তাঁহার সর্ব্বশক্তি নিয়া ঠাকুরের ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য এবার বদ্ধপরিকর তাহাও সেদিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল গুরুভাইদের চোখে।

বিশ্ব-ধর্ম্মসভার জয়গৌরব নিয়া, পাশ্চাত্য দেশে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় ১৮৯৭ সালে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাগবাজারে পশুপতি বোসের বাড়িতে দেশবাসী তাঁহাকে সাড়ম্বর সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের বন্দোবস্ত করিয়াছে। সেখানে গিয়া স্বামীজীর কণ্ঠে ব্রহ্মানন্দ একটি মনোহর পুষ্পমালা জড়াইয়া দিলেন।

স্বামীজী তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলেন। স্মিতহাস্যে কহিলেন, "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।"

ব্রহ্মানন্দও সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল স্বরে উত্তর দেন, "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাসম পিতা।"—স্বামীজী বয়সে তাঁহা হইতে কয়েক দিনের বড়, এ কথাটি তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন।

সেই দিনই অপরাহ্নে আলম বাজার মঠে ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী কাছে ডাকাইলেন, বিদেশ হইতে সংগৃহীত টাকার ব্যাগটি তাঁহার হাতে দিয়া সবাইর উদ্দেশে কহিলেন, "এদ্দিন যার জিনিষ বয়ে বেড়িয়েছি আজ তাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।"

এই বৎসরই স্বামীজীর নেতৃত্বে বলরাম বসুর ভবনে মিলিত হইয়া ভক্তরা স্থাপনা করিলেন রামকৃষ্ণ মিশন। ইহার অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মানন্দ মহারাজের প্রেরণা ও নির্দ্দেশে মিশনের কর্ম্মীরা মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, দেওঘরে দুর্ভিক্ষের ত্রাণ কার্য্যে অবতীর্ণ হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শে বিবেকানন্দ তখন আলমোড়ায় গিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দকেই একধারে মঠ ও মিশনের সমস্ত কিছু দায়িত্ব বহন করিতে হইতেছে। অর্থ সংগ্রহ, কর্ম্মীদের পরিচালনা, তরুণ ভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবনের সাহায্য দান, সব কিছু তিনি করিতেন অনন্য নিষ্ঠায় এবং অসাধারণ দক্ষতার সহিত। কিন্তু এতকিছু বহুমুখীন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও কোনদিন তাঁহার আত্মাভিমান জাগে নাই, বাহ্যিক জীবনের সংঘাত তাঁহাকে চঞ্চল করে নাই। অপার প্রশান্তি নিয়া অচল অটল পর্ব্বতের মতো সংগঠনের স্নায়ুকেন্দ্রে তিনি সদাই থাকিতেন বিরাজিত।

স্বামীজী সে-বার ব্রহ্মানন্দকে কহেন, "রাজা, আমাদের এমন একটা সংগঠন তৈরী কর যা আপন ত্যাগে ও তেজ বার্য্যে আপনা আপনি চলে যায়, আমরা মরি বা বাঁচি তার অপেক্ষা না ক'রে এটা যেন বেঁচে থাকতে পারে।"

স্বামীজীর এই নির্দ্দেশ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও যত্নে মিশনের মধ্যে এমন একটা দক্ষতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও আত্মিক শক্তির উদ্বোধন ঘটে যাহা দীর্ঘদিন রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর বহুমুখী কর্ম্মধারাকে সঞ্জীবিত ও উদ্দীপিত করিয়া রাখিয়াছে।

কাশ্মীরে কিছুকাল অবস্থানের পর স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে

ফিরিয়া আসেন। স্বাস্থ্য তাঁহার তখন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাখাল প্রভৃতি গুরুভাইরা আতঙ্কিত হইয়া পড়েন।

গিরিশ ঘোষ এ সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি মঠে ছুটিয়া আসেন। শয্যায় পড়িয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না, স্বামীজী কোনমতে হাঁটিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গিরিশবাবু কহিলেন, "একি স্বামীজী, শুনলাম তুমি অত্যন্ত পীড়িত, তাই দেখতে এলাম। এখন দেখছি তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো।"

স্বামীজী উত্তর দিলেন, "কি করবো বল জি-সি। বিছানায় শুয়ে থেকে যতবার চোখ মেলেছি দেখেছি রাজা প্যাঁচার মতো মুখ করে সামনে বসে আছে। তাব মুখখানার ঐ ভাব দেখে আর শুয়ে থাকতে পারলুম না। তাই আস্তে আস্তে উঠে এলুম। আমি হাটছি বেড়াচ্ছি দেখে যদি রাজাব মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে।"

এমন সময়ে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহেন, "এ'কি, তুমি এভাবে উঠে এলে যে? শরীর কি কিছুটা ভাল বোধ হচ্ছে?"

গিরিশবাবুকে উদ্দেশ করিয়া স্বামীজী কহেন, "রাজা শালা আমায় রোগী করে শুইয়ে রাখতে চায়। রোগ-ফোগ কি? আমি এখন বেশ ভাল আছি।"

ব্রহ্মানন্দ স্থান ত্যাগ করার পর কথা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, "বুঝলে জি-সি, রাজার কাজ দেখে আমি কিন্তু অবাক্ হয়ে গেছি। কি সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে মঠ ও মিশনের কাজ চালাচ্ছে। রাজার রাজবুদ্ধির তারিফ অবশ্যই করতে হয়। ঠাকুর ঠিকই বলতেন--রাখালের রাজবুদ্ধি; একটা প্রকাণ্ড রাজ্য চালাতে পারে। তা ঠিক।"

গিরিশ সোৎসাহে একথায় সায় দেন,—"তা হবে না কেন? ঠাকুরেরই তো ছেলে।"

স্বামীজী হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠেন। তারপর বলেন, "ত্যাখো, রাজার স্পিরিচ্যুয়েলিটি আঁকড়ে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে

কোলে করতেন, আদর করে খাওয়াতেন, এক সঙ্গে শয়ন করতেন, তার কি তুলনা হয়? রাজা আমাদের মঠের প্রাণ— সত্যিই সে আমাদের রাজা।"

সে-বার এক ইউরোপীয় ভক্ত মঠে আসিয়া বিবেকানন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতেছেন, স্বামীজীর কাছে কোন একটি জটিল তত্ত্বের তিনি মীমাংসা চান। স্বামীজী সাহেবকে বলেন, "তুমি এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে। তাঁর কাছে গিয়ে সব খুলে বল।"

ভক্তটি ব্রহ্মানন্দেরই দ্বারস্থ হইলেন। ব্রহ্মানন্দ কিন্তু তাঁহাকে ফেরত পাঠাইলেন স্বামীজীরই কাছে, কহিলেন, "তিনি ছাড়া তোমায় এ তত্ত্ব কে বোঝাবে, বল?"

স্বামীজীর কাছে ভক্তটি আবার যাইতেই তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তবে শোন ওঘরে বসে আছেন যে ব্রহ্মানন্দ তিনি হচ্ছেন একটি সক্রিয় ডায়নামো—আধ্যাত্মিক শক্তি সদাই নিঃসৃত হচ্ছে তার ভেতর থেকে। আর আমরা এখানকার সবাই হচ্ছি তাঁরই অধীনস্থ। তুমি তাঁকে ভাল করে চেপে ধর—কাজ হবে।"

ব্রহ্মানন্দ বুঝিলেন, বিদেশী ভক্তটি একজন প্রকৃত সত্যান্বেষী। এবার সযত্নে কাছে বসাইয়া জটিল সমস্যার সমাধান তিনি অবলীলায় করিয়া দিলেন। ভক্তটির আনন্দ আর ধরে না। তখনই স্বামীজীর কক্ষে গিয়া বার বার জ্ঞাপন করেন তাঁহার কৃতজ্ঞতা। বলেন, "আমার ভারতে আসা সার্থক হয়েছে, স্বামী ব্রহ্মানন্দের কৃপায় সত্য বস্তু কি, তা আমি বুঝতে পেরেছি।"

১৮৯৯ সালে রামকৃষ্ণ মঠ বেলুড়ের নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। তারপর একদিন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রাণপ্রিয় রাজাকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান। এসময়ে গুরুভাইয়ের সমক্ষে যুক্তকরে ব্রহ্মানন্দের কাছে নিবেদন করেন, "রাজা, তোর আদর শুধু ঠাকুরই যে জানতেন। আমরা কি জানি যে তোর প্রকৃত সমাদর করবো?"

দ্বিতীয়বার আমেরিকা ও ইউরোপ সফর করিয়া স্বামীজী দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তারপর অল্প দিনের মধ্যেই রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করেন ব্রহ্মানন্দের উপর। স্নেহপূর্ণ নয়নে স্বামীজী তাঁহাকে কহেন, "রাজা, আজ থেকে এসবই তোর। আমি কেউ নই।"

বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ দুজনেরই প্রকৃতি ও গুণাবলী ছিল ভিন্ন রকমের। কিন্তু দুই জনেই ছিলেন অতি অন্তরঙ্গ, পরস্পরের প্রতি একান্তভাবে নির্ভরশীল ও বিশ্বাসসম্পন্ন। আব সর্ব্বোপরি তাঁহাদের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য হইয়া উঠিয়াছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের একাত্মকতার মধ্য দিয়া।

রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সংগঠনে, রামকৃষ্ণের তত্ত্ব প্রচারে স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দ দুইজনেই ছিলেন দুইজনের পরিপূরক। তাঁহাদের যুগ্মশক্তি ও যুগ্ম প্রতিভা তাই এদেশের অধ্যাত্মজীবনের কল্যাণে এমন সার্থক হইতে পারিয়াছিল।

"স্বামীজী ছিলেন দৃপ্ত সিংহের মতো তেজস্বী, সাগরের মতো অপার, গভীর জ্ঞানবৈরাগ্য ও বিদ্যাবুদ্ধির আধার, তারুণ্য শক্তির দুকূলপ্লাবী উত্তাল উদ্বেল তরঙ্গে সতত চঞ্চল. আর মহারাজ ছিলেন ধীর প্রশান্ত অচঞ্চল, আকাশের মতো উদার, অপরিমেয়. অসীম ভাবতন্ময়, কমনীয় বালস্বভাবের মাধুর্যে কোমল। একজন ছিলেন প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক কর্ম্মশক্তির দীপ্যমান ভাস্কর, অপরে ছিলেন অন্তর্মুখী ভাবদ্যুতির বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতি। একজনের বাণী প্রাণস্পর্শী বিদ্যুৎবাহী শক্তিকণা, অপরের অন্তঃসলিলা ফল্গুর পূতপ্রবাহ। একজনের বিশাল আকর্ণবিস্তৃত নয়নে বিশ্বগ্রাসী প্রেমপূর্ণ প্রখর দিব্য তেজ। অপরের ধ্যানস্তিমিত লোচনে সকরুণ, অপার্থিব, ঠাকুরের কথায়—'ফ্যালফেলে দৃষ্টি, যেন ডিমে তা দিচ্ছে'[১]।'

দ্বিতীয় বারে আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া স্বামী

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত

বিবেকানন্দ একদিন ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য গুরুভাইদের বলেন, "প্রথম বারে পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে ওদের সঙ্ঘবদ্ধতা দেখে বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, তাদের সব প্রতিষ্ঠানের ভিতর ব্যবসাদারী বুদ্ধি,—আর নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ভরে রয়েছে। নিজের নিজের প্রাধান্য আর ক্ষমতার লোভে যেন সবাই তারা সদাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। গরীব দুর্ব্বলদের পিষে ফেলে ধনীরা নিজেদের সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের যোগাড় করে নিচ্ছে। এই দেখে এবার জ্ঞান হল—ওসব যেন সাক্ষাৎ নরক।"

ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ত্যাগপূত আদর্শ ও প্রেমভক্তির ভিত্তিতে মঠের কাজকর্ম্ম চলিতেছে, ভক্ত ও কর্ম্মীরা নিঃস্বার্থভাবে জীব সেবায় ব্রতী হইয়াছে, ইহা দেখিয়া স্বামীজী খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

মিশনের তরুণ কর্ম্মীদের অধ্যাত্ম-জীবন যাহাতে সুগঠিত হয়, কর্ম্মব্রত উদ্‌যাপনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ঈশ্বরভজন ও ঈশ্বরনিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়, সেদিকে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। ত্যাগ বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক ধৃতি দৃঢ় না হইলে, ঈশ্বরপ্রেমের আনন্দ-রস হৃদয়ে ওতপ্রোত না হইলে, মঠ মিশনের কাজে স্বার্থবুদ্ধি, ঐহিকতা ও অহমিকা আসিবে, সঙ্ঘের ভিত্তি ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, ইহা ব্রহ্মানন্দ জানিতেন। তাই সর্ব্বসময়ে তরুণ সাধুদের তিনি যোগাইতেন ঈশ্বরীয় প্রেরণা ও সাধন-ভজনের উদ্দীপনা।

কর্ম্মীদের উপদেশ দিতে গিয়া মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "মনের গোলমালের জন্য ধ্যান-জপ হয় না। কাজের জন্য ধ্যান-জপের সময় পাওয়া যায় না, মনে করা ভুল। ওয়ার্ক অ্যাণ্ড ওয়ারশিপ—কর্ম্ম এবং উপাসনা একসঙ্গে করবার অভ্যাস করতে হবে। কেবল সাধন-ভজন নিয়ে থাকতে পারলে ভাল, কিন্তু কয়জনে তা পারবে? কিছু না করে অজগরবৃত্তি অবলম্বন করে থাকে এক সম্পূর্ণ জড়বুদ্ধি

লোকেরা অর্থাৎ যাদের মস্তিষ্ক খাটাবার কোনই শক্তি নেই, কোন রকমে বেঁচে থাকে, তারাই পাবে—আর পাবেন মহাপুরুষরা যাঁরা সকল কর্মের পার। গীতায় আছে, কর্ম না করে জ্ঞানলাভ হয় না। কর্মের মধ্যে দিয়ে যেতেই হয়। যারা কর্ম ছেড়ে দিয়ে সাধনভজন করে, তাদেরও ঝুপড়ি বাঁধতে আর রান্না করতে সময় কেটে যায়। কর্ম ঠাকুর স্বামীজির—এই ভাব নিয়ে করলে কোনো বন্ধন তো হবেই না, অধিকন্তু তার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক, নৈতিক মানসিক, শারীরিক সব রকমের উন্নতি হবে। তাঁদের পায়ে আত্মসমর্পণ ক'র। শরীর মন সব তাঁদের পায়ে দিয়ে দাও।"

মানুষের মনস্তত্ত্ব ও মনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে মহারাজ অভিজ্ঞ ছিলেন। এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নবীন সাধকদের উদ্দেশে বলিতেন[১]:

"মন খাটিতে চায় না, সকল সময় সুখ খোঁজে। কিছু পাইতে হইলে খাটিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় অভ্যাস দৃঢ় করিবার জন্য জোর করিয়া ধ্যান-জপাদি করিতে হয়। যদি অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে কষ্ট বোধ হয়, শুইয়া জপ করিবে, ঘুম পাইলে বেড়াইয়া বেড়াইয়া করিবে। এইরূপে অভ্যাস দৃঢ় ও ধাতস্থ করিয়া লইতে হইবে। ইচ্ছা হইলেই কি ছাড়িয়া দিতে হইবে? এইরূপভাবে চলিলে কোনদিনও অভ্যাস দৃঢ় হয় না। মনের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করা চাই। এইরূপ চেষ্টার নামই সাধন। মনকে বশে আনাই সাধন পথের লক্ষ্য।"

পৃথিবীতে সৎ অসৎ দুই আছে এবং থাকিবে। এসম্পর্কে নবীন সাধনার্থীদের তিনি দার্শনিক মনোভাব অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেন। বলিতেন, "সৎভাবের লোক উপকার করেই যাবে, এ তাদের স্বভাব। দুষ্টলোক অনিষ্ট করবে, সেও কিন্তু তাদের স্বভাব। 'একজন সাধু নদীর ধারে বসে ধ্যানজপ ভজন করত। একদিন

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ: পত্রাবলী

একটি বিছে জলে ভেসে যাচ্ছে দেখে তার মনে দয়া হল এবং হাতে ধরে বিছেটাকে জল থেকে পারে তুলে দিলে। বিছেটাকে যেমনি ধরতে গেছে, অমনি সে হাতে কামড়ে দিয়েছে। সাধুটি তখন যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে বিছেটা আবার জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। তা দেখে সাধুটি আবার তাকে পারে তুলে দিলে -বিছেটা আবার তাঁকে কামড়ে দিলে। কিছুক্ষণ পরে বিছেটা আবার জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখে সাধুটি যখন তাকে ফের তুলতে যাচ্ছে, তখন এক ব্যক্তি বললে,—'দেখুন বিছেটা আপনাকে বার বার কামড়ে দিচ্ছে, আর আপনি ফের তাকে তুলতে যাচ্ছেন? তার কথা শুনে সাধুটি জবাব দিলে, 'বিছের স্বভাব কামড়ানো, সে কামড়াচ্ছে; সাধুর স্বভাব পরোপকার করা, আমি তাই করব। সে আমাকে কামড়েছে বলে আমি নির্দয় হব কেন?' এই বলে আবার বিছেটাকে জল থেকে তুলে অনেক দূরে ফেলে দিলে, যাতে আর না জলে পড়তে পারে। যাদের সৎস্বভাব, তারা এইরূপই করে যাবে—তারা কখনও নিজের স্বভাব ছাড়ে না।"

তরুণ ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মানন্দের কণ্ঠে যে আশা ও উৎসাহের বাণী শুনিতেন, তাহা অপূর্ব্ব। তিনি বলিতেন, "উঠে পড়ে লেগে বস্তু লাভ করে নে। মনটাকে ঠিক কম্পাসের কাঁটার মতো করতে হবে; জাহাজ যে দিকেই যাক না কেন, কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকেই থাকে। তাই জাহাজের দিক্ ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তাহলে তারও আর কোন ভয় থাকে না। হাজার কুলোকের মধ্যে পড়লেও তার বিশ্বাস ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবৎকথা হলেই সে ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। কি রকম জানিস্? যেমন চক্‌মকি পাথর শত বৎসর জলের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার আগুন নষ্ট হয় না—তুলে লোহার ঘা মারা মাত্রই আগুন বেরোয়, সেই রকম তাঁকে লাভ করে যে ধন্য হয়েছে সে অন্য কিছুতেই মন দিতে পারে না। কেবল তাঁকে নিয়েই দিন যাপন করে। ভগবৎ কথা ও সাধু ভক্তের সঙ্গ ছাড়া তার আর কিছুই ভাল লাগে না। ঝড়ের এঁটো

পাতার মতো পড়ে থাকে, নিজের কোন ইচ্ছা বা অভিমান থাকে না, বাতাস তাকে যে দিকে নিয়ে যায় সে দিকেই যায়। সে তখন সংসারেও থাকতে পারে, আবার সচ্চিদানন্দ-সাগরেও ডুবে যেতে পারে।

"তোদের মনের স্বভাবটা যাতে পাকা হয়ে যায় তার চেষ্টা কর্। একবার অন্য রকম হয়ে গেলে আর উপায় নেই। বাসনাহীন মন কেমন জানিস? যেমন শুকনো দেশলাই -একবার ঘষলেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে। কিন্তু ভিজে গেলে ঘষতে ঘষতে কাঠি ভেঙ্গে গেলেও জ্বলে না। তেমনি মনে একবার অন্য রকম ছাপ পড়লে শত চেষ্টাতে তা নষ্ট করা যায় না।"

মঠের যুবক সাধুদের সতর্ক করিতে গিয়া তিনি কহিতেন,[১] "আসল তপস্যা তিনটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম সত্যাশ্রয়ী হতে হবে, সত্য খোঁটাকে সর্বদা ধরে থাকতে হবে, প্রত্যেক কাজে। দ্বিতীয় কামজয়ী হতে হবে। তৃতীয় বাসনা জয়ী হতে হবে। এই তিনটি পালন করতেই হবে এইগুলি জীবনে ফলানো বা সাধন করাই আসল তপস্যা। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি সবচেয়ে দরকারী, অর্থাৎ ব্রহ্মচারী হতে হবে। আমাদের শাস্ত্র বলেন, যারা বারো বৎসর কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তাদের পক্ষে ভগবান লাভ করা খুব সোজা। এরূপ হওয়া ভারী শক্ত। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের বলছি, ঠিক ঠিক ব্রহ্মচারী না হলে ঠিক ঠিক ধ্যান হওয়া অসম্ভব। সূক্ষ্ম বাসনা জয় করা ভারী শক্ত। এই জন্য সন্ন্যাসীদের এত কঠোর নিয়ম। সন্ন্যাসী কোন স্ত্রীলোকের দিকে তাকাবে না। এমন কি, ফটোগ্রাফ দেখলেও মনের উপর একটা ছাপ পড়তে পারে। মনের স্বভাব হচ্ছে কোন একটা সুন্দর জিনিস দেখলেই ভোগ করতে চায়। এইরূপে অনিচ্ছাসত্ত্বে অনেক জিনিস ভোগ করে। এটা অতিশয় হানিকর। ব্রহ্মচর্য্য পালনে ওজঃশক্তি বৃদ্ধি হবে।"

১ ধর্মপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ : কথাপকথন

একটি জিজ্ঞাসু ভক্ত ধ্যানজপ সম্পর্কে মহারাজের কাছে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাঁহার উত্তরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি লিখেন[১], "ধ্যান-জপে ও পূজা-পাঠে যত বেশী সময় দিতে পারা যায় তা কল্যাণকর। যাহারা শুধু সাধন-ভজন লইয়া থাকিতে চায়, তাহাদের অন্ততঃ ১৪।১৫ ঘণ্টা ধ্যান-জপ করা উচিত। অভ্যাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে সময় আরও বাড়িয়া যাইবে। মন যত ভিতরের দিকে যাইবে, তত বেশী আনন্দ পাইবে। ভজনে একবার আনন্দ পাইলে আর কোনমতেই ছাড়িতে ইচ্ছা হইবে না। তখন কত সময় কি করিতে হইবে—সে প্রশ্নের মীমাংসা মন নিজেই ঠিক করিয়া লইবে। মনের এইরূপ অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ⅔ ভাগ সময় যাহাতে ধ্যান-জপে কাটে, বিশেষভাবে তাহার চেষ্টা করিবে। সৎগ্রন্থ পাঠ করিবে ও ধ্যান-জপের সময় মনে কত ভাব উঠে, মন কতটা স্থির হয় ইত্যাদি বিষয় ভাবিবে। শুধু চোখ-কান বুজিয়া ঘণ্টাখানেক ধ্যান-জপ করিলেই সব হইয়া গেল না। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করা দরকার। এইভাবে চিন্তা করিলে মনের অবস্থা বিশেষভাবে বুঝা যায় এবং মনে যে সব স্ফুট উঠে সেগুলিকে ত্যাগ করিবার চেষ্টা করা যায়। এইরূপে একটি একটি করিয়া ত্যাগ করিবার পর মন যখন শান্ত হইয়া যাইবে তখনই ঠিক ঠিক ধ্যান-জপ হইবে। ধ্যান-জপের উদ্দেশ্য মনকে শান্ত করা। ধ্যান-জপ করিয়া মন যদি শান্ত না হয়, আনন্দ যদি না পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে ধ্যান-জপ ঠিক ঠিক হইতেছে না।"

ব্রহ্মানন্দকে আরও বলিতে শুনা যাইত, "যারা সাধন-ভজন করে, সব অবস্থায়ই করে। যেখানে সুযোগ-সুবিধা বেশী হয় সেখানে তারা আরও জোরে সাধন-ভজন করে। এখানে সুবিধা হচ্ছে না, ওখানে সুবিধা হচ্ছে না করে যারা বেড়ায়, তারা কোন কালে কিছু করতে পারে না, ভ্যাগাবণ্ডের মত ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে শুধু সময় নষ্ট করে।

১ পত্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ

"খুব জপ কর্ বাবা, খুব জপ কর্। কলিতে জপই হচ্ছে সহজ উপায়। এ যুগে যোগ-যাগ করা বড় কঠিন। জপ করতে করতেই মন স্থির হয়ে ইষ্টেতে লয় হয়ে যাবে। জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমূর্তি চিন্তা করতে হয়। তাতে জপ-ধ্যান দুই-ই একসঙ্গে হয়ে যায়। এভাবে জপ করতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়।

"স্মরণ-মনন খুব রাখতে হবে। জপ-ধ্যান করতে গেলে নানা সুযোগ সুবিধা খুঁজে নিতে হয়, কিন্তু স্মরণ-মননে কোন অপেক্ষা রাখে না। খেতে-শুতে, উঠতে-বসতে, সব সময়ই স্মরণ-মনন হতে পারে। দিনরাত স্মরণ-মনন রাখতে পারিস্ তো জানবি, মন অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। রামানুজের মতে, ঐরূপ অবিশ্রান্ত চিন্তার নামই ধ্যান।"

তরুণ সাধকদের শুদ্ধতা, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও পবিত্রতার উপর ব্রহ্মানন্দ মহারাজ অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। কহিতেন, "ছাখো, ঠাকুর বলতেন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। তাই বলছি, যদি আমরা তার ভক্ত, তাঁর সেবক, তাঁর দাস বলে পরিচয় দিতে চাই, তা হলে আমাদের শুদ্ধ, পবিত্র হতে হবে। শুদ্ধ হৃদয়ই তাঁর আসন। অশুদ্ধ হৃদয় থেকে তিনি অনেক দূরে থাকেন। আমাদের হৃদয় যখন কাঁচের মতো স্বচ্ছ ও নির্মল হবে—কোন দাগ থাকবে না, তখনই আমাদের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা হবে। তখনই আমরা তাঁর ভক্ত, সেবক, আশ্রিত বলবার অধিকারী।

"শুদ্ধ মনে তাঁর ছাপ সুন্দর পড়ে। আরশিতে ময়লা থাকলে যেমন মুখ দেখা যায় না, তেমনি অশুদ্ধ মনে ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে না। তোমাদের এখন অল্প বয়স, মনে কোন রকম ময়লা ধরে নি, এখন থেকে তাঁর জন্য হৃদয়ে আসন পেতে রাখ—অন্য কোন জিনিসের স্থান যেন সেখানে আর না হয়। শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন না হলে তাঁকে কখনো জানা যায় না। শুদ্ধ পবিত্র হও। তাঁকে লাভ করতেই হবে এ জীবনে।"

তপস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে এক নবীন সাধুকে তিনি লিখিতেছেন[১]
"মনকে দুষ্ট অশ্বের সঙ্গে তুলনা করেছে। দুষ্ট অশ্ব বিপথে নিয়ে যায়
যে রাশ টেনে রাখতে পারে সেই ঠিক চলে। খুব লড়াই কর
কি কচ্ছ তোমরা? গেরুয়া নিলে আর সংসার ত্যাগ করলেই বি
সব হয়ে গেল? কি হয়েছে তোমাদের?

"সময় শুধু চলে যাচ্ছে। এক মুহূর্তও নষ্ট ক'রো না। খুব জো
আর তিন চার বৎসর করতে পারবে, তারপর শরীর, মন দুর্বল হ
পড়বে। তখন আর কিছুই করতে পারবে না। না খাটলে বি
কিছু হয়? তোমরা বুঝি ভেবেছ যে আগে অনুরাগ ও ভক্তি বিশ্বা
হোক তারপর ডাকবে। তা কি কখনও হয়? অরুণোদয় না হ
কি আলো আসে? তিনি এলেই তবে প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস স
সঙ্গে আসবে। তাঁকে জানবার জন্যই তপস্যা। তপস্যা ছাড়া বি
কিছু হয়। ব্রহ্মা প্রথমে শুনেছিলেন, 'তপঃ, তপঃ, তপঃ।' দেখছ
অবতার পুরুষদের পর্য্যন্ত কত খাটতে হয়েছে! কেউ কি না খে
কিছু পেয়েছে? বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য এঁদেরও কত তপস্যা কর
হয়েছে। আহা! কি ত্যাগ, কি তপস্যা!

"বিশ্বাস কি প্রথমে হয়? রিয়েলিজেশান বা অনুভূতি হলে ত
বিশ্বাস হয়। কিন্তু তার আগে শুধু গুরু মহাপুরুষদের বাক্যে বিশ্ব
করে, এমন কি অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে এগুতে হয়। ঠাকুরের সে
ঝিনুকের কথা জানতো? স্বাতী নক্ষত্রের এক-ফোঁটা জলের জন্য
করে থাকে, ফোঁটাটা পেলেই অতল জলে ডুবে যায়, গিয়ে মুক্তা তৈ
করে। তোমরাও তেমনি গুরুকৃপারূপ এক-ফোঁটা জল পেয়েছে
যাও, ডুবে যাও।

"তোমাদের একটা আত্মবিশ্বাস নেই। সাধন পথে পুরুষাক
দরকার। কিছু কর—চার বৎসর অন্ততঃ করে দেখ দেখি। য
কিছু না হয় তবে আমার গালে একটা চড় মেরো। তমঃ র

১ পত্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ

ছাড়িয়ে সত্ত্বে যেতে না পারলে ধ্যান-জপ কিছু হয় না। তারপর সত্ত্বকেও ছাড়িয়ে চলতে হবে। এমন জায়গায় যেতে হবে যে আর আসতে না হয়। মানুষ জন্ম কত দুর্লভ। অপর প্রাণীদের জ্ঞান হয় না। একমাত্র মানুষ জন্মেই ভগবান লাভ হয় এবং তা করতে হবে। এই জন্মে খেটে-খুটে মনটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেন আর জন্মাতে না হয়। প্রথমে মনকে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, পরে সূক্ষ্ম থেকে কারণ, কারণ থেকে মহাকারণ, মহাকারণ থেকে মহাসমাধিতে নিয়ে যেতে হবে।

"আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর পাদপদ্মে ছেড়ে দাও। তিনি ছাড়া যে আর কিছু নেই। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' তিনিই সব, সবই তাঁর। কিন্তু হিসেব ক'রো না। আত্মসমর্পণ কি একদিনে হয়? সেটা হলে তো সব হয়েই গেল। সেটার জন্য খুব চেষ্টা করতে হয়। অনন্ত জীবন রয়েছে। মানুষের আয়ু বড় জোর একশ বছর; যদি অনন্ত সুখ চাও তো এই একশ বছরের সুখ ছেড়ে দিতে হবে।"

ভক্তদের প্রায়ই তিনি বলিতেন সময় থাকিতে সাধন-ভজনের কাজ গুছাইয়া নিতে—"এই জীবনের কিছুই ঠিক নেই। দশ বিশ বছর পরে শেষ হতে পারে বা আজই শেষ হতে পারে। কখন শেষ হবে তা যখন জানা নেই, তখন পথের সম্বল যত শীঘ্র করা যায় ততই ভাল। কি জানি কখন সে ডাক আসে। শেষে কি খালি হাতে অজানা, অচেনা দেশে যেতে হবে? খালি হাতে অজানা দেশে গেলে বড় কষ্ট পেতে হয়। যখন জন্মেছ তখন মৃত্যু নিশ্চয়ই হবে। মৃত্যু হলে অন্য এক দেশে যেতে হবে এটাও ঠিক। যো সো করে পথের সম্বল করে নিয়ে বসে থাকো। ডাক এলে হাসতে হাসতে চলে যাবে। কাজ গোছানো থাকলে আর কোন ভয় থাকবে না। মনে ঠিক ঠিক জানা থাকে আমাদের পথের সম্বল আছে।

"সদ্‌বাসনা মনে যখন জেগেছে, সদ্ভাবে জীবন যাপন করবার, তাঁকে জানবার ও বোঝবার সুযোগ যখন হয়েছে, তখন খেটে-খুটে বস্তু লাভ করে নাও। খুঁটি পাকড়াও। শরীর যাক্ থাক্, খুঁটি

পাকড়ানো চাই-ই চাই। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ। আমি মানুষ, আমি সব করতে পারি, এই রকম বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যাও —বস্তু পাবে, মনুষ্য জীবনের যথার্থ সদ্ব্যবহার হবে। আসা যাওয়া বড় কষ্ট। আসা যাওয়ার দফা শেষ করে ফেল। তাঁর নিত্যসাথী হয়ে যাও।

"ভয় ও দুর্ব্বলতা মন থেকে দূর করে দাও। পাপ পাপ ভেবে মন কখনও খারাপ করবে না। তাছাড়া, যত বড় পাপই হোক না কেন, লোকের চক্ষেই উহা বড়, ভগবানের দিক দিয়ে ওটা কিছুই নয়। তাঁর একটি কটাক্ষে কোটি কোটি জন্মের পাপ এক মুহূর্তে ছিন্ন হতে পারে।"

প্রেমপূর্ণ নয়নে, দৃপ্ত ভঙ্গীতে, ঈশ্বরের কৃপার প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "ওহে, তিনি যে অপেক্ষা করছেন, পাল তুলে ধরলেই নৌকা ঠিকানায় ঠিক পৌঁছে যাবে। পাল তোল, ওহে পাল তোল। শক্তি তোমাদের যথেষ্ট রয়েছে। এবার নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ — তাঁর নাম শুনেছি, তাঁর নাম করেছি, আমাতে ভয় দুর্ব্বলতা থাকতে পারে না; তাঁর কৃপায় আমি তাঁকে লাভ করবই এ জীবনে। পিছনে ফিরে তাকিও না, এগিয়ে যাও— তাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে, মনুষ্য জন্ম সার্থক হবে, অপার আনন্দের অধিকারী হবে।"

মঠের ছেলেদের মহারাজ সকল সময় চোখে চোখে রাখিতেন, তাঁহার পরমাশ্রয়ে অবস্থান করিয়া নির্ভয়ে তাঁহারা গঠন করিত সাধনময় ও সেবাময় জীবন। মহারাজ বলিতেন, "তোদের এত বলি কেন জানিস? আমাদের যখন তোদের মতো বয়স ছিল, ঠাকুর আমাদের জোর করে সাধনা করিয়ে নিতেন। ছেলেবেলা কাঁচা মাটির মতন স্বভাবটা থাকে কিনা, তাই যেটা সামনে পায় সেইটাকেই আঁকড়ে ধরে। নরম মাটিতে যা ইচ্ছে হয় গড়—সব জিনিসই তৈরী করতে পারা যায়। একটি জিনিস তৈরী কর, তাকে ভেঙ্গে ফেলে

আবার অন্য জিনিস তৈরী কর। যতক্ষণ মাটি কাঁচা থাকে তাতে যেরূপ ইচ্ছে গড়ন করা যায়। কিন্তু এ মাটিকে আগুনে পোড়াবার পর আর কোন রকম গড়ন হবে না। তোদের মন এখন কাঁচা মাটির মতো। এখন যে ভাবে গড়বি সে রকম হবে। মন এখন শুদ্ধ পবিত্র আছে—অল্প চেষ্টাতেই ভগবানের দিকে যাবে। মনটা এখন থেকে বেশ করে ভগবানে লাগিয়ে রাখলে অন্য কোন ভাব ঢুকতে পারবে না। তাঁর ভাবে মন যদি একবার পাকা হয়ে যায়, আর কোন ভাবনা নেই।

"মন সরষের পুঁটুলির মতো। সরষের পুঁটুলি খুলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়লে কুড়িয়ে তোলা যেমন শক্ত, বয়স হলে মন যখন সংসারে ছড়িয়ে পড়বে তখন সে মনকে গুটিয়ে এনে ঈশ্বরীয় বিষয়ে লাগানও তেমনি শক্ত। তাই তোদের বলি, ছড়িয়ে যাবার আগে মনটা গড়ে নে। খুঁটি বেশ পাকা করে নে। এরপর বেশী বয়স হলে মন যখন সংসারে ছড়িয়ে যাবে, তখন সদ্ভাবে মন লাগাতে খুব বেগ পেতে হবে —কষ্ট পেতে হবে। ষোল বৎসর থেকে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যা করবার করে নিতে হবে।"

ঠাকুরের কথা প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ এক ভক্তকে লিখিয়াছেন,[১] "ভগবানের জন্য যে সব ছেড়েছে, ভগবানের উপর তার একটা জোর আছে। বাপ-মার কাছে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে যেমন জোর করা যায়, আব্দার করা যায়, তাঁকেও তেমনি জোর করে বলা যায়—দেখা দাও, দেখা দিতেই হবে। তখন তিনি দৌড়ে আসেন, কোলে তুলে নেন। তার কোলে উঠলে যে কি আনন্দ, তা সেই জানে যাকে তিনি কোলে তুলে নিয়েছেন। সে আনন্দের কাছে মানুষ যাকে আনন্দ বলে তা তুচ্ছ হয় -আলুনী লাগে। ঠাকুর আরও বলতেন, 'যাঁরা তাঁর জন্য ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করেছে, তারা বারআনা রাস্তা এগিয়ে গেছে।' দেহসুখ ত্যাগ করা কি সোজা রে? তাঁর অনেক

১ পত্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ

*

কৃপা থাকলে, পূর্ব্ব জন্মের অনেক তপস্যা থাকলে তবে মানুষ সেই শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী হয়। মনটাকে এমনভাবে তৈরী করতে চেষ্টা কর যেন ওসব বাসনা মনে আদৌ উঠতে না পারে। এইভাবে জীবন কাটান বড় শক্ত। এখন ছেলেমানুষ বলে যত সোজা মনে করছিস তত সোজা নয়। এ অবস্থাটা কি রকম জিনিস?—খোলা তরোয়ালের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। প্রত্যেক মুহূর্তে কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া এ রাস্তায় চলা যায় না। ভগবানে ভালবাসা ও বিশ্বাস না হলে ব্রহ্মচর্য্য রাখা বড় শক্ত। ভোগ বিলাসপূর্ণ জগতে থাকতে হবে, চোখের সামনে শতকরা নিরানব্বই জনেরও বেশী লোক ভোগের পিছনে পিছনে দৌড়ুচ্ছে; এই সব নিত্য দেখতে হবে, এইসব দেখে শুনে মনের মধ্যে নানা রকম ছাপ পড়বার খুবই সম্ভাবনা। এই সব ছাপ যদি একবার কোনরকমে পড়ে আর রক্ষা নেই। যারা ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করতে চায়, তাদের সদা সর্ব্বদা নিজের মনকে সৎ বিষয়ে নিযুক্ত করে রাখতে হবে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সৎ বিষয়ে আলোচনা, ঠাকুর সেবা, সাধু সেবা, সাধুসঙ্গ ও জপধ্যান নিয়ে থাকতে হবে। একমাত্র এই উপায়েই নিজেকে তৈরী করা যেতে পারে।

"প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যে নিষ্ঠা পাকা করবে—বাকী সব আপনি এসে যাবে। সাধনা না করলে ব্রহ্মচর্য্য ঠিক রাখা যায় না। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই ভগবান লাভ হয়। ভগবান লাভ না হলে মনুষ্যজন্ম বৃথা গেল। তাঁর দর্শন হলে তবেই আনন্দ। ছেলেমানুষ তোরা, সৎ বুদ্ধি, সৎ মন তোদের। একটু চেষ্টা কর্। অল্প চেষ্টাতেই ভক্তি-বিশ্বাস জেগে উঠবে।"

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া মঠের কঠোর সন্ন্যাস জীবন তরুণেরা নিয়াছে, তাঁহাদের যাহাতে পরমার্থ লাভ হয় এজন্য ব্রহ্মানন্দের ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। তাহাদের কহিতেন[১], "ভগবান লাভের

১ পত্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ

জন্য ঘর-দোর ছেড়ে এসেছিস্, তাঁকে লাভ করবার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে প্রাণপণ চেষ্টা চাই। পাগলা কুকুরের মতন ভগবানের জন্য 'হন্তে' হতে হবে। চারটি ডাল ভাত খেয়ে মঠে শুধু পড়ে থাকা মানে অত্যন্ত হীনভাবে জীবন যাপন করা—না হল এদিক, না হবে ওদিক, একুল ওকূল দুকুল গেল! ইতো নষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হবে। আর মন যদি তাঁতে বসতে না চায়, অভ্যাস রাখতে হবে। রোজ এক অধ্যায় করে গীতাপাঠ দরকার। আমি নিজে দেখেছি, মন যখন নীচে নামে, একটু গীতাপাঠ করলে সেগুলো একেবারে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেয়। চারটি ডাল ভাত খেয়ে পড়ে থাকাই তো ইতো নষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ।

"প্রত্যহ মনকে খোঁচাতে হবে। কি করতে এসেছি, কি করে দিনটা গেল? বাস্তবিকই কি ভগবানকে আমার চাই? চাই যদি তো করছি কি? বুকে হাত দিয়ে বল্ দেখি চাওয়ার মতো কাজ করেছিস কিনা? মন ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে। তার গলা টিপে ধরতে হবে, ফাঁকি না দিতে পারে। সত্যকে ধরতে হবে—পবিত্র হতে হবে। যতই পবিত্র হবে ততই মনের একাগ্রতা বাড়বে ও মনের সূক্ষ্ম ফাঁকিগুলো ধরা পড়বে, আর সেগুলি সম্পূর্ণরূপে নাশ পাবে। 'কে শত্রবঃ সন্তি নিজেন্দ্রিয়ানি। তান্যেব মিত্রাণি-জিতানি যানি।' এই মনই নিজের শত্রু আবার এই মনই নিজের মিত্র। যে যত বিশ্লেষণ করে, জেরা করে, মনের এই গলদ বের করে তার সম্যক্ নাশ করতে পারবে, সে তত দ্রুত সাধনরাজ্যে এগিয়ে যাবে।

"খুব জপধ্যান করবি। প্রথম প্রথম মন স্থূল বিষয়ে থাকে। ধ্যানজপ করলে তখন সূক্ষ্ম বিষয় ধরতে শিখে। শীতকালই তো ধ্যানজপের সময়, আর এই-ই বয়স। 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং' —বলে বসে যা। সত্যই ভগবান আছেন কি না একবার দেখে নে না। একটু একটু তিতিক্ষা, যেমন অমাবস্যা একাদশীতে একাহার, করা ভাল। বাজে গল্পটল্প না করে সারাদিন তাঁর স্মরণ-মনন করবি। খেতে, শুতে, বসতে—সর্ব্বক্ষণ। এইরূপ করলে দেখবি

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ক্রমে ক্রমে জাগবে। স্মরণ-মননের চেয়ে কি আর জিনিস আছে? মায়ার পর্দা একটার পর একটা খুলে যাবে। নিজের ভেতরে যে কি অদ্ভুত জিনিস আছে দেখতে পাবি—স্ব-প্রকাশ হবি।"

স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এই দুই গুরুভাই-এর আকৈশোর বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা ও প্রেম ছিল এক দর্শনীয় বস্তু। আবার দুইজনের মধ্যে কলহ, মান-অভিমান ও কান্নাকাটিও কম দেখা যাইত না। গোলযোগটা প্রায়ই স্বামীজীই শুরু করিতেন। শেষের দিকে, রোগে ভুগিয়া ও অতিরিক্ত শ্রমজনিত অবসন্নতার ফলে স্বামীজীর মেজাজ কিছুটা খিট্‌খিটে হইয়া যায়। এ সময়ে তাঁহার ঝামেলা ও চেঁচামেচি ব্রহ্মানন্দকেই সহ্য করিতে হইত বেশী, আর ইহা তিনি করিতেন স্বামীজীর প্রেমের আকর্ষণে, নিজের ঔদার্য্য ও প্রশান্তির গুণে।

সে-বার বলরাম বসুর ভবনে স্বামীজী এবং ব্রহ্মানন্দ দুই জনেই অবস্থান করিতেছেন। ডায়াবিটিজ্ রোগে স্বামী বিবেকানন্দ তখন খুব পীড়িত। ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য গুরুভাইদের এজন্য উদ্বেগের অবধি নাই। রাত্রে স্বামীজী প্রায়ই ঘুমাইতে পারেন না, সেদিন ক্লান্ত হইয়া দুপুরে নিজের ঘরে শয়ন করিয়া আছেন। এমন সময় স্বামীজীর মাতার পুরানো দাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

ব্রহ্মানন্দকে সে প্রশ্ন করে, "হ্যাঁগা, আমাদের নরেন কোথায় রয়েছে, বল তো।"

ব্রহ্মানন্দ জানান, "তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন। শরীর অসুস্থ, কাল সারা রাত ঘুম হয় নি। তুমি বরং আর একদিন এসো।" একথা শুনিয়া দাসী সেখান হইতে চলিয়া গেল।

নিদ্রাভঙ্গের পর বিবেকানন্দকে একথা জানানো হয়। ক্রোধে তিনি গর্জ্জিয়া উঠেন, ব্রহ্মানন্দকে কহেন, "তোর কি কিছুমাত্র

কাণ্ডজ্ঞান নেই ? ঝি কি এমনি শুধু শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো ? নিশ্চয় মা তাকে কোন জরুরী কাজের ভার দিয়ে এখানে পাঠিয়েছিলেন।"

সঙ্গে সঙ্গে বর্ষিত হয় প্রচুর তিরস্কার ও কটূক্তি। তখনি একটা ঘোড়ার গাড়ী ডাকাইয়া স্বামীজী তাঁহার জননীর সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়া গেলেন।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া শুনিলেন, মা ঐ ঝিকে তাঁহার নিকট পাঠান নাই। ও পাড়ায় তাহার কি যেন এক কাজ ছিল, সেই সুযোগে নরেনের সঙ্গেও সে দেখা করার চেষ্টা করিয়াছে।

একথা শোনা মাত্র স্বামীজীর অনুতাপের আর সীমা রহিল না। তৎক্ষণাৎ জননীর নাম করিয়া ব্রহ্মানন্দের জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। ব্রহ্মানন্দ সেখানে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অনুতপ্ত স্বরে কহিলেন, "রাজা, আমি বড় অন্যায় করেছি। অযথা তোকে এত গালমন্দ দিয়েছি। কেবল তুই বলেই ওরকম কটু কথা আমি বলতে পেরেছি।"

ব্রহ্মানন্দের দুঃখ ও অভিমান ততক্ষণে দূর হইয়াছে। একগাল হাসিয়া এবার স্বামীজীকে প্রবোধ দিবার জন্যই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

স্বামীজীর ইচ্ছা, বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরের কিছুটা অংশে পোস্তা বাঁধানো হোক, এবং একটা ঘাট তৈরী করা হোক। বিজ্ঞানানন্দ প্রাক্তন ইন্‌জিনিয়ার, তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ত্যাখো তাড়াতাড়ি এর একটা প্ল্যান আর খরচের এষ্টিমেট দাও।"

বিজ্ঞানানন্দ ভয়ে ভয়ে কম করিয়াই ব্যয়বরাদ্দ স্থির করিলেন। কহিলেন, "তিন হাজার টাকাতেই এটা হয়ে যাবে।"

ব্রহ্মানন্দের উপর টাকা সংগ্রহ ও কাজকর্ম্ম দেখাশুনার ভার, কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু দেখা গেল, পূর্ব্বের ব্যয়বরাদ্দ আর ঠিক থাকিতেছে না। স্বামীজীর ভয়ে বিজ্ঞানানন্দ ভীত হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মানন্দ আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তা আর কি করা যাবে ? কাজে

যখন হাত দেওয়া হয়েছে, খরচ বেশী হলেও শেষ করতেই হবে। এজন্য তুমি ভেবো না। কাজ যাতে ভালো হয় তাই কর।"

স্বামীজী একদিন খোঁজখবর নিতে গিয়া দেখেন, এষ্টিমেটের চাইতে ব্যয় ইতিমধ্যে বেশী হইয়া গিয়াছে এবং কাজ এখনো অনেক বাকী। ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন; তীব্র ভাষায় ব্রহ্মানন্দকে করিতে লাগিলেন গালিগালাজ।

স্বামীজী সেখান হইতে চলিয়া গেলে মর্ম্মাহত ব্রহ্মানন্দ নিজের ঘরে গিয়া দুয়ার বন্ধ করিলেন।

এবার স্বামীজীর হুঁস হইল, প্রিয়তম গুরুভাইকে অযথা কি মনোব্যথাই না তিনি দিয়াছেন। অখণ্ডানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "পেশন, শিগ্‌গীর যাও তো একবার, দেখে এসো রাজা কি করছে। আহা তাকে কি কটু কথাই না বলেছি।"

অখণ্ডানন্দ ঘরে ঢুকিয়া দেখেন ব্রহ্মানন্দ শয্যায় মুখ গুঁজিয়া অঝোর ধারে কাঁদিতেছেন। এ সংবাদ স্বামীজীর কাছে পৌঁছিল, তখনি উন্মাদের মতো তিনি ছুটিয়া আসিলেন ব্রহ্মানন্দের কক্ষে। তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন, "রাজা, রাজা, আমায় তুই ক্ষমা কর। কি ঘোর অন্যায় আমি করেছি। তোকে অনর্থক গালাগালি দিয়েছি। আমায় তুই ক্ষমা করলি কিনা বল।"

ব্রহ্মানন্দের মনের ক্ষোভ দুঃখ কোথায় চলিয়া গেল, ক্রন্দনরত স্বামীজীকে সান্ত্বনা দিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, "তুমি কেন এমন উতলা হয়েছো? আমায় গালাগাল দিয়েছো, তাতে কি হয়েছে? আমায় এত ভালবাসো বলেই তো গাল দিতে পেরেছো। তুমি শান্ত হও।"

স্বামীজীর অনুশোচনার অন্ত নাই। প্রবোধ বাক্য শোনার পরেও অশ্রু ছলছল নয়নে কহিতে থাকেন, "না, না রাখাল, তুই আমায় ক্ষমা কর্। ঠাকুর তোকে কত আদর করতেন, কখনো একটা কড়া কথা তোকে তিনি বলেন নি। আর আমি কিনা ছাই কাজের জন্য তোকে এত গালাগালি করলুম—মনে কষ্ট দিলুম।

আমি আর তোদের সঙ্গে থাকার যোগ্য নই। চলে যাই হিমালয়ে। কোথাও নির্জ্জনে গিয়ে থাকবো।"

ব্রহ্মানন্দ ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলেন, "ওসব কি কথা তুমি বলছো। তোমার গালাগালি যে আমাদের আশীর্ব্বাদ। তুমি কোথায় চলে যাবে? তুমি যে আমাদের মাথা। তুমি চলে গেলে আমরা থাক্‌বো কি নিয়ে?"

বহিরঙ্গ জীবনের অন্তস্তলে এমনি এক গভীর প্রেমের ফল্গুধারা উভয়ের মধ্যে ছিল প্রবাহিত। এক একদিনের আকস্মিক ঘটনায় ইহার প্রকাশ দেখিয়া ভক্ত-শিষ্যেরা অবাক হইয়া যাইতেন।

আর একবার স্বামীজীর কঠোর তিরস্কারে ব্রহ্মানন্দ মনে নিদারুণ আঘাত পাইলেন। ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন, না এই ঝামেলা আর পোহাইবেন না, দু চোখ যেদিকে যায়, চলিয়া যাইবেন।

মঠ-ত্যাগ করার সংকল্প নিয়া বাহিরে যাইতেছেন, বেলতলায় আসিয়া পা দুটি অচল হইয়া গেল। সেখানেই তিনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'এই মঠ, এই ভক্তসঙ্ঘ, এই পবিত্র সেবাকর্ম্ম, সব কিছুই তো ঠাকুরের। আমাদের কারুর ব্যক্তিগত তো কিছু নয়। ঠাকুরের এসব ফেলে কোথায় যাবো? কেনই বা যাবো? স্বামীজীর বকাবকিতে কি আসে যায়। বকেছে তো কি হয়েছে? তাছাড়া, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়ার জন্যই তো তার এমন খিটখিটে মেজাজ।'

মন তাঁহার অমনি শান্ত হইয়া যায়, চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে আনন্দোজ্জ্বল হাসির আভা। ধীরপদে মঠে ঢুকিয়া শুরু করেন নিজের দিনচর্য্যা।

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহার সারা অন্তরের উপলব্ধি দিয়া জানিতেন, বিবেকানন্দ, তাঁহার আকৈশোর বন্ধু বিবেকানন্দ, তাঁহার প্রাণপ্রিয় ঠাকুরের লীলার প্রধান পার্ষদ—ঠাকুরের সহস্রদল কমল। আবার স্বামী বিবেকানন্দও জানিতেন, ব্রহ্মানন্দ শুধু তাঁহার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুই নয়, ঠাকুর নিজের চিহ্নিত সঙ্ঘনায়ক—রাখালরাজ। তাই বাহিরের

লোক এই দুইয়ের প্রীতি ও সখ্যের গভীরত্বের পরিমাপ করিতে সক্ষম হইত না। দুইজনেই ছিলেন গুরুগতপ্রাণ এবং গুরুসর্ব্বস্ব। তাই গুরুর মাধ্যমেই দুইয়ের আত্মিক বন্ধন হইয়া উঠে এমনতর চির-অবিচ্ছেদ্য।

রামকৃষ্ণ লীলার ধারক ও বাহক এই দুই প্রধান শিষ্যের প্রণয়-কলহ ছিল মঠের তরুণ ব্রহ্মচারীদের এক দর্শনীয় বস্তু।

"মঠের বাগানের পার্শ্বে খোলা মাঠ জমিতে স্বামীজীর গাভী, ছাগল প্রভৃতি চরিয়া বেড়াইত। স্বামীজী ও মহারাজ এই মাঠ এবং বাগানের একটি সীমা বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। যদি স্বামীজীর গাভী, ছাগল প্রভৃতি ভক্ত-সীমা অতিক্রম করিয়া বাগানে আসিত তবে মহারাজ অনধিকার প্রবেশ লইয়া প্রবল আপত্তি তুলিতেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে তুমুল প্রেমকলহ উপস্থিত হইত। পরস্পরের এই অদ্ভুত বালকবৎ আচরণে তাঁহাদের গুরুভ্রাতারা এবং মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা আনন্দে আপ্লুত হইতেন। মনে হইত যেন দুইটি দিব্য ভাবাপন্ন বালক অপরূপ খেলায় মত্ত হইয়াছেন। ইহাদের একজন বিশ্বজয়ী আচার্য্য শ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যজন মঠ-মিশনের সঙ্ঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দ। দুই জনেই প্রায় প্রৌঢ় সীমায় উপনীত। অথচ ইহাদের দুইজনের বালকের মতো বাহ্যিক প্রীতি-কলহের অন্তরালে কি গভীর প্রেম প্রকাশ পাইত[১]।"

মঠ ও মিশনের কাজ ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছে, মঠনায়ক ব্রহ্মানন্দের তাই কর্ম্মতৎপরতার সীমা নাই। কিন্তু ব্রহ্মচারী ও কর্ম্মীরা শুধু সেবাকর্ম্ম নিয়াই ব্যস্ত থাকুক ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নয়। এই কর্ম্মের পিছনে একটি সাধনভিত্তি গড়িয়া উঠুক, যে জন্য তাহারা

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন

ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে সেই ঈশ্বর-লাভেব সঙ্কল্প সফল হোক, ইহাই তিনি মনেপ্রাণে সর্ব্বদা চাহিতেন। তাই দেখা যাইত, মঠ পরিচালনার ব্যাপক কর্ম্মসূচীর মধ্যেও এই তরুণ কর্ম্মীদের আত্মিক উন্নতির ভিত্তি গঠনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ সদা তৎপর থাকিতেন। সাধন-নির্দ্দেশ ও তত্ত্বেব মীমাংসা তাহার কাছ হইতে জানিয়া নিয়া ভক্ত সাধকেরা কৃতার্থ বোধ কবিতেন।

স্নেহপূর্ণ স্বরে ইহাদেব সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেন, "খুব সকাল সকাল শয্যা ত্যাগ করা ভাল। রাত্রি যায় দিন আসে, দিন যায় রাত্রি আসে এই সময়টা সংযম সময়। এই সময় প্রকৃতি শান্ত থাকে, উহা ধ্যানজপের বিশেষ অনুকূল। এই সময় সুষুম্না নাড়ী চলে, তখন দুই নাক দিয়েই নিঃশ্বাস বয়। নচেৎ সর্বদা ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী চলে, অর্থাৎ এক নাক দিয়ে নিঃশ্বাস বয়। তখন চিত্ত চঞ্চল হয়। যোগীপুরুষরা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখেন, কখন সুষুম্না নাড়ী বইবে। সেই সময় তাঁরা যে কাজেই থাকুন না কেন, সব ছেড়ে দিয়ে ধ্যানে বসবেন।"

সাধন-ভজন সম্পর্কে ভক্ত ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা মহারাজের কাছ হইতে কত খুঁটিনাটি কথা, কত জটিল তত্ত্বের মীমাংসাই না জানিয়া নিতেন। তিনি বলিতেন, "সাক্ষাৎ সাধন হচ্ছে সব চেয়ে উত্তম—সেই পরমাত্মা রয়েছেন, সর্ব্বদা তার অনুভূতি হচ্ছে। তারপর হচ্ছে ধ্যান, সেখানে তিনি আছেন, আর আমি আছি, জপ-তপ সব কিছু বন্ধ। যখন ধ্যান জমবে তখন দেখবে শুধু ইষ্টের রূপ, তখন জপতপ সব আর চলে না। তার নীচে স্তবস্তুতি ও জপ-তপ করা যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ চিন্তা করা যাচ্ছে। আর তারও নীচে হচ্ছে বাহ্যপূজা—প্রতীক বা প্রতিমা-উপাসনা। এই সবই হচ্ছে ক্রমোন্নতির নানা অবস্থা। যার মনের যে রকম অবস্থা, সে সেখানে থেকে সাধন আরম্ভ করে, আর ক্রমে বেড়ে যায়। একজন সাধারণ লোকের কথা ধর, তাকে একেবারেই যদি নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তা বা সমাধি সম্বন্ধে উপদেশ করা যায়, সে কিছুই ধারণা করতে পারবে না, তার

ভালও লাগবে না। দু-একদিন চেষ্টা করে ছেড়ে দেবে। কিন্তু তাকে যদি ফুল-বেলপাতা নিয়ে পূজা করতে দেওয়া যায়, তাতে সে মনে করবে একটা কিছু করলুম। তার মনটাও খানিক ক্ষণের জন্য কতকটা স্থির হলো। এতে সে বেশ আনন্দও পায়। তারপর ক্রমে সেই অবস্থা অতিক্রম করে।

"মন যত সূক্ষ্ম হতে থাকে, স্থূল জিনিসে আর সেই রকম রস পায় না। ধরুন আপনি প্রথমে পূজা আরম্ভ করলেন। কিছুদিন পরে দেখবেন, আপনা থেকেই মনে হবে—জপ করা ভাল, তখন জপটা বেড়ে যাবে। আবার কিছুদিন পরে মনে হবে ধ্যান করা ভাল, তখন শুধু ধ্যান করতে ইচ্ছা যাবে। এই রকমে মানুষ ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। একেই বলে—ন্যাচারাল গ্রোথ্ বা স্বাভাবিক উন্নতি। এই রকমে মন যেটুকু লাভ করে তা আর নষ্ট হয় না।

"মনে করুন, আপনি এই উঠানে আছেন, আপনাকে ছাদে উঠতে হবে। কোথায় সিঁড়ি আছে খুঁজে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তবে উঠতে পারেন। তা না হয়ে উঠান থেকে কেউ যদি আপনাকে ছুঁড়ে দেয়, তা হলে আপনার অনেক কষ্ট হবে এবং তাতে বিপদের আশঙ্কাও খুব আছে। এই বাইরের জগতে যেমন দেখছেন নিয়মকানুন আছে, অন্তর্জগতেও ঠিক সেই রকম সব ব্যবস্থা আছে"[১]।

ভক্তদের মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "ছাখো, দেহই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। সেইজন্য ধ্যান-ট্যান সব শরীরের ভিতর করতে বলে। সহস্রারে মন গেলে আর নামতে চায় না। 'যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।' 'রথে চ বামনং দৃষ্টা' প্রভৃতির মানে হচ্ছে, হৃদয়ের ভিতর সেই পরমপুরুষকে দেখলে আর জন্ম হয় না। নিম্ন অধিকারীর জন্য বাহ্যরথ, মন্দির প্রভৃতির সৃষ্টি। রামপ্রসাদ যখন হৃদয়ে মাকে দেখলেন, তখন গান বানিয়ে বললেন—'তুমি মাতা

১ ধর্মপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ : কথোপকথন

থাকতে আমার জাগা ঘবে চুরি।' উঃ, কি ভয়ানক কথা বল দেখি। বাস্তবিক সেই আস্বাদ পেলে আর অন্য কিছু কি ভাল লাগে?

"ঠাকুর বলতেন—দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে জ্ঞাননেত্র আছে, সেটা ফুটলে চারদিক আনন্দময় দেখায়।

—রাজার সাত দেউড়ি বাড়ি। কোন গরীব নায়েবের কাছে রাজদর্শন প্রার্থনা করলে। নায়েব সঙ্গে করে এক এক দেউড়িতে নিয়ে যায়, আর সে জিজ্ঞাসা করে—এই কি রাজা? উত্তর হয়—'না'। এই প্রকারে যখন সপ্তম দেউড়িতে প্রবেশ করে রাজদর্শন করলে, তখন সেই অপরূপ রূপ দেখে আর জিজ্ঞাসা করলে না। সেই রকম গুরু এক এক দেউড়ি দিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষে ভগবানকে মিলিয়ে দেন।"

ধ্যানের পদ্ধতি ও চরম উপলব্ধি সম্পর্কে এক ব্যক্তি মহারাজকে সেবার প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি জানান,—"ধ্যানকালে ইষ্টমূর্ত্তিকে জ্যোতির্ময় ভাবতে হয়—যেন তাঁর জ্যোতিতে সব আলোকিত। চৈতন্যস্বরূপ ভাব্‌বে। এইরূপ ধ্যান পরে সহজেই নিরাকার ধ্যানে পরিণত হয়। তাতে বোধে বোধ হয়। তারপর জ্ঞানচক্ষু খুলে গেলে তখন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সে আর এক জগৎ। এ জগৎটা যেন আলাদা। তাছাড়া, এটা তখন খুব তুচ্ছ হয়ে যায়—যেমন উদি (মহারাজের ভুবনেশ্বরস্থিত পাচক) কলকাতায় এসে শহরের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য দেখে বললে, 'ভুবনেশ্বরটা কিছুই না'। তারপর মন লয় হয়ে যায়-তখন সমাধি। তারপর নির্বিকল্প। তারপর আরও এগিয়ে কি যে, তা মুখে আর বলা যায় না। সেখানে দেখা নাই, শোনা নাই, অনন্ত—অনন্ত!! এ সবই হচ্ছে অবস্থার কথা। তখন মনকে জোর করে এজগতে আনতে হয়—এটা কিছু নয় বলে মনে হয়। 'দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিতং'। সে অবস্থায় গিয়ে কেউ কেউ শরীরটাকে মস্ত বাধা মনে করে সমাধিতে শরীরটা ছেড়ে দেন। যেন ঘটটা ভেঙ্গে দেওয়া। ঠাকুর বেশ একটা দৃষ্টান্ত দিতেন—'দশটা সরায় জল আছে, তাতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে।

এক একটা করে সরা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে শেষে একটি সরা ও একটি সূর্য্য রইল। সেটাও ভেঙ্গে দিতে যা রইল, তাই রইল—সত্য সূর্য্য রইল এ কথাও বলা চলে না। কে তখন বলবে?'

অধ্যাত্ম-আলোচনার প্রসঙ্গে একদিন তরুণ সাধকদের তিনি বলিলেন, "ঠিক পাকা বিশ্বাস, সেটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি না হলে হয় না। একবার যদি তাঁর দর্শন হয়, অনুভূতি হয়, তবেই ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়। তার পূর্বে সেই বিশ্বাসের খুব কাছাকাছি একটা হয়। খুব জোর করে বিশ্বাস আনতে হয়। আর বারে বারে এই রকম করতে করতে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। অবিশ্বাস করতে নেই। যখন সন্দেহ উপস্থিত হবে, তখন ভাবতে হয়—ভগবান সত্য; আমার অদৃষ্টদোষে, আমার অশুভ সংস্কারের ফলে তাঁকে বুঝতে পারছি না। যখন তাঁর কৃপা হবে তখন হবে।

"এই মন কি তাঁর ধারণা করতে পারে? তিনি যে এই মনবুদ্ধির অনেক দূরে। এই যে সৃষ্টিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো মনের রাজত্ব? মনই হলো এর কর্তা। এই সব হচ্ছে মনেরই সৃষ্টি। এর পারে ওর যাবার জো নেই। ভগবানের নাম করতে করতে আর একটি সূক্ষ্ম মন জন্মায়। সেই মন এখন ক্ষুদ্র জীবাণুরূপে সকলেরই ভিতর রয়েছে, সাধনার দ্বারা সেই মন যখন বিকাশ লাভ করে তখন নানারকম সূক্ষ্ম অনুভূতি হয়। সেও ফাইনাল বা চরম কিছু নয়। এই সূক্ষ্ম মনও পরমাত্মার কাছ পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারে না, জগতের আর কিছু ভাল লাগে না। কেবল ভগবদ্‌ভাবে বুঁদ হয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়।

"তারপরে সমাধি। সে অবস্থা বর্ণনা করা যায় না, অস্তি-নাস্তির পার। সেখানে সুখ নেই, দুঃখ নেই, আনন্দ নেই, নিরানন্দ নেই, আলো নেই, আঁধার নেই—কি যে আছে মুখে বলা যায় না।"[১]

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ: কথোপকথন

এক ভক্ত সেদিন প্রশ্ন করেন, "মহারাজ, সাধন পথের শেষে তো আনন্দের স্রোত সদাই প্রবাহিত হচ্ছে, তাই না ?"

উত্তরে ব্রহ্মানন্দ বলেন, "আনন্দের কথা কি বলছো ? সেখানে আনন্দ-নিরানন্দ কিছুই নেই, সুখ-দুঃখ কিছুই নেই, ভাব-অভাব কিছুই নেই। আনন্দ তো সাধন অবস্থার কথা। তোমার নৌকাখানি যতক্ষণ লক্ষ্যস্থলে না পৌঁছায় ততক্ষণ অনুকূল বাতাস দরকার। পৌঁছে গেলে আর বাতাস-টাতাস দরকার নেই। আনন্দ ঐ অনুকূল বাতাসের মতো খুব সাহায্য করে। জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, সব লয় হয়ে যায়। শাস্ত্রে শুধু ঐ পর্যন্ত বলেছে। কিন্তু কি জান তারপর যা আছে তা আর বলতে পারে না। সাধন করলে সে সব নিজের অনুভব হয়। স্বয়ংবেদ্য হচ্ছে সেই ভূমা বস্তু। সেখানে কোন অভাব নেই, কোন ভয় নেই - শুধু ভাবলেই মনটা উঁচু হয়ে যায়। কি মজার জিনিস ! কেউ কেউ নিত্য আর লীলা—এই দুটোই দেখেন।

"নিত্যে পৌঁছে তারপরে তো লীলা"—এ প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বলিলেন--"তার কিছু মানে নেই, দুই-ই বটে। রাসলীলা যখন হচ্ছিল, তখন এক সখী আর এক সখীকে বলেছিল, সখি, বেদান্ত-সিদ্ধান্তো নৃত্যতি। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত কি না সেই পরব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। এখানে নিত্য আর লীলা এক। আর একটা আছে নিত্যলীলা দুইয়েরই পার।"

সাধনজীবনে মন্ত্র ও গুরুকরণের আবশ্যকতা সম্পর্কে তাঁহার মতবাদ ছিল অতিশয় স্পষ্ট—"মন্ত্র না নিলে একাগ্রতা আসে না। আজ হয়তো তোমার কালীরূপ ভাল লাগল, আবার কাল হরিরূপ ভাল লাগল, পরশু নিরাকারে মন হলো—ফলে কোনোটাতেই একাগ্রতা হবে না। মন স্থির না হলে ভগবান লাভ ত দূরের কথা, সাধারণ সাংসারিক কাজের মধ্যেও অনেক কিছু গোলমাল হবে।

ভগবান লাভ করতে হলে গুরুর একান্ত দরকার। গুরু তাঁর শিষ্যের ভাবানুযায়ী মন্ত্র ও ইষ্ট ঠিক করে দেন। সেই গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে নিষ্ঠার সহিত সাধন-ভজন না করলে কিছুতেই কিছু হবে না। ধর্ম্মপথ অতি দুর্গম। সিদ্ধগুরুর আশ্রয় না হলে যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, যতই চেষ্টা করুক না কেন, হোঁচট খেয়ে পড়তেই হবে। চুরি করতে পর্য্যন্ত একজন গুরুর দরকার হয়। আর এতবড় ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে গুরুর দরকার নেই?"

সাধনা, সিদ্ধি ও ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এক মুমুক্ষু ভক্তকে ব্রহ্মানন্দ সেদিন বলিতেছেন, "মনের আসক্তি ত্যাগই ত্যাগ। হাজার জিনিস আসুক না কেন, আসক্তি না থাকলে কিছুই নয়। আবার কিছুই নেই কিন্তু আসক্তি থাকলে সবই রইল। সাধনার দ্বারা মনটাকে নির্ম্মল করতে হয়। তা না হলে ভগবানের আসন পড়ে না। চাই চেষ্টা, চাই সংগ্রাম। সংগ্রাম করবার প্রবৃত্তি যার আসেনি সেতো মৃত। বুক পেতে এই সংগ্রাম বরণ করে নিতে হবে তার পরের অবস্থা হচ্ছে শান্তি। সব চেয়ে সহজ সাধন—সর্বদা তাঁর স্মরণ-মনন। তাঁকে আপনার বলে জানতে হবে। বাইরে যেমন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ানো, পরানো এবং তাদের সঙ্গে আলাপ ব্যবহারাদি করা, মনোরাজ্যেও যখন এইরূপ হবে, অর্থাৎ সেই রাজ্যেও যখন আলাপ ব্যবহারাদি হবে তখনই শান্তি।

"তাঁর কার্য কি বুঝা যায়? অনন্ত অথচ শান্ত। মানুষেও তিনি আসেন। কাকভূষণ্ডী প্রথম প্রথম রামচন্দ্রকে মানুষ বলে ধারণা করে ত্রিলোকের কোথাও স্থান পেলে না। পরে তাঁর কৃপায় তাঁকে ভগবান বলে বুঝলে ও স্তবস্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করলে। ভগবান কাকে কোন্ পথ দিয়ে নিয়ে যান তা বুদ্ধির অগম্য। তিনি কখনও সুগম পথ দিয়ে, কখনও কাঁটার মধ্যে দিয়ে, কখনও দুর্গম পাহাড়-পর্বতের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যান। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।"

সে-বার এক জিজ্ঞাসু সাধকের প্রশ্নের উত্তরে ধ্যান এবং ধ্যানলব্ধ অনুভূতি সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলেন, "ধ্যানাদিতে কেবল যে মনের শান্তি হয় তা নয়। ওতে শরীরেরও উন্নতি হয়, ব্যারাম-স্যারাম কম হয়। শরীরের উন্নতির জন্যও ধ্যানাদি করা উচিত।

"প্রথম প্রথম ধ্যানও মনের সঙ্গে যুদ্ধ দোলায়মান মনকে ক্রমাগত টেনে এনে ইষ্টপাদপদ্মে লাগাতে হয়। এতে কিছুক্ষণ পরে একটু মাথা গরম হয়। এজন্য প্রথম প্রথম বেশী ধ্যান-ধারণা করে মস্তিষ্ককে খুব বেশী খাটাতে নেই, খুব আস্তে আস্তে বাড়াতে হয়। কিছুদিন এরূপ অভ্যাসের ফলে যখন ঠিক ঠিক ধ্যান হবে তখন এক আসনে বসে দুই-চার ঘণ্টা ধ্যান-ধারণা করলেও কোন কষ্ট হবে না বরং সুষুপ্তির পর শরীর ও মন যেরূপ সতেজ ও স্বচ্ছন্দ হয়, সেরূপ বোধ হবে, আর ভিতরে খুব আনন্দ অনুভব হতে থাকবে।

"দেহটা যেন মন্দির, ঠাকুর তাতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। ধ্যান করতে করতে মন যখন স্থির হবে তখন যেখানে ইচ্ছা ইষ্টদর্শন হবে। পার্শ্বে, হৃদয়ে, পশ্চাতে বাহিরে সবখানেই ধ্যান করা যায়। ধ্যান করতে করতে প্রথমে জ্যোতি দর্শন হয়, কিন্তু ঐরূপ জ্যোতি দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বা একটু পরেই একটা নিবিড় আনন্দ আসে, তা ছেড়ে মন এগুতে চায় না। তারপর জ্যোতির্ঘন-দর্শন, তখন মন তাতে তন্ময় হয়ে যায়। কখনও কখনও বা দীর্ঘ প্রণব ধ্বনি শুনতে শুনতেও মন তন্ময় হয়। দর্শন, অনুভূতির রাজ্য এর কি ইতি আছে? যত এগোও অনন্ত! অনন্ত! অনেকে একটু জ্যোতিঃ-টোতি দেখে মনে ভাবে এই শেষ—তা নয়! যেখানে গিয়ে মনের বিকল্প শেষ হয়, কেউ কেউ বলেন ঐখানেই শেষ। আবার কেউ কেউ বলেন, ঐখান থেকেই আরম্ভ[১]।"

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ

ভগবান লাভ না হইলে মানবজীবন সফল হয় না, বন্ধ্যা বলিয়া গণ্য হয়। এ সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "ভগবান লাভের জন্য তিনটি জিনিসের দরকার। প্রথম মনুষ্য জন্ম, দ্বিতীয় মুক্তির কামনা তৃতীয় মহাপুরুষের আশ্রয়। ভগবানের কৃপায় মনুষ্য জন্ম পেয়েছ, সৎসঙ্গও লাভ করেছ, মুক্ত হবার বাসনাও জেগেছে, এখন জীবনটাকে এমনভাবে গড়ে তোল যেন এই জন্মটা বৃথা না যায়। কি হবে ক্ষণস্থায়ী ভোগের পিছনে দৌড়ে? অনন্তের অধিকারী হও। আর একটা কথা মনে রেখো, মনুষ্যজন্ম আবার হয়তো হবে, মুক্তির বাসনা পরজীবনে আবার হয়তো আসবে, কিন্তু এবারের মতো সাধুসঙ্গ বার বার পাবে না। সব সময় মহাপুরুষের-সঙ্গ ভাগ্যে জোটা বড় দুর্লভ। জন্ম-জন্মান্তরের অনেক সুকৃতি ও তপস্যার ফলে এই সুযোগ হয়। ভাগ্যফলে যখন ঠাকুরের গণ্ডির ভিতর এসে পড়েছ, দেখো যেন জীবনটা গোলমালে কেটে না যায়।

"বিশ্বাস, বিশ্বাস, কেবল বিশ্বাস চাই! গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে পড়ে থাক। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে পড়ে থাকলে সব হয়ে যাবে। গুরুবাক্যে যদি বিশ্বাস না থাকে শুধু মন্ত্রে-তন্ত্রে কিছু হবে না! বেড়ালের ছানার মতো পড়ে থাক। গুরু যখন যা দরকার করিয়ে নেবেন। নিজে তুমি কতটুকু বোঝ? তাঁর উপর ভার দিয়ে পড়ে থাক। যাঁকে ভার দিয়েছ, তাঁর একটা দায়িত্ববোধ আছে। তিনি তোমার নিজের চাইতে তোমার বিষয় ঢের বেশী ভাবেন। ষোল আনা তাঁতে নির্ভর কর, তিনি সকল আপদ-বিপদ থেকে তোমায় রক্ষা করবেন। এ জগতে কারও সাধ্য নেই গুরু আশ্রিত শিষ্যের অনিষ্ট করে। গুরুর কৃপায় তার চতুর্দ্দিকে লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা। জীবনে অনেক ভুল হবার সম্ভাবনা, যতক্ষণ না ভগবান লাভ হয়। গুরুকে আশ্রয় করে থাকলে ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। আলের উপর দিয়ে বাপ-বেটায় যাবার ঠাকুরের সেই গল্পটি মনে আছে তো? বাপ ছেলের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে না। ছেলে বাপের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে। সদ্‌গুরুর আশ্রয় যারা পেয়েছে, তারা

যদি তাঁকে আশ্রয় করে পড়ে থাকে তবে তিনিই তাঁদের ভুলভ্রান্তি সব শুধরে নেবেন।"

গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া কহিতেন, "ঠাকুর বলতেন—'সদ্‌গুরু হলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে যায়।" গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। কাঁচা গুরুর হাতে পড়লে শিষ্যের অহঙ্কার যায় না, সংস্কার-বন্ধন ঘোচে না। যারা ঈশ্বরলাভ করেনি, তাঁর আদর্শ পায়নি, তাঁর শক্তিতে শক্তিমান্ হয়নি, তাদের সাধ্য কি যে অপরের সংসার বন্ধন মোচন করে? কানা কানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলে হিতে বিপরীত হয়। নিজে মুক্ত হলেই তবে অপরকে মুক্ত করা যায়—সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যায়।

"যদি কারো ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে, সাধনভজন করবার ইচ্ছে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন। গুরু লাভের জন্য সাধকের চিন্তা করবার কোন দরকার নেই। যাদের সদ্‌গুরু লাভ হয়েছে তাদের আর ভাবনা কি? রাস্তা তো তারা পেয়েছে। সে রাস্তা ধরে এখন তারা চলুক।

সাধনা, সিদ্ধি ও ঈশ্বরীয় কর্ম্ম, সর্ব্ব দিক দিয়াই ব্রহ্মানন্দ ছিলেন একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ। একাধারে তিনি ছিলেন আপ্তকাম সাধক, দরদী আচার্য্য এবং মঠ ও মিশনের সংগ্রামকুশল অধিনায়ক। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত জীবনের এই বহুমুখী সাফল্যের কথাটি প্রত্যক্ষদর্শী, ভক্ত সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসুর লেখনীতে বড় সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।[১] তিনি লিখিয়াছেন, "মহারাজ অমিত ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার বহুমুখী শক্তি বর্ষার বারিধারার ন্যায় শতমুখে প্রবাহিত হইত। কিন্তু এত তেজ, এত শক্তি কিরূপে যে মৃন্ময় আধারে এত শান্ত হইয়া থাকিত, তাহার সন্ধান কেহ জানিত না।

১ ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ : পরিচয়—দেবেন্দ্রনাথ বসু

বিদ্যুৎবাহী তার দেখিতে নির্জীব, কিন্তু স্পর্শ করিলে জানা যায় কি অমোঘ শক্তি তাহাতে নিহিত! শুনিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীর মৃন্ময় নয়—চিন্ময়। কিন্তু এই চিন্ময় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সে তথ্য সহজে বুঝা যাইত না। কি অলৌকিক ভালবাসায় তিনি সকলকে ভুলাইয়া রাখিতেন। সাধু, ভক্ত বা ব্রহ্মচারী নির্ম্মল চিত্ত লইয়া অথবা ব্যথিত, তাপিত, পতিত, কলঙ্কিত জীবনের বোঝা বহিয়া যে-কেহ এই পুরুষোত্তমের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, তিনিই অন্তরে অন্তরে এই সত্যটি অনুভব করিয়াছেন—তিনিই দেখিয়াছেন, যাহাকে সম্ভাষণ করিতে মন সঙ্কুচিত হয় সেই অনাদৃত জনকে মহারাজ কি আদরে আপ্যায়িত করিতেছেন। আত্মীয়স্বজন যাহার নাম শুনিতে কুণ্ঠাবোধ করে, কি স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে মহারাজ তাদের তত্ত্ব লইতেছেন। যে অভাগা সর্ব্বজন পরিত্যক্ত, কি মমতায় মহারাজ তাহাকে বাঁধিয়াছেন। যার কোথাও স্থান নাই, মহারাজের দ্বার তাহার জন্য চির উন্মুক্ত।

"এই উদার বিশ্বপ্রেমের অমৃত-আস্বাদ পাইয়া কেহ ধারণা করিতে পারিত না যে, এই নিশ্চিন্ত শান্ত শিবময় পুরুষের কি মহান ত্যাগ, কঠোর বৈরাগ্য, অপরিমেয় তিতিক্ষা, কি জ্ঞান ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম্মানুরক্তি সংসার-মোহ-হারিণী এক মহাশক্তির উদ্বোধনের জন্য নিরুদ্বেগ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া থাকিত! ভিক্ষু তাহার অপ্রত্যাশিত করুণায় কৃতার্থ হইয়া ফিরিত; জ্ঞানী জ্ঞানচর্চ্চায় তাঁহার ইতি করিতে পারিত না; ভক্ত সে ভক্তিসিন্ধু সন্তরণ করিয়া পার পাইত না; কর্ম্মী কর্ম্মকৌশলে তাহার কাছে হার মানিত; সংশয়ী বিশ্বাসের বল পাইত; সংসারী সংসারধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিত; রসিক তাঁহার রসস্ফূর্ত্তিতে মহাহাস্যধারায় হাবুডুবু খাইত; সাধক তাঁহার কাছে সাধনার উচ্চতত্ত্ব লাভ করিয়া চরিতার্থ হইত; তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া হতাশ চিত্ত উৎসাহে, ভগ্ন হৃদয় আশার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিত, অথচ এই মহারাজ বালকের সঙ্গে যেন বালকটি হইয়াই খেলা করিতেন।

"মহারাজ যে মহারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন সেথায় দুঃখ, দৈন্য, শোকের প্রবেশ অধিকার ছিল না; রিপুদল সেখানে বল প্রকাশ করিতে পারিত না। সে রাজ্যের যাঁহারা প্রজা—মহারাজের অমায়িক ব্যবহারে তাঁহারা ভাবিতেন, আমি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, অথচ আপন আপন অধিকার-সীমা লঙ্ঘন করিয়া প্রশ্রয় লইতে কেহ কখন সাহসী হইতেন না। এ রাজ্যে প্রবেশ করিলে মনে হইত সংসারের বহু ঊর্দ্ধে কোন্ এক অত্যাশ্চর্য আনন্দময় লোকে আসিয়াছি—যেখানে দ্বেষ দেশছাড়া, দ্বন্দ্ব স্পন্দনহীন, তাঁর আনন্দ অবাধ।"

সে-বার কাশীধামে অবস্থান করার সময় স্বামী বিবেকানন্দ গুরুতরভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন। সারা শরীরে শোথ দেখা দেয়, ডাক্তারেরা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া উঠেন।

বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে। তিনি স্থির করেন, কলিকাতায় আনিয়া স্বামীজীর চিকিৎসা করানো হইবে। অবিলম্বে স্বামীজীকে বেলুড় মঠে নিয়া আসা হয় এবং অভিজ্ঞ কবিরাজের তত্ত্বাবধানে তাঁহার চিকিৎসা চলিতে থাকে। এ সময়ে ব্রহ্মানন্দ গুরুভাই ও তরুণ ব্রহ্মচারীদের বলিতেন, "তোমরা সবাই প্রাণপণে স্বামীজীর সেবা-যত্ন কর, তাঁকে সুস্থ করে তোল। স্বামীজী আমাদের সব চাইতে বড় অবলম্বন।"

স্বামীজীর সেবা-পরিচর্য্যায় ব্রহ্মানন্দ নিজেও একান্তভাবে তাঁহার প্রাণ-মন ঢালিয়া দেন। এসময়ে দিনরাত রোগীর শয্যার পাশে চিন্তাকুল হইয়া তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। ক্রমে স্বামীজী কিছুটা সুস্থ হইয়া উঠেন, গুরুভাইরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন এবং ব্রহ্মানন্দের মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার আভা। এ সময়ে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে বলিতে শোনা যায়, "স্বামীজীর এই পীড়ার সময় কি ব্যস্ততা আর উদ্বেগেই না দিন কেটেছে। মনে হচ্ছে ঠাকুরের পীড়ার সময়ও এত সেবা করতে পারি নি।"

স্বামীজীর ভগ্নস্বাস্থ্য আর জোড়া লাগে নাই, কয়েকমাসের মধ্যেই আবার দেখা দেয় এক দারুণ সঙ্কট। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে তিনি মরধাম চিরতরে ত্যাগ করিয়া যান। ভক্ত ও গুরু-ভাইদের হৃদয়ে নামিয়া আসে বিষাদের অন্ধকার।

প্রিয়তম গুরুভাই, গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধানতম লীলাপার্ষদ বিবেকানন্দের শোকে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ উন্মত্তের মতো হইয়া যান. স্বামীজীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তিনি ক্রন্দন করিতে থাকেন। শোকের বেগ কিছুটা প্রশমিত হইলে মহারাজকে সাশ্রুনয়নে বলিতে শোনা যায়,—"সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড়টা আজ অদৃশ্য হয়ে গেল।"

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারা এসময়ে দিকে দিকে বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করিয়া তরুণ ছাত্রসমাজে সেবাধর্ম্মের একটা জোয়ার বহিয়া যায়। আর্ত্তত্রাণ, নিরক্ষরদের শিক্ষাদান, আর বন্যা-দুর্ভিক্ষের সঙ্কটে দেশের তারুণ্য শক্তি রামকৃষ্ণ মিশনের নেতৃত্বে অগ্রসর হইয়া আসে। সারা ভারতের জনজীবনে ইহার প্রভাব অনুভূত হয়।

মঠ ও মিশনের বিস্তার সাধিত হইতেছে আর ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্ব-শক্তিও হইতেছে দূরবিস্তারী। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণীবহরূপে, জীবন্ত ভাষ্যরূপে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

যুবক ভক্ত ও ব্রহ্মচারীদের কাছে ব্রহ্মানন্দের প্রথম ও শেষ কথা ছিল কর্ম্ম ও উপাসনার যুগ্ম সাধনা। প্রায়ই বলিতেন, "রামকৃষ্ণ-ভক্তদের সেবাধর্ম্ম মানুষের বা জীবের সেবা নয়, এটা হচ্ছে জীবন্ত ভগবানের পূজা—প্রেমে ও ভক্তিতে জীবরূপী নারায়ণের সেবা।"

ব্রহ্মানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ-রসের ঘনীভূত বিগ্রহ। মঠ মিশনের কাজে যখন যেখানে তিনি উপস্থিত হইতেন ভক্ত ও সেবকদের অন্তরে, নবাগত জিজ্ঞাসু তরুণদের অন্তরে জাগিয়া উঠিত আনন্দের

স্রোতধারা। মহারাজের প্রেম বিহ্বলতার স্মৃতি চিরতরে তাহাদের মনে অঙ্কিত হইয়া যাইত। ঐশ্বরীয় ভাবে তাহারা উদ্দীপিত হইয়া উঠিত।

মহারাজের প্রাণঢালা ভালবাসাই ছিল তরুণ কর্ম্মীদের এবং সমগ্র রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরই সেবা ও উপাসনার এক বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিতে তিনি সক্ষম হন। "সকল প্রকার কাজকর্ম্ম ও জাগতিক ব্যাপারের উর্দ্ধে অতীন্দ্রিয় উচ্চ ভাবভূমিতে নিয়ত অবস্থান করিয়াও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে তিনি দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন করিয়াছিলেন। এইরূপ পরমহংসের ন্যায় বিরাজ করিয়াই তিনি সঙ্ঘের বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন। মঠ ও মিশনের যাবতীয় সদনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান এবং জনহিতকর কার্য্যের প্রেরণার মূলে থাকিয়াও তিনি ছিলেন অনাসক্ত, একক, নির্দ্বন্দ্ব এবং সমাহিত। বালকবৎ কোমল, সরল ও আনন্দময় হইয়াও তিনি ছিলেন প্রশান্ত, অচঞ্চল এবং গম্ভীর। এই অপূর্ব্ব দিব্যভাবেই আধ্যাত্মিক তরঙ্গের প্রবাহে তিনি নীরবে সঙ্ঘের সম্প্রসারণ করিয়াছিলেন[১]।"

বঙ্গভঙ্গের পর সারা দেশে একটা বিরাট রাজনৈতিক আলোড়ন দেখা দেয়। রাজনৈতিক মুক্তি-সাধন এবং ভারতীয় ধর্ম্মসংস্কৃতির উজ্জীবন সাধনের জন্য শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ জাগিয়া উঠে। এই সময়ে বিশেষ করিয়া বিবেকানন্দের ভাবধারা দেশের সর্ব্বত্র বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে; দলে দলে যুবক কর্ম্মী ও মুমুক্ষুরা রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনে ভীড় করিতে থাকে। রামকৃষ্ণের ধারক ও বাহক ব্রহ্মানন্দের বাণী ও দিব্য সান্নিধ্য এইসময়ে অনেকের জীবনকে রূপান্তরিত করে।

কিছুসংখ্যক প্রাক্তন বিপ্লবী ও রাজরোষে পতিত রাজনৈতিক কর্ম্মীও এই সময়ে সাধনপ্রয়াসী হন এবং ব্রহ্মানন্দের শরণ নেন। বিদেশী শাসকদের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করিয়া মহারাজ মঠে

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন কর্ত্তৃক প্রকাশিত

তাঁহাদের আশ্রয় দেন, পরমার্থ লাভের সুযোগ পাইয়া তাঁহারা ধন্য হয়।

নবাগত সাধনার্থী ও কর্ম্মীদের মহারাজ বলিতেন, "ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখলে মনের একটা শক্তি জন্মে। বারো আনা মন ভগবানের দিকে রেখে, চার আনায় জগতের কাজ ভেসে যায়।"

ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সাধনের সঙ্কল্প স্থির থাকিলে এবং ঈশ্বরের আশ্রয় নিলে সাধনার সমস্ত কিছু সুযোগ, সুযোগ ঈশ্বর নিজেই পুরাইয়া দেন। ঈশ্বরের ধারক বাহক জীবন্ত মহাপুরুষেরাই শুধু নয়, সূক্ষ্মদেহী বিদেহী মহাপুরুষেরাও সাধনপথে সাধকদের নানাভাবে সাহায্য করেন। এই সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ তাঁহার নিজ জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা মাঝে মাঝে বলিতেন।

একবার তিনি বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। সে সময়ে রাত বারোটায় ঘুম হইতে উঠিয়া জপ-ধ্যানে নিবিষ্ট হইবার অভ্যাস তাঁহার ছিল। জপ করার সময় প্রায়ই চোখে পড়িত এক অলৌকিক দৃশ্য। কক্ষের দ্বার রুদ্ধ। কিন্তু, দেখা যাইত, এক সৌম্যমূর্ত্তি বৈষ্ণব বাবাজী জপের মালা হাতে নিয়া শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রহ্মানন্দ বুঝিতেন, কোন সূক্ষ্মদেহী মহাত্মা তাঁহাকে আশ্বাস ও প্রেরণা দিবার জন্যই রোজ প্রভাতে আবির্ভূত হইতেছেন।

একদিন শরীর বড় ক্লান্ত ছিল, অভ্যাসমতো বারোটার প্রাক্কালে ব্রহ্মানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। এমন সময়ে কে যেন তাঁহাকে ধাক্কা মারিয়া জাগাইয়া দিল। চোখ মেলিতেই দেখিলেন, সেই বিদেহী বাবাজী স্মিতহাস্যে শয্যার পাশে দণ্ডায়মান, জপমালাটি প্রসারিত করিয়া ব্রহ্মানন্দকে ইঙ্গিত করিতেছেন জপে বসিবার জন্য।

ভগবান লাভে বদ্ধপরিকর সাধুদের জন্য সাহায্য এমনিভাবে ভগবৎ কৃপায় জাগতিক ও সূক্ষ্ম স্তর হইতে নামিয়া আসে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের চেষ্টায় ও যত্নে মাদ্রাজের মঠ তখন দৃঢ়

ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা, মঠনায়ক ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একবার সেখানে পদার্পণ করেন। মহারাজের আগমনের প্রাক্কালে রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ মঠের সাধু ও কর্মীদের ডাকিয়া কহিলেন, "একথাটি তোমরা সবাই স্মরণ রেখো—স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের নিজের সন্তান। তোমরা তাঁকে যখন দর্শন করবে তখন ঠাকুর কেমন ছিলেন তার কতকটা আভাস পাবে। ব্রহ্মানন্দের অহংটি সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে। যা তিনি বলেন, যা তিনি করেন—তা ঠাকুরের প্রেরণায়। ঠাকুর তাঁকে ঠিক নিজের ছেলের মতোই দেখতেন। তিনি ঠাকুরের ঘরেই শুতেন, কখনো কখনো এক মশারীর ভেতরেই থাকতেন। রাখালের পরিধানে কোন ছিন্ন বস্ত্র দেখলে তিনি কেঁদে ফেলতেন আর চেঁচিয়ে বলতেন, 'রাখালকে নূতন কাপড় দেবার কি কেউ নেই?' ঠাকুরের জন্য কেউ কোন ফল মিষ্টি বা খাবার জিনিষ আনলে অনেক সময় তিনি তাদের বলতেন, 'ও সব রাখালকে দাও—আমি তার মুখে খাই।' একদিন রাত্রে ঠাকুরের পিপাসা পায়। তিনি রাখালকে খাবার জল দিতে বল্লেন। রাখাল বিছানায় শুয়ে তন্দ্রার ঘোরে বিড়্‌বিড়্‌ করে 'পারবো না' বলে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন। গুরু মহারাজের এতে আনন্দ যেন উথলে উঠল। পরের দিন তিনি আনন্দ করে সবাইকে এই ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'এখন বুঝেছি, রাখাল আমাকে ঠিক বাপ বলেই জানে।'

গুরুভাই ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের ধারণা ও মূল্যায়ন কি ছিল, এই ভাবণ হইতে তাহা উপলব্ধি করা যায়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাষায় রাখাল মহারাজ ছিলেন একটি বর্ণচোরা আম। সহজ সুন্দর অমায়িক আনন্দময় এই সাধকের ভিতরে যে গম্ভীর তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষটি বাস করিতেন তাহার সন্ধান অনেকের পক্ষেই পাওয়া কঠিন ছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে সে সময়ে ভক্ত-প্রবর গিরিশ ঘোষ এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "তুমি আমায় লিখিয়াছিলে, রাখালকে কেউ চিনিতে পারে না। আমার ধারণা,

যে ভাগ্যবান্ রাখালকে চিনিবে, সে সেইদিনই মহারাজের (ঠাকুর রামকৃষ্ণের) কৃপা প্রাপ্ত হইবে তাহার মনুষ্য জন্ম সফল।"

মাদ্রাজে মীনাক্ষী মন্দির দর্শন কালে ব্রহ্মানন্দের যে দিব্য ভাবাবেশ হয় তাহার স্মৃতি স্থানীয় ভক্তদের হৃদয়ে দীর্ঘদিন জাগ্রত ছিল। দর্শনের দিন ভোরবেলা হইতে মহারাজ গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দকে বলিতে থাকেন, "মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাবের জোয়ার আসছে, যেন একটা কিছু আজ ঘটবে।"

মন্দিরের ভিতরে গিয়া দেবীমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ নীরব নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়েন, অতীন্দ্রিয় দর্শনের ফলে হারান তাঁহার বাহ্যজ্ঞান। গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার দেহটি বেষ্টন করিয়া থাকেন।

একঘণ্টা কাল ব্রহ্মানন্দের এই ধ্যানাবেশ চলিতে দেখা যায়, মন্দিরের তীর্থযাত্রী ও সাধু-সন্ন্যাসীরা দিব্যভাবে বিভাবিত এই মহাপুরুষের দিকে সবিস্ময়ে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে শত শত লোক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধন্য হয়।

সেদিনকার ভাবাবেশ সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ ভক্তদের বলিয়াছিলেন, "যখন মন্দিরে বিগ্রহের সামনে দাঁড়ালাম তখন দেখলাম, জগন্মাতার বিগ্রহ যেন জীবন্ত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন—তাই তো অমন সংজ্ঞাহারা হয়ে গিয়েছিলাম।"

বাঙ্গালোরে মঠ স্থাপিত হওয়ার পর সে-বার স্বামী নির্ম্মলানন্দের আগ্রহাতিশয্যে ব্রহ্মানন্দ সেখানে গিয়া কিছুদিন অতিবাহিত করেন। তাঁহার উপস্থিতিতে আশ্রমে ও তাহার আশেপাশে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়, একটা অভূতপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ রচিত হয়।

এখানকার মুচি সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক ভক্ত রবিবারে মঠে আসিয়া কীর্ত্তন ও ভজনে অংশ গ্রহণ করিত। মহারাজ পরমানন্দে তাঁহাদের সহিত যোগ দিতেন, তাহারাও এই পুণ্যচরিত মহাত্মার

পদবন্দনা করিয়া ধন্য হইত। এই অস্পৃশ্য ভক্তদের আকর্ষণে মহারাজ একদিন তাহাদের পল্লীস্থিত ঠাকুরঘরে গিয়া উপস্থিত হন, সাধন-ভজনে উৎসাহ দান করিয়া এই মুচিদের আশীর্ব্বাদ করিয়া আসেন। তাঁহার এই প্রেমপূর্ণ মনোভাব ও সমদর্শিতা দেখিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও ভক্ত-সাধকেরা প্রেরণা লাভ করেন, অন্ত্যজদের প্রতি সংস্কারজাত যে বৈষম্যবোধ ও বিদ্বেষ ছিল তাহা অনেকটা দূরীভূত হয়।

এই মঠের কর্ম্মী ও সাধুদের আধ্যাত্মিক ভিত্তি যাহাতে দৃঢ় হয় এজন্য ব্রহ্মানন্দ সদাই তাহাদের উৎসাহিত করিতেন। কখনো কখনো মধ্য রাত্রে বা শেষ রাত্রে একজন লণ্ঠনধারী সেবককে সঙ্গে নিয়া নবীন সাধুদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেন, লক্ষ্য করিতেন জপতপে কাহারা রত, আর কাহারাই বা রহিয়াছে তামস ঘুমে অচেতন। পরের দিন ভোরবেলায় ছেলেরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিত, ক্ষুব্ধ গম্ভীর কণ্ঠে মহারাজ আলস্যপরায়ণ সাধুদের তীব্র তিরস্কার করিতেন—"এ কি কচ্ছিস্ তোরা? রাত্রিকাল সাধনের প্রশস্ত সময়। আর তোরা ঘুমিয়ে তা কাটিয়ে দিচ্ছিস্। এই জোয়ান বয়সে তোদের এত ঘুম? এখন যদি ভগবান লাভ করবার জন্য না খাটবি, তবে কবে আর তোদের সময় হবে? দিনের বেলা তো কাজকর্ম্মে গল্পে-সল্পে সময় কেটে যায়। তাঁকে ডাকবি কখন?"

স্বভাব গম্ভীর, শান্ত সমাহিত পুরুষ, ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ভিতরে বাস করিত একটি আনন্দময় বালক। এই বালকটি হঠাৎ এক একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিত, তখন আনন্দরঙ্গ ও হাস্য পরিহাসে মহারাজ চারিদিক মাতাইয়া তুলিতেন। তখন তাঁহার রকমসকম দেখিয়া কে ভাবিতে পারিত যে ইনিই রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের বহুভক্ত-সেবিত অধিনায়ক ব্রহ্মানন্দ মহারাজ।

মহারাজের রহস্যপ্রিয়তার একটি কাহিনী এখানে বর্ণিত হইতেছে। সেবার দূরদেশ হইতে এক গুরুভাই বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দের

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। কয়েক দিন পরমানন্দে মঠে অতিবাহিত করার পর তিনি জানান, এবার তাঁহাকে নিজের কর্ম্মকেন্দ্রে ফিরিতে হইবে, রাত্রির ট্রেনেই তিনি রওনা দিবেন।

অনেক দিন পরে গুরুভাইকে কাছে পাইয়াছেন, মহারাজের মন চাহিতেছে না যে তিনি চলিয়া যান। কহিলেন, "আরো দু'চার দিন থেকেই যাও না। কতকাল পরে দেখা।"

"তা কি করে হয়! সেখানে যে নানা জরুরী কাজ রয়েছে। আজই আমার যাওয়া অত্যন্ত দরকার।" গুরুভাইটি উত্তরে বলেন।

ব্রহ্মানন্দ চুপ করিয়া গেলেন। গুরুভাইকে ধরিয়া রাখার জন্য গোপনে আঁটিলেন এক ফন্দী। তখনকার দিনে বেলুড় মঠ হইতে স্টেশনে যাইতে হইলে পাল্কী নিতে হইত। রাতের বেলায় পাল্কী নিয়া বেহারারা হাজির, যাত্রার প্রাক্কালে মহারাজ তাহাদের নিভৃতে ডাকিয়া ফিসফিস করিয়া কি যেন বলিয়া দিলেন। পাল্কী চলিতে শুরু করিল, গুরুভাইটি ভিতরে পা ছড়াইয়া তন্দ্রায় ঢুলিতেছেন আর মাঝে মাঝে কানে আসিতেছে বাহকদের হুম্-হুম্ আওয়াজ। ক্রমে তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

অতি প্রত্যূষে দেখা গেল, বাহকেরা পাল্কীটি নিয়া মঠের মাঠেই বিচরণ করিতেছে. আর অবিরাম হুম্-হুম্ শব্দ করিয়া চলিয়াছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া স্মিতহাস্যে গুরুভাইটিকে অভ্যর্থনা জানাইলেন।

বুঝা গেল, বাহকেরা পাল্কীটি নিয়া মোটেই স্টেশনের দিকে যায় নাই। আরোহীটি ভিতর হইতে বাহকদের মুখের আওয়াজ শুনিয়া নিশ্চিন্তে শুইয়া ভাবিতেছিলেন, পাল্কী যথারীতি তাহাদের গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। তারপর কখন হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়েন। আসলে সারারাত তিনি মঠের ময়দানেই চক্কর খাইতেছেন। মহারাজের এই রসিকতায় তিনি একেবারে বোকা বনিয়া গেলেন, চারিদিক হইতে হাসির রোল উঠিল।

গুরুভাইটি উপলব্ধি করিলেন, ব্রহ্মানন্দের এই রসিকতার মধ্যে

লুক্কায়িত রহিয়াছে পুরাতন ও অন্তরঙ্গ সখাকে আরো দুই চারদিন কাছে ধরিয়া রাখার ব্যাকুলতা। তাই দুই চোখ তাঁহার আনন্দের অশ্রুতে ছলছল হইয়া উঠে।

সে-বার ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও প্রবীণ ভক্তেরা কিছুদিনের জন্য কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে আসিয়াছেন। বিশেষ করিয়া মহারাজের আগমনে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, নানা স্থান হইতে কর্মী ও সাধুরা জমায়েত হইয়াছেন। আশ্রম ও সেবায়তন দিন রাত আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ। মহারাজ তরুণ সাধুদের রোজ উৎসাহ দিতেছেন, "ক্ষেত্রের মধ্যে কাশীধাম শ্রেষ্ঠ। কাশীর মতো জায়গা নেই। কত সাধু ঋষি তপস্বী রাজামহারাজার সাধনার ক্ষেত্র, সিদ্ধির স্থান। এখানে একটু জপ-ধ্যান করলেই জমে যায়।"

কখনো বা কাহাকে বলিতেছেন, "খুব উঠে পড়ে লাগ্‌। এ এমন স্থান যে ধ্যান আপনা হতেই হয়। রাতদিন হর-হর বোম-বোম্‌ শব্দ হচ্ছে। এখানকার হাওয়াই অন্যরকম। একটু করলেই হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়।"

মা-সারদামণিও তখন কাশীতে রহিয়াছেন। একদিন ভক্তেরা পরম সমাদরে তাঁহাকে আশ্রম ও সেবায়তনে নিয়া আসিলেন।[১] পাল্কীতে করিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া তাঁহাকে সব দেখানো হইল। দেখিয়া শুনিয়া শ্রীমার আনন্দ আর ধরে না। তাঁহার নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তনের পর এক ভক্ত মায়ের পদবন্দনা করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "মা, কেমন দেখলেন আপনার ছেলেদের সেবাশ্রম।"

প্রশান্ত কণ্ঠে সারদামণি উত্তর দিলেন, "দেখলুম, ঠাকুর ওখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন। তাই এই সব কাজ হচ্ছে। এই সব যত কিছু তাঁরই কাজ।"

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা

ভক্তটি তখনি আশ্রমে গিয়া সোৎসাহে মহারাজকে মায়ের এই মন্তব্য জানাইয়া দিলেন। শিষ্য ও ভক্তেরা সবাই এ সংবাদে আনন্দে উৎফুল্ল। ঠাকুরের প্রবীণ ভক্ত, কথামৃতকার মহেন্দ্র গুপ্ত এসময়ে আশ্রমে আসিয়াছেন। রামকৃষ্ণ ভক্তদের মধ্যে একদল কহিলেন, 'ঠাকুরের উপদেশের সারমর্ম—প্রাণপণ প্রয়াসে ঈশ্বর লাভ কর। ত্রাণকার্য্য ও সেবাধর্ম্মের কথা কখনো তিনি বলেন নাই। এসব পরিকল্পনা এসেছে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে।' মহেন্দ্র গুপ্ত এই মতবাদীদের অন্যতম। ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের অন্যান্য শিষ্য ভক্তেরা তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন। কহিলেন, "মাষ্টারমশাই, মা'র কথা শুনেছেন তো? এখন আর না মানলে চলবে না যে ঠাকুরের সম্মতি আছে সেবাকর্ম্মে। মা এই সেবাশ্রমে ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করলেন। মা বলেছেন এ তাঁর শ্রীমুখের কথা।"

মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সহাস্যে কহিলেন, "তা বটেই তো। আর এসব অস্বীকার করবার জো নেই।"

ব্রহ্মানন্দ-স্বামী বালকের মতো আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। স্বামীজীর আহ্বানে কর্ম্ম ও উপাসনার যে তত্ত্ব তাঁহারা প্রচার করিয়া চলিয়াছেন সে তত্ত্বের বিপুল সমর্থন যেন তিনি আদায় করিয়া ছাড়িলেন।

কাশীতে মা-সারদামণি অদ্বৈত আশ্রমের নিকট এক ভক্তের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। ব্রহ্মানন্দ প্রাতদিনই সেখানে মা'কে দর্শন করিতে যাইতেন। নীচতলায় দাঁড়াইয়া এই দর্শনকার্য্য চলিত। এক-একদিন বালকের মতো হাসি গানে তিনি মাতিয়া উঠিতেন, আর উপর হইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মা আনন্দ উপভোগ করিতেন।

মায়ের কাছে দর্শনার্থীদের নানা আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উত্থাপিত হইত। কোন কোনটির সমাধান তিনি নিজেই করিতেন কখনো বা বলিতেন, "রাখালের কাছ থেকে এর উত্তর জেনে নিও।" কোন কোন মুমুক্ষু ভক্তকে গৈরিক দিয়া মা নির্দ্দেশ দিতেন, "এবার রাখালের কাছ থেকে সন্ন্যাস নিও।"

একদিন মাতৃ দর্শনের জন্য ব্রহ্মানন্দ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। আশেপাশে আরো কয়েকজন উপস্থিত। মায়ের সেবিকা গোলাপ-মা দোতলা হইতে ডাকিয়া বলেন, 'রাখাল, মা জিজ্ঞেস করছেন, আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?"

ব্রহ্মানন্দ যুক্তকরে উত্তর দেন, "মার কাছেই যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে আর উপায় নেই।"

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহে মনে এক দিব্যভাবের তরঙ্গ খেলিয়া যায়। পরমানন্দে উদাত্ত স্বরে তিনি গান ধরেন:

শঙ্করী-চরণে মন মগ্ন হয়ে রওরে।
মগ্ন হয়ে রওরে সব যন্ত্রণা এড়াওরে।
এ তিন সংসার মিছে, মিছে ভ্রমিয়ে বেড়াওরে।
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধেয়াও রে।
কমলাকান্তের বাণী শ্যামা মায়ের গুণ গাওরে।
এতো সুখের নদী নিরবধি ধীরে ধীরে বাওরে।

ভাবাবেশে মত্ত মহারাজ বালকের মতো নাচিয়া নাচিয়া করতালি দিয়া গানটি শেষ করেন। তারপর হো-হো-হো শব্দে অট্টহাস্য করিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলায়ন করেন।

মা-সারদামণি এতক্ষণ অলিন্দ হইতে এই স্বর্গীয় দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলেন। বালক ভাবে বিভাবিত তনয়ের এই আনন্দরঙ্গ দেখিয়া অন্তর তাঁহার অপার প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল।

বেলুড় মঠে আর একদিন মা-সারদামণির সম্মুখে ব্রহ্মানন্দ যেরূপ দিব্যভাবে আবিষ্ট হন, তাঁহার স্মৃতিও সেবকদের মনে দীর্ঘকাল জাগরূক ছিল।

মঠ প্রাঙ্গণে কালীকীর্তন হইতেছে, লোকে লোকারণ্য। শ্রীমা উপরের ঘরে বসিয়া কীর্তন শুনিতেছেন। প্রেমানন্দ স্বামী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মহারাজকে কীর্তনের আসরে ধরিয়া নিয়া বসাইলেন। ক্ষণপরেই দেখা গেল, ভাবতরঙ্গে উদ্বেল হইয়া মহারাজ নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছেন। ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হইল তিরোহিত।

ভক্তেরা প্রমাদ গণিলেন। অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে কীর্ত্তন আসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া বসানো হইল মঠবাড়ীর নিম্নতলের এক কক্ষে।

মহারাজ স্থাণুবৎ নিশ্চল নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া আছেন। বাহ্য চেতনার কোন চিহ্ন নাই। সেবকদের বহু ডাকাডাকিতেও তাঁহার হুঁস আসিতেছে না।

মা-সারদামণি মঠে আসিবেন, তাই মহারাজ ভোর হইতে রহিয়াছেন উপবাসী। দীর্ঘসময় ভাবাবিষ্ট থাকার পরও তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতেছে না দেখিয়া প্রবীণ গুরুভাইরা শঙ্কিত হইলেন।

এ সংবাদ মাকে জানানো হইল। তাঁহার চোখে মুখে প্রসন্নতার আভা, কহিলেন, "সেজন্য ভেবো না। নাও—এই প্রসাদ রাখালকে গিয়ে দাও।"

মায়ের প্রসাদ সামনে রাখিয়া অনেকবার উচ্চ স্বরে ডাকাডাকি করা হইল, কিন্তু ধ্যানস্থ ব্রহ্মানন্দের কানে কোন কথাই পৌঁছিল না। নিমীলিত নয়নে, ঋজু হইয়া তিনি বসিয়া আছেন, মুখমণ্ডল দিব্য আনন্দের ছটায় উজ্জ্বল। এই বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার যেন আর কোন যোগাযোগ নাই।

মা-সারদামণি এবার ধীরপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। ব্রহ্মানন্দের বাহু স্পর্শ করিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে কহেন, "ও রাখাল, এই যে আমি প্রসাদ দিয়েছি, তুমি খাও।"

সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের বাহ্য-চেতনা ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়। রোমাঞ্চিত কলেবরে মায়ের চরণ বন্দনা করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন, তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে।

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের বালকবৎ ভাব ও প্রেমঘন অন্তর্লীন অবস্থার উল্লেখ করিয়া স্বামী সারদানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, "আমাদের মধ্যে একমাত্র মহারাজের ভেতরেই ঠাকুরের পরমহংস অবস্থার

হাবভাব, চালচলন দেখতে পাওয়া যায়। মহারাজকে পেছন থেকে দেখলে তো ঠাকুর বলেই মনে হত।"

ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন বহুভাবের প্রমূর্ত্ত রূপ। কর্ম্ম, জ্ঞান ও প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ দেখা যাইত তাঁহার মহাজীবনে। "কোন্ সময়ে কোন্ ভাবের স্ফুরণ হইবে তাহা বাহির হইতে দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না। অনুভূতির বিশাল রাজ্য যেন তাঁহার করতলগত, অথচ তাহা যেন স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—'মন এখন লীলা হইতে নিত্য এবং নিত্য হইতে লীলায় আসে।' তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, তাঁহার দেহ-মন যেন কোন অপার্থিব বস্তুতে গঠিত। প্রেম, পবিত্রতা, সরলতা ও সাধু প্রবৃত্তির তিনি ছিলেন মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। মহারাজের মুখমণ্ডল প্রায়ই ভাবজ্যোতিতে পরিপূর্ণ থাকিত, সর্ব্বদাই আনন্দময়—কখনও বালকের মতো হাস্যকৌতুক ও ক্রীড়ারঙ্গে মত্ত আবার কখনও নৃত্যবাদ্যে উৎফুল্ল। তাঁহার একদিকে সহজ বালস্বভাব, অপরদিকে অপূর্ব্ব গম্ভীরভাব। তিনি যখন নিজের ভাবে মত্ত থাকিয়া ভাবগম্ভীর অবস্থায় বসিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার নিকট কেহ অগ্রসর হইতে সাহস পাইত না, এবং কেহ কোন প্রশ্ন করিতে আসিলেও নীরব হইয়া থাকিত; আবার কেহ কিছু বলিতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া যাইত। যখন তিনি একাকী মঠের প্রাঙ্গণে বা কোন উন্মুক্ত দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে গম্ভীরভাবে পাদচারণা করিতেন তখন তাঁহাকে দেখিলে তেজোদৃপ্ত নরসিংহের ন্যায় বোধ হইত[১]।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে গুরুভাই, প্রতিভাধর নাট্যকার ও নট, গিরিশ ঘোষের অতি উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁহার এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"রাখাল-টাখাল

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন

আমার কাছে ছেলেমানুষ, কালকের ছোকরা। ঠাকুরের কাছে আমি যখন যেতাম, তখন আর ওদের বয়স কত? এই রাখালকে আমি ঠাকুরের মানস-পুত্র বলে মানি। তা কি শুধু শুধুই মানি? যখন আমার প্রথম হাঁফানি হল, তখন খুব জ্বর, খুব দুর্ব্বলও হয়ে পড়লুম। এখানে তো শান্তি স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ হচ্ছে। এদিকে আমার মনে এক সর্ব্বনেশে ভাবের উদয় হল—ঠাকুর একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। তখনি মনে হল—গুরুতে মানুষজ্ঞান, মানুষ-বুদ্ধি, আমি বেটা গেছি। মনে এল দারুণ অশান্তি, কিছুতেই ঠাকুরের উপর ভগবদ্‌বুদ্ধি এল না। অনেককে বললাম, যে সব ত্যাগী গুরুভাইরা আমায় দেখতে আসতো, সবাইকে বলতাম। কিন্তু সবাই শুনে চুপ করে থাক্‌তো। আমার মনে দিন দিন দারুণ অশান্তি বৃদ্ধি পেতে লাগলো। মনের সঙ্গে সর্ব্বদা লড়াই করছি—তবু ঠাকুরের উপর মানুষবুদ্ধি যায় না। এই সময় একদিন রাখাল দেখতে এল। তাঁকে সব খুলে বলে, কাতরভাবে প্রশ্ন করলাম, 'এখন উপায় কি?'

"রাখাল সব কথা শুনে হোহো করে হেসে উঠলো। বললে—'ও কিছু নয়, ঢেউ যেমন হুস করে উঁচু হয় আবার তখনি নীচু হয়ে নেমে যায়, মনটাও তেমনি। ওর জন্য কিছু ভাববেন না। শিগগীরই আধ্যাত্মিক উন্নতির একটা উঁচু স্তরে আপনাকে নিয়ে যাবে, তাই মন এমনি হচ্ছে। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না'। ন'দিদি খাবার এনে দিলে। রাখাল খেয়ে উঠে গেল, যাবার সময়ে হেসে বল্লে, 'ব্যস্ত হবেন না। কোন ভয় নেই, মন আবার তড়াক্‌ করে লাফ দিয়ে কোথায় চলে যাবে।' এই বলে যেই রাখাল বাড়ীর সামনের গলি পার হয়ে অন্য গলিতে মোড় ফিরলে, অমনি আমার কাঁধের ভূতটা যেন চলে গেল—ঠাকুরের উপর আগেকার মত ভগবদ্‌বুদ্ধি এল। সাধ করে কি ওকে মানি? রাখাল পিছন ফিরলে অনেক সময় ঠাকুর বলে আমারই ভুল হয়। ঠিক সেই রকম হাব-ভাব কথাবার্ত্তা কতক কতক পেয়েছে।'

ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তির বিচ্ছুরণ আরো অনেক ভক্তের উপর পড়িয়াছে, তাহাদের জীবনে আনয়ন করিয়াছে শান্তি, স্থৈর্য্য ও আত্মিক সাধনার সাফল্য।

ত্যাগ বৈরাগ্যের সহিত সংগঠন পরিচালকের দৃঢ়তা ও দূরদৃষ্টি ব্রহ্মানন্দের জীবনে সমন্বিত হইয়াছিল। তাই মঠ মিশন ও ভক্ত শিষ্যেরা তাঁহার প্রজ্ঞা এবং সূক্ষ্ম স্বচ্ছ দৃষ্টির সাহায্য লাভ করিয়া সতত উপকৃত হইতেন।

সে-বার এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁহার একমাত্র পুত্রের দেহান্তের পর শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন। সাধুসঙ্গের ফলে প্রাণে শান্তি আসিবে এই আশায় কিছুদিন তিনি বেলুড় মঠের কাছাকাছি একটি বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। দুবেলা মঠে যাতায়াত এবং ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করার ফলে হৃদয়ের জ্বালা কিছুটা দূর হইল। মঠের প্রতি ক্রমে তিনি খুব আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

রামকৃষ্ণের উদার মত, বিবেকানন্দের সেবাধর্ম্ম এবং ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের পূত চরিত্র তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এদিকে নিজের হৃদয়ে জাগিয়াছে নির্ব্বেদ। সংসারে কে কাহার এবং বিত্ত ও পুত্র কলত্রের স্থায়িত্বই বা কতটুকু? স্থির করিলেন, নিজের সব কিছু বিষয়-আশয় ত্যাগ করিবেন, লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসাটিও অর্পণ করিবেন মিশনের জনহিতকর কাজে।

স্বামী প্রেমানন্দের কাছে এই প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করেন এবং সকাতর অনুনয় জানান এসব গ্রহণের জন্য। প্রেমানন্দ কোমল-হৃদয় সন্ন্যাসী, ধনী ব্যবসায়ীর কথায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়, তখনি ব্রহ্মানন্দকে গিয়া সব কথা খুলিয়া বলেন।

ব্রহ্মানন্দ কিন্তু বুঝিয়া নিলেন, শোকের আঘাতে ধনী ব্যক্তিটির সাময়িক বৈরাগ্য আসিয়াছে—ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাহাকে বলিতেন, মর্কট বৈরাগ্য। শোক দূরীভূত হইলেই পূর্ব্ব-সংস্কার তাঁহার

জাগিয়া উঠিবে, তারপর মনে আসিবে তীব্র অনুশোচনা ও প্রতিক্রিয়া।

মহারাজ দুই হাত জোড় করিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু কহিলেন, "বাবুরামদা একি তুমি বলছো? ক'দিনের সাধুসঙ্গ করে লোকটির মনে ত্যাগ বৈরাগ্যের উদয় হল, আর তার সঙ্গ করার ফলে আমাদের বিষয়বুদ্ধি জেগে উঠবে?"

প্রেমানন্দ মুহূর্তে ব্রহ্মানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারধারা বুঝিয়া নিলেন। ধনী ব্যক্তিটির প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ করিলেন প্রত্যাখ্যান।

আর একবার একজন বিত্তবান ভক্ত মঠকে বেশ কিছু জমি দান করিতে ব্যগ্র হয়। মঠের সাধু সন্ন্যাসীরা সর্ব্বদাই অর্থাভাবে থাকে, তদুপরি সদাই এখানে রহিয়াছে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের প্রসাদ নেওয়া। আবাদী জমিতে উৎপন্ন চাউল মজুদ করা থাকিলে সাধুদের অনেক ঝামেলা কমিয়া যায়।

ভক্তটির আগ্রহাতিশয্যে প্রেমানন্দ সসঙ্কোচে একদিন ব্রহ্মানন্দকে এই প্রস্তাবের কথা নিবেদন করেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সেদিনও উত্তর দিলেন, "বাবুরামদা, তোমরা সিদ্ধসংকল্প সাধুপুরুষ, তোমরা যা মনে করবে তা ফলবে। ঐরূপ সংকল্প ছেড়ে দাও।"

মঠ ও মিশনের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিজের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দিয়া এমনিভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিচার করিতেন, নির্দ্ধারণ করিতেন নিজেদের নীতি ও কর্ম্মপন্থা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রভাব ও কর্ম্মের পরিধি যেমন বাড়িতে থাকে, তেমনি দলে দলে এখানে আসিতে থাকে সাধনপ্রার্থী ও মুমুক্ষু নরনারী। রামকৃষ্ণ-তনয়, মিশনের অধিনায়ক, ব্রহ্মানন্দের কাছে সাধন ও আশ্রয় নিবার জন্য ইহাদের অনেকে ব্যাকুল হয়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের মতো ব্রহ্মানন্দও দীক্ষা এবং সাধনপ্রার্থীদের আগে হইতে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া নিতেন। তাহাদের আগ্রহ,

চরিত্রের ধৃতি ও পবিত্রতার দিকে তীক্ষ্ণ, সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তারপর দীক্ষার্থীর ইষ্ট এবং সাধনপথ ধ্যানবলে জানিয়া নিয়া দিতেন তাহাকে পরমাশ্রয়। দীক্ষা দানের পূর্ব্বে প্রায়ই ঠাকুরের ইঙ্গিত বা নির্দ্দেশ আসিত। তাই একবার তাঁহাকে স্পষ্টভাবে বলিতে শোনা যায়, "ঠাকুরের আদেশেই আমি সবাইকে নাম দিচ্ছি।"

ব্রহ্মানন্দ সেবার কয়েকদিনের জন্য বলরাম ভবনে আসিয়াছেন। একদিন দুপুরে শয়নকক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন. এমন সময়ে ধনী ঘরের এক বিধবা কিশোরী ব্যাকুল হইয়া সেখানে উপস্থিত হয়, কাতর কণ্ঠে তাঁহার দর্শন প্রার্থনা করে।

সেবক ভক্তটি একথা জানাইলে মহারাজ উত্তরে বলেন, "এই বুড়ো বয়সে দিন রাত আর কত বক্‌বো বাবা?"

তদনুযায়ী মেয়েটিকে জানাইয়া দেওয়া হয়, "মহারাজ বড় ক্লান্ত, তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হবে না।"

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। আর্ত্ত স্বরে জানায়, "আমি তাঁকে একটুও বিরক্ত করবো না। একটিবার শুধু দর্শন করেই চলে যাবো।"

এবার মহারাজকে অনুমতি দিতেই হইল। মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করার পর আবার ক্রন্দন শুরু করে, অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়া যায়। এদিকে মহারাজেরও অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা, একটা দিব্য ভাবাবেশে আননখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে শান্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে ব্রহ্মানন্দ বলেন, "স্থির হও, মা, স্থির হও। কি হয়েছে আমায় বল।"

এ অভয় বাণী শুনিয়া মেয়েটি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়। তারপর দেয়ালস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোটির দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠে, "ঐ উনিই আমায় নির্দ্দেশ দিয়েছেন আপনার কাছে শরণ নিতে। তাইতো আমি পাগলিনীর মতো ছুটে এসেছি।"

অতঃপর মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে মেয়েটি সবিস্তারে সব কথা খুলিয়া বলে। সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা সে, বাল্যকালেই বিধবা হইয়াছে। এখন

বয়স প্রায় চৌদ্দ বৎসর। দীর্ঘ জীবন সম্মুখে পড়িয়া আছে, অথচ নিজের মনের দিক দিয়া তাহার কোন অবলম্বন নাই, আশ্রয় নাই। কিছুদিন যাবৎ সে বড় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, নিজের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া মন হইয়াছে নৈরাশ্যে অভিভূত। এই সঙ্কট সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কয়েকদিন আগে গভীর রাত্রে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, চাহিয়া দেখে শয্যার পাশে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন। কৃপাভরে তিনি কহিলেন, 'আমার ছেলে রাখাল বাগবাজারেই তো রয়েছে। তার কাছে তুই চলে যা।"

এই দৈবী আদেশ প্রাপ্তির পর অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া এখানে আসিয়া সে উপস্থিত হইয়াছে।

সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দ্দেশের মর্ম্ম বুঝিয়া নিতে মহারাজের দেরী হইল না। সেই দিনই কৃপাভরে এই বিধবা কিশোরীকে তিনি দীক্ষা দান করিলেন।

মহারাজের কৃপায় এই মহিলা অল্পকাল মধ্যে উন্নততর সাধনের অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং উত্তরকালে গ্রহণ করেন সন্ন্যাসজীবন।

ব্রহ্মানন্দের কৃপার ধারা ছিল সকলেরই জন্য উন্মুক্ত। এ কৃপা ধনী নির্ধন, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের কোন তারতম্য করিত না। অভিনেত্রী তারাসুন্দরী এ সময়ে মহারাজের পরমাশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশিত সাধনপন্থা অনুসরণ করিয়া অপার শান্তি লাভ করেন।

একবার অক্সফোর্ডের কোন বিশিষ্ট অধ্যাপকের কন্যা কলিকাতায় স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। এই সময়ে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দিব্য স্পর্শ এই বিদেশিনীর সম্মুখে এক অলৌকিক অনুভূতির দ্বার খুলিয়া দেয়। এ সম্পর্কে তিনি ভগিনী দেবমাতাকে এক পত্র লিখেন,—"ভগিনী, আমি যা আশা করেছিলাম তার চাইতেও অনেক বেশী বিস্ময়কর কাণ্ড! মাত্র পাঁচ মিনিট কাল দর্শন পেয়েছি, কিন্তু তাঁর দুটি হাতের ভেতর আমার হাতটি নিয়ে তিনি এমন কিছু উৎসাহপূর্ণ আশ্চর্য্যজনক কথা বলেছিলেন যাতে নিশ্চিতরূপে কিছু ঘটে গেল। যখন তাঁর ঘর থেকে বাইরে এলাম

আমার মনে হলো, আমার বয়স যেন বিশ বৎসর কমে গিয়েছে। আর নূতন আশা নিয়ে, নূতন বিশ্বাসের ধৃতি নিয়ে আত্মিক সংগ্রাম চালানোর জন্য আমি যেন প্রস্তুত হয়েছি। এ দিনটি আমার কাছে অপূর্ব্ব, এদিন থেকে কত তৃপ্তি আর আনন্দ আমি বোধ করছি। এর জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, আর যাঁরা এই দর্শন লাভে আমায় সাহায্যে করেছিলেন তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ [১]।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্যেরা জানিতেন, ব্রহ্মানন্দের মতো অপর কেহই ঠাকুরের নিয়ত সঙ্গ করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া দিনের পর দিন ঠাকুর অজস্র উপদেশ ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বিতরণ করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ শিষ্যদের অধ্যাত্মজীবন গড়িয়া তুলিতে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। নানা নিগূঢ় সাধন-নির্দ্দেশ তিনি এ সময়ে তাঁহাদের দিতেন এবং কথাপ্রসঙ্গে নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির কাহিনীও অকপটে বিবৃত করিতেন। এই সব তত্ত্ব ও তথ্যের প্রধান ভাণ্ডারী ছিলেন তাঁহার আদরের পুত্র, নিত্যকার সঙ্গী,. রাখালরাজ। তাই উত্তরকালে ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে শ্রুত এধরণের অনেক কিছু তথ্য সারদানন্দ স্বামী তাঁহার লীলপ্রসঙ্গে পরিবেশন করিয়াছেন।

ঠাকুরের নিজমুখের উপদেশবাণী সঠিকভাবে সঙ্কলিত হয় এবং ভক্ত-সাধকদের উপকারে আসে, এ বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ উদ্যোগী হন এবং কাজ অনেকটা অগ্রসরও হয়। সে-বার কাশীতে থাকাকালে মহারাজ একদিন একটি সেবককে দিয়া তাঁহার নিজের কানে শোনা কয়েকটি উপদেশ লিখাইয়া রাখেন।

সেই দিনই নিশীথ রাতে হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। ব্যস্ত হইয়া সেবকটিকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দেন। সে আসিলে বলেন, "ওরে ছাখ্ তো, উপদেশ সঙ্কলনের খাতাটা কোথায়।"

খাতাটি নিয়া আসিলে উহা হইতে একটি উপদেশ বাদ দিবার

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ: উদ্বোধন কর্ত্তৃক প্রকাশিত

নির্দ্দেশ তিনি দেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে বলেন, "ঠাকুর নিজে এসে বলে গেলেন,—"রাখাল, ওটা কিন্তু আমার কথা নয়।"

এই অলৌকিক ঘটনাটি হইতে বুঝা যায়, অন্তর্দ্ধানের পরও ঠাকুর তাঁহার প্রাণপ্রিয় শিষ্য রাখালরাজের প্রতিটি কার্য্যের উপর কি সতর্ক দৃষ্টিই না রাখিতেন।

অতীন্দ্রিয় দর্শনের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন, রাখাল ব্রজের রাখাল, কৃষ্ণ-সখা, সহস্রদল কমলের উপর কৃষ্ণের হাত ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে। এই সঙ্গে ঠাকুর এ সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেন, ব্রজের স্বরূপসত্তা যেদিন সে উপলব্ধি করিবে, নরদেহের ঘটিবে অবসান। ঠাকুরের গুরুভাইরা রাখালের কাছে একথাটি গোপন রাখিতেন। এ সময়ে স্বামী সারদানন্দ ঠাকুর-রামকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ লিখিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রেসে তাহা ছাপানো হইতেছে। গুরুভাই প্রেমানন্দ মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হন। আর সারদানন্দ পরম উৎসাহে পাণ্ডুলিপিটি তাঁহাকে পাঠ করিতে দেন।

সেদিন পাণ্ডুলিপির একটি অংশ পড়িতে গিয়া প্রেমানন্দ চমকিয়া উঠেন। রাখাল ব্রজের বালক কৃষ্ণ-সখা—এ সম্পর্কে ঠাকুরের যে অলৌকিক দর্শন ঘটিয়াছিল, সে কথাটি এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রেমানন্দ শঙ্কিত কণ্ঠে কহিলেন, "শরৎ, এ তুমি কি করেছো? ঠাকুরের কথা কি তোমার মনে নেই? এসব প্রকাশিত হলে যে মহারাজের দেহ চলে যাবে!"

সারদানন্দ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এখনি এ ভুল অবিলম্বে শুধ্‌রানো দরকার। তৎক্ষণাৎ প্রেসে লোক পাঠাইয়া দিলেন। পাণ্ডুলিপির সংশ্লিষ্ট পাতাটি ছিঁড়িয়া ফেলা হইল এবং কম্পোজ করা টাইপের অংশবিশেষও করা হইল অপসারিত।

বাগবাজারাস্থিত বলরাম বসুর ভবনটি রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর অন্যতম পুণ্যতীর্থ। বলরাম, তাঁহার পুত্র রাম ও পুরনারীরা সবাই দীর্ঘদিন

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তদের আন্তরিক সেবা করিয়াছেন। ঠাকুর নিজে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় আসিলে প্রধানতঃ বলরামের ভবনেই অবস্থান করিতেন, এখানেই ভক্তদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ করিতেন। মা সারদামণির পুণ্যস্মৃতিও এস্থানে বিজড়িত। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এবং অন্যান্য রামকৃষ্ণ ভক্তদেরও প্রিয় বাসস্থান ছিল এই বলরাম ভবন।

সে-বার ব্রহ্মানন্দ কয়েকদিনের জন্য এখানে আসিয়াছেন। কলিকাতার ভক্তদের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী চলিতেছে। এসময়ে একদিন রাত্রে একটি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিল। গভীর রাত্রে কি এক কারণে মহারাজের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হঠাৎ দেখিলেন, তাঁহার বসিবার ছোট খাটটির সম্মুখে ঠাকুর নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। ক্ষণপরেই এই মূর্ত্তি তেমনি আকস্মিকভাবে শূন্যে মিলাইয়া গেল।

সবিস্ময়ে মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন, 'ঠাকুরের এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের কারণ কি? কোন কথা না বলে, কোন কিছুর নির্দ্দেশ না দিয়ে এমন নির্ব্বাক ভাবেই বা চলে গেলেন কেন? এই আবির্ভাব কি কোন ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত বহন করছে?'

মনে নানা চিন্তার তরঙ্গ খেলিতেছে। উদাস দৃষ্টিতে ব্রহ্মানন্দ চুপচাপ শয্যায় বসিয়া আছেন। এমন সময়ে সেবক ভক্তটি তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মানন্দ মৃদুস্বরে ঠাকুরের এই অলৌকিক দর্শনের কথা তাঁহার কাছে বিবৃত করেন, সেই সঙ্গে উচ্চারণ করেন স্বগতোক্তি,—"এখন আমার মনে কোন বাসনা নেই। এমন কি তাঁর নাম করবারও আর বাসনা নেই—এখন শুধু শরণাগত, শরণাগত।"

সেদিন ভোরবেলায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। রামলালকে দেখিলেই ব্রহ্মানন্দের মনে দক্ষিণেশ্বরের পুরাতন দিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিত, ঠাকুর হাসিয়া গাহিয়া যে মধুময় পরিবেশের সৃষ্টি করিতেন তাঁহার উল্লেখ করিয়া উভয়েই মুখর হইয়া উঠিতেন।

সদানন্দময় ঠাকুর যে রসালাপ করিতেন, যে ভঙ্গীতে নাচিতেন গাহিতেন, যে আখর দিতেন তাঁহার অনুকরণ করা হইত আর হাসির তুফান উঠিত।

সেদিনও দুজনের কথাবার্ত্তা ও হাসি গান খুব জমিয়া উঠিল। প্রেমানন্দে মাতিয়া উঠিয়া মহারাজ আব্দার ধরিলেন, "রামলাল দাদা, এসো সবাই মিলে আনন্দ করে ঠাকুরের পুরানো দিনের গান শুনা যাক্। আজ সন্ধ্যায় তুমি ঢপ্ওয়ালী সেজে আসর করে বস্‌বে। হ্যাঁ, আজই।"

রামলাল বড় সরল মানুষ ছিলেন, আর মহারাজের প্রতি তাঁহার ভালোবাসাও ছিল অতি গভীর, তাঁহার কোন কথা তিনি অমান্য করিতে পারিতেন না। সলজ্জভাবে কহিলেন, "মহারাজ, আপনি বলছেন বটে, কিন্তু এতো মঠ নয়, এ যে গৃহস্থ বাড়ী। বিশেষতঃ বাড়ীতে মেয়েরা রয়েছেন। সবাই কি মনে করবেন, বলুন তো।"

মহারাজ তখন আনন্দের আবেশে মাতিয়া উঠিয়াছেন, কহিলেন, "না রামলালদা, তোমার কোন ওজর-আপত্তিই আমি শুনছি না। কে কি মনে করবে তাতে বয়েই গেল। হ্যাঁ, আজ কীর্ত্তনওয়ালীর মতো সেজেগুজে তোমায় ঠাকুরের গান সবাইকে শোনাতেই হবে। সে খুব মজা হবে, ঠাকুরকে ঘিরে যে পুরানো দিনগুলো আমরা কাটিয়েছি আবার তা মনে ঝলমল করে ভেসে উঠবে।"

বৃদ্ধ রামলালদার কোন কাকুতি-মিনতিতেই মহারাজ কান দিলেন না। ঢপ্ আজ তাঁহাকে গাহিতেই হইবে।

অগত্যা রামলালদাকে রাজী হইতে হইল। সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, তোমার কথা কে ফেল্‌তে পারে? বেশ তাই হবে।"

সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মানন্দ সেবক-ভক্তদের আদেশ দিলেন, "তোরা ভাল করে রামলালদাদাকে সাজিয়ে নিয়ে আয়।"

বলরাম-গৃহের বধূদের কাছ হইতে রঙ্গীন রেশমী শাড়ি ও গহনা আনিয়া রামলালদাদাকে নারীর বেশে সজ্জিত করা হইল। বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণের শরীর শুক্নো, সব গহনা পরানো যাইতেছে না। একথা শুনিয়া পুরনারীরা সোৎসাহে খিল্‌-দেওয়া গহনা পাঠাইয়া দিলেন। সারা বাড়ীতে তখন আনন্দ কলরব পড়িয়া গিয়াছে।

বড় হলঘরে মহারাজ আসর জমকাইয়া বসিলেন, আশেপাশে ভক্ত, কৌতূহলী দর্শকবৃন্দ। বাড়ীর মেয়েরাও চিকের আড়াল হইতে এই নাটকীয় দৃশ্য দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন।

ঢপ্‌কীর্ত্তন শুরু হইল। কীর্ত্তনওয়ালীর বেশধারী বৃদ্ধ রামলাল-দাদা নাচিয়া গান ধরিলেন,—

একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক তুয়ের মত
(ও তোর) মন মানে তো থাক্‌বি সেথা নইলে আসবি দ্রুত।
আগে ছিল এক হেঁটো জল
এখন যমুনা অতল—
সাঁতার দিতে হবে।
নৈলে যমুনার তীরে বসে ব্রজ নিরখিবে।
(বল্‌লেও বল্‌তে পারো, আগে রাখাল ছিলে
—এখন রাজা হয়েছো)
না হয় ব্রজগোপীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে।

সভার শ্রোতারূপে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ভক্ত এবং সেবকগণ সহ বসিয়া আছেন। রামলালদাদা তাঁহার নিকটে আসিয়া ঢপওয়ালীর ভঙ্গীতে অঙ্গভঙ্গী করিয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া গাহিতেছেন। বার বার দিতেছেন ভাবময় আখর—আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছো।

এই আখর শুনিয়া সহসা মহারাজের হাসি আনন্দ ও কৌতুক-চপলতায় ছেদ পড়িয়া যায়। মুহূর্তে তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে এক ভাবগম্ভীর মহিমময় মূর্ত্তি। সমুন্নত দেহ ঋজু হইয়া উঠে। নয়ন দুটি স্থির নিষ্পলক, চোখে মুখে বিস্তারিত দিব্য জ্যোতির ছটা।

এই গুরুগম্ভীর ভাবমূর্ত্তি দেখিয়া রামলালদাদা তাড়াতাড়ি তাঁহার কীর্ত্তন সমাপ্ত করেন। চিকের আড়ালে পুরনারীদের মৃদু

গুঞ্জন স্তব্ধ হইয়া যায়। ভক্ত সাধু ও সেবকেরা নির্ব্বাক হইয়া অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকেন মহারাজের দিকে। হঠাৎ ধ্যানের গভীরে কোন্ অতলে তিনি তলাইয়া গিয়াছেন।

আনন্দোজ্জ্বল, হাস্য-কৌতুকে মুখর, কীর্ত্তন-সভা ভাঙ্গিয়া যায়। ধ্যানস্তিমিত নয়ন মহারাজকে ঘিরিয়া ভক্ত ও সেবকের উৎকণ্ঠার অবধি নাই। এক স্তব্ধ গম্ভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে সেখানে।

হঠাৎ কেন ব্রহ্মানন্দের এই অদ্ভুত ভাবান্তর! 'রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছো'—কি যাদু নিহিত আছে এই কথা কয়টিতে? রামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে দেখা ব্রজের রাখাল, রাখালরাজ, আজ কি তাঁহার জন্মান্তরের স্মৃতি খুঁজিয়া পাইয়াছে? 'ব্রজের খেলা—নিত্যলীলা'---এই নিত্যলীলার উদ্দীপনার মধ্য দিয়াই কি মহারাজ তাঁহার স্বরূপস াার অতলে এমনি করিয়া ডুবিয়া গেলেন?

অতঃপর আর বেশীদিন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহার মরদেহে অবস্থান করেন নাই। বলরাম ভবনে সে-বার গুরুতর পীড়ায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। চিকিৎসক ও সেবকদের সমস্ত কিছু প্রাণপণ প্রয়াস বিফল হয়। ভক্ত ও সুহৃদ্‌দের অশ্রুসজল নয়নের সমক্ষে এই আপ্তকাম সদানন্দময় মহাপুরুষের চিরবিদায়ের লগ্নটি হয় নিকটতর।

শয্যার পাশে দণ্ডায়মান বিষাদখিন্ন ভক্তদের দিকে চাহিয়া মহারাজ বলেন, "ভয় পেয়ো না। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।"

গুরুভাইদের কাছে বিদায় নিয়া কহিলেন, "রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই, আমি ব্রজের রাখাল,—দে দে আমায় ঘুঙুর পরিয়ে দে,—আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচবো—ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্। কৃষ্ণ এসেছো। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। তোরা দেখতে পাচ্ছিস নে? তোদের চোখ নেই! আহা-হা কি সুন্দর!"

অন্তরঙ্গেরা স্মরণ করিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা—"ব্রজের স্বপ্নে ব্রজের রাখালের জীবনের অবসান হবে।" স্পষ্টতঃই বুঝা গেল শেষ মুহূর্ত্তের আর বেশী দেরী নাই।

ক্ষণকাল বিরতির পর মহারাজ মৃদু স্বরে আবার বলিয়া উঠেন, "আমার কৃষ্ণ—কমলে কৃষ্ণ, পীতবসনে কৃষ্ণ! ব্রহ্ম সমুদ্রে বটপত্রে ভেসে যাচ্ছি। এবারের খেলা শেষ হল। ঠাকুরের পা-দুখানি কি সুন্দর! ছাখো-- ছাখো, একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে—বলছে, আয়, চলে আয়।"

পরের দিনই ১৯২২ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মহাসাধক ব্রহ্মানন্দ মরলীলায় ছেদ টানিয়া দিলেন, প্রবেশ করিলেন চিদানন্দময় নিত্য ধামে।

যোগত্রয়ানন্দজী

যোগীরাজ শিবরাম স্বামী সে-বার হাওড়ার উপকণ্ঠে বালীতে গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতেছেন। গুরুদেবের দেহ মোটেই সুস্থ নাই এবং এবার এটি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। তাই নানা স্থান হইতে শিষ্য ও ভক্তেরা আসিয়া জুটিতেছেন শেষ দর্শনের জন্য। দু বেলাই চলিতেছে সৎসঙ্গ ও তত্ত্ব আলোচনা।

প্রবীণ শিষ্য কালীনাথও বালীতেই থাকেন, গুরুদেবের এখানে নিত্য করেন আসা-যাওয়া। একদিন প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র শশীভূষণকে সঙ্গে নিয়া আসেন। গুরুর চরণে দণ্ডবৎ করার পর যুক্তকরে নিবেদন করেন, "প্রভু, আপনি শশীর প্রতি একটু কৃপা দৃষ্টি করুন। নয় বৎসর বয়সে ওর উপনয়ন হয়। তারপর থেকেই দেখা দেয় এক দুরন্ত মূর্চ্ছা রোগ। ডাক্তার কবিরাজেরা সব হার মেনেছেন। এবার আপনার চরণতলে একে রেখে দিচ্ছি, এর প্রাণ রক্ষা করুন।"

বালক শশী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম নিবেদন করে, প্রসন্নমধুর হাস্যে যোগীবর তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করেন। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া স্পর্শ করেন তাঁহার মেরুদণ্ড। ধীরে ধীরে বালক সম্বিৎহারা হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে।

কালীনাথ ও অপর ভক্ত-শিষ্যেরা এবার ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়েন। গুরুজী শিবরাম স্বামী কিন্তু রহিয়াছেন নির্বিকার। প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কক্ষের একধারে সন্তর্পণে ওকে সরিয়ে রাখো, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুক।"

আদেশ তখনি পালিত হয়। শিবরামানন্দ শুরু করেন তাঁহার তত্ত্ব-আলোচনা। কেনোপনিষদের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া ভক্তদের তিনি বুঝাইতে থাকেন।

ব্যাখ্যান শেষে যোগীবর বলেন, "এবার বালক শশীকে তোমরা

একটু ছাখো তো। তার বাহ্যজ্ঞান এতক্ষণে এসে গিয়েছে। এখানে আমার সম্মুখে নিয়ে এসো।"

বালককে তুলিয়া আনা হইল। শিবরামানন্দজী হাসিয়া কহিলেন, "শশী, এবার তুমি বলো তো, এতক্ষণ এখানে বসে আমি ভক্তদের কি বুঝাচ্ছিলাম।"

শশী ঋজু হইয়া উঠিয়া বসে, চোখে মুখে বিদ্যুতের দীপ্তি খেলিয়া যায়। শান্ত ধীর কণ্ঠে যোগীবরের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সারমর্ম্ম সে বিবৃত করে। উপস্থিত ভক্ত-সাধকদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

কালীনাথের দিকে তাকাইয়া শিবরামানন্দজী কহিলেন, "বৎস, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের রোগ চিরতরে সেরে গিয়েছে, আর কোন ভয় নেই। মূর্চ্ছা রোগে সে আক্রান্ত হতো না। আসলে এটা ছিল তার পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারজাত একটা ধ্যানাবেশ। বিস্মৃতির পাথরে এতকাল এটা চাপা পড়ে ছিল, আজ খুলে দিলাম।"

প্রসন্ন কণ্ঠে আরো কহিলেন, "কালীনাথ. শশীকে আমি দীক্ষা দেবো। বয়সে বালক হলেও, সে এর যোগ্য আধার।"

অতঃপর বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে কহিলেন, "আরে শশী, তুই তো আমার তত্ত্ব আলোচনার মর্ম্ম চমৎকার বুঝিয়ে বলেছিস্। তুই তো তাহলে সত্যিকার পণ্ডিত। যা—আজ থেকে তোকে আমি পণ্ডিত বলেই ডাক্‌বো।"

পরদিনই শশীভূষণের দীক্ষা সম্পন্ন হইয়া যায়। গুরুর কৃপায় দশ বৎসর বয়স্ক এ বালকের জীবনে ঘটতে থাকে অমানুষী মেধা ও প্রতিভার বিকাশ। যে শাস্ত্রকথা, যে সাধনরহস্য বালক একবার শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ উহা তাহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। মহাসাধক, অশেষ শাস্ত্রবিদ্, সিদ্ধযোগী শিবরামানন্দজীর স্নেহাশিসে জীবন তাঁহার সার্থক হইয়া উঠিতে থাকে।

গঙ্গাতীরে দেহত্যাগের সঙ্কল্প যোগীবর নিয়াছেন। বিদায়ের লগ্নটি এবার তিনি ত্বরান্বিত করিতে চান। শিষ্য ও ভক্তদের সেদিন তাই জানাইয়া দিলেন, "আজ থেকে আমি গঙ্গাজল ছাড়া অপর

কোন কিছু পানীয় বা খাদ্যরূপে গ্রহণ করবো না। অচিরে প্রাণের উৎক্রমণ ঘটবে, তখন এ দেহটিকে তোমরা পুণ্যতোয়া গঙ্গার গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়ো।”

আশ্রিত শিষ্যদের অন্তরে আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়া ঘনাইয়া আসে, অশ্রুসজল চক্ষে দুবেলাই তাঁহারা শিবকল্প গুরুদেবকে দর্শন করিতে আসেন।

ইতিমধ্যে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। উপবাসে যোগীরাজের তনু ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। শেষ শয্যায় শায়িত থাকিয়া ইষ্টধ্যানে সদা বিভোর হইয়া আছেন।

বালক-শিষ্য শশী সেদিন আসিয়া গুরুর পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়েন, আর্ত্ত কান্নায় বক্ষ তাহার ভাসিয়া যায়।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে থাকেন, “প্রভু, এভাবে স্বেচ্ছায় কেন আপনি দেহ ছেড়ে দিচ্ছেন ? আমি প্রাণ পেয়েছি, পরমাশ্রয় পেয়েছি আপনার কৃপায়। সেই আপনি আজ কেন এমন নিষ্ঠুর হচ্ছেন ? আপনার বিহনে কি করে আমি জীবন কাটাবো ?”

গুরু কহিলেন, “পণ্ডিত, স্থির হও। বয়সে বালক হলেও সত্য বস্তু তোমার ভেতরে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। তুমি কেন এত ধৈর্য্য-হারা হবে ? আমি ধ্যানাসনে বসে দেহত্যাগ করবো আগামী কাল। এর কোন নড়চড় হবার উপায় নেই।”

শশী ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, “আপনার অভাবে কে দেবে আমার মতো হতভাগ্যকে সাধনতত্ত্বের উপদেশ ? কে দেবে ইষ্টলাভে সহায়তা ?”

“তোমার ভবিষ্যতের জন্য ভেবো না, পণ্ডিত সে ভাবনা আমার। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার সাধনসত্তায় তত্ত্ব স্ফুরিত হয়ে উঠবে, শাস্ত্রজ্ঞান ও যোগ সিদ্ধি হবে তোমার করতলগত। আমি বিদেহী হয়েও তোমার সঙ্গে থাকবো চিরকাল, আমার আশীর্ব্বাদে উত্তর-জীবনে হবে তুমি আপ্তকাম। আরও একটা কথা স্মরণ রেখো। আমার সার্থকনামা শিষ্য চিদ্‌ঘনানন্দ রইলো। তার কাছ থেকে শাস্ত্র ও সাধনসম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব কিছু সাহায্য তুমি পাবে।”

কালীনাথ ইতিমধ্যে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। গুরু তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস, আমার দেহান্তের সময় নিকটবর্ত্তী। যাবার আগে তোমায় প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করে যাই। আর বলে যাই তোমায়, তোমার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র শশীর সম্বন্ধে আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী। উত্তরকালে সে কীর্ত্তিত হবে এক শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্ সাধকরূপে। অমানুষী প্রতিভা, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি আর অসামান্য যোগসিদ্ধির হবে সে অধিকারী। যে দীক্ষা ও সাধন সে আমার কাছে লাভ করেছে তার পরিণত রূপ বিস্মিত করবে দেশবাসীকে।"

পরের দিনই তাঁহার পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত লগ্নে স্বামী শিবরামানন্দ চিরসমাধিতে মগ্ন হন। সমবেত ভক্ত শিষ্যেরা তাঁহার মরদেহটি এক কাষ্ঠসম্পুটে স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে দেন গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন।

গুরু মরলীলায় ছেদ টানিয়া দিলেন বটে কিন্তু তাঁহার বিদেহী লীলায় ইহার পরেও ছেদ পড়ে নাই। উত্তরকালে তাঁহার কৃপাদত্ত বীজ শশীভূষণের জীবনে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া উঠে। মনীষা, প্রজ্ঞা ও লোকশক্তির বিস্ময়কর সমাহার দেখা যায় তাঁহার জীবনে। নাম হয়—যোগত্রয়ানন্দ। বাংলা ও কাশীর অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে এক করুণাঘন আচার্য্যরূপে ঘটে তাঁহার অভ্যুদয়।

শশীভূষণের জন্ম হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। কলিকাতার ওপারে হাওড়া জেলার বালীতে তাঁহার পৈতৃক নিবাস। পিতা রামজীবন সান্ন্যাল ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। সরল ও সৎ প্রকৃতির লোক বলিয়া সবাই তাঁহাকে ভালবাসিত। আর শশীভূষণের জননী বিশ্বেশ্বরী দেবী ছিলেন ধর্ম্মপ্রাণা উদার স্বভাবা।

ঘরে কুলদেবতা নারায়ণ বিগ্রহ স্থাপিত ছিলেন, প্রতিদিন তাঁহার পূজা না করিয়া রামজীবন জলগ্রহণ করিতেন না। রামজীবনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালীনাথ ছিলেন সাত্ত্বিক ধরণের লোক। সাধনভজন, পূজা অর্চ্চনা ও দেবদ্বিজের সেবাতেই দিনের বেশী সময় তিনি নিরত থাকিতেন। যোগীরাজ শিবরামানন্দ স্বামীর অনুগৃহীত ও অন্তরঙ্গ

শিষ্যদের তিনি অন্যতম। ইঁহারই মাধ্যমে বালক শশীভূষণ যোগীরাজের চরণতলে উপনীত হন, লাভ করেন তাঁহার কৃপা-প্রসাদ।

স্বামী শিবরামানন্দের আশিস ও ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হইতে দেরী হয় নাই। দুই দশকের মধ্যেই শশীভূষণ পরিচিত হইয়া উঠেন একজন অতুলনীয় শাস্ত্রবিদ্ ও শক্তিধর সাধকরূপে। শত শত আর্ত্ত ও মুমুক্ষু তাঁহার শরণ নিয়া কৃতার্থ হয়।

গুরুর অন্তর্দ্ধানের পর হইতে গুরুগতপ্রাণ সাধক নিজেকে শশীভূষণ নামে আর পরিচিত করেন নাই, নিজেকে আখ্যাত করেন শিবরাম-কিঙ্কর নামে। কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই তিন যোগেই ছিল তাঁহার অসামান্য অধিকার, তাই ভক্ত ও শিষ্যেরা তাঁহাকে অভিহিত করিতে থাকেন যোগত্রয়ানন্দ নামে। উত্তরকালে কলিকাতা এবং কাশীর সারস্বত ও সাধকসমাজে তাঁহার এই নামটিই বেশী প্রচলিত হইয়া উঠে। শশীভূষণের তখন কিশোর বয়স। এই বয়সে লোকে খেলাধূলা ও হাসি-আনন্দেই মত্ত থাকে। কিন্তু তাহার বেলায় দেখা যায় ভিন্ন রূপ। গঙ্গাস্নান, পূজা পাঠ ও শাস্ত্র অধ্যয়নেই বেশী সময় সে অতিবাহিত করে। তদুপরি রহিয়াছে গুরু প্রদত্ত মন্ত্রজপ ও ধ্যান-ধারণা। অসাধারণ শ্রুতিধর ও মেধাবী সে, যে কোন গ্রন্থ একবার পাঠ করে, যে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শ্রবণ করে তখনি উহা তাঁহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। প্রতিভাধর কিশোরকে আশেপাশের লোকেরা স্বভাবতঃই কিছুটা সমীহ করিয়া চলে।

তখন শীতকাল। লাল রঙে ছোপানো একটি মোটা চাদর শশীভূষণকে কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেদিন এটিকে কাঁধে ফেলিতে গিয়া হঠাৎ একটা তামাসা করার ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠে। লাল চাদরটি নেংটির মতো পরিধান করিয়া জননীর সম্মুখে উপস্থিত হন, বলেন, "চেয়ে ত্যাখো মা, আমি কেমন সন্ন্যাসী সেজেছি।"

তামাসাটি জননী তখনকার মতো উপভোগ করেন বটে, কিন্তু মনে তাঁহার কি জানি কেন একটা দুর্ভাবনা জাগে। শশী তাঁহার আর পাঁচটা ছেলের মতো নয়, পূজাপাঠ জপ নিয়াই এ বয়সে বিভোর

হইয়া আছে। ভয় হয়, শেষটায় সত্যি সত্যিই ঘর ছাড়িয়া সে সন্ন্যাসী না হয়। স্বামীকে জানাইলেন তাঁহার দুশ্চিন্তার কথা, তারপর কহিলেন, "এ ছেলেকে ঘরে ধরে রাখা কিন্তু দায় হবে। তাড়াতাড়ি এর বিয়ে দাও, সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে যদিবা কিছুটা বদলায়।"

পত্নী বিশ্বেশ্বরীর কথা রামজীবনের মনঃপূত হইল, বড়ভাই-এর অনুমতি নিয়া পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ তিনি করিয়া ফেলিলেন।

গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণ করিয়া সংসারের জালে আবদ্ধ হইবেন, একথা শশীভূষণ কখনো কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বরং সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া ঈশ্বর লাভের জন্য তপস্যা করিবেন, ইহা ছিল মনের গোপন আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু পিতা ও মাতার আদেশকে তিনি জ্ঞান করেন দেবতার আদেশরূপে, তাই সেদিন কোন প্রতিবাদ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

এক শুভ লগ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। শশীভূষণের বয়স তখন তের, আর পত্নী হরিদাসীর নয়।

যৌবনে উপনীত হওয়ার পর শশীভূষণের শাস্ত্রজ্ঞানের পিপাসা ও সাধননিষ্ঠা আরো তীব্র হইয়া উঠে। বেদ আগম স্মৃতি পুরাণের বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলেন, পাঠ করাই শুধু নয়, এই সব গ্রন্থের দুরূহ তত্ত্ব অবলীলায় তাঁহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। এই সঙ্গে সদ্‌গুরু শিবরাম স্বামীর প্রদত্ত সাধন ও তাঁহার জীবনে আনিয়া দেয় মূল্যবান্ অধ্যাত্ম সম্পদ। গুরু মহারাজের প্রধান শিষ্য চিদ্‌ঘনানন্দ-স্বামী মাঝে মাঝে এ অঞ্চলে আগমন করেন। তাঁহার শিক্ষাধীনে থাকিয়াও দিনের পর দিন শশীভূষণের সাধন প্রস্তুতি পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিতে থাকে।

পিতার আয় অতি নগণ্য, শশীভূষণ নিজে তখনও কোন অর্থকরী বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। অথচ সংসারে অনটন সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। এসময়ে কিছু উপার্জ্জন অবশ্যই করা দরকার। ভাবিলেন, কবিরাজী চিকিৎসা শিখিলে মন্দ কি?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল পুরাতন দিনের এক দুঃখময় স্মৃতি। শশীভূষণ তখন মারাত্মক উদরাময় রোগে ভুগিতেছেন, কবিরাজী চিকিৎসা চলিতেছে, কিন্তু রোগ কিছুতেই সারিতেছে না। ঘরে টাকা-কড়ির অভাব, চিকিৎসককে কিছুদিন ঔষধের দাম দেওয়া যায় নাই। তিনি বাঁকিয়া বসিলেন, টাকা না পাইলে ঔষধপত্র আর দিতে পারিবেন না।

শশীভূষণ মিনতি করিয়া, সজল চক্ষে, কহিলেন, "কব্‌রেজ মশাই, আপনি দয়া করে আমার রোগ দূর করুন, আমায় বাঁচিয়ে তুলুন। যে টাকা আপনার পাওনা থাকবে তা গণ্য হবে আমার নিজের ঋণ বলে। আমার উপার্জ্জন শুরু হ'লে, এই ঋণ আমি অবশ্যই শোধ করে দেবো।"

কবিরাজের হৃদয় গলিল না, ঔষধ দেওয়া তিনি বন্ধ করিলেন। তারপর নানা গ্রাম্য টোট্‌কা ঔষধ ব্যবহার করিয়া, দীর্ঘদিন ভুগিয়া, শশীভূষণ ঐ দুরন্ত রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান।

তখন তিনি ভাবিতে বসেন, 'চিকিৎসকের মনোভঙ্গী যদি এরূপ হয় তবে তো দরিদ্র জনসাধারণের কষ্টের অবধি নেই। দুবেলা যাদের অন্ন জোটে না, ঔষধের দাম ও চিকিৎসকের পাওনা টাকা কি করে তারা মেটাবে? না—আমায় তবে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পড়তেই হবে। চিকিৎসা-বৃত্তি আমি গ্রহণ করবো, সাধ্যমতো দূর করবো দরিদ্র জনগণের কষ্ট।'

এবার স্থির কবিলেন, আগেকার ইচ্ছাটিকেই বাস্তব রূপ তিনি দিবেন, কবিরাজী শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়া চিকিৎসা শুরু করিবেন, ইহা দ্বারা সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ এবং জনকল্যাণ দুই-ই সাধিত হইবে।

অলৌকিক মেধা ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন শশীভূষণ। তাই অল্পদিনের মধ্যেই প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সঙ্গে অথর্ব্ব বেদের রোগনাশক মন্ত্র ও দ্রব্যগুণ সম্পর্কিত জ্ঞানও তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

বিদ্যাবত্তা ও প্রয়োগ নৈপুণ্য তাঁহার অসামান্য। তাই চিকিৎসক হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করিতে বেশী দেরী হয় নাই।

জটিল রোগে আক্রান্ত যে সব রোগীকে অভিজ্ঞ ডাক্তারেরা পরিত্যাগ করিতেন, তাহাদের অনেকেই শশীভূষণের চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইতে থাকে। ফলে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়ে।

চিকিৎসাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিলেও, শাস্ত্রপাঠ ও সাধন-ভজনেই দিন রাতের বেশী সময় তিনি ব্যয় করিতেন। এক একদিন দেখা যাইত, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া প্রায় সারা রাত অতিবাহিত করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বর গ্রামে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অভ্যুদয় তখন সবে শুরু হইয়াছে। তাঁহার অমৃতময়ী কথা শোনার জন্য, সাধন নির্দ্দেশ নিবার জন্য, জড়ো হইতেছে কৌতূহলী দর্শক ও মুমুক্ষু ভক্তের দল। নবীন সাধক শশীভূষণও মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন, আপ্তকাম মহাসাধকের মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়া হইতেন কৃতকৃতার্থ।

বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব দিন দিন বাড়িতেছে, আয় অতিশয় সীমিত। কারণ যে সব রোগীরা শশীভূষণের কাছে চিকিৎসার জন্য আসে তাহাদের অধিকাংশই দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট—অন্ন বস্ত্রেরই সংস্থান নাই, চিকিৎসার ব্যয় কি করিয়া বহন করিবে? ইহার উপর আছে শশীভূষণের নানা গোপন দান। ফলে পরিবারে অভাব অনটন লাগিয়াই আছে।

অপর দিকে কঠোর সঙ্কল্প নিয়া শশীভূষণ সাধনভজন চালাইয়া যাইতেছেন, কিন্তু আশানুরূপ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি তো তাঁহার হইতেছে না। নৈরাশ্যে এক একদিন মুহ্যমান হইয়া পড়েন। সেদিন তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে ছুটিয়া আসেন।

ঠাকুর তখন ভবতারিণীর মন্দিরে। শশীভূষণ ধীর পদে অগ্রসর হইয়া সিঁড়ির নীচে অপেক্ষায় রহিলেন, নামিয়া আসার সময়

ঠাকুরকে ধরিবেন। আজ তাঁহার হৃদয়ের আগুন ঠাকুরকে নির্ব্বাপিত করিতেই হইবে।

মন্দির হইতে অবতরণের সময় ঠাকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন, কহিলেন, "কে গো, আমাদের পণ্ডিত না?" শিবরামানন্দের দেওয়া ঐ উপনামটি ঠাকুরও ব্যবহার করিতেন।

যুক্তকরে শশীভূষণ উত্তর দেন, "আজ্ঞে হাঁ, আমিই বটে। আপনার কাছে নিভৃতে আমার কিছু বলার আছে।"

"তা, কি বলবে বল।"

"দেখুন, প্রাণের জ্বালা কিছুতেই নিবৃত্ত হচ্চে না। আপনার কৃপা স্পর্শ চাই। পবিত্র চরণখানি আমার বুকে একবার রাখুন, তাহলে যদি শান্তি পাই।"

"পণ্ডিত, জ্বালায় জ্বলছো, এতো ভালো কথা। এর পরেই তো আসে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন, আসে পরম শান্তি, পরম অমৃত।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণের চরণখানি কিছুক্ষণ বক্ষে ধারণ করিয়া শশীভূষণ দিব্য আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে ঠাকুর কহিলেন, "পণ্ডিত, স্থির হও। এবার উঠে বসো। আমি ওপারে, তোমাদের বালীতেই যাচ্ছি বাবা-কল্যাণেশ্বর শিব দর্শন করতে। ভক্তেরাও সঙ্গে যাচ্ছে। তুমিও যাবে চল।"

শশীভূষণ সোৎসাহে রাজী হইলেন। শিব দর্শন উপলক্ষ করিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের পূত সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা পরম আনন্দে কাটিয়া গেল। ঠাকুরের ভাগবতী কথা শুনিয়া ও ধ্যানতন্ময় দিব্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া শশীভূষণের যেন আর আশা মিটে না।

মন্দিরের দর্শনাদি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর নিজে যাচিয়া শশীভূষণের বালীস্থিত ভবনে পদার্পণ করিলেন। আনন্দরঙ্গে সেই অঞ্চলের সবাইকে মাতাইয়া ঠাকুর যখন ফিরিয়া চলিলেন তখন শশীভূষণের হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইয়াছে, দেহমনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে দিব্য আনন্দের রসধারায়।

বিদায় নিবার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ কহিলেন, "পণ্ডিত, তুমি

ব্রাহ্মণ, সদ্‌বংশীয়। চিকিৎসা বৃত্তি থেকে টাকা রোজগার করছো,—ও টাকা ভালো নয়। এ বৃত্তি ছেড়ে দাও।”

ক্ষণপরেই ঠাকুর আবার মন্তব্য করেন, “তাই তো এত বড় সংসারের দায়িত্ব রয়েছে। চিকিৎসার আয় না থাকলে চলবেই বা কেমন করে? আচ্ছা, তুমি চিকিৎসা করে টাকা নেবে, কিন্তু সংসার চালানোর জন্য ঠিক যতটুকু দরকার তাই নেবে।”

শ্রীরামকৃষ্ণের এই নির্দ্দেশ শশীভূষণ সেদিন শিরোধার্য্য করিয়া নেন। অতঃপর নিজের দক্ষতায় বহু দুশ্চিকিৎস্য রোগ তিনি নিরাময় করিয়াছেন বটে, কিন্তু আয় বৃদ্ধি কোনদিন করেন নাই। ফলে সংসারে দারিদ্র্যের কষ্ট রহিয়াই গেল।

ঈশ্বর-দত্ত প্রতিভা ও মনীষা নিয়া শশীভূষণ জন্মিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে প্রথম জীবনে নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান অধিগত করার স্পৃহাও ছিল প্রচুর। তাই শুধু সংস্কৃতে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়নেই তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজীতে ব্যুৎপন্ন হইয়া আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রধান গ্রন্থগুলিও তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন।

কিন্তু শশীভূষণের জীবনের মূল লক্ষ্য –ভারতীয় ঋষিদের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করা, ঋষিদের জ্ঞানবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পন্থা অনুসরণ করিয়া ঋদ্ধি ও সিদ্ধি করায়ত্ত করা। তাই বেদ বেদান্ত, আগম, স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ ও সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি কোন কিছুর অধ্যয়নই তিনি বাকী রাখেন নাই।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করিতে গিয়া শশীভূষণ শুধু চরক সুশ্রুত প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের পন্থা যেমন অনুসরণ করিতেন, তেমনি করিতেন অথর্ব্ব বেদের মন্ত্র ও ঔষধি প্রয়োগ। কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রশক্তির উপরই তিনি নির্ভর করিতেন বেশী।

শশীভূষণ তখন বরানগরে বাস করিতেছেন। এক ভদ্রলোক কয়েক বৎসর যাবৎ দুরারোগ্য বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া আছেন,

কলিকাতার প্রবীণ চিকিৎসকদের সব কিছু চেষ্টা বিফল হইয়াছে এবং রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহার প্রাণের আশা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমন সময়ে ঐ রোগীটি শশীভূষণের শরণ নেয়। আর্ত্তস্বরে জানায়, "মরতে হয় তো আপনার চিকিৎসাধীনে থেকেই মরবো। শেষ চেষ্টা হিসেবে, যা কিছু করবার আপনি তা করুন।"

দ্রব্যগুণের সব পরীক্ষাই এ যাবৎ এই রোগীর উপর করা হইয়াছে। ডাক্তার ও কবিরাজেরা সাধ্যমতো সব কিছু করার পর হার মানিয়াছেন। এবার শশীভূষণ এই দুশ্চিকিৎস্য রোগের জন্য ব্যবস্থা করিলেন ঋষিদের উদভাবিত মন্ত্রের প্রয়োগ। "শুধু বৈদিক মন্ত্রের অচিন্ত্য শক্তির আশ্রয় লইয়া তিনি এই রোগীর অসহ্য যন্ত্রণা অল্পকালের মধ্যেই পূর্ণভাবে শান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ তিনি ঋগ্বেদ অথবা অথর্ব্ববেদের মন্ত্র প্রয়োগ করিতেন। বৈদিক মন্ত্রের উপর তাঁহার এইরূপ আধিপত্য ছিল যে তিনি যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারাই অল্পক্ষণের মধ্যে রোগের যন্ত্রণা ও উপসর্গের জটিলতা দূর করিতে সমর্থ হইতেন। এই ভদ্রলোকটির বেলায়ও তিনি সেইরূপ করিয়াছিলেন।

"ভদ্রলোকটিকে সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার মস্তক হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত নিজের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা সঞ্চালন করিতে করিতে বিধি অনুসারে তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চারণ ও সঞ্চালন ক্রিয়া কয়েকবার অনুষ্ঠিত হইলে রোগীর অসহ্য বেদনা আশ্চর্য্যরূপে শান্ত হইয়া যায়, তাঁহার দেহের মধ্যে একপ্রকার স্নিগ্ধ শান্তিময় ভাব অনুভূত হয়। সুদীর্ঘকাল স্থায়ী এই দেহের যন্ত্রণা নিবৃত্ত হইতে পাঁচ মিনিটের অধিক সময় লাগে নাই। ইহার পর বেদনার আর পুনরাবৃত্তি হয় নাই এবং কয়েকদিন পর্য্যন্ত ঐ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে রোগীর মুখ্য রোগও নির্ম্মূল ভাবে অপগত হয়[১]।"

এই রোগীটি উত্তরবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নের

১ সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ : ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

বন্ধু ছিলেন। তর্করত্ন মহাশয় রোগীর নিজ মুখ হইতে শশীভূষণের এই মন্ত্রচিকিৎসার কথা শুনিতে পান এবং এই তথ্যটি ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের কাছে প্রকাশ করেন।

গুরু মহারাজ শিবরামানন্দ স্বামীর কৃপায় ও জন্মান্তরের অর্জিত পুণ্যবলে শশীভূষণ অনেক সময় সূক্ষ্মলোকচারী মহাত্মা ও দেবদেবী-দের দর্শন পাইতেন, শাস্ত্রতত্ত্বের বহু দুরূহ বিষয় ইঁহাদের কৃপায় জানিতে সমর্থ হইতেন।

এক সময়ে তিনি ঋষি পাণিনির মহাভাষ্য (পতঞ্জলি-কৃত) অধ্যয়ন করার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। বাংলায় তখন পাণিনির চর্চা তেমন হইত না এবং উপযুক্ত শিক্ষাদাতারও অভাব ছিল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, দক্ষিণী পণ্ডিত গোবিন্দ শাস্ত্রী ভরদ্বাজের তখন খুব নামডাক। বিশেষ করিয়া পাণিনির অধ্যাপনায় তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। ভাবিয়া চিন্তিয়া শশীভূষণ তাঁহারই কাছে গিয়া উপস্থিত। প্রণাম নিবেদনের পর যুক্তকরে বলেন, "আমার একান্ত অভিলাষ, আপনার মতো মহাপণ্ডিতের কাছে পাণিনি পাঠ করি। আপনি আমায় কৃপা করুন।"

শাস্ত্রী মহোদয় তখন তাঁহার ছাত্রদের নিয়া তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন। কহিলেন, "এখানে যাদের দেখছো, এরা সবাই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। আমি তো বাইরের কোন ছাত্রের অধ্যাপনা করিনে। সে ইচ্ছাও নেই, সময়ও নেই।"

শশীভূষণ কিছুতেই ছাড়িবেন না, বার বার মিনতি করিতে থাকেন, "আমায় পাণিনির মহাভাষ্যের পাঠ আপনাকে দিতেই হবে, একান্তভাবে আমি আপনার শরণ নিচ্ছি।"

শাস্ত্রীজী তাঁহার সঙ্কল্পে অটল। শশীভূষণকে বার বার মিনতি করিতে শুনিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। কটূক্তি করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন।

এই রূঢ় প্রত্যাখ্যান শশীভূষণের হৃদয়ে বড় বাজিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি অন্নজল ত্যাগ করেন, তীব্র মনোকষ্ট নিয়া বার বার ভাবিতে থাকেন নিজের ব্যর্থতার কথা। সঙ্গে সঙ্গে অন্তস্তল হইতে উদ্গত হয় আকুল প্রার্থনা, "হে প্রভু, হে দেবাদিদেব, তুমি তো জান, নিজ স্বার্থের জন্য আমি এমন ব্যাকুল হই নি, ঋষিশাস্ত্র অধ্যয়নের চাবিকাঠিই আমি হাতড়ে বেড়াচ্ছি, যাতে ত্রিতাপ তাপিত মানুষের কল্যাণ হয় তা-ই তো আমি সারা অন্তর দিয়ে চেয়েছি। প্রভু, এবার থেকে আর আমি মানুষের দ্বারে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য ভিক্ষা করতে যাবো না, থাকবো একান্তভাবে তোমারই সাক্ষাৎ কৃপার ওপর নির্ভর ক'রে।"

সারা দিনরাত অনাহারে কাটিয়া যায়। গভীর রাতে পূজার ঘরে বসিয়া শশীভূষণ জপে নিবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে চাহিয়া দেখেন ক্ষুদ্র কক্ষটি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে, আর অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন জটাজুটমণ্ডিত এক ঋষিকল্প মহাপুরুষ।

ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়াই তো শশীভূষণ পূজায় বসিয়াছিলেন, তবে কি করিয়া এই বৃদ্ধ তাপস ভিতরে ঢুকিলেন? বিস্মিত হইয়া একথা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে স্নেহপূর্ণ স্বরে মহাপুরুষ কহিলেন, "বৎস, তুমি এত মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছ কেন? সারাদিন অন্নজলই বা গ্রহণ কর নি কেন? শরীরকে কেন শুধ্ শুধ্ কষ্ট দিচ্ছ? শাস্ত্রী তোমার জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করে নি, এজন্যই কি তুমি এমন মর্ম্মাহত? প্রকৃত জিজ্ঞাসু, তপস্যাপরায়ণ ও একনিষ্ঠ সাধকেরা ভগবানের কাছ থেকেই তো জ্ঞান আহরণ করে। তুমি হতাশ হয়ো না, আমিই তোমায় শিক্ষা দেবো ব্যাকরণ ভাষ্যের রহস্য। আমি যে গ্রন্থ রচনা করেছি, তা শিক্ষা দেবার সামর্থ্য কি আমার নেই?"

শশীভূষণ উপলব্ধি করিলেন, আবির্ভূত মহাত্মাটি হইতেছেন স্বয়ং পতঞ্জলি দেব, কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহাকে তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন।

আর কালবিলম্ব না করিয়া আগন্তুক ঋষিবর শশীভূষণের কাছে

পাণিনি মহাভাষ্যের ব্যাখ্যান শুরু করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সকল কিছু তত্ত্ব সকল কিছু রহস্য তিনি বুঝাইয়া দিলেন। শশীভূষণের মনের সংশয় এবার ঘুচিয়া গেল। দিব্য আনন্দে তিনি আপ্লুত হইলেন।

ঋষির আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধানের মধ্যে ব্যবধান বেশী ছিল না। এই অত্যল্প সময়েই মহাত্মা দুরূহ মহাভাষ্যটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল? এই চিন্তা মনে উঠার সঙ্গে সঙ্গে শশীভূষণ উপলব্ধি করিলেন, সাধারণ জীবজগৎ কালের যে মানে অবস্থিত থাকে, বিদেহী শক্তিধর মহাত্মার কালের মান তাহা হইতে সূক্ষ্মতর। মুহূর্ত্তে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার তাঁহার কৃপায় যে কোন মানুষ আয়ত্ত করিতে সক্ষম।

ঋষি প্রদত্ত জ্ঞান সত্য সত্যই তিনি ধারণ করিতে পারিয়াছেন কিনা, তখনই শশীভূষণ ইহা পরীক্ষা করিতে ব্যগ্র হন। দেখিলেন, ভাষ্য খুলিয়া পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে উহার নিহিতার্থ তাঁহার নিকটে স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে। ঋষির কৃপার বলে জন্মান্তরের প্রাক্তন বিদ্যা উৎসারিত হইতেছে ইন্দ্রজালের মতো। এই দৈবী বিদ্যা শশীভূষণ কিছু সংখ্যক উত্তম অধিকারীকে উত্তরকালে বিতরণ করিয়াছিলেন।

আর একবার, শিবরাত্রির মহানিশায় সাধক শশীভূষণ কৃপা লাভ করেন ঋষি গৌতমের। সমগ্র ন্যায়দর্শনের তত্ত্ব এসময়ে তিনি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন।

পবিত্রতা, ত্যাগ বৈরাগ্য ও তপঃশক্তির সহিত শশীভূষণের জীবনে মিলিত হয় ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনের ব্যাকুলতা। ইহার ফলেই সূক্ষ্মলোকচারী মহাত্মাদের কৃপালীলা এভাবে তাঁহার জীবনে বিস্তারিত হয়।

দৈবী শক্তিসম্পন্ন শাস্ত্রবিদ্‌ ও সাধকরূপে তাঁহার খ্যাতি এবার কলিকাতা ও শহরতলীগুলিতে প্রচারিত হয়। ধীরে ধীরে তাঁহার চারিপাশে গড়িয়া উঠে একটি জিজ্ঞাসু ভক্তগোষ্ঠী। প্রায়ই তাঁহারা শাস্ত্র পাঠের জন্য সাধক শশীভূষণের কুটিরে সমবেত হইতেন। এই

জিজ্ঞাসুদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভক্ত নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ (উত্তরকালের বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ) এবং প্রেমানন্দ ভারতীকেও দেখা যাইত।

শশীভূষণের তপস্থাময় জীবনে দেখা গিয়াছিল কর্ম্ম, শক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব মিলন। জীবন যুদ্ধের জয় পরাজয় ও লাভ-ক্ষতিতে তিনি ছিলেন নির্ব্বিকার ও নিরাসক্ত। ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, একনিষ্ঠা ভক্তি নিয়া, অযাচকভাবে তিনি তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বহু ত্যাগী ভক্তের পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না। এই সঙ্গে অধ্যাত্মজ্ঞান ও প্রাচীন শাস্ত্রতত্ত্বের তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট ধারক বাহক। তাঁহার সাধনজীবনে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের এই সমাহার লক্ষ্য করিয়া বিশিষ্ট ভক্ত ও অনুরাগীরা তাঁহার নাম দেন—যোগত্রয়ানন্দ। এখন হইতে দর্শনার্থী ও সাধনকামী ভক্তদের মধ্যে এই নামেই প্রধানতঃ তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

জননী অনেক দিন হয় কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছেন, আর যে আরোগ্যলাভ করিবেন এমন আশা নাই। পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "শশী, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে বাবা, এবার তুই আমায় কাশীধামে নিয়ে যা। সেখানে প্রভু বিশ্বনাথের পুণ্যভূমিতে শেষ নিঃশ্বাস আমি ত্যাগ করতে চাই। তাড়াতাড়ি এর একটা ব্যবস্থা তোকে করতে হবে।"

মায়ের কথা শিরোধার্য্য করেন যোগত্রয়ানন্দ, তাঁহাকে আশ্বাস দেন, "মা, তুমি নিশ্চিত হয়ে থাকো। যে ক'রেই হোক তোমার কাশীবাসের বন্দোবস্ত আমি করবোই।"

জননীকে তো কথা দিলেন, এখন উপায়? সংসারে যত্র আয় তত্র ব্যয়, হাতে টাকা-কড়ি কোন সময়েই কিছু থাকে না। অনেক চেষ্টা করিয়া এক অর্থবান্ রোগীর নিকট হইতে একশত টাকা ধার করিলেন।

রাস্তায় কাশী প্রত্যাগত এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার দেখা। যোগত্রয়ানন্দকে তিনি কহিলেন, "কাশীতে যাচ্ছো যাও, কিন্তু সেখানে গুণ্ডার বড় উৎপাত। বটুক পাঁড়ে নামে এক বড় পাণ্ডা আছে, সেখানে তার খুব প্রতিপত্তি। আমার অনেক দিনের চেনা। তাকে আমার নাম করে আগে থাকতে চিঠি দিয়ে দাও। তার বাড়ীতেই উঠ্‌বে। কোন ভয় ভাবনা থাক্‌বে না।"

সবাইকে নিয়া যোগত্রয়ানন্দ বটুক পাঁড়ের হাবেলীতেই আশ্রয় নিলেন। মোক্ষদায়িনী কাশী, বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার পুণ্যধাম কাশী! জননীকে নিয়া এই মহাতীর্থে পৌঁছিবার পরই মন তাঁহার আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে।

গঙ্গাস্নান ও বাবা বিশ্বনাথের দর্শন শেষ করিয়া বাসায় ঢুকিতেছেন, এমন সময় মহল্লার কয়েকটি বাসিন্দা যোগত্রয়ানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া নেন, বলেন, "মশাই, এ আপনি কি করেছেন? শেষটায় বটুক পাঁড়ের বাড়ীতে উঠেছেন সপরিবারে! পাঁড়ে যে এখানকার এক গুণ্ডা—ডাকাত বিশেষ। শিগ্‌গীর অন্য কোথাও উঠে গিয়ে সবার প্রাণ বাঁচান।"

যোগত্রয়ানন্দের ললাটের একটি রেখাও কুঞ্চিত হইল না, কথাগুলি শোনার পরও রহিলেন পূর্ব্ববৎ ধীর স্থির অকুতোভয়।

যুক্তকর শিরে ঠেকাইয়া শুধু কহিলেন, "বাবা বিশ্বনাথের শরণ নিতেই আমরা এসেছি। সেস্থলে তুচ্ছ এক বটুক পাঁড়ের ভয়ে ভীত হলে চলবে কেন? তাছাড়া বটুক গুণ্ডামী করছে তার নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ। আমি তার সঙ্গে দেখা করবো, তার দোষত্রুটি বুঝিয়ে বলবো। এজন্য আপনারা ভাব্‌বেন না।"

প্রতিবেশী শুভানুধ্যায়ীরা বুঝিয়া নিলেন, এ নবাগত ব্রাহ্মণের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, ইহার সঙ্গে তর্ক করিয়া কোন লাভ নাই। একে একে তাঁহারা সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিকালবেলায় যোগত্রয়ানন্দ পাঁড়েজীর ছড়িদারকে ডাকাইয়া আনেন। হাসিয়া বলেন, "বাবার স্নান তর্পণ ও দর্শন হয়েছে, এবার

তো বাবার পাণ্ডাকে একবার দর্শন করা চাই। চলুন একবার বটুক পাঁড়েজীকে ভেট করে আসবো।”

ছড়িদার তখনি সোৎসাহে যোগত্রয়ানন্দকে পাঁড়ের কাছে হাজির করিলেন। তেতলার ছাদের উপর বটুক পাঁড়ে একটা চৌপাই-র উপর উপবিষ্ট। ভাঁটার মতো চোখ দুইটি সিদ্ধির সরবতের প্রভাবে ঢুলু ঢুলু। নীচে মাদুরে বসিয়া কয়েকজন বয়স্য ও সেবক হাণ্ডিতে সিদ্ধি ঘোঁটিতেছে। অদূরে ছাদের উপর দুইজন পালোয়ান ল্যাঙ্গট পরিয়া কুস্তী কসরত করিতে ব্যস্ত।

নূতন যজমান কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, পাঁড়ে সৌজন্য সহকারে যোগত্রয়ানন্দকে বসিতে বলিল। সম্মুখের আসনটিতে উপবেশন করিয়াই যোগত্রয়ানন্দ পাঁড়ের দিকে সঞ্চালিত করিলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, “মহল্লার অনেকে বলে, তুমি নাকি একজন দুর্দ্ধর্ষ গুণ্ডা? ধর্ম্মক্ষেত্রে আছো, বাবা বিশ্বনাথের সেবার অধিকার পেয়েছো, তবে গুণ্ডামী কর কেন?”

বটুক পাঁড়ের ভাঙ্গের নেশা এই আকস্মিক আঘাতে অনেকটা টুটিয়া গিয়াছে। ভাঁটার মতো চোখ দুইটি যোগত্রয়ানন্দের দিকে সে নিবদ্ধ করে, কিন্তু ক্ষণপরেই তাহা সরাইয়া নেয়, কি জানি কেন মাথা নীচু করিয়া নীরব নিস্পন্দ হইয়া সে বসিয়া থাকে! যোগত্রয়ানন্দের চোখে মুখে কোন্ অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ সে দেখিয়াছে, তাহা কে বলিবে?

পাঁড়ের ইয়ার-বন্ধু এবং সেবকেরা এই আকস্মিক তিরস্কারে চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, আর কসরত-রত পালোয়ান দুইটি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যোগত্রয়ানন্দের ঠিক পিছনে। অর্থাৎ, পাঁড়েজীর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে তাহারা প্রস্তুত, হুকুম মিলিলেই কলিকাতার এই বেকুব আদমীকে তাহারা নীচে ছুঁড়িয়া ফেলিবে।

ইতিমধ্যে গুণ্ডারাজ বটুক পাঁড়ের মুখভাব প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে। যুক্তকরে, ধীর কণ্ঠে সে বলিতে থাকে, “আমার

ভেতর থেকে কে যেন কেবলি ডেকে বলছে—আপনি আমার জন্ম-জন্মান্তরের গুরু। আমি তা বিশ্বাস করেছি, মেনেও নিয়েছি। নইলে দুনিয়ায় এমন কোন্ মানুষ আছে যে বটুক পাঁড়েকে গুণ্ডা বলে গালি দেবার হিম্মত রাখে?"

সঙ্গে সঙ্গেই বটুক পাঁড়ে যোগত্রয়ানন্দজীর চরণতলে লুটাইয়া পড়ে। অনুশোচনায় হৃদয় তাহার দগ্ধ হয়। তারপর অকপটে যোগত্রয়ানন্দের কাছে বিবৃত করে তাহার এতদিনকার অনেক কিছু দুষ্কৃতি ও পাপাচারের কাহিনী। ততক্ষণে দিব্য আনন্দের আভায় যোগত্রয়ানন্দের চোখ মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম ও করুণায় আপ্লুত হইয়া অতঃপর পাঁড়েকে তিনি নানা উপদেশ ও আশ্বাস দেন। ধর্ম্ম-জীবন গঠনে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করেন।

পাঁড়ে একান্তভাবে যোগত্রয়ানন্দের শরণ নেয় এবং সেই দিন হইতে ঘটে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল পাপময় জীবনের অবসান।[১]

হাতের টাকা কয়েক দিনের মধ্যেই ফুরাইয়া গেল। এবার যোগত্রয়ানন্দ কাশীধামে বসিয়াই শুরু করেন তাঁহার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা। বহু সঙ্কটাপন্ন রোগীকে তিনি এ সময়ে আরোগ্য করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি খ্যাতনামা হইয়া পড়েন। ভাল উপার্জ্জনও হইতে থাকে। কিন্তু দরিদ্র রোগীদের কাছ হইতে তিনি কোন অর্থ গ্রহণ করেন না, আর গৃহে সদাব্রত লাগিয়াই আছে, তাই অর্থের অভাব তাঁহার ঘুচিতে চায় না।

জননীর দেহের অবস্থা ক্রমে অবনতির দিকে যাইতেছে, এবার শেষের দিনটি সমাগত হয়। মাতৃভক্ত যোগত্রয়ানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, "মা, তুমি আদেশ দিয়েছিলে—তাই কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথের চরণতলে তোমায় নিয়ে এসেছি। আমার কথা আমি রেখেছি। তোমার মনের আর কি ইচ্ছে আছে, আমায় খুলে বল। আমি তা পূরণ করবো।"

১ সাধক শশীভূষণ : সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যু-পথ যাত্রিণী জননী বলেন, "বাবা শশী, তোকে আমার একটা শেষ অনুরোধও রাখতে হবে।"

"বল মা, কি তুমি চাও।"

"বাবা, তুই যে অবস্থায় আছিস্ তাতে সংসারে থাকা কষ্টকর তা আমি বুঝি। কিন্তু তুই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হলে পরিবারের এতগুলো লোক যে অনাহারে মরবে। তুই আমায় কথা দে—গৃহস্থ থেকেই তুই সাধনভজন করবি, সন্ন্যাসী কখনো হবিনে।"

"তাই হবে মা। তোমার কথাই রাখবো। গৃহীযোগী রূপেই চালিয়ে যাবো আমার সাধনা। গুরুকৃপায় ও তোমার আশীর্ব্বাদে পরম প্রাপ্তি যেন আমার ঘটে।"

এবার অপার সন্তোষে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া জননী ত্যাগ করেন তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস।

এ সময়কার কাশীর পরিবেশটি বড় আনন্দময়। কয়েক জন শিবকল্প মহাত্মার আবির্ভাবের ফলে জনজীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে নূতন আধ্যাত্মিক চেতনা। এই সিদ্ধপুরুষদের অলৌকিক জীবন, শক্তি বিভূতি ও করুণা-লীলার কাহিনী নিয়া সর্ব্বত্র সোৎসাহ আলোচনা চলিতেছে। দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থীদের ভীড় এই সব বিরাট পুরুষদের আস্থানে লাগিয়াই আছে।

যোগত্রয়ানন্দ অবসর পাইলেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ প্রভৃতি মহাত্মাদের কাছে গিয়া উপস্থিত হন, পুণ্যময় সান্নিধ্যে বসিয়া দেহ মন প্রাণ তাঁহার জুড়াইয়া যায়। একদিন তিনি ভাস্করানন্দ সরস্বতী মহারাজের আশ্রমে তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন। শহরের উপান্তে এক বিস্তীর্ণ বাগিচায় তাঁহার আশ্রম। যোগবিভূতিসম্পন্ন এই মহাপুরুষকে দর্শনের জন্য দর্শনার্থীদের উৎসাহের সীমা নাই।

প্রথম দিন জনতার ব্যূহ ভেদ করিয়া যোগত্রয়ানন্দ কোন মতে মহাত্মার নিকটস্থ হইলেন। প্রণাম করার পর তিনি শুধু কহিলেন, "দর্শন হো গিয়া, আভি চলা যাও।"

বড় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়েন যোগত্রয়ানন্দ। পর পর আরো দুই দিন ভাস্করানন্দ মহারাজের কাছে গেলেন, কিন্তু মহাত্মা তাঁহাকে তেমন আমলই দিলেন না।

এবার তিনি দুঃখিত চিত্তে ভাবিতে থাকেন, 'কোন স্বার্থসিদ্ধির উদেশ্য নিয়ে তো আমি সরস্বতীজীর কাছে যাই নি, গিয়েছি জ্ঞান আহরণের জন্য। তবে কেন তিনি এমনভাবে আমায় উপেক্ষা করলেন?'

কয়েক দিনের মধ্যেই ঘটনার গতিপ্রকৃতি বিস্ময়কররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। প্রবীণ গুরুভ্রাতা চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামী এসময়ে কিছুদিনের জন্য কাশী আসিয়া উপস্থিত। গুরু শিবরামানন্দ স্বামীর হাতে গড়া মানুষ তিনি, গুরুকৃপায় ও আপন সাধন-বলে অশেষ-শাস্ত্রবিদ্ রূপে তিনি পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন, যোগবিভূতি অর্জ্জনে হইয়াছেন সফলকাম। এই গুরুভ্রাতাকে যোগত্রয়ানন্দ নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতোই শ্রদ্ধা করেন, প্রয়োজনমতো দুরূহ শাস্ত্রতত্ত্ব তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া নেন, নিগূঢ় যোগসাধনের নির্দ্দেশাদি গ্রহণ করেন। কাশীতে আসিয়া চিদ্‌ঘনানন্দজী তাঁহার পরম স্নেহভাজন যোগত্রয়ানন্দের গৃহেই অবস্থান করিতে থাকেন।

চিদ্‌ঘনানন্দের নিকট ভাস্করানন্দ সরস্বতী মহারাজ নানাভাবে উপকৃত, তাঁহার আগমনের বার্ত্তা শুনিয়াই তাড়াতাড়ি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। স্বামীজীকে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য দেখানোর জন্য প্রচুর পুষ্পমাল্য ও ফলমূল নিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে রহিয়াছে কতিপয় ভক্ত-শিষ্য।

সরস্বতী মহারাজের আগমনের সংবাদ শুনিয়াই চিদ্‌ঘনানন্দজী চাদর মুড়ি দিয়া কম্বলাসনে শুইয়া পড়িলেন। ভান করিলেন, তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। সরস্বতী মহারাজ নীরবে কক্ষের একপাশে বসিয়া বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। তারপর হঠাৎ চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামীর কপট নিদ্রা টুটিয়া গেলে নিযুক্ত হইলেন তাঁহার পদসেবায়।

"একে, ভাস্কর এসেছো? তা বেশ, তা বেশ, তোমায় দেখে খুব আনন্দ হলো। কখন এলে?"—বলিয়া চিদ্‌ঘনানন্দ সাদরে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, জানাইলেন তাঁহার আশীর্ব্বাদ।

এবার গৃহস্বামী যোগত্রয়ানন্দের দিকে সরস্বতী মহারাজের দৃষ্টি পতিত হয়। সোৎসাহে বলেন, "ধন্য তুমি। কি সৌভাগ্য তোমার। অতুলনীয় শ্রদ্ধা আর প্রেমের ডোরে অনায়াসে তুমি এই শিবকল্প মহাপুরুষকে বেঁধে ফেলেছো। অথচ আমরা কত চেষ্টা করেও এঁকে আমাদের কাছে ধরে রাখতে পারিনে। কেবলই তিনি দূরে দূরে পালিয়ে বেড়ান।"

চিদ্‌ঘনানন্দ স্মিতহাস্যে বলেন, "ভাস্কর, তুমি এই সমর্থ গৃহী-যোগীকে, আমার গুরুর আশিস্‌পূত এই সাধককে, ঠিকমতো চিনতে পারো নি। একে ভেবেছিলে সংসারাবদ্ধ জীব বলে। তাই তোমার সকাশে দু-তিনবার গিয়েও ইনি তোমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পান নি।"

ভাস্করানন্দ সরস্বতী নিজের ভুল বুঝিতে পারেন, এবার আনন্দে যোগত্রয়ানন্দকে জড়াইয়া ধরেন, বার বার করেন সাধুবাদ।

আনীত ফলমূল চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামীর সম্মুখে ধরিতেই তিনি বলেন, "না ভাস্কর, আগে তুমি আমার এই গুরুভাইর আতিথ্য গ্রহণ করো, তারপর আমি তোমার উপহার করবো অঙ্গীকার।"

যোগত্রয়ানন্দের গৃহে বসিয়া দুই চারিটি ফল ভাস্করানন্দ ভোজন করিলেন। তারপর চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামীর সহিত নানা নিগূঢ় শাস্ত্রতত্ত্ব সাধনপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা সারিয়া নিজের আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। গুরুভ্রাতা চিদ্‌ঘনানন্দের কৌশলে যোগত্রয়ানন্দের মনের ক্ষোভ সেদিন এভাবে তিরোহিত হইল[১]।

যোগত্রয়ানন্দের বৃহৎ পরিবারে ব্যয় অনেক। অথচ আয় অতি সামান্য। দুশ্চিকিৎস্য বহু রোগী তিনি আরোগ্য করিতেছেন বটে,

১ সাধক শশীভূষণ : সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু পারিশ্রমিক নেন যৎসামান্য। দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসায় অর্থ গ্রহণ তো করেনই না বরং পথ্য ও অন্নবস্ত্রের জন্য অনেক সময় তাহাদেরই সাহায্য করিতে হয়। তাছাড়া, কোন প্রার্থীকে যোগত্রয়ানন্দ ফিরাইতে পারেন না, তাই ছোটখাটো আর্থিক সাহায্য মাঝে মাঝে দুঃস্থদের দিতে হয়। ফলে সংসার প্রায় অচল, ঋণের বোঝা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামী এ পরিস্থিতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন। ভাবিলেন, দেবপ্রতিম এই গুরুভাইকে তো এবার রক্ষা করা দরকার। অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করিয়া এত বড় পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন কি করিয়া চলিবে?

আমেটির রাজা চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামীর খুব ভক্ত। স্বামীজী তাঁহার কাছে যোগত্রয়ানন্দের কথা বিশদ করিয়া লিখিলেন, -"আমার এই গুরুভাইটি বৈরাগ্যবান্ সাধক, শাস্ত্রজ্ঞান এবং যোগৈশ্বর্য্যও তাঁহার প্রচুর। নিস্পৃহ ও অনাসক্ত হইয়া সংসারে আছেন তাই অর্থাভাবে তাঁহার বৃহৎ সংসারটি ক্লিষ্ট হচ্ছে। আমার ইচ্ছা তুমি একে তোমার কাছে রাখ এবং এর সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়ে একে ভারমুক্ত কবো। এতে তোমার কল্যাণ হবে।"

উত্তরে রাজা জানান, "আজ্ঞা পালন করতে পারলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করবো। যোগী মহারাজের পরিবারের খরচ চালানোর জন্য প্রতি মাসে আমার এস্টেট তিনশত টাকা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনি অবিলম্বে তাঁকে পাঠাবেন এবং তাঁকে সেবা করার সুযোগ দিয়ে আমায় কৃতার্থ করবেন।"

রাজার এই স্বীকৃতি পাইয়া স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দের আনন্দের অবধি নাই। চিঠিটি যোগত্রয়ানন্দকে দেখাইয়া কহিলেন, "যাক্ এবার থেকে একটা বড় দুশ্চিন্তা দূর হলো। এই বৃহৎ পরিবারের দায়িত্বের কথা আর তোমায় ভাবতে হবে না। যত সত্বর পার, সবাইকে নিয়ে তুমি আমেটি যাত্রা করো।"

যোগত্রয়ানন্দ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকেন। তারপর যুক্তকরে

নিবেদন করেন, "স্বামীজী এভাবে কোন ধনী ব্যক্তির গলগ্রহ হয়ে থাকাটা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করিনে। গুরুদেবের কৃপায় এবং আপনার আশীর্ব্বাদে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ কোনমতে হয়েই যাবে। আপনার চরণে আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।"

চিদ্‌ঘনানন্দজী প্রসন্ন হইয়া উঠেন, গুরুভাইকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া কহেন, "আত্মজ্ঞান পেতে হলে চাই এমনি অনাসক্তি, এমনি ত্যাগ বৈরাগ্য। অচিরে তোমার তপস্যা জয়যুক্ত হোক, আন্তরিক-ভাবে এই আশীর্ব্বাদ আমি করছি।"

বহু কঠিন রোগী যোগত্রয়ানন্দ আরোগ্য করিতেছেন, মৃত্যুপথ-যাত্রী কত লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। মারাত্মক রোগে আক্রান্ত নরনারী প্রথমেই তাঁহার কাছে চিকিৎসার জন্য চলিয়া আসে। কাশীর কয়েকজন প্রবীণ ডাক্তার কবিরাজের এজন্য খেদের অন্ত নাই।

একদিন এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার যোগত্রয়ানন্দকে প্রণাম জানান, প্রশ্ন করেন, "বাবা, মায়ের তো গঙ্গা-প্রাপ্তি হলো, এবার আপনি কবে কোলকাতায় ফিরছেন?"

"কেন বলুন তো"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন যোগত্রয়ানন্দ।

ডাক্তার মৃদুহাস্য করিয়া বলেন, "ভাবছি, তাহলে আমাদের আরো রোগী জুটবে এবং আমরা দুমুঠো খেতে পাবো। আর ওদিকে আপনি ফিরে গেলে আপনার কোলকাতার রোগীরাও বাঁচবে।"

যোগত্রয়ানন্দ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "ভয় নেই আপনাদের। সময় এসে গেছে। শিগ্‌গীরই আমি কাশী ত্যাগ করবো।"

অল্পদিনের ব্যবধানেই বৃহৎ পরিবারটি সঙ্গে নিয়া তিনি বরানগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কয়েক মাস পরে এক নিদারুণ দুঃসংবাদ পৌছিল যোগত্রয়ানন্দের কাছে। কাশী ত্যাগ করার পর স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া তীর্থরাজ প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হন এবং হঠাৎ প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হন। শেষ সময় সমাগত জানিয়া স্বামীজী ভক্তগণ-

সহ পবিত্র সঙ্গমস্থলে উপনীত হন, তারপর পদ্মাসনে আসীন অবস্থায় স্বেচ্ছায় বরণ করেন জল-সমাধি।

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ শুধু যোগত্রয়ানন্দের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ গুরুভ্রাতাই নন, গুরু শিবরামানন্দ স্বামীর পাণ্ডিত্য ও যোগপন্থার এক শ্রেষ্ঠ ধারকবাহক তিনি। গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর হইতে যোগত্রয়ানন্দকে সাধনা ও শাস্ত্রতত্ত্ব সম্পর্কে নানা নিগূঢ় উপদেশ এতকাল তিনি দিয়া আসিতেছিলেন। তাই তাঁহার এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে যোগত্রয়ানন্দ শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন।

শুধু একজন অশেষ শাস্ত্রবিদ্‌রূপেই নয়, মহাজ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষরূপেও কলিকাতা এবং কাশীর সাধকসমাজে যোগত্রয়ানন্দ পরিচিত ছিলেন।

বরানগরে ও বালীতে থাকাকালে তাঁহার গৃহটি হয় তরুণ শাস্ত্রবিদ্যার্থী ও সাধকদের এক মর্ম্মকেন্দ্র। বহু প্রবীণ সাধু-সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ ভক্তেরা এসময়ে তাঁহার কাছে উপনীত হইতেন, অধ্যাত্ম জীবনের নানা জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া নিতেন।

তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যে-সব প্রতিভাধর এবং তরুণ জিজ্ঞাসুরা আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসাদ চন্দ্র, প্রেমানন্দ ভারতী প্রভৃতি। প্রথমোক্ত দুই জন উত্তরকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ নামে। প্রেমানন্দ ভারতীও পরবর্ত্তীকালে সাধনমার্গে উন্নতি লাভ করেন এবং আমেরিকায় ধর্ম্ম প্রচারে উদ্বুদ্ধ হন।

যোগত্রয়ানন্দের কাছে পাণিনির মহাভাষ্য ও ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যা শুনিয়া বিবেকানন্দ সোৎসাহে একবার বলিয়াছিলেন, "আমার ইচ্ছে হয়, কোন নির্জ্জন পাহাড়ের গুহায় গিয়ে, আপনার চরণতলে বসে, ঋষিদের শাস্ত্রগুলো একান্ত মনে পাঠ করি।"

একদিন যোগত্রয়ানন্দ দিব্যভাবে উদ্দীপিত হইয়া ঋষিদের ধ্যানলব্ধ

বৈদিক জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। নিবিষ্ট মনে দীর্ঘসময় তাঁহার ভাষণ শোনার পর বিবেকানন্দ উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠেন, "বেদের পরমতত্ত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব যদি এমনি হয়, তবে এই পৃথিবীতে এমন কোন্ মানুষ আছে যে এই মহাপবিত্র গ্রন্থের কাছে মাথা নীচু করবে না?"

জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, ডন পত্রিকার সম্পাদক, মনীষী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একবার মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনে বরাবরই বর্ত্তমান ছিল। উত্তর জীবনে তিনি গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং কাশীধামে কঠোর সাধনায় ব্রতী হইয়া এক উচ্চকোটির সাধকে পরিণত হন। যোগত্রয়ানন্দের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সতীশচন্দ্র দর্শনতত্ত্বের কয়েকটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

মহাত্মা এই সব প্রশ্নের মীমাংসা করেন গণিতের সাহায্যে। প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও আধুনিক গণিতের তত্ত্ব ও প্রয়োগ কৌশল যেরূপ নৈপুণ্যের সহিত তিনি বুঝাইয়া দেন, তাহাতে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া যান।

বিদায় নিবার সময় তিনি বলেন, "গণিতের সাহায্যে ধর্ম্ম ও দর্শনের মর্ম্ম যে এমন করে উদ্‌ঘাটন করা যায়, তা আমার ধারণায় ছিল না। আমার প্রার্থনা, আপনি এ ধরণের ব্যাখ্যাযুক্ত একটি গ্রন্থ কৃপা ক'রে রচনা করুন। আধুনিক যুগের মানুষ এর দ্বারা অশেষভাবে উপকৃত হবে।"

যোগত্রয়ানন্দ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "সবই প্রভুর ইচ্ছা।"

অভেদানন্দ মহারাজ এসময়ে শাস্ত্রপাঠের জন্য আগ্রহাকুল। প্রায়ই তিনি যোগত্রয়ানন্দের সকাশে উপস্থিত হইতেন, অলৌকিকী প্রজ্ঞা ও যোগসিদ্ধির অধিকারী এই মহাত্মার কাছ হইতে বহু শাস্ত্রীয় প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা তিনি জানিয়া নিতেন। সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে যোগত্রয়ানন্দের সমান ব্যুৎপত্তি ছিল, কাজেই আধুনিক

শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণেরা তাঁহার সৎসঙ্গ ও আলোচনায় তৃপ্তি পাইতেন, তাঁহাদের নানা সন্দেহের নিরসন ঘটিত।

যোগত্রয়ানন্দ এসময়ে অযাচক বৃত্তি নিয়া বাস করিতেছেন। বহু দুরারোগ্য রোগী তাঁহার চিকিৎসার ফলে বাঁচিয়া উঠিতেছে বটে, কিন্তু এজন্য কোন পারিশ্রমিক নিতে তিনি অপারগ। ভগবৎ কৃপায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যখন যে যাহা দেয় তাহাতেই তাঁহার সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

এমন বহুদিনই গিয়াছে, ঘরে শিশুপুত্রের জন্য দুধটুকুও যোগাড় করা যায় নাই। গৃহিণী গোপনে নিজের আঁচলে চোখের জল মুছিতেছেন। চাল ডাল ফুরাইয়াছে, হাট-বাজার করার কোন সঙ্গতি নাই, অথচ দশ-বারোটি প্রাণীর অন্ন জোগাইতে হইবে। নিজের পরিবারের লোক তো ছিলই, তদুপরি দুঃস্থ রোগী এবং আত্মীয়-অভ্যাগতেরাও অনেক সময় তাঁহার গৃহে আশ্রয় নিতেন। এই গুরু সাংসারিক দায়িত্বের সকল কিছু তিনি সমর্পণ করিয়াছিলেন ভগবানের চরণে। আর লোকে প্রায়ই অবাক হইয়া দেখিত, শরণাগত সাধকের সকল কিছু প্রয়োজন ভগবানই দিনের পর দিন মিটাইয়া দিতেছেন।

সে-বার রাধানাথ নামে একটি ছাত্র মরণাপন্ন কাতর হইয়া যোগত্রয়ানন্দের গৃহে আশ্রয় নেয়। রোগীর শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধানের জন্য তাহার পত্নী ও মাতাপিতাও আসিয়া উপস্থিত। রোগীর ঔষধের ব্যয় তো মহাত্মাকে বহন করিতে হইতেছেই, তদুপরি রহিয়াছে রোগীর পরিবারের সবাইর ভরণপোষণ।

বহু চেষ্টা ও যত্নে যোগত্রয়ানন্দ রোগীকে ভাল করিয়া তুলিলেন। রোগমুক্ত হইবার পর মাঝে মাঝে সে যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গে ভগবৎ তত্ত্বের আলোচনা করিতে বসিত।

রাধানাথের মা ইহা লক্ষ্য করিতেছেন আর বিরক্তিতে তাঁহার মন

ভরিয়া উঠিতেছে। অবশেষে একদিন তিনি ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন। যোগত্রয়ানন্দকে গালাগালি দিয়া বলিতে থাকেন, "আমার একটি মাত্র ছেলে, এবার এম-এ পরীক্ষা দেবে, রোজগার করে সংসারের সব দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে, তাকে কিনা আপনি সাধু বানিয়ে ফেলছেন। আপনার এ বাহাছুরিতে আর কাজ নেই।"

ক্রোধভরে মহিলাটি সেইদিনই সবাইকে নিয়া প্রস্থান করেন। মহাত্মা যে তাঁহার পুত্রের প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, তাঁহার পরিবারের সবাইকে এতদিন ভরণ-পোষণ করিয়াছেন এবং এজন্য যে চিরকাল তাঁহার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এসব কোন কিছুই তাঁহার অন্তরে ঠাঁই পায় নাই। যোগত্রয়ানন্দ কিন্তু একটি কথাও ইহাদের বলেন নাই। নির্ব্বিকার, অভিমানশূন্য মহাপুরুষ তখন বহির্ব্বাটিতে বসিয়া জিজ্ঞাসুদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন।

এই সময়ে যোগত্রয়ানন্দ একদিন গুরুদেব শিবরামানন্দের প্রত্যাদেশ লাভ করেন। গুরু বলেন, "বৎস, অযাচক বৃত্তি নিয়ে সংসার করছো, ত্যাগ তিতিক্ষাময় তপস্যায় আপ্তকাম হয়েছো, ভাল কথা। কিন্তু সাধু যদি জনসমাজে বাস করে, জনকল্যাণের জন্য কিছু করতে হয়। ভগবৎ কৃপায় বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি দ্বারা ঋষিদের তত্ত্ব তুমি উপলব্ধি করেছো। সেই তত্ত্ব এ যুগের মানুষের উপযোগী করে প্রকাশ করো। বেদ, আগম, ভক্তিশাস্ত্র সব কিছুর নির্য্যাস নিয়ে তুমি রচনা করো একটি মহান গ্রন্থ।"

যে চিন্তা মাঝে তাঁহার হৃদয়ে দোলা দিত, বিদেহী গুরুদেব আজ দিলেন তাহারই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ। সঙ্কল্প তাঁহার তখনি স্থির হইয়া গেল, যোগত্রয়ানন্দ শুরু করিলেন তাঁহার মহান কালজয়ী গ্রন্থের রচনা। এই গ্রন্থ হইতেছে বহু খ্যাত—আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডার খুঁজিয়া, সাধনজাত স্বচ্ছ দৃষ্টির আলোকে, এই অপূর্ব্ব মনীষা-দীপ্ত মহাগ্রন্থ রচিত। সাত্ত্বিক বিচারনৈপুণ্য যেমন

ইহাতে আছে, তেমনি আছে চিরন্তন ও সর্ব্বজনীন পরমতত্ত্বের উদ্‌ঘাটন, বিশেষ করিয়া ঋষি-রচিত শাস্ত্রের তত্ত্ব নিরূপণ।

এই গ্রন্থ রচনার সময় যে ত্যাগ তিতিক্ষা ও ধৈর্য্য যোগত্রয়ানন্দ স্বীকার করিয়াছেন, সমগ্র পরিবারকে যে চরম দুর্গতি ও অর্থকষ্টের পরীক্ষায় টানিয়া নিয়াছেন তাহা অকল্পনীয়। কোন দিন অর্দ্ধাহার জুটিয়াছে, কোন দিন তাহাও জুটে নাই, বেলপাতার রস পান করিয়া বাড়ীর সবাই দিনাতিপাত করিয়াছে। ঠাকুরঘরে ধ্যান-ভজনের পর যোগত্রয়ানন্দ রত হইতেন তাঁহার এই শাস্ত্রগ্রন্থের রচনায়। প্রতিদিন চৌদ্দ-পনের ঘণ্টা করিয়া অবিরাম পরিশ্রম তাঁহাকে করিতে হইত। হাতে অর্থ নাই, প্রাচীন দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা নাই, অথচ গুরু কৃপায়, সিদ্ধ মহাত্মাদের সাহায্য ও দৈবী যোগাযোগের ফলে প্রয়োজনমতো সব কিছুরই ব্যবস্থা যেন আপনা হইতে সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে।

গৃহে যাঁহার অন্নের সংস্থান নাই, তাঁহার পক্ষে এই সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করা কি করিয়া সম্ভব? অথচ এ অসম্ভব সম্ভব হইল, প্রয়োজনমতো সব কিছুই ভগবান মিলাইয়া দিলেন।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ প্রকাশিত হইলে সাধকমণ্ডলে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের সাধনোজ্জ্বল প্রজ্ঞা, মনীষা ও বিদ্যাবত্তায় সকলে বিস্মিত হন।

এই গ্রন্থের পরিচয় পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন,—এমন একটি বহুমুখীন তত্ত্ব-সম্বলিত মহাগ্রন্থ যে মানুষ রচনা করতে পারেন, তাঁর মেধা ও প্রতিভার পরিমাপ আমি করতে পারছি না। আমার মনে হয়, এই গ্রন্থ ইংরেজীতে রচিত হলে সারা পৃথিবীতে এর প্রচার হতো, সত্যকার আদর হতো।

মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ তাঁহার যৌবনকালে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "এই মহান গ্রন্থে এমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতার নিদর্শন ছিল যাহা দেখিয়া তৎকালে আমার মন স্তব্ধ

হইয়া গিয়াছিল এবং নীরবভাবে মহাজ্ঞানী ঋষিকল্প গ্রন্থকারের চরণে পুনঃপুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছিলাম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন এবং নবীন দর্শন, বিজ্ঞান সর্ব্ব শাস্ত্রেরই পূর্ণ জ্ঞানের পরিচয় এই গ্রন্থমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া আমার একান্ত ইচ্ছা যে ইঁহাকে দর্শন করিব এবং ইঁহার চরণে বসিয়া জ্ঞানের অনুশীলন করিব। গ্রন্থপাঠে মনে হইতেছিল যে গ্রন্থকার কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সকল মার্গেই সমরূপ অধিকারী; তিনি ঋষিকল্প এবং বিজ্ঞান মদগর্ব্বিত বর্ত্তমান ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের গুরু স্বরূপ।"

যোগত্রয়ানন্দজীর উত্তুঙ্গ সারস্বত প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়া ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ আরও লিখিয়াছেন, "তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান গ্রন্থ—আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ। এই মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে পৃথিবীর বিশেষ কল্যাণ হইত সন্দেহ নাই। ইহার ভূমিকায় যে অংশটুকু প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাও অতি বিশাল ও অপূর্ব্ব। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার যেরূপ 'সিন্থেটিক ফিলসফির' পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার চেয়েও বিরাট কল্পনা ছিল আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপকারের। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য; ইহা হইয়া উঠে নাই। তাঁহার মানবতত্ত্ব ও বর্ণ বিবেক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। তাঁহার পরলোক তত্ত্ব, পরলোক ও আবশ্যকীয় যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে বিপুল গ্রন্থ। ইহা বড় বড় চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার তিন খণ্ড আমি দেখিয়াছি, চতুর্থ খণ্ড দেখি নাই। প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা জানি না। তাঁহার ভূত ও শক্তি, আয়ুস্তত্ত্ব, গণিতের দার্শনিক রহস্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক আলোচনা-প্রধান গ্রন্থও আছে। এই সব গ্রন্থ তাঁহার কাশী আসিবার পূর্ব্ব সময়কার রচনা। কাশী আসিবার পর কাশী অবস্থানের শেষ দিকে এবং কাশী ত্যাগের পর তাঁহার আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে[১]।"

অযাচক বৃত্তির উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া যোগত্রয়ানন্দ

১ সাধু দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ : ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। তদুপরি ছিল শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়, এজন্য তাঁহাকে বহুতর কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কিন্তু সুখে দুঃখে, জয়-পরাজয়ে, লাভ ক্ষতিতে সমজ্ঞানী মহাপুরুষ সর্ব্বদা হাসি মুখে এই সব পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন।

সেদিন গৃহিণী জানাইয়া দেন। গৃহে এক মুষ্টি তণ্ডুল নাই। মুদি বাকিতে মাল দিতে অস্বীকার করিয়াছে। একটি টাকা কোথাও হইতে সংগ্রহ করা যায় নাই। এখন উপায়?

মহাত্মা আকাশের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া কহিলেন, "আমরা তাঁর চরণে শরণ নিয়ে আছি, রাখতে হয় তিনি রাখবেন, মারতে হয় মারবেন। ধৈর্য্য ধর, একটু কিছু হবেই।"

তারপর তাঁর আদেশে বাড়ীর সবাই বিল্বপত্রের রস পান করিয়া সেদিনটি অতিবাহিত করিলেন। আরো প্রায় দুই দিন অনশনে কাটিয়া গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে যে এই চরম দুর্গতি চলিয়াছে—শিষ্য, ভক্ত, দর্শনার্থীদের কেহই তাহা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে নাই। পাঠকক্ষে বসিয়া যোগত্রয়ানন্দ যথারীতি গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, কখনো বা ভক্ত ও সাধনার্থীদের নিয়া তত্ত্ব আলোচনায় রহিয়াছেন বিভোর।

তৃতীয় দিনের অপরাহ্ণ। কালীপ্রসাদ (অভেদানন্দ) প্রভৃতি জিজ্ঞাসু ভক্ত গৃহে সমবেত হইয়াছেন। আর যোগত্রয়ানন্দ প্রশান্ত কণ্ঠে একটি জটিল দার্শনিকতত্ত্ব তাহাদের বুঝাইতেছেন। এমন সময়ে ডাকপিওন আসিয়া একটি রেজেষ্ট্রী করা ইনসিওরড্ খাম বিলি করিয়া গেল।

খামটি খুলিয়া যোগত্রয়ানন্দ উহার ভিতরকার চিঠিটি পাঠ করেন। তারপর উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিস্পন্দ হইয়া যান। কপোল বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরিতে থাকে।

ভক্ত ও শিক্ষার্থীরা বিস্ময়ে অবাক হইয়া মহাত্মার দিকে নীরবে নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া আছেন। এমন দৃশ্য আর কখনো তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই।

প্রায় পনের মিনিট কাল এইভাবে কাটিয়া যায়। অতঃপর কালী-মহারাজ (অভেদানন্দ) প্রশ্ন করেন, "বাবা, ব্যাপারটি কি, আমরা কেউ তা বুঝতে পারছিনে। আপনার চক্ষে অশ্রুজল তো আমরা কখনো দেখি নি। সমস্ত কিছু শোক দুঃখের অতীত আপনি। এমন কি দুর্দ্দৈব ঘটেছে যার জন্যে আপনি এত অভিভূত হয়ে পড়েছেন ? আপনার চোখে জল কেন ? আর ঐ চিঠি পড়েই বা এমন স্তব্ধ হলেন কেন আপনি ? আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি।"

যোগত্রয়ানন্দ এবার মুখ খুলিলেন। কহিলেন, "তোমরা আজ আমার চক্ষু থেকে যে অশ্রু ঝরতে দেখেছ তা শোকের নয়, আনন্দের। শোক আমায় কখনো অভিভূত করতে পারে না, কাঁদাতে পারে না। আমি কেঁদেছি শ্রীভগবানের করুণার কথা মনে করে। এই পত্রটা তোমরা পড়ে দেখতে পারো।"

সবাইর সম্মুখে এটি পাঠ করা হইল। লিখিয়াছেন কাশীর চৌখাম্বা মহল্লার অধিবাসী এক সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁহার চিঠির মর্ম্ম এইরূপ :

আগের দিন রাত্রে তিনি এক স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বাবা বিশ্বনাথ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন—আমি উপবাসী রয়েছি, অন্নজল কিছুই গ্রহণ করি নি শিগ্‌গীর আমার জন্যে অন্নের ব্যবস্থা কর। আমার এক পরমভক্ত উপবাসী রয়েছে, তাই আমায়ও কাটাতে হচ্ছে উপবাসী হয়ে। আমার প্রতি তোমার যদি বিন্দুমাত্র ভক্তিশ্রদ্ধা থাকে তবে আমার ঐ ভক্তের অন্ন গ্রহণের ব্যবস্থা করে দাও। এতে তিলমাত্র বিলম্ব যেন না হয়।

শুধু তাহাই নয়, প্রভু বিশ্বনাথ কাশীধামের ঐ ভদ্রলোকটিকে উপবাসী ভক্তের নাম ঠিকানা জানাইয়া দিতেও ভুল করেন নাই—ঐ নাম ঠিকানা স্বপ্নের মধ্যেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে প্রকট হইয়া উঠে এবং প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিটি তদনুযায়ী যোগত্রয়ানন্দের ঠিকানায় এই খাম পাঠান। ইহার মধ্যে রহিয়াছে বিস্তৃত একটি চিঠি এবং পাঁচশত টাকার নোট।

পত্রপ্রেরক আরো লিখিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাস প্রভু বিশ্বনাথের স্বপ্নাদেশ ব্যর্থ হইবে না এবং প্রেরিত অর্থ যথাস্থানে এবং যথাসময়ে পৌঁছিবে।

অতঃপর যোগত্রয়ানন্দ তাঁহার গৃহের অবস্থা সবিস্তারে বিবৃত করেন। প্রায় তিনদিন যাবৎ তাঁহার পরিবারের সবাই উপবাসী রহিয়াছেন। তিনি খুব ভালভাবে জানেন, তাঁহার এমন বহু ভক্ত আছেন যাঁহারা এ সম্পর্কে একটু মাত্র ইঙ্গিত পাইলে তৎক্ষণাৎ সব ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কিন্তু ক্ষুণাক্ষরেও একথা কাহারও নিকট তিনি প্রকাশ করেন নাই। একান্তভাবে শ্রীভগবানের উপরই তিনি নির্ভর করিয়াছেন। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্ব করুণার উৎস, তিনি তো সব কিছুই দেখিতে পাইতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে মুহূর্ত্তে তাঁহার এ অভাব মোচন হইতে পারে। তবে কেন যোগত্রয়ানন্দ অপরের উপর নির্ভর করিতে যাইবেন?

আজ করুণাময়ের এই দিব্য লীলা দেখিয়া তিনি অভিভূত হইয়াছেন, নয়ন হইতে নামিয়া আসিয়াছে পুলকাশ্রুর ধারা।

এ কাহিনী শুনিয়া সবাই আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন, শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যায় বিরতি দিয়া শুরু করিলেন শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন।

মহেন্দ্র দাস নামে এক ধনী প্রতিবেশী সেখানে ছিলেন। লোকটি শিক্ষিত, অমায়িক ও ধর্ম্মপ্রবণ। যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গে কোনদিনই তাঁহার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু দূর হইতে মহেন্দ্রবাবু তাঁহাকে প্রায়ই লক্ষ্য করিতেন এবং গণ্য করিতেন একজন উঁচুদরের মহাত্মারূপে।

তখন যোগত্রয়ানন্দের খুব অর্থ-সঙ্কট চলিয়াছে। প্রায়ই পাওনাদারেরা বাড়ীতে তাগাদা দিতে আসে। মহেন্দ্রবাবু সেদিন নিজে যাচিয়া কহিলেন, "বাবাজী, আমার কিছু নিবেদন করার আছে, অভয় দেন তো বলি।"

"বল বাবা, কি তুমি আমায় বলতে চাও"—স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেন যোগত্রয়ানন্দ।

"দেখুন, আমার বাবা জীবিত থাকতে প্রায়ই বলতেন, 'ভগবানকে বেঁধে রাখবার কৌশল আমি জানি।' আমরা ব্যগ্র হয়ে তাঁকে ধরে বসতাম, 'বলতাম, বেশ তো, তাহলে সে কৌশলটা আমাদের শিখিয়ে দিন।' তিনি এড়িয়ে যেতেন, বলতেন, 'মৃত্যুর সময় বলে যাবো।'

"বলে যেতে পেরেছেন তো তিনি ?" কৌতুকভরে প্রশ্ন করেন যোগত্রয়ানন্দ।"

"হ্যাঁ, তিনি তাঁর দেহান্তের আগে শোনালেন সে কৌশলের কথা। বললেন, 'প্রথমে তোরা প্রচুর টাকাকড়ি রোজগার করে নিবি। তা' দিয়ে গঙ্গাতীরে তৈরী করবি দেয়াল-ঘেরা বাগান। তারপর সন্ধান নিতে হবে এমন সাধুপুরুষের যিনি সাধনা আর শাস্ত্র চর্চ্চায় সব সময় রত, যিনি সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানী, যিনি লোভমোহের অতীত হয়ে ভগবৎ-ভাবে সদা বিভোর হয়ে আছেন। ভগবানকে পাওয়া কঠিন, কিন্তু ভগবানের কৃপা আর অন্তরঙ্গতা পেয়েছেন এমন সাধু পাওয়া তেমন কঠিন নয়। খুঁজলে পাওয়া যায়। এমনতর সাধু ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরের ঐ বাগানে রেখে সেবা করবি। তাঁর মধ্য দিয়ে ভগবানও বাঁধা পড়ে যাবেন।"

"বুঝতে পারছি, তোমার বাবা সত্যিকার চতুর লোক ছিলেন। ভগবানকে বাঁধবার কৌশল যে বার করে, তার চাইতে চতুর আর কে ? কিন্তু, আমায় একথা শোনাচ্ছো কেন, বল তো ?"

"আপনাকে দর্শন করার পর থেকে বাবার সেই কথাগুলো বার-বার আমার মনে পড়ছে। আপনার সেবার অধিকার আমায় কিছুটা দিন, আমি কৃতার্থ হই। আপনার ওপর ঋণের বোঝা চেপে গিয়েছে। আমি তা লাঘব করতে চাই। আপনি ঋণমুক্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে মানুষের উপকার করতে থাকুন।"

মহাপুরুষের সম্মতি নিয়া এই নূতন ভক্তটি একটা মোটা অঙ্কের ঋণ এ সময়ে পরিশোধ করিয়া দেন।

যোগত্রয়ানন্দের চিকিৎসা পদ্ধতির মূলে ছিল প্রাচীন ভারতের ভেষজ বিদ্যা, অথর্ব্ব বেদোক্ত মন্ত্র প্রয়োগ এবং তাঁহার যোগবিভূতি। জীবনের গোড়ার দিক হইতে রোগ-নিরাময়কে তিনি তাঁহার এক মহান ব্রতরূপে গ্রহণ করেন এবং এই ব্রতসাধনে অর্থ-উপার্জ্জনকে কোনদিনই গুরুত্ব দেন নাই। রোগমুক্তির পর রোগী ও তাহার পরিজনের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিলেই নিজেকে তিনি কৃতার্থ বোধ করিতেন। শ্রীভগবানের করুণালীলার জন্য বার বার করিতেন কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

বালীর অন্যতম জমিদার রাজেন্দ্রবাবুর সহিত যোগত্রয়ানন্দের বেশ হৃদ্যতা ছিল। তাঁহার পরিবারের চিকিৎসায় প্রায়ই তাঁহাকে আহ্বান করা হইত। সে-বার রাজেন্দ্রবাবুর মাতার মস্তকে এক ক্ষত হয় এবং ক্রমে তাহাতে দেখা যায় নিক্রোসিস্ বা অস্থিক্ষয় রোগের আক্রমণ। বিখ্যাত সার্জ্জন, ডাঃ সুরেশ সর্ব্বাধিকারীকে আনিয়া রোগিণীকে দেখানো হয়, তিনি শলাকা ঢুকাইয়া দেখেন, ক্ষত অত্যন্ত গভীর। প্রায় মস্তিষ্কে গিয়া পৌঁছিয়াছে। এ অবস্থায় অস্ত্রোপচার অত্যন্ত বিপজ্জনক—এই মত প্রকাশ করিয়া সার্জ্জন চলিয়া গেলেন। রোগিণী ও তাঁহার ছেলে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন, এবং সেইদিন হইতে যোগত্রয়ানন্দ গ্রহণ করেন চিকিৎসার দায়িত্ব।

অথর্ব্ব বেদোক্ত কয়েকটি নিগূঢ় প্রক্রিয়া এই রোগিণীর উপর যোগত্রয়ানন্দ প্রয়োগ করিলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল, ক্ষত প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে এবং রোগিণীর সুনিদ্রা হইতেছে। অচিরে এই রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

সতীশ পাল শুধু যোগত্রয়ানন্দের ভক্তই নয়, সে তাঁহার সমগ্র পরিবারের একজন একনিষ্ঠ সেবক। অল্প বয়সে সতীশের মনে

তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং বেলুড়ে থাকিয়া মঠ ও স্বামীজীদের সেবায় সে আত্মনিয়োগ করে। অতঃপর এক সময়ে মঠে বাবুরাম মহারাজ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং যোগত্রয়ানন্দ দীর্ঘদিন চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। এই সময়ে সাধক যোগত্রয়ানন্দের তেজোময় ব্যক্তিত্ব ও ত্যাগপূত জীবনের প্রতি সতীশ আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার আশ্রয়েই চলিয়া আসে। সে-বার সতীশ তাঁহার নিজের বাড়ীতে গিয়া মারাত্মক রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। ডাক্তারদের সমস্ত যত্ন ও চেষ্টা বিফল হয় এবং বাড়ীর লোক তাঁহার প্রাণের আশা ছাড়িয়া দেন।

যোগত্রয়ানন্দের কাছে এ সংবাদ পৌঁছিল। সতীশ যে তাঁহার অতি প্রিয় সেবক। তাড়াতাড়ি তখনই সতীশের বাড়ী আলম-বাজারে তিনি ছুটিয়া যান। তাঁহাকে দেখিয়াই সতীশ ক্রন্দন করিয়া উঠে, বলিতে থাকে, "বাবা, এবার আর আমি বাঁচবো না, আশীর্ব্বাদ করুন, জন্মে জন্মে যেন আপনার সেবার অধিকার পাই।"

সতীশের অস্থিচর্ম্মসার দেহটি দেখিয়া যোগত্রয়ানন্দ হতাশ হইয়া পড়েন। সেদিনকার মতো কিছু ঔষুধপত্র ব্যবস্থা করিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিতেছেন, সঙ্গে রহিয়াছেন এক তরুণ ভক্ত, তাঁহার দিকে তাকাইয়া শোকার্ত্ত স্বরে যোগত্রয়ানন্দ বলিয়া উঠেন, "সতীশের যে অন্তিম অবস্থা দেখলুম রে। এখন একমাত্র ভগবান যদি কৃপা ক'রে বাঁচান।"

ভক্তটি দৃঢ় স্বরে উত্তর দেয়, "বাবা, এজন্য আপনি এত উতলা হয়েছেন কেন? আপনি ভগবানকে একটু চেপে ধরুন, তাহলেই তো সতীশ বেঁচে যায়।"

যোগত্রয়ানন্দ সমস্তটা পথ একেবারে মৌনী হইয়া রহিলেন। বাড়ীতে ফিরিয়াই প্রবেশ করিলেন ঠাকুরঘরে। দ্বার রুদ্ধ অবস্থায় প্রহরের পর প্রহর প্রার্থনা ও ধ্যান-জপে কাটিয়া গেল। পূজাকক্ষ হইতে বাহিরে আসিলে দেখা গেল, বদনমণ্ডল দিব্য প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রভাতে সংবাদ নিয়া জানা গেল, সতীশের রোগ-সঙ্কট

অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। তীব্র যন্ত্রণারও হইয়াছে উপশম। অতঃপর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সে সুস্থ হইয়া উঠে।

যোগত্রয়ানন্দের শাস্ত্রজ্ঞান ও যোগবিভূতির কথা শুনিয়া রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এক সময়ে তাঁহার প্রতি খুব আকৃষ্ট হন। স্বয়ং তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করেন, "বাবা, আপনি লোকের কল্যাণের জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করে শাস্ত্রগ্রন্থ লিখছেন। অর্থের অভাবে অনেক সময় এই কাজে কত ব্যাঘাত হচ্ছে। আপনি অনুমতি দিলে, আমি আপনার সংসার চালানোর ভার নিতে পারি।

যোগত্রয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "গুরুর আদেশে শাস্ত্রতত্ত্ব প্রচারে আমি ব্রতী। বেশ, যতদিন গ্রন্থ ছাপানোর কাজ চলবে ততদিন আপনার প্রস্তাবিত অর্থ আমি নেব। কিন্তু এটা গণ্য হবে আমার ঋণ রূপে। গ্রন্থ ছাপানো হবার পর বিক্রির টাকা থেকে এই ঋণ পরিশোধ করা হবে।"

কালীকৃষ্ণ এ কথায় রাজী হন এবং তাঁহার প্রদত্ত টাকায় কোন-মতে প্রতি মাসে মহাত্মার সংসার ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে থাকে।

কিছুদিন পরের কথা। যোগত্রয়ানন্দ নিজ গৃহে নিভৃতে বসিয়া ধ্যান-জপ করিতেছেন, হঠাৎ এক সময়ে মানসপটে ভাসিয়া উঠে এক দুর্ঘটনার দৃশ্য। দেখেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর নিজের ঠাকুরঘরে সহসা পা ফস্‌কাইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। উঠিয়া দাঁড়ানোর সামর্থ্য নাই। 'আহা! আহা!' বলিয়া যোগত্রয়ানন্দ আর্ত্তস্বরে চেঁচাইয়া উঠেন। নয়ন দুটি করুণায় অশ্রুসজল হইয়া উঠে।

কিছুক্ষণ পরে ধ্যানকক্ষ হইতে বাহির হইতেই দেখিলেন, ঠাকুর-বাড়ীর এক কর্ম্মচারী গাড়ী নিয়া আসিয়াছে।—কর্ত্তা বড় অসুস্থ। এখনই একবার বাবার সেখানে যাওয়া আবশ্যক।

সেখানে উপস্থিত হইয়া যোগত্রয়ানন্দ দেখেন, কালীকৃষ্ণের পা হঠাৎ জখম হইয়াছে তাহা নয়, ব্যাপার আরও গুরুতর। আকস্মিক-

ভাবে পক্ষাঘাতের আক্রমণ ঘটে তাঁহার দুই পায়ে, ফলে তিনি ভূতলে পড়িয়া আহত হন। এই পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্য করা বড় সহজসাধ্য নয়।

কালীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া অসহায়ের মতো কাঁদিয়া ফেলেন। যোগত্রয়ানন্দ সস্নেহে তাঁহার পিঠে কল্যাণময় হস্তটি বুলাইয়া দেন, আশ্বাস দিয়া বলেন, "ভয় কি? ভালো হয়ে যাবেন। শ্রীভগবান নিশ্চয় কৃপা করবেন।"

মহাপুরুষের মঙ্গল হস্তের স্পর্শে তখনি এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, কালীকৃষ্ণের পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত আর নাই। ধীরে ধীরে লাঠিতে ভর দিয়া তিনি দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। এবারও যোগত্রয়ানন্দের কৃপায় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পরিবার এক মর্ম্মান্তিক দুর্দ্দৈব এড়াইতে সক্ষম হয়।

ঠাকুরের এক ভাইঝির হাতে নিক্রোসিস্ বা অস্থিক্ষয় রোগ দেখা দেয়। প্রবীণ শল্য চিকিৎসক ডাঃ মাউয়াটি রোগিণীর ভার নিয়াছেন। ইতিমধ্যে কয়েকবার অস্ত্রোপচারও হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রোগ সারে নাই। কেবলই চলিয়াছে বৃদ্ধির পথে। অবশেষে অভিজ্ঞ সার্জ্জন বলিয়া দিলেন, কনুইয়ের নীচেকার অংশ কাটিয়া বাদ দিতে হইবে, নতুবা রোগিণীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হইবে না।

কালীকৃষ্ণ বড় ঘাবড়াইয়া যান, তৎক্ষণাৎ গাড়ী পাঠাইয়া যোগত্রয়ানন্দকে বাড়ীতে নিয়া আসেন। কাতর স্বরে বলেন, "বিজ্ঞ সার্জ্জনের বিদ্যা বুদ্ধি সব হার মেনেছে। এবার আপনি কৃপা ক'রে এ মেয়েটিকে বাঁচান।"

যোগত্রয়ানন্দ কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে রোগিণীকে পরীক্ষা করেন, তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, "ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি বলছি, দুশ্চিকিৎস্য হলেও এ রোগ অচিরে আরোগ্য করা যাবে। দু সপ্তাহের বেশী সময় লাগবে না।"

কার্য্যকালে তাহাই ঘটিতে দেখা যায়। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভেষজের গুণে প্রাণঘাতী অস্থিক্ষয় নিবারিত হয়।

অতঃপর ঠাকুর ভবনের চিকিৎসার সব কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত হইল যোগত্রয়ানন্দের উপর। এইসব চিকিৎসার পারিশ্রমিক বাবদ বহু টাকা তাঁহার পাওনা হয়। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ভাবিতেছিলেন, এই বাবদ একটা মোটা টাকা একসঙ্গে তাঁহাকে দিয়া দিবেন। কিন্তু যোগত্রয়ানন্দ তাহাতে বাধ সাধিলেন। তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "গ্রন্থ ছাপানোর সময় আপনি প্রতি মাসে আমার সংসারের ব্যয়ের জন্য টাকা দিয়েছেন। সে টাকা আমি ঋণ বলেই এতকাল গণ্য করে আসছি। চিকিৎসার খাতে আমার যে টাকা পাওনা হয়েছে, তা থেকে পূর্ব্বেকার ঐ ঋণ শোধ হয়ে যাক্।"

এই ব্যবস্থাই কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে সেদিন মানিয়া নিতে হইল।

ঠাকুরবাড়ীর উপর যোগত্রয়ানন্দের কৃপা দীর্ঘদিন ছিল। সে-বার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের দৌহিত্রীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে। বিবাহের দিন সারা আকাশ জুড়িয়া মেঘের ঘনঘটা দেখা গেল। সকলেই মহা চিন্তিত, ঝড়-জল বেশী হইলে চরম অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। কালীকৃষ্ণের নাতনী বিবাহের কনে, আতঙ্কিত হইয়া বলে, "দাদু, সব যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, এখন উপায়?"

কালীকৃষ্ণ চিন্তিত হইয়া কহিলেন, "তাই তো, এ যে মহাবিপদ দেখ্‌ছি। একমাত্র বাবাজীই এ বিপদে রক্ষা করতে পারেন। তিনি পাশের ঘরেই বসে আছেন। তোকে তো খুব স্নেহ করেন, তুই তাঁকে চেপে ধর না।"

কালীকৃষ্ণের নাতনী আবদারের সুরে যোগত্রয়ানন্দকে বলিতে থাকে, "আজকের ঝড়-বাদল থামাতেই হবে, নইলে বাবাজী, আপনার মাহাত্ম্য বুঝা যাবে না।"

যোগত্রয়ানন্দ হাসিয়া কহিলেন, "ঝড় বৃষ্টিও চলবে, তোমার বিয়েতে কোন বাধা হবে না, এই ব্যবস্থাই বরং ভালো।"

নীরবে বারান্দায় বসিয়া, দূর আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া

যোগত্রয়ানন্দ মৃদুস্বরে কতকগুলি মন্ত্র পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইল প্রবল বর্ষণ। এই বর্ষণের শেষে আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া গেল। তারপর সে রাত্রে আর বৃষ্টি হয় নাই, বিবাহ সভার কোন ক্ষতিও সাধিত হয় নাই।

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী যোগত্রয়ানন্দ যেমন চিকিৎসা করিতেন, তেমনি অতি আধুনিক ডাক্তারী বিদ্যায়ও তাঁহার ব্যুৎপত্তি কম ছিল না। ইংরেজীতে রচিত দেহতত্ত্ব ও চিকিৎসা সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ এক সময়ে তিনি অধ্যয়ন করেন। এগুলি আয়ত্তও করেন আপন সহজাত মেধা ও প্রতিভার বলে। প্রয়োজনবোধে কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে তাঁহাকে অভিজ্ঞ ইউরোপীয় ডাক্তারদের পদ্ধতি অনুসরণ করিতে দেখা যাইত এবং আধুনিকতম চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া প্রবীণ ডাক্তারেরাও বিস্মিত হইতেন।

কাশীপুরে থাকা কালে একটি জ্বরের রোগী তাঁহার হাতে আসে। স্থানীয় এক বিজ্ঞ ডাক্তারও রোগীটির দেখাশুনা করিতেছেন। জ্বর বড় অদ্ভুত ধরণের, কোনমতেই ইহার গতি-প্রকৃতি সঠিকভাবে বুঝা যাইতেছে না। রোগীর অবস্থা ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে।

যোগত্রয়ানন্দ রোগ নির্ণয় করেন, সহযোগী ডাক্তারকে বলেন, "আসলে এ রোগটি হচ্ছে বিলিয়াস নিউমোনিয়া। লিভারকে আরো বেশী সক্রিয় না করতে পারলে রোগীকে বাঁচানো যাবে না।"

অতঃপর রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা তিনি করিলেন।

সহযোগী ডাক্তারটি অভিজ্ঞ ও প্রবীণ। তিনি মন্তব্য করিলেন, "ইউরোপে এই রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি বার করা হয়েছে বলে শুনেছি। ভারতবর্ষে অনেক ডাক্তারের কাছে তা অজ্ঞাত।"

সেদিন ঠাকুরঘর হইতে যোগত্রয়ানন্দ বাহিরে আসিতেছেন,

হঠাৎ তাঁহার পায়ে আসিয়া ঠেকিল একটি পুরাতন কাগজের ঠোঙ্গা। হাতে তুলিতেই দেখিলেন, ইউরোপীয় গবেষক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের রচিত কতকগুলি গ্রন্থের বিজ্ঞাপন উহাতে দেওয়া রহিয়াছে। এই বিজ্ঞাপন-তালিকা হইতে একটি গ্রন্থ বাছিয়া নিয়া তখনি ভক্ত সতীশকে কলিকাতায় পাঠাইলেন। নির্দ্দেশ দিলেন, যে কোন মূল্যে এটি যেন সংগ্রহ করা হয়।

ঐ ডাক্তারী গ্রন্থটি কিনিয়া আনা হইল, গভীর রাত অবধি যোগত্রয়ানন্দ উহা পাঠ করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসা ঠিক পথেই চলিয়াছে। পরের দিনই রোগীর জ্বর ছাড়িয়া গেল, বাড়ীর সবাই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

যোগত্রয়ানন্দ এবার সহযোগী প্রবীণ ডাক্তারটিকে ডাকিয়া নূতন কিনিয়া-আনা ইউরোপীয় চিকিৎসা-গ্রন্থের নির্দ্দেশ দেখাইয়া দিলেন।

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, "আপনি যত কিছুই বলুন না কেন, আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির যত বই-ই দেখান না কেন, আমি বলবো, আপনার যোগশক্তিই এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনাকে পথ দেখিয়েছে, সঠিক রোগনির্ণয়ের দিকে টেনে এনেছে।"

একবার এক পশ্চিম দেশীয় সাধু শহরে আসিয়া উপস্থিত হন। লোক পরম্পরায় যোগত্রয়ানন্দের কথা তাঁহার কানে যায় এবং তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন।

সাধুকে যথেষ্ট সমাদর করা হইল এবং উভয়ের মধ্যে নানা ধর্ম্ম-প্রসঙ্গের আলাপ-আলোচনা চলিল। এবার যোগত্রয়ানন্দ যুক্তকরে কহিলেন, "মহারাজ, বেলা হয়ে গিয়েছে, আমার একান্ত ইচ্ছে আপনি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমার কয়েকটি ভক্ত নিকটেই এক বাড়ীতে বসবাস করেন। চলুন, সেখানে আপনার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে।"

সাধুটি গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, “আমি তো কোন্ গৃহীর আতিথ্য গ্রহণ করিনে। লোকালয়ের বাইরে গিয়ে কোন একটা জায়গা দেখে নেবো। এজন্য ভাবনার প্রয়োজন নেই।”

“প্রয়োজন আছে বলেই তো ভাবছি মহারাজ। শুধু ভাবছিনে, দুর্ভাবনায়ই পড়েছি আপনাকে নিয়ে।”—সবিনয়ে নিবেদন করেন যোগত্রয়ানন্দ।

“তার মানে? ওসব অবান্তর কথা রাখুন। আমার ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না।”—বলিয়া সাধুটি বাড়ীর বাহিরে আসিলেন, রাস্তা দিয়া আপন মনে চলা শুরু করিলেন।

যোগত্রয়ানন্দ তাঁহার পিছনে পিছনে চলিয়াছেন, আর বার বার জানাইতেছেন অনুরোধ। অবশেষে দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “মহারাজ, আপনি অবুঝের মতো ব্যবহার করছেন। আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, একটা মারাত্মক ব্যাধি আপনার দেহে প্রবেশ করেছে। এখন কিছুকাল আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। সুচিকিৎসার ব্যবস্থা তো করতেই হবে।”

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সাধু পূর্ব্ববৎ পথ চলিতে থাকেন। অগত্যা যোগত্রয়ানন্দকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

কিন্তু দেখা গেল, রাস্তার মোড় পার না হইতেই সাধুটি প্রবল জ্বরের ঘোরে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। যোগত্রয়ানন্দ তখনি আবার ছুটিয়া যান। ধরাধরি করিয়া সাধুটিকে পূর্ব্বকথিত বাড়ীতে নিয়া তোলা হয়। যোগত্রয়ানন্দের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ভক্ত-সেবকেরা গ্রহণ করেন তাঁহার সেবার ভার।

রোগীর জ্বরটি বড় মারাত্মক ধরণের। যোগত্রয়ানন্দ রোজই তাঁহাকে দেখিতে যান, ওষুধপত্রাদি দিয়া আসেন। সেদিন খাওয়ার ওষুধের সঙ্গে বুকে-পিঠে মালিস করার জন্যও একশিশি ওষুধ পাঠানো হইয়াছে। পূজার ঘরে ঢুকিয়া যোগত্রয়ানন্দ জপে বসিতে যাইবেন, এমন সময় শুনিলেন এক দৈবী আওয়াজ। কে যেন বলিতেছেন, ‘শিগ্‌গীর পীড়িত সাধুটিকে দেখে এসো। শুশ্রূষাকারী

ভুল করে তাকে মালিসের ওষুধ খাওয়াতে যাচ্ছে। খাওয়ানোর পরই বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।"

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যোগত্রয়ানন্দ ত্রস্তপদে সাধুর কাছে গিয়া উপস্থিত হন। সেবক ভক্তটির হাত হইতে ওষুধের গ্লাসটি সাধু নিতে যাইবেন এমন সময় যোগত্রয়ানন্দ উহা কাড়িয়া নিলেন। গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "এটা খাবার ওষুধ নয়, মালিস।"

এ কথা শুনিয়াই সাধুর মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া যায়। সক্রোধে মালিস এবং খাবার ওষুধ সব কিছুই তিনি বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলেন।

যোগত্রয়ানন্দ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন, "অনর্থক আপনি রাগ করছেন। ভুল করে আপনাকে মালিস খেতে দেওয়া হচ্ছে, ঠাকুর একথা আমায় জানিয়ে দিলেন। তাই তো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলাম। আর একটু দেরী হলেই আপনাকে আর বাঁচানো যেতো না।"

এবার সাধুর চৈতন্যোদয় হইল। অনুতপ্ত হইয়া কহিলেন, "নিজের অভিমান বশতঃ মহাত্মাকে আমি চিনতে পারি নি। আপনি আমার জীবনদাতা। আমায় ক্ষমা করুন, কৃপা করুন।

প্রায় তিন সপ্তাহ মারাত্মক জ্বরে ভুগিবার পর ঐ সাধুটি সুস্থ হইয়া উঠেন, তারপর নিজের দেশে ফিরিয়া যান।

আশ্রিত ভক্ত-শিষ্যদের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত অধিকারী তাঁহাদের অনেকে যোগত্রয়ানন্দের যোগবিভূতি ও অলৌকিক শক্তির সহিত পরিচিত ছিলেন। সিদ্ধ মহাপুরুষের এই শক্তির প্রকাশ ঘটিত নানা ভঙ্গীতে এবং নানা মাধ্যমের ভিতর দিয়া।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার পত্নী যোগত্রয়ানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত। ব্যবহারিক জীবন এবং সাধনময় জীবনের অনেক কিছু সমস্যায়ই এই শক্তিধর মহাত্মার কৃপার উপর তাঁহারা নির্ভর করিতেন।

গোপালবাবু বিচার বিভাগের একজন অফিসার। সে-বার তিনি বদলী হইয়া নূতন চাকুরিস্থল ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ শহরে আসিয়াছেন। খড়ের চালযুক্ত একটি বাংলো বাড়ীতে তাঁহারা বাস করিতেছেন। একদিন গভীর রাতে কি এক অজ্ঞাত কারণে চালে আগুন লাগিয়া যায় এবং অল্পকাল মধ্যে বাড়ীর চারিদিকে তাহা ছড়াইয়া পড়ে। হঠাৎ এক দৈবী কণ্ঠস্বর শুনিয়া গোপালবাবু ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠেন। দেখেন, লেলিহান আগুনের শিখা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। তখনি পত্নীকে জাগাইয়া তুলিলেন। ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র উভয়ে মিলিয়া উঠানে স্থানান্তরিত করার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত ছাদটি নীচে ধসিয়া পড়িল। আর একটু বিলম্ব হইলে দু'জনেই এই অগ্নিদাহে দগ্ধ হইতেন।

গোপালবাবুর পত্নী সবিস্ময়ে দেখিলেন, জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর মূর্ত্তিতে যোগত্রয়ানন্দ ঐ জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার প্রশান্ত কৃপাদৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে আশ্রিত ভক্ত দম্পতির উপর।

সাশ্রুনয়নে এই ভক্তমতী মহিলা তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত হয়ে স্বয়ং বাবাই আজ আমাদের দু'জনের প্রাণ রক্ষা করলেন। তাঁকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয় নি।"

১৯০৬ সাল। যোগত্রয়ানন্দ স্থির করিলেন, এবার তিনি কাশীতে বাস করিবেন, প্রভু বিশ্বনাথের পাদপদ্মে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া শুরু করিবেন অধ্যাত্ম জীবনের নূতন পর্য্যায়। স্বজনবর্গ এবং দুই চারিটি সেবক-ভক্ত সঙ্গে নিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁহার বহু আকাঙ্ক্ষিত শিবধামে।

অধ্যাত্ম জগতে সুপরিচিত, উৎসব সম্পাদক অধ্যাপক রামদয়াল মজুমদার এ সময়ে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীতে বাস করিতেছেন। শক্তিধর মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের আগমনে তিনি মহা পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

প্রত্যূষে উঠিয়া যোগত্রয়ানন্দ গঙ্গাস্নান করিতেন, তারপর রুদ্ধ কক্ষে দীর্ঘসময় কাটাইতেন যোগসাধনায় ও নিত্যকার পূজা ও জপতপে। বিশ্বনাথ দর্শন, গঙ্গাভ্রমণ ও নামকীর্ত্তনও ছিল তাঁহার প্রাত্যহিক দিনচর্য্যার অঙ্গ।

রামদয়াল মজুমদার প্রায়ই গঙ্গাভ্রমণের সময় যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গী হইতেন। মহাত্মার পুণ্যসঙ্গ ও অমৃতময় বচনসুধা পান করিয়া মন তাঁহার দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিত। উত্তরকালে কথা প্রসঙ্গে মজুমদার মহাশয় যোগত্রয়ানন্দের মহনীয় চরিত্র ও অন্তরঙ্গ আচরণের নানা কাহিনী বর্ণনা করিতেন।

তখন শীতকাল। একদিন বিকালে তিনি যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গী হইয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিয়াছেন। পথের পাশে একটি ভিখারী ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে আসিতেই কাতরকণ্ঠে সে সামান্ত কিছু ভিক্ষা চায়। যোগত্রয়ানন্দ করুণ নেত্রে তাঁহার অর্দ্ধনগ্ন বেশের দিকে তাকাইয়াই নিজের কাঁধের পশমী আলোয়ানটি তাহাকে দিয়া দিলেন। সম্প্রতি এক ধনী ভক্ত এই মূল্যবান বস্তুটি মহাত্মাকে উপহার দিয়াছিলেন।

রামদয়ালবাবু মন্তব্য করেন, "এই দামী আলোয়ানটি না দিয়ে, ওকে বাজার থেকে আর একটা গায়ের চাদর কিনে দিলেই হতো।"

স্মিতহাস্যে মহাপুরুষ কহিলেন, "ভগবান যদি দামী শীতবস্ত্র আমায় পরাতেই চান, তবে তো নিজেই কৃপা করে পাঠিয়ে দেবেন। এ নিয়ে ভাব্‌বার কি আছে?"

সেইদিনই গঙ্গাভ্রমণ হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিলে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগত্রয়ানন্দের হাতে একটি পার্শেল দিয়া কহিলেন, "দাদা, এটি কলকাতা থেকে এসেছে।"

পার্শেলটি খুলিয়া দেখা গেল, এক ভক্ত শীতে ব্যবহারের জন্ম বাবাকে একটি মূল্যবান পশমী শাল পাঠাইয়াছেন। রামদয়াল বিস্ময়ে মহাত্মার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যোগত্রয়ানন্দের রচিত আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপের খ্যাতি তখন সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বহু শিক্ষিত এবং জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা এই মহান গ্রন্থের রচয়িতার সহিত পরিচিত হইতে আসিতেন। তত্ত্ব ও সাধনপ্রণালী সম্পর্কে তাঁহারা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাধক মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ তখন তরুণবয়স্ক। আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপকারের প্রতিভা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাই তাঁহাকে একবার দর্শন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। যোগাযোগ অচিরে ঘটিয়া গেল, কাশীতে একদিন যোগত্রয়ানন্দের গৃহে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিলেন।

মহাত্মা তাঁহাকে স্নেহাশিস্ জানাইলেন, স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন, "বাবা, তোমার কোন সংশয় বা প্রশ্ন যদি থাকে বল।"

তরুণ বিদ্যার্থী গোপীনাথ একটি সুন্দর প্রশ্ন – যাহা বহু জিজ্ঞাসু সাধকের প্রশ্ন—উত্থাপিত করিলেন। কহিলেন, "বাবা, গুরুজনদের মুখে শুনেছি, সত্য এক ও অখণ্ড। মুনি ঋষিরা যদি সত্যের সাক্ষাৎকার ক'রে থাকেন তবে তাঁদের মতে মতবৈষম্য হয় কেন? নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্—একথার অর্থ কি? নানা মুনির নানা মত কেন হবে? ব্রহ্মবিদ্ মুনিরা কি একমত হতে পারেন না? এর তাৎপর্য্য আমায় বুঝিয়ে বলুন। এ তাৎপর্য্য বুঝতে পারলে সাধারণ জিজ্ঞাসুরা উপকৃত হবে। নানা পথ ও মতবৈষম্যের মধ্যে পড়ে তাদের বিভ্রান্ত হতে হবে না।"

এই প্রশ্নের এক অপরূপ মীমাংসা যোগত্রয়ানন্দ করিয়া দিলেন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের ভাষাতেই এখানে উহা বর্ণিত হইতেছে। "বাবাজী কহিলেন, বৎস, তোমার প্রশ্নের অঙ্গীভূত বাক্যের মধ্যেই উহার সমাধান রহিয়াছে। মুনি কাহাকে বলে? যিনি মননশীল তিনিই মুনি-পদবাচ্য। মত কাহাকে বলে? মনের দ্বারা যাহা অঙ্গীকৃত হয় অর্থাৎ অখণ্ড সত্যের যে অংশটুকু খণ্ড মনের দ্বারা গৃহীত হয় তাহাই মত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনকে অবলম্বন করিয়া সত্যের সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করা যাইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অখণ্ড

সত্যের দর্শন লাভ সুদূর পরাহত। অখণ্ড সত্যের ধারণা করিতে হইলে মনকে নিরুদ্ধ করিয়া এবং শুধু মনকে নয় অন্তঃকরণের যাবতীয় বৃত্তিকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া অন্তঃকরণের বাহিরে যাইতে হইবে। অন্তঃকরণের পৃষ্ঠভূমিতেই আত্মার স্বয়ংপ্রকাশ আলোক অবস্থিত। বিকল্প শক্তির দ্বারা মন ঐ আলোককে ভাগ করিয়া পৃথক পৃথক ভাবরূপে পরিণত করে। মনের ইহা দোষ নহে, ইহাই মনের স্বভাব।

"বিকল্পশূন্য পরম সত্যকে পাইতে হইলে মনের ঊর্ধ্বে উত্থিত হইতে হইবে। এই অবস্থায় মতামতের কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ মনই যেখানে নাই সেখানে মত কোথায়? কিন্তু ঐ সত্যের প্রকৃত চিত্র অজ্ঞানীকে প্রদর্শন করান যায় না, কারণ উহা সংক্রমণ হয় না। যাহার চিত্ত ঐ স্বয়ংপ্রকাশ ভূমিতে প্রবিষ্ট হইবে তাহার নিকট উহা আপনিই প্রকাশিত হইবে। কিন্তু অজ্ঞান জগতের জ্ঞানলাভের কোন উপায় উহা হইতে হয় না। ঐ অবস্থা যাহার হয়, শুধু তাহারই হয়। ঐ জ্ঞান অজ্ঞানী পরন্তু অনুরাগী ও আশ্রিত জিজ্ঞাসু-জনকে দিতে হইলে মনের আশ্রয় গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। মনের ধর্মই কল্পনা বা বিকল্প বৃত্তি ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞানকে বিকল্পের সঙ্গে যুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসুর নিকট উপস্থাপিত করা হয়। বিকল্প নানা প্রকার। জিজ্ঞাসুর চিত্তের প্রকৃতি, বাসনা ও অনুভব প্রভৃতি বিচার করিয়া তত্ত্বজ্ঞ গুরু তদনুরূপভাবে শব্দের সাহায্যে তাহাকে ঐ জ্ঞান দান করেন।

"এইখানেই মনের সার্থকতা। এইখান হইতেই মতের উদ্ভব হয়। যিনি পূর্ণ সত্যকে মনের দ্বারা ধারণা করিতে যান তাঁহার তো মত থাকিবেই, কিন্তু যিনি মনকে ত্যাগ করিয়া পূর্ণ সত্যকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারও মত থাকে। তখন তিনি মনো-ভূমিতে বিদ্যমান, বিশিষ্ট অধিকার সম্পন্ন জিজ্ঞাসুর নিকট ঐ জ্ঞান সঞ্চার করেন। এই জন্যই উভয় জ্ঞানীতে স্বরূপতঃ পার্থক্য না থাকিলেও অধিকার ভেদে তাঁহাদের উপদেশের মধ্যে পার্থক্য

আসিয়া পড়ে। এই জন্যই বলা হইয়াছে—নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।

"ইহাই মুনিদের মতভেদের রহস্য। সাধারণ লোকের অর্থাৎ অজ্ঞ লোকের মতভেদ এই প্রকার নহে। কারণ মুনিদের মতভেদ সত্ত্বেও মূলে আছে জ্ঞান, কেবল অন্যের উপদেশের জন্য বিকল্পের আশ্রয় নেওয়া হয়। সাধারণ লোকের মতভেদের মূল অজ্ঞান[১]।"

প্রশান্ত বদনে সৌম্যভাবে বাবাজী এই দুরূহ প্রশ্নটিকে সরল ও সহজবোধ্য করিয়া দিলেন। প্রজ্ঞা এবং করুণার প্রতিমূর্ত্তি এই মহাসাধকের চরণধূলি নিয়া তরুণ জিজ্ঞাসু হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিলেন।

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন তখন কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পুত্র বৃন্দাবন এসময়ে এক মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত হয়, ক্রমে তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টাই করিয়াছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এবার দৈব কৃপা ছাড়া গতি নাই।

তর্করত্ন মহাশয় স্থির করিলেন, বৃন্দাবনকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা তিনি এবার করিবেন,—যোগত্রয়ানন্দজীর কাছে মাগিবেন তাহার জীবনভিক্ষা।

গোপীনাথ কবিরাজ তর্করত্ন মহাশয়ের অতিশয় স্নেহের পাত্র, আবার যোগত্রয়ানন্দ বাবার সঙ্গেও গোপীনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তাই তর্করত্ন মহাশয় সেদিন ভোরবেলায় লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন। কহিলেন, "গত রাতে বৃন্দাবনের অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে। আর বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই বাবাজীর এবার শরণ নিতে যাচ্ছি। তুমি আমায় এখুনি সেখানে নিয়ে চল।"

গোপীনাথ জানেন, বাবাজী সকালবেলায় দীর্ঘ সময় রুদ্ধদ্বার

১ সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ—যোগত্রয়ানন্দজী : ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

কক্ষে একান্তে সাধনভজন করেন। কোন বাহিরের লোকের সঙ্গে তখন দেখাশুনা করেন না। অন্তরঙ্গ সেবকেরাও এসময়ে তাঁহার ঘরে ঢুকিতে সাহস পায় না। কাজেই এখন তর্করত্ন মহাশয়কে নিয়া সেখানে গেলে, হয়তো বাবাজীর কাছে তাঁহার আগমন সংবাদ পৌঁছিবেই না, সাক্ষাৎও হইবে না।

তর্করত্ন মহাশয়কে কহিলেন, "বাবাজী অপরাহ্নেই দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখাশুনা করেন, তাই ঐ সময়টাই তাঁর কাছে যাওয়ার প্রশস্ত সময়।"

তর্করত্ন মহাশয় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শয্যাশায়ী বৃন্দাবনকে দেখাইয়া দিলেন। দীর্ঘদিন ভুগিয়া ভুগিয়া সে কঙ্কালসার হইয়াছে, পড়িয়া আছে মৃতের মতো অসাড় হইয়া। শিয়রে বসিয়া তাহার জননী অসহায়ভাবে কাঁদিতেছেন।

গোপীনাথ বুঝিলেন, বৃন্দাবনের জীবনের কোন আশাই নাই। তর্করত্ন মহাশয় করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "না গোপীনাথ, আর সময় ক্ষেপণ করা যায় না। চল, এখনি গিয়া বাবাজীর কাছে আমার প্রার্থনা নিবেদন করি।"

যোগত্রয়ানন্দ তখন কাশীর রাজঘাটে বাস করিতেছেন। উভয়ে তাঁহার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইতেই, বাবাজীর প্রিয় সেবক সতীশ কহিল, "এই যে আপনারা এসে গেছেন দেখ্‌ছি। বাবা একটু আগেই আমায় ডেকে বললেন, 'গোপীনাথ আর তর্করত্ন মশাই এখনই এখানে আসবেন। বৃন্দাবনের শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। দেখো, ওরা যেন ফিরে না যান। তুমি নীচে গিয়ে অপেক্ষা করবে এবং ওরা এলেই আমার ঘরে নিয়ে আসবে। আমি ওদের জন্য প্রতীক্ষা করবো আর একলাটিই থাক্‌বো। যদিও এসময়ে আমি কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনে, তবুও ওদের সঙ্গে কথাতেই হবে। কেউ যেন ওদের বাধা না দেয়।"

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীর কৃপার কথা ভাবিয়া তর্করত্ন মহাশয়ের দুই চোখ অশ্রুসজল হইয়া

বাবাজীর সহিত তখনি উভয়ে সাক্ষাৎ করিলেন। তর্করত্ন মহাশয় মহাত্মার প্রশস্তিসূচক এবং ভক্তি-অর্ঘ্য স্বরূপ কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া আনিয়াছিলেন, উহা পাঠ করিয়া ও প্রণাম নিবেদন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

যোগত্রয়ানন্দ স্নেহপূর্ণ স্বরে তর্করত্নকে কহিলেন, "গত রাতে ধ্যানাসনে বসবার পরই দেখতে পেলাম, বৃন্দাবনের অবস্থা সঙ্কট-জনক, আর আপনি চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন। আপনারা আসবেন, তাও জানতে পারলাম। তাই সতীশকে বলে রেখেছি, আপনাদের যেন ফিরিয়ে দেওয়া না হয়।"

তর্করত্ন মহাশয় পুত্রের রোগমুক্তির জন্য বাবাজীর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন, আর তিনি যে কৃপাভরে তাঁহার জন্য এতটা চিন্তা করিয়াছেন সেজন্য বার বার জানান কৃতজ্ঞতা।

কথা প্রসঙ্গে তর্করত্ন মহাশয় প্রশ্ন করেন, "বাবা, এসব কি আপনার যোগশক্তির ব্যাপার?"

যোগত্রয়ানন্দ স্মিতহাস্যে উত্তর দেন, "যোগশক্তি ছাড়া আর কি? হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হলে স্বভাবতঃ এই রকমই ঘটে থাকে। তখন দূরকেও নিকটে দেখা যায় এবং ভবিষ্যৎকেও বর্ত্তমানরূপে জানা যায়।"

কিছুকাল মৌনী থাকিয়া আবার বলিলেন, "আপনি বৃন্দাবনের জন্য আর চিন্তা করবেন না। যখন সে আমার দৃষ্টিতে পড়েছে তখন সে অবশ্যই ভাল হয়ে যাবে। আপনারা বাড়ী ফিরে গেলেই দেখতে পাবেন—তার অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে।"

বাবাজীর এই অহেতুক করুণায় তর্করত্ন মহাশয় একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। ছল ছল নেত্রে বাবাজীকে প্রণাম করিয়া তিনি ঘরে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর বৃন্দাবনের অবস্থায় দ্রুত উন্নতি দেখা গেল এবং অনতিবিলম্বে সে সুস্থ হইয়া উঠিল।

যোগত্রয়ানন্দ প্রায়ই ভক্ত এবং দর্শনার্থীদের বলিতেন, "সাধন-জীবনের উন্নতি সাধন করতে হলে চাই আন্তরিক বিশ্বাস। এই

বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় না হলে শুধু যুক্তি-তর্কের সাহায্যে এ পথে এগোনো যায় না।"

আরো বলিতেন, "ত্থাখো, বিশ্বাসের বলে সবই হতে পারে। যা লৌকিক দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়, বিশ্বাসের বলে তাও অনায়াসে সংঘটিত হতে পারে। কিভাবে, কোন্ শক্তির দ্বারা কোন্ কাজ সাধিত হয়, তা মানুষ বুঝে উঠতে পারে না।

কলিকাতার এক ইন্‌জিনিয়ার ভদ্রলোকের মাতা যোগাত্রয়ানন্দের খুব ভক্ত ছিলেন, বাবার যে কোনো কথার উপর তাঁহার অটুট আস্থা ছিল। এই বৃদ্ধা মহিলা তখন হৃদ্‌রোগে খুব ভুগিতেছেন। ডাক্তারদের মতে, যে কোনো সময়ে এই পীড়া আরো বাড়িতে পারে এবং তাঁহার মৃত্যু ঘটিতে পারে। তাঁহার পক্ষে বেশী নড়াচড়া করা ভাল নয়, এ সতর্কবাণীও তাঁহার উচ্চারণ করিয়াছেন।

বৃদ্ধা মহিলা একদিন করজোড়ে যোগত্রয়ানন্দকে কহিলেন, "বাবা, আমার এই অবস্থা। বাইরে কোথাও যাওয়া ডাক্তারদের নিষেধ। কিন্তু প্রাণে বড় ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর আগে কয়েকটা তীর্থ দর্শন করবো। এ ইচ্ছা পূর্ণ হয়, যদি আপনি আমায় কৃপা করেন। আরো একটা ইচ্ছে আছে, কাশীতে যেন আমার দেহান্ত হয়।"

বাবা সহাস্যে কহিলেন, "বেশ, আপনার দুটো আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হবে। কাশীপ্রাপ্তি আপনার অবশ্যই ঘটবে। আর আপনাকে তীর্থ দর্শনও করাবো। আপনার কোনো ভয় নেই। কিন্তু আমি অনুমতি দেবো, একটা সর্তে।"

"বলুন বাবা, আমি তা মেনে নিতে রাজী।"

"আমি যে যে স্থানে যেতে নির্দেশ দেবো, যে যে দৃশ্য দেখতে বলবো, তা-ই আপনি করবেন। অতিরিক্ত কোথাও যাবেন না, বা দেখবেন না। আমার কথামতো চললে আপনার জীবনহানির কোনো আশঙ্কা নেই। অন্যথায় বিপদ হবে।"

বৃদ্ধার ধর্মবিশ্বাসের আঁট ছিল, বাবাজীর প্রতিও ছিল অবিচল নিষ্ঠা। অনুমতি পাইয়া কয়েকটি তীর্থ দর্শন তিনি সমাপ্ত করিলেন।

কিন্তু হঠাৎ ঝোঁকের বশে তিনি এক মস্ত ভুল করিয়া বসিলেন। যোগত্রয়ানন্দের নির্দেশ ছিল, গির্ণার পাহাড়ে বৃদ্ধা যাইবেন না। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে বাবার কথা বিস্মৃত হইয়া তিনি পাহাড়ে উঠিয়া গেলেন। তারপর শুরু হইল হৃৎপিণ্ডে তীব্র যন্ত্রণা ও স্পন্দন।

সর্বশরীর ঘর্মাক্ত, পা দুটি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা আকুল কণ্ঠে বাবাকে ডাকিতে লাগিলেন। কহিলেন, "বাবা, তোমার কথা না শুনে কি অন্যায়ই না আমি করেছি। যা হোক্ তুমি কৃপাময়, কৃপাই তোমার স্বভাবগত ধর্ম। এবারটি আমায় বাঁচাও। তাছাড়া, বাবা, তুমি তো বলেছো, কাশীতে আমার মৃত্যু হবে, এখন এই গির্ণার পাহাড়ে, বিদেশ-বিভুঁই-এ মৃত্যু হলে যে তোমারই দুর্নাম হবে। দয়া ক'রে আমায় রক্ষা করো।"

বৃদ্ধার কাতর ক্রন্দনের ফল অচিরে ফলিল। দেখিলেন, একটি গৌরকান্তি প্রৌঢ় সাধু, দেখিতে অনেকটা যোগত্রয়ানন্দেরই মতো, তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আর তাঁহাকে আশ্বাস বাক্য বলিতেছেন।

এই সাধুটিই এবার বৃদ্ধাকে কোলে তুলিয়া নিয়া পাহাড়ের উপরকার মন্দির ও অন্যান্য দর্শনীয় সব কিছু দেখাইয়া দিলেন। অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে নিচে নামাইয়াও আনিলেন। ততক্ষণে তাঁহার হৃৎপিণ্ডের বেদনা ও কাঁপুনিও একেবারে থামিয়া গিয়াছে, তিনি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। অতঃপর বৃদ্ধাটি সঙ্গিগণসহ নিরাপদে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

যোগত্রয়ানন্দকে এই অলৌকিক ঘটনার রহস্য সম্পর্কে জনৈক অন্তরঙ্গ ভক্ত এক সময়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, "আসল কথাটা কি জানো? ভগবান্ হচ্ছেন বিশ্বরূপ স্বরূপ। তাঁর যে ভক্ত তাঁকে যে রূপ দর্শন করতে ইচ্ছে করে—সেই রূপেই ভগবান্ তাকে দর্শন দিয়েই কৃতার্থ করেন। গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করাই শাস্ত্রের উপদেশ। বৃদ্ধা তা-ই করেছিলেন। আমি তো পাষাণ—কিন্তু পাষাণেও ভক্তির প্রভাবে শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি হয়।"

কিছুদিন পরে ঐ বৃদ্ধা ভক্তটির হৃদ্‌রোগ আবার বৃদ্ধি পায়, তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। তাঁহার চিরদিনের ইচ্ছা, অন্ত্যকালে যেন কাশীপ্রাপ্তি হয়। তাই অবিলম্বে কাশীতে যাওয়ার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর, এল, দত্ত বৃদ্ধার চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "এ অবস্থায় রোগিণীকে যেন নড়াচড়া করতে দেওয়া না হয়। কাশীতে যাওয়া দূরের কথা, দোতলা থেকে একতলায় নামতে গেলেই ঘোর বিপদের সম্ভাবনা। বৃদ্ধার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরাও ডাক্তারের কথা মানিয়া নিলেন, বাধা দিলেন কাশী যাওয়ার প্রস্তাবে।

অবশেষে বৃদ্ধার আগ্রহাতিশয্যে কাশীতে যোগত্রয়ানন্দের কাছে তাঁহার মত চাহিয়া তার করা হইল। উত্তরে তিনি নির্দেশ দিলেন, "যে যা বলুক, কোনো ভয় নেই, অবিলম্বে এখানে চলে এসো।"

অতঃপর স্বজনগণসহ বৃদ্ধা কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে কিছুদিনের মধ্যেই ঘটে তাঁহার অভিলষিত কাশীপ্রাপ্তি।

বহু মুমুক্ষু নরনারীকে যোগত্রয়ানন্দ দীক্ষা দিয়াছেন এবং এই সব দীক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেকে উচ্চতর সাধনমার্গে প্রবিষ্টও হইয়াছেন। দীক্ষাদানের আগে আপন যোগশক্তি সহায়ে তিনি শিষ্যের জন্মান্তরের সংস্কার এবং তাঁহার সাধনেচ্ছার আসল গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে নির্ণয় করিতেন। তারপর স্থির করিতেন তাঁহার সাধনমার্গ ও ইষ্টতত্ত্ব। শিষ্যের বহিরঙ্গ জীবনের ঝোঁক বা রুচিকে এই প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহাপুরুষ কোনোদিনই গুরুত্ব দিতে চাহিতেন না।

খড়দহের এক ভদ্রলোক কাশীতে থাকিয়া সাধনভজন করিতেন। এখানে আসিয়া একটি হরিসভার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। ভক্তিভাবের উদ্রেক হয় তাঁহার হৃদয়ে এবং ক্রমশ বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাকথা শুনিতে তাঁহার প্রবল উৎসাহ। নিত্য সন্ধ্যায় কীর্তন ও ভাগবত পাঠের

আসরে গিয়া না বসিলে মনে তিনি শান্তি পান না। সে-বার এই ভদ্রলোকটি এক সময়ে যোগত্রয়ানন্দের সন্ধান পাইয়া তাঁহার কাছে যাতায়াত শুরু করেন, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও যোগৈশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া যান।

ভদ্রলোকটি মনে মনে স্থির করেন, এই মহাপুরুষের নিকট হইতেই দীক্ষা নিবেন, তাঁহার চরণেই নিবেন একান্ত শরণ। একদিন যোগত্রয়ানন্দের কাছে নিজের প্রার্থনা তিনি নিবেদন করিলেন।

বাবাজীও সম্মতি দিলেন, "বেশ তো, তোমার যখন তীব্র ইচ্ছে হয়েছে, দীক্ষা আমার কাছে পাবে। কিছুদিনের মধ্যেই একটা দিন স্থির করতে হবে।"

দুই চারদিন পরে কথাপ্রসঙ্গে যোগত্রয়ানন্দ তাঁহাকে কহিলেন, "ওহে, তোমার তো দেখছি—শক্তিমন্ত্র। মহাশক্তিকে মাতৃরূপে উপাসনা ক'রে সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। এখন থেকেই এজন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নাও। নিজের ভেতর সন্তান ভাবটি জাগিয়ে তুলে জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করো। সব নারীমূর্তি জগজ্জননী মহামায়ার প্রকাশ, এটা অভ্যাস করো।"

ভদ্রলোকটি নীরবে কথাগুলি শুনিলেন কিন্তু কোনো উৎসাহ দেখাইলেন না। মনে তখন তাঁহার একটা ঘোরতর সংশয় আসিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবভাবে তিনি ভাবিত, বৈষ্ণবীয় রুচি তাঁহার। অথচ বাবা তাঁহাকে শক্তিমন্ত্র দিতে চাহিতেছেন। যিনি শিষ্যের অন্তরের গতিপ্রকৃতি বুঝিতে পারেন না, তাহার সংস্কার কি তাহা ধরিতে পারেন না, তিনি আবার কেমন মহাপুরুষ ?

বাবাকে তিনি অন্তর্যামী ও সর্বশক্তিমান্ বলিয়া ধরিয়া নিয়াছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে তাঁহার প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি নাই। প্রকৃত সাধন-বৈভব যাঁহার নাই এমন সাধকের কাছে তো আত্মসমর্পণ করা যায় না।

ভদ্রলোকটি যোগত্রয়ানন্দের কাছে যাওয়া-আসা প্রায় বন্ধ করিয়া দিলেন, ফলে দীক্ষার ব্যাপারটিও চাপা পড়িয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি কাশী ত্যাগ করিয়া খড়দেহে ফিরিয়া যাসেন। এখানে আসার পর জীবনধারার পরিবর্তন ঘটে এবং কাশীতে হরিসভায় যাতায়াত করার ফলে যে ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল তাহা ক্রমে স্তিমিত হইয়া আসে।

দেশে থাকার সময় সে-বার ভদ্রলোকটি ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অভিজ্ঞ ডাক্তারদের বহু চেষ্টার ফলেও তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেছেন না। বরং এই ব্যাধি ক্রমে মারাত্মক হইয়া উঠে এবং দেহের যন্ত্রণায় তিনি মৃতকল্প হইয়া পড়েন।

সেদিন গভীর রাতে অসহায়ভাবে রোগশয্যায় শুইয়াছেন, হঠাৎ দেখিলেন—শিয়রে দণ্ডায়মান এক জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি; এই মূর্তি নির্নিমেষে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন, আর আয়ত নয়ন দুইটি হইতে ঝরিতেছে দিব্য স্নেহ আর করুণার ধারা।

যেমন আকস্মিকভাবে এই মাতৃমূর্তির আবির্ভাব ঘটে, তেমনি তাহা হয় অন্তর্হিত। কিন্তু পরমবিস্ময়ের কথা, এই অন্তর্ধানের পর হইতেই ভদ্রলোকটির রোগ যন্ত্রণার উপশম ঘটে। শুধু তাহাই নয়, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

এবার যোগত্রয়ানন্দের কথা সম্পর্কে তাঁহার চৈতন্যের উদয় হয়। বাবা কেন তাহাকে শক্তিমন্ত্র দিতে চাহিয়াছেন, মাতৃরূপিণী ইষ্টের উপাসনায় কেন উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মর্ম তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন। বুঝিলেন, নিজের বহিরঙ্গ জীবনের ঝোঁক ও রুচি দিয়া নিজের আভ্যন্তরীণ সত্তাকে চিনিবার চেষ্টা করিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন। বাবার সাধনালব্ধ অন্তর্দৃষ্টি অভ্রান্ত, তাই উহা সঠিক-ভাবে তাঁহার মন্ত্র ও ইষ্ট নির্ণয় করিয়া দিয়াছে।

অতঃপর ভদ্রলোকটি কাশীতে গিয়া যোগত্রয়ানন্দের চরণতলে পতিত হন। কাতর কণ্ঠে বলেন, "বাবা, আমার অপরাধের সীমা নেই। আপনার বাক্যে আমার সংশয় এসেছিল। আপনার কৃপায় মা নিজে এসে আমার রোগযন্ত্রণা সারিয়ে দিয়েছেন, প্রাণ রক্ষা

করেছেন। আর এই কৃপালীলার মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন আপনার কথার সত্যতা। আপনি আমায় মার্জনা করুন।”

বাবাজী তাঁহাকে সস্নেহে কাছে টানিয়া নেন, নানা প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করেন। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই ভক্তটি অতঃপর সাধনজীবনে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন।

যোগত্রয়ানন্দ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ভারতের সারস্বত সমাজের মুকুটমণি ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন—“নিবৃত্তরাগস্য গৃহ তপোবনং—এই শাস্ত্রবাক্য তাঁহার ন্যায় রাগদ্বেষহীন, পূর্ণ বৈরাগ্য-সম্পন্ন কর্তব্যনিষ্ঠ গৃহস্থ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।”

আশেপাশের সাধকজনের উপর যোগত্রয়ানন্দের দূর বিস্তারী প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়া ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ লিখিতেছেন :

“বাবাজী জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। বহু দূর দেশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উচ্চাঙ্গের বিভিন্ন সাধক তাঁহার নিকট সদ্-উপদেশের জন্য উপস্থিত হইতেন। যতি, সন্ন্যাসী, অবধূত, যোগী, কর্মী, ভক্ত অনেকেই তাঁহার নিকট আসিতেন। সকলেই তাঁহার নিকট নিজ নিজ সমস্যার প্রকৃত সমাধান প্রাপ্ত হইতেন। সকল সম্প্রদায়কেই তিনি আপন বলিয়া মনে করিতেন এবং সকলকেই যথাযোগ্য উপদেশ দান করিতেন। গৃহস্থের নিকট সন্ন্যাসীর জ্ঞানলিপ্সাতে আগমন অপূর্ব, সন্দেহ নাই। কিন্তু জনক ও শুকদেবের কিংবদন্তী এই দেশে এখনও জাগরূক রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও কাশীনিবাসী মহাত্মা ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ীর সান্নিধ্যে বহুসংখ্যক জিজ্ঞাসু ও সাধনপ্রার্থী সন্ন্যাসীর ভিড় প্রায় সর্বদাই লাগিয়া থাকিত।

“আমার ব্যক্তিগত জীবনে বাবাজীর প্রভাব যে কতটা পড়িয়াছিল আজ তাহা ঠিক ঠিক নির্দেশ করা সহজ নহে, তবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিব। তাঁহার কৃপাতে অনেক সময় অলৌকিকভাবে আমি দৈহিক রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। তাঁহার অযাচিত করুণার

প্রতিদান আমি দিতে পারি নাই এবং কোনোদিন দিতে পারিব না। বুদ্ধি-সংক্রান্ত জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁহার সাহায্য অতুলনীয়— শুধু তাঁহার জ্ঞানময় জীবনের আদর্শ নহে, সাক্ষাৎভাবেও তিনি বহু জ্ঞান এই আধারে সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ জীবন, পবিত্র হৃদয়, অমায়িক স্বভাব এবং কর্মে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান-ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় আমার প্রথম যৌবনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বুদ্ধির অতীত ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান আমি নত শিরে স্বীকার করিতে বাধ্য।"

১৯২৫ সাল। স্বেচ্ছায় যোগত্রয়ানন্দ এবার কাশীধামের লীলায় ছেদ টানিয়া দিলেন। কহিলেন, "এবার বিরতির পালা। শিবের কিঙ্কর, রামের কিঙ্কর, এবার থেকে ভাব্‌বে শুধু কৈঙ্কর্যের কথা আর মুখে জপ্‌বে সুধাময় নাম।"

কলিকাতার ভক্তেরা সাগ্রহে বাবাজীর এই প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা শিরোধার্য করিলেন। প্রথমে উত্তর পাড়ায় কিছুদিন তিনি অবস্থান করেন, তারপর বরানগরের গঙ্গাতীরের এক উদ্যানে তাঁহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

কথাপ্রসঙ্গে ভক্তদের একদিন বলেন, "সর্ব তীর্থ সার এই গঙ্গাতীর। জীবনের সব কিছু চাওয়া-পাওয়া দেবো এবার বিসর্জন।

কিছুদিনের মধ্যে বাবাজী আতুর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গঙ্গার পবিত্র জল ছাড়া আর কিছু গ্রহণে তাঁহার আর রুচি নাই, ইচ্ছা নাই। পুত্র ইন্দুভূষণ ও ভক্ত-শিষ্যদের আবেদন ও মিনতি ব্যর্থ হয়। স্বেচ্ছায়, পরম আনন্দে দিনের পর দিন বাবাজী অগ্রসর হন তাঁহার বিদায় লগ্নের দিকে।

একদিন উদাস নয়নে নিস্তরঙ্গ ভাগীরথীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভক্তদের কহিলেন, "যেখানে শ্রীগুরু বাবাকে জলসমাধি দেওয়া হয়েছে, দেহত্যাগের পর এ খোলসটাকে সেখানেই তোমরা রেখে দিও।"

ভক্ত-শিষ্যেরা সাশ্রুনয়নে অনুরোধ জানান, "বাবা, আর কিছুদিন থেকে গেলে হতো না? কৃপা ক'রে তাই করুন।"

মৃদু হাসিয়া যোগত্রয়ানন্দ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "শ্রীগুরু বাবা চরণে নিজেকে এবার একেবারে সঁপে দিয়েছি। আর থাকা যায় না আমায় এবার যে যেতেই হবে।"

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর। সেদিন গভীর রাতে মহাৎ যোগত্রয়ানন্দ সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হন, তারপর এদিক ওদিে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন।

পুত্র ইন্দুভূষণ বাহিরের বারান্দায় নিদ্রিত ছিলেন, কে যে তাঁহাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়া গেল, "আ বিলম্ব না ক'রে বাবার কাছে যাও।"

পুত্র ও ভক্তেরা নিকটে দাঁড়াইতেই প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলে "এখনি আমায় তোমরা গঙ্গায় নিয়ে চল।"

সবাই মিলিয়া দেহটি বহন করিয়া আনিলেন গঙ্গাতটে। পবি বারি স্পর্শ করিয়া যোগত্রয়ানন্দ কিছুক্ষণ ধ্যানাবিষ্ট রহিলেন তারপর ভক্ত ও শিষ্যদের শোকসাগরে ভাসাইয়া মগ্ন হইলে চিরসমাধিতে।

অবধূত নিত্যানন্দ

বীরভূমের একচক্র গ্রাম। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সেদিন ধীর পদে এ গ্রামের হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মস্তকে জটার ভার, গৌরকান্তি দীর্ঘবপু এই অভ্যাগতকে দেখিয়া পণ্ডিতের আনন্দের সীমা নাই। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া যুক্তকরে কহেন, "প্রভু, কৃপা করে দর্শন যখন দিয়েছেন, আজ আমাদের সেবার অধিকার দিন। এখানেই রাত্রি যাপন করুন।"

স্মিতহাস্যে হস্ত উত্তোলন করিয়া সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ জানান। বুঝা গেল, এ রাত্রির মত আতিথ্য গ্রহণে তাঁহার আপত্তি নাই। হস্ত পদ প্রক্ষালনের জল-দেওয়া হইলে তিনি আসন বিছাইয়া বসিলেন।

পণ্ডিতের বালক-পুত্র কুবের। খেলাধূলা সাঙ্গ করিয়া সবে মাত্র বাড়ী ফিরিয়াছে। ছুটিয়া আসিয়া অতিথির চরণে সে দণ্ডবৎ করিল।

সন্ন্যাসীর চোখে এ কোন্ বিদ্যুতের ঝলক? স্থির, প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে তিনি এই বালকের দিকেই চাহিয়া আছেন। কাঁচা সোনার মত তাহার রং, সুন্দর সুঠাম অঙ্গখানি লাবণ্যে ঢলঢল। চোখে-মুখে দিব্য আনন্দের আভা। হাড়াই পণ্ডিতের এ পুত্রটি মায়ামুক্ত সন্ন্যাসীকে আজ কোন্ আকর্ষণে ফেলিতে চাহিতেছে? এ কোন্ জন্মান্তরের সম্বন্ধ? আজিকার এ সাক্ষাতের অন্তরালে কোন্ গূঢ় দৈবী ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা কে বলিবে? সর্ব্বত্যাগী পরিব্রাজকের দৃষ্টি বালকের দিকে বার বার নিবদ্ধ হইতে থাকে।

পণ্ডিত ও তাঁহার স্ত্রীর সেবা-যত্নের অবধি নাই। অতিথি পরম পরিতুষ্ট হইলেন, ভগবৎ কথা প্রসঙ্গে ও আনন্দে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইল।

পরের দিন প্রভাতে পণ্ডিতকে ডাকিয়া সন্ন্যাসী যাহা বলিলেন তাহাতে তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কহিলেন, "ছাখো বাবা, আমি নানা তীর্থ পর্য্যটনের জন্য বার হয়েছি, বয়স যথেষ্ট

হয়েছে, দেখাশুনো করবার মত সঙ্গে কেউ নেই। আমি ভাবছি কি, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবেরকে আমার সঙ্গে নেব। তোমাদের কোন ভয় নেই, পুত্রাধিক স্নেহে তাকে আমি রক্ষণাবেক্ষণ করবো, তীর্থ ও ধর্ম্ম উভয়ই তার লাভ হবে—কুল পবিত্র হবে। এতে তোমার সম্মতি চাই।"

হাড়াই পণ্ডিত নিস্তব্ধ নতশির। ভাবিয়া আকুল হইলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবের তাঁহাদের নয়নমণি, তাহাকে বিদায় দিতে গেলে যে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। আবার সম্মতি না দিয়াই বা উপায় কি? সন্ন্যাসীর ক্রোধে হয়তো ইহকাল পরকাল উভয়ই যাইবে। হাড়াই নিজে ভগবদ্ভক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মপরায়ণ। কিছুটা স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, মানুষ তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তিতে পুত্রের কতটুকু কল্যাণ সাধন করিতে পারে? তবে এ শক্তিধর সন্ন্যাসীর হাতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিই না কেন? এমন যে পরাক্রমশালী রাজচক্রবর্ত্তী দশরথ, তিনিও ঋষি বিশ্বামিত্রের হাতে প্রাণপ্রিয় পুত্র দুইটিকে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

চিন্তাকুল হৃদয়ে পণ্ডিতপ্রবর পত্নী পদ্মাবতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। এ বিষয়ে তাঁহার মতও যে নেওয়া চাই। সন্ন্যাসীর এ অনুরোধের কথা তাঁহাকে জানাইলেন।

পদ্মাবতীর মনে পড়িল কয়েকদিন আগেকার এক ঘটনা। বালক কুবের হঠাৎ সেদিন এক ভাবের ঘোরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তারপর শুশ্রূষার ফলে তাহার সংজ্ঞালাভ হয়। উৎকণ্ঠিতা মায়ের প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়, "মাগো, হঠাৎ কি জানি কেন আমার চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল। তারপর সে অবস্থায় আমি স্বপ্ন দেখলাম—এক দিব্যকান্তি মহাপুরুষের সঙ্গে আমি দূর-দূরান্তের তীর্থস্থানে বেড়াচ্ছি। তারপর যে সব দৃশ্য ভেসে এল তা মনে নেই।"

মায়ের মনে পুত্রের সেই কথারই স্মৃতি আজ আলোড়ন তুলিয়া দেয়। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার তাঁহার সীমা নাই। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে স্বামীকে শুধু কহিলেন, "ওগো, ধর্ম্মের দিকে চেয়ে যা তুমি স্থির করবে, তাতেই আমার মত।"

পণ্ডিত তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব এই পুত্রকে সন্ন্যাসীর করে অর্পণ করেন। সারা গ্রামে ঘনাইয়া আসে বিষাদের ছায়া। দ্বাদশ বৎসরের বালক কুবের দণ্ড-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেদিন ঘরের বাহির হইয়া পড়েন, আর সেখানে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। পর্য্যটন, পরিব্রাজন ও অবধূত জীবনের নানা পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া কুবের একদিন ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু একচাকায় নয়—নবদ্বীপে, প্রেমভক্তি প্রচারের এক প্রেরিত পুরুষরূপে। নাম তখন—নিত্যানন্দ অবধূত। শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তন নর্ত্তনে নদীয়া তখন টলমল, শক্তিধর নিত্যানন্দের আবির্ভাবে এই আনন্দের স্রোতে জোয়ার জাগিয়া উঠে। অদ্বৈত প্রভু ইঁহারই স্তুতি সেদিন গাহিয়া উঠেন :

তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি
তুমি সে চৈতন্যের বক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি।

হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে সন্ন্যাসী সেদিন বুঝিবা এক ঐশী ইঙ্গিতেই আসিয়া আবির্ভূত হন, বালক কুবেরের জীবনধারাটিকে অর্গলমুক্ত করিয়া দেন। দেশ-দেশান্তর অতিক্রম করিয়া চৈতন্য-প্রেমের সমুদ্রে আসিয়া একদিন তাহা ঝাঁপাইয়া পড়ে।

চতুর্দ্দশ শতকের কথা। একচাকা গ্রামে তখন এক সম্পন্ন ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেন। গৃহস্বামীর নাম সুন্দরমল্ল। বংশের উপাধি বাঁড়ুরী। লোকে ডাকিত ওঝা বলিয়া। যজনযাজন ও অধ্যাপনায় তাঁহার সংসার চলে, বিত্ত ও প্রতিপত্তি কোন কিছুরই তাহার অভাব নাই। কিন্তু পণ্ডিতের মনে বড় কষ্ট, সন্তান হইয়া প্রায়ই বাঁচে না। বহু পূজা আরাধনা ও শান্তি স্বস্ত্যয়নের পর এক পুত্র জন্মিল, উমা মহেশ্বরের চরণে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া নাম রাখিলেন, হাড়াই। পোষাকী নাম মুকুন্দ বাঁড়ুরী।

বিদ্যাবত্তা ও চরিত্রগুণে এ পুত্র ক্রমে খ্যাতিমান হইয়া উঠেন। বংশের তিনি একমাত্র পুত্র, বাপ-মা তাই আদর করিয়া অল্প বয়সে

তাঁহার বিবাহ দেন। সম্ভ্রান্ত বংশের সুলক্ষণা কন্যা পদ্মাবতীকে পুত্রবধূ রূপে তাঁহারা ঘরে আনেন। ইহার অল্পকাল পরেই সুন্দরমল্ল ও তাঁহার স্ত্রী লোকান্তরে চলিয়া যান।

হাড়াই পণ্ডিত নিজে শাস্ত্রবিদ্ ও ধর্ম্মপরায়ণ, পত্নীও বড় ভক্তি-মতী। ব্রত-পূজা, দান-ধ্যান ও অতিথি সৎকারে তাঁহাদের অত্যন্ত নিষ্ঠা। কিন্তু দীর্ঘদিন কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায় মনে তাঁহাদের সুখ নাই, শান্তি নাই। কিছুদিন পরে পদ্মাবতী রাত্রিতে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেন। তাঁহার নয়ন সমক্ষে যেন এক সুদীর্ঘ জ্যোতির্ম্ময় বর্ত্ম খুলিয়া গেল। জটাজুটধারী, আজানুলম্বিত-বাহু এক দিব্যপুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। প্রসন্নমধুর হাস্যে তিনি কহিলেন, "বৎসে, তোমার মনস্তাপের আর প্রয়োজন নেই। পাপী তাপী উদ্ধারের জন্য এক মহাশক্তিধর পুরুষ তোমার গর্ভে শীঘ্র জন্মগ্রহণ করবেন। তুমি দুশ্চিন্তা ক'রো না।" স্বপ্নবার্ত্তা কিন্তু সত্য হইয়া উঠে। ১৩৯৫ শকাব্দের মাঘ মাসে, শুক্লপক্ষে, ত্রয়োদশী তিথির এক শুভক্ষণে এক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এই শিশুই উত্তর কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের অন্যতম নায়ক, নিত্যানন্দ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তিন প্রভুর অন্যতম।

অনিন্দ্যসুন্দর শিশু। যে দেখে সেই তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া যায়। পিতামাতার আদরের নাম, কুবের। যথাকালে হাড়াই পণ্ডিত খুব ধুমধাম করিয়া পুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসব করিলেন। এ শিশু শুধু পিতামাতারই নয়, পাড়া-প্রতিবেশীরও যে আনন্দ-ধন। রূপে ভুবন-মোহন, মুখে আধ আধ মধুর বুলিতে ভুবন-মঙ্গল হরিনাম। সহচর-দের সঙ্গে শিশু খেলিতে যায়, মা পদ্মাবতী মোহন সাজে তাহাকে সাজাইয়া দেন, সে যেন তাঁহার এক মস্ত বড় কাজ। নিজের লালপেড়ে নীলাম্বরী শাড়ীটি কোঁচা দিয়া পরাইয়া দেন, কপালে আঁকেন শ্বেতচন্দনের ফোঁটা, চোখে মাখাইয়া দেন কালো কাজল। কুবের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়, যে একবার দেখে লাবণ্য ঢল-ঢল শিশুকে কোলে তুলিয়া বার বার আদর জানায়।

কুবের ক্রমে বড় হইয়া উঠিতে থাকে। সহচরদের সহিত যে খেলাধূলা সে করে তাহার ভঙ্গী বড় বিচিত্র। শাস্ত্র পুরাণের কথা ও কাহিনী শুনিতেই বেশী উৎসাহ। তাই আমোদপ্রমোদ ও ক্রীড়ায়ও তাহাই রূপায়িত হইয়া উঠে, কখনো রামলীলা কখনো কৃষ্ণলীলা তিনি সঙ্গীদের নিয়া অভিনয় করিয়া বেড়ান।

প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের সন্তান। শাস্ত্র বিশারদ না হইলে চলিবে কেন? মান-সম্মান ও অর্থোপার্জ্জন, সবই যে নির্ভর করে ইহার উপর। হাড়াই ওঝা পুত্র কুবেরকে তাই টোলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। মেধা ও প্রতিভার দিক্ দিয়া বালকের জুড়ি নাই, অল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণে তাঁহার ব্যুৎপত্তি হয়। বয়স যখন মাত্র বার বৎসর তখনই দুরূহ ন্যায়শাস্ত্রে কুবের পারঙ্গম হইয়া উঠে। পণ্ডিতেরা সস্নেহে তাঁহাকে ন্যায়চূড়ামণি উপাধি প্রদান করেন। অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে ইহারই উল্লেখ করিয়া লেখা হইয়াছে—"ন্যায় চূড়ামণি ইঁহার শাস্ত্রের আখ্যাতি, নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি।"

সবে মাত্র বার বৎসর বয়স। কিন্তু কুবেরের জীবনে যেন তখনই এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত হইতে চাহিতেছে। খেলাধূলা ও অধ্যয়নের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ কি জানি কেন সে গম্ভীর হইয়া বসে, পরিপার্শ্ব হইতে আপনাকে অবলীলায় বিচ্ছিন্ন করিয়া নেয়। গত জন্মের সাত্ত্বিক সংস্কার এবার জীবনের দোরগোড়ায় বার বার আঘাত করিয়া ফিরে। সংসারের কোন আকর্ষণই যেন আর তাহার নাই।

পুত্রের এ পরিবর্ত্তন দেখিয়া জনক-জননীর দুশ্চিন্তার অবধি নাই। এ কি অদ্ভুত ভাবান্তর ও উদাসীনতা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে? উভয়ে ভাবিতে বসেন—পুত্রকে কি তবে তাড়াতাড়ি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিবেন? তাহাতে কি সংসারের দিকে মন একটু ফিরিবে?

ঠিক এই সময়েই হাড়াই ওঝার গৃহে ঘটে সন্ন্যাসীর আকস্মিক আবির্ভাব। কুবেরের বিবাগী মনের শিথিল বোঁটায় এ যেন দমকা হাওয়ার একটা বড় আঘাত।

সন্ন্যাসীর সঙ্গীরূপে এবার তাঁহার পরিব্রাজন শুরু হয়। দূর-দূরান্তের অরণ্যে পর্ব্বতে, দুর্গম তীর্থস্থলগুলিতে দিনের পর দিন উভয়ে পরিক্রমা করিয়া বেড়ান পরিব্রাজক জীবনের কঠোরতায় কুবের ক্রমে অভ্যস্ত হইতে থাকেন। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও পবিত্রতার মধ্য দিয়া তাঁহার সাধনজীবনের ভিত্তিটি দৃঢ়তর হইয়া উঠে। বৎসরের পর বৎসর এরূপে অতিবাহিত হইয়া যায়। অবশেষে কুবের একদিন তাঁহার অভিভাবক-সন্ন্যাসীকে হারাইয়া ফেলেন। কিশোর সাধকের জীবনে শুরু হয় নিঃসঙ্গ পর্য্যটনের পালা।

কিছুদিন যাবৎ কুবেরের অন্তর দীক্ষা গ্রহণের জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় তাঁহার চিহ্নিত গুরু, কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে অধ্যাত্ম-জীবনের বীজটি তিনি রোপণ করিয়া দিবেন, আর জীবন তাঁহার ধন্য হইবে, এই চিন্তায় অন্তর দিনের পর দিন আলোড়িত হইতে থাকে।

নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে সেবার তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলেন। কৃষ্ণলীলার মুখ্যভূমিতে আসা মাত্র মনপ্রাণ কৃষ্ণাবেশে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। কুঞ্জগলির পথে পথে, জঙ্গলাকীর্ণ লীলাস্থলীর আনাচে-কানাচে, দিনরাত ঘুরিয়া বেড়ান। আর্ত্তিভরে খেদোক্তি করিতে থাকেন, জীবন-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণধন কোথায়? কে তাঁহাকে এ পরম সম্পদ মিলাইয়া দিবে? উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের মত সারা বৃন্দাবন তখন তিনি ঢুঁড়িয়া বেড়াইতেছেন।

সহসা একদিন নয়ন পথে পড়িল বহু শিষ্য পরিবৃত পরমভাবগত এক সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি। কৃষ্ণরসে তনুমন সদা রসায়িত। এই সন্ন্যাসী হইতেছেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী। শ্রীচৈতন্য-লীলার সহায়ক ঈশ্বরপুরী ও অদ্বৈত আচার্য্য ইঁহারই কৃপাপ্রাপ্ত।

মহাত্মার দর্শন মাত্রেই তরুণ সাধক কুবেরের সর্ব্ব অঙ্গে ভক্তি-রসের জোয়ার জাগিয়া উঠিল। ভাব-প্রমত্ত হইয়া কিছুক্ষণ মধ্যে তিনি সম্বিৎ হারাইলেন।

মাধবেন্দ্রপুরীর চোখে মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠে। কে এই বৈষ্ণব

যে সদা করে কৃষ্ণরসে অবগাহন? এই তরুণ বয়সে এমন কৃপাধন্য হইয়া উঠিয়াছে! সর্ব্বদেহে তাঁহার অষ্টসাত্বিক ভাববিকার, বদন-মণ্ডলে ফুটিয়া উঠিয়াছে অপরূপ জ্যোতির আভা। ভূতলে পতিত দেহটির দিকে মাধবেন্দ্র নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন।

দীর্ঘকাল পর তরুণ সম্বিৎ পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। নয়ন-জলে বক্ষ ভাসাইয়া কহিলেন, "প্রভু, বহু ভাগ্যবলে আজ আপনার দর্শন মিলেছে। কৃপা করে এ অভাজনকে উদ্ধার করুন, আশীর্ব্বাদ করুন, আমার যেন কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।"

মহাপ্রেমিক মাধবেন্দ্রপুরী দু'হাত প্রসারিয়া তাঁহাকে করেন আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

তারপর এক শুভলগ্নে কৃষ্ণমন্ত্রে এই নবীন সাধককে করিলেন দীক্ষিত। নামকরণ হইল, নিত্যানন্দ। উভয়ের নর্ত্তন কীর্ত্তনে বৃন্দাবনে আনন্দরস উথলিয়া উঠিল। প্রেমভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ মাধবেন্দ্রের পূতসান্নিধ্য লাভ করিয়া সেদিন নিত্যানন্দের আনন্দের আর সীমা নাই। গদ্‌গদস্বরে বার বার তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তকবি এই পুরীমহারাজের প্রেম-শক্তির প্রশস্তি গাহিয়া বলিয়াছেন—

মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর,
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর।
কৃষ্ণরস বিনে আর নাহিক আহার,
মাধবেন্দ্র পুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার।[১]

মাধবেন্দ্রের কৃপাদীক্ষা[২] এ সময়ে সাধক নিত্যানন্দের জীবনে

১ বৃন্দাবন দাস: চৈতন্য ভাগবত

২ ভক্তিরত্নাকর ও অন্যান্য গ্রন্থে মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্য্য লক্ষ্মীপতি কর্তৃক নিত্যানন্দকে দীক্ষা দানের কথা আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য-প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। মাধ্বদের দর্শন ও সাধন প্রণালীর সহিত কিন্তু শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাদৃশ্য নাই। (দ্রঃ: সাধক ৮ম খণ্ড, মধ্বাচার্য্য) কাজেই নিত্যানন্দের মাধ্ব-দীক্ষার কথা যুক্তিসঙ্গত নয়।

এক নূতন রসতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দেয়। কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করিয়া আবার তিনি পর্য্যটনে বাহির হন। এবার তিনি এক স্বেচ্ছাবিহারী অবধূত। ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া কখনো রঙ্গনাথে, রামেশ্বরে, কখনো বা নীলাচলে ও গঙ্গাসাগরে ঘুরিয়া বেড়ান। কৃষ্ণরসের ঐন্দ্রজালিক মাধবেন্দ্রপুরীর স্পর্শ তাঁহার সারা সত্তাকে আজ উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। যে দেব-দেউলেই তিনি যান, আকুল হইয়া কেবলই খুঁজিয়া বেড়ান, কোথায় প্রাণ-সর্ব্বস্ব শ্রীনন্দ-নন্দন, কবে তাঁহার দর্শন লাভে এ জীবন শীতল হইবে, সার্থক হইবে?

কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল নিত্যানন্দ কিন্তু আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। এবার নিরন্তর থাকেন ভাবসাগরে নিমজ্জিত। দিবারাত্র জ্ঞান নাই, আহার নিদ্রার প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে। প্রেম সাধনার গভীর স্তরে ধীরে ধীরে হইতেছেন প্রবিষ্ট।

একান্তে প্রচ্ছন্নভাবে বৃন্দাবনে তিনি দিন যাপন করিতেছেন। হঠাৎ এ সময়ে কৃষ্ণ একদিন স্বপ্নযোগে কহেন, "অবধূত, কেন আর বৃথা এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করা? গৌড়দেশে নবদ্বীপে যাও। প্রেমভক্তির সুধাভাণ্ড হাতে করে নিমাই পণ্ডিত সেখানে আচণ্ডালে পরম সম্পদ বিতরণ করছে, তাঁর কর্ম্মে তনুমনপ্রাণ ঢেলে দাও। ভাগবতধর্ম্ম, ভগবৎপ্রেম প্রচারের তুমি যে চিহ্নিত পুরুষ। তোমার ভেতর দিয়ে এ মহাব্রত উদ্‌যাপিত হয়ে উঠুক।"

ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দ তৎক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছেন। প্রেমভক্তির উৎস-সন্ধান এবার মিলিয়াছে। সোৎসাহে তাহারই উদ্দেশে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নিত্যানন্দ সেদিন নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রথমেই নন্দন আচার্য্যের সহিত তাঁহার দেখা। দেবদ্বিজ সন্ন্যাসীর উপর আচার্য্যের অগাধ ভক্তি, অপূর্ব্ব তাঁহার

বৈষ্ণবীয় নিষ্ঠা। নিত্যানন্দের দেবদুর্লভ কান্তি, আজানুলম্বিত বাহু ও আয়তনেত্র দেখিয়া তিনি মোহিত হন এবং সযত্নে নিজ গৃহে রাখিয়া দেন। নীরবে প্রচ্ছন্ন জীবনযাপনেই অতিথির অভিলাষ। তাই তাঁহার নির্দ্দেশে আচার্য্য কাহাকেও এ সংবাদ দেন নাই।

নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গের কাছে অজানা রহে নাই। কয়েকদিন হয় প্রভু কেবলই ভক্ত পার্ষদদের বলিতেছেন, "তোমরা সবাই দেখবে, শিগ্‌গীরই নবদ্বীপ ধামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে।"

ভক্তেরা জিজ্ঞাসু হইয়া এ উহার মুখের দিকে তাকায়। কে এই মহাপুরুষ? কি তাঁহার পরিচয়? কিছুই বুঝা যাইতেছে না।

কৌতুকী প্রভু এবার ব্যাপারটিকে আরও কিছুটা স্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। কহিলেন, "তোমরা এক আনন্দের সংবাদ শোনো। কাল রাতে চমৎকার এক স্বপ্ন আমি দেখলাম। মোহন বেশধারী, অনিন্দ্যসুন্দর এক অবধূত পুরুষ আমার সম্মুখে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বদনমণ্ডল থেকে জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। তিনি বললেন, আমি আর তিনি নাকি অভিন্নহৃদয়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানালেন, আজই তিনি আমাদের দর্শন দান করবেন।"

মহাপুরুষের এ প্রসঙ্গটি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুর একি বিচিত্র রূপান্তর! ভাবাবিষ্ট হইয়া বারংবার তিনি হুঙ্কার ছাড়িতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কহেন, "ত্থাখো, তোমরা শিগ্‌গীর নবদ্বীপ ধামের চারিদিকে সন্ধান নাও। সেই মহাপুরুষকে অবিলম্বে বার করতে হবে। তাঁকে দেখবার জন্য আমার মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।"

ভক্তেরা ত্রস্তব্যস্ত হইয়া বাহির হন। কিন্তু বহু খোঁজখবর করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

গৌরাঙ্গ এবার নিজেই পার্ষদগণ-সহ নগরে বাহির হইলেন। স্বপ্নে দৃষ্ট মহাপুরুষকে দর্শন না করিয়া তাঁহার স্বস্তি নাই। নয়নে প্রেমাশ্রুর ধারা, সারা দেহখানি পুলকাঞ্চিত—প্রভু যন্ত্রচালিতবৎ

নবদ্বীপের রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে জুটিয়াছে বহুতর ভক্ত। নন্দন আচার্য্যের গৃহের সম্মুখে আসিবামাত্র প্রভু থামিয়া পড়িলেন। তারপর ঢুকিয়া পড়িলেন অঙ্গনে। সম্মুখে তাঁহার দণ্ডায়মান শুভ্র-কান্ত প্রেমিক পুরুষ—নিত্যানন্দ। দর্শনমাত্র প্রভু তাঁহাকে স্বগণসহ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন।

একি মহা বিস্ময়! যে পরম বস্তুর জন্য তীর্থে তীর্থে অরণ্যে পর্ব্বতে নিত্যানন্দ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়াছেন, আজ তাহা নিজে যাচিয়া আসিয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত। শুধু তাহাই নয়, প্রভু সাগ্রহে এতদিন নিত্যানন্দেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। এবার তাঁহার নিভৃতির আড়াল ঘুচাইয়া দিয়া এক মুহূর্ত্তে তাঁহাকে করিলেন আত্মসাৎ।

আনন্দাবেশে নিত্যানন্দ অধীর। অপার ঔৎসুক্যে প্রভুর ভুবন-ভুলানো রূপ দেখিতেছেন। এ রূপ দেখিয়া তাঁহার নয়ন যেন আর ফিরিতে চাহে না। বৃন্দাবন দাস এ অপরূপ রূপমাধুর্য্যের ভাণ্ডটি উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন—

বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যেন
মদন সমান।
দিব্য গন্ধ মাল্য
দিব্য বাস পরিধান॥
কি হয় কনক দ্যুতি
সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে
চাঁদের সাধ লাগে॥
দেখিতে আয়ত দুই
অরুণ নয়ন।
আর কি কমল আছে
হেন হয় জ্ঞান॥

সে আজানু দুই ভুজ
হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে যজ্ঞসূত্র
অতি সূক্ষ্ম ক্ষীণ॥

গৌরসুন্দরের পদ্মপলাশ নেত্রের দিকে চাহিয়া নিত্যানন্দ ভাবের গভীরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছেন। নির্নিমেষ নয়নে, ঋজু দেহে, তিনি একেবারে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান। প্রভু এবার ভক্তপ্রবর শ্রীবাসকে সোৎসাহে কহিলেন, "পণ্ডিত, দিব্য প্রেমাবেশ যদি দেখতে চাও, তবে নিত্যানন্দের উদ্দীপনা জাগিয়ে তোল, শিগ্‌গীর ভাগবত থেকে শ্রীনন্দনন্দনের রূপ বর্ণনা কর।"

প্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র শ্রীবাসও শ্লোক পড়িতে লাগিলেন পরম আনন্দে। —বর্হাপীড়ম্ নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্…। শ্যামসুন্দরের রূপমাধুর্য্যের বর্ণনায় নিত্যানন্দের আনন্দতরঙ্গ চাকতে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। সর্ব্বশরীরে আত্মপ্রকাশ করে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি প্রেমবিকারের চিহ্ন।

কিছুটা বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্তির পর তাঁহার নর্ত্তন কীর্ত্তন শুরু হয়, হুঙ্কার ধ্বনিতে নন্দন আচার্য্যের গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে। এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া ভক্তদের হৃদয় হয় আনন্দে উদ্বেলিত।

নিত্যানন্দ ক্রমে শান্ত হন। এবার শুরু হয় পরস্পরের কুশল-প্রশ্ন ও প্রশস্তির পালা।

পুলকাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে নিত্যানন্দ কহিলেন, "প্রভু, এত তীর্থ, এত জনপদ আমি ঘুরেছি আর তোমার সন্ধান করেছি, কোথায়ও তোমায় পাই নি। অবশেষে জানলাম, তুমি নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছো, জীবের উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করেছো। তাই তো দর্শনের আশায় এখানে ছুটে এলাম।"

প্রভুও হটিবার পাত্র নহেন। সমাগত ভক্তদের সম্মুখে নিত্যানন্দের মর্য্যাদা বাড়াইয়া কহিলেন—

মহাভাগ্য দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন॥ (চৈঃ ভাঃ)

প্রেমাবেশে বিহ্বল দুই প্রভু অতঃপর পুলকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন। এখন হইতে নিত্যানন্দ হইলেন গৌরাঙ্গের প্রধান পার্ষদ, নবদ্বীপে প্রেমভক্তি আন্দোলনের অন্যতম নিয়ন্তা। বৈষ্ণব ভক্তেরা তাঁহাদের প্রাণসর্ব্বস্ব গৌর-নিতাইকে দেখিয়াছেন এক সম্মিলিত ভাবঘন বিগ্রহরূপে। বৈষ্ণব তাই কবিও প্রেমভরে গাহিয়াছেন—

দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।

পরের দিন ব্যাসপূজা হইবে। স্থির হইল, শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনেই নিত্যানন্দ এ পূজার অনুষ্ঠান করিবেন। সন্ধ্যার পরই গৌরাঙ্গ শ্রীবাস অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদিনই ভক্তগণ-সহ এখানে তিনি কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হন। আজ যেন তাঁহার উৎসাহ শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। দুয়ারে কপাট লাগাইয়া দেওয়া হয়। গৌর-নিতাইকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হয় বৈষ্ণব ভক্তদের উদ্দণ্ড কীর্ত্তন।

আজ গৌরাঙ্গের যেন উদ্দীপনার সীমা নাই। প্রেমাবেশে দেহ থর থর কাঁপিতেছে। মুখে উচ্চারিত হইতেছে সঘন হুঙ্কার। উদ্দাম নৃত্যেরও যেন আর বিরাম নাই। দিব্য লাবণ্যময় বিশাল দেহটি ভূমিতে বার বার আছাড়িয়া পড়ে—ভক্তেরা হাহাকার করিয়া উঠেন। অশ্রু কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারের প্রকাশ দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। যে কথা এতকাল লোকে শুধু শুনিয়াছে, ভক্তিশাস্ত্রে পড়িয়াছে, শ্রীবাস অঙ্গনে আজ তাহারই অপূর্ব্ব রূপায়ণ। নৃত্য শেষে ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দকে শান্ত করিয়া গৌরাঙ্গ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাত্রিযোগে নিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরেই রাহিয়া গিয়াছেন। গৌরাঙ্গের অদ্ভুত নৃত্যলীলা, ভক্তদের এই কীর্ত্তন ও জয়ধ্বনি—আজ

তাঁহাকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। হৃদয়ের প্রেম যেন উৎসটি যেন শতধারে আজ উৎসারিত, বিশ্বের সমস্ত কিছু প্লাবিত না করিয়া উহা নিরস্ত হইবে না।

প্রেমাবিষ্ট নিত্যানন্দ রাত্রিতে এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসেন। সন্ন্যাসী জীবনের পরম ধন—দণ্ড ও কমণ্ডলু দুইটি অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। অরণ্য প্রান্তরে, তীর্থে তীর্থে কম কঠোর জীবন এযাবৎ তিনি যাপন করেন নাই। চিরবাঞ্ছিত নিধি আজ বহুদিন পরে মিলিয়াছে। এবার তাঁহার নূতন জীবনের পালা। প্রেমের ঠাকুরের পাশে দাঁড়াইয়া প্রেমভক্তির প্রচারে তাঁহাকে ব্রতী হইতে হইবে। তাই তো দণ্ড কমণ্ডলুর বোঝা তিনি এমন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত সবিস্ময়ে দেখেন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ভাবাবেশে সম্বিৎহারা, সন্ন্যাস-দণ্ড ও কমণ্ডলুটি ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেছে।

সংবাদ পাইয়া গৌরাঙ্গ দ্রুতপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলেন, নিত্যানন্দ অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন, সুস্মিত আনন হইতে দিব্য আনন্দের জ্যোতি ঝরিয়া পড়িতেছে। সস্নেহে শ্রীপাদের হস্তটি ধারণ করিয়া প্রভু তাঁহাকে স্নানের ঘাটে আনয়ন করিলেন। ভগ্ন দণ্ড কমণ্ডলু তখনই গঙ্গায় বিসর্জ্জিত হইল। অবধূত নিত্যানন্দ হইলেন মহাপ্রেমিক নিত্যানন্দ—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রধান পার্ষদ।

ভাবরাজ্যের মানুষ, আনন্দ চঞ্চল নিত্যানন্দকে নিয়া ভক্তদের বিপদ বড় কম নয়। গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছেন, শিশুর মত শুরু করিলেন জলকেলি, আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। অথচ এদিকে ব্যাসপূজার সময় প্রায় হইয়া গিয়াছে।

গৌরাঙ্গ কোনমতে তাঁহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া পণ্ডিতের গৃহে নিয়া আসিলেন। সেখানে ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন করা হইয়াছে। অঙ্গন মধ্যে প্রভু ভক্তগণ-সহ কীর্ত্তনানন্দে বিভোর, আর

ঘরের ভিতরে নিত্যানন্দ ব্যাসপূজার আসনে বসিয়া গিয়াছেন। পূজা শেষে মালা অর্পণ করিয়া প্রণাম নিবেদন করিতে হইবে, কিন্তু নিত্যানন্দের সেদিকে কোন হুঁসই নাই। আবেশ-বিহ্বল হৃদয়ে মালাখানি হাতে নিয়া তিনি বসিয়া আছেন।

শ্রীবাস বার বার ব্যগ্রভাবে কহিতেছেন, "শ্রীপাদ, ব্যাসদেবের উদ্দেশে মাল্য অর্ঘ্য দিয়ে আপনি পূজা এবার সাঙ্গ করুন।"

তাঁহার একটি কথাও কিন্তু নিত্যানন্দের কানে পৌঁছে নাই। ভাবাবিষ্ট তিনি। এদিক ওদিক তাকাইয়া কেবলই কাহাকে যেন খুঁজিতে চাহিতেছেন।

উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত তখন গৌরাঙ্গকে ডাকিয়া আনিলেন। কহিলেন, "প্রভু, ছাখো তোমার নিত্যানন্দ পূজা সমাপ্ত করতে দিচ্ছেন না। এবার মাল্য অর্ঘ্য দেবার কথা, কিন্তু তা তাঁর হাতেই রয়ে গিয়েছে। তুমি এসে যা করবার হয় কর।"

প্রভুকে নৃত্যগীত থামাইতে হইল, তাড়াতাড়ি পূজার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। বেদীর সম্মুখে গিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, একি করছো তুমি? মালাগাছ হাতে তুলে নিয়ে এমন চুপচাপ বসে কেন? এবার ব্যাসদেবের উদ্দেশে ভক্তিভরে অর্ঘ্য দাও।"

ভাববিভোর হইয়া আছেন অবধূত নিত্যানন্দ, চোখে মুখে এক অপূর্ব্ব আনন্দের দ্যুতি খেলিয়া গেল। বহুবাঞ্ছিত প্রভু তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, হাতের এ মালা তাঁহার গলায় না পরাইয়া আর কাহার উদ্দেশে নিবেদন করিবেন? পরমানন্দে তিনি গৌরসুন্দরের গলায় পুষ্পমালাটি পরাইয়া দিলেন। সমবেত ভক্ত কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে সে অঞ্চল মুখরিত হইয়া উঠিল।

মাল্যপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই নিতাই আনন্দ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া যান। প্রভুর সে প্রেমমধুর নয়নাভিরাম রূপের বদলে একি অলৌকিক ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তি! এ ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর বিভূতিলীলা সংবরণ করিয়া গৌরাঙ্গ তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন,—

যে কীর্ত্তন নিমিত্ত করিলা
অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল
কিবা চাহ আর ॥
তোমার সে প্রেমভক্তি
তুমি প্রেমময়।
বিনে তুমি দিলে কারো
ভক্তি নাহি হয় ॥
আপনা সংবরি উঠ,
নিজ জন চাহ ॥
যাহারে তোমার ইচ্ছা
তাহারে বিলাহ ॥

প্রভু গৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্ম প্রচারের প্রধান ও চিহ্নিত পরিকর উপস্থিত ! এবার তিনি স্বেচ্ছামত নাম-প্রেমধন বিলাইয়া ফিরিবেন।

করজোড়ে ভক্তি গদ্‌গদকণ্ঠে অবধূত নিত্যানন্দ সর্ব্বসমক্ষে গৌরাঙ্গের স্তবগান করিতে লাগিলেন।

এমনিতেই নিত্যানন্দ এক মহাপ্রেমিক পুরুষ—তদুপরি অন্তরে লাগিয়াছে প্রেমাবতার গৌরাঙ্গের দিব্যস্পর্শ। দিব্য ভাবের প্রবাহ তাই উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে নিত্য নূতন লীলাছন্দে নিত্যানন্দকে নাচাইয়া তুলিতেছে। এ প্রমত্ত অবস্থায় তাঁহাকে স্থির করিয়া রাখিবে কে? চৈতন্য ভাগবতের ভাষায়, এখন তিনি—

অহর্নিশ ভাবাবশে
পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নদীয়ায় বুলে
জ্যোতির্ম্ময় ধাম ॥

সেদিন অপরাহ্ণে নিমাই স্বগৃহে বিশ্রাম করিতেছেন। এমন

সময় অবধূত নিত্যানন্দ একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত। প্রেমাবেশে তিনি তখন মাতোয়ারা, দুই চোখে দরদর ধারে পুলকাশ্রু নির্গত হইতেছে। কখনো অট্টহাসি হাসিতেছেন, কখনো বা পরম উল্লাসভরে প্রভুর অঙ্গনে নৃত্য করিতেছেন। নৃত্যপরায়ণ এই দিগম্বর পুরুষকে দেখিয়া বাড়ীর মেয়েরা লজ্জায় পলায়ন করিল। নিমাই বিশ্রামরত ছিলেন, দ্রুতপদে শয়নমন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রেমোম্মাদ নিত্যানন্দকে শান্ত করিতে তাঁহার বেশী সময় লাগিল না। নিজের মস্তকের আচ্ছাদন-বস্ত্রটি তাঁহার কোমরে সযত্নে জড়াইয়া দিলেন, স্বহস্তে তাঁহাকে চন্দন চর্চ্চিত করিলেন, গলে দিলেন গন্ধপুষ্পের একগাছি মালা। অতঃপর শুরু করিলেন অবধূতের অপূর্ব্ব স্তুতি—

নামে নিত্যানন্দ তুমি
রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ
রাম মূর্ত্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ—পর্য্যটন
ভোজন ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু
নাহিক তোমার॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি
মনুষ্যের কোথা?
পরম সুসত্য—তুমি
যথা কৃষ্ণ তথা॥

প্রভু শুধু এখানেই থামিলেন না। ভিক্ষা মাগিলেন, "শ্রীপাদ, আমার বড় অভিলাষ—তোমার একটি কৌপীন কৃপা ক'রে আমায় দান কর।"

নিত্যানন্দের কৌপীনটি আনানো হইল। গৌরাঙ্গ এটি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ভক্তেরা আগ্রহ-ব্যাকুল হইয়া

প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছেন। এবার তিনি সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা সবাই এ পবিত্র বস্ত্রখণ্ড শিরে ধারণ কর। নিত্যানন্দ কৃষ্ণরসময়—তাঁর কৃপায় তোমাদের প্রকৃত কৃষ্ণভক্তির উদয় হবে।"

প্রভুর নির্দ্দেশে ভক্তেরা সোল্লাসে কাড়াকাড়ি করিয়া নিত্যানন্দের পাদোদক পান করিলেন। অবধূত কিন্তু পূর্ব্ববৎ প্রেমাবিষ্ট ও মৌনী হইয়াই আছেন, আর স্মিত হাসি হাসিতেছেন।

নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সেদিন নিত্যানন্দের মহিমার তত্ত্বটি এমনিভাবে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছিলেন। ভক্তদের বুঝিতে বাকি রহিল না—অবধূত নিত্যানন্দ শুধু প্রভুর প্রধান পার্ষদই নহেন, অভিন্নহৃদয় সখা এবং প্রধান সহকর্ম্মীও বটেন।

গৌরাঙ্গ প্রেমধর্ম্ম ও নামকীর্ত্তন যজ্ঞের প্রবর্ত্তক। জীব উদ্ধারের ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। নিবেদিত-প্রাণ ভক্তদলও চারিপাশে কম জুটে নাই। কিন্তু তাঁহার প্রেমধর্ম্ম-বাহিনীর প্রস্তুতি এতদিন সম্পূর্ণ হয় নাই—অভাব ছিল অভিযাত্রা পথে তাঁহার প্রধান এই সহকারীর। অবধূত নিত্যানন্দের আবির্ভাবে সে অভাব আজ দূর হইয়াছে। এবার যাত্রা শুরুর পালা।

নবদ্বীপের পথে পথে নিতাই এবার প্রবল উৎসাহে নাম প্রচার শুরু করিয়াছেন। নগরের লোকে বলাবলি করিতে থাকে—একে নিমাই পণ্ডিত ও তাঁহার সঙ্গীদের কীর্ত্তন-নর্ত্তনে লোকের রক্ষা নাই, তারপর এই দিব্যকান্তি, শক্তিধর তরুণ সাধক কোথা হইতে আসিয়া জুটিল? প্রেমঘনমূর্ত্তি কে এই অবধূত?

নিত্যানন্দ এখন হইতে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই বাস করেন। সর্ব্ববন্ধনমুক্ত আনন্দময় মহাপুরুষ—সদাই যেন বালকবৎ ভাব। বালচাপল্য আর আনন্দরঙ্গে সদা উচ্ছল হইয়া ফিরেন। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী দেবীকে নিতাই মা বলিয়া ডাকেন। এই বত্রিশ বৎসরের বালককে লইয়া মালিনী দেবীরও ঝঞ্ঝাটের সীমা নাই।

চাঞ্চল্য ও আবদারের নানা অত্যাচার তাঁহাকে সহিতে হয়। নিতাই নিজের হাত দিয়া কিছু খান না—মালিনী দেবীকেই তাই তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। ভক্তিনিষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিতের দৃষ্টিতে নিতাই যে পরম দুর্লভ ধন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন। তাছাড়া প্রভুর মুখে নিত্যানন্দের স্বরূপ মাহাত্ম্য তিনি শুনিয়াছেন। এ গৃহে এই মহাপুরুষ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, এ যে তাঁহার পরম সৌভাগ্য।

প্রভু একদিন কৌতুক করিয়া শ্রীবাসকে কহিলেন, "পণ্ডিত, তুমি এসব কি করছো বলতো? অজ্ঞাত-কুলশীল এ অবধূতকে তুমি ঘরে রেখেছ কেন? এর কি জাত কুল কিছুর ঠিক আছে? শিগ্‌গীর ভালোয় ভালোয় একে বিদেয় কর।"

এ যে প্রভুর এক পরীক্ষা তাহা বুঝিতে শ্রীবাসের দেরী হয় নাই। হাসিয়া কহেন, "প্রভু, তোমার ছলনা বুঝতে আমার বাকী নেই। যে তোমায় একদিনের তরেও ভালোবাসে, ভক্তি করে, সে হয় আমার প্রাণতুল্য। আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যে তোমারই অভিন্ন-স্বরূপ, তিনি যে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। আমাকে আর এসব পরীক্ষায় ফেলা কেন প্রভু?"

নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য শ্রীবাস কিছুটা বুঝিয়াছেন, একথা জানিয়া প্রভুর সেদিন আনন্দের সীমা রহিল না। স্মিত হাস্যে বর প্রদান করিলেন, "শ্রীবাস, আমি আজ তোমার প্রতি বড় প্রসন্ন হয়েছি। আমি বলছি, তোমার গৃহে দারিদ্র্য কখনো থাকবে না, আর তোমার স্বজনদের থাকবে আমার উপর অচলা ভক্তি!"

শচীমাতার কাছেও নিতাই এক অমূল্য নিধি। গৌরাঙ্গ নিজে নিতাইকে পরিচিত করিয়া দিয়া বলেন, "মা, এই তোমার হারানো ছেলে বিশ্বরূপ।" বহুদিনের চাপা দীর্ঘশ্বাস মায়ের বুক হইতে নিঃসারিত হয়, অশ্রুসজল চোখে নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁ বাবা, সত্যিই কি তুই আমার বিশ্বরূপ?"

বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিয়া নিতাই বলেন, "হ্যাঁ মা, আমিই যে তোমার সন্তান।"

নিমাই আর নিতাই—এ দুটিকে নিয়া শচীর আনন্দ ও গর্ব্বের সীমা নাই। নিতাই নূতন আসিয়াছেন বটে, কিন্তু দুইদিনেই তাঁহার পরম প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

গৌরাঙ্গ পরিকরদের সংখ্যা তখন কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে, ভক্ত সমাজের বিস্তৃতি ঘটিতেছে। প্রভু এবার নিতাই ও হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, "আজ থেকে তোমরা দু'জন জীব উদ্ধারের কাজে আমার সহায় হও। পাপ, অনাচার আর শুষ্ক ধর্ম্মাচরণে দেশ ছেয়ে গেছে। সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তোমরা কৃষ্ণনাম বিলাও। এ কাজ তোমরা ছাড়া আর কে করবে, বল? পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু সবাইর কাছে এই ভুবনমঙ্গল নাম তোমরা পৌঁছে দাও।"

প্রভুর নির্দ্দেশ পাইয়া নিত্যানন্দ মহাখুসী, ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ব্রতরূপে এ কাজকে তিনি গ্রহণ করিলেন। নবদ্বীপের পথে পথে ঘরে ঘরে সকলকে সাধিয়া বিলাইতে লাগিলেন হরিনাম। তাঁহার প্রধান সহায়ক হইলেন নামাচার্য্য যবন হরিদাস।

দুই জনেরই পরনে সন্ন্যাসীর বেশ। দেহ দীর্ঘায়ত, দিব্য লাবণ্যে ভরা রূপ প্রাণমন কাড়িয়া নেয়। উদাত্ত কণ্ঠের নাম শুনিয়া ভক্তজনেরা ধন্য হয়।

অধার্ম্মিক ও বৈষ্ণব-দ্বেষীর সংখ্যা তখন নদীয়ায় প্রচুর। নাম প্রচারক এই সন্ন্যাসীদুটিকে দেখিয়া কেহ অবজ্ঞা দেখায়, কেহ বা টিট্‌কারী দেয়, কেহ বা মারমুখী হইয়া তাড়াইতে আসে। পরম ভাগবত নিত্যানন্দের তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া নগরময় ঘুরিয়া বেড়ান, সাধিয়া সাধিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলকে বলেন, "ভাই কৃপা করে একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কর, আমায় বিনামূল্যে কিনে নাও।"

জগন্নাথ ও মাধব নবদ্বীপের দুই প্রতাপশালী ব্যক্তি, নগরের শান্তিরক্ষার ভার রহিয়াছে ইহাদের উপর। অর্থ ও সামর্থ্যের যেমন

অভাব নাই, পাপাচার ও অত্যাচারেও তেমনি ইহাদের জুড়ি মেলানো ভার। দুই ভাই মদের নেশায় সর্ব্বদা চুর হইয়া থাকে, ভক্ত বৈষ্ণব দেখিলে উপহাস করে, অসম্মান অত্যাচার করিতেও কিছুমাত্র তাহাদের বাধে না। সমস্ত নদীয়া এই দু'জনের ভয়ে সন্ত্রস্ত।

নিতাই ও হরিদাস ইহাদের নানা কুকীর্ত্তির কথাই শুনিতে পান। দূর হইতে দুই মাতালের হুড়াহুড়িও মাঝে মাঝে তাহাদের চোখে পড়ে।

নিতাই ভাবিতে থাকেন, পাতকী উদ্ধারের জন্য গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। কিন্তু কৃপার যোগ্য এমন পাতকী প্রভু আর কোথায় পাইবেন? তাঁহার কোন শক্তি বিভূতির লীলা না দেখিয়া তো লোকে এমনিতেই উপহাস করে। জগাই মাধাইর পরিবর্ত্তন সাধন যদি করা যায়, তবে তো সকলে প্রভুর প্রভুত্ব বুঝিবে, তাঁহার জয় গাহিবে।

নিতাই সেদিন পরম ভাগবত হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভাই হরিদাস, এ দুই পাতকীর দুর্গতি তো দেখতেই পাচ্ছো। হরিনাম করার অপরাধে, মুসলমান কাজীর আদেশে, তোমার উপর কি দুঃসহ অত্যাচারই না হয়েছিল, কিন্তু তুমি তো তাদের জন্য সেদিন শুভ ইচ্ছাই জানিয়েছিলে। এবার তুমি মনে মনে একবার জগাই মাধাইর উদ্ধারের সঙ্কল্প কর, অচিরে প্রভু এদের কৃপা করবেন। তাতে দেশবাসী বুঝতে পারবে প্রভুর মাহাত্ম্য ও প্রভাব।"

হরিদাস হাসিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, একথা তোমার মুখে সাজে না। তোমার ইচ্ছা যে প্রভুরই ইচ্ছা, একথা যে আমার অবিদিত নয়। তুমি যখন একবার ভেবেছ—জগাই মাধাই উদ্ধার হলে ভাল হয়, তবে প্রভুর কৃপা থেকে তাদের আর বঞ্চিত করে কে?"

উভয়ে মিলিয়া সেদিন জগাই মাধাইর বাসগৃহের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উদাত্ত স্বরে হরিনাম কীর্ত্তন শুরু হইল। কাণ্ড দেখিয়া সকলের তো চক্ষুস্থির। এ দুই সন্ন্যাসী কি পাগল, না—মরিতে বাসনা হইয়াছে ইহাদের? কোন হিংসার কাজ, ঘৃণিত কাজ করিতে

এ দুরাত্মাদের বাধে না। কেহ কেহ সম্মুখে আসিয়া সতর্ক করিয়াও দিল—"কেন ভাই সাধ করে এ দুর্বৃত্তদের ক্ষেপিয়ে তুলছো? তোমাদের কি প্রাণের মায়া নেই?"

হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া নিত্যানন্দ অগ্রসর হইয়া চলেন। সম্মুখে মূর্ত্তিমান যমদূতের মত জগাই মাধাই দণ্ডায়মান। মদের ঘোরে চক্ষু আরক্তিম, হস্তে যষ্ঠি। উত্তেজিত হইয়া কৃষ্ণনামরত দুই সন্ন্যাসীর দিকে দু'জনে ধাইয়া আসিল। কৌতুকী নিত্যানন্দের রঙ্গ বুঝিয়া উঠা ভার। বৃদ্ধ হরিদাসকে টানিয়া নিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে তিনি সেখান হইতে পলায়ন করিলেন।

রাজপথে তৎক্ষণে চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী দুইটি কোনমতে প্রাণ বাঁচাইয়া ফিরিতে পারিয়াছে—একদল লোক ইহাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বিদ্রূপ করিবার লোকেরও অভাব নাই, তাহারা বলিতে থাকে, "এ পাপিষ্ঠ দুটোকে এমন করে ঘাঁটিয়ে কি লাভ বাপু, এদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে আবার এমন পালিয়ে যাওয়াই বা কেন?"

লীলাময় নিত্যানন্দের আসল স্বরূপ তাঁহার সহকারী হরিদাসের অজানা নয়। এবার কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত সয়েছি, জলে ডুবেও আবার ভেসে উঠেছি। এতদিন এতো অত্যাচার সহ্য করেও প্রাণটা কোন মতে ছিল। কিন্তু আজ দেখছি চঞ্চল অবধূতের সঙ্গী হয়ে তাও শেষে খোয়াতে হবে!"

কৌতুকী নিত্যানন্দ জগাই-মাধাই উদ্ধার লীলার ভূমিকাটি রচনা করিতেছেন। এ লীলায় গৌরাঙ্গের আবির্ভাব চাই, করুণা চাই। নইলে তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় লোকে কি করিয়া পাইবে? তাঁহার প্রভুত্বই বা জনসমাজে কি করিয়া হইবে প্রতিষ্ঠিত? প্রভুর কানে এ দুই দুরাত্মার অত্যাচারের কথা তিনি প্রথমে পৌঁছাইয়া দিতে চান। তারপর এক বড় সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে এই পাতকীতারণ লীলায় অবতরণ করাইতে চান।

আপন মনোভাব নিতাই গোপন রাখিলেন, হরিদাসের ঐ প্রণয়-কোন্দলের জের টানিয়া কহিলেন, "আমার চঞ্চলতার দোষ ধরলে কি হবে! একবার তোমার প্রভুর কথাটাও ভেবে দেখ। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে ধরেছেন তিনি রাজসিক বৃত্তি। পরিকরদের ওপর আদেশ জারি করেছেন—ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম বিতরণ করে বেড়াতে হবে। তাঁর এ আজ্ঞা পালন না করলে চলবে না, আবার দুরাত্মাদের কাছে গিয়েও আমাদের প্রাণ হবে বিপন্ন। হরিদাস, তাই বলছি, আমার দোষ না ধরে, তোমার প্রভুর কাণ্ডটাও একবার দেখে নাও।"

ভক্তজনসহ গৌরাঙ্গ সেদিন ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস দুই ভগ্নদূতের মত সেখানে আসিয়া উপস্থিত। নিত্যানন্দ জগাই-মাধাইর নানা দুষ্কর্মের কথা, আজ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবনের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। তারপর কহিলেন, "প্রভু, তুমি নবদ্বীপের এই দুই মহাপাতকীকে আগে কৃষ্ণনাম নেয়াও, তবে তো লোকে তোমার মাহাত্ম্য বুঝবে। যে ধার্ম্মিক সে তো তার আপন স্বভাবেই নাম কীর্ত্তন করতে এগিয়ে আসছে। চরম পাপী যে, তাকে ভক্তি পথে নিয়ে এসো, তবে তো তোমার পাতকীপাবন নাম সার্থক হবে।"

প্রেমাবতার নিত্যানন্দের এই অনুরোধ এড়ানোর উপায় নাই। প্রভুকে জগাই-মাধাই উদ্ধারের জন্য কথা দিতে হইল :

হাসি বোলে বিশ্বম্ভর—
হইল উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন
পাইল তোমার॥
বিশেষে চিন্তহ
তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তার
করিবে কুশল॥

প্রেম-ভিখারী নিত্যানন্দ নদীয়ার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান, সাধু-অসাধু, ভক্ত-অভক্ত সবাইর দুয়ারে গিয়া যাচিয়া যাচিয়া নাম-প্রেম দান করেন। সেদিন কীর্ত্তন-টহল হইতে ফিরিতেছেন। সঙ্গে রহিয়াছেন সহকারী হরিদাস। দুজনেই দেখিলেন, অদূরে পানোন্মত্ত দুই ভাই জগাই মাধাই ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ ইহাদের উদ্ধারে নিতাই কৃতসঙ্কল্প। দুই বাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া তিনি উচ্চ স্বরে নামকীর্ত্তন শুরু করিলেন।

দুই পাপী প্রচণ্ড ক্রোধে ও উত্তেজনায় লাফাইয়া উঠে। এই তো নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গী সেই অবধূত—দিন নাই রাত নাই তারস্বরে হরিনাম গাহিয়া লোকের শান্তি ভঙ্গ করে। জগাই-মাধাই হরি-নামের বিরোধী, একথা সে ভালভাবেই জানে, তবুও তাহার ভয়-ডর নাই! এত বড় স্পর্দ্ধা তো নবদ্বীপের কাহারও নাই। মাধাই ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়, নিতাইর মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারে এক ভাঙ্গা কলসী।

আঘাতের ফলে নিতাইর মস্তক হইতে দরদর ধারে রক্ত ঝরিতেছে। এক হাতে তিনি আহত স্থানটি চাপিয়া ধরিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে গাহিতেছেন কৃষ্ণনাম। পথচারীর দল করুণ নেত্রে এ অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে যাইবে, এমন দুঃসাহস কাহার? দুর্ব্বৃত্তদের কোপে একবার পড়িলে যে আর নিস্তার নাই। মাধাইর এ হঠকারিতায় জগাই কিন্তু বড় চঞ্চল হইয়া পড়ে। তাই তো, এ সন্ন্যাসী তো তেমন কিছু অপরাধ করে নাই। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের দু'ভাইর তেমন কি ক্ষতি সে করিয়াছে? মাধাই এতটা নির্ম্মম না হইলেই পারিত। নিতাইর বুক বাহিয়া রক্ত ঝরিতেছে, কিন্তু দেহে মনে কোন বিকার, কোন বৈলক্ষণ্যই যেন নাই। দিব্যকান্তি পুরুষের দুই চোখে অতলস্পর্শী করুণার মহিমা! কি যেন এক অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি এই প্রেমিক সন্ন্যাসীর রহিয়াছে, জগাই তাহার অমোঘ আকর্ষণে সেই মুহূর্ত্তে বাঁধা পড়িয়া যায়।

উত্তেজিত মাধাই আবার নিতাইকে আঘাত করিতে যাইবে এমন সময় জগাই তাহাকে ধরিয়া ফেলে। দৃঢ়স্বরে কহে, "ওরে, কেন শুধু শুধু এই বিদেশী সন্ন্যাসীকে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারছিস্? এবার থাম্ তো।" মাধাইকে নিরস্ত হইতে হইল, নিত্যানন্দ একটা প্রাণঘাতী আঘাতের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন।

ইতিমধ্যে গৌরাঙ্গের নিকট এ চাঞ্চল্যকর সংবাদ পৌঁছে—নিত্যানন্দ আহত হইয়াছেন, মাধাইর নিষ্ঠুর আঘাতে তাঁহার মস্তক হইতে হইতেছে রক্তপাত। স্বগণসহ তখনি তিনি ত্বরিৎগতিতে ঘটনা-স্থলে আসিয়া উপস্থিত।

প্রাণপ্রতিম নিতাই আহত। ক্ষতস্থান হইতে দরদর ধারে রক্ত ঝরিতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া গৌরাঙ্গের ধৈর্য্যের বাঁধ সেদিন ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রোধে হুঙ্কার ছাড়িলেন, এই পাপিষ্ঠদের আজ দিবেন তিনি চরম দণ্ড।

নিতাই অগ্রসর হইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার হস্ত ধারণ করেন। প্রেম বিগলিত কণ্ঠে কহেন, "প্রভু, ক্ষান্ত হও, মাধাইর যেন দোষ হয়েছে, কিন্তু জগাই তো নিরপরাধ। বরং তার সহায়তায়ই আমার জীবন রক্ষা হয়েছে। সত্যি বল্‌ছি প্রভু, এ আঘাত ও রক্তপাতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি। কৃপা করে জগাই আর মাধাইকে আমায় তুমি ভিক্ষে দাও।"

ততক্ষণে জগাইর প্রতি প্রভুর করুণা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই তো পরম প্রিয় নিত্যানন্দের জীবন সে রক্ষা করিয়াছে! তবে তো তাহাকে প্রভুর আজ অদেয় কিছু নাই। প্রেমভরে ভুবাহু বাড়াইয়া জগাইকে আলিঙ্গন করিয়া কহেন, "জগাই, তুমি আমার প্রাণসর্ব্বস্ব নিত্যানন্দের জীবন রক্ষা করেছো আজ আমায় তুমি কিনে নিয়েছ। আশীর্ব্বাদ করি, কৃষ্ণ-কৃপা তোমার ওপর বর্ষিত হোক্। আজ হতে তোমার ভক্তি লাভ হোক্।"

অপূর্ব্ব প্রভুর মহিমা, অপূর্ব্ব তাঁহার এই বর দান। সমবেত পার্ষদ ও ভক্তগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠেন। গৌরাঙ্গের দিব্য

স্পর্শে জগাইর দেহে দেখা যায় অদ্ভুত প্রেমাবেশ! মূর্চ্ছিত হইয়া তখনি সে ভূতলে পতিত হয়।

মাধাইর অন্তরেও ইতিমধ্যে তীব্র অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠে। আর সে ধৈর্য্য ধরিতে পারে না, সাশ্রুনয়নে সেও প্রভুর চরণ জড়াইয়া ধরে। বলে—এক সঙ্গে দুই ভাই এতদিন পাপ করিয়াছে, আজ কেন কৃপা বিতরণের বেলায় দুই রকমের ফল? তাছাড়া, মাধাই হয়তো অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, কিন্তু দয়াময় প্রভু তাঁহার নিজের ধর্ম্ম, দয়া-ধর্ম্ম, ছাড়িবেন কিরূপে?

মাধাইর এ ক্রন্দন ও মিনতিতে কিন্তু প্রভু টলিতেছেন না। তাহাকে কহিলেন, "মাধাই, তোমার অপরাধের যে সীমা নেই। পরম ভাগবত নিত্যানন্দের—আমার অভিন্নহৃদয় নিত্যানন্দের রক্ত-পাত তুমি করেছ। শ্রীপাদ কৃপা করে যদি তোমায় ক্ষমা করেন তবেই তোমার রক্ষা। তুমি তাঁর চরণে ধরে পড়।"

মাধাই পদতলে পড়া মাত্রই নিতাই তাহাকে দুই হাতে টানিয়া তুলিলেন, প্রেমালিঙ্গন দিয়া তাহার সর্ব্ব অপরাধ করিলেন মার্জ্জনা। এবার প্রভুর কৃপা বর্ষণ করাইয়া দুই মহাপাপীকে শুদ্ধ করিয়া নিতে হইবে। নিতাই তাই সানুনয়ে কহিলেন—

কোন জন্মে থাকে যদি
আমার সুকৃতি।
সব দিনু মাধাইরে
শুনহ নিশ্চিত॥
মোরে যত অপরাধ
কিছু তার নাই।
মায়া ছাড় কৃপা কর
তোমার মাধাই॥ (চৈঃ ভাঃ)

অবধূত নিত্যানন্দের একি ক্ষমাসুন্দর রূপ, একি পরমমধুর প্রেমলীলা! ভক্তেরা পুলকাঞ্চিত দেহে অনিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে

চাহিয়া আছেন। মিলিত কণ্ঠের আনন্দধ্বনির মধ্যে গৌরাঙ্গ এবার মাধাইকেও করিলেন আলিঙ্গনাবদ্ধ, প্রেমভক্তি দানে তাহাকে করিলেন কৃতার্থ। জগাই-মাধাই আত্মসাৎ-এর এ লীলাটি অবধূত নিত্যানন্দের প্রভাবে সেদিন এমনি করিয়াই নবদ্বীপের ভক্তজন সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল।

ক্ষমা ও আশ্বাস পাইলে কি হয়, অনুশোচনার তীব্র দহনে মাধাইর অন্তর নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। নিত্যানন্দের পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া একদিন সে কহিল, "প্রভু, আমি এমন মহাপামর যে তোমার দিব্য অঙ্গে আঘাত করেছি, রক্তপাত করেছি। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি করে হবে, কৃপা করে তাই আমায় বলে দাও।" নিত্যানন্দের চরণে একান্ত শরণ নিয়া বার বার সে তাঁহার মহিমার স্তুতি গাহিতে থাকে।

দয়াল নিতাই প্রেমপূরিত নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, দিব্য দেহের আলিঙ্গনে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া কহেন—

শিশুপুত্রে মারিলে কি
বাপে দুঃখ পায়।
এই মত তোমার
প্রহার মোর গায়॥
তুমি যে করিলে স্তুতি,
ইহা যেই শুনে।
সেই ভক্ত হইবেক
আমার চরণে॥
আমার প্রভুর তুমি
অনুগ্রহ পাত্র।
আমাতে তোমার দোষ
নাহি তিলমাত্র॥

যে জন চৈতন্য ভজে
সেই মোর প্রাণ।
যুগে যুগে আমি তার
করি পরিত্রাণ॥ (চৈঃ ভাঃ)

প্রেমাবতার নিত্যানন্দের আলিঙ্গন ও আশ্বাসবাণী পাইয়া মাধাই যেন আজ প্রাণ পায়। তাহার বুকের উপর হইতে এক বিরাট পাষাণভার নামিয়া যায়। নিতাইর চরণে নিবেদন করেন, "দয়াল প্রভু, তুমি তো আজ আমায় কোল দিয়ে উদ্ধার করলে। কিন্তু দীর্ঘ বৎসর ধরে যে কত লোকের হিংসা করেছি, কত অপরাধ করেছি, তার কোন সীমা সংখ্যা নেই। আমি তাদের আজ চিনতে পারবো কি করে? তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনাই বা জানাবো কি করে? কৃপা করে তাই আমায় বলে দাও, প্রভু।"

নিত্যানন্দ উপায় কহিয়া দিলেন, "মাধাই, তুমি আজ থেকে সর্ব্ব অপরাধ ভঞ্জনকারিণী গঙ্গার সেবা-কার্য্য শুরু কর। গঙ্গার ঘাটে সহস্র সহস্র মুক্তিকামী ভক্তের সমাবেশ হয়। তাদের জন্য ঘাট নির্ম্মাণ কর, দিনরাত গঙ্গাতীরে বাস করে ভক্তদের পদরেণু ও আশিস গ্রহণ কর।"

মাধাই এই উপদেশ পালন করিতে বিলম্ব করে নাই। স্বহস্তে এক কোদালি নিয়া সে ঘাট নির্ম্মাণে ব্রতী হয়, গঙ্গাতীরে আগত ভক্তজনের সেবায় করে জীবন উৎসর্গ। নিজের নির্ম্মিত এই ঘাটে মাধাই প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া গঙ্গা স্নান করে, দুই লক্ষ নাম জপ সমাপ্ত করে। তারপর স্নানার্থীদের চরণে ভক্তিভরে সে প্রণত হয়, কাতরে নিবেদন করে—

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত করিনু অপরাধ
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ।

এই ঘাটে বসিয়াই এক কঠোরতপা ব্রহ্মচারীরূপে সে খ্যাতি লাভ করে। আজিও নবদ্বীপে 'মাধাইর ঘাট' পাষণ্ডী মাধাইর এই দিব্য রূপান্তরের পবিত্র স্মৃতিটি বক্ষে ধরিয়া আছে।

জগাইর জীবনেও লাগে গৌর নিতাইর পুণ্য স্পর্শ, জীবনে তাহার আসে মহা পরিবর্ত্তন। উভয় ভ্রাতার একি অপূর্ব্ব বৈষ্ণবীয় আর্ত্তি আর দৈন্য। নবদ্বীপের যে কেহ ইহাদের দর্শন করে, তাহারই দু'চোখ অশ্রু সজল হইয়া উঠে। লোকে বলাবলি করিতে থাকে, ধন্য পুরুষ এই নিমাই পণ্ডিত আর তাঁহার প্রধান পরিকর, অবধূত নিত্যানন্দ। ঐশ্বরীয় শক্তি ধারণ না করিলে দুর্ব্বৃত্ত জগাই মাধাইর এমন পরিবর্ত্তন তাঁহারা কি করিয়া সম্ভব করিলেন ?

এমনি করিয়া সেদিন নিত্যানন্দের কৌশল ও রঙ্গলীলা সারা নদীয়ায় গৌরাঙ্গের প্রভাবকে বিস্তারিত করিয়া দেয়।

শ্রীবাসের কুটিরে প্রতিদিন কীর্ত্তন ও অভিনয়ের নব নব রঙ্গ অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রভু গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ, এই দুই প্রেমঘন বিগ্রহকে ঘিরিয়া ভক্ত-গোষ্ঠীর আনন্দের আর সীমা নাই। নবদ্বীপে বৈষ্ণবের সংখ্যা ও শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। গৌর হইয়াছেন তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ, আর নিতাই বিরাজমান তাঁহাদের শক্তি ও প্রতিষ্ঠার উৎসরূপে। প্রভু নিতাইকে পরিকরদের সম্মুখে তাঁহার দ্বিতীয় বিগ্রহ-রূপে স্থাপন করিয়াছেন। ভক্তগোষ্ঠী ও ভক্ত সংগঠনের মধ্যে তাঁহাকে প্রধান প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে হইবে, তাই বার-বারই অন্তরঙ্গ মহলে নূতন করিয়া অবধূতের স্বরূপ ও লীলা মাহাত্ম্য তিনি তুলিয়া ধরিতেছেন।

সেদিন সন্ধ্যায় গৌরসুন্দর ভক্তজন পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণকথায় মত্ত রহিয়াছেন। অন্যতম প্রধান পার্ষদ মুরারি গুপ্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদিনকার অভ্যাসমত মুরারী প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ করিলেন। তারপর প্রণত হইলেন পার্শ্বে উপবিষ্ট অবধূত নিত্যানন্দের পদতলে।

প্রভু সব কিছু লক্ষ্য করিতেছেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠেন, "মুরারি, প্রণাম নিবেদন করতে গিয়ে তোমার কিন্তু একটা ব্যতিক্রম

ঘটলো। তোমার মত ভক্তবীরের কাছে সবাই প্রকৃত তত্ত্ব জানবে, প্রকৃত আচরণ শিখবে, এই তো আমি আশা করি। কিন্তু সেই তোমারই দেখছি সব কিছু গোলমাল হয়ে গেছে।"

মুরারি গুপ্তও হটিবার পাত্র নহেন। করজোড়ে কহেন, "প্রভু আমার যা কিছু আচার-আচরণ, সবই তো তোমারই প্রভাবে, তোমারই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আর প্রণামের যে ক্রম তুমি ভেতর থেকে শিখিয়ে দিচ্ছ, বাইরের ব্যবহারে যে তা-ই প্রকাশ পাচ্ছে।"

"ভাল, ভাল মুরারি। আজ আর বৃথা বাক্যব্যয় করে কাজ নেই। আগামী কালই সব কিছু তোমার ভেতর হয়তো স্ফুরিত হবে, প্রকৃত তত্ত্ব হবে তোমার বোধগম্য।"

সেদিনকার সভা ভঙ্গের পর মুরারি চলিয়া গেলেন। অন্তরে তাঁহার যুগপৎ হর্ষ ও ভয়ের দোলা লাগিতেছে। প্রভুর ইঙ্গিতের মর্ম্ম বুঝিয়া উঠা ভার। কি ভাবে, কোন্ তত্ত্ব তিনি স্ফুরিত করিবেন কে জানে?

সেই রাত্রিতে মুরারি গুপ্ত এক স্বপ্ন দর্শন করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। গৌর ও নিতাই দুই প্রভু দিব্যোজ্জ্বল মূর্তিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গৌরসুন্দর এসময়ে স্পষ্টভাবে তাঁহার উপলব্ধিতে আনিয়া দিলেন—নিত্যানন্দ শুধু তাঁহার দ্বিতীয় বিগ্রহই নয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রতিম। কহিলেন, গৌরকে প্রণাম নিবেদনের আগে পরম ভক্ত মুরারি যেন নিতাইয়ের চরণে প্রণতি জানায়।

অস্ফুটকণ্ঠে বার বার নিত্যানন্দ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মুরারি গুপ্তের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভোরে উঠিয়াই তিনি প্রভুর গৃহের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। প্রভু ভক্ত-পারিষদদের মধ্যে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। মুরারি সম্মুখে গিয়া প্রথমেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, তারপর গ্রহণ করিলেন গৌরাঙ্গ প্রভুর চরণধূলি।

কৌতুকী প্রভু ভক্তদের সমক্ষে অবধূত নিত্যানন্দের মহিমা প্রচারের জন্য ব্যগ্র। স্মিতহাস্যে তিনি কহেন, "মুরারি, তোমার প্রণামের ক্রম আজ যেন অন্য রকম দেখছি।"

"প্রভু, সবই তোমার লীলা। তুমি যেমন দেখালে ও বুঝালে, সেই অনুযায়ীই তো আমায় আচরণ করতে হ'লো। তুমি স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে যে দেখিয়ে দিলে— নিত্যানন্দ তোমার জ্যেষ্ঠ।

সমবেত ভক্তদের শুনাইয়া সস্নেহে গৌরাঙ্গ কহেন, "মুরারি, তুমি আমার বড় প্রিয়, তাই তো নিত্যানন্দ-তত্ত্ব বুঝবার অধিকার তুমি পেয়েছ।"

প্রভুর কর্ম্মলীলার, কৃপালীলার প্রধান সহকারী নিত্যানন্দ। অক্রোধ পরমানন্দরূপী এই বিরাট পুরুষের কীর্ত্তন-তাণ্ডবে নদীয়া তখন টলমল। মানুষের দ্বারে দ্বারে তিনি প্রেম-ভক্তির পসরা নিয়া ফিরেন, প্রভুর প্রবর্ত্তিত মণ্ডলীর সংগঠনকে ধীরে ধীরে পূর্ণায়ত করিয়া তুলেন। এই বিরাট সংগঠন শক্তি গৌরাঙ্গের কাজীদলন লীলার পরম সহায়ক হইয়া উঠে, মুসলমান শাসনকর্ত্তার আদেশ অমান্য করিয়া এই দেশে প্রকাশ্যে ও সর্ব্বপ্রথমে কীর্ত্তন-অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়।

বহুতর লোক এখন হইতে প্রভু গৌরাঙ্গের চরণে শরণ নিতে আরম্ভ করে, বৈষ্ণব ভক্তগোষ্ঠীর আয়তনও ক্রমেই বিস্তৃততর হইতে থাকে। কিন্তু পাষণ্ড, পাপাচারী ও বৈষ্ণব বিরোধীদের সংখ্যা দেশে তখন নিতান্ত কম নয়। প্রেম ভক্তিধর্ম্মের নেতা নিমাই পণ্ডিতকে তাহারা স্বীকৃতি দিতে চাহে না। প্রকাশ্যে বৈষ্ণবদের করে নানা লাঞ্ছনা ও উপহাস, অত্যাচার করিতেও অনেক সময় দ্বিধা করে না।

প্রভু একদিন সঙ্গোপনে নিত্যানন্দকে নিকটে ডাকাইলেন। কহিলেন, "শ্রীপাদ, আমার প্রাণের ইচ্ছা— পাপক্লিষ্ট জীবকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করবো, আর তারা উদ্ধার পাবে। কিন্তু তা সফল হতে

পারছে কই? হিংসা ও দ্বেষের আগুন ছড়িয়ে নিন্দুকেরা আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে বেড়াচ্ছে। এর একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে আমার সন্ন্যাস গ্রহণ। সংসারের ভোগ সুখ একেবারে ত্যাগ না করলে সংসারের জীব আমায় তো প্রীতির চোখে তেমন দেখবে না, আমার কথারও মূল্য তারা দেবে না।"

নিত্যানন্দের শিরে এ যেন এক আকস্মিক বজ্রাঘাত। রুদ্ধবাক্ হইয়া করুণ নয়নে তিনি প্রভুর দিব্য মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আছেন।

প্রভু বুঝিলেন, তাঁহার বিচ্ছেদের এ পূর্ব্বাভাস নিত্যানন্দের প্রাণে কি তীব্র আঘাত হানিয়াছে। সান্ত্বনার সুরে, প্রেমপূরিত কণ্ঠে তাঁহাকে কহিলেন,—"শ্রীপাদ, ভেবে ছাখো, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কোন শত্রু নেই। আমি সেই সন্ন্যাসী হয়ে কেঁদে কেঁদে লোকের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম ভিক্ষে করবো। তাহলে তো আর তারা নাম প্রচারে বাধা জন্মাতে আসবে না? কাজেই আমার সন্ন্যাসের কথায় তুমি এমন ভেঙে পড়ো না।"

নিত্যানন্দ তবুও নিরুত্তর। একি মহা দুর্দ্দৈবের কথা আজ তাঁহাকে শুনিতে হইতেছে? কোন মুখে তিনি প্রভুর এ নিষ্ঠুর প্রস্তাবে সম্মতি দিবেন?

প্রভু এবার তাঁহার শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, স্বীয় আবির্ভাবের নিগূঢ় কারণটি জানাইয়া অবধূতকে কহিলেন—

ইথে তুমি কিছু দুঃখ
না ভাবিও মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে
সন্ন্যাস কারণে॥
... ...
জগৎ উদ্ধার যদি
চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি
করিবে আমারে॥

এতক্ষণে নিত্যানন্দ মুখ খুলিলেন। সজল চক্ষে প্রেম গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "প্রভু, তুমি স্বেচ্ছাময়। যে সিদ্ধান্ত তুমি মনে মনে স্থির করেছ তার অন্যথা করবে এমন শক্তি কার আছে? তোমার বিহনে ভক্তদের কি গতি হবে, শচী-মা আর বিষ্ণুপ্রিয়ার কি মর্ম্মান্তিক অবস্থা হবে, তাই আমি কেবল ভাবছি। তোমার এই জীব-উদ্ধারলীলার গতিপ্রকৃতি অবশ্য শুধু তুমিই জানো। সন্ন্যাস নেওয়া যখন স্থির করেই ফেলেছ, তখন তাই হোক। কিন্তু তোমার মনের কথাটি অন্তরঙ্গ ভক্তদের একবারটি জানাও, তারা অন্ততঃ প্রস্তুত হয়ে নিক্।"

নিত্যানন্দের এ অনুরোধ গৌরাঙ্গ অগ্রাহ্য করেন নাই। তাই পার্ষদদের মধ্যে কয়েকজন এ আসন্ন বিচ্ছেদের কথা সেদিন জানিতে পারিয়াছিলেন।

প্রভুর গৃহত্যাগের দিনটি অবশেষে আসিয়া যায়। ভক্তদের প্রেম-বন্ধন, স্নেহময়ী জননীর আকর্ষণ ও পত্নীর প্রণয়পাশ ছিন্ন করিয়া তিনি পথে বাহির হইয়া পড়েন। কাটোয়া নগরে পরম ভাগবত সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর আশ্রম। এই মহাপুরুষের নিকট তিনি সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। নব নামকরণ হইল—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। এ সময়ে তাঁহার সঙ্গী হইবার অধিকারী হন অবধূত নিত্যানন্দ, গদাধর ইত্যাদি পঞ্চ পার্ষদ।

কাটোয়ায় গিয়া দীক্ষা গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যের প্রেমসিন্ধু যেন উত্তাল, দুর্ব্বার হইয়া উঠে। মহাভাবরসে সদা তিনি মাতোয়ারা। হৃদয়ে তাঁহার নিরন্তর পশিতেছে নীলাচলনাথ দারুব্রহ্মের অমোঘ আহ্বান। তাই ব্যাকুলভাবে এবার তিনি মহাধাম নীলাচলের দিকে ধাবমান হইলেন।

চির বিদায়ের আগে জননী ও ভক্তদের সহিত প্রভু একবার সাক্ষাৎ করিতে চান। তাই নিত্যানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, 'শ্রীপাদ, আমি আর নবদ্বীপে ফিরবো না, শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের ভবনে অপেক্ষা করবো। তুমি নিজে গিয়ে জননী ও ভক্তদের সংবাদ দাও।"

নিত্যানন্দ নবদ্বীপে পৌঁছা মাত্র ভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া যায়। প্রভুর সংবাদের জন্য সকলেই মহা ব্যগ্র। সকলকে আশ্বস্ত করিয়া নিতাই শচীমাতার চরণ বন্দনা করিতে যান। প্রভুর গৃহের দৃশ্য দেখিয়া সেদিন তাঁহার পক্ষে আত্মসম্বরণ করা কঠিন হয়। পুত্রশোকে মাতা উন্মত্তা-প্রায়, নিরন্তর তিনি বিলাপ করিতেছেন, বারো দিন যাবৎ কোন আহার্য্যই গ্রহণ করেন নাই। বিরহবিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ মূর্ত্তি দেখিয়া অশ্রুরোধ করা যায় না। নিত্যানন্দ উভয়কে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তারপর শচীমাতাকে কহিলেন, "মাগো, তোমার উপবাসে যে কৃষ্ণও উপবাসে থাকেন। তুমি স্থির হয়ে উঠে ব'স, ভোগান্ন প্রস্তুত কর। আমি ক্ষুধার্ত্ত, তোমার হাতের প্রসাদান্ন খেতে আমার বড় অভিলাষ হয়েছে। আমার সঙ্গে আজ ভক্তেরাও তোমার এখানে প্রসাদ পাবেন।"

নয়নাশ্রু মুছিয়া শচী রন্ধন শুরু করিলেন। সেদিন প্রভুর গৃহে নিত্যানন্দ ও ভক্তদের আহার সম্পন্ন হইল, শচীদেবীও উপবাস ভঙ্গ না করিয়া পারিলেন না। তারপর শচীমাতা ও ভক্তগণসহ নিত্যানন্দ অদ্বৈতের গৃহে উপনীত হইলেন। শান্তিপুরে সেদিন আনন্দের বান ডাকিয়া উঠিল।

জননী ও ভক্তদের নানাভাবে প্রবোধ দিয়া চৈতন্য এবার পুরীর পথে পা বাড়াইলেন। সঙ্গী শুধু অন্তরঙ্গ ভক্ত ও পার্ষদগণ।

নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে সুবর্ণরেখার তটে আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রভু তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, আর ভক্তেরা আসিতেছেন কিছুটা পিছনে। এ সময়ে নিত্যানন্দ এক দুঃসাহসী কাজ করিয়া বসেন।

প্রভু প্রায়ই ভাবাবিষ্ট ও অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় থাকেন, সন্ন্যাসদণ্ডটি ঠিকমত হাতে রাখিতে পারেন না। এজন্য পণ্ডিত জগদানন্দকেই এটি সন্তর্পণে বহন করিতে হয়। সেদিন পণ্ডিত ভিক্ষায় বাহির হইবেন, প্রভুর দণ্ডটি নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, প্রভুর এ সন্ন্যাসদণ্ড তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, এটা কিন্তু খুব সাবধানে রাখতে হবে। আমি গ্রাম থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করে এখনই ফিরে আস্‌ছি।"

নিত্যানন্দ তখন ভাবাবেশে বিভোর, কখনো বা থাকেন অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায়। প্রভুর দণ্ডটি হাতে আসিতেই চেতনা ফিরিয়া আসে, চিন্তা করিতে থাকেন, জীব উদ্ধারের জন্য প্রেমাবতার প্রভুর আবির্ভাব। তাঁহার আবার এ দণ্ড কমণ্ডলু বহন করা কেন? হঠাৎ কি এক অদ্ভুত উদ্দীপনা তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত হয়, হস্তস্থিত দণ্ডটি তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন, নদীর জলে দেন তাহা বিসর্জ্জন।

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত জগদানন্দের তো চক্ষুস্থির! ভাবপ্রমত্ত অবস্থায় নিত্যানন্দ এ কি সাংঘাতিক কাজ করিয়া বসিয়াছেন? প্রভুর সন্ন্যাসদণ্ড যে এক পরম পবিত্র বস্তু। এটি ভগ্ন হইয়াছে দেখিলে যে তিনি তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিবেন। পণ্ডিত সঙ্কোচে ভয়ে জড়সড় হইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই প্রভুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ। দণ্ডটি ভগ্ন দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "কার এমন সাহস, কে আমার দণ্ডের এই দুরবস্থা করেছে?"

নিত্যানন্দ তখনও ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "প্রভু, এ কাজ আমারই। যদি ইচ্ছা হয়, তুমি দণ্ড বিধান কর!"

নিত্যানন্দের একথা শুনার পর প্রভুকে রোষ সম্বরণ করিতে হইল। সর্ব্ব পাশমুক্ত অবধূতের এ আবার কোন্ বিচিত্র লীলা, কে বলিবে? তাছাড়া; চৈতন্য যে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মান

দিয়া থাকেন। তাই ভাবের ঘোরে দণ্ড ভাঙ্গার জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করারই বা উপায় কই?

প্রভু শুধু কাহলেন, "এ পৃথিবীতে একমাত্র এ দণ্ডটিই ছিল আমার প্রধান অবলম্বন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় আজ তাও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ভালই হ'লো। এবার আর কারুর সঙ্গেই আমার কোন সম্পর্ক রইলো না। এখন থেকে আমি একলাই পথ চলবো, আব তোমরা সবাই যদি নীলাচলে যেতে চাও—পৃথকভাবে এসো।"

এ ব্যবস্থাই ভক্তদের আপাতত মানিয়া নিতে হইল। প্রভুকে আগে যাইতে দিয়া ভক্তেরা তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন।

জলেশ্বর গ্রামে শিবের এক জাগ্রত বিগ্রহ বর্ত্তমান। এখানে পৌঁছিয়াই প্রভু নবভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। কীর্ত্তন ও উদ্দণ্ড নর্ত্তনের ফলে সেখানে লোকের ভীড় জমিয়া যায়।

ইতিমধ্যে অনুসরণকারী পরিকরগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভক্তপ্রবর মুকুন্দের সুললিত কীর্ত্তন ও ভাবাবিষ্ট প্রভুর নৃত্যে এক আনন্দের হাট বসিয়া গেল।

শ্রীচৈতন্যের অন্তর পরম প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠে। সন্ন্যাসদণ্ডটি ভাঙ্গার ফলে যা কিছু উষ্মার সঞ্চার হইয়াছিল, এতক্ষণে তাহা দূর হইয়াছে। এবার নিত্যানন্দকে নিকটে আহ্বান করিয়া প্রেমপূরিত কণ্ঠে অনুযোগ দিলেন—

কোথা তুমি আমারে
করিবে সংবরণ।
যেমতে আমার হয়
সন্ন্যাস রক্ষণ॥
আরো আমা পাগল
করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর তবে
মোর মাথা খাও॥

যেন কর তুমি আমা
তেন আমি হই।
সত্য সত্য এই আমি
সভাস্থানে কই॥

প্রভুর শ্রীমুখের এ কথা কয়টিতে অবধূত নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য ও তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চৈতন্য একাকী সবার আগে নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিলেন। জগন্নাথ মন্দিরে সেদিন দেখা গেল অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। শ্রীবিগ্রহ দর্শন মাত্রেই প্রভু প্রেমোদ্বেল হইয়া উঠিয়াছেন, সর্ব্বদেহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বল্পকাল মধ্যেই দিব্যকান্তি দেহখানি সম্বিৎহারা হইয়া ধূলায় লুটাইতে থাকে। রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম এই সময়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে উপস্থিত। তরুণ সন্ন্যাসীর অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। পরিহারীদের সাহায্যে তাঁহাকে তিনি সযত্নে নিজ আলয়ে নিয়া গেলেন।

নিত্যানন্দ ও অপর সঙ্গীরা পিছনে পড়িয়াছিলেন, এবার প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। চৈতন্য ও তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তদের পরিচয় পাইয়া সার্ব্বভৌমের আনন্দের অবধি রহিল না। চৈতন্য ও নিত্যানন্দ এই উভয়কেই তিনি পরম যত্নে তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করাইলেন।

ভাবের মানুষ নিত্যানন্দকে সামলাইয়া চলা বড় কঠিন। কখনো তাঁহার প্রেমাবেশ উদ্দাম হইয়া উঠে, কখনো বা উদ্দণ্ড নর্ত্তন-কীর্ত্তন ও হুঙ্কারে তিনি সকলকে সচকিত করিয়া তুলেন। একদিন তো ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি জগন্নাথ মন্দিরে এক প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াই বসিলেন। মন্দিরের গর্ভগৃহে দাঁড়াইয়া নিত্যানন্দ সেদিন সঙ্গীগণ সহ কীর্ত্তন করিতেছেন। অকস্মাৎ মহাভাবে উদ্দীপিত হইয়া পড়িলেন। প্রেম-প্রমত্ত অবধূতের হুঙ্কারে সবাই ভীত চকিত হইয়া উঠিল। ভাবের ঘোরে প্রচণ্ড বিক্রমে তিনি ছুটিলেন জগন্নাথ-

বলরাম বিগ্রহদ্বয়কে আলিঙ্গন করিতে। মন্দির পরিহারীরা সবাই ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিল, কিন্তু তাঁহাকে ঠেকানো গেল না। বেদীর উপর আরোহণ করিয়া অবধূত নিত্যানন্দ বলরাম-বিগ্রহকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন, আর তাঁহার মালাগাছ তুলিয়া নিয়া নিজের গলায় পরিলেন। ঈশ্বরীয়ভাবে তিনি তখন উদ্দীপিত, আননখানি দিব্য আনন্দের ছটায় উদ্ভাসিত। ভক্ত ও পরিহারীদের জয়ধ্বনিতে শ্রীমন্দির মুখরিত হইয়া উঠিল।

নিত্যানন্দের এই প্রেম-প্রমত্ত ভাব এ সময়ে নীলাচলবাসীর বিস্ময় উদ্রেক করিতে থাকে। চৈতন্যের প্রধান পার্ষদরূপে সর্ব্বত্র তিনি হন অসামান্য মর্য্যাদার অধিকারী।

চৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন; ভক্ত পার্ষদদের কাহাকেও সঙ্গে নিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। সবাইকে কহিলেন, সেতুবন্ধ হইতে তিনি না ফিরিয়া আসা অবধি তাঁহারা সবাই যেন নীলাচলেই অপেক্ষা করেন। নিত্যানন্দ প্রমাদ গণিলেন। কহিলেন, "সে কি কথা প্রভু, একাকী তোমার যাওয়া কি করে হয়? তোমার প্রায়ই কোন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, কখন কি বিপদ ঘটে তা কে জানে? কাউকে তোমায় সঙ্গে নিতেই হবে। দক্ষিণের পথঘাট সব আমার চেনা, সেখানকার তীর্থগুলো আমি পরিক্রমণ করে বেড়িয়েছি। আমাকেই তোমার সঙ্গে যেতে দাও।"

চৈতন্য এ প্রস্তাবে রাজী নন, এই ভ্রমণ সময়ে তাঁহাকে বহুতর কার্য্য সাধন করিতে হইবে, বহুলোককে উদ্ধার করিতে হইবে, এ সময়ে মুক্ত ও স্বতন্ত্র হইয়াই তিনি চলিতে চাহেন। নিত্যানন্দের স্নেহবন্ধনে নিজেকে জড়িত রাখা তাঁহার মনঃপূত নয়—

প্রভু কহে আমি নর্ত্তক
তুমি সূত্রধার।
যৈছে তুমি নাচাহ
তৈছে নর্ত্তন আমার॥

সন্ন্যাস করি আমি
চলিলাম বৃন্দাবন।
তুমি আমা লৈয়া
আইলা অদ্বৈত ভবন॥
নীলাচল আসিতে তুমি
ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড।
তোমা সবার গাঢ় স্নেহে
আমার কার্য্য ভঙ্গ।

সঙ্গীরূপে অন্য কোন ভক্তকে গ্রহণের প্রস্তাবও তিনি উড়াইয়া দিলেন। এবার নিত্যানন্দ মিনতি করিয়া কহিলেন, "বেশ কথা, আমরা অন্তরঙ্গের দল না হয় নাই গেলাম, কিন্তু পরিচারক ও সঙ্গী হিসাবে একজন কাউকে তোমায় নিতেই হবে। তুমি সদাই থাকবে প্রেমাবেশে বিভোর, দুই হস্ত থাকবে কীর্ত্তন বা নামজপে ব্যাপৃত, কৌপীন-বহির্ব্বাস ও জলপাত্রই বা বহন করবে কে, কে-ই বা এসব দেখাশুনা করবে? ভক্তসরলপ্রাণ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস এখানে রয়েছে ও তাকেই আমরা তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, অন্ততঃ একে নিতেই হবে।"

নিত্যানন্দের এ অনুরোধ এড়ানোর উপায় রহিল না। অগত্যা প্রভু স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, তবে তাই হোক, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।"

প্রভু দাক্ষিণাত্য ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের পর শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সেদিনকার এই দীর্ঘ পরিক্রমার উদ্দেশ্যটি কম তাৎপর্য্যপূর্ণ ছিল না। ব্রজরসতত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ রামানন্দ রায়কে তিনি এ উপলক্ষে আত্মসাৎ করিলেন, প্রেমধর্ম্মের বীজ সারা দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতে বপন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

মহাধাম নীলাচলে চৈতন্যের লীলানাট্যের মঞ্চটি ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছে। ভারতের দূর-দূরান্তে পাদ-পরিক্রমা করিয়া তিনি লক্ষ লক্ষ লোককে কৃষ্ণনামে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, এবার তাঁহার দৃষ্টি

পড়িল মাতৃভূমি গৌড়ের উপর। এখানকার জনসমাজে তান্ত্রিক প্রভাব বড় প্রবল। নব্যন্যায়ের তর্ক ও কচকচিতে পণ্ডিতসমাজ সদাই থাকে অতিমাত্রায় মুখর। সাধারণ মানুষের জীবনে নীতিধর্ম্ম ও শরণাগতির চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া ভার। তাই নিজের এই আবির্ভাবভূমিতে তাঁহার নব-ধর্ম্ম প্রচার না করিলে চলিবে কেন? সারা গৌড়দেশকে মন্থন করিয়া প্রেমভক্তির অমৃত উৎসারিত করিতে প্রভু ব্যগ্র হইলেন।

কিন্তু এই বিরাট কাজের ভার তিনি কাহাকে দিবেন? প্রভু নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে পুরীধামে বাস করিতেছেন। উচ্চকোটির ভক্ত ও সাধকদের অনেকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হইয়াছেন সন্ন্যাসী। অনেকেরই ধারণা, প্রভুর প্রকৃত অনুগামী হইতে হইলে বুঝি গার্হস্থ্য অবলম্বন না করাই ভাল।

অদ্বৈত অবশ্য গৃহীরূপেই গৌড়ে অবস্থান করিতেছেন। প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্ম্মজ্ঞ ও ব্যাখ্যাতা রূপে তিনি পরিচিত। গৌড়ীয়া ভক্তসমাজ তাঁহার মত মহাপুরুষকে পাইয়া ধন্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অদ্বৈত বৃদ্ধ হইয়াছেন, এই বিরাট বৈষ্ণব সংগঠনের ভার নিবার মত বয়স তাঁহার নাই। তাছাড়া, গৌড়দেশে জ্ঞানপন্থী পণ্ডিতের ছড়াছড়ি। ইহাদের আত্মসাৎ করিতে হইলে প্রেমঘন মূর্ত্তি নিতাইর মতন নেতারই প্রয়োজন। প্রভু তাই মনে মনে ভাবিলেন, এ গুরুভার নিত্যানন্দকেই দিবেন।

নিতাই প্রভুর অভিন্নহৃদয় সহকারী। ভক্তগণ তাঁহাকে প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর বলিয়া ভাবিয়া নিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। নব ভাবের উদ্বোধন ঘটাইতে, নবগঠিত বৈষ্ণবসমাজে নূতন উদ্দীপনা নূতন রসতরঙ্গ সৃষ্টি করিতে, তাঁহার মত সমর্থ পুরুষ আর কে আছে? বলা বাহুল্য সিদ্ধান্ত স্থির করিতে প্রভুর দেরী হইল না।

নিত্যানন্দকে একদিন বিরলে ডাকিয়া নিয়া কহিতে লাগিলেন, "শ্রীপাদ, আমার দুঃখের অবধি নেই। আমি নিজমুখে ঘোষণা করেছি, বিদ্বান মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, ধনী দরিদ্র সবাইকে কোলে টেনে

নেব, হরিভক্তি ও প্রেমধর্ম্ম বিতরণ করবো। কিন্তু তার তো উপায় দেখছিনে। আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, গৃহস্থদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আর রইলো না। তুমিও যদি সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ ছেড়ে দিয়ে উদাসীন হয়ে থাকো, তবে পতিত অভাজনদের গতি কি হবে? তাদের উদ্ধার কে করবে? তুমি নিজেকে এমন করে সম্বরণ করে রাখলে তো চলবে না। শ্রীপাদ, আমার কথা রাখো। তুমি গৌড়দেশে ফিরে যাও, সেখানে গিয়ে সংসারী হও, সংসারের উষর ক্ষেত্রে প্রেমভক্তির অমৃত প্রবাহ নামিয়ে আনো।”

এ কি নির্ম্মম আদেশ! প্রভুর কথা কয়টি শুনা মাত্র নিত্যানন্দ মর্ম্মাহত ও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এ যেন এক আকস্মিক বজ্রাঘাত। অতি অল্প বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াছেন। সন্ন্যাস ও অবধূত জীবনের মধ্য দিয়া ভাগবত প্রেমের পরম মাধুর্য্য খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। পূর্ব্বতন জীবনের সমস্ত কিছু মহান আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়া শেষকালে বিবাহ করিতে হইবে, গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করিতে হইবে?

একথাও নিতাই বুঝিয়া নিয়াছেন, প্রভুর জীব উদ্ধার ব্রতের তিনি এক বড় সহায়ক। এ ব্রত সাধনের জন্য যে কোন প্রকার দুঃখ-বরণে বা ত্যাগ স্বীকারে তিনি পরাঙ্মুখ নন, ইহাও সত্য। প্রভুর আজিকার আদেশ সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন। নিতাইর কাছে ইহা যতই অনভিপ্রেত হোক, তাহা অমান্য করার প্রশ্ন উঠে না। তাই অবনত শিরে এ নির্দ্দেশ তিনি গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বজনবন্দিত অবধূত নিত্যানন্দ সেদিন প্রভুর দেওয়া শৃঙ্খল বন্ধন স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

নিতাই এবার গৌড়ের পথে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে তাঁহার রহিয়াছেন প্রেমধর্ম্ম প্রচারের উপযুক্ত ভক্তদল—রামদাস, গদাধরদাস, সুন্দরানন্দ, পরমেশ্বর দাস, পুরুষোত্তম দাস ইত্যাদি।

নিত্যানন্দ নূতন উদ্দীপনায় উন্মত্ত, রসাবেশে আনন্দচঞ্চল। ভক্ত পরিকরদের মধ্যেও তিনি এসময়ে এক বিস্ময়কর অলৌকিক

শক্তি সঞ্চারিত করেন। তারপর ভাববিহ্বল সঙ্গীদলসহ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে গৌড়ে আসিয়া উপস্থিত হন।

গৌড়দেশে সেদিন নিত্যানন্দের প্রকাশ ঘটে প্রেমদাতা 'দয়াল নিতাই' রূপে। ভুবনমোহন তাঁহার দিব্যকান্তি, উল্লাসময় তাঁহার নর্ত্তন-কীর্ত্তন, প্রেমে বিগলিত ঘন তাঁহার নয়নের অশ্রু আর অদ্ভুত তাঁহার সাত্ত্বিক বিকার। এই অলৌকিক পুরুষের সান্নিধ্যে আসিয়া ভক্তেরা সাক্ষাৎভাবে ভাগবত প্রেমের স্পর্শ অনুভব করে, তাঁহার দিব্য প্রেম দর্শনে নরনারী সেদিন উদ্বেল হইয়া উঠে, তাঁহার দৃষ্টি সম্পাতে ও করস্পর্শে হয় প্রেম প্রমত্ত। সেদিনকার গৌড়ে প্রেমাবতার নিত্যানন্দ-প্রভু যেন ভাগবতী সাধনার এক শতদলরূপে বিরাজিত, আর তাহার মধুলোভে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে দূর দূরান্তের ভক্তদল।

নিত্যানন্দের এ সময়কার বর্ণনা দিতে গিয়া, তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও করুণার কথা তুলিয়া বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

যাহারে করেন দৃষ্টি
নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া
পড়েন পৃথিবীতে॥

এ এক অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারণ। নাচিয়া গাহিয়া কাঁদিয়া ও হুঙ্কার ছাড়িয়া নিত্যানন্দ সেদিন সারা গৌড়ে অপূর্ব্ব প্রেমতরঙ্গের সৃষ্টি করিলেন।

সেদিন তিনি পানিহাটি গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। চারিদিকে বহুসংখ্যক পার্ষদ ও ভক্তদলের ভীড়। অবিরাম ধারায় কীর্ত্তনানন্দ চলিয়াছে। হঠাৎ তিনি ঈশ্বরীয় ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। ভক্তদের আদেশ দেন, এখনি তাঁহাকে সাড়ম্বরে অভিষেক করাইতে হইবে। ভারে ভারে গঙ্গাজল আনয়ন করিয়া নিত্যানন্দের অভিষেক সম্পন্ন হয়। বনমালা গলে, চন্দনচর্চ্চিত দেহে

খট্টার উপর তিনি উপবিষ্ট, আর রাঘব পণ্ডিত তাঁহার শিরে ছত্র ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তদের কীর্ত্তন ও উল্লাস ধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রাঘব পণ্ডিতের গৃহে লীলাকৌতুকী নিত্যানন্দ সেদিন এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটান বলিয়া জনশ্রুতি আছে। পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া সহাস্যে স্মিত হাস্যে কহেন, "পণ্ডিত, শিগ্‌গীর আমার জন্য এক ছড়া কদম্বমালা গেঁথে আনো, কদম্ব যে আমার সব চাইতে প্রিয়।"

রাঘব মহা বিপদে পড়িলেন। এ অসময়ে কদম্বপুষ্প কোথায় পাইবেন? জোড়হস্তে বার বার একথা নিবেদন করিয়াও নিষ্কৃতি পাইলেন না। নিত্যানন্দ গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, "পণ্ডিত, ছাখোনা একবার বাড়ীর ভেতর গিয়ে। খোঁজ নাও। হঠাৎ কোথাও এ ফুল ফুটে থাকতেও তো পারে।"

সত্যই তো। রাঘব পণ্ডিত দেখিলেন, গৃহকোণের এক লেবুগাছে গুটিকয়েক কদমফুল ফুটিয়া আছে। বিস্ময় বিমূঢ় রাঘব কোনমতে আত্মসম্বরণ করিয়া মালা গাঁথা শেষ করিলেন, তারপর সর্ব্বসমক্ষে এটি পরাইয়া দিলেন নিত্যানন্দের গলায়।

সেদিনকার কীর্ত্তনে নিত্যানন্দ আরও একটি অলৌকিক লীলা বিস্তার করেন বলিয়া শোনা যায়। কীর্ত্তনরত ভক্তদের নাসিকায় হঠাৎ দমনক পুষ্পের তীব্র সুবাস প্রবেশ করিতে থাকে। বিস্মিত হইয়া সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতেছেন। নিত্যানন্দ এ রহস্যের মর্ম্ম কহিলেন—

চৈতন্য গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন॥
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা॥
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য দমনক গন্ধে।
চতুর্দ্দিক পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে॥

তোমা সবাকার নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে।
আপনে আইসে প্রভু নীলাচল হৈতে॥
এতেকে তোমরা সর্ব্ব কার্য্য পরিহরি।
নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপনা পাসরি॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে।
সভার শরীর পূর্ণ হউক প্রেমরসে॥

নিত্যানন্দের প্রেমদৃষ্টিপাতে সেদিন সমবেত ভক্তদের মধ্যে এক অপরূপ দিব্য ভাবের সঞ্চার হয়, কীর্ত্তনক্ষেত্রে স্বর্গীয় আনন্দের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠে। তাঁহার অপরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশের ফলে প্রতিটি লোক সেদিন অলৌকিক প্রেমাবেশে আত্মহারা হয়—

অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম,
পুলক, হুঙ্কার।
স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ, গর্জ্জন
সিংহসার॥
শ্রীআনন্দ মূর্চ্ছা আদি
যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত
কৃষ্ণ অনুরাগ॥
সভার শরীরে পূর্ণ
হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দস্বরূপের
প্রেম-বল॥
যে দিকে দেখেন
নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেই দিকে মহাপ্রেম-
ভক্তি বৃষ্টি হয়॥

পানিহাটিতে প্রায় তিন মাস কাল নানা লীলাবিলাসের পর

নিত্যানন্দ খড়দহে চলিয়া আসেন। সেখানেও আনন্দের হাট বসিয়া যায়। এ হাটের ক্রেতা আপামর জনসাধারণ, বিক্রেতা নিত্যানন্দ, পণ্য চৈতন্যপ্রভু। সুরধুনীর তীরে তীরে নিতাই কীর্ত্তন ধরেন—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ
লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ
সে হয় আমার প্রাণ॥

'প্রেমদাতা দয়াল নিতাই'র সে এক অপরূপ রূপ। গুরুগম্ভীর তত্ত্বের আড়ম্বর নাই, সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ নাই, আছে শুধু ভাবোদ্বেল কীর্ত্তন-নর্ত্তন আর নয়নাশ্রুর ধারা। আচণ্ডালে তিনি প্রেম বিতরণ করিতে থাকেন, কখনো ভূমিতলে লুটাইয়া, কখনো লোকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহেন, "ভাই, দয়া করে একবার কৃষ্ণ ভজ, গৌরাঙ্গ ভজ। বিনামূল্যে চিরতরে আমায় কিনে নাও। আমায় তোমাদের দাসানুদাস কর, ভাই।"

দেবপ্রতিম মহাসাধকের এ কি হৃদয়বিদারক দৈন্য ও আর্ত্তি! যে-ই এ দৃশ্য দর্শন করে, নয়নাশ্রু সম্বরণ করা তাহার পক্ষে কঠিন হয়। নিত্যানন্দকে কিনিয়া নেওয়া তো দূরের কথা, মুহূর্ত্তে সে নিজেই তাঁহার চরণে বিক্রীত হইয়া বসে। প্রেমিক অবধূতের প্রেম যেমন অতি-মানুষিক, তাঁহার এই প্রচার পদ্ধতিও তেমনি অভিনব। ভাগীরথীর দুই তীরে এমনিভাবে হরিনাম-প্রেমের মহোৎসব তিনি জাগাইয়া তোলেন।

দিক্‌বিদিকে সংবাদ রটিয়া যায়, পতিতপাবন রূপে গৌড়দেশে নিত্যানন্দের প্রকাশ ঘটিয়াছে। আচণ্ডালে নাম-প্রেমসুধা বিতরণ করিয়া তিনি জীবের উদ্ধার সাধন করিতেছেন। অলৌকিক তাঁহার শক্তি, অপরিমেয় তাঁহার জীবপ্রেম, আর প্রভু চৈতন্যের তিনি দ্বিতীয় কলেবর। দলে দলে লোক প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এই বিরাট পুরুষকে দর্শনের জন্য ভীড় জমায়।

প্রেম সরোবরে নিতাই সদা ভাসমান—প্রেম-রসেরই তরঙ্গভঙ্গে তিনি সদা টলমল। হৃদপদ্মে তাঁহার নব নব ভাবের দল বিকশিত হইয়া উঠে, উদ্বোধন ঘটে নব নব লীলারঙ্গের।

সর্ব্বত্যাগী এই অবধূতের হঠাৎ কি এক খেয়াল হয়, মনোহর নাগর সাজে তিনি সজ্জিত হইবেন, সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া দেশের যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইবেন। এই অদ্ভুত ইচ্ছা জাগিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে বসনভূষণ সংগ্রহে দেরী হইল না। এমনিতেই দেহখানি সুগৌর সুঠাম, এবার নীল বসনে মণ্ডিত হইয়া এটি আরও নয়নাভিরাম হইয়া উঠিল। কণ্ঠে তাঁহার রত্নহার, হস্তে সুবর্ণ বলয়, অঙ্গুলি কয়টিতে রত্ন খচিত অঙ্গুরীয়—চরণে রমণীয় রৌপ্য নূপুর। অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, ললাটে অঙ্কিত তিলক চিহ্ন, আর গলে বিলম্বিত রহিয়াছে মল্লিকা-মালতীর শুভ্র সুগন্ধ মালা। এই দিব্য রূপ, এই মোহন সাজ, আর তাঁহার নৃত্যের ছাঁদ একবার যে দেখে সে মোহিত হয়। নিত্যানন্দের ভুবনমঙ্গল নামকীর্ত্তন একবার যে শ্রবণ করে—মন প্রাণ তাঁহার চিরতরে বাঁধা পড়িয়া যায়।

তাঁহার পারিষদ দলও কম রঙ্গিয়া নন। মনোহর ব্রজরাখাল বেশে তাঁহারা সদাই সজ্জিত থাকেন। বসন ভূষণের পারিপাট্য তাঁহাদেরও যথেষ্ট। গলে গুঞ্জামালা, হাতে শিঙ্গা, বেত্র ও বংশী নিয়া তাঁহারা শহরে জনপদে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ান। এই পরিকরদের এক একটি যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, অলৌকিক প্রেম ও শক্তির নানা প্রকাশ দেখাইয়া, ভক্তিরসের প্রবাহ উদ্বেলিত করিয়া সারা গৌড় দেশে তাঁহারা চাঞ্চল্য তুলিয়া দিলেন।

খড়দহ প্রভৃতি অঞ্চল পরিক্রমা করিয়া নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে উপনীত হন। এখানে ত্রিবেণীর ঘাটে পরম ভক্ত উদ্ধারণ দত্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। সাক্ষাৎ মাত্রই ঘটে তাঁহার আত্মসাৎ। উদ্ধারণ সর্ব্বমনপ্রাণ নিত্যানন্দের চরণে নিবেদন করেন, অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি হন তাঁহার পার্শ্বচর। সপ্তগ্রামে নিরন্তর অবধূতের নর্ত্তন-কীর্ত্তন ও আনন্দলীলা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

এখানকার বণিকসমাজের নেতা হইতেছেন উদ্ধারণ দত্ত। ইঁহারই প্রভাবে গৌড়ীয় বণিকেরা নিত্যানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়। বাংলার হিন্দুসমাজে ইহারা তখনও জলচল ছিল না। নিত্যানন্দ ইহাদের নূতন মর্য্যাদা দান করিলেন, নবধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে সুবর্ণ বণিকেরা হইয়া উঠিল তাঁহার পরম সহায়ক।

নাম-প্রেমের ঝঙ্কারে সপ্তগ্রাম অঞ্চল মাতাইয়া তুলিয়া নিতাই শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার দর্শনে অদ্বৈতের আনন্দের অবধি রহিল না। সোৎসাহে দুই বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে তিনি আলিঙ্গনে করিলেন। ভাবমত্ত দুই মহাপ্রেমিকের হুঙ্কারে ও ক্রন্দনে শান্তিপুরে সেদিন এক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা হইল।

বৃদ্ধ আচার্য্য অদ্বৈত প্রভুর কণ্ঠে সেদিন নিত্যানন্দের স্তুতি উচ্চারিত হইতে শোনা যায়—

তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তি
নিত্যানন্দ নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি
চৈতন্যের গুণগ্রাম॥
সর্ব্বজীব পরিত্রাণ
তুমি মহা সেতু।
মহাপ্রলয়েতে তুমি
সত্য-ধর্ম্ম সেতু॥
তুমি সে বুঝাও
চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্য-বৃক্ষে
ধর পূর্ণ শক্তি॥
(চৈঃ ভাঃ)

নবদ্বীপের ভক্তেরা মাঝে মাঝে নিত্যানন্দের দর্শন পান এবং আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন, গৌর-লীলাভূমিতে প্রেমভক্তি রসের

নূতন জোয়ার জাগিয়া উঠে। প্রধানত মহাবলী নিত্যানন্দের প্রেরণাতে গৌরাঙ্গ ভজন বিস্তার লাভ করিতে থাকে।

একবার নিত্যানন্দ নবদ্বীপে হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিত দরিদ্র হইলেও বড় শুদ্ধসত্ত্ব ও ভক্তিমান। পরম আগ্রহে অবধূত নিত্যানন্দের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। নিজে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব হইলে কি হয়, এসময়ে তাঁহার গৃহের উপরই পড়ে ডাকাতদের দৃষ্টি। নিত্যানন্দের বেশভূষায় খুব আড়ম্বর। কণ্ঠে ও হাতে পায়ে রহিয়াছে নানা সোনা রূপার অলঙ্কার। ভক্তদের উপহারও ভারে ভারে কম আসিতেছে না। অবশ্য এসব কোন কিছুতেই নিত্যানন্দের হুঁস নাই। দিনরাত নামপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন।

এই ডাকাতদলের নেতা এক তরুণ ব্রাহ্মণ। নরহত্যা গৃহদাহ প্রভৃতি এমন কোন কুকাজ নাই যাহা করিতে সে পশ্চাদপদ হয়। দলবল সঙ্গে নিয়া এক রাত্রিতে সে হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহের পিছনে লুকাইয়া থাকে। সুযোগ মত নিত্যানন্দকে মারিয়া তাঁহার অলঙ্কার ও টাকাকড়ি সে লুট করিবে।

রাত্রি তখনও গভীর হয় নাই। ডাকাতেরা ঠিক করিল, মধ্যরাত্রে তাহারা আক্রমণ শুরু করিবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে কেমন এক অদ্ভুত ঘুমে সবাই অচেতন হইয়া পড়ে। এ রহস্যময় ঘুম টুটিয়া যায় ভোরবেলায়, তখন সূর্য্যালোক ছড়াইয়া পড়িতেছে। তখন তাড়াতাড়ি তাহারা সরিয়া পড়ে।

দস্যুদলের জেদ কিন্তু বাড়িয়া যায়। আবার একদিন তাহারা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়া সেখানে হানা দিতে আসে। কিন্তু কি বিস্ময়কর ব্যাপার! বাড়ীর চারিদিকে এবার কাহারা পাহারা দিতে শুরু করিয়াছে। দীর্ঘ সুঠাম সুন্দরবপু এই রক্ষীদল, আর ইহাদের হাতেও রহিয়াছে নানা মারাত্মক অস্ত্র। এদিনও লুণ্ঠনের সুযোগ হইল না। ভীত হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয়দিন নিশাযোগে আবার তাহারা আসিয়া উপস্থিত। সোর-

গোল করিয়া অঙ্গনে ঢুকিবামাত্র দেখা গেল কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে তাহাদের সকলেরই দৃষ্টিশক্তি হঠাৎ লোপ পাইয়া বসিয়াছে। ভীত বিভ্রান্ত ডাকাতদের নিজেদের মধ্যেই জড়াজড়ি হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। ইহার উপর আবার আরম্ভ হয় প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি। অতিকষ্টে পথ হাতড়াইয়া কোনমতে তাহারা পণ্ডিতের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

এবার দস্যুদের সত্যই ভয় হইয়াছে। নাম কীর্ত্তনে প্রমত্ত এই নিত্যানন্দটি তবে তো নিতান্ত সাধারণ সাধক নন। নিশ্চয় তাঁহারই শক্তিবলে এ তিন দিন এত কিছু অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাগ্যে তাহাদের প্রাণ যায় নাই। দস্যু দলপতি তাঁহার অনুগামীদের সহ নিত্যানন্দের চরণে আসিয়া আত্মসমর্পণ করে। এ কয় দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া সে বলে, "প্রভু, আমি মহাপাষণ্ড, আপনার অলঙ্কারের লোভে পড়ে পণ্ডিতের বাড়ী লুঠ করতে এসেছিলাম। আমার পাপের আর সীমা নেই। আপনি কৃপাময়, এ অধমকে চরণে স্থান দিন।"

দস্যু ব্রাহ্মণটিকে আলিঙ্গন করিয়া অবধূত নিত্যানন্দ কহিলেন, "বাবা, তোমায় ক্ষমা করবো না তো করবো কাকে? তুমি যে মহা ভাগ্যবান। কৃষ্ণ কৃপার ফলে তুমি কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ এই তিন দিন এমন করে দেখতে পেয়েছো। এ বস্তু ক'জনের চোখে পড়ে, ভাই? তুমি এবার লুণ্ঠন আর নরহত্যা ছেড়ে দিয়ে পাষণ্ডদের ধর্ম্মপথে টেনে নিয়ে এসো।"

আপন গলার মালাটি দস্যুদলপতির কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া দয়াল নিতাই তাঁহাকে সানন্দে জড়াইয়া ধরেন। নিত্যানন্দের প্রসাদে উত্তরকালে সে এক পরম ভাগবত রূপে পরিণত হয়, অশ্রুকম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইতে থাকে।

গৌড়ে আসিবার পর হইতে নিত্যানন্দ যে সব বৈপ্লবিক কাণ্ড শুরু করেন তাহাতে চারিদিকে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। সুবর্ণবণিকেরা

গৌড়ীয় সমাজে তখন অপাংক্তেয় ছিল, তিনি তাঁহাদের কোলে তুলিয়া নেন। বণিক উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন মহাভক্ত, ইঁহারই উপর ছিল নিত্যানন্দের ভোগ রন্ধন ও সেবার ভার। বৈষ্ণবীয় উদারতা ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান নিত্যানন্দ, অব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদেরও ধর্ম্ম-গুরুর ভূমিকা গ্রহণের অধিকার দেন। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, নিরক্ষর, অন্ত্যজ হিন্দু তাঁহার কৃপায় শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবে পরিণত হয়। সমকালীন সমাজের অনুদারতা, প্রাণহীন ধর্ম্মাচরণ ও অজস্র বিধি-নিষেধের নিগড় ভাঙ্গিয়া নিতাই আনয়ন করেন নূতনতর মুক্তির প্রাণপ্রবাহ।

অগণিত লোক তাঁহার এই উদ্দীপনা ও মুক্তিমন্ত্রে সেদিন মাতিয়া উঠে, উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গোঁড়া ব্রাহ্মণদের বিরোধিতাও এ সময়ে তাঁহাকে কম সহ্য করিতে হয় নাই। নিতাইর নামে তাঁহারা নানা নিন্দাবাদ ও কলঙ্ক রটাইতে ছাড়েন নাই। একদল বৈষ্ণবও তাঁহাকে ভুল বুঝিতে আরম্ভ করে। শুধু তাহাই নয়, নিত্যানন্দের সাজসজ্জার পারিপাট্য, তাঁহার রঙ্গীন ও মনোহর ক্ষৌম বস্ত্র, অঙ্গের অলঙ্কারও একদল লোকের নিন্দা-সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠে।

প্রভুর দর্শনের জন্য নিতাই সেবার নীলাচলে গিয়াছেন। সেখানে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার বড় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। সবাই জানে, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী চৈতন্য-প্রভুর প্রধান অনুগামী তিনি। কিন্তু আপন প্রেমাবেশ ও আনন্দে মত্ত হইয়া একি চঞ্চলের ন্যায় ব্যবহার তিনি করিতেছেন? বৈরাগ্য ও অবধূতবৃত্তি তো অনেক দিন হইল বিসর্জ্জন দিয়াছেন। উত্তম বেশভূষায় সাজিয়া সদাই তিনি আনন্দরঙ্গে দিন কাটাইতেছেন। এজন্য সমাজের ও সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোকের সমালোচনাও তাঁহাকে মাঝে মাঝে সহ্য করিতে হয়।

পুরীধামের প্রান্তে একটি ফুল বাগিচায় নিতাই সেদিন বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন। বেশ কিছুটা ভয়ও হইয়াছে—প্রভু এবার তাঁহাকে কিভাবে গ্রহণ করিবেন, তাঁহার প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের পদ্ধতি

ও আচার আচরণ সম্বন্ধে তিনি কি মনোভঙ্গী অবলম্বন করিবেন, তাহা কে জানে?

সদানন্দময় নিত্যানন্দ মনোদুঃখে, একাকী চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, একথা প্রভুর কানে পৌঁছিল। ভক্তবৎসল প্রভু তখনি দলবল সহ সেখানে ছুটিয়া আসিলেন।

এখানে তিনি এক বিচিত্র কাণ্ড করেন। নিত্যানন্দকে মুখে কিছু না বলিয়া যুক্তকরে প্রভু তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। ভক্তেরা তখন দলে দলে আসিয়া চারিদিকে ভীড় জমাইয়াছে। চৈতন্য সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া নিতানন্দের স্তুতি গাহিতে শুরু করিলেন। কিন্তু এ যে বড় অসহনীয় দৃশ্য! নিত্যানন্দ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বিহ্বল হইয়া প্রভুর সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ছাড়িয়ে তুমি আমায় এ কি অবস্থায় রাখলে? আমি আমার ভাব-স্রোতে স্বেচ্ছামতই চলেছি। আমার আচার আচরণ, আমার বেশভূষা দেখে কতজনে কত পরিহাস ও বক্রোক্তিও করে। আমার প্রকৃত কর্ত্তব্য কি তা তুমি এবার আমায় বলে দাও।"

নিত্যানন্দকে প্রবোধ দিয়া প্রভু কহিতে লাগিলেন, "শ্রীপাদ, তুমি কি জান না, তুমি সঙ্কল্প করে আমায় যা করাও তাই আমি করে থাকি। আর তোমার মত মহামুক্ত পুরুষের আচরণে আবার নিন্দনীয় কি থাকতে পারে? তোমার দেহে যে অলঙ্কার শোভা পাচ্ছে সে যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিরই প্রতীক। তুমি আপামর জনসাধারণে যে ভক্তিসম্পদ বিতরণ করে যাচ্ছো তার তুলনা কোথায়? জীব উদ্ধারে তুমি অবতীর্ণ, সাধারণ বিধিবিধান তো তোমার জন্য নয়।"

ত্রিজগতে এই প্রভু ব্যতীত নিতাইর আর কে আছে? এই প্রভুর চরণেই যে তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাই তাঁহার এ প্রবোধ বাক্যে নিতাই স্থির হইয়া উঠিয়া বসিলেন, শান্ত হইলেন।

গদাধরকে নিত্যানন্দ বড় ভালবাসেন। গৌড় হইতে নীলাচলে আসিলেই তিনি তাঁহার সেবা-কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হন, উভয়ের মিলনে অপূর্ব্ব আনন্দ তরঙ্গ উত্থিত হয়। গদাধরের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ গোপীনাথের জন্য এবার তিনি গৌড়ের সূক্ষ্ম আতপ চাল ও রঙ্গীন বস্ত্র আনিয়াছেন। টোটাগোপীনাথে উপস্থিত হইয়া নিতাই আদেশ দেন, "গদাধর, আজ তোমার মনোমত করে প্রভুর ভোগ লাগাও।"

গদাধর পরম উৎসাহে উদ্যোগ আয়োজনে লাগিয়া যান। উৎকৃষ্ট ভোগান্ন প্রস্তুত হয় এবং উহা শ্রীগোপীনাথকে ভক্তিভরে নিবেদন করা হয়।

হঠাৎ দ্বারদেশে মধুর কণ্ঠের ধ্বনি শোনা যায়, 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ'। চৈতন্য প্রভু হাসিতে হাসিতে এ সময়ে গোপীনাথ মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত। গদাধর ত্রস্তে ছুটিয়া গিয়া দণ্ডবৎ হইলেন। প্রভু স্মিতহাস্যে কহিলেন, "গদাধর, তোমার এ কি আচরণ, বলতো? আজ এই আনন্দের দিনে আমায় তুমি ভিক্ষা নেবার জন্য বল নি? শ্রীপাদ নিত্যানন্দ এনেছেন ভোগের উপকরণ, পরম নিষ্ঠাভরে তা রন্ধন করেছ তুমি, আর শ্রীগোপীনাথের মুখামৃতের স্পর্শ রয়েছে এ প্রসাদে। এতে আমার ভাগ যে নিশ্চয়ই রয়েছে।"

নিত্যানন্দ দর্শনে গদাধর ও অন্যান্য ভক্তদের যে আনন্দ হইয়াছে প্রভুর আগমনে তাহা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

নিতানন্দ নীলাচলে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর চৈতন্য তাঁহাকে একদিন নিভৃতে নিকটে ডাকাইয়া আনেন। প্রভুর আয়ত নয়ন দুইটি করুণায় ছলছল, কণ্ঠে মিনতির সুর। মৃদু স্বরে কহেন, "শ্রীপাদ, আর কেন এভাবে সময় ক্ষেপণ করছো? জীব উদ্ধারের জন্য, সমাজকে ধারণ করে রাখবার জন্য অবিলম্বে তোমার দারপরিগ্রহ করা প্রয়োজন। তোমার গৃহজীবনকে কেন্দ্র করে, তোমার বংশের ধারাকে অবলম্বন করে, গৃহে গৃহে বৈষ্ণব জীবন গড়ে উঠুক—তোমার প্রচারিত নামগানে সবাই নূতন মানুষ হয়ে উঠুক। আমি তো বিবাগী, সংসারত্যাগী হয়ে রয়েছি। জীব উদ্ধারের জন্য জী-

জীবনের বন্ধন স্বীকার—এ যে তোমাকেই করতে হবে। আর দেরী নয়, তুমি আজই গৌড়ে চলে যাও।”

নিতাই একথায় ক্ষুণ্ণ হন। উত্তরে বলেন, “প্রভু, ছলনার তোমার অন্ত নেই। নিবেদিতপ্রাণ ভক্তদের বিচ্ছেদের আগুনে জ্বালিয়ে মারতেই যেন তোমার পরম আনন্দ। বেশ, আমি তোমার দেওয়া দুঃখকেই মাথা পেতে নিলাম। কিন্তু সত্য করে আজ বল, তোমার সাক্ষাৎ আমি কখন্ কিভাবে পাবো।”

প্রভুর অধরে দেখা দেয় স্মিত হাসির আভা। চৈতন্যের যিনি অভিন্নহৃদয়, অভিন্ন কলেবর বলিয়া পরিচিত তাঁহার মুখে বহিরঙ্গ দর্শনের এ ব্যাকুলতা কেন? কিন্তু নিতাইকে আশ্বস্ত করিয়া অবিলম্বে গৌড়ে না পাঠাইলেও চলিবে না—

প্রভু কহে প্রতিবর্ষে এখানে আসিবা।
ইচ্ছামাত্র আমাকে যে দেখিতে পাইবা॥
তোমার নর্ত্তনে আর মাতার রন্ধনে।
নিঃসন্দেহে আমারে পাইবে দুইস্থানে॥
(নিঃ বংশবিস্তার)

অতঃপর আরম্ভ হয় উভয়ের প্রেমার্ত্তি ও ক্রন্দন। নয়নাশ্রুর ধারায় বসন তিতিয়া যায়। কৃষ্ণকথার রসভুঞ্জনে, আর নিজ নিজ মর্ম্মকথার উদ্ঘাটনে সারারাত্রি অতিবাহিত হয়।

প্রভাতে উঠিয়া চৈতন্য ও নিত্যানন্দ সমুদ্র স্নান সমাপন করেন—উভয়ে মিলিয়া দর্শন করেন দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ। সেই দিনটি হইতে দেখা দেয় চৈতন্য প্রভুর বিরাট ভাবান্তর। ভক্তদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া নিমজ্জিত হন কৃষ্ণ বিরহের মহাসাগরে। ভক্তকবি বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ভাষায়—

সেদিন হইতে প্রভুর
হৈল কোন্ দশা।
নিরন্তর কহে কৃষ্ণ
বিরহের ভাষা॥

চৈতন্য এইদিন হইতে প্রবেশ করিলেন গম্ভীরার গর্ভে। আর তাঁহার প্রতিনিধি নিত্যানন্দ বাহির হইলেন সমাজ-জীবনের উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে—প্রেমধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম ধারক ও বাহকরূপে। চৈতন্যের শক্তি যেন অবধূতের জীবনে নূতন করিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে—নব প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম আজ তাঁহার মধ্যেই যেন হইয়াছে বিগ্রহীভূত।

নিত্যানন্দ সেবার পানিহাটিতে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে আসিয়াছেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি ও উল্লাসের অন্ত নাই। সেদিন নদীতীরে এক গাছের নীচে পার্ষদদের নিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। এমন সময় এক তরুণ আসিয়া তাঁহার চরণে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানায়। সেবকেরা কহেন, "প্রভু, ইনি সপ্তগ্রামের জমিদারের পুত্র রঘুনাথ। আপনার কৃপাপ্রার্থী হয়ে এসেছেন।"

রঘুনাথের কথা নিত্যানন্দ শুনিয়াছেন। এই বৈরাগ্যবান্ ভক্ত ইতিপূর্ব্বে শান্তিপুরে চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রভু ইহাকে আশীর্ব্বাদ করেন, কিন্তু আরও কিছুকাল সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে উপদেশ দেন। সেই দেবদুর্লভ মূর্ত্তি দর্শনের পর হইতে ভক্ত রঘুনাথের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, কবে সংসার ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণতলে আশ্রয় লাভ করিবেন, সেই চিন্তায়ই দিন গুণিতেছেন।

দয়াল নিতাইচাঁদের কথা, তাঁহার জীবোদ্ধার লীলার নানা কাহিনী, রঘুনাথদাস শুনিয়াছেন। চৈতন্যপ্রভুর এই প্রতিভূকে দর্শনের অভিলাষ তাঁহার বহুদিন হইতেই হইয়াছে। আজ সুযোগ পাইয়া এখানে ছুটিয়া আসিয়াছেন।

পরম ভক্ত রঘুনাথের আগমনে নিত্যানন্দের অন্তর প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠে। রঘুনাথ কিন্তু ইতিমধ্যে সরিয়া গিয়া দৈন্যভরে দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নিতাই তাঁহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আনেন, পদদ্বয় করেন তাঁহার শিরে সংস্থাপন। তারপর কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহেন "হাঁরে চোরা, তুই নিকটে না এসে এতদিন দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্ কেন? আয়, আজ আমি তোর দণ্ড

বিধান করবো। আমার সব ভক্তদের, সব বৈষ্ণবদের তুই দই-চিড়ে ভোজন করিয়ে দে তো।"

এ যে রঘুনাথের পরম সৌভাগ্য। এ আদেশ যে প্রভু নিতাইর দণ্ডদান নয়, এ তাঁহার বরদান। সমকালীন গৌড়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমিদারের সন্তান রঘুনাথ, ধনজনের তাঁহার অভাব নাই। নির্দেশ দেওয়া মাত্র অমনি দিকে দিকে লোক ছুটিয়া যায়। অবিলম্বে চিড়া মহোৎসবের সমস্ত কিছু উপকরণ সংগ্রহ করা হয়।

ভারে ভারে চিড়া, দধি, গুড়, কলা ও মিষ্ট দ্রব্যাদি আসিয়া উপস্থিত। পানিহাটির গঙ্গাতীরে বৈষ্ণব-সমাজের আনন্দমেলা বসিয়া গেল। লক্ষ লোকের সমাবেশ সেখানে, আর চারিদিকে কেবল দীয়তাং ভুজ্যতা রব। ঘনিষ্ঠ পরিকরদের সঙ্গে নিত্যানন্দ তাঁহার এই পুলিন-ভোজন রঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন।

শুনা যায়, মহাবলী নিতাই সেদিনকার এই মহোৎসবে মহাপ্রভু চৈতন্যকেও আকর্ষণ করিয়া আনেন—চিড়া, দধি তাঁহাকে ভোজন করান। কয়েকটি ভাগ্যবান্ ভক্ত সেদিন গৌর ও নিতাই এই দুই প্রভুর লীলাকৌতুকী রূপ দেখিয়া ধন্য হন।

পুলিন ভোজনের পর শুরু হয় রাঘব পণ্ডিতের গৃহে নৃত্য ও কীর্ত্তন। নিত্যানন্দ আজ যেন প্রেমতরঙ্গভঙ্গে উদ্বেল। মনের আগলটি কোন্ মুহূর্ত্তে খুলিযা গিয়াছে। রাঘবের গৃহে তিনি সেদিন আরো একটি অলৌকিক লীলা বিস্তারিত করিলেন।

উদ্দণ্ড কীর্ত্তনের পর প্রসাদ গ্রহণের ডাক পড়ে। নিত্যানন্দের আসনের দক্ষিণে স্থাপন করা হইয়াছে চৈতন্য প্রভুর জন্য এক আসন। রাঘব পণ্ডিত সবিস্ময়ে দেখেন, নিত্যানন্দের পাশে প্রভু চৈতন্যও প্রসাদ পাইতে বসিয়া গিয়াছেন। কোথায় সুদূর নীলাচল আর কোথায় পানিহাটি! ভক্তের আকর্ষণ প্রভুকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে, আর অলৌকিক দিব্যদেহ ধরিয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। দুই প্রভুর ভোজনাবশিষ্ট তুলিয়া নিয়া রাঘব পণ্ডিত ভক্ত রঘুনাথকে অর্পণ করিলেন।

পরদিন গঙ্গাস্নানের পর নিত্যানন্দ সাঙ্গোপাঙ্গসহ কৃষ্ণকথা শুরু করিয়াছেন। রঘুনাথ এসময়ে দীনভাবে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, বামন হয়ে আমার চাঁদ ধরবার সাধ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণ পেতে আমি অভিলাষী হয়েছি। কিন্তু বার বারই আমার যাত্রাপথে বাধা এসে পড়ছে।"

"রঘুনাথ, তুমি যে মহাভক্ত। বাধা পেয়ে তুমি পশ্চাদ্পদ হবে কেন? আরো দৈন্য, আরো আর্ত্তি নিয়ে এগিয়ে পড়।"

কিন্তু অভিজ্ঞ বৈষ্ণবদের কাছে রঘুনাথ যে শুনেছেন, নিতাইর কৃপা না হলে গৌরকৃপা লাভ করা বড় কঠিন। তাই তাঁহার কৃপার জন্য সর্ব্বসত্তা আজ উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—

তোমার কৃপা বিনা কেহ
চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তারে
অধমেও পায়॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন
করিতে করো ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঁই
হইয়া সদয়॥
মোর মাথে পদ ধরি
করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাই,
কর আশীর্ব্বাদ॥

রঘুনাথের শিরে চরণ রাখিয়া নিত্যানন্দ তাঁহাকে আশিস্ প্রদান করিলেন। সঙ্গীয় পার্ষদদের কহিলেন, "ভক্ত রঘুনাথের বিষয়-বাসনা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর, প্রার্থিত চৈতন্যপদ সে যেন অচিরে প্রাপ্ত হয়।"

মুমুক্ষু রঘুনাথের দুই নয়নে তখন অঝোর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে। নিত্যানন্দ সস্নেহে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহেন, "রঘুনাথ, তুমি যে মহাভাগ্যবান্। তোমার প্রতি কৃপা করে গৌরসুন্দর নীলাচল থেকে এসে পুলিন-ভোজনে যোগ দিয়েছিলেন, তোমার মহোৎসবের দধি চিড়া তিনি ভোজন করেছেন, রাত্রে আমাদের পংক্তিতে বসে প্রসাদ ভক্ষণও বাদ দেন নি। তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে এমন করে যিনি ছুটে আসতে পারেন, তিনি কি তোমার বিষয়-বন্ধন মোচন করতে পারেন না? ভয় নেই। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, শীগ্‌গীরই তুমি চৈতন্যচরণ পাবে, তাঁর অন্তরঙ্গ পরিকর রূপে অবশ্য গণ্য হবে।"

নিত্যানন্দের কথায় রঘুনাথ আশ্বস্ত হন, ভক্তদের চরণ বন্দনা করিয়া তিনি সপ্তগ্রামে চলিয়া যান। নিত্যানন্দের পুণ্যস্পর্শ পাইবার পর হইতে রঘুনাথের বিষয়-বিরক্তি চরমে উঠে। এ সময় হইতে তিনি বাড়ীর ভিতরে যান নাই, শয়ন মন্দিরেও প্রবেশ করেন নাই। যে কয়দিন সংসারে ছিলেন, বহির্ব্বাটিতে চণ্ডীমণ্ডপে বাস করিতেন, কৃষ্ণনাম জপ আর গৌরাঙ্গ চরণের ধ্যানে থাকিতেন সদা নিবিষ্ট। নিত্যানন্দের কৃপায় অচিরে এই বৈরাগ্যবান্ সাধক লাভ করেন দুর্লভ চৈতন্যচরণ।

সপ্তগ্রামের জমিদার পুত্র রঘুনাথের এই রূপান্তরের মধ্য দিয়া সেদিন নিত্যানন্দের মহিমা নূতন করিয়া ঘোষিত হয়। এই সঙ্গে সারা গৌড়দেশের বৈষ্ণব সংগঠনও দৃঢ়তর ও বিস্তৃততর হয়। নিত্যানন্দ ও ভক্ত রঘুনাথের অনুষ্ঠিত এই চিড়া মহোৎসবের স্মৃতি দীর্ঘকাল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উদ্দীপিত করিয়াছে। আজিও এদেশে উহার স্মৃতি ম্লান হয় নাই।

নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে নিত্যানন্দ সেবার অম্বিকা কাল্‌নায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সঙ্গে প্রিয় শিষ্য ও সেবক উদ্ধারণ দত্ত।

চৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্ত গৌরীদাস পণ্ডিতের বাস এই নগরে। পণ্ডিতের ভ্রাতা সূর্য্যদাস তৎকালীন রাজসরকারের এক বিশিষ্ট কর্ম্মচারী, সজ্জন ও ভক্তিমান্ বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি সে অঞ্চলে যথেষ্ট। বসুধা ও জাহ্নবী নামে তাঁহার বিবাহযোগ্যা দুইটি কন্যা রহিয়াছে। উভয়েই সুলক্ষণা ও রূপবতী।

নিতাই বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করুন, ইহাই চৈতন্যপ্রভুর ইচ্ছা। তাই নিতাই নিজ সিদ্ধান্তও এবার তিনি স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে আসার পর কন্যার সন্ধানও পাওয়া গেল। পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠা কন্যা বসুধার পাণিপ্রার্থী হইলেন নিত্যানন্দ।

বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দের তখন অতুল প্রতাপ। চৈতন্যের অভিন্নহৃদয় ভক্ত ও প্রতিনিধিরূপে সর্ব্বত্র তাঁহার অসামান্য মর্যাদা। সূর্যাদাস পণ্ডিতের কাছে তাঁহার এ প্রস্তাব মোটেই ফেলিবার মত নয়। কিন্তু পণ্ডিত বড় দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। সামাজিক বিধিনিষেধের গণ্ডি কি করিয়া অতিক্রম করিবেন ? অবধূত-জীবনে নিত্যানন্দ জাতি বিচার করেন নাই, যত্রতত্র আহার বিহার করিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহার হাতে কন্যা সম্প্রদান করিলে সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে যাইতে হইবে, জ্ঞাতি ও আত্মীয়স্বজনেরাও ইহা অনুমোদন করিতে চাহিবে না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সূর্য্যদাস পণ্ডিত যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু, আপনি উপযাচক হয়ে আমার গৃহে কন্যাপ্রার্থী, এ আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আপনি নিজেই বলুন, জাতিবর্ণ যিনি ত্যাগ করেছেন, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ হয়ে তাঁর ঘরে আমি কি করে কন্যা সম্প্রদান করবো ? আপনি আমায় মার্জ্জনা করুন।"

ভক্তসমাজের যুক্তিজাল, বণিকশ্রেষ্ঠ উদ্ধারণ দত্তের অনুনয় বিনয় কোন কিছুই সেদিন সূর্য্যদাস পণ্ডিতের সম্মতি আদায় করিতে পারিল না। এ বিবাহ-প্রস্তাব সম্বন্ধে সকলে হাল ছাড়িয়া দিলেন। নিত্যানন্দ এ বিষয়ে তখন আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই।

সেবক-ভক্ত উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে নিয়া তিনি গঙ্গাতীরে চলিয়া যান, এক নিভৃত কুটিরে বাস করিতে থাকেন।

এদিকে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে দেখা দিল এক আকস্মিক বিপদ। বসুধা এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, বহু চেষ্টায়ও তাঁহাকে নিরাময় করা যাইতেছে না। অবস্থা ক্রমে চরমে পৌঁছিল, মুমূর্ষু রোগিণীকে বাঁচানোর আর কোন উপায় নাই।

ভক্ত গৌরীদাস সেদিন সেখানে উপস্থিত। ভাইকে কহিলেন, "সব চেষ্টাই তো করলে, এবার প্রভু নিত্যানন্দকেই আহ্বান কর, তাঁর শরণাপন্ন হও। নইলে বসুধাকে বাঁচাবার কোন উপায় আমি দেখছিনে। আমার মনে হয়, অবধূতের কথা অগ্রাহ্য করায়, তাঁর অবমাননা করায়, এ বিপদ উপস্থিত হয়েছে।"

উপয়ান্তর নাই, সূর্য্যদাস অশ্রু সজল চোখে কহিলেন, "তবে তাই হোক, অবধূতের কাছে ক্ষমা চেয়ে, চরণ ধরে তাঁকে নিয়ে এসো। কন্যা যদি তাঁর কৃপায় জীবন পায় তবে তাঁর করেই তাকে সমর্পণ করবো।"

গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া নিত্যানন্দ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। সবাই তাঁহার কাছে গিয়া মার্জ্জনা চাহিলেন। মিনতি করিয়া তাঁহাকে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে নিয়া আসা হইল।

মুমূর্ষু বসুধার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবধূত নিত্যানন্দ সেদিন যে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখান তাহা বড় বিস্ময়কর। 'অদ্বৈত-প্রকাশ' গ্রন্থে ঈশান নাগর এ দৃশ্যের এক মনোরম বর্ণনা দিয়াছেন। নিত্যানন্দ কহিতেছেন—

এই কন্যায় যদি মুঞ
জীয়াইতে পারি।
তবে মোরে কন্যা দিবা
কহ সত্য করি॥
শুনিয়া পণ্ডিত কহে
আর বন্ধুগণ।

জীয়াইলে কন্যা দিব,
করিলাম পণ ॥
তাহা শুনি নিত্যানন্দ
আনন্দিত মনে।
মৃত সঞ্জীবন নাম
দিলা কানে ॥
হরিনামামৃত পিয়া
বসুধা উঠিলা।
অলৌকিক কার্য্যে সবে
বিস্ময় মানিলা ॥

বসুধা সুস্থ্য হইয়া উঠিলে সূর্য্যদাস সানন্দে নিতাইর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন ইহার কিছু দিন পরে পণ্ডিত তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা জাহ্নবীকেও তাঁহার করে অর্পণ করেন। চির উদাসীন, সর্ব্ব-পাশমুক্ত অবধূত চৈতন্য-কৃপায় হইয়া উঠেন প্রেমধর্ম্মের প্রধান উদ্গাতা—কৃষ্ণনাম রসের প্রধান ভাণ্ডারী। আবার সেই প্রভুরই প্রেরণায় এবার তাঁহাকে হইতে হয় সংসারী।

নিতাই এখন হইতে পত্নীদ্বয়সহ খড়দহে বাস করিতে থাকেন। এখানে প্রেমের ঠাকুর শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করিয়া গার্হস্থ্যের পরিমণ্ডলকে করিয়া তুলেন অমরার আনন্দ-কানন।

তাঁহার প্রথমা পত্নী বসুধা দেবীর গর্ভে পরম বৈষ্ণব বীরভদ্রের জন্ম হয়। খড়দহের গোস্বামীরা ইঁহাদেরই বংশের সন্তান-সন্ততি। দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবী দেবীর পোষ্যপুত্র রামাই গোস্বামী বিস্তারিত করেন আর এক গোস্বামী-শাখা। বাংলার সমাজ-জীবনের নানা স্তরে প্রেমধর্ম্মের প্রবাহ বেশ কিছুকাল নিত্যানন্দ ধারার এই গোস্বামীরা বিস্তারিত করিয়া যান।

নিতাই ভাবের মানুষ। ভাবপ্রমত্ত ঝঞ্ঝার মত কখনো তিনি সম্মুখের সমস্ত কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উড়াইয়া নিয়া যান, কখনো বা

অপার প্রেম ও করুণায় বিগলিত হইয়া সহস্রধারায় আপনাকে বিস্তারিত করিয়া দেন। সর্ব্বপাশমুক্ত অবধূতের জীবন আধারে দিনের পর দিন চলে প্রেমরসের এই অপরূপ লীলা। ভাবের মানুষ, রসের মানুষ নিতাইকে তাই অনেক সময় দেখা যাইত উদ্দাম ও স্বাতন্ত্র্যবাদী মহাপুরুষরূপে। কোন কোন কঠোরী, বৈরাগ্যবান্ সাধকের চোখে এ স্বাতন্ত্র্য, এ চাঞ্চল্য, কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকিত। এ সম্পর্কে নিন্দা সমালোচনাও মাঝে মাঝে দেখা দিত।

নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ ছিলেন চৈতন্যের সহপাঠী। প্রভুর এবং তাঁহার প্রেমধর্ম্মের তিনি খুব অনুরাগী। কিন্তু গৌড়ে আসিয়া নিতাই যে আচার আচরণ করিতেছেন তাঁহার মর্ম্ম তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। অচ্ছুৎ অন্ত্যজের হাতে ভোজন, তাহাদের নিয়া নাচানাচি, সর্ব্বোপরি স্বর্ণালঙ্কার ধারণ, মাল্য গন্ধ এবং বিলাসের উপকরণ ব্যবহার—এসবেরই বা তাৎপর্য্য কি? সেবার নীলাচলে থাকার সময়, সুযোগ বুঝিয়া একদিন এই ব্রাহ্মণ চৈতন্যের কাছে এসব কথা পাড়িলেন।

প্রভু সহাস্যে কহিলেন, "সে কি কথা ভাই, তুমি কি জান না, অধিকারী পুরুষ ও মহাসমর্থ সাধকেরা যে সর্ব্ব দোষগুণের অতীত। ভাগবতে ঠাকুর তো নিজেই বলেছেন—

ন ময্যেকান্তভক্তানাং
গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং
বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম।

—যাঁরা রাগাদি দোষ শূন্য, যাঁরা সকলের প্রতি সমদর্শী হ'য়ে প্রকৃতির অতীত হ'য়েছেন ও পরমেশ্বরকে পেয়েছেন—বিধিনিষেধ-জনিত পুণ্যপাপের সঙ্গে আমার সেই একান্ত ভক্তদের সম্পর্ক নেই।

সন্দিগ্ধচেতা ব্রাহ্মণটিকে প্রভু আরো স্পষ্টরূপে বলিয়া দিলেন, "ভাই, পদ্মপত্রে যেমন জল স্পর্শ করে না, আমার নিত্যানন্দেও তেমনি পাপের স্পর্শ লাগতে পারে না।"

সর্ব্বজন আরাধ্য প্রভুর কণ্ঠে নিত্যানন্দ মাহাত্ম্যের এই ব্যাখ্যা শুনে ব্রাহ্মণটির বিস্ময় চরমে উঠিল, তিনি নির্ব্বাক হইয়া গেলেন প্রভু বলিয়া চলিলেন—

নিত্যানন্দ স্বরূপ
পরম অধিকারী।
অল্প ভাগ্যে তাঁহাকে
জানিতে না পারি ॥
অলৌকিক চেষ্টা যেবা
কিছু দেখি তান।
তাহাতেও আদর করিলে
পাই ত্রাণ ॥
পতিতের ত্রাণ লাগি
তাঁর অবতার।
তাঁহা হৈতে সর্ব্বজীব
পাইবে উদ্ধার ॥
তাঁর আচার বিধি-
নিষেধের পার।
তাঁহারে বুঝিতে শক্তি
আছয়ে কাহার ॥

পরবর্ত্তীকালে প্রভু একবার গৌড় আগমন করেন। দিকে দিকে সেদিন ছড়াইয়া পড়ে এই আনন্দের বার্ত্তা। সহস্র সহস্র ভক্তের হৃদয়-সাগর প্রেমে ভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া ওঠে। জাহ্নবীর তীরে তীরে আনন্দের মেলা বসিয়া যায়। এই সময়ে পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের ভবনে বসিয়া প্রভু একদিন তাঁহার নিকট নিত্যানন্দতত্ত্ব বর্ণনা করেন। পণ্ডিতকে বলেন—

রাঘব তোমারে আমি
নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাই
নিত্যানন্দ বই ॥

এই নিত্যানন্দ যেই
করায়েন আমারে।
সে-ই করি আমি, এই
বলিল তোমারে॥
আমার সকল কর্ম্ম
নিত্যানন্দ দ্বারে।
এই আমি অকপটে
কহিল তোমারে॥
যে-ই আমি সে-ই নিত্যানন্দ
ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব
জানিবা হেথাই॥

প্রভু চৈতন্যের এই ইঙ্গিতপূর্ণ চাবি-কাঠিটি দিয়া রাঘব পণ্ডিত নিত্যানন্দতত্ত্বের মঞ্জুষা উন্মুক্ত করেন—গৌর ও নিতাইর অভেদত্ব তাঁহার সাধনসত্তায় স্ফুরিত হইয়া উঠে।

খড়দহকে কেন্দ্র করিয়া নিতাই তাঁহার প্রেম-ভক্তির রসস্রোত তখন দিকে দিকে ঢালিয়া দিতেছেন। সারা গৌড়দেশ জুড়িয়া তখন অপূর্ব্ব প্রাণ চাঞ্চল্য, প্রেমার্ত্তি ও উন্মাদনা। আপামর জনসাধারণ দয়াল নিতাইর জীয়নকাঠির স্পর্শে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রেমনাট্যের এ রঙ্গমঞ্চে নিতাইকে কিন্তু বেশী দিন ধরিয়া রাখা যায় নাই। ধীরে ধীরে এক দিব্য ভাবান্তর তাঁহার জীবনে আত্ম-প্রকাশ করিতে থাকে। কোথায় সে নিতাই যিনি 'মাতা হাতীর' মত নৃত্যের তাণ্ডবে ধরণী কম্পিত করিয়া তোলেন? প্রেমে বিগলিত অশ্রু ধারায় যিনি শত শত পাষণ্ডীকে অবলীলায় ভাসাইয়া নিয়া যান, তিনি আজ ধীরে ধীরে আপন মর্ম্মতলের কোন্ গোপন নীড়ে আশ্রয় নিতে যাইতেছেন?

ভক্ত ও পার্ষদদের অন্তরে এজন্য বিষাদের অন্ত নাই। নিত্যানন্দের

এই অন্তর্মুখীনতায় তাঁহারা বড় বেদনা পান, বড় অসহায় বোধ করেন।

ইহার পর গৌড়ীয়াদের জীবনে আসে চরম মর্ম্মান্তিক আঘাত্। নীলাচলধাম হইতে সংবাদ প্রেরিত হয় প্রভু শ্রীচৈতন্য ভক্তদের শোকসাগরে ভাসাইয়া অপ্রকট হইয়াছেন।

নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে আপনাকে আরও সংহত করিয়া নেন। প্রায়ই থাকেন বাহ্যজ্ঞানহীন। আর অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় উচ্চারিত হয় কেবল কৃষ্ণকথা আর গৌর-গুণগান।

বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের এ সময়কার এক আলেখ্য আঁকিতে গিয়া বলিয়াছেন—

চৈতন্য বিচ্ছেদে সদাই প্রভুর বিলাপ।
কদাচিৎ বাহ্য হইলে চৈতন্য আলাপ॥
কায়মনোবাক্যে সদা চৈতন্য ধেয়ায়।
উচ্চ শব্দ করি সদা গৌরাঙ্গ গুণ গায়॥
আপনে গৌরাঙ্গ গাই গাওয়ায় জগতে।
গৌরাঙ্গের গুণ গাও পাবে নন্দ স্নুতে॥

চিরদিনের আনন্দ-চঞ্চল নিতাই ক্রমে হইয়া উঠেন ভাবগম্ভীর এবং দুরবগাহ। নয়টি বৎসর এভাবে অতিবাহিত হয়।

১৪৬৪ শকাব্দের এক প্রভাত। শ্যামসুন্দর মন্দিরে মঙ্গলারতির পর নৃত্য ও কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইতেছে। অবধূত নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাতের জন্য অদ্বৈত প্রভু সেদিন খড়দহ মন্দিরে উপস্থিত। দুই প্রভুর মিলনে ভক্তদের আনন্দের অবধি নাই।

নিতাইও সেদিনকার কীর্ত্তনে দিব্য ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। ক্রমে দেখা দেয় মহাভাবের গাঢ় আবেশ। এ আবেশ সেদিন আর ভাঙ্গে নাই। সুমহান জীবনলীলার শেষ অঙ্ক সমাপ্ত করিয়া নিত্যানন্দ চিরতরে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। শুধু খড়দহে নয়, শুধু গৌড়ে নয়, সারা ভারতের ভক্তসমাজে নামিয়া আসে বিষাদের অন্ধকার।

ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষরূপে আবির্ভূত হন নিত্যানন্দ। তাঁহার প্রকাশ ঘটে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রধান সহকারীরূপে, প্রেমভক্তির উত্তাল রসতরঙ্গ তিনি দিকে দিকে উৎসারিত করেন। কর্ম্মমুখর লীলাচঞ্চল জীবনের চমকপ্রদ অধ্যায়গুলি একের পর হয় অতিক্রান্ত। যতটা নিজেকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেন, অনুদ্‌ঘাটিত থাকে তার চাইতে অনেক বেশী, যে পরিমাণে জীবকে তিনি কাঁদান, কাঁদিয়া যান তার চাইতে বহু গুণ। নিত্যানন্দের মর্ম্ম বুঝিতে গিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্তকবিকে তাই হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিতে হইয়াছে—

বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখান যারে সে দেখিতে পারে॥

বীরশৈব বসভেশ্বর

দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদে দক্ষিণ ভারতের কানাড়ায়, বর্ত্তমানের মহীশূরে, আবির্ভূত হন মহাসাধক বসভেশ্বর। ভক্তিধর্ম্মী শৈব-সাধনার এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেন এই সিদ্ধপুরুষ—সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সঞ্চারিত করেন উদার, সার্ব্বভৌম ও বৈপ্লবিক ধর্ম্মবোধ।

বসভেশ্বরের বীরশৈববাদ এবং তাঁহার সংগঠিত লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের অবদান এ দেশের ধর্ম্ম সংস্কৃতিতে আনিয়া দেয় নূতনতর মহিমা, নূতনতর সমৃদ্ধি। শুধু তাহাই নয়, জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির এক অপরূপ সমন্বয় সাধিত হয় এই সিদ্ধ শিবযোগীর ধ্যান-ধারণা, জীবন সাধনা ও ধর্ম্ম-আন্দোলনের ফলে।

১১০৫ খৃষ্টাব্দে কানাড়ার বাগওয়াড়ী[১] নামক স্থানে বসভেশ্বর ভূমিষ্ঠ হন। পিতা মাদিরাজ ছিলেন এই অঞ্চলের সরকারী প্রধান—'গ্রামনিমণি'। ধনবান্ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বসভের মাতার নাম মাদাম্বা। মহা ভক্তিমতী এই মহিলা নিজের দিনান্তের কাজ সমাপ্ত হইলেই রোজ তিনি নন্দীশ্বরের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হন, দীর্ঘ সময় শিবের পূজা ও ধ্যান-জপে কাটাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন।

কন্যা আক্কা নাগাম্মার জন্মের পর কয়েক বৎসর গত হইয়াছে, কিন্তু কোন পুত্রসন্তান এযাবৎ হয় নাই। জননী মাদাম্বার মনে তাই শান্তি ও স্বস্তি নাই, নন্দীশ্বরের মন্দিরে গিয়া প্রভুর কাছে বার বার সাশ্রুনয়নে নিবেদন করেন তাঁহার অন্তরের আকুতি।

১ দ্রঃ—ডঃ পি. বি. দেশাই : বসভ অ্যাণ্ড হিজ টাইমস, পৃঃ ১৬৮ ; আর. সি. সি কার্ : মনোগ্রাফ অন লিঙ্গায়েৎস, পৃঃ ৩ ; ই, থারস্টন : কাস্ট অ্যাণ্ড ট্রাইবস অব ইণ্ডিয়া, ভল্যু ৪, পৃঃ ২৩১।

দেবতা অবশেষে একদিন প্রসন্ন হইয়া উঠেন। মৃদু-মধুর কণ্ঠের দৈববাণী ধ্বনিত হয় মন্দিরের অভ্যন্তরে—"সুতপা মাদাম্বা, এমন করে আর তুমি অশ্রুপাত করো না। তোমার দুঃখ-রজনীর অবসান হবে এবার, কোল জুড়ে আসবে কুলপাবন পুত্র। শিবাংশে হবে তার জন্ম। শিব-আরাধনার নূতন পন্থা সে করবে উদ্ভাবন। শিবভক্ত মানুষের হবে দিক্-দিশারী—হাজার হাজার আর্ত, দীনজনের হবে আশ্রয় স্বরূপ।"

আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠেন মাদাম্বা। স্বামীর কাছে সোৎসাহে বিবৃত করেন এই অলৌকিক ঘটনার কথা।

দম্পতির আশা পূর্ণ হয়, বৎসরান্তে মাদিরাজের গৃহে ভূমিষ্ঠ হয় সুলক্ষণযুক্ত, প্রিয়দর্শন এক পুত্রসন্তান।

নন্দীমন্দিরের অধীশ্বরের কৃপায় জন্ম, তাই তাহার নাম রাখা হয়, বসভেশ্বর।[১]

মাদিরাজ গ্রামের প্রধান, বিত্ত-বিষয়ও তাঁহার যথেষ্ট। তাই এই পুত্রের জন্মকে কেন্দ্র করিয়া সেদিন তাঁহার ভবনে শুরু হয় আনন্দ উৎসব। আত্মীয়-কুটুম্বদের সাড়ম্বরে আপ্যায়ন করা হয় আর সেই সঙ্গে চলে দরিদ্রদের অন্ন বিতরণ।

গ্রামের উপান্তে রহিয়াছে নন্দীশ্বরের প্রাচীন মন্দির। কয়েকদিন হয় এখানে আশ্রয় নিয়াছেন জাতবেদমুনি নামে এক প্রখ্যাত শৈব সাধক।[২] সিদ্ধপুরুষ এবং শিবভক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা বলিয়া লোকে তাঁহাকে যথেষ্ট সমীহ করিয়া চলে। এই সাধক সেদিন আপনা হইতেই মাদিরাজের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। অভ্যর্থনা ও পদবন্দনার পর মাদিরাজ যুক্তকরে নিবেদন করেন, "প্রভু, আপনার সাধনস্থান পবিত্র কুড়ল-সঙ্গম ছেড়ে করে এখানে

---

১ কানাড়ী ভাষায় 'বসভ' শিবের বাহন বৃষভেরই প্রতিশব্দ।

২ লিংগিরাজ পুরাণ: ভল্যু ৭৪

এলেন তা তো জানিনে। যদি কৃপা করে দর্শন দিয়েছেনই আমার নবজাত পুত্রটিকে একটিবার আশীর্ব্বাদ করে যান।"

"বৎস, সেই জন্যেই যে আমার বাগওয়াড়ী গ্রামে আসা। আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন নেই। কোথায় তোমার নবজাত পুত্র ?"

শিশুটিকে তখনই মহাপুরুষের সম্মুখে নিয়া আসা হয়। বর্ষীয়ান সাধকের দুই চোখ দিব্য আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাড়াতাড়ি ঝুলি হইতে একটি ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ বাহির করিয়া বালকের কণ্ঠে তিনি স্পর্শ করান। অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করেন শিব মহিমার স্তোত্রমালা।

গৃহে সমাগত নরনারী সবাই বিস্মিত হইয়া মহাত্মার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছেন। এবার মাদিরাজের দিকে তাকাইয়া তিনি কহিলেন, "বৎস, তুমি পরম ভাগ্যবান্ তাই এ শিশু তোমার গৃহে আবির্ভূত হয়েছে। কয়েকটি দিব্য লক্ষণ রয়েছে এর অঙ্গে। দেখবে, উত্তরকালে এক শক্তিধর শৈব মহাপুরুষ বলে এ কীর্ত্তিত হবে। বহু সাধকজনের হবে পথ প্রদর্শক। ধ্যানযোগে এর সংবাদ আমি জেনেছি, তাই দ্রুতপদে চলে এসেছি এই গ্রামে।"

শিশুকে আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইয়া বৃদ্ধ সাধক ধীর পদে মাদিরাজের ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণের সন্তানকে উপনয়নের পর শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী হইতে হয়। পিতা তাই বসভেশ্বরের শিক্ষার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বালকের মেধা ও প্রতিভা অমানুষী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভৃতি একের পর এক সে আয়ত্ত করিতে থাকে। অভ্যাসমতো শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী থাকিলেও মনে কিন্তু তাহার তৃপ্তি নাই, প্রসন্নতা নাই। জন্মগত সংস্কার কেবলই তাহার মনকে উধাও করিয়া নেয় কোন্ এক অজানার আকর্ষণে। এই কচি বয়সেই সাধন-ভজন ও ধ্যান-ধারণার দিকেই মন বেশী ঝুঁকিয়া পড়িতে চায়।

বাগওয়াড়ীতে বহু অগ্রহার[১] ব্রাহ্মণের বাস। বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়া-কর্ম্মে ইঁহারা সবাই ছিলেন পারদর্শী। কিন্তু বালক বসভের কাছে কি জানি কেন এগুলি ছিল অর্থহীন ও প্রাণহীন বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। বরং ইহার চাইতে মাতুলালয় ইংগলেশ্বরের ভক্তিময় পরিবেশ আর শিবভক্ত সাধু সজ্জনদের সান্নিধ্য তাঁহার কাছে ছিল অনেক বেশী আকর্ষণীয়। বালক বয়সে মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁহাকে ইংগলেশ্বরে গিয়া বাস করিতে হইত। তাই এখানকার প্রভাব ছোটবেলা হইতেই তাঁহার জীবনে বড় হইয়া দেখা দেয়।

ইংগলেশ্বরের শিব বিগ্রহ রেবন-সিদ্ধেশ্বরের খ্যাতি বহুদিনের।[২] স্থানীয় জনসাধারণের পরম শ্রদ্ধার বস্তু এটি। একটি প্রাচীন গুহায় এ বিগ্রহটি অধিষ্ঠিত। পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে দূর-দূরান্ত হইতে শত শত নরনারী এই পবিত্র গুহায় আসিয়া সমবেত হয়, রেবন-সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের উদ্দেশে জানায় অন্তরের যত কিছু আকুতি। এই বিগ্রহের কাছে ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী নির্ধনের কোন ভেদ-বৈষম্য ছিল না। উদার সার্ব্বভৌম শিব সাধনা ছিল এখানকার বিশেষত্ব।

ইংগলেশ্বরের দিব্য মণ্ডপ বা মহামনে-তে জড়ো হইতেন দেশ-বিদেশের শৈব সাধু-সন্ন্যাসীরা, ইঁহাদের সান্নিধ্যে আসিয়া তত্ত্ব ও সাধনের উপদেশ নিয়া গৃহস্থ নরনারীরা উপকৃত হইত। বসভেশ্বরের মাতুল বলদেব এবং মাতা মাদাম্বা স্বভাবতঃই ভক্তিভরে এই সব সাধু সন্ন্যাসীদের সেবা-যত্ন করিতেন, ধন্য হইতেন তাঁহাদের উপদেশ ও কৃপালাভে। বালক বসভেশ্বরের মানসপটে এই সব শৈব সন্ন্যাসীর স্মৃতি চিরতরে মুদ্রিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই পরিবেশে তাঁহার জীবনে শিবভক্তির উদয় হয় অতি স্বাভাবিকভাবে।

বসভেশ্বর তখন অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। পিতা মাদিরাজ তাহার উপনয়ন সংস্কারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গ্রামের

১ বসভেশ্বরের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন অগ্রহার ব্রাহ্মণ, কাম্যকুল ও শাংখ্যায়ন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। (সিংগিরাজ পুরাণ—১২শ খণ্ড)

২ হরিহর : বসভরাজ দেবর রগলে, পৃঃ ১-১০

স্বগোত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সবাই অগ্রহার—যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠানে তাঁহারা দক্ষ ও উৎসাহী, আর এদিকে মাদিরাজও সমাজে ধনবান্ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। তাই উপনয়নের অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার সঙ্গে সামাজিক উৎসব-আনন্দও সেদিন কম দেখা গেল না।

অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যেই বালক বসভের জীবনে ঘটিয়া যায় চরম দুর্দ্দৈব। পিতা ও মাতা গৃহের সবাইকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। ইহার অল্প কিছুদিন পরেই জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নাগলাম্বের সঙ্গে বসভ চলিয়া যান তাঁহার মাতুলালয় ইংগলেশ্বরে। ফলে বসভেশ্বর কিছুদিনের মধ্যেই রেবন-সিদ্ধেশ্বরে সমাগত সাধকদের প্রভাব গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়েন।

শৈব সাধনার এক নূতনতর, উদারতর পন্থার দিকে অতঃপর তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন।[১]

মাতুল বলদেব রাজসরকারে কাজ করেন। বৎসরের বেশীর ভাগ সময় কল্যাণ শহরে (তৎকালীন মঙ্গলওয়াড়া) তাঁহাকে বাস করিতে হয়। তাই মাতামহীর অভিভাবকত্বে এবং আদরযত্নে তিনি ও তাঁহার ভগ্নী নাগলাম্ব লালিত হইতে থাকেন।

মাতামহী ছিলেন এক খ্যাতনামা শিবভক্তি-সিদ্ধা সাধিকা। স্থানীয় মহামনে বা ধর্ম্মসভায় যে সব সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন ঘটিত তাঁহারা সবাই এই বৃদ্ধা মহিলাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন; তাঁহার সেবা-যত্নে আপ্যায়িত হইতেন। বালক বসভও পরমানন্দে ঘোরা-ফেরা করিতেন এই সব সাধু-সজ্জনদের সঙ্গে। রেবন-সিদ্ধেশ্বর এখান হইতে খুব বেশী দূরে নয়। লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন

---

১ গবেষকদের মতে, বীরশৈব সম্প্রদায়ের পূর্ব্বসূরীরা রেবন-সিদ্ধেশ্বরের প্রভাবেই অনেকাংশে প্রভাবিত হন এবং বেদাচার বহির্ভূত শিব-আরাধনার এক নূতনতর বৈপ্লবিক ধারার প্রবর্তন করেন। উত্তরকালে বসভেশ্বর এই সাধকদের ধ্যান-ধারণাকেই রূপায়িত করেন।

সাধু-সন্ন্যাসী, বহু শক্তিধর সিদ্ধপুরুষ এ অঞ্চলে যাওয়া-আসা করিতেন। বেদাচারের বাহিরে এক সর্ব্বজনীন শিবভক্তির আন্দোলন ইঁহাদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেখানে গড়িয়া উঠিতেছিল।

এ অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শৈব তীর্থ কুড়ল-সঙ্গম খুব বেশী দূরে নয়। লিঙ্গায়েৎ সাধু ও শৈব যোগীদের কয়েকটি সিদ্ধ-গুহা ও সাধনকেন্দ্র প্রাচীনকাল হইতেই সেখানে রহিয়াছে। সেখানকার সাধকেরা অনেক সময় ইংগলেশ্বরের মহাসনে বা ধর্ম্মসভায় আসিয়া জুটিতেন। মাতামহী ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নাগলাম্বের সহিত বসভও এই সব সাধুদের সান্নিধ্য উপভোগ করিতেন প্রাণ ভরিয়া। শৈব ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধনক্রম তিনি এই সুযোগে শ্রদ্ধাভরে তাঁহাদের নিকট হইতে জানিয়া নিতেন।

ইংগলেশ্বরে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়। বসভ এবার পদার্পণ করেন ষোল বৎসরে। কৈশোর ও যৌবনের এই সন্ধিক্ষণেই তাঁহার জীবনে ফুটিয়া উঠে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মননশীলতা। শৈব ধর্ম্মের, বিশেষতঃ লিঙ্গায়েৎদের সর্ব্বজনীন উদার মতবাদের গভীরে প্রবেশ করার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া পড়েন।

বালককাল হইতেই ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক দিক্‌টি তাঁহাকে আকৃষ্ট করে নাই। বাগওয়াড়ীর আত্মীয়-স্বজনেরা খ্যাতনামা কর্ম্মকাণ্ডী পণ্ডিত। যে কোনো পূজা-পার্ব্বণে উৎসবে তাঁহারা বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড ও যাগযজ্ঞ নিয়া মাতিয়া উঠেন, ধর্ম্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠার চাইতে বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানই যেন তাঁহাদের কাছে বড় হইয়া উঠে। এ অনুষ্ঠানে আত্মিক সংবেদন তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ যে শুধু ধর্ম্মের প্রাণহীন কাঠামো বা খোলস নিয়া অকারণ মাতামাতি করা।

তরুণ বসভেশ্বরের অন্তর এবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসে। উপনয়নের সংস্কার তিনি অগ্রাহ্য করেন, আর উপবীত ছিন্ন করিয়া আসিয়া দাঁড়ান লিঙ্গায়েতী সাধু-সন্ন্যাসীদের আস্তানায়। এখন হইতে সেই পরম শিবেরই আরাধনা ও সাধনা তিনি করিবেন, যাঁহার কৃপায় পণ্ডিত মূর্খ ও ব্রাহ্মণ অন্ত্যজের ভেদবৈষম্য ঘুচিয়া যায়, ধনী

নিধন আচারী অনাচারীর পার্থক্য হয় দূরীভূত। খণ্ড বুদ্ধির পরপারে যে দেবাদিদেব বিরাজিত, যাঁহার অখণ্ড পরমসত্তায় বিশ্বসৃষ্টির স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছু ওতপ্রোত, সেই পরমপুরুষের কাছেই নিজেকে করিবেন তিনি উৎসর্গীত।

অধ্যাত্ম-জীবনের এই বিপ্লব-সূচনায় বসভের সারা অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠে শৈব সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র কুড়ল-সঙ্গমে গমনের জন্য। সেখানে গিয়া কঠোর সাধনায় ব্রতী না হওয়া অবধি জীবনে যে তাঁহার শান্তি নাই, স্বস্তি নাই।

দেবাদিদেব বুঝি তাঁহার ভক্তের অন্তরের এই আকুতি শুনিতে পাইলেন। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটানোর জন্য অচিরে পরম সুযোগ মিলিয়া গেল। বসভের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নাগলাম্বে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, ভক্তিমতী সাধিকা বলিয়া তাঁহার সুনামও এ অঞ্চলে ইতিমধ্যে রটিয়া গিয়াছে। মাতামহী ঠিক করিলেন এবার তাঁহার বিবাহ দিবেন। কুড়ল-সঙ্গমের এক ধনবান্ ও ভক্তিমান্ বংশের ছেলে শিবদাস। রূপে গুণে সব দিক দিয়াই সে নাগলাম্বের বর হইবার উপযুক্ত। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সাড়ম্বরে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। বসভেরও সুযোগ আসিল তাঁহার বহু ঈপ্সিত তীর্থ কুড়ল-সঙ্গমে যাওয়ার জন্য।

মাতামহীকে কহিলেন, "কুড়ল-সঙ্গম সাধু তপস্বীদের স্থান তো বটেই, তাছাড়া সেখানে রয়েছে শাস্ত্রপাঠের ও আত্মিকজীবন গঠনের পরম সুযোগ। ঠিক করেছি, আমি এবার সেখানে থেকেই শাস্ত্রপাঠ করবো, সাধন-ভজনে রত হবো।"

দিদি নাগলাম্বের তো উৎসাহের অবধি নাই। ছোট ভাই তাঁহার কাছাকাছি থাকিবে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে? তিনিও মাতামহীকে চাপিয়া ধরিলেন। এবার বসভের কুড়ল-সঙ্গমে যাওয়ার পক্ষে আর কোন বাধা রহিল না। অচিরে সেখানে পৌঁছিয়া একটি বিদ্যাকেন্দ্রে তিনি আশ্রয় নিলেন, তারপর ব্রতী হইলেন আত্ম-উজ্জীবনের সাধনায়।

কুড়ল-সঙ্গম এ সময়ে খ্যাত ছিল বেদ, উপনিষদ, আগম এবং কাব্য পুরাণ প্রভৃতির পঠন-পাঠনের জন্য। ১১৬০ খৃষ্টাব্দে এ স্থানে যে চারিটি বিশাল শিলালেখ পাওয়া যায়, তাহাতে বলা হইয়াছে,—'কুড়ল-সঙ্গম সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণদের আবাস স্থল, আর এখানকার সন্ন্যাসী সাধক বা মহাজনেরা সারা কানাড়ায় প্রসিদ্ধ তাঁহাদের বিদ্যাবত্তার জন্য। ঈশানীয়-গুরু এই মহান্ বিদ্যাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ।'

বসভের মেধা প্রতিভা ও জ্ঞানতৃষ্ণার পরিচয় পাইয়া এই ঈশানীয়-গুরুই গ্রহণ করিলেন তাঁহার শিক্ষাগুরুর স্থান।

বসভের মনের স্বাভাবিক ঝোঁক কিন্তু শৈবশাস্ত্র ও শৈবসাধকদের তথ্য আহরণের দিকে। অল্প দিনের মধ্যে দাসিমায়, রেবনসিদ্ধ, মাদরণ, কেশিরাজ প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষদের কথা ও তাঁহাদের তত্ত্ব-উপদেশ তিনি জানিয়া নিলেন। তেষট্টি পুরাণ বা তামিলী নাইনারদের কাহিনী অধ্যয়ন শেষ করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

শাস্ত্র ও ধর্ম্মসাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তরুণ বসভের হৃদয়ে শিবভক্তির ধারাস্রোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

এখানকার নির্জ্জনতা, নিসর্গ-সৌন্দর্য্য ও আনন্দময় পরিবেশ স্বতঃই মনকে রসাবিষ্ট করিয়া তোলে। সব চাইতে বড় কথা, এখানে আসিয়া বসভ লাভ করেন জাগ্রত বিগ্রহ সঙ্গমেশ্বরের সান্নিধ্য।

প্রতিদিন প্রত্যূষের আগেই বসভ শয্যাত্যাগ করেন। কৃষ্ণা ও মলপ্রভার পুণ্য সঙ্গমে গিয়া সমাপন করেন তাঁহার অবগাহন স্নান। তারপর নিজহাতে রাশি রাশি পুষ্প চয়ন করিয়া উপনীত হন প্রভু সঙ্গমেশ্বরের মন্দির দ্বারে। ধ্যান ভজন ও স্তবগানে প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হয়। দিনে রাতে এমনি করিয়া চলে ইষ্টদেবের আরাধনা।

সেদিন পূজা ধ্যান সারিয়া সবে তিনি মন্দির চত্বর হইতে বাহিরে আসিয়াছেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে অদূরে দণ্ডায়মান জটাজুটধারী এক

শৈব সন্ন্যাসীর উপর। বসভের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

বসভ শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন করিতেই সন্ন্যাসী প্রসন্ন মনে আশীর্ব্বাদ করেন, স্নিগ্ধ স্বরে কহেন, "বৎস, আমি যে তোমারই জন্য এতদিন অপেক্ষা করে আছি। তুমি প্রভু সঙ্গমেশ্বরের চরণতলে এসে গিয়েছো, ভালই হয়েছে।"

বসভের সারা দেহ-মন-প্রাণ স্বর্গীয় আনন্দে আবিষ্ট হইয়া উঠে। মনে হয়, এ সন্ন্যাসী যেন তাঁহার অতি পরিচিত, অতি আপনার জন। কিন্তু কে তিনি, কি তাঁহার পরিচয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

সন্ন্যাসী এবার তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহেন, "বসভ, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের। আমি তোমায় ঘনিষ্ঠভাবে জানি, বৎস। কিন্তু তোমার পক্ষে আমার পরিচয় জানা সম্ভব নয়। এ অঞ্চলের ভক্ত-সাধকেরা সবাই আমায় জানে জাতবেদমুনি বলে। তোমার পিতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তোমাদের গ্রাম বাগওয়াড়ীতেও আমি গিয়েছি।"

"তাহলে, তখনই কি আপনাকে দেখেছি, প্রভু?" করজোড়ে বসভ নিবেদন করেন।

"না বৎস, তুমি তখন সদ্যপ্রসূত শিশু মাত্র। আমার স্মৃতি ধরে রাখবার মতো বয়স তখন তোমার কই? বাগওয়াড়ীর নন্দীমন্দিরে কয়েকটা দিন অতিবাহিত করতে গিয়েছিলাম—আর তা তোমারই কারণে। প্রভু সঙ্গমেশ্বরের প্রত্যাদেশ পেয়ে তোমায় আমি দিয়েছিলাম লিঙ্গায়েৎ শৈবদের প্রথা অনুযায়ী লিঙ্গ-দীক্ষা, তোমার কণ্ঠে স্থাপন করেছিলাম লিঙ্গ প্রতীক। প্রভু সঙ্গমেশ্বরের চিহ্নিত ভক্ত তুমি, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক কিছু কাজ তোমায় করতে হবে। পরে জানতে পারবে সব।"

"প্রভু, আমি বালক মাত্র। শৈশব থেকেই অজানিতভাবে ইষ্টরূপে গ্রহণ করেছি দেবাদিদেব মহাদেবকে। কিন্তু এই ইষ্টের

দর্শন কি করে হবে, কি করে তাঁর সেবায় মন-প্রাণ ঢেলে দেবো, তা আমার জানা নেই। এই অবোধ অজ্ঞান বালককে আপনি কৃপা করে আশ্রয় দিন, পরম পথের সন্ধান দিয়ে কৃতার্থ করুন।”

“সেইজন্যেই তো এ স্থানে আমার আগমন। বৎস, তোমায় আমি নূতন করে লিঙ্গ-দীক্ষা দেবো, আর দেবো নিগূঢ় সাধনার গভীরে প্রবেশ লাভের উপদেশ, কিন্তু এ সবই প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র। এই সঙ্গে তোমায় প্রাচীন ও নবীন শাস্ত্রে পারঙ্গম হতে হবে। শৈবধর্ম্মের প্রচারে, জন-জীবনের উন্নয়নে, তোমার একটা বিধি-নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কাজেই সাধনা ও সিদ্ধির সঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞানও তোমায় আয়ত্ত করতে হবে।”

সেদিন এমনি আকস্মিকভাবে ঐশী কৃপার দ্বার উন্মোচিত হয় বসভের জীবনে। জাতবেদমুনির প্রভাবে এখন হইতে অতি সহজে কুড়ল-সঙ্গমের বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রবিদের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিতে থাকে।

সহজাত শুভসংস্কার ও সাধননিষ্ঠা বসভের রহিয়াছে, তদুপরি রহিয়াছে শক্তিধর গুরুর নির্দ্দেশ ও পরিচালনা। তাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার সাধনজীবনে যেমন রূপান্তর ঘটে, তেমনি তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠেন প্রাচীন বেদ-বেদাঙ্গ আগম এবং আধুনিক শাস্ত্র ও প্রকরণ গ্রন্থের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে।

সাধনা ও শাস্ত্র অধ্যয়নের মধ্য দিয়া বসভের মনে ইষ্টভাবনা ও শিবতত্ত্বের একটা নূতনতর উপলব্ধি ফুটিয়া উঠে। পরমতত্ত্ব হিসাবে শিব অনাদি ও অনন্ত, অবিনশ্বর। বিশ্ব সৃষ্টির সব কিছু তাঁহা হইতেই উদ্ভূত—আবার লয় হয় তাঁহাতেই। চেতন, অচেতন, স্থাবর জঙ্গম সবই শিবের শরীর, শিবময়। তবে তাঁহার সৃষ্ট এই বিশ্ব-সংসারে উচ্চ-নীচের ভেদবৈষম্য কেন থাকিবে?

পৌরাণিক যুগের শিবের ক্ষেত্রেও দেখা যায়—তিনি আশুতোষ, পরম কারুণিক। আর্য্য-অনার্য্য, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, পণ্ডিত-মূর্খের ভেদ

তাঁহার কাছে নাই। হিমালয় শিখরের গলিত তুষারের মতো তাঁহার কৃপার ধারা সতত সর্ব্বত্র ঝরিয়া পড়িতেছে। শিবের বৈশিষ্ট্য—তাঁহার মহা করুণা। তবে এই করুণার ধারাকে সমাজের সর্ব্ব স্তরে কেন ছড়াইয়া দেওয়া হইবে না? জাতিভেদের প্রাচীর কেন মাথা উঁচাইয়া থাকিবে শিবভক্ত জঙ্গমদের মধ্যে? কৃত্রিম বর্ণভেদের বিলোপসাধন করিয়া, স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য দূর করিয়া কেন শিব-আরাধনা ও শিবলোকের কল্যাণধারাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হইবে না?

গুরু জাতবেদমুনির কাছে বসভ মাঝে মাঝে তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করেন। গুরু সুস্পষ্ট কোন নির্দ্দেশ দেন না, প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে দুই চারিটি কথা বলিয়া উঠিয়া যান।

সেদিন দুজনে এ বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ হইল। বসভ সবিনয়ে কহিলেন, "গুরুদেব, শৈবযোগ ও শিবভক্তি আজ যে পর্য্যায়ে রয়েছে তাতে আমার মনে শান্তি খুঁজে পাচ্ছি না।"

"কি ব্যাপার, খুলে বলতো।"

"শৈবধর্ম্ম করুণার ধর্ম্ম, সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম। একদল আচার্য্য ও সাধুমণ্ডলীর গণ্ডীর মধ্যে একে এমন করে সীমাবদ্ধ করে রাখা কেন? বৈদিক অবৈদিক, আর্য্য দ্রাবিড়, ব্রাহ্মণ শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলের মধ্যেই শিবের আরাধনাকে ছড়িয়ে দেওয়া হোক না কেন?"

"বেশ তো, বৎস, এতো অতি উত্তম কথা।"

"প্রভু, আজকের দিনের সমাজের দিকে চেয়ে দেখুন। ধর্ম্ম, ন্যায়নীতি বলতে কিছু নেই। স্বার্থের কলুষে দেশ ভরে গিয়েছে। এ সময়ে শৈবধর্ম্মেরই বা কি দুর্দ্দশা। সাধকেরা নেমে গিয়েছে গোপন বীভৎস পাপাচারের পথে। আজ এ ধর্ম্মের উজ্জীবন চাই। প্রকৃত শিবভক্তির মধ্য দিয়ে এ উজ্জীবনকে সার্থক করে তুলতে হবে, নিয়ে যেতে হবে দীন হীন প্রতি মানুষের দ্বারে, দেবাদিদেব আশুতোষের প্রসন্নতা লাভ করবে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সবাই।"

"বসভ, কানাড়ায়, শুধু কানাড়া কেন সারা দক্ষিণ ভারতে, এক নূতন শৈব আন্দোলন আসন্ন, তা আমি জানি। এই আন্দোলন সফল হবে তোমার সাধনা ও সিদ্ধিতে। কিন্তু বৎস, এজন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি তো চাই।"

"আদেশ করুন, এই মুহূর্ত্তে আমি সকল কিছু ত্যাগ করে শৈব সন্ন্যাস গ্রহণ করি। সারা দেহ মন নিয়োজিত করি ঈশ্বরের এই মহান্ কর্ম্মে।"

"না বৎস, এজন্য তোমাব সন্ন্যাস নেবার প্রয়োজন নেই। বরং গৃহে থেকে, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকেই তোমায় করতে হবে এই নূতন শৈব আন্দোলনের নেতৃত্ব।"

"আপনার কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে, প্রভু। আমায় একটু বুঝিয়ে বলুন।"

"জানতো কর্ণাটী শৈব সাধকদের কথা—'কায়কভে কৈলাস', অর্থাৎ কায়ক বা কর্ম্ম হচ্ছে মানব-জীবনের কৈলাস। এই কায়ক সাধনা তোমায় গ্রহণ করতে হবে, কৈলাসপতির সংসারকে করে তুলতে হবে কৈলাসস্বরূপ। কায়কের মূল কথা, দেহ মনকে ব্যবহারিক কর্ম্মে নিয়োজিত রাখতে হবে এবং এই ব্যবহারিক কর্ম্মকেই বিশ্বাস করতে হবে ঐশ্বরীয় কর্ম্ম বলে। দেহ মনের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সাধনায় যে ঐকতান বেজে উঠবে, তার ফলে মানবসমাজে নেমে আসবে মুক্তির স্বর্গ। আরও একটা কথা আছে। ব্যবহারিক কর্ম্মজাত সমস্ত অর্থ নিবেদন করতে হবে শিবভক্ত ও শিবযোগী জঙ্গমদের সেবায়। স্মরণ রাখবে এই সঙ্গে, শিবে পূর্ণ আসক্তি ছাড়া কর্ম্মে অনাসক্তি জন্মে না। শিবে পূর্ণ আত্মোৎসর্গ ছাড়া 'এ সাধনা সম্ভব নয়।"

"বেশ, আপনার অনুমতি পেলে এই সাধন-পথই আমি আজ থেকে বেছে নেবো।"

"তাই নাও বৎস। আর এ সঙ্গে তৈরী হও গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করার জন্য। অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যের প্রশাসনের ভারও তুমি

পাবে। শৈবধর্ম্মের নব জাগৃতির জন্য তার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বসভ, মূল কথাটি কোনদিন যেন বিস্মৃত হয়ো না, তা হচ্ছে—কায়কভে কৈলাস।"

"কর্ম্মজীবনের মধ্য দিয়ে আত্মার মুক্তিসাধন, এ বড়ো কঠিন কাজ প্রভু। আপনার আদেশে সঙ্কল্প আমি গ্রহণ করেছি, কিন্তু এই সঙ্গে মনে ভয়ও হচ্ছে, এই কঠিন ব্রত উদযাপন করে দেবাদিদেবের পরম পদে আমি পৌঁছুতে পারবো তো।"

"ভয় নেই বসভ, তোমার দিকে আজ শুধু আমার স্নেহদৃষ্টি রয়েছে তাই নয়, অল্লাম প্রভুদেবের প্রসন্ন দৃষ্টিও রয়েছে তোমার উপর নিবদ্ধ।"

"প্রভুদেবের নাম আমি শুনে আসছি, এখনো তাঁর দর্শন পাবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। প্রকৃত পরিচয়ও জানা নেই।"

"মনে রেখো, প্রভুদেব অল্লাম হচ্ছেন শিবসাধনা ও শিবসিদ্ধির ঘনীভূত বিগ্রহ। দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শৈবযোগী বলে তিনি সাধক সমাজে স্বীকৃত। যোগবিভূতির দিক্ দিয়ে অনেকে তাঁকে তুলনীয় মনে করেন মহাযোগী গোরখনাথের সঙ্গে। ধর্ম্ম ও সমাজের দুর্গতিতে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছে, শৈবধর্ম্মের একটা পুনরুত্থান তিনি চান। তোমার মতো শক্তিমান্ সাধকের উপর তাঁর দৃষ্টি তাই রয়েছে।"

"তার দর্শনের সৌভাগ্য কি আমার হবে না?"

"এখনো সময় হয় নি বৎস। যথাসময়ে তুমি তাঁর সান্নিধ্য ও সহায়তা পাবে।"

স্মিত হাস্যে বসভকে আশিস্ জানাইয়া জাতবেদমুনি ধীর পদে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কুড়ল-সঙ্গমের মঠ মন্দিরে, সাধক ও পণ্ডিতসমাজে বসভ ক্রমে সুপরিচিত হইয়া উঠেন। যে কোন মহামনে-তে বা ধর্ম্মসভায় যান, এই নবীন শিবভক্তের ব্যক্তিত্ব ও মতবাদ জনগণকে সচকিত করিয়া তোলে। তাঁহার উদার দৃষ্টিভঙ্গী, সর্ব্বজনীন শৈববাদ, ধারালো যুক্তিতর্ক সবাইকে মুগ্ধ করিতে থাকে।

গুরুর আদেশ, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিয়া করিতে হইবে। কিন্তু কোথায় এ কাজ শুরু করিবেন? মঙ্গলওয়াড় চালুক্যদের শাসনকর্ত্তা বিজ্জলের রাজধানী, সেখানেই জীবিকার উদ্দেশ্যে গিয়া উপস্থিত হন। প্রথমটায় কিছুটা অসুবিধায় পড়িলেন। প্রভু সঙ্গমেশ্বর ঠিক কোথায় তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন তাহা জানা নাই। যাই হোক যে কোন একটা কাজ তাড়াতাড়ি না জুটাইতে পারিলে বিপদ। কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর রাজকোষাগারে হিসাবরক্ষকের এক শিক্ষানবীশী কাজ তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

আত্মিক সাধনা আর ব্যবহারিক কর্ম্ম দুইয়েতেই বসভের সমান নিষ্ঠা। যথাসাধ্য শ্রম ও দক্ষতার সহিত তিনি কাজে রত হইলেন। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝিলেন, কর্ম্মচারীরা সবাই বড় অলস প্রকৃতির। সরকারী কাজে শৈথিল্য যেমন রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে অজস্র ভুলভ্রান্তি। একটি বড় হিসাবের ভুল তাঁহার নজরে পড়িল। সিদ্ধ-দণ্ডাধিপ তখন কোষাগারের অধ্যক্ষ। বসভ তখনই সরাসরি তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত।

হিসাবের খাতায় এ ধরনের মারাত্মক ভুল দেখিয়া তো অধ্যক্ষের চক্ষুস্থির। তখনই উহা সংশোধনের আদেশ দিলেন।

বসভের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এবার তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন স্থায়ী চাকুরীতে।

তরুণ কর্ম্মচারীর পরিচয় নিতে গিয়া সিদ্ধ-দণ্ডাধিপের আনন্দের অবধি রহিল না, কহিলেন, "দেখ্‌ছি, তোমার পিতা মাদিরাজ আমার জ্ঞাতি, তুমি আমার আত্মীয় হয়ে অন্যত্র কেন থাকবে? এখন থেকে আমার গৃহে এসে বাস করতে থাকো।"

সিদ্ধ-দণ্ডাধিপের সস্নেহ পৃষ্ঠপোষকতায় ও নিজের দক্ষতার গুণে উপর্য্যুপরি বসভের পদোন্নতি ঘটিতে থাকে। ক্রমে এই সুদক্ষ, ন্যায়নিষ্ঠ, তরুণ কর্ম্মচারীর প্রতি প্রদেশের শাসক বিজ্জলের দৃষ্টিও

আকৃষ্ট হয়। বসভকে সরকারী কোষাগারের দায়িত্বপূর্ণ কাজে তিনি নিযুক্ত করেন।

কয়েক বৎসর পরে সিদ্ধ-দণ্ডাধিপ লোকান্তরে চলিয়া যান এবং বিজ্জল তরুণ বসভকেই প্রদান করেন অধ্যক্ষের পদ। বসভ একজন শৈবসাধক, কুড়ল-সঙ্গমের সাধু-সন্ন্যাসী ও ঈশানীয়-গুরু প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার গুণমুগ্ধ একথা বিজ্জল শুনিযাছেন। বসভ ইাতমধ্যে মঙ্গলওয়াড়-এ অবস্থান কবিযা একটি শিবভক্ত গোষ্ঠী গডিয়া তুলিয়াছেন, একথাও তাঁহার জানা আছে। তাই এই তরুণ ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ম্মচারীকে রাজকোষাগারের অধ্যক্ষ পদে ববণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইলেন।

ভাণ্ডারী বা অধ্যক্ষের পদ গ্রহণেব পর বসভ গুরুর আদেশে বিবাহ করেন। সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা, পরম ভক্তিমতা, গঙ্গাম্বি পত্নীরূপে তাঁহার গৃহে অধিষ্ঠিতা হন। স্বামীর সংসার এবং শিবভক্ত শরণদের সেবা, দুইই তিনি আনন্দ ও তৃপ্তিতে পরিযা তোলেন।

গুরু জাতবেদমুনির উপদেশ বসভ মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, কর্ম্মজীবনকে কৈলাসে পরিণত করিতে হইবে আর আত্মিক সাধনাকে ছড়াইয়া দিতে হইবে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে। তাই মঙ্গলওয়াড়ে থাকিয়া রাজস্ব বিভাগের কার্য্যে যেমন দক্ষতা ও তৎপরতা তিনি দেখাইতেন, কুড়ল-সঙ্গমে গেলেও তেমনি ফুটিয়া উঠিত তাঁহার অপরিসীম ইষ্টনিষ্ঠা ও ধ্যান-ভজনের দিব্য আবেশ।

বিজ্জল ছিলেন শৈবসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। বসভের শৈব দীক্ষা ও সাধনার খ্যাতি তিনি শুনিয়াছেন, সচিব তাহারই ধর্ম্মপথের পথিক, ইহাতে তিনি মনে মনে মহা আনন্দিত। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বিজ্জল বুঝিলেন, বসভ প্রাচীন শৈববাদের অনুগামী নহেন, বেদাচার বহির্ভূত, সংস্কারপন্থী, এক নূতন শৈবধর্ম্ম তিনি স্থাপন করিতে উৎসুক। বিজ্জলের মনে সচিব সম্বন্ধে দ্বিধা ও সংশয় জাগিয়া উঠে। কিন্তু আবার ভাবেন, এই তরুণ সাধক কুড়ল-সঙ্গমের

সাধু-সন্ন্যাসীদের পরমপ্রীতিভাজন, তা ছাড়া, কানাড়ার শিবভক্ত সাধু ও গৃহস্থেরা দলে দলে তাঁহার কাছে আসা-যাওয়া করিতেছে। তাঁহার এই জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনের মধ্যে আপত্তি করার তো কিছু নাই। বরং শাসনকর্তা হিসাবে বিজ্জলের কাজের পক্ষে ইহা কিছুটা সহায়কই হইবে।

ব্যবহারিক কর্ম্ম আর শিব-সাধনার অপরূপ সমন্বয় সাধন করিয়াছেন বসভ, তাঁহার নূতন সুসংস্কৃত শৈববাদ প্রচারেও হইয়াছেন উদ্বুদ্ধ। এ সময়ে একবার তিনি কুড়ল-সঙ্গমে গিয়া উপস্থিত হন।

গুরু জাতবেদমুনির সহিত সাক্ষাৎ হইতেই স্মিতহাস্যে তিনি কহিলেন, "বৎস বসভ, তোমার ভাগ্য আজ বড় সুপ্রসন্ন। অল্লাম প্রভু এ সময়ে এখানে উপস্থিত। তোমার প্রসঙ্গ উঠিতেই কহিলেন, —তোমার সাধনা সিদ্ধির পথে এগিয়ে এসেছে। তাই ভাবছি, বড় সুসময়েই তুমি এসে পড়েছো।"

অল্লাম প্রভুর চরণে প্রণাম নিবেদন করিতেই বসভকে তিনি প্রাণ ভরিয়া করিলেন আশীর্ব্বাদ। তারপর স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "বসভ, দেখতে পাচ্ছি তোমার কায়ক-সাধনা ও ইষ্টনিষ্ঠা ঠিক পথেই চলেছে। কিন্তু বৎস, ইষ্টদর্শন না হলে তো তোমার কায়ক-সাধনা দৃঢ়ভূমিতে স্থাপিত হবে না। কর্ম্মক্ষেত্রকে কৈলাসে পরিণত করার সঙ্কল্প তুমি গ্রহণ করেছো, কিন্তু কৈলাসপতির দর্শন না পেলে তো সে সাধনায় সহজে তুমি জয়যুক্ত হবে না। ইষ্টদর্শন লাভ করে ইষ্টের আশীর্ব্বাণী নিয়ে অগ্রসর হও, তবেই তো শৈবধর্ম্মের পুনর্গঠনের ব্রত তোমার সফল হয়ে উঠবে।"

সেদিন গভীর রাত্রে সঙ্গমেশ্বর মন্দিরে গিয়া বসভ ধ্যান-জপে বসিয়াছেন। ভাবাবেশে দীর্ঘ সময় নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ মন্দিরগৃহ স্নিগ্ধ-শুভ্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বর আবির্ভূত হইলেন তাঁহার নয়নসমক্ষে। দৈবীকণ্ঠের বাণী শুনা গেল, "বৎস বসভ, শিবভক্তি ও শিবযোগের উজ্জীবনের

জন্য, প্রচার ও প্রসারের জন্য, যে সঙ্কল্প তুমি করেছো, তা অবশ্য সিদ্ধ হবে। সহস্র সহস্র সাধকজন, শিবভক্ত নরনারী তোমার সহায়তার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে, তাদের ভেতর তোমার সাধনা ও সিদ্ধির কল্যাণ-ধারা তুমি বিস্তারিত করে দাও।"

জ্যোতির্ম্ময় দিব্য মূর্ত্তিটি ধীরে ধীরে এবার মন্দিরের লিঙ্গ প্রতীকে মিলাইয়া যায়। সাধক বসভের অন্তরে বার বার অনুরণিত হইতে থাকে দৈবী কণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার। দ্রুতপদে তখনই তিনি ছুটিয়া যান যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভুর কাছে। যুক্তকরে, কাতর কণ্ঠে, অনুনয় করেন, "প্রভুদেব, আপনার কৃপায় এ দাস ধন্য হয়েছে। কিন্তু কৃপার ধারা একবার উন্মুক্ত করে আর যেন আমায় বঞ্চিত করবেন না।"

"বৎস, তুমি শান্ত হও, স্থির হয়ে বসো"—স্নিগ্ধ-মধুর হাস্তে অল্লাম প্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দেন।

"প্রভু, আমার প্রার্থনা আপনাকে পূর্ণ করতেই হবে। নিজের সম্বন্ধে আমার মূল্যবোধ রয়েছে, আমার শক্তি যে সীমাবদ্ধ সে সম্বন্ধে আমি সচেতন। শৈবধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় এক বিরাট কাজ, অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐশ্বরীয় কাজ। সাক্ষাৎভাবে আপনি আমায় সহায়তা না করলে আমার পক্ষে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।"

"বসভ, আমি যাঁকে জীবনভব ধ্যেয়াই সেই ইষ্টের দর্শন তুমি লাভ করেছো। তাঁর আশীর্ব্বাদও পেয়েছো। শিবের আদিষ্ট কাজে, শিব স্মরণ করে, তুমি অগ্রসর হও। পাপাচার আর কলুষে শৈব-সম্প্রদায় ভরে উঠেছে, এর সংস্কার সাধন কর সর্ব্বাগ্রে। লিঙ্গ-দীক্ষার ভেতর দিয়ে সহস্র সহস্র বীরশৈব সাধক সৃষ্টি কর দেশের দিকে দিকে। এই পুনর্গঠিত শৈবেরা পরিচিত হবে বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎ বলে। আর একাজে আমার সাহায্য অদূর ভবিষ্যতে, প্রয়োজনমতো, অবশ্যই তুমি পাবে, বৎস।"

অল্লাম-প্রভু ও সমবেত শিবযোগীদের পদবন্দনা করিয়া হৃষ্টচিত্তে বসভ মঙ্গলওয়াড়ে ফিরিয়া আসেন।

নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শৈবধর্ম্মের সংস্কার সাধনে ও প্রচারে

তিনি ব্রতী হন। তারপর অচিরে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত হইয়া উঠেন ভক্তি-ভাণ্ডারী বসভেশ্বর নামে।

বসভেশ্বরের প্রচারিত বীরশৈববাদ এবং তাঁহার জীবন ও সাধন-পন্থার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে কানাড়ার ধর্ম্ম আন্দোলনের পশ্চাৎপট অনুধাবন করা দরকার।

বৌদ্ধধর্ম্ম এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল দীর্ঘদিন। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ মহাবংশে দেখা যায়, মহারাজ অশোক বনবাসী (উত্তর কানাড়া) এবং মহিষমণ্ডলে (মহীশূর) ধর্ম্ম প্রচারকদের প্রেরণ করেন। কয়েক শতক ব্যাপিয়া এখানকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বৌদ্ধ মতবাদের প্রতাপ দেখা যায়, তারপর ক্রমে তাহা নিস্তেজ হইয়া আসে। একাদশ শতকেও বল্লিগাভের বৌদ্ধকেন্দ্রের স্মৃতি জনমানব হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। কানাড়ায় জৈনধর্ম্মের প্রভাব অতঃপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রকূট ও গঙ্গবংশের রাজারা সোৎসাহে এ ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, তাই অষ্টম হইতে দশম শতক অবধি এই ভূখণ্ডে দেখিতে পাই জৈন সাধুদের প্রবল প্রতিপত্তি। কোপন ও শ্রবণবেলগোলার জৈনমন্দিরগুলি তখনকার জনসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠে। চালুক্যরাজের সেনাপতি নাগদেবের ভক্তিমতী পত্নী সত্তিমবে প্রায় পনের শত জৈনমন্দির স্থাপন করিয়া যান। এজন্য জনগণ তাঁহাকে আখ্যা দেয়—দান-চিন্তামণি।

কানাড়ায় বৈষ্ণব ও শৈবের সংখ্যা ও একসময়ে নিতান্ত কম ছিল না। চালুক্য রাজারা ছিলেন বিষ্ণুভক্ত, ইষ্টরূপে তাঁহারা বরাহ অবতারের পূজা করিতেন। বাদামীর মনোরম গুহা, মন্দির আজিও এই ইষ্টাপূজার স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

মহাত্মা মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগ এবং তন্ত্রের সাধনাও এক সময়ে মহারাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানের মধ্য দিয়া কানাড়ায় ছড়াইয়া পড়ে। শক্তিমান সাধক ও সিদ্ধদের মাধ্যমে জনসমাজে এ সাধনা বিস্তারিত হয়।

ভারতের শৈবধর্ম্ম অতি প্রাচীন। ঋক্‌বেদের রুদ্রের উল্লেখ হইতে এই ধর্ম্ম ও উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরাণিক ও মধ্যযুগে এই শাস্ত্রানুগ শৈবধর্ম্মের বিস্তার সাধিত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে শৈবসম্প্রদায় কতগুলি উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং এক শ্রেণীর সাধকদের মধ্যে মানসিক বিভ্রান্তি ও নৈতিক অধঃপতনের প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়। একাদশ শতকের কানাড়ায় ও শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে নানা পাপাচার ও নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়। পাশুপত (লাকুল), কালামুখ, কাপালিক সবাইর ভিতরেই ছড়াইয়া পড়ে পাপাচার এবং স্খলন পতনের ত্রুটি।

বহুলখ্যাত তরুণ বীরশৈব, বসভেশ্বরের ভাগিনেয় ও হাতে-গড়া সাধক, চন্নবসভেশ্বর সমকালীন ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে একটি দোঁহাতে বলিয়াছেন[১] :

শৈব রয়েছে বিমূঢ় হতবাক্ হয়ে,
পাশুপত খুঁজে পাচ্ছেনা পথের সন্ধান,
কালামুখীর দুই চোখে অন্ধত্বের কালো,
মহাব্রতী ঘুরছে তার ঔদ্ধত্য আর অহংকার নিয়ে!
সন্ন্যাসী আজ ঈশ্বরবিমুখ,
কৌল হয়েছে উন্মাদ রোগগ্রস্ত,
ভক্তিমার্গে এই ছয় জনার কাকে আনবে টেনে?

দ্বাদশ শতকে শৈবধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়াস পান তিনটি স্বনামখ্যাত সাধক; সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইঁহাদের প্রভাব ছিল অসামান্য। ইঁহাদের নাম—একান্তদ রামাইয়া, মহামণ্ডলেশ্বর বিরূপরস এবং বীর গাগিদেব। কিন্তু শৈব সাধনা ও সিদ্ধির সহিত সামাজিক উদারতার সমন্বয় সাধনে ইঁহারা সক্ষম হন নাই। এ সমন্বয়ের জয়ধ্বনি সর্ব্বপ্রথমে উচ্চারিত হয় বীরশৈব বসভেশ্বরের

১ ডক্টর পি. বি. দেশাই : বসভেশ্বর অ্যাণ্ড হিজ্ টাইম্‌স

ইষ্টদেব মঙ্গলময় শিবকে বসভ গুরুকৃপায় ও স্বীয় সাধনশক্তি বলে দর্শন করিয়াছেন, উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যময় পরমসত্তা। আর অনুভূতি রাজ্যের এই শিখরে উঠিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, গুরুর কৃপায় অপার করুণায় হইয়াছেন উদ্বেল, শিবতত্ত্বকে জনগণের মধ্যে বিস্তারিত করিতে হইয়াছেন বদ্ধপরিকর। শুধু তাহাই নয়, এই করুণা ও জনকল্যাণের সঙ্কল্প নিয়া বসভেশ্বর কানাড়ায় যে সামাজিক বিপ্লব ও সর্ব্বজনীন মুক্তির সূচনা করেন, ভারতের ধর্ম্মসংস্কৃতির ইতিহাসে আজো তাহা স্মরণীয় হইয়া আছে।

বসভেশ্বর উপলব্ধি করিয়াছেন—তাঁহার ইষ্ট সঙ্গমেশ্বর যে বিভু, তাঁহার সর্ব্বব্যাপী পরমসত্তায় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে ওতপ্রোত, সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময় তাঁহার অস্তিত্ব বসভ অনুভব করিয়াছেন মনপ্রাণ দিয়া। একটি বচনে এ পরম অনুভূতির আভাস পাই[১] :

হে প্রভু, যেখানেই নয়ন দুটি আমি মেলে দিই,
তোমার মাধুর্য্য করি নিরীক্ষণ,
অনাদি অনন্ত মহাকাশের যে দিকেই তাকাই—
নয়ন আমার ভরে ওঠে তোমার রূপে।
তুমিই যে এই বিশ্বসৃষ্টির নয়নের জ্যোতি,
তুমিই যে এর লাবণ্যময় প্রদীপ্ত আনন,
তোমার নিঃসীম হস্ত দুটিই প্রসারিত দিগন্ত জুড়ে,
ওগো কুড়ল-সঙ্গমের দেব,
তোমারই চরণচিহ্ন ছড়ানো দেখি যে দিকে দিকে।

দেবাদিদেবের সীমাহীন ব্যাপ্তি ও অনন্ত ঐশ্বর্য্যের প্রশস্তি গাহিয়া বসভেশ্বর আর একটি অনুপম বচনে বলিতেছেন :

এই বিশ্বসৃষ্টির মতোই
সীমাহীন তুমি প্রভু, স্বর্গের মতোই
তুমি উর্দ্ধায়িত, মহীয়ান—

১ দাস্ স্পেক্ বসভ—অনুবাদ : এ. সুন্দররাজ থিয়োডোর

প্রপঞ্চের চাইতেও তুমি বৃহত্তর,
তোমার রাতুল চরণ দুটি স্থাপিত রয়েছে
পৃথিবীর নিম্নতম স্তরে,
আর তোমার উজ্জ্বল কিরীট
ধক্ ধক্ করে জ্বলছে অবিরত
এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি ছাড়িয়ে।

সাধক বসভের আর একটি বড় পরিচয় তাঁহার মানবপ্রীতি—শিবশরণ, শিব-ভক্তদের প্রীতি। সর্ব্বজনীন প্রেম দিয়া যেমন নিজ সাধনাতে তিনি জয়যুক্ত হন, তেমনি ইহারই মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ উদারবুদ্ধি ও ভক্ত মানুষের সঙ্গে তিনি বাঁধা পড়েন নিবিড় বন্ধনে। বসভের অনুভূতিলব্ধ 'বচনে' তাঁহার এই করুণাঘন স্বরূপটি ফুটিয়া উঠিতে দেখি :

করুণার রসধারা আর সঞ্জীবনী শক্তি
নেই যাতে—কি করে তা
অভিহিত হবে ধর্ম্ম বলে ?
করুণার অমৃতধারা পড়বে ঝরে অজস্র ধারায়,
আর লক্ষ কোটি মানুষের জীবনে
করুণার রস সতত হবে উৎসারিত
ধর্ম্ম বিশ্বাসের মূল দেশ থেকে—
তবেই না রক্ষা পাবে এই বিশ্বসংসার।
ওগো, করুণা নেই যেখানে
সেখানে নেই আমার প্রভু দেবাদিদেব কুড়ল-সঙ্গম।

ধর্ম্মজীবনে এবং ব্যবহারিক জীবনে বসভেশ্বরের এখন বিপুল প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি।

দিকে দিকে খ্যাতি রটিয়া যায়—বসভ শিব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কুড়ল-সঙ্গমের শৈব সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রকারেরা তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিবযোগী অল্লাম-প্রভু, সাধক

সমাজে যিনি প্রভুদেব বলিয়া খ্যাত, বসভেশ্বরকে কৃপা করিয়াছেন অকৃপণ করে, আখ্যা দিয়াছেন তাঁহাকে – ভক্তিভাণ্ডারী।

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বিজ্জলের দরবারেও বসভেশ্বর প্রথম সারির সচিব। রাজ্যের রাজস্বের হিসাব ও কোষাগারের পরিচালন-ভার তাঁহারই উপর। বিজ্জলের তিনি দক্ষিণ হস্ত।

ঋদ্ধি ও সিদ্ধির এই সমাহার বসভেশ্বরকে রাজ্যমধ্যে করিয়া তুলিয়াছে অনন্যসাধারণ। শত শত শিব-শরণ এবং শিবভক্ত গৃহী ও সন্ন্যাসী সাধক প্রতিদিন তাঁহার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। ধর্ম্ম, দর্শন ও সাধন সম্পর্কে সোৎসাহ আলোচনা চলে। আর চলে সাধু-সম্বর্দ্ধনা ও সাধু ভোজন—দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে সারা নগরী মুখরিত হইয়া উঠে।

ভক্তজন ও সাধকদের সমাবেশে বসভেশ্বর যে শৈবধর্ম্মের কথা, বীরশৈববাদের কথা বলেন—তাহা কিন্তু বেদানুগ শৈবধর্ম্ম নয়। কর্ম্মকাণ্ডের কথা ইহাতে নাই, নাই বর্ণাশ্রমের সমর্থন। বেদাচার বহির্ভূত এ এক বৈপ্লবিক ও সংস্কারপন্থী নবতর শৈবধর্ম্ম। বসভেশ্বর ঘোষণা করেন, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে, স্ত্রী-পুরুষের ভেদ বৈষম্য না মানিয়া, প্রত্যেক নবজাত শিশুকে দিতে হইবে লিঙ্গদীক্ষা। এই দীক্ষার বলে সাধনক্ষেত্রে সকল শিবভক্তই হইবে সমপর্য্যায়ভুক্ত, সমান অধিকারযুক্ত। বসভেশ্বর আরও কহেন, শিব-শরণ বা শিবে শরণাগত সন্ন্যাসী মাত্রেই শিবের প্রতিভূ। প্রত্যেক ভক্তের প্রধান কর্ত্তব্য এই শিব-শরণদের আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জানানো এবং ইঁহাদের সেবা ও ভোজনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা।

বীরশৈববাদের দার্শনিক ভিত্তিও বসভেশ্বর এই সময়ে রচনা করেন। তাঁহার সৃষ্ট স্থায়ী ধর্ম্মসভা অনুভব-মণ্ডপেও দার্শনিকতা ও সাধনপদ্ধতির উপকরণ সংগৃহীত হয়।

এই মত অনুযায়ী শিব হইতেছেন অনাদি অনন্ত পরমপুরুষ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। শক্তি শিবের ক্রিয়াশীল সত্তা, শিব

হইতে শক্তিকে কোনমতে পৃথক করা যায় না। তাই দার্শনিক মহলে বীরশৈববাদকে বলা হয় শক্তি-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

এই মতের সাধকেরা লিঙ্গ ও অঙ্গ এই দুইটি তত্ত্বের উপর জোর দেন। লিঙ্গ হইতেছেন শিব, আর অঙ্গ—জীবাত্মা। আসলে এই দুইটিতে কোন পার্থক্য নাই। অজ্ঞানতার জন্য আমরা অন্তর্নিহিত ঐক্যকে উপলব্ধি করিতে পারি না, এই অজ্ঞানতার মল দূর হইলেই শিবশক্তির অখণ্ড পরমসত্তা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। একের সাথে, অখণ্ডের সাথে, সাধকের ঘটে মহামিলন। এই মহামিলনই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। এই মিলনকে শৈবযোগের ভাষায় বলা হয়—লিঙ্গাঙ্গ সামরস্য।

এই সামরস্য সাধিত হয় দীর্ঘ দিনের সাধনার ফলে এবং ছয়টি স্তরের ভিতর দিয়া সাধককে অগ্রসর হইতে হয়। এগুলিকে বলা হয় ষট্‌স্থল। অষ্টাবরণ বা আটটি সূক্ষ্ম মানসক্রিয়ার উপরও বীর-শৈব সাধকেরা গুরুত্ব আরোপ করেন।

লিঙ্গাঙ্গ সামরস্য বা পরম প্রাপ্তির পথে চলিতে হইলে সাধকের নৈতিক চরিত্র এবং সামাজিক আচার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। বসভেশ্বরের অনুগামী সাধকেরা এগুলিকে বলেন—পঞ্চাচার। কায়ক বা শিবে উৎসর্গীত ব্যবহারিক কর্ম্ম বীরশৈববাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। কায়কের মূল কথা—প্রত্যেক মানুষকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে হইবে। এই কর্ম্ম শিবেরই কর্ম্ম, এই সঙ্গে বজায় রাখিতে হইবে 'দাসোহং' মনোভাব। কায়কের উপার্জ্জিত অর্থে শিবভক্তের কিন্তু কোন অধিকার নাই, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট অর্থ তাহাকে দান করিতে হইবে। বীরশৈববাদের প্রচারক জঙ্গম সাধুরা এই অর্থ ব্যয় করিবেন সমাজের কল্যাণে।

কায়ক বা নিবেদিত কর্ম্ম সম্বন্ধে বসভেশ্বর অত্যন্ত উদারপন্থী। যে কোন বর্ণের লোক স্বেচ্ছানুযায়ী তাহার বৃত্তি নির্ব্বাচন করিবে, এই বিধি তিনি দিয়াছেন।

অনুভব মণ্ডপ বা সাধক-সভা বসভেশ্বরের এক বিশিষ্ট অবদান। এই সভায় পণ্ডিত অপণ্ডিত, উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্য সবাই মিলিত হইতেন। নিজেদের সাধনজীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা যেমন সবাই দিতেন, বিতর্কেও তেমনি করিতেন অংশ গ্রহণ।

এই অনুভব মণ্ডপকে শিবানুভব মণ্ডপও বলা হইত। এখানকার আলোচিত তত্ত্ব বিশেষ করিয়া বসভেশ্বর ও অন্যান্য সিদ্ধ সাধকদের উপদেশ ও অনুভূতি-জাত তত্ত্ব শ্লোকবদ্ধ হইত 'বচন'-রূপে।[১] তারপর অগণিত শিবভক্তের জন্য এগুলি বিভিন্ন শহরে ও জনপদে বিতরণ করা হইত।

সঙ্কলিত বচনগুলিতে বসভেশ্বর শুধু তত্ত্বের ব্যাখ্যান করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। এই তত্ত্বকে রূপায়িত করিতেন নিজের ব্যবহারিক জীবনে। শাসনকর্ত্তা বিজ্জলের সচিব ও কোষাগারের অধ্যক্ষরূপে তিনি ছিলেন সমাজের এক অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কিন্তু নিজ গৃহে, অনুভব মণ্ডপে, দরিদ্র অস্পৃশ্যদের সঙ্গে উপবেশন করিতে তাঁহার বাধিত না। সরকার হইতে যে উচ্চ বেতন তিনি পাইতেন, সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য তাহা হইতে সামান্য কিছু রাখিয়া দিয়া অধিকাংশ অর্থ ব্যয় করিতেন শিব-শরণ ও শিবযোগীদের জন্য। তাঁহার ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন, সিদ্ধ জীবন, তাই সে সময়ে আকৃষ্ট করে সহস্র সহস্র সাধারণ নরনারীকে। জনমনে তিনি পরিগ্রহ করেন শিবকল্প মহাপুরুষের আসন।

সেদিন অনুভব মণ্ডপে ভক্ত আর শিব-শরণেরা জড়ো হইয়াছেন। আত্মিক সাধনার নানা সমস্যা নানা জটিলতার হইতেছে সমাধান। এক সাধক বসভকে প্রশ্ন করেন "প্রভু-প্রভু বলে আকুল হয়ে কতো ডাকছি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। কিন্তু কই একান্ত আপনার জন হয়েও, প্রাণপ্রভু হয়েও, তিনি তো সাড়া দিচ্ছেন না। বলে দিন এবার আমি কি করি?"

---

১ বসভেশ্বর কমেমোরেশন্ ভলুম: কায়ক—ভি. কে. জাবলি।

বসভ অন্তর্লীন হইয়া যান। ভাবাবেশে নির্গত হয় আশ্বাসভরা এক 'বচন'—১

মুখে শুধু প্রভু-প্রভু বললে হবেনা কোন কাজ,
বিশ্বাসের ভিত্তি যেখানে নেই
'প্রভু' ডাক যে সেখানে শূন্যগর্ভ।
একবার বিশ্বাসে ভর করে দাঁড়াও,
অমনি হৃদয় তাঁর যাবে গলে,
এগিয়ে আসবেন প্রভু সঙ্গমেশ্বর—
এই যে আমি, এই যে আমি, ব'লে

এক নবীন সাধক সেবার বসভকে প্রশ্ন করেন, "ইষ্টদেব শিবে আত্মসমর্পণ করলে সাধকের কোন্ অবস্থা হয়, পরিপূর্ণতা ও আনন্দে কি তার হৃদয় ভরে ওঠে চিরতরে ?

বসভেশ্বর উত্তর দেন তাঁহার সদ্য রচিত এক 'বচনের' মধ্য দিয়া, সাধনা ও সিদ্ধির পথে দান করেন দিব্য প্রেরণা :

প্রভুর প্রতি সত্যকার প্রেম যখন জাগে,
মানুষের কামনা বাসনা হয় নিষ্কাশিত।
প্রভুর পদে যে নেয় আশ্রয় ও শরণাগতি.
অন্তরে তার থাকেনা ভেদ বৈষম্যের রেখা।
প্রেমের কারবারে যে হয় ধনী,
অপর ধনকে তুচ্ছ করে সে অবলীলায়।
পরা শান্তি লাভ করেছে যে সাধক,
ভ্রান্তি আর চাঞ্চল্য নেই তার জীবনে—
ঈর্ষা অহঙ্কারের গণ্ডী সে করেছে অতিক্রম,
পরম প্রভু আসন পেতেছেন তাঁর হৃদয়ে।

নব দীক্ষিত অপরিণত সাধকদের উদ্দেশ করিয়া বসভেশ্বর একস্থলে বলিতেছেন : "তোমার সাধনার বৈরীরা লুকিয়ে আছে

১ বচনস্ অব বসভন্না : অনুবাদ—মেনজেস্ অ্যাণ্ড অঙ্গাডি।

তোমারি দেহে মনে। তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে বিপন্ন পশুর মতো আর্ত্ত চীৎকার করতে হবে, উদ্ধারকে করতে হবে ত্বরান্বিত।"

একটি 'বচনে' এই আর্ত্ত ভঙ্গিটি তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শৈবধর্ম্মের তিনটি তত্ত্ব—পশু, পাপ ও পশুপতির তত্ত্ব এখানে আভাসিত :

হতভাগ্য পশু মুমূর্ষু হয়েছে খাদে পড়ে,
কি করে নিজেকে বাঁচাবে সে,
নিরুপায় হয়ে কতই বা ছুঁড়বে সে চারটে পা ?
নিজের প্রভুকেই ডাকতে হবে তাকে—
মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাবার আশায়।
তেমনি করে হে সাধক, হে পশু,
আর্ত্ত হয়ে ডাকো তোমার পশুপতিকে,
বলো—হে প্রভু, হে কৃপাময়,
টেনে তোল আমায় এই গহ্বর থেকে,
পাপ আর কলুষ আমায় চেপে ধরবার আগে
তোমার পুণ্যহস্তে করো আমায় উদ্ধার।

সঙ্গমেশ্বরের কৃপাই সাধকপ্রবর বসভের প্রধান উপজীব্য, এই কৃপাই তাঁহার পরমাশ্রয়। এ সম্বন্ধে তিনি প্রভুকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন :

তোমার কৃপায় অসম্ভব হয়ে ওঠে সম্ভব
শুষ্ক শাখায় নামে সবুজের স্নেহ—
জীর্ণপাতায় জাগে নূতন প্রাণের জোয়ার।
তোমার কৃপায় উষর ভূমিতে আসে স্নিগ্ধ সরসতা,
আর প্রাণঘাতী বিষ হয় অমৃত।
কৃপা তোমার এনে দেয় প্রাচুর্য্যের সমারোহ
হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গম দেব।

১১৫৩ খৃষ্টাব্দের কথা। মঙ্গলওয়াড়-এর রাজনৈতিক জীবনে এ সময়ে ঘটে এক চাঞ্চল্যকর পটপরিবর্ত্তন। চালুক্যরাজ তৃতীয় তইলো এ সময়ে দুর্ব্বল হস্তে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। নিজের সেনাধ্যক্ষ ও শাসনকর্ত্তাদের আয়ত্তে রাখার শক্তি তাঁহার নাই। শত্রুর আক্রমণ ও সামন্তরাজদের বিদ্রোহের ভয়ে তিনি সদা সন্ত্রস্ত।

ইতিমধ্যে রাজা এক মহাসঙ্কটে পড়িলেন। বিদ্রোহী কাকতীয় বংশের সামন্ত দ্বিতীয় প্রোলকে দমন করিতে গিয়া নিজেই হইলেন তাঁহার হস্তে বন্দী। বিজ্জল ও অন্যান্য অমাত্যদের হস্তক্ষেপের ফলে রাজা বন্দীদশা হইতে উদ্ধার পাইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় আর রাজধানী কল্যাণে ফিরিয়া আসিলেন না।

ইহার ফলে সারা রাজ্যে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা, প্রশাসন ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হয়। শক্তিমান শাসনকর্ত্তা বিজ্জল তখন মঙ্গলওয়াড়-এ বসিয়া ঘটনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেছেন, অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ভাবিতেছেন, দুর্ব্বল হস্ত হইতে যে রাজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িতেছে শক্তিধর বিজ্জল কেন তাহা অধিকার করিবেন না?

কলচুরি সম্রাটবংশে বিজ্জলের জন্ম। দুই-তিন পুরুষ যাবৎ চালুক্যরাজদের সামন্ত বা শাসনকর্ত্তা হিসাবে তাঁহারা কাজকর্ম্ম করিতেছেন। এবার সুযোগ আসিয়াছে রাজসিংহাসন অধিকারের, কলচুরি সাম্রাজ্য আবার প্রতিষ্ঠা করার। বিজ্জল ভাবেন, সেনা ও যুদ্ধ উপকরণ তাঁহার আছে, নিজে তিনি কুশলী যোদ্ধা, কুশাগ্রবুদ্ধি। রাজনীতিজ্ঞতায় তাঁহার জুড়ি নাই। অধিকাংশ অমাত্য ও সামন্ত মেরুদণ্ডহীন চালুক্যরাজার উপর আস্থা হারাইয়া বসিয়াছে, বরং তাঁহারা বিজ্জলেরই পক্ষপাতী। প্রজারাও উন্নততর শাসন ও আইন-শৃঙ্খলার প্রবর্ত্তনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এই সুবর্ণ সুযোগ বিজ্জল কেন হেলায় হারাইবেন? ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে কেন

তিনি গ্রহণ করিবেন অসহায় দর্শকের ভূমিকা ? না, আর দেরী করা নয়, রাজদণ্ড তাঁহাকে ছিনাইয়া নিতেই হইবে।[১]

অচিরে সুযোগও মিলিয়া গেল। রাজা তইলো বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইয়া রাজধানী কল্যাণে আর ফিরিয়া আসেন নাই। অমাত্য ও সেনাধ্যক্ষদের ষড়যন্ত্রের ভয়ে তিনি দূরে সরিয়া আছেন। নিজেই বরং তিনি আদেশ দিলেন তাঁহার প্রতিনিধিরূপে বিজ্জলই কল্যাণে অবস্থান করিবেন, গ্রহণ করিবেন সারা রাজ্যের শাসনভার।

বিজ্জল এবার সাড়ম্বরে কল্যাণে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই একদল সামন্ত ও শাসনকর্ত্তার সমর্থন নিয়া নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন।

মঙ্গলওয়াড় হইতে অন্যান্য সচিব ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে বসভেশ্বরকেও কল্যাণে আসিতে হয়। বিজ্জল রাজসিংহাসনে আসীন হইয়াই বসভেশ্বরকে নিযুক্ত করেন রাজ্যের কোষাগার-অধ্যক্ষরূপে।[২] আয়-ব্যয়ের সমস্ত কিছু দায়িত্বও তাঁহার উপর অর্পিত হয়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাগিদ ও তাঁহার নিজস্ব যুক্তিতর্ক যাহাই থাকুক, চালুক্য সিংহাসন বিজ্জল অন্যায়ভাবে জোর করিয়াই দখল করিয়াছেন। মনে মনে তিনি ঠিকই জানেন, ন্যায়নীতির দিক দিয়া কাজটা ভাল হয় নাই। অমাত্য ও সামন্তের মধ্যে একদল ঈর্ষা-পরায়ণ হইয়াছে, আর জনসাধারণের মধ্যে জাগিয়াছে অসন্তোষ। এ সময়ে বসভেশ্বরের মত একজন জনপ্রিয় ধর্ম্মনেতা তাঁহার পাশে থাকেন, ইহা তিনি চাহেন। কিন্তু বসভেশ্বরের উপরও আজকাল তিনি তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না।

১ বিজাপুর জেলার মুত্তগী নামক স্থানে একটি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বিজ্জলের তৎকালীন মনোভাব ও পরিকল্পনার চিত্র পাওয়া যায়। শিলালেখটি বিজ্জলের উত্তরাধিকারী রাজা রায়মুরারী সোভিদেবের আমলে উৎকীর্ণ হয়। দ্রঃ ডক্টর পি. বি. দেশাই : বসভ অ্যাণ্ড হিজ টাইম্‌স, পৃ : ২৯-৩০

২ চন্নমল্লিকার্জ্জুন : লাইফ টাইম অব বসভেশ্বর

বিজ্জল সনাতনী শৈব, বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপর তাঁহার তীব্র অনুরাগ। অপর দিকে দেখা যাইতেছে বসভ একজন সংস্কারবাদী বীরশৈব। ব্রাহ্মণ শূদ্রের তারতম্য তিনি মানেন না, শিবভক্ত ও লিঙ্গদীক্ষায় দীক্ষিত মানুষ মাত্রকেই সানন্দে কোল দেন। তাছাড়া, বিজ্জলের রাজসিংহাসন দখল করার কাজ-টাকেও বসভেশ্বর তেমন সুচক্ষে দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। তবুও সাময়িকভাবে বসভের প্রতিষ্ঠা, জনপ্রিয়তা ও লক্ষ লক্ষ বীরশৈবের নেতৃত্বকে রাজা কাজে লাগাইতে মনস্থ করিলেন।

রাজধানী কল্যাণে আসার পর হইতে বসভেশ্বরের মনে কিন্তু শান্তি নাই। কুচক্রী বিজ্জল হঠাৎ নিতান্ত অন্যায়ভাবে চালুক্য সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। অথচ তাঁহারই অধীনে বসভেশ্বরকে কাজ করিতে হইবে। নৈতিকতার দিক দিয়া মনে তিনি একটুও সায় পাইতেছেন না। বিপুল সংখ্যক শিব-ভক্তেরাই বা এ সম্পর্কে কি ভাবিতেছে? এ পরিস্থিতিতে কি তাঁহার কর্ত্তব্য, অচিরেই তাহা স্থির কবিতে হইবে। মন তাই বড় চঞ্চল হইয়া

এই সঙ্কটময় সময়ে সেদিন তাঁহার ভবনে আবির্ভূত হন মহা-সমর্থ শিবযোগী অল্লাম প্রভু। ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিয়া বসভেশ্বর কহেন, "প্রভুদেব, আপনার আগমনে এ ভবন আজ পবিত্র হয়েছে, আর আমিও অন্তরে পেয়েছি পরম শান্তি। রাজা বিজ্জলের অধীনে কাজ করার ইচ্ছা আর আমার নেই। কল্যাণনগর ত্যাগ করে আর কোথাও চলে যাবো বলে ভাবছি। কিন্তু তাতেও রয়েছে এক বড় বাধা। শৈবধর্ম্মের উজ্জীবন ও পুনর্গঠনের পবিত্র কাজটি আজ এমন একটা স্তরে এসে পৌছেছে যে এ সময়ে এ নগর ছেড়ে গেলে সমূহ ক্ষতি হবে। আন্দোলন শিথিল হয়ে পড়বে। আমায় বলুন, এ সঙ্কটে কোন্ পথ আমি অবলম্বন করবো।"

"বৎস, 'কায়কত্তে কৈলাস' এই কানাড়ী বাণীর রহস্য তুমি কি ভুলে গিয়েছো?"

"না, প্রভু। এক মুহূর্ত্তের তরেও তা ভুলি নি।"

"তোমার ব্যবহারিক জীবনের কাজ তো শিবেরই কাজ। রাজ্যে, সমাজে যা ঘটবার তা ঘটুক। তোমার তাতে কি হয়েছে? নিজের কাজের পরিমণ্ডলকে কৈলাস বলে জ্ঞান কর, নিষ্ঠাভরে তুমি তোমার কাজ করে যাও।"

"কিন্তু প্রভু, বিশ্বাসহন্তা পররাজ্য-অপহারক বিজ্জলের সান্নিধ্যটা যেন……।"

"তেমন ভালো লাগছে না, এই তো?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"রাজা বিজ্জল কি করেছেন না করেছেন তা দেখবেন শিব স্বয়ং। তুমি এ নিয়ে বৃথা কেন চঞ্চল হয়েছো? বিজ্জলের ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল অপেক্ষা তোমার সিদ্ধ জীবনের পরিমণ্ডল অনেক বেশী শক্তিশালী, অনেক বেশী জ্যোতির্ম্ময়। তাঁর সান্নিধ্যে থাকলে তোমার মতো সাধকের আবার কি অপকার হবে?"

"বুঝতে পারছি প্রভু, এ-ও আমার একটা বড় রকমের পরীক্ষা।"

"হ্যাঁ, বৎস, এই পরীক্ষাই তোমার শিবসাধনার শেষ পরীক্ষা। ঘৃণ্য পাপীর সান্নিধ্যে থেকেও তুমি অবিচল ও অনাসক্ত থাকো কিনা, সহজ সমাধি তোমার অধিগত হয় কিনা, তাই আমি দেখতে চাই।"

"বেশ প্রভু, তাই হবে, আপনার এ আদেশ সদাই হবে আমার শিরোধার্য্য।"

"একটা কথা মনে রেখো, বৎস। বিজ্জলের পাপের ভরা পূর্ণ হতে আর দেরী নেই। শিব সত্বরই তাঁর শাস্তি বিধান করবেন।"

"কিন্তু প্রভু, একটা বিশেষ নিবেদন আমার রয়েছে। অভয় দেন তো বলি।"

"বল বসভেশ্বর, তোমায় আমার অদেয় কিছুই নেই।"

শিব-ভক্ত শরণদের জন্য এক বিশাল অনুভব-মণ্ডপের প্রতিষ্ঠা আমি করেছি। আমি চাই, অধ্যক্ষ ও নিয়ন্তা হিসাবে আপনার নাম এর সঙ্গে যুক্ত হোক। এই পবিত্র মণ্ডপে আপনি মাঝে মাঝে

উপস্থিত হবেন, শিবযোগী ও শিবভক্তদের দান করবেন নিগূঢ় সাধনের উপদেশ। এই আমার প্রার্থনা।”

“বৎস, আমি তো সদাই তোমার ধর্ম্ম-আন্দোলনকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি, সাহায্যও করছি। তবে, শুধু শুধু আমার নামটি এর সঙ্গে যুক্ত রাখার কি সার্থকতা আছে, বলতো ?”

“প্রভু, আমার সাধনা ও সিদ্ধি যাই থাক্, রাজমন্ত্রী বলেই সবাই আমায় জানে। আর আপনার পরিচয় —আপনি মহামুক্ত সিদ্ধ-পুরুষ, এ দেশের শ্রেষ্ঠ শিবযোগী। তাছাড়া, বিস্ময়কর শক্তি-বিভূতি রয়েছে আপনার করায়ত্ত। আপনার পুণ্যময় নামটি বীরশৈবদের অনুভব-মণ্ডপের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দিন। তার ফলে আমাদের আন্দোলনেব শক্তি বৃদ্ধি পাবে বিপুল পরিমাণে।”

“বেশ বৎস, তাই যদি হয়, আমার নাম এতে যুক্ত করে দিয়ো। আমি স্বেচ্ছামত তোমাদের মণ্ডপে মাঝে মাঝে এসে উপস্থিত হবো, তোমাদের সমস্যার সমাধানে সাহায্যও করবো।”

বসভেশ্বরকে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ জানাইয়া অল্লাম-প্রভু ধীরপদে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কল্যাণ দাক্ষিণাত্যের এক শ্রেষ্ঠ নগর এবং বিজ্জলের রাজধানী। এই নগরই এখন হইতে বীরশৈব আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। বসভেশ্বরের ভবনে, তাঁহার অনুভব-মণ্ডপে, হাজার হাজার শিবভক্ত গৃহস্থ, যোগী, জঙ্গম আসিয়া ভীড় করে। আর সমদর্শী সাধক বসভ এই সব ভক্তদের জ্ঞান করেন ইষ্টদেব শিবের প্রতিভূ বলিয়া, তাঁহাদের ডাকেন—‘মহেশ্বর’ নামে।

রাজমন্ত্রীরূপে বসভেশ্বর প্রচুর বেতন পান, কিন্তু এই বেতনের সামান্য কিছু নিজ পরিবারের জন্য রাখিয়া আর সবই ব্যয় করেন অভ্যাগত ‘মহেশ্বর’দের অশন-বসনের জন্য। প্রতিদিন শত শত নরনারী পংক্তি ভোজন করে বসভেশ্বরের অঙ্গনে। উৎসবে পার্ব্বণে যেদিন ভাণ্ডারা দেওয়া হয় সেদিন তো অগণিত ভক্ত, সাধু ও সন্ন্যাসী

ভোজনে বসিয়া যায়। ভক্তি-ভাণ্ডারী বসভেশ্বরের অর্থভাণ্ডারও হয় সেদিন সাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

তাঁহার গৃহের এই অন্নসত্রের খ্যাতি প্রচারিত হয় দেশের দিক্-বিদিকে। কিন্তু এ খ্যাতিই এক অনর্থ ডাকিয়া আনে।

সনাতনপন্থী শৈবেরা কোনদিনই বসভের উপর তেমন প্রসন্ন নন। তাঁহার উদার বৈপ্লবিক মতবাদ এসময়ে বহু নরনারীকে আকৃষ্ট করিতেছে, বীরশৈবদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় রাজধানী হইতেছে কম্পিত। বসভেশ্বরের গৃহের এই জনসংঘট্ট প্রাচীনপন্থী শৈব আচার্য্যদের আর সহ্য হইতেছে না। রাজা বিজ্জল তাঁহাদের মতোই সনাতনী শৈব। এবার তাঁহার দরবারে মন্ত্রী বসভেশ্বরের নামে এক অভিযোগ উত্থাপিত হইল। অভিযোগকারীদের সমর্থন জানাইলেন বসভের বিরোধী একদল অমাত্য।

সবাই কহিলেন, "মহারাজ, অর্থমন্ত্রী ও কোষাগারের অধ্যক্ষ বসভেশ্বরের উপর সমস্ত কিছুর ভার দিয়া আপনি পরম নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু আপনার মন্ত্রী যে তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন সে খবর আপনি রাখেন না।"

রাজা বিজ্জল চমকিয়া উঠেন, প্রশ্ন করেন, "কি তাঁর অপরাধ, রাজ-সরকারের কি ক্ষতি তিনি করেছেন তা কি আপনাদের জানা আছে? তবে সব আমায় খুলে বলুন।"

"মহারাজ, আপনি কি জানেন, বসভেশ্বরের ভবনে রোজ কয়েক হাজার বীরশৈব প্রসাদ পায়? কিন্তু টাকা আসে কোত্থেকে? আপনার কোষাগার থেকেই এ টাকা ব্যয়িত হচ্ছে।"

"না-না, তা হতে পারে না, বসভেশ্বর তেমন লোক নয়। উচ্ছৃঙ্খল ধরণের একটা শৈবধর্ম্ম নিয়ে যতই মাতামাতি করুক, সরকারী তহবিল তছরূপ কখনো সে করবে না।"

"সুচতুর মন্ত্রী বসভেশ্বর আপনার চোখে ধুলো দিচ্ছে। আপনি অবিলম্বে হিসাব পরীক্ষা করুন, তার অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ নিশ্চয় পেয়ে যাবেন।"

রাজা মনে মনে ভাবিলেন, 'বেশ তো, একদল সম্ভ্রান্ত আচার্য্য কথাটা যখন তুলেছেনই, রাজকোষ পরীক্ষা করে দেখা যাক্ না কেন ?'

তৎক্ষণাৎ রাজার সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে হিসাব-নিকাশ নেওয়া হইল, কোষাগারের নগদ অর্থ-গণনাও বাদ গেল না। কিন্তু তহবিল ভাঙ্গার কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

রাজা বিজ্জল এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন, "মন্ত্রীবর, বলুন তো আপনার ভবনে রোজ হাজার হাজার লোকের পাত্ পড়ে, তার ব্যয় সঙ্কুলান কি করে হয় ?"

বসভেশ্বর সবিনয়ে নিবেদন করেন, "মহারাজ, বীর শৈবদের কায়ক তত্ত্বে আমি বিশ্বাস করি। পরিশ্রম দ্বারা যে অর্থ আমি উপার্জ্জন করি তার নগণ্য অংশ পরিবারের জন্য রেখে দিয়ে আর সব উৎসর্গ করি শিবের প্রতিভূ শিবভক্তদের জন্য। আমার মত এই তত্ত্বে অনেকেই বিশ্বাসী, তাঁদের প্রদত্ত অর্থও ভক্ত জঙ্গমদের সেবায় যথেষ্ট সাহায্য করে। শিবের কাজে অর্থের অভাব হবার তো কথা নয়, মহারাজ।"

রাজা বিজ্জল, তখন বেশ কিছুটা অপ্রস্তুত। অভিযোগকারী পণ্ডিতেরাও অতঃপর ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন।

বসভেশ্বরের দৃষ্টিতে শিবভক্ত মাত্রেই 'মহেশ্বর'। তাঁহার ভবনের ভৃত্য ও রক্ষীরা তাঁহারই শৈব মতবাদে বিশ্বাসী, তাই এই সব ভৃত্য ও রক্ষীদের তিনি গণ্য করেন ইষ্টের বিভূতি রূপে। গৃহের একটি ভৃত্যের, প্রতিবেশী একটি ভক্তের, আহার সমাধা না হওয়া অবধি বসভ নিজে কোন আহার গ্রহণ করেন না। এমনি ছিল তাঁহার ধর্ম্মানুশীলনের নিত্যকার রীতি।

একদিন গভীর রাতে বসভেশ্বরের গো-গৃহে চোর আসিয়া উপস্থিত হয়। দুগ্ধবতী, সুপুষ্টা কয়েকটি গাভী নিয়া চোরেরা তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে সরিয়া পড়ে।

রাত্রি প্রভাত হইলে ভৃত্যেরা চুরির ঘটনা জানিতে পারে এবং তাড়াতাড়ি মনিবকে তাহারা সংবাদ দেয়।

গো-গৃহে পৌঁছিয়া বসভেশ্বর দেখেন, মাতৃহারা গো-বৎসগুলি করুণনয়নে চাহিয়া আছে, কোন আহার্য্য গ্রহণে তাহাদের রুচি নাই। বসভেশ্বর মহাউদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন, মা-হারা হইয়া কিরূপে ইহারা প্রাণে বাঁচিবে? দুই চোখ তাঁহার জলে ভরিয়া উঠে।

ব্যগ্রস্বরে পরিচারকদের কহেন, "এক্ষুনি তোমরা সবাই চোরদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো। তোমরা ফিরে না আসা অবধি আমার পক্ষে আহার নিদ্রা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। চোরদের ঠিকানা পেলে তক্ষুনি এই বৎসগুলোকে তাদের মায়েদের কাছে পৌঁছে দাও।"

আদেশমত সন্ধান তখনই শুরু হইয়া যায়। তস্করদের ধরিয়া আনা হইলে বসভেশ্বর কহেন, "ভাই, দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ তা বজায় থাক। তোমাদের ঘরে দধি দুগ্ধের সরবরাহ বেড়ে যাক, শিবভক্তদের সেবা হোক বোধ হয় এটাই প্রভুর ইচ্ছা। তোমরা গাভীগুলো রেখেই দাও আর এই বৎসগুলোকে এখনি নিয়ে যাও তোমাদের ঘরে। আহা! মা-হারা হয়ে কি দুঃখে এরা রয়েছে।"

শিবপ্রতিম সাধকের এই অদ্ভুত আচরণে তস্করদের চোখে জল আসিয়া যায়। বসভেশ্বরের চরণে শরণ মাগিয়া সেইদিন হইতেই তাঁহারা শুরু করে উন্নততর জীবন। কৃপালু বসভেশ্বর উত্তরকালে ইহাদের লিঙ্গদীক্ষা দান করিয়াছিলেন।

বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের নেতার পদে বসভেশ্বর এখন সমাসীন। এই সম্প্রদায়ের জন্য দরকার সুসম্বদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের। সাধনা ও সিদ্ধির ক্রমিক পর্য্যায় নির্ণয় করা, পুরাতন শৈবপন্থার সংস্কার-সাধন, নবদীক্ষিত বীরশৈবদের আচার বিচার ও নৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ—এই সব গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্ম তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে।

তাঁহার নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির সহিত, সংস্কারপন্থী আদর্শ ও আচরণের সহিত যুক্ত হয় অনুভবমণ্ডপে আগত শিবভক্ত ও সিদ্ধযোগীদের মতবাদ। এই সংযুক্তি ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়া বীরশৈব সম্প্রদায়ের ভাবধারা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, আচার-ব্যবহারের নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়।

বসভেশ্বরের ধর্ম্ম-আন্দোলনের প্রধান সহায়ক তাঁহার প্রতিভাধর ভাগিনেয় চেন্ন-বসভ, বালককাল হইতেই চেন্ন-বসভের জীবনে দেখা দেয় আত্মিক মুক্তির ব্যাকুলতা, শৈব দর্শন ও শৈব যোগসাধনায় অতি অল্পকাল মধ্যে তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠেন। বীরশৈববাদের প্রচার ও সংস্কারধর্ম্মী মতবাদ সংস্থাপনে তিনি মাতুল বসভেশ্বরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠেন।

এই সঙ্গে তাঁহাদের শক্তি বৃদ্ধি করেন, শোলাপুরের ভক্ত সিদ্ধরাম, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও উচ্চকোটির শৈব সাধক মদিভাল মচ্ছইয় প্রভৃতি। বসভেশ্বরের ধর্ম্ম-আন্দোলন ইঁহারা শক্তি সঞ্চার করেন, দিকে দিকে ছড়াইয়া দেন তাঁহার বাণী ও আদর্শবাদ। সর্ব্বোপরি তাঁহার বীর শৈববাদ উপকৃত হয় এবং সাধক ও দার্শনিক সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভুর আশীর্ব্বাদ ও সহযোগিতার ফলে।

বসভেশ্বরের ধর্ম্ম-আন্দোলনে সিদ্ধ নারী-সাধিকাদের অবদান কম নয়। তাঁহার অনুভবমণ্ডপে ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদবৈষম্য যেমন ছিল না, তেমনি পুরুষ ও নারীর ছিল সমান মর্য্যাদা এবং সমান অধিকার। ধর্ম্মীয় উদারতার দিক দিয়া এটি বসভের এক অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি। বহুকাল আগে গৌতম বুদ্ধ তাঁহার মণ্ডলীতে নারী সাধিকাদের প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে তিনি ও তাঁহার শিষ্যেরা নারীদের এই অধিকার দানে তেমন ইচ্ছুক ছিলেন না। বসভেশ্বরের বেলায় কিন্তু দেখি, নারীদের সমমর্য্যাদা দিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বা দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং সাধনজীবন গঠনের ব্যাপারেও দেখা গিয়াছে তাঁহার অসামান্য নিষ্ঠা ও তৎপরতা।

বীরশৈব সাধিকা লকম্মা ছিলেন ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ। কল্যাণনগরে সাধক বসভেশ্বরের তখন বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। প্রতিদিন তাঁহার অনুভবমণ্ডপে শিবভক্ত ও শিবযোগীদের সমাবেশ হয়। ধর্ম্মালাপ ও বিচার বিশ্লেষণের শেষে হাজার হাজার ভক্ত নরনারী আনন্দ কলরবের মধ্যে ভোজনপর্ব্ব সমাধা করে।

লকম্মা ও তাঁহার স্বামী একদিন কৌতূহল ভরে অনুভবমণ্ডপে আসিয়া হাজির হন। বসভ তখন শিবযোগীদের কাছে কায়ক-এর তত্ত্ব বুঝাইতেছেন। কি করিয়া মানবজীবন ও ব্যবহারিক কর্ম্মকে ইষ্টদেব শিবের চরণে উৎসর্গ করিতে হয়, কি করিয়া গার্হস্থ্য জীবনকে পরিণত করা যায়। পুণ্যময় কৈলাসরূপে তাহার ব্যাখান চলিতেছে। বসভের ব্যক্তিত্বে ও আন্তরিকতায় লকম্মা ও তাঁহার স্বামী মুগ্ধ হইলেন, ভাষণ শেষে আশ্রয় নিলেন তাঁহার চরণতলে, বসভেশ্বরের কাছে লিঙ্গদীক্ষা নিয়া এই দম্পতি শুরু করিলেন ত্যাগ তিতিক্ষাময় সাধনা।

লকম্মার বৈরাগ্য ও সংযম ছিল অসাধারণ। কথিত আছে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে প্রতিদিন যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক তণ্ডুল ভোজনের জন্য রন্ধন করিতেন, তাহা অপেক্ষা বেশী হইলে লকম্মা তৎক্ষণাৎ স্বামীকে দিয়া ভিখারীদের মধ্যে উহা বিতরণ করাইতেন। পরবর্ত্তী বেলার জন্য একটি তণ্ডুলকণাও তিনি নিজের কুটিরে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে দিতেন না।

বসভেশ্বর নারী-ভক্ত শিষ্যাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন অক্কা মহাদেবী।[১] এই শিষ্যার প্রশংসায় বসভেশ্বর নিজে ছিলেন পঞ্চমুখ। তা ছাড়া, তাঁহার শিষ্য ও সহকর্ম্মী সিদ্ধরাম, মাদিভায়ল, চেন্ন-বসভ হইতে শুরু করিয়া যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভু অবধি অনেকেই এই সাধিকার যোগসিদ্ধি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।

মহাদেবী ছিলেন দাক্ষিণাত্যের একটি রাজ্যের রাজা কৌষিকের

---

১ সরোজিনী শিনূত্রি: বসভ অ্যাণ্ড উওম্যান হুড, সেন্টিনারী মেমোরিয়াল ভল্যুম, গবর্নমেন্ট অব মাই সোর।

মহিষী। তরুণ বয়স হইতেই এই ভক্তিমতী মহিলার জীবনে আসে অজানা লোকের আহ্বান, শিববিগ্রহের সেবা-পূজার জন্য অন্তরে জাগে আকুল আগ্রহ। স্বামী কিন্তু স্ত্রীর ধর্ম্মানুরাগ তেমন সুচক্ষে দেখেন নাই; সুযোগ পাইলেই শিবের নিন্দা সমালোচনায় তিনি মুখর হইয়া উঠিতেন।

মহাদেবীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই, ইষ্টদর্শনের আকাঙ্ক্ষা বরং দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিতেই থাকে। ইতিমধ্যে হঠাৎ রাজভবনে আগমন ঘটে এক বীরশৈব সন্ন্যাসীর। ইহার কাছে বসভের কথা, কল্যাণের অনুভবমণ্ডপ ও বীরশৈবদের সমাবেশের কথা তিনি জানিতে পারেন। প্রাণে জাগিয়া উঠে মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ভিতর হইতে বার বার কে যেন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতে থাকে—"ওরে, মহাসাধক বসভেশ্বরই তোমার চিহ্নিত গুরু, তাঁর কৃপা পেলে তবেই পূর্ণ হবে তোর ইষ্ট দর্শনের সঙ্কল্প।"

অতঃপর আর একদিনও মহাদেবী স্বামীর প্রাসাদে বাস করেন নাই। গোপনে রাজ-অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া চলেন কল্যাণ নগরীর দিকে। প্রভু বসভেশ্বরের চরণে স্থান না নেওয়া অবধি জীবনে তাঁহার শান্তি নাই, স্বস্তি নাই।

তাঁহার মতো রূপসী তরুণীর পক্ষে একাকিনী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা সহজ কথা নয়। বিঘ্ন বিপদ, দুঃখ দুর্দ্দশা, দিনের পর দিন এ সময়ে কম আসে নাই। কিন্তু মহাদেবী যে ইষ্টদেবের কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন, তাঁহারই কৃপায় সফল হইল এই অভিযাত্রা। অচিরে বসভেশ্বরের দর্শন তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

তীব্র মুমুক্ষা ও আর্ত্তি নিয়া মহাদেবী গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। সর্ব্বস্ব ছাড়িয়াছেন সর্ব্বময় পরম শিবকে লাভ করার জন্য। ত্যাগ-বৈরাগ্যময় সাধনার প্রস্তুতি তাঁহার জীবনে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। নিষ্ঠা ও পবিত্রতায় ভরা এই নারী সাধিকাকে দর্শন মাত্রেই বসভেশ্বর তাঁহাকে সেদিন মা বলিয়া ডাকিলেন,

দিলেন তাঁহাকে শৈব যোগের নিগূঢ় সাধনা। উত্তরকালে এই তরুণী শিষ্যার সঙ্গে তিনি ব্যবহার করিতেন অল্পবয়স্ক পুত্রেরই মতো।

দিব্যদৃষ্টি সহায়ে বসভ বুঝিলেন, এই নবাগতা শিষ্যার সাধন-জীবনে রহিয়াছে বিরাট সম্ভাবনা। তাই শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনতত্ত্ব দুই-ই তিনি অকৃপণ করে ঢালিয়া দিলেন তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব আধারে। অল্পকাল মধ্যে অক্কা মহাদেবী বীরশৈব সাধনার এক স্তম্ভরূপে গণ্য হন, চিহ্নিত হন এক সিদ্ধ সাধিকা রূপে। শত শত নারী তাঁহার সান্নিধ্য ও উপদেশ লাভে কৃতার্থ হয়।

এই শিষ্যার সিদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বসভেশ্বর বরাবরই অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। মহাদেবী যে উচ্চকোটির সাধিকা তাহা সবাইকে জানানোর জন্য সেবার তিনি এক কৌশল অবলম্বন করেন।

অল্লাম প্রভু এ সময়ে কয়দিনের জন্য কল্যাণে আসিয়াছেন। অনুভবমণ্ডপে তাই ভক্ত, যোগী ও সাধু-সন্ন্যাসীর ভীড়ের অন্ত নাই। বসভেশ্বর সেদিন অক্কা মহাদেবীকে এই বিরাট গুণীজন সমাবেশের সমক্ষে দাঁড় করাইয়া দেন। আর অল্লাম প্রভুকে অনুরোধ করেন, তাঁহার এই নবীনা শিষ্যার সাধনা ও সিদ্ধি কোন্ স্তরে অবস্থিত তাহা যেন তিনি নির্ণয় করিয়া দেন।

অল্লাম ও অপরাপর যোগীদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া অক্কা মহাদেবী সবাইকে সেদিন বিস্মিত করেন। অতঃপর শুধু বীরশৈব মহলেই নয়, দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন ধর্ম্মমণ্ডলীতে এই মহিয়সী নারী সাধিকার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে।

বসভেশ্বরের কাছে ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শূদ্র, স্ত্রী-পুরুষের যেমন ভেদবৈষম্য নাই। তেমনি নাই নবীন প্রবীণ সাধকদের। অনুভব মণ্ডপের সভায় নিত্য নূতন কত সাধনেচ্ছু ভক্তেরা আসে। বসভেশ্বর অপার প্রেম ও স্নেহ নিয়া সাহায্য করেন তাঁহাদের আত্মিক জীবন গঠনে। এই সময়ে বেদী হইতে বীরশৈবদের নির্দ্দেশ দিতে গিয়া যে সব বচন তিনি রচনা করেন, উত্তরকালের সাধকদের কাছে তাহা গণ্য হইয়া রহিয়াছে অমূল্য সম্পদ রূপে।

বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎরা কণ্ঠে লিঙ্গ-ধারণ করে দীক্ষার দিন হইতে। মন্দির বা বিগ্রহ পূজা তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। এই সম্পর্কিত একটি 'বচনে' বীরশৈবদের মতবাদ পরিস্ফুট :

যাদের আছে বিপুল বিত্ত বিভব
হে প্রভু, তারা তৈরী করুক তোমার মন্দির,
কিন্তু আমার মত বিত্তহীন তা করবে কি দিয়ে ?
আমার নিজের চরণ দুটিই হচ্ছে স্তম্ভ,
তার ওপর স্থাপিত রয়েছে আমার দেহরূপ মন্দির—
আমার শিরোদেশে এই মন্দিরের গম্বুজ।
হে প্রভু, ইঁট কাঠ দিয়ে গড়া যে মন্দির
তাতো একদিন ধ্বসে পড়ে গুঁড়ো হয়ে যায় ;
কিন্তু আমার এই সিদ্ধ কায়া—
চলমান মন্দির রূপে ছড়াবে তোমার দিব্য নাম,
বেঁচে থাকবে, আর অটুট থাকবে দীর্ঘকাল।

বীরশৈবদের সাধনায় কায়কের কথা, ইষ্টদেব শিবের চরণে নিবেদিত কর্ম্মের কথা, রহিয়াছে। কিন্তু কায়াকে ক্লিষ্ট করিয়া যে সাধনা অনুষ্ঠিত হয় তাহার কথা নাই। দেহের উপর নির্য্যাতন না চালাইয়া মনকে নিয়ন্ত্রিত কর, সম্পূর্ণরূপে বশীভূত কর—ইহাই যে প্রভু সঙ্গমেশ্বর চাহেন। তাই বসভেশ্বর বলিতেছেন :

প্রকাণ্ড এক উই-এর ঢিবির নীচে
লুকিয়ে আছে বিষাক্ত গোখ্‌রা সাপ,
উই ঢিবির ওপরে যদি ক'র লাঠির আঘাত
গভীরে লুকানো সাপ হয় কি নিহত ?
তেমনি বাইরের এই দেহের অস্থি মজ্জা মাংসে
যতই চালাও কৃচ্ছ্র আর নির্য্যাতন—
হৃদয়ের যদি না হয় কোন শোধন,
পাপ আর অজ্ঞানতার না হয় মৃত্যু,

তবে মিলবেনা আমার প্রভুর অনুমতি,
এই দেহের নিপীড়ন করবেন না তো সমর্থন।

নবীন শিষ্যেরা বসভকে প্রশ্ন করেন, "প্রভু, পিচ্ছিল মনকে নিয়ে তো আর পারছিনে। ইষ্টধ্যানে একে কেন্দ্রীভূত করা যে এত দুঃসাধ্য তা তো জানতেম না। এর প্রতিবিধান কি বলুন তো।"

এই সব নবীন শিষ্যদের সতর্ক করার জন্য বসভেশ্বর একটি 'বচনে' বলিতেছেন :

মন বশ করার কথা বল্‌ছো, হে সাধক,
হিংস্র ক্রুর কেউটে সাপের মত যে এই মন।
যতক্ষণ থাকে সাপুড়ের মোহনিয়া বাঁশীর বশ,
ততক্ষণ হিংসা আর খলতা যায় ভুলে,
সুরে সুরে ফণা নাচিয়ে কত খেলাই না খেলে,
আর ক্রীতদাসের মত করে সে আত্মসমর্পণ।
কিন্তু সাপুড়ের একটি মুহূর্তের ভুল
এনে দেয় অভাবনীয় বিপদ আর বিনষ্টি,
ক্ষিপ্রবেগে কেউটে হঠাৎ ছোবল্ মেরে বসে—
ঢেলে দেয় তার প্রাণঘাতী বিষ।
তাই জানাও তোমার আকুল প্রার্থনা,
বল, হে মোর প্রভু, হে কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর
সাধন-জীবন আমার সদাই যেন থাকে
সদা সতর্ক, থাকে যেন সংযমের কঠিন বন্ধনে—
মন ভুজঙ্গ তাকে যেন না করে দংশন।

......, নিষ্ঠাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ সাধনা ও সিদ্ধির কথা ভাবিয়া ভয় পায়। ক্ষুদ্র শক্তি নিয়া অনাদি অনন্ত দেবাদিদেবকে কি কখনো লাভ করা যায়, এই প্রশ্ন তাঁহার আত্মিক অভিযাত্রাকে সংশয়াকুল করিয়া তোলে। এই সব সাধকের জন্য বসভেশ্বর উচ্চারণ করেন আশ্বাসের বাণী :

ক্ষুদ্র ও বৃহতের প্রশ্ন নিয়ে
কেন শুধু নিজেকে কর হতাশ আর উদ্‌ভ্রান্ত?
বিশালকায় হস্তী—বিপুল সামর্থ্য তার দেহে,
অথচ ছাখো, অঙ্গুলি প্রমাণ একটি অঙ্কুশ
অবলীলায় করছে তার নিয়ন্ত্রণ।
আকারে ক্ষুদ্র বটে এই অঙ্কুশ
কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণের পরিধি কি বিস্তৃত।
গগনচুম্বী প্রস্তরীভূত ঐ যে পাহাড়,
ওর গর্ভে রয়েছে ক্ষুদ্র এক টুকরো হীরে,
তীব্র দ্যুতির ছটায় করছে ঝলমল,
আকারে ক্ষুদ্রতা, না দ্যুতির ঝলক্—
কি দিয়ে করবে তার মূল্য নিরূপণ?
দূরবিস্তারী সূচীভেদ্য অন্ধকার—
ক্ষুদ্র একটি মোমের আলোয় মুহূর্তে হয় দূর,
এই মোমের আলো কি তুচ্ছ হবে ক্ষুদ্র বলে?
হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গম দেব,
ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ যে মন আমার
তোমার মত ভূমাকে, বিভুকে ধারণ করে হয় ধন্য—
সে মনকে কি ক্ষুদ্র বলে করবো হেলা?

এক সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠীর পুত্র বসভেশ্বরের কাছ হইতে নিয়াছেন লিঙ্গ-দীক্ষা। তারপর শুরু করিয়াছেন তাঁহার আত্মিক সাধনা। এই সঙ্গে বীরশৈব আন্দোলনকে দিকে দিকে বিস্তারিত করার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ও তৎপরতার অবধি নাই। নিজের প্রচুর ধন-সম্পদ ও লোকলস্করও এই মহান কর্মে তিনি নিয়োজিত করিয়াছেন। কিন্তু সাধন-জীবনে তেমন কিছু উন্নতি এযাবৎ তাঁহার হইতেছে না। অনুভবমণ্ডপের সম্মেলনে একদিন এই শিষ্যটি তাঁহার এই সাধনদৈন্যের কথা নিয়া খেদোক্তি করিলেন। বসভেশ্বর কহিলেন:

হাতীর পিঠে কিংখাব-মোড়া হাওদায় ব'সে
চলেছো তুমি রাজার মতো,
শরীরে লেপন করেছো সুগন্ধী প্রসাধন।
কিন্তু এই রাজকীয় বিলাসিতার ভীড়ে
সত্যকে জানবে কি করে বলতো ?
অহং-এর বিলয়ে নিহিত রয়েছে পরমধর্ম্ম—
সে ধর্ম্মের বীজ তো আজও করনি বপন ?
অহমিকার হাতীতে চড়ে স্ফীত হয়েছো গর্ব্বে,
এই গর্ব্বই তোমায় ফেলবে টেনে ভূমিতলে।
প্রভু সঙ্গমেশ্বরকে জানতে চাওনি তুমি—
জানতে চেয়েছো নরকের আস্বাদ।

হিংসা, পাপ আর কদাচারে সারা দেশ তখন ভরিয়া গিয়াছে। সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্য, সংস্কারবাদী নূতন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি গঠনের জন্য বহু তরুণ এসময়ে উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু বসভেশ্বরের মূল কথা—আগে নিজেকে কর শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, মোহাচ্ছন্ন মনকে করাও মুক্তিস্নান, তারপর শিবশক্তিতে শক্তিমান হইয়া অগ্রসর হও জগতের কল্যাণে। তিনি বলিতেছেন :

কুটিলতার জটিল ঘৃণ্য জালে
ছেয়ে গেছে আমাদের এই পৃথিবী—
সেই জাল তুমি ছিন্ন করতে চাও,
চাও এই পৃথিবীকে সরল করতে, সুন্দর করতে ?
কিন্তু কে তুমি ? কে দিয়েছে তোমায় এ কর্ত্তৃত্ব ?
নিজের জটিলতাকে আগে সরল করে নাও,
দেহ আর মনকে শুদ্ধ কর, ঋজু কর—
তবে তো করবে অপরকে কলঙ্কমুক্ত।
প্রভু সঙ্গমেশ্বরের কাছে কপটতার নেই স্থান,
নিজের জন্য সবার আগে কর অশ্রু বিসর্জ্জন,
কুটিলতা আর মলিনতা দাও ধুয়ে মুছে,

তবেই প্রভুর কাছ থেকে পাবে অনুমতি,
অপরের কলঙ্ক তখন করবে বিমোচন।

সিদ্ধ শিবযোগী অল্লাম প্রভুর শ্রীমুখ হইতে বসভেশ্বর প্রাপ্ত হইয়াছেন পরা-ভক্তি ও মহা-প্রেমের পরমতত্ত্ব। এই তত্ত্বটি বীরশৈব সাধকদের অন্তর পটে সদাই তিনি উৎকীর্ণ করিয়া দিতেন। কহিতেন, "ইষ্টের প্রতি প্রেম থাকবে সারা প্রাণমন জুড়ে, সারা জীবন জুড়ে, তবে তো আত্মিক সাধনায় আসবে সিদ্ধি, হবে পরম প্রাপ্তি। এই তত্ত্বটি বসভের একটি 'বচনে' চমৎকাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে[১] :

খেলার আনন্দে নিশ্চয়ই মেতে ওঠো তুমি,
গান গাও সুরে ছন্দে তাল-লয়ে,
গ্রন্থপাঠ হয়তো এনে দেয় কতই পাণ্ডিত্য,
কিন্তু সব কিছুই যে হয়ে যায় ব্যর্থ,
যদি না দাসোহং ব'লে একান্ত নিষ্ঠায়
আশ্রয় নাও প্রভুর রাতুল চরণে।
পেখম ধরে ময়ূরী কত নাচই তো নাচে,
বীণার তারে বেজে ওঠে কত না মধু ঝংকার
তোতার কণ্ঠে কতনা শেখানো বুলি ঝরে,
কিন্তু তাতে হৃদয়ের পেলব স্পর্শ কোথায় ?
প্রাণে তোমার প্রেমের বাতি জ্বালিয়ে
যদি না ডাকো আকুল হয়ে, তবে কি করে
প্রভু তোমায় করবেন অঙ্গীকার ?

বসভেশ্বর এখন সাধনা ও ধর্ম্মজীবনের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। তাঁহার বীরশৈব মতবাদ দেশের অসংখ্য পণ্ডিত ও সাধকের সমর্থন লাভ করিয়াছে।' শ্রেষ্ঠ শিবযোগী অল্লাম-প্রভুর মূল্যবান সহযোগিতা এবং অনুভবমণ্ডপের অধ্যক্ষতাও বসভেশ্বরের খ্যাতি প্রতিপত্তি কম বাড়ায় নাই। লক্ষ লক্ষ সংস্কারপন্থী শিবভক্ত এখন তাঁহাকে অনুসরণ

১ সিলেক্‌টেড্‌ সেইং অব বসভ : বাগি

করিতেছে, শিবকল্প গৃহী-যোগীরূপে দিতেছে তাঁহাকে অভাবনীয় শ্রদ্ধা ও সম্মান।

বলা বাহুল্য, বসভের এই মর্য্যাদা ও জনপ্রিয়তায় সনাতনী শৈবেরা মোটেই খুসী নয়। বরং তাহাদের ঈর্ষা দিন দিন আরো বাড়িতেছে। রাজা বিজ্জলও আজকাল মন্ত্রী বসভেশ্বরের অসাধারণ প্রতিপত্তিতে বেশ কিছুটা চিন্তিত। তাছাড়া, ব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্যকে একাকার করিয়া দিয়া বসভ বেদাচার বিরোধী কাজ করিতেছেন, ইহাও রাজার মনঃপুত নয়। অথচ হঠাৎ তাঁহাকে পদচ্যুত করাও সমীচীন হইবে না। জনসাধারণের বিশাল অংশ তাঁহাকে দেবতার মতো জ্ঞান করে। তাঁহার বা তাঁহার ধর্ম্মান্দোলনের উপর কোন হস্তক্ষেপ এইসব ভক্ত অনুগামীরা সহ্য করিবে না। বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ হয়তো শুরু করিয়া দিবে। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তোইলোকে সিংহাসনচ্যুত করার পর হইতেই অমাত্য ও সচিবদের মধ্যে একটা বিরোধী দল গজাইয়া উঠিয়াছে। গোপনে বেশ কিছুটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে, এ সংবাদও বিজ্জলের অজানা নয়। তাই এ সময়ে বসভেশ্বরকে ঘাঁটানো কূটনীতির দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁহার অনুগামী বিপুল সংখ্যক বীরশৈবদের ক্ষেপাইয়া তোলাও হইবে এক চরম নির্ব্বুদ্ধিতা। তাই বিজ্জল এখনই তাঁহাকে আঘাত করিতে ইচ্ছুক নন। অদূর ভবিষ্যতে কোন সময়ে এ সুযোগ হয়তো আসিবে, এই প্রতীক্ষায়ই দিন গুণিতেছেন।

এ সময়ে বসভেশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহার ফল হয় দূরপ্রসারী।

কম্বলিয় নাগিদেব নামে অন্ত্যজ সাধক এক শহরের প্রান্তে বাস করিতেন। একজন সাধননিষ্ঠ বীরশৈব বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। অনুভবমণ্ডপের সভায় প্রবীণ শৈব সাধকেরাও ইঁহার মতামতের গুরুত্ব দিতেন, সবাই তাঁহাকে দেখিতেন সম্মানের চোখে।

ঘুরিতে ঘুরিতে বসভ সেদিন নাগিদেবের বাড়ীর সম্মুখে গিয়া

উপস্থিত। একটি ক্ষুদ্র ভক্তগোষ্ঠী সেখানে সমবেত হইয়াছে এবং শিব-উপাসনার নানা নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ চলিয়াছে।

বসভেশ্বরকে দেখিয়া গৃহস্বামী ও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা তো মহা আনন্দিত। সোৎসাহে অভ্যর্থনা জানাইয়া তাঁহাকে গৃহের ভিতরে আনা হইল। শ্রদ্ধাভরে তাঁহার উপদেশ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে ধন্য হইলেন।

বেলা বাড়িয়া গিয়াছে। বসভ এবার ভক্তদের কাছে বিদায় নিবেন। নাগিদেব যুক্ত করে কহিলেন, "প্রভু, আমাদের পরম সৌভাগ্য, এই দীনের কুটিরে আপনার মতো সিদ্ধ মহাপুরুষের পায়ের ধূলি পড়লো। আজ এখানে ইষ্টগোষ্ঠী করা হয়েছে, প্রসাদান্ন নিবেদন করা হয়েছে ইষ্টদেবকে। আমাদের একান্ত ইচ্ছে, আপনি এখানে প্রসাদ গ্রহণ করুন। অবশ্য যদি আপনার এতে কোন আপত্তি না থাকে।"

"আপত্তির তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, নাগিদেব। জান তো, শিবভক্ত মাত্রেই আমার চোখে 'জঙ্গম'—মহেশ্বর। শিবের মন্দির, শিবের বিগ্রহ প্রতিটি ভক্তসাধকের দেহে ও অন্তরে প্রতিষ্ঠিত—এ আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আর এই বিশ্বাসই তো আমাদের সাধনার প্রধান অঙ্গ।"

ভক্ত শিষ্যদের আনন্দের অবধি নাই। বসভকে নিয়া সবাই পংক্তি ভোজনে বসিয়া যান, আনন্দ কলরব আর জয়ধ্বনিতে অন্ত্যজ পাড়া মুখরিত হইয়া উঠে।

বসভেশ্বরের বিরোধী কয়েক ব্যক্তি নিকটেই ছিলেন। ছুটিয়া গিয়া তাঁহারা রাজা বিজ্জলের গুরু আচার্য্য নারায়ণ ভট্টকে ইহার বিবরণ দিলেন। সনাতন শৈব মতের ধারক-বাহক ক্রমিত, কুচিগ প্রভৃতি বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধকদের কাছেও তখনি সংবাদ পাঠানো হইল। বসভেশ্বরের বিরোধী একদল প্রতিপত্তিশীল রাজ অমাত্যও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সবাই মিলিয়া রাজা বিজ্জলের প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত।

উত্তেজিত কণ্ঠে তাঁহারা কহিলেন, "মহারাজ, আপনি নিজ হাতে রাজদণ্ড গ্রহণ করার পর থেকে, সারা দেশে আশা ভরসা জেগে উঠেছে। আপনাদের প্রাচীন কলচুরীয় বংশ যেমনি শিবভক্ত তেমনি বেদাচার ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষণে তৎপর। কিন্তু এ রাজ্যে ধর্ম্মের যে সব অনাচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে তো কলচুরী বংশের কল্যাণ হবে না।"

"আপনারা আমায় খুলে বলুন, কিসের অনাচার, আর কোথায় এটা ঘটছে।"

রাজগুরু নারায়ণ ভট্ট এবার দৃঢ়কণ্ঠে কহেন, "মহারাজ, পাপমতি বসভেশ্বর যে ধর্ম্ম সমাজ সব কিছু উচ্ছন্ন দিতে বসেছে। এর কোন প্রতিকার কি আপনি করবেন না?"

"বসভেশ্বর ধর্ম্ম সংস্কারে মত্ত, যাকে তাকে দীক্ষা দিচ্ছে। এ তো সবাই আমরা জানি। কিন্তু হঠাৎ এমন কি ঘটলো যে দলবদ্ধ হয়ে আপনারা ছুটে এসেছেন?"—গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেন রাজা বিজ্জল।

"সে কথা বলার জন্যই তো আমরা এসেছি। শুনুন মহারাজ। বসভেশ্বর তার নিজ গৃহে, নিজের অনুভবমণ্ডপে অন্ত্যজ অস্পৃশ্যদের নিয়ে কত কিছু পাপাচারই তো করে যাচ্ছে, তাতে আমরা এতকাল কিছু বলি নি। কিন্তু এমন সাহস হয়েছে তার যে অবলীলায় নগরের যত্রতত্র অধর্ম্ম অনাচার সে করে যাচ্ছে।"

"ব্যাপার কি খুলে বলুন, আচার্য্য দেব।"

"মহারাজ, নগরের প্রান্তে, নাগিদেব নামে এক অস্পৃশ্য ব্যক্তির ঘরে গিয়ে বসভেশ্বর সবার সঙ্গে বসে ভোজন করেছে। প্রকাশ্যে বহু লোকের দৃষ্টির সম্মুখেই একাজ সে করেছে। অথচ সে জানে, রাজ্যের রাজা বেদাচার মানেন, জাতিভেদ বর্ণভেদ মেনে চলেন। কোন্ সাহসে প্রকাশ্যে সে তার বিরোধিতা করছে? এতে আপনার সনাতন শৈব ধর্ম্মকে সে যেমন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে, তেমনি অপমান করেছে আপনাকে। না—মহারাজ, এ অন্যায়ের শাস্তি আপনাকে

দিতে হবে কঠোরভাবে। নইলে লোকে বুঝবে, আপনি দুর্ব্বল হস্তে শাসন করছেন।”

রাজা বিজ্জল মন দিয়া কথাগুলি শুনিলেন, তারপর ধীর স্বরে কহিলেন, “আচার্য্যদেব, আপনি ও রাজপণ্ডিতেরা এখানে রয়েছেন। বিশিষ্ট অমাত্যদেরও আমি দেখতে পাচ্ছি। আপনারা সবাই অতি বিশ্বস্ত, আমার কল্যাণের জন্যও সদা যত্নবান। তাই খোলাখুলি ভাবেই এ ব্যাপারটা আমি আলোচনা করতে চাই।”

“হ্যাঁ, তাই করুন মহারাজ, সেটাই তো আমদের কাম্য।”

“তবে শুনুন আপনারা। বসভেশ্বরের কোন কথাই আমার অজানা নাই। তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে আমি তাঁকে দিনের পর দিন লক্ষ্য করে আসছি, আজকের ঘটনার সব বিবরণও চরমুখে আমি শুনেছি।”

“তবে সত্বর তার দণ্ডবিধান করুন।”

“হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা একটা করতেই হবে, তা ঠিক। কিন্তু আজই, এখনই নয়।”

“সে কি মহারাজ, আপনি কি বসভেশ্বরের চেয়ে শক্তিমান নন? এ রাজ্যের রাজদণ্ড কি আপনার হাতে নেই? পাপাচার আর অন্যায়ের সব কথা জেনেও আপনি চুপ হয়ে তা সহ্য করবেন।”—নারায়ণ ভট্ট ক্ষুব্ধ কণ্ঠে, এক নিঃশ্বাসে কথা কয়টি বলেন।

“তবে শুনুন, রাজদণ্ড আমি ধারণ করি এবং শক্ত হাতেই করি। এ কয় বৎসরে কল্যাণ রাজ্যকে সামরিক শক্তির দিক দিয়ে আমি অজেয় করে তুলেছি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো তা ভালো ভাবেই জানে। বসভেশ্বরকে সমুচিত দণ্ড দেবার শক্তি আমার নিশ্চয় আছে।”

“তবে?”

“সেই কথাই তো আমি বুঝিয়ে বলছি। বসভেশ্বর শুধু আমার একজন সুদক্ষ মন্ত্রী হলে কথা ছিল না। কিন্তু সে এখন কানাড়া রাজ্যের, শুধু কানাড়া কেন সারা দাক্ষিণাত্যের, অন্যতম প্রধান ধর্ম্মনেতা। ধীরে ধীরে সে অতি মাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ আজ তাকে সম্মান করে, ভালবাসে। তার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তুত। বসভেশ্বরকে কঠোর দণ্ড দিলে, গণবিক্ষোভ ও গণবিদ্রোহের আশঙ্কা রয়েছে।"

"তবে কি তাঁকে আপনি শাস্তি দেবেন না, আর তার শক্তি দিন দিন বেড়েই চলবে?"—হতাশভাবে বলে উঠেন আচার্য্য।

"আঘাত আমি তার ওপর হানবোই। কিন্তু সে হবে চরম আঘাত। কূটনীতি ও প্রশাসনের দিক দিয়ে বসভেশ্বরের প্রভাব প্রতিপত্তির এই বৃদ্ধি মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু এখনই তাঁর দণ্ড বিধান করে জটিলতার সৃষ্টি করতে আমি চাই না। আপনারা জানেন, চালুক্য-রাজ তোইলো-তৃতীয়ের দুর্ব্বল শাসনে সারা দেশ খণ্ড বিখণ্ড হচ্ছিল, ধর্ম্ম যাচ্ছিল রসাতলে। নিজে এ সিংহাসন ভোগ করবো বলে আমি তার হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিই নি, নিয়েছি দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য।"

"মহারাজ, তা তো বটেই"—পণ্ডিত ও অমাত্যেরা তোষামোদের সুরে বলিয়া উঠেন।

"কিন্তু এই সহজ সত্যটি রাজ্যের একদল লোক এখনো স্বীকার করে নিতে পারছে না। গোপনে সদাই তারা ষড়যন্ত্র করছে আমার রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্য। ঠিক এ সময়ে বসভেশ্বর ও তার বৃহৎ সংগঠনকে বিদ্রোহী করে তোলা যুক্তিযুক্ত হবে না। বসভেশ্বরকে আমি অবশ্যই ডেকে পাঠাবো। অস্পৃশ্যদের নিয়ে প্রকাশ্যে যেভাবে সে চলাচলি করছে সেজন্য কঠোর ভাষায় তাকে তিরস্কার করবো। সতর্ক করে দেবো, আর যেন এই অনাচার সে বা তার সংস্কারপন্থী বীরশৈবেরা না করে। অন্যথায় কঠোর দণ্ড দেওয়া হবে।"

আচার্য্য ও তাঁহার দলবল ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিছু পরেই বসভেশ্বরকে রাজার সকাশে ডাকিয়া আনা হইল। বিজ্জল তাঁহাকে কাছে বসিতেও দিলেন না, দূরস্থিত এক আসনে স্থান গ্রহণ করিতে বলিলেন। তিনি যেন এক অস্পৃশ্য।

এবার রাজা বিরক্তি ও উষ্মার সঙ্গে প্রশ্ন করেন, "বসভ, এ

তোমার কি দুর্মতি, বলতো ? ঘরে বসে ভাঙ্গী, চামার চণ্ডালদের নিয়ে কত পাপাচারই তো করছো। কিন্তু অস্পৃশ্যের সঙ্গে প্রকাশ্যে তুমি পংক্তি ভোজন করলে কোন্ সাহসে! এতে যে আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভেঙে পড়বে, প্রজারা হয়ে উঠবে দুর্নীতিপরায়ণ, স্বেচ্ছাচারী। রাজ শাসনের ভয় যাবে ভেঙে। তোমার এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়। তাছাড়া, অস্পৃশ্যের সঙ্গে একসাথে বসে খেয়েছো, তাই তোমাকেই আমি গণ্য করছি অস্পৃশ্য বলে। রাজা ও তাঁর মন্ত্রীর ভেতর এই ব্যবধান তুমিই সৃষ্টি করলে, বসভ, তোমার হঠকারিতা দিয়ে।"

বসভেশ্বর এবার শান্ত স্বরে উত্তর দেন, "মহারাজ, আমার ধর্ম্মীয় মতবাদ তো মোটেই আপনার অজানা নয়। আমার আচার-ব্যবহারে গোপনতা কিছু নেই, রাজা ও ধর্ম্মের বিরোধিতা করা তো দূরের কথা তাঁদের সেবাতেই আমি নিযুক্ত রয়েছি। কিন্তু শিবের জগতে শিব-সন্তানদের মধ্যে ভেদজ্ঞান থাকবে, এ আমি চাইনে। ব্রাহ্মণ শূদ্র সবাই মিলে হবে একটি একান্নবর্ত্তী পরিবার, পাপ-তাপে ভরা এই পৃথিবীকে করে তুলবে কৈলাস ধাম। এটা আমার নবতর শৈব ধর্ম্মের মূল কথা। এতে পাপাচার কিছুমাত্র নেই, কারুর অকল্যাণের প্রয়াসও নেই।"

"না বসভ, তুমি এসব অবাস্তব, ভাবাবেগময় কথায় আমায় বিভ্রান্ত করতে পারবে না। তোমার সংস্কারপন্থী ধর্ম্মে গণ-বিদ্রোহের বীজ নিহিত রয়েছে। বেদধর্ম্ম ও বেদাচার ধ্বংস করার কু-অভিসন্ধি নিয়েই তুমি কাজ করছো, অন্ত্যজদের সমর্থনে নিজের শক্তি বাড়িয়ে তোলার স্বপ্ন দেখছো।"

"এ আপনি কি বলছেন, মহারাজ ?"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আর শোন, এর ফল কিন্তু তোমার পক্ষে মোটেই ভালো হবে না। যাক্, আর যা-ই করো, প্রকাশ্যে অন্ত্যজদের সঙ্গে বসে তুমি বা তোমার দলের লোকেরা যেন কখনো ভোজন ক'রো না, সমাজের বকে স্বেচ্ছাচার ও বিদ্রোহের সূচনা

ক'রো না। প্রথম অপরাধ আমি মার্জ্জনা করলাম। কিন্তু তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি, এর পর কেউ প্রকাশ্যে এরূপ অপরাধ করলে তার আমি চরম দণ্ড বিধান করবো।"

ক্রুদ্ধ বিজ্জল দৃঢ়স্বরে কথা কয়টি বলিয়া বসভেশ্বরকে বিদায় দিলেন। সেই দিন হইতে রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে গড়িয়া উঠিল এক বিরোধের প্রাচীর।

কয়েক মাস পরের কথা। রাজধানী কল্যাণে এবার আর একটি ঘটনা ঘটে যাহার ফলে এক বৃহত্তর সঙ্কট ঘনাইয়া আসে।

হরলয় নামক এক অন্ত্যজের পুত্রের সঙ্গে মধুবায় নামক এক ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ সেদিন অনুষ্ঠিত হয়। উভয়েই বীরশৈব সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু এ ঘটনায় সনাতনী আচার্য্যেরা গর্জ্জিয়া উঠেন। একে অস্পৃশ্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিবাহ, তদুপরি ব্রাহ্মণের কন্যা যাইতেছে অস্পৃশ্যের ঘরে। এ যে প্রতিলোম বিবাহ। শাস্ত্র কখনো ইহার সমর্থন করে না। প্রভাবশালী সনাতনপন্থীরা রাজা বিজ্জলের দরবারে অভিযোগ পেশ করিলেন।

হরলয় ও মধুবায় উভয়কেই ডাকাইয়া আনা হইল। বিজ্জল উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "দ্যাখো, এ প্রতিলোম বিবাহ দেশের শাস্ত্র বিধানের বিরোধী। সরকারী আইন এটা কখনো সমর্থন করবে না। এজন্য গুরুতর কারাদণ্ড তোমাদের পেতে হবে। ভালো চাও তো এ বিবাহ এখনই নাকচ করে দাও।"

অভিযুক্তেরা একটুও ভীত নয়। স্পষ্ট ভাষায় তাহারা নিবেদন করে, "মহারাজ, আমাদের বীরশৈব মত অনুযায়ীই এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, এতে তো কারুর কিছু হানি হয় নি। কারুর কিছু বলারও নেই।"

"তবে কি রাজ-রোষের ভয়ও তোমরা করছো না"—বিজ্জল ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন।

"মহারাজ, কারুর রোষের পরোয়া আমরা করিনে। মাথার

ওপরে দেবাদিদেব শিব, আর চোখের সামনে মহাসাধক বসভেশ্বর। এই দুই ছাড়া আর কাউকে আমরা জানিনে।"

রোষে উত্তেজনায় রাজা বিজ্জলের সারা দেহ কম্পিত হইতেছে। দৃঢ় স্বরে আদেশ দিলেন, "এরা রাজদ্রোহী, সমাজদ্রোহী। চরমদণ্ডই এদের প্রাপ্য। দুষ্টদের চোখ উপড়ে ফেলে দেওয়া হোক। দেশের লোক বুঝুক, সমাজ ও রাজশক্তির বিরোধিতা করলে কোন্ দণ্ড পেতে হয়।"

আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হয়। এক মর্ম্মান্তিক স্তব্ধতা নামিয়া আসে রাজধানীর জন-জীবনে।

বসভেশ্বর শিহরিয়া উঠেন এ সংবাদে। সাধন কুটিরে একান্তে গিয়া উপবেশন করেন। করুণ আর্ত্তি জাগিয়া উঠে সারা অন্তরে। যুক্ত করে নিবেদন করেন, "হে দেবাদিদেব, হে প্রভু সঙ্গমেশ্বর, সারা জীবন ধরে আমি এগিয়ে চলেছি তোমারি নির্দ্দেশে। সাধন ভজন, বীরশৈবদের সংগঠন ও সংস্কার সব কিছুতেই পেয়েছি তোমারই সমর্থন ও প্রেরণা। আজ আমায় বলে দাও, অতঃপর কি আমার কর্ত্তব্য।"

কিছুক্ষণের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া বসভেশ্বর গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যান। তারপর ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বরের ঘটে আবির্ভাব। প্রশান্ত কণ্ঠে প্রভু কহেন, "বৎস বসভেশ্বর, কায়কের সাধনা তোমার শেষ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকে তোমার সাধনার বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে মুক্তির দীপশিখা। শিবভক্তির জোয়ার এসেছে লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনগণের জীবনে। তোমার ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কাজ তুমি সমাপন করেছো। এবার এসে পড়ো তোমার প্রাণপ্রিয় কুড়ল-সঙ্গমে। সেখানে তোমাতে আমাতে কি আনন্দেই না কাটবে।"

সিদ্ধান্ত স্থির করিতে বসভের একদিনও দেরী হইল না। রাজা বিজ্জলের কাছে পদত্যাগ পত্র তিনি পেশ করিলেন।

যোগীবর অল্লাম-প্রভু তখন বল্লিগাভেতে অবস্থান করিতেছেন। তাড়াতাড়ি সেখানে এক পত্র পাঠাইয়া বসভ সঙ্গমেশ্বরের নির্দ্দেশ

তাঁহাকে জানাইয়া দেন। তারপর সর্ব্বত্যাগী জঙ্গমের বেশে শুরু করেন কুড়ল-সঙ্গমের দিকে পদযাত্রা।

ভক্তেরা কাঁদিয়া বলে, "প্রভু, আমাদের প্রতি কি নির্দ্দেশ রইলো আপনার? কি করেই বা আমাদের দিন কাটবে, তা বলে দিন।"

প্রশান্ত কণ্ঠে বসভেশ্বর বলেন, "শিবময় ধর্ম্মজীবন, আর শিবের মতন ত্যাগপূত তপস্যা নিয়ে দিন যাপন কর। অনুভব-মণ্ডপ আর বীরশৈব সংগঠনের কাজ পূর্ব্ববৎ চালিয়ে যাও তোমরা। ভুলবে না, তোমরা সবাই শিবভক্ত, শিবস্বরূপ হওয়াই তোমাদের সাধনার চরম লক্ষ্য। প্রভু সঙ্গমেশ্বর আমায় ডাক দিয়েছেন। তাঁর পুণ্যধামেই আমি এবার যাচ্ছি। তাঁর প্রেরণায় তোমাদের ভেতর এসেছিলাম, তোমাদের সেবা যথাসাধ্য করেছি। এবারে তাঁরই আদেশে ফিরছি কুড়ল-সঙ্গমে।"

সহস্র সহস্র মানুষের আর্ত্তি ও ক্রন্দন পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, বসভেশ্বর ধীর পদে অগ্রসর হইলেন প্রভুর ধামের দিকে।

সঙ্গমেশ্বর তীর্থে পৌঁছিয়া তাঁহার আনন্দের আর অবধি নাই। জীবনে এবার আসিয়াছে চির-বিরতির পালা। এবার শুধু প্রভু আর তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের আনন্দ-রঙ্গ, আনন্দ-মিলন।

প্রভুর চরণকমল ধ্যানেই বাকিটা দিন বসভেশ্বর অতিবাহিত করিবেন। যতদিন এ দাসকে তিনি আত্মসাৎ না করেন, ততদিন চলিবে তাঁহার আরাধনা ও ধ্যান জপ। সঙ্গমেশ্বরের চরণে সেদিন সাশ্রুনয়নে নিবেদন করিলেন:

তোমার চরণ-কমলের মধুকর আমি,
হে প্রভু, চেয়ে ছাখো, তাইতো জিহ্বা আম
তোমার নামের সুধায় হয়েছে মিঠে,
তোমার মুখশশীর জ্যোতির ছটায়
প্রদীপ্ত হয়েছে আমার এই নয়ন যুগল।
তোমার নিরন্ধ্র ভাবনা আর অনুধ্যানে
আমার দিনরাতের ব্যবধান গেছে ঘুচে,

তোমার স্তুতিগানের পবিত্র ঝঙ্কারে
আমার এ শ্রবণ দুটি সদাই রয়েছে ভরপুর।

পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যে যে একটি নিবিড় আনন্দময় অনুভূতি রহিয়াছে, তাহা বসভেশ্বরের এ সময়কার একটি বচনে পরিস্ফুট। তাঁহার মতে—সাধক দেহ যেন একখানি রম্য বীণা, পরম প্রভু লীলাভরে এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আবার নিজ হাতেই সুরে তালে লয়ে তাহা সানন্দে বাজাইয়া চলিয়াছেন। এই রূপকটির বর্ণনা দিতে গিয়া বসভ গাহিয়াছেন:

দয়াল প্রভু, আমার এই দেহকে
কর তোমার বীণা যন্ত্রের দেহ।
আমার এই শির হোক তার শীর্ষচক্র,
স্নায়ু-শিরাগুলোর হোক রূপান্তর
সেই বীণার মধু-নিঃস্যন্দী তারে,
আমার এই হাতের আঙুলগুলো হয়ে উঠুক্
বীণার তার-জড়াবার কান,
হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর!
আমার এ দেহবীণার তারে তারে
কর আঘাত, আর বাজাও তোমার দিব্য সুর।

এ সময়ে হঠাৎ একদিন রাজধানী কল্যাণের এক দুঃসংবাদে কুড়ল-সঙ্গমে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। জানা যায়, বিরোধীদের আকস্মিক আক্রমণে রাজা বিজ্জল নিহত হইয়াছেন এবং আততায়ীরা বীরশৈব দলেরই অন্তর্ভুক্ত চরমপন্থীদল।

হরলয় ও মধুবায়ের চক্ষু উৎপাটন করার পর বিজ্জলের বিরুদ্ধে জনরোষ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। বসভেশ্বরের অন্তরঙ্গ সাধকেরা শান্ত থাকিলেও একদল উগ্র বীরশৈব রাজার এই নৃশংস কার্য্যের সমুচিত দণ্ড বিধান করিতে উদ্যত হয়। এই দলের প্রধান নেতা জগদেব। সহকারীদ্বয় মোল্ল ও বোময়কে নিয়া রাজা বিজ্জলের নিধনের জন্য

তিনি এক গোপন চক্রান্ত গড়িয়া তোলেন। তারপর সুযোগ বুঝিয়া হঠাৎ একদিন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজাকে তাঁহারা হত্যা করেন। রাজধানী কল্যাণে অতঃপর চলিতে থাকে সরকারী দমন-অভিযান আর উত্তাল হইয়া উঠে গণ-বিক্ষোভ ও গণ-সংঘর্ষ।

কুড়ল-সঙ্গমের ভক্তেরা বসভেশ্বরকে এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির কথা জানাইলেন, চাহিলেন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ।

ধ্যানাবিষ্ট বসভেশ্বর শুধু কহিলেন, "বিজ্জলের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। তাই বুঝি তাকে বিদায় নিতে হলো। তবে জগদেব ভুল করেছে, নিজ হাতে নিধনের অস্ত্র তুলে না নিয়ে তাঁর ওপরই নির্ভর করা উচিত ছিল, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ন্তা হয়ে যিনি রয়েছেন সদা জাগ্রত। এ সম্পর্কে আমার নিজের কিছু বলার নেই, করারও নেই। এখন প্রভুর লীলার আমি দর্শক মাত্র।"

গুরু জাতবেদমুনি বহুদিন যাবৎ গত হইয়াছেন। কিন্তু কুড়ল-সঙ্গমের শৈব সাধক ও সন্ন্যাসীর সমাবেশ পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। বসভেশ্বর কিন্তু আজকাল কাহারও সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করেন না, আপন মনে দিনের বেলায় ঘুরিয়া বেড়ান সঙ্গমস্থলে, আর রাত্রে ধ্যান জপে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন।

এখন কেবলই তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন পরিপূর্ণতার পথে, দেবাদিদেব মহেশ্বরের পরম সঙ্গমের দিকে। দেহ, মন, আত্মা সব কিছুই আজ ভরিয়া উঠিয়াছে তাঁহার প্রভুর প্রেমে, আর অবদানে। এ সময়কার একটি বচনে তিনি গাহিয়াছেন[১] :

হে প্রভু, যত কিছু কথা আমার
ভরে তুলবো তোমার নামের সুধায়,
নয়ন দুটি জুড়ে উঠবে ফুটে
তোমার নয়নাভিরাম রূপ।
তোমার রম্য স্মৃতিতে পূর্ণ হবে আমার অন্তর,

১ বচন্‌স্ অব বসভন্ন—অনুবাদ : মেনজেস্ অ্যাণ্ড অংদি

শ্রবণ দুটি উঠবে ভরে তোমার যশোগানে,
হে কুড়ল-সঙ্গম দেব,
তোমার চরণকমল দুটি ছুঁয়ে
সার্থক করে তুলবো আমার এ জীবন।

সাধনার চরম স্তরে পৌঁছিয়াছেন বসভেশ্বর। ধ্যান দৃষ্টিতে সদাই হইতেছে অপরূপ দর্শন। পরম শিব আর তাঁহার অনাদ্যন্ত সৃষ্টি দুইই হইয়া গিয়াছে একাকার। বসভের মুখনিঃসৃত একটি বচনে, এই দিব্য অভিজ্ঞতাটি বর্ণিত :

যে দিকেই করি নয়নপাত, হে প্রভু,
নিরন্তর হয় শুধু তোমারই দর্শন।
এই সীমাহীন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড
বিলসিত রয়েছে তোমারি অপরূপ রূপে—
তুমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের আয়ত নয়ন,
বিকচ কমল সদৃশ আনন তুমিই,
স্কন্ধ, হস্ত ও চরণদ্বয় তাও যে প্রভু তুমি,
বিশ্ব নিয়ন্তা হে কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর,
কোটি কোটি নক্ষত্রে খচিত তোমার এই মহাকাশ—
তোমার এই বিরাম বিহীন সুমহান সৃষ্টি—
তোমারই মত অনাদি আর অনন্ত,
তোমারই মত অপরূপ মহিমায় তারা সমুজ্জ্বল।

সাধনার এই পরম অবস্থার পর দেহবোধ তাঁহার বিলুপ্ত হয়, ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বরও প্রাণপ্রিয় ভক্ত বসভেশ্বরের দেহ মন আত্মাকে করেন আত্মসাৎ।

১১৬৭ খৃষ্টাব্দের বসভের মহাপ্রয়াণের এই মর্মান্তিক দিনটি বীরশৈব সাধকেরা কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

লাটু মহারাজ

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেদিন ভক্ত লাটুকে নিয়া মহাব্যস্ত। এই নূতন অবাঙ্গালী শিষ্যটি নিরক্ষর, কোনমতে বর্ণ পরিচয় করাইয়া দিলে যদি বা লেখাপড়ার দিকে তাহার মনটা ঘোরে। আজ ঠাকুর তাই স্থির করিয়াছেন, লাটুর অক্ষর পরিচয় শেষ করিয়া তবে ছাড়িবেন।

ঠাকুর যতবার পড়ান 'ক', ছাত্র ততবার বলে 'কা'। পশ্চিমদেশীয় ভক্তের জিহ্বায় সহজে অকারান্ত উচ্চারণ আসে না। ঠাকুর মহা সমস্যায় পড়িয়াছেন, আর বলিতেছেন "শালা, 'ক'কে যদি 'কা' বলিস, তবে এতে আকার দিলে তখন কি বলবি?" বহু চেষ্টার পর রামকৃষ্ণ শিক্ষাদানে ক্ষান্ত হইলেন। বলিলেন, "যা শালা, তোর পড়েই আর কাজ নেই!"

উত্তরকালে এই নিরক্ষর শুদ্ধসত্ত্ব শিষ্যের আধারে ঠাকুর অকৃপণ করে কৃপার ধারা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিজের সাধন-জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—পবিত্রতা, সরলতা ও ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা। তাঁহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই অধ্যাত্ম-শিল্পী রামকৃষ্ণের এই বিহারী ভক্ত লাটু মহারাজের মধ্যে।

ব্যবহারিক শিক্ষা ও লেখাপড়ার অভাব যে ভগবৎ-প্রাপ্তির অন্তরায় ঘটাইতে পারে না, তাঁহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ঠাকুর নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন; উত্তরকালে লাটু মহারাজের অলোকসামান্য অধ্যাত্ম-জীবনেও দেখা গিয়াছে তাহারই অনুকৃতি।

ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রয়াস সেদিন বিফল হইয়া গেল। লাটু তারপর পরমানন্দে গঙ্গাতীরের বাগানে গিয়া প্রাণ খুলিয়া গান শুরু করিলেন, 'মনুয়ারে—সীতারাম ভজন করলিজিয়ে।'

স্মিতহাস্যে ঠাকুর দূর হইতে ইহা শুনিতেছেন। লাটুকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, তোর ওতেই হবে।" সত্যিই ইহাতেই তাঁহার

হইয়াছিল। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া বৈরাগ্যবান্ স্বভাবসরল লাটু সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশিত শ্রদ্ধা-ভক্তির পথেই অগ্রসর হন। এই পথেই তাঁহার ভাগবত জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। লীলাময় রামকৃষ্ণের আনন্দ-কাননের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া লাটু মহারাজ ফুটিয়া উঠেন একটি দিব্য সৌগন্ধবিস্তারী পুষ্পরূপে।

লাটু মহারাজ তাঁহার উত্তর জীবনে ঠাকুরের একটি গল্প প্রায়ই ভক্তদের কাছে বলতেন। গুরু-নিষ্ঠার দিক দিয়া এ গল্পটি কিন্তু লাটু মহারাজকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

রামচন্দ্রের সভায় সর্ব্বজনসমক্ষে ভক্ত বীর হনুমান যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভু রামচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া এ সময়ে হনুমানকে একছড়া বহুমূল্য মুক্তামালা উপহার দেন। হনুমান উহা প্রথমে নাড়িয়া-চাড়িয়া কি যেন পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাহার পর প্রত্যেকটি মুক্তা নখাঘাতে বিদীর্ণ করেন, ভেতরকার বস্তুটি বুঝি আবিষ্কার করিতে চাহেন। তাহার পর ঐ মালা ছুঁড়িয়া ফেলেন ভূতলে।

প্রভু রামচন্দ্রের মালার এই অপমান! লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্ব্বাণ উদ্যত করিয়াছেন, এমন সময় শ্রীরাম বাধা দিয়া কহেন, "আসল কথাটা কি জানো, মুক্তামালাতে 'রামনাম' কোথাও ক্ষোদিত নেই, তাই পরমভক্ত হনুমানের কাছে এটা মূল্যহীন, পরিত্যজ্য।

গুরু রামকৃষ্ণের প্রতি এমনই একনিষ্ঠ ভক্তি লাটু মহারাজেরও ছিল। জীবনে প্রাপ্ত সমস্ত কিছু তত্ত্ব ও শিক্ষাই তিনি সদ্‌গুরু রামকৃষ্ণের কষ্টিপাথরে সতর্করূপে যাচাই করিয়া নিয়াছেন।

লাটু মহারাজের গুরুভাইরা বলিতেন, ভক্তবীর পবন-তনয় যেমন রামচন্দ্রের লীলার এক উজ্জ্বল রত্ন, রামকৃষ্ণের লীলায় লাটু মহারাজও তেমনই একটি বড় সম্পদ। তাই বুঝি কাশীতে স্থাপিত স্মৃতি-মন্দিরে হনুমানজীর প্রস্তরমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে এই নৈষ্ঠিক ভক্তের প্রেম-ভক্তির স্মারকরূপে।

লাটু মহারাজের গুরুকৃপার সৌভাগ্য ও অধ্যাত্ম-সিদ্ধির পরিমাপ করা যায় তাঁহার গুরুভাই বিবেকানন্দের একটি মন্তব্যের

মধ্য দিয়া। ঠাকুর ও ঠাকুর-সন্ততির আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আমাদের মধ্যে লেটোটাই ঠাকুরকে ঠিক ধরেছিল।" সদ্‌গুরুর অনুসরণে, নিরন্তর অনুধ্যানে, লাটু মহারাজের অন্তর-সত্তা তাঁহারই ভাবে ও ভাবনায় হইয়াছিল বিভাবিত। দেহেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল রামকৃষ্ণেরই ছাপ। তাই প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের আকৃতির সহিত লাটু মহারাজের সাদৃশ্য দেখিয়া একবার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

লাটু মহারাজের জীবন ছিল ত্যাগবৈরাগ্যময়। এ জীবন ভক্তিময় ভজনের নিরালা পথটি ধরিয়াই অগ্রসর হয়। রামকৃষ্ণ-মণ্ডলী তাঁহার প্রাণপ্রিয় হইলেও বিবেকানন্দের প্রবর্ত্তিত সঙ্ঘে তিনি যোগ দেন নাই। প্রিয় গুরুভ্রাতাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও তিনি মঠে রাত্রিবাস কখনো করিতেন না। বলিতেন, "হামরা সাধু। হামাদের আবার জমি, বাড়ী, বাগান, ঐশ্বর্য্য এ সব কি বাবা? এ সবের মধ্যে হামি থাক্‌বে না।"

তবুও মঠের বাহিরে, একান্তচারী এই মহাপুরুষের রামকৃষ্ণময় জীবন হইতে, মণ্ডলীর কত সাধু-সন্ন্যাসী যে অধ্যাত্ম-পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছে, আপ্তকাম হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রায়ই লাটু মহারাজের কাছে নবীন ভক্তদের পাঠাইতেন। আর এই কঠোরী মহাপুরুষের কাছে পাঠানোর সময় আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "লাটুর কাছে ঘেঁষতে ভয় কিসের রে? ওর বাইরে একটু রুক্ষভাব—সেটা লোকসঙ্গ এড়ানোর জন্য, কিন্তু ওর ভেতরটা একেবারে ক্ষীরে ভরপুর।'

ভক্তপ্রবর গিরিশ ঘোষ তো লাটু মহারাজ সম্পর্কে ছিলেন উচ্ছ্বসিত, সবাইকেই তাঁহার আশীর্ব্বাদ চাহিয়া নিতে তিনি উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন, "এমন বেদাগ্‌ সাধু আমি জীবনে কখনো দেখি নি।"

দক্ষিণেশ্বরে একদিন সমাধির পরে অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ লাটুকে বলিয়াছিলেন, "ওরে লেটো, দেখবি একদিন তোর মুখ দিয়ে বেদ-বেদান্ত ফুটে বেরোবে।"

এই অমোঘ বাক্যের ফল ফলিয়াছিল এবং নিরক্ষর লাটু মহারাজ প্রখ্যাত হইয়াছিলেন রামকৃষ্ণের এক অসামান্য সৃষ্টিরূপে।

লাটু মহারাজের বাল্যকালের নাম রাখতুরাম। বিহারের ছাপরা জেলায় এক কৃষকের পরিবারে তাঁহার জন্ম। গরীব ঘরের ছেলে, ভেড়া-ছাগল চরানো অর্দ্ধনগ্ন রাখাল, এই রাখতুরাম যে একদিন রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক হইবেন, তাহা কে জানিত? জানিতে পারিলে কেহ হয়তো তাঁহার জন্মের সাল তারিখ সতর্কতার সহিত লিখিয়া রাখিত। তবে মোটামুটিভাবে অনুমান করা যায়, রাখতুরাম পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে।

বাল্যকালেই রাখতু পিতামাতাকে হারায় এবং তারপর সে পিতৃব্যের সংসারে থাকিয়া মেষপালন করিতে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা লাভেরও কোন সুযোগ তাহার ঘটে নাই। আর্থিক দুরবস্থায় পড়িয়া পিতৃব্য সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং এখানে রামকৃষ্ণ-ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে পরিচারক হিসাবে রাখতুরাম কাজ করিতে থাকে। বাড়ীর সকলে আদর করিয়া তাহাকে ডাকিত লালটু নামে। তেজস্বী, সৎ ও ঈশ্বরভক্ত এই নূতন ভৃত্যটিকে রাম দত্ত ও তাঁহার পরিবারের সবাই স্নেহ করিতেন। অকপট ও উচিতবক্তা এই বালক কিন্তু মাঝে মাঝে সমস্যার সৃষ্টি করিয়া বসিত, রাম দত্ত সস্নেহে তাহাকে মানাইয়া চলিতেন।

গৃহে ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ প্রায়ই চলে। বালক উৎকর্ণ হইয়া এই আলোচনা শুনিতে চেষ্টা করে। কি এক অমোঘ আকর্ষণ যে সে অনুভব করে, কিছুই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না।

এক একদিন কম্বল চাপা দিয়া শুইয়া লালটু গুম্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠে। অহৈতুক কান্নায় দুই চোখ ভাসিয়া যায়।

সাধক নিত্যগোপাল অবধূত এই সময়ে রাম দত্তের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। ধর্ম্মালোচনা ও নামগান তাই মাঝে মাঝে হয়, আর

লালটুর অন্তরের গভীরে রহস্যময় শিহরণ জাগে, নূতন জীবনোন্মেষের ইঙ্গিত সারা দেহমন চঞ্চল করিয়া তুলে।

রামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রায়ই আলোচিত হয় আর এসব তাহার কানে পেঁছে। দিনরাত চলে তাহার গুঞ্জরণ—'যে সদা ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই কাছে ঈশ্বর হন প্রকাশিত।'

প্রভু রামকৃষ্ণের কথাগুলি লালটু মনে রাখিয়াছে। মন তাই অজানা পরম বস্তুর জন্য বার বার চঞ্চল হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে কেনই বা সে ফুঁপাইয়া কাঁদে আর চক্ষুর জল ফেলে বাড়ীর কেহ সে রহস্যের সমাধান করিতে পারে না।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দটি লালটুর জীবনের এক স্মরণীয় বৎসর। একদিন মনিব রাম দত্তের সঙ্গে গিয়া সে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে। ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া লালটু প্রণাম করে, করজোড়ে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া থাকে।

সমবেত ভক্তদের উদ্দেশ করিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠেন, "ছাখো, যারা নিত্যসিদ্ধ তাদের কিন্তু জন্মে জন্মে জ্ঞানচৈতন্য হয়েই রয়েছে। তারা যেন পাথরচাপা ফোয়ারা। মিস্ত্রী এখানে-সেখানে ওস্কাতে ওস্কাতে যেই এক জায়গার চাপটা সরিয়ে দেয়, অমনি ফোয়ারার মুখ থেকে ফর্‌ফর্‌ করে জল বেরুতে থাকে।"

কথা কয়টি শেষ করিয়া হঠাৎ ঠাকুর লাটুকে স্পর্শ করিলেন।[১] এই দিব্য স্পর্শে ঘটে তাহার বিস্ময়কর ভাবান্তর। গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, সমস্ত শরীর কম্পমান, দেহের রোমরাজী কণ্টকিত। আর তার অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইতেছে কান্না।

রাম দত্ত বিপদ গণিলেন। ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন, "ব্যাপার তো বুঝলুম। তা, ছেলেটি কি সারাক্ষণ কাঁদতেই থাকবে?"

১ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়: শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা

ঠাকুর আবার স্পর্শ করা মাত্র লালটুর ক্রন্দন থামিয়া যায়। অধ্যাত্ম-জীবনের অলৌকিক শক্তিধর শিল্পী ছিলেন রামকৃষ্ণ। সে'দিন লালটুর অন্তস্তলে কোন্ পাথরচাপা নির্ঝরের মুখ তিনি নিপুণ হস্তে খুলিয়া দিলেন তাহা তিনিই জানেন।

ইহার পর লালটুর জীবনে এক বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটে। তাঁহার সমস্ত চঞ্চলতা ও কলরব হয় অন্তর্হিত—সে যেন তখন একটি কলের পুতুল। ঠাকুরের জন্য ফল-মূল নিয়া আবার একদিন লালটু পরমোৎসাহে দক্ষিণেশ্বরে যায়। ঠাকুরের মিষ্টি কথা শুনিয়া ও প্রসাদ পাইয়া নিজেকে জ্ঞান করে কৃতকৃতার্থ।

ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বাস করার জন্য লালটু বদ্ধপরিকর। কিন্তু এই সময়ে ঠাকুর হঠাৎ কিছুদিনের জন্য স্বগ্রামে চলিয়া যান। তীব্র ব্যাকুলতা নিয়া চাতক পক্ষীর মতো দক্ষিণেশ্বরে লালটু মাঝে মাঝে বসিয়া থাকে। তাঁহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ দেশে গেলেও অলক্ষিতে এখানে সদাই বর্ত্তমান আছেন। তবে লালটু তাঁহার সূক্ষ্মদেহের সান্নিধ্য ছাড়িবে কেন?

একদিন ভক্তবৎসল ঠাকুরের কৃপায় তাহার মনোবাঞ্ছা কিন্তু পূর্ণ হয়, অলৌকিকভাবে ঠাকুর তাঁহাকে দর্শন দান করেন। লালটুর অধ্যাত্ম-জীবনে সদ্গুরুর আশীর্ব্বাদটি এই দর্শনের মধ্য দিয়া সক্রিয় হইয়া উঠে।

পরমহংসদেব কামারপুকুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মনিবের প্রদত্ত ফল-মূল ও মিষ্টান্ন নিয়া আবার একদিন লালটু দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছে। ঠাকুর সস্নেহে এবার কহিলেন, "ওরে আজ তুই এখানেই থেকে যা। মায়ের প্রসাদ পাবি।"

লালটু দক্ষিণেশ্বরে রহিয়া গেল। রাত্রে প্রসাদ পাইবার পর সে ঠাকুর রামকৃষ্ণের পদসেবার ভার পাইয়াছে। তাই আনন্দ আর ধরে না। অকস্মাৎ তাহার সারা দেহে মনে একটা দিব্য ভাবের ঘোর নামিয়া আসে, তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। চোখে নামে অশ্রুর বন্যা।

ঠাকুর নীরবে লক্ষ্য করিতেছেন। এবার রহস্য করিয়া হাসিয়া বলেন, "কিরে, তোর আবার একি হল ?"

কম্পিত কণ্ঠে লালটু উত্তর দেয়, "হামে কি জানে ?"

সবাই বুঝিলেন, পরমহংসদেবের সামান্যতম কৃপা কটাক্ষে এই নবাগত শিষ্যের দেহে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার ভাব হইয়াছে এমন ঘনীভূত।

লালটুকে দিয়া আর বাড়ীর পরিচারকের কাজ করাইতে রাম দত্তের মন এবার সরে না। ঠাকুরের কাজের জন্যেই তাঁহাকে তিনি নিয়োজিত রাখিতে চান। লালটু আজকাল ঠাকুরের উৎসব অনুষ্ঠানে কর্ম্মী হিসাবে ঘোরাঘুরি করিতে থাকে। অবশেষে ঘটনাচক্রে দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরের সেবক হৃদয় মুখুয্যে অপসারিত হন, রাম দত্ত নিজেই উৎসাহ করিয়া লালটুকে স্থায়ীভাবে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দেন।

ঠাকুরের সেবায় লালটু এবার কায়-মন-প্রাণ ঢালিয়া দেয়। সদ্‌গুরুর সস্নেহ ও সতর্ক দৃষ্টিও তাহার উপর থাকে নিবদ্ধ। মাঝে মাঝে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন, "দেখিস রে লেটো, তুই যেন ইখানকার বাইরেটা দেখে ভুলে যাস নি। ওরে এটার (হাড় মাসের খাঁচা) সেবায় কিছু পাওয়া যায় না। এর ভেতরে যে বাস করে, তার সেবা করলে সব পাবি।"

সাধক লাটু সারা জীবন ভরিয়া এই নির্দ্দেশটি পালনে চেষ্টিত ছিলেন। ঠাকুরের দেহাবসানের পরেও তাঁহার মুখ্য ভাব ছিল —'তাঁকে যেন না ভুলি।' ঠাকুরকে জীবন-সর্ব্বস্ব করিবার এই সাধনায় লাটু মহারাজ যে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি কৃতী গুরুভাইরা অকুণ্ঠ চিত্তে ইহা স্বীকার করিতেন।

লাটুর সাধনা ছিল আত্মসমর্পণের সাধনা। সদ্‌গুরু চরণে তিনি বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন তাঁহার দেহ-মন-প্রাণ, সর্ব্বসত্তা।

আত্মসমর্পণের এই সাধনায় লাটু মহারাজের নিরক্ষরতা ও শুদ্ধা-ভক্তির বেগ তাঁহাকে অশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

শিষ্য নিজেকে সমর্পণ করিতেছেন; তাহার যেমন সব কিছু দিয়াও মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিত না, গুরুরও তেমনি চাওয়ার অন্ত ছিল না। শিষ্যের আত্মসমর্পণকে নিরন্ধ্র ও নিখুঁত করিবার জন্য তাঁহার কি ব্যাকুলতা, কি সতর্ক প্রহরা!

শরৎ মহারাজের মাতা একদিন লাটুকে আদর করিয়া চচ্চড়ি রাঁধিয়া খাওয়ান। লাটু তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে বলিতেছেন, "আজ এমন চচ্চড়ি রসুই হয়েছে যে হামনে জীবনে খায় নি, মোশাই।"

ঠাকুর যেন তাঁহার সঙ্গী অবোধ বালকটি। ব্যথিত স্বরে তিনি বলিলেন, "বলিস্ কিরে। তুই একা সে-সব খেয়ে এলি! ইখানকার জন্যে কিচ্ছু আনলি নে?"

ঐ চচ্চড়ি পরের দিন আনানো হয়। সর্ব্বপাশমুক্ত, সর্ব্ব-লোভমুক্ত ঠাকুর তাহা ভোজন করেন। গুরুগতপ্রাণ শিষ্য সামান্য চচ্চড়িটুকু খাইতে গিয়াও ঠাকুরের কথা স্মরণে রাখুক, নিজের তৃপ্তির সহিত ঠাকুরের তৃপ্তির অন্বয় সাধন করুক, আত্মবৎ সেবার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝুক—ইহাই ছিল রামকৃষ্ণের চচ্চড়ি-ভক্ষণে উৎসাহের প্রকৃত মর্ম্ম। শিষ্য গুরুকে যেমন আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন, গুরুও তেমনি তাঁহাকে দিয়াছিলেন সর্ব্বাত্মক আশ্রয়।

যদু মল্লিকের বাড়ীতে সেদিন সিংহবাহিনীর পূজা হইতেছে। সংবাদ পাইয়া রামকৃষ্ণ লাটু প্রভৃতি ভক্তদের নিয়া দেবীকে প্রণাম করিতে গেলেন। মল্লিক মহাশয় তখন মহাব্যস্ত, এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছেন, ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করা তো দূরের কথা, একবার বসিতেও বলিলেন না।

রামকৃষ্ণ দেবী প্রতিমা প্রণাম করিয়া সঙ্গী ভক্ত-শিষ্যদের নিয়া বাহিরে আসিলেন। লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা এবার রামকৃষ্ণকে চাপিয়া ধরিলেন। শুধু শুধু অপমানিত হইবার জন্য এই অভদ্র বড়লোকের বাড়ীতে কেন তিনি আসেন?

ঠাকুর স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁরে, তোরা কি তবে বাড়ীর

বড়লোক কর্ত্তাকে দেখতে গিয়েছিলি যে, বসতে বলেনি বলে অভিমান করছিস্। সাধু হতে চাইলে অভিমান ত্যাগ করতে হবে, কেউ মানলো কি না মানলো, এসব দেখলে চলবে না, বুঝলি ?"

এমনি করিয়াই ঠাকুর লাটু প্রভৃতি ভক্তদের অহমিকার অঙ্কুর সযত্নে দিনের পর দিন উৎপাটন করিতেন।

গিরিশ ঘোষ একদিন মদ্যপানের পর মত্ত অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ঠাকুর লাটুকে কহিলেন, "ওরে, যা তো গাড়ীতে গিরিশবাবু কিছু ফেলে এসেছে কিনা ত্থাখ্।"

লাটু গাড়ীর ভিতরে উঁকি মারিয়া তো অবাক্। তারপর সেখান হইতে একটি মদের বোতল ও গ্লাস উদ্ধার করিয়া আনিলেন। উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল।

ঠাকুর প্রশান্ত কণ্ঠে বাললেন, "ওগুলো রেখে আয়। শেষ খোঁয়াড়ীর কাজে লাগবে।"

উদ্দাম গিরিশবাবুকে রামকৃষ্ণ কিভাবে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। ভক্তের জন্য এই উদার আশ্রিতবাৎসল্য ও সহনশীলতা দেখিয়া লাটুর চোখে সেদিন অশ্রুধারা নামিয়া আসে।

লাটু প্রথম বয়সে খুব ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়াছিলেন, কুস্তী কসরতও কম করিতেন না। স্বভাবতঃই সে সময়ে তিনি বেশী পরিমাণে আহার করিতে পারিতেন এবং ইহাতে প্রচুর উৎসাহও তাঁহার ছিল।

"ওরে, কখনো ভুলিসনে, তপস্যা করতে গেলে কম খেতে হয়"—ঠাকুরের এই সতর্কবাণী লাটুর মর্ম্মমূলে গিয়া প্রবিষ্ট হয় এবং তাঁহার এই একদিনের কথায় তিনি আহারের কৃচ্ছ্র সাধনে রত হন।

ক্লান্ত হইয়া প্রথম প্রহর রাত্রে একদিন তিনি ঘুমাইতেছিলেন। ঠাকুর তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "সে কিরে, এত ঘুমুলে সাধনভজন করবি কখন ? লাটু গুরুবাক্যের তাৎপর্য্য তখনি বুঝিলেন, নিজেকে করিলেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। এখন হইতে রাত্রির অধিকাংশ সময়ই ধ্যান-জপে কাটাইতেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি এই নিয়ম পালন করিয়া গিয়াছেন।

লাটু অন্তরঙ্গভাবে ঠাকুরের সেবা করিতেন আর দিন রাতের অবসর সময়টা কাটাইতেন সাধনকর্ম্মে। পরে ঠাকুর এই শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তকে শ্রীমা সারদামণির সেবায়ও নিয়োজিত করেন।

মায়ের সম্বন্ধে কথা উঠিলে ভক্তির আবেগে লাটুর কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইত। তিনি বলিতেন, "মা'র মতো বৈরাগ্য হামনে ত দেখি নি! আউর তাঁর দয়ার কি তুলনা আছে? মায়ের কৃপায় আমার জীওন সার্থক হয়েছে। হামি তাঁকে পেয়েছি।'

গুরুভাইরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন, মায়ের পরিপূর্ণ আশীর্ব্বাদ তাঁহার ভক্ত সন্তান লাটুর উপর বর্ষিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ-সর্ব্বস্ব ছিলেন লাটু মহারাজ। গুরু-দর্শন, গুরুপরিচর্য্যা গুরুদত্ত সাধনা তাঁহার জীবনে আবর্ত্তিত হইত পবিত্র অক্ষমালার মতো।

প্রতিদিন ভোরবেলায় শয্যাত্যাগের আগে ঠাকুরের দিব্য আনন-খানি না দেখিয়া তিনি কার্য্যারম্ভ করিতেন না। একদিন ঠাকুর বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, লাটুও তাঁহার প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। দুই হাতে চক্ষু আবরিত করিয়া তিনি শুধু চেঁচাইতেছেন "মোশাই, আপনি কুথায়!"

লাটু যতই চীৎকার করিয়া ডাকেন পরমহংসদেব দূর হইতে ততই ব্যস্ত হইয়া উত্তর দেন, "যাচ্ছি রে যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি।"

যতক্ষণ ঠাকুর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত না হইলেন লাটু তাঁহার চক্ষু হইতে হাতদুটি অপসারিত করিলেন না।

এক ভক্ত সেদিন লাটুকে একজোড়া নূতন চটি দিয়াছিলেন। পরদিনই উহার একপাটি কোথায় হারাইয়া যায়। রামকৃষ্ণ এ সংবাদ শুনিয়া বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই নিজে বাগানে উপস্থিত হইয়া শুরু করিলেন ঐ চটির সন্ধান।

লাটু ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসেন। কাতর স্বরে কহেন,

"ওখানে কি খুঁজছেন, মোশাই? আপুনাকে হামার চটি খুঁজে বেড়াতে হোবে না, আমার যে পাপ হবে।"

ঠাকুর চটিজুতা খুঁজিতেছেন এবং পরিতাপের সুরে বলিতেছেন, "তাই তো রে। নতুন জুতো জোড়া তোর ভোগে এলো না।"

লাটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, "হামার জুতোর জন্য আপুনি কষ্টো কচ্ছেন, হামার আজ দিনটাই খারাপ যাবে।"

ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া উত্তর দিলেন, "ওরে, দিন কি ওতে খারাপ যায়? যেদিন ভগবানের নাম নেওয়া হয় না সেইদিনই খারাপ যায়।"

ঠাকুরের এই অপূর্ব্ব ভক্তবাৎসল্যের রসে সাধক লাটু মহারাজ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। এই সৌভাগ্যের তুলনা কোথায়?

লাটু গুরু-কৃপায় জপসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার অন্তর সত্তায় নিরন্তর নাম-সাধনা চলিত। উত্তরকালে তিনি বলিতেন, "নাম করতে করতে নাম মনের মাঝে আপন বাসা বেঁধে নেয়।··· একমাত্র নামের শক্তিতে মনের ধর্ম্ম পাল্টে যায়, মনের সঙ্কল্প-বিকল্প সব বন্ধ হয়ে যায়। মনে যখন ঢেউ থাকে না, তখনই মত 'নিসপিওর' হয়। তখনই ভগবানের শক্তি নামতে থাকে, সৎ বস্তুকে চেনা যায়।"

নিরন্তর নাম-জপের অভ্যাস চালাইয়াই প্রথম জীবনে লাটু মহারাজ কামজয়ের সাধনায় জয়ী হইয়াছিলেন, এই কথা উত্তর-কালে তিনি সাধন প্রয়াসীদের প্রায়ই বলিতেন।

ব্রহ্মচারী সাধক লাটুকে ডাকিয়া রামকৃষ্ণ সেদিন বলিলেন, 'ছাখ্, নামের সঙ্গে নামীর ধ্যান করবি।'

ভাব-ভেদে ইষ্টভেদ হইয়া থাকে। লাটু নিজ ধ্যেয়ের আসনে কাহাকে বসাইবেন? সম্মুখে সদ্‌গুরুর প্রেম ঘন বিগ্রহ বর্ত্তমান। প্রধানতঃ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই লাটুর কঠোর তপস্যা এযাবৎ অগ্রসর হইয়াছে। রামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে সেদিন তরুণ সাধকের

সকল সমস্যা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়া যায়। ভাবগ্রাহী ঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন, "ত্থাখ, ধ্যান করতে বসবার আগে ইখানকে (আপনার বক্ষে অঙ্গুলি সঙ্কেতে) একবার ভেবে নিবি। এঁকে ভাবলেই তাঁকে মনে পড়ে যাবে।"

ঠাকুরের সমাধিমগ্ন অবস্থার দিব্য জ্যোতির্ময় রূপটি লাটুর ইষ্টের বেদীতে চিরদিনে জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

লাটু মহারাজ বলিতেন, "গুরু—সচ্চিদানন্দ। সাধনপথে গুরু করা ভাল। তুমি ভগবানকেও গুরু করে নিতে পার—বাকী ভগবানের ভক্তদেরই গুরু করা ভাল। কেন জান? তোমার যখন পিয়াস লাগে—তুমি কি কর? কাছাকাছি যেখানে পানি মিলবে সেখানকেই যাও তো?"

সর্ব্বজ্ঞ আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের চালনা করিতেন নিজ নিজ প্রবণতা ও প্রস্তুতি অনুযায়ী। লাটুর ভক্তি ও ভাবময়তা গোড়ার দিকে গুরু সেবা ও নাম-জপ ধরিয়াই অগ্রসর হয়। ঠাকুর তাঁহাকে সংকীর্ত্তনের রসেও রসায়িত করিয়া নিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কীর্ত্তন-অনুষ্ঠানের সময় ঠাকুর মাঝে মাঝে লাটু ও অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করিতেন। এই শক্তি সঞ্চারের কালে লাটুর ভাব-তরঙ্গ উদ্বেলন হইয়া উঠিত। তাঁহার অশ্রুপাত, সর্ব্বাঙ্গের কম্পন, উদ্দণ্ড নৃত্য ও হুঙ্কার এক অপার্থিব ভাব-ঘন পরিবেশের সৃষ্টি করিত। লাটুর ভাবময়তাকে ঠাকুর যেমন প্রশংসা করিতেন। তেমনি আবার উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য সতর্কবাণীও উচ্চারণ করিতেন। তরুণ সাধককে বলিতেন, "ভাব যেন মাতা হাতী। ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে, সব তোলপাড় করতে থাকে। কিন্তু ওরে, বেশী নাচুনি-কাঁদুনি ভাল নয়। ওতে সময় সময় ভাব ভঙ্গ হয়ে যায়। ভাবকে গোপন করতে না পারলে তা অন্তর্মুখী হয়ে চায় না।"

গুরুর এই নির্দ্দেশের পরে ভাবাবেশের পরবর্ত্তী স্তরে লাটুর মধ্যে ধীরে ধীরে অপূর্ব্ব সংযম ও প্রশান্তি আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণের নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, "আমি সারেও আছি, মাতেও আছি।" নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও রূপ-ব্রহ্ম তাঁহার নিকট একাকার। সাধন পদ্ধতির দিক দিয়াও ঠাকুর সর্ব্ব ভাবধারার সমন্বয়কে উৎসাহিত করিতেন। লাটু প্রভৃতি ভক্তদের তিনি তাহাদের নিজ নিজ মানসিক গঠনভঙ্গী ও প্রস্তুতি অনুযায়ী চালিত করিতেন। আবার বিভিন্ন সাধনধারার সমন্বয় দেখানোর জন্য, এই সমন্বয়ের রসাস্বাদন করাইবার জন্য, বলিতেন, "ওরে তোরা একঘেঁয়ে হোস্ নি। একঘেঁয়ে ইখানকার ভাব নয়। ইখানে ঝোলেও খাবো, ঝালেও খাবো, অম্বলেও খাবো—এই ভাব।"

লাটু মহারাজ ঠাকুরের সাধন সমন্বয়ের মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন, তাই ভাব ও জ্ঞান তাঁহার জীবনে সমভাবে স্ফুরিত হইয়া উঠে। গুরু-কৃপা এবং তাঁহার নিজস্ব সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও সাধনভজন লাটু মহারাজের সম্মুখে ধীরে ধীরে পরমবোধের ইন্দ্রিয়াতীত দ্বার খুলিয়া দেয়।

এই মহাসাধকের তপস্যার বিষয়ে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, "কি ঠাকুরের সঙ্গে, কি তাঁহার দেহত্যাগের পর, তিনি আজীবন প্রায় সারা রাত্রি জাগিয়া ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন এবং দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন।...এইরূপে সারা রাত্রি ধ্যান-ধারণায় রত থাকিলেও তিনি নিয়মিতভাবেই ঠাকুরের সেবা করিয়া যাইতেন।"[১]

সারদানন্দজী একান্তচারী লাটু মহারাজের সাধন সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ কাহিনী ভক্তদের বলিতেন। ঠাকুরের তখন দেহান্ত ঘটিয়াছে। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সবাই নিজ নিজ সাধনায় রত। এই সময়ে গুরু-ভ্রাতাদের মধ্যে লাটুকে কেন্দ্র করিয়া একদিন কৌতুককর ঘটনা সংঘটিত হয়। লাটু দিবাভাগে নিদ্রা যান এবং রাত্রেও কাহারো সঙ্গে বসিয়া তেমন ধ্যান-জপ করিতে তাঁহাকে দেখা যায় না। গুরু-ভ্রাতা শরৎ মহারাজ প্রায়ই গভীর রাত্রে শায়িত থাকা কালে ঠক্‌ঠক্ শব্দ শুনিতে পান। প্রথমটায় সকলে মনে করেন যে

১ সারদানন্দ : লীলাপ্রসঙ্গ

ঘরে ইঁদুরের উপদ্রব বাড়িয়াছে। শেষটায় কিন্তু লাটুর উপরই সন্দেহ ঘনীভূত হয়।

শরৎ মহারাজ ও অপর সবাই সেদিন মধ্য-রাত্রিতে নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া আছেন। সবাইকে ঘুমন্ত মনে করিয়া লাটু মহারাজ চুপি চুপি নাম-জপের মালা হাতে নিয়া সাধনে বসিলেন।

জপের মালা আবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুভাইরা একযোগে চড়াও হন, "তবে রে শালা" বলিয়া লাটু মহারাজকে জড়াইয়া ধরেন। বমাল সহ চোর ধরা পড়াতে মধ্যরাত্রে মঠে এক হৈচৈ পড়িয়া গেল।[১]

এমনই ছিল লাটু মহারাজের তপস্যার সুমধুর গোপনতা ও অন্তর্লীন ভঙ্গিমা।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকৃষ্ণ জপ-ধ্যান নিরত লাটুর সমগ্র সত্তায় একটি প্রচণ্ড নাড়া দিয়া দিলেন। ব্যাপারটি রাখাল মহারাজ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলিয়াছেন, "একদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে ঠাকুরের আদেশে লাটু আমাদের সকলকে ডেকে তুলল। ঠাকুর আমাদের বললেন, 'তোরা আজ খুব জপ করতে থাক্।'

"তারপর তিনি 'জাগো মা কুল-কুণ্ডলিনী' গানখানি বেড়াতে বেড়াতে গাইতে লাগলেন। হঠাৎ কি জানি দেহটা কেঁপে উঠলো আর লেটো উহুঁ উহুঁ করে চাৎকার করে উঠলো। ঠাকুর তার কাঁধ দুটো চেপে ধরে বললেন, 'ঠিক বসে থাকবি। আসন থেকে উঠতে পাবি নি।'

"কিছুক্ষণ পরে লেটো বেহুঁশ হয়ে পড়লো। ঠাকুর তখনো সেই গান গেয়ে তাঁর শক্তি সঞ্চারিত করে দিচ্ছিলেন।"

১ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়: লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা।
মহেন্দ্রনাথ দত্ত: তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান।

লাটু মহারাজ তখন কৃচ্ছ্র ও তপশ্চর্য্যায় রত। নিজের অভীষ্ট সাধনে দিনের পর দিন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। একদিন তিনি শিব মন্দিরে ধ্যানমগ্ন—অচৈতন্য-প্রায় হইয়া আছেন। কৃপালু রামকৃষ্ণ ধ্যানী শিষ্যের অবস্থাটি সম্যক্ অনুধাবন করিলেন। একটি হাতপাখা ও এক গ্লাস জল নিয়া ঠাকুর তখনি লাটুর নিকট গিয়া উপস্থিত। শিষ্যের ঘর্ম্মাক্ত কম্পমান দেহে ব্যজন করিতে করিতে কহিলেন, "ওরে বেলা যে গড়িয়ে এল, সন্ধ্যেটন্ধ্যে সাজাবি কখন ?"

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে লাটুর লজ্জার সীমা রহিল না। আপত্তি জানাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আপুনি একি করছেন ? এতে যে হামার অকল্যাণ হোবে! কুথায় আপুনাকে হামি সেবা করবে, না— আপুনি হামার জন্য কষ্ট করছেন।"

স্মিতহাস্যে ভক্ত-বৎসল ঠাকুর উত্তর কহিলেন, "ওরে তোর কে সেবা করছে ? তোর ভেতরে যে উনি (শিবলিঙ্গকে দেখাইয়া) এসেছিলেন। তাঁর সেবা করবো না, সেকি কথারে! এত গরমে ওঁর যে কষ্ট হচ্ছিল।"

কি ঘটিয়াছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে লাটু বলিলেন, "হামি তো কুছু জানে না, বাকী তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সামনে একটা জ্যোতি দেখতে পেলুম, সব ঘরখানা ভরে গেল, আর কুছু হামার মনে নেই।"

একদিন কি এক কারণে লাটু তাঁহার ধ্যানে মনটি নিবিষ্ট করিতে পারিতেছেন না। রামকৃষ্ণকে বিপদের কথা নিবেদন করিলেন। ঠাকুরের নানা প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইলেন, "আজ মন্দিরে যাবার আগে মনে হয়েছিল— মা যদি বর দিতে আসেন তবে হামি কি চাইবো ?"

গুরু তখনি ব্যগ্র হইয়া শিষ্যকে সতর্ক করিয়া দিলেন, "ঐ হয়েছে রে! কামনা আশ্রয় করলে কখনো কি জপ-ধ্যানে মন বসে ? ওসব করবি নি। ধ্যানে বসে বর চাইতে নেই।"

দেব-দেবীর দর্শন লাভ হইলে সাধক সাধারণতঃ বর প্রার্থনা

করিয়া নেয়, এই কথাই সরল লাটুর জানা আছে। এবার তাঁহার সর্ব্ব সমস্যার সমাধান করিয়া ঠাকুর নির্দ্দেশ দিলেন, "নারে না, বর চাইতে নেই। একান্তই মা যদি তোকে বর নিতে বলেন, তবে বলবি,—মা আমি ধন-জন দেহসুখ চাইনে, আমার কেবল শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

এমনই করিয়া সাধনের প্রতি স্তরে, প্রতি গ্রন্থিতে কৃপাসিন্ধু ঠাকুর আশ্রিতদের সযতনে রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার অধ্যাত্ম-সন্তানদের সাধনজীবনের কোন রন্ধ্রপথেই তাঁহার সদাজাগ্রত দৃষ্টিকে এড়াইয়া অবিদ্যার প্রবেশ সম্ভব ছিল না।

লাটুর পরবর্ত্তী সাধনজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্বামী অদ্বৈতানন্দ বর্ণনা করিয়াছেন একদিন ধ্যানতন্ময় অবস্থায় লাটু অচৈতন্য হইয়া পড়েন। মুখ থুবড়িয়া মাটিতে পড়িয়া তিনি গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে থাকেন।

এ সংবাদ পাওয়া মাত্র ঠাকুর সেখানে গিয়া উপস্থিত। তিনি তাঁহাকে চিত করিয়া শোয়াইয়া দিলেন আর তাঁহার বুকে নিজের হাঁটু দিয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে লাটুর সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই বুঝি আজ মা কালীকে দেখেছিস্? চুপ কর শালা! চুপ কর্ শুনতে পেলে এখনই একটা হৈচৈ পড়ে যাবে!" স্বভাব-শান্ত সাধক লাটু চুপ করিয়া গেলেন। ইহার পর হইতে ধ্যানকালে গুরুভাইরা তাঁহার রূপান্তরের নানা বিশিষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাইতেন।

গুরু কৃপায় ও নিজের কঠোর-তপস্যার ফলে লাটুর নানা দিব্য দর্শন হইতে থাকে। ধ্যানে তিনি রামচন্দ্র, মহাবীরজী, বিশ্বনাথ, মা-কালী, কিষণজী ও যোগমায়ার দর্শন তিনি প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন ঐশী প্রকাশের, বিভিন্ন লীলামূর্ত্তির আনন্দধারায় স্নাত হইয়া সাধক লাটু তাঁহার চরমসিদ্ধির দিকে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকেন।

একদিন নিশীথ রাত্রে রামকৃষ্ণ লাটুকে বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসনে ধ্যান করিতে পাঠাইলেন। দৃঢ় ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, নির্ভীক

ও শক্তিধর সাধক ছাড়া ঠাকুর পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সহসা কাহাকেও বসিতে দিতেন না।

সিদ্ধ আসনে গিয়া লাটু মহারাজ উপবেশন করেন বটে, কিন্তু ঠাকুরের সিদ্ধি-পূত এই পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিবার পূর্ব্বক্ষণে এই বীর সাধকের অন্তর কাঁপিয়া উঠে।

ধ্যানে দর্শনাদির পরে লাটু এক বিপদে পতিত হন। কোনমতেই আসন ছাড়িয়া তিনি উঠিতে পারিতেছেন না। পঞ্চমুণ্ডী আসনের চারিদিকে লাটু বীভৎস ভীতিপ্রদ দৃশ্যাদি দেখিতেছেন, একেবারে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অজানা কিছুই নাই। তিনি নিকটেই ছিলেন, এবার সঙ্কটমোচনের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন। উচ্চকণ্ঠে অভয় জানাইয়া বলিলেন, "কিরে ভয় পেয়েছিস নাকি? এত ভয় কিসের? আয় আয়, আমার সঙ্গে চলে আয়!"

আর একদিনের কথা। বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর সিদ্ধাসনে লাটু মধ্যরাত্রে ধ্যান শুরু করিয়াছেন। একনিষ্ঠ সাধকের নিশ্চল নিস্পন্দ দেহে বাহ্য চৈতন্যের চিহ্নমাত্র নাই। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তখনো লাটু ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় বেলতলায় বসিয়া আছেন। প্রিয় শিষ্যকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ঘরে দেখিতে না পাইয়া ঠাকুর বেলতলার দিকে অগ্রসর হইলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন, লাটু ধ্যানাবিষ্ট, বাহ্যজ্ঞান নাই। বেলতলার অদূরে দুইটি কুকুর স্থির নিষ্পলক নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঠাকুর কতকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, ক্রমে সাধক চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। সম্মুখে করুণাঘন সদ্‌গুরুর দিব্যমূর্ত্তি। আনন্দাপ্লুত লাটু ঠাকুরের পাদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন।

ঘরে ফিরিবার পথে রামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওরে তোর মহা-সৌভাগ্য!" মা তোর রক্ষার জন্য দুটো ভৈরবকে পাঠিয়েছিলেন। কুকুরের বেশ ধরে দুটো ভৈরব তোকে এতক্ষণ পাহারা দিচ্ছিল. দেখলুম।

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের চিহ্নিত ভক্তেরা তখন একে একে আসিয়া জুটিয়াছেন। প্রায় দিনরাত্র ঠাকুরের নির্দ্দেশে শিষ্যদের নাম-জপ, কীর্ত্তন ও ধ্যান চলিতেছে। গৃহী-শিষ্যের দলও ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসিয়া ধীরে ধীরে হইতেছেন রূপান্তরিত। এসময়ে একদিন ঠাকুর সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "লেটো চড়েই রয়েছে। ক্রমে লীন হবার যো।"

যুবক নরেন্দ্রনাথ (উত্তরকালের বিবেকানন্দ) তখন মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন। দ্বিধা ও সংশয়ে তখনো তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া আছে। তাই বুঝি সেদিন ধ্যানাবিষ্ট লাটুর ধ্যান ভাঙ্গানোর জন্য রামকৃষ্ণ নরেনকেই তাঁহার কাছে পাঠাইলেন। নিকটেই রহিয়াছে একটি বড় গাছ। লাঠি দিয়া এই গাছের গুঁড়িতে নরেন বার বার আঘাত করিতে লাগিলেন। এই শব্দে লাটুর ধ্যান টুটিয়া যাক, ইহাই তিনি চান। কিন্তু লাটুর কোন হুঁশই নাই।

এমন সময় ঠাকুর ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "থাক, ওকে আর বিরক্ত করিস নি।"

নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "ওর হুঁশ থাকলে তো বিরক্ত করবো। একেবারেই যে বেহুঁশ।" শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "এরকম বেহুঁশ না হতে পারলে কি ধ্যান জমেরে !"

অন্যান্য দিন পরমহংসদেব লাটুকে দিয়াই নরেনের খোঁজখবর করাইতেন। আজ ধ্যান-বিভোর লাটুর অবস্থাটি দেখানোর জন্যই বুঝি তাঁহার সন্নিধানে নরেনকে পাঠাইলেন।

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালেই স্পর্শমণি ঠাকুরের স্পর্শ-প্রভাবে লাটু এক উচ্চতর অধ্যাত্ম-স্তরে আরূঢ় হন। তাঁহার ধ্যানতন্ময়তা এমন বাড়িয়া যায় যে এসময়ে প্রায়ই, ঠাকুর নিজের হাঁটু দিয়া শিষ্যের বক্ষ ঘর্ষণ করিতেন, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতেন।

সদগুরু রামকৃষ্ণের নিকট হইতে লাটু যে সাধনা ও সিদ্ধি লাভ

করিয়াছিলেন, সারা জীবন তাহা ঠাকুরের নাম করিয়া, ঠাকুরের উপদেশ হিসাবে, মুমুক্ষুদের মধ্যে তিনি বিলাইয়া গিয়াছেন।

সাকার ও নিরাকার ধ্যান সম্বন্ধে লাটু মহারাজ বলিতেন, "ভক্ত নামরূপ নিয়ে ধ্যেন করে, আর জ্ঞানী জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ নিয়ে ধ্যেন করে। বাকী যা নিয়েই ধ্যেন করনা কেনো, শেষে দুজনাই এক জায়গায় পৌছায়। জানবে ধ্যেন জম্‌লে নামও ছুটে যায়। তখন একটা রেশ থাকে। বাকী, সেটা যে কি তা মুখে বলতে পারা যায় না। ধ্যেন জমলেই অখণ্ডের বোধ এসে যায়। এ বেপার মুখে বলা যায় না। সেই বোধে দেহজ্ঞান থাকে না, মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প কুছু থাকে না, বুদ্ধিভি চলে যায়, তখন শুধু বোধ থাকে।"

আপন অধ্যাত্ম জীবনের অভিজ্ঞতার কথা লাটু মহারাজ তাঁহার প্রজ্ঞা-প্রোজ্জ্বল সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন,—"জানো, সাধনকালে জ্যোতি-ট্যোতি দেখা কুছু নয়—ওসব দেখলে শুধু বিশ্বাস দৃঢ় হয়। যখন দেহবোধ চলে যায় আর অন্তর শুদ্ধ, পবিত্র হয়, তখনই বুঝতে পারা যায় যে, জ্যোতির পারে এক মুল্লুক আছে—যে মুল্লুকের খবর বুদ্ধি-বিচার দিয়ে মেলে না। একদিন তো কাশীপুরে ওনার (শ্রীরামকৃষ্ণের) মাথায় হাত বুলুচ্ছিলুম ; তখন তো হামার সামনে সেই মুল্লুক খুলে গেলো। সেই মুল্লুকে যা দেখেছি তা চোখ ধরতে পারে নি, যা আস্বাদন করেছি তা জিব নিতে পারে নি। কিন্তু সব কুছু হামি অনুভব করেছি।"

কাশীপুরের বাগানে রামকৃষ্ণের সেবায় ভক্তগণ প্রাণ-মন ঢালিয়া দেন। নিরন্তর গুরু পরিচর্য্যার মধ্যেই তাঁহারা অধ্যাত্ম সাধনার মূল ধারাটির সন্ধান প্রাপ্ত হন। এ সময়ে সবাই ঠাকুরকে নিয়াই দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁহাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার অবসর বড় একটা মিলিত না।

কেউ কেউ এ সময়ে মন্তব্য করেন, "তাই তো ভজনের সুযোগ আর তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। যারা সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এসে তপস্যা শুরু করেছে, তাদের দশা কি হবে?"

লাটু মহারাজ উত্তেজিত হইয়া বলেন, "ছাখো, আস্‌লি উপাসনা হচ্ছে তাঁর সেবায়। তিনি (ঠাকুর) হামাদের বলতেন, 'উপাসনা করবার সময় ভাবতে হয় যেন তিনি (ইষ্টদেব) সামনে রয়েছেন আর তুমি তাঁর পা ধুয়ে দিচ্ছো, তাঁকে নাওয়াচ্ছো, তাঁকে খাওয়াচ্ছো, তাঁকে সাজাচ্ছো গোছাচ্ছো, হৃদয়ে বসাচ্ছো, যেন ফুল দিয়ে পূজা করছো'—হামাদের তো সেখানে ঠাকুরের সেবায় তাই হোত।"

গুরু-অন্ত প্রাণ-সাধকের নয়নযুগল এই সেবাধর্ম্মের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে দিব্য জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত।

একদিন রামকৃষ্ণ বাগানে বেড়াইতে নামিয়াছেন। পরমভক্ত গিরিশের স্তুতিতে তাঁহার মধ্যে দেখা গেল দিব্য ভাবাবেশ।

"তোমাদের চৈতন্য হোক্" বলিয়া কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন সম্মুখস্থ ভক্তদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। পুণ্যময় দেহের স্পর্শে সবাই ধন্য হইল। লাটু কিন্তু সেই সময়ে সোরগোল শুনিয়া এবং ভক্তদের আহ্বান পাইয়াও ছুটিয়া আসেন নাই। কল্পতরুরূপী ঠাকুরের কাছে সেদিন তিনি কেন আশিস্‌-প্রার্থী হন নাই, এ প্রশ্নের উত্তরে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "তিনি তো আশীর্ব্বাদ দিয়ে হামাদের ভরপুর করে দিয়েছেন। আবার হামি কি চাইবো তাঁর কাছে?"

অহৈতুক গুরুকৃপার রসধারা যাঁহার সারা সত্তাকে অভিসিঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, প্রাণ-সর্ব্বস্ব সেই ঠাকুরের নিকট লাটুর নূতন করিয়া আর কি-ই বা চাহিবার ছিল?

লাটুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণ এবং ঘনিষ্ঠ মহলের কাছে 'অদ্ভুত' রূপেই চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাই তাঁহার সন্ন্যাস নাম হইয়াছিল অদ্ভুতানন্দ স্বামী। বহুর মধ্যে লাটু মহারাজ ছিলেন একক, সাধারণের মধ্যে ছিলেন অসাধারণ— এবং রহস্যময়।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকৃষ্ণ শুদ্ধসত্ত্ব কিশোর লাটুকে সারদা-

মণির সম্মুখে উপস্থিত করেন। সারদামণির নানা গৃহকর্ম্মে সহায়তা করিয়া ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া লাটু তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে চিহ্নিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা-সারদামণির স্নেহরসে যেমন লাটু বর্দ্ধিত হন, তেমনি উভয়ের সঙ্গে এক স্বাভাবিক অপত্য-সম্বন্ধের যোগেও নিজেকে তিনি যুক্ত করিয়া নেন। মমত্ব ও নির্ভরতার দিক দিয়া এ যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন।

বরানগরের মঠে একদিন ভোরবেলায় শশী মহারাজ দেখিতে পান যে ঠাকুরের হালুয়াভোগ রান্নার কড়াইটি অপরিচ্ছন্ন রহিয়াছে। গত রাত্রে লাটু মহারাজ তাহাতে ছোলা সিদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহা পরিষ্কার করিতে ভুল হইয়াছে। ঠাকুরের সেবার ত্রুটি হইলে একান্ত ভক্ত শশী মহারাজের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত। তিনি লাটু মহারাজকে গালি দিতে লাগিলেন।

তিরস্কারের উত্তরে বালকের মতো লাটু মহারাজ ভয় দেখাইয়া বলিলেন, "তোমার বাবা-মা আর হামার বাবা-মা কি আলাদা আছে? হামি মাকে আজই পত্র দিব।"

ঠাকুরের লোকান্তরের পর শ্রীমার সঙ্গে লাটু মহারাজ বৃন্দাবন ধামে তীর্থ ভ্রমণে যান। খামখেয়ালী সাধক-পুত্রকে নিয়া এই সময়ে মার ঝামেলা কম পোহাইতে হইত না। আহারে বসিয়া লাটু সমস্ত খাবার বানরদের বিলাইয়া দিতেন। আবার অসময়ে আসিয়া মা ও তাঁহার সঙ্গিনীদের কাছে নিজের খাবার চাহিতেন, তাঁহাদের বিব্রত করিতেন। যমুনার তীরে কখনো বা সারা দিনমান ঘুরিয়া আসিয়া বালকবৎ লাটু মায়ের নিকট আব্দার করিতেন, "বড় খিদে পেয়েছে মা, জলদি হামায় কিছু খাবার দিন।"

"আমার লাটুর সবই অদ্ভুত", এই মন্তব্য করিয়া শ্রীমা তাঁহার সমস্ত স্নেহের দাবী স্মিতহাস্তে মানিয়া নিতেন।

শ্রীমার উপর লাটু মহারাজের শাসনেরও এক মনোরম বিবরণ আছে। বলরামবাবুর ভবনে মা সেদিন আসিয়াছেন। বহির্ব্বাটিতে

লাটু তখন অবস্থান করিতেছেন। সাগ্রহে তাড়াতাড়ি এই খেয়ালী পুত্রের সঙ্গে তিনি দেখা করিতে আসিলেন।

লাটু বাড়ীর অভ্যন্তরে মেয়ে মহলে ইচ্ছা করিয়াই এতক্ষণ যান নাই। এবার মা নিজেই বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ জুড়িলেন—"কি বাবা লাটু, কেমন আছ?"

লাটু বিপদে পড়িলেন। উষ্মা-জড়িত কণ্ঠে মাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি ভদ্দর ঘরের মেইয়া, সদর বাটিতে তুমি কেন? ভেতরে যাও। হামি তো তোমার গোলাম আছি! হামি সেখানে গিয়ে তোমার সাথে দেখা করছি।'

অদ্ভুতানন্দের অদ্ভুত খেয়াল সারদাদেবীর জানা ছিল। তাই হাসিতে হাসিতে তখনি লাটুর অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি চলিয়া যান। এবার অন্দরমহলে বাড়ীর ভিতরে গিয়া মায়ের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া লাটু যুক্তকরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।[১]

বরানগর মঠে নরেন্দ্রনাথ লাটুকে বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাস নিবার নির্দ্দেশ দেন। এই হোমের পূর্ব্বে পিণ্ডদান করিতে হয়। লাটু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক ভঙ্গীতে পিতৃ-পুরুষকে আহ্বান করিলেন। তারপর সরল অনাড়ম্বর গ্রাম্য ভাষায় কহিতে লাগিলেন, "এ মেরা বাপজী, হিয়া আয়, হিয়া বৈঠ্। ইয়ে পূজা লে, পিণ্ড লে, পানি লে।"

অদ্ভুত চরিত্র, অদ্ভুত ভাবময়তা ও ধ্যানানুরাগের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ লাটুর নামকরণ করিলেন অদ্ভুতানন্দ। সন্ন্যাস গ্রহণের পর লাটু মহারাজের ত্যাগ বৈরাগ্য আরও বাড়িয়া যায়। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপদেশটি অধিকতর নিষ্ঠার সহিত আঁকড়াইয়া ধরেন।

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা

মুক্ত বিহঙ্গের মতো স্বেচ্ছাবিহার করিতেন লাটু মহারাজ, আর গঙ্গার তীরে বসিয়া করিতেন জপ-ধ্যান। বেশভূষা বা আহার্য্যের দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নাই—কঠোরতপা তপস্বীর একাগ্র সাধনসত্তার সম্মুখে বিরাজিত শুধু তাঁহার ইষ্টদেব।

বলরাম মন্দিরে বা উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাপাখানায় আপন খেয়াল মতো কখনো কখনো কিছুদিন তিনি বাস করিতেন, আবার কোথায় হইতেন অদৃশ্য।

অর্থের প্রতি তাঁহার তীব্র বিতৃষ্ণা যেমন তাঁহার ছিল, চিরজীবন নারী সান্নিধ্য এড়াইয়া চলার ঝোঁকও ছিল তেমনই প্রবল।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে লাটু মহারাজ সেবার কাশ্মীরে বেড়াইতে গিয়াছেন। হাউস বোটে সকলে উঠিতে যাইবেন, লাটু অকস্মাৎ লাফাইয়া মাটিতে পড়িলেন। বোটের মাঝি সপরিবারে এককোণে বাস করে। নৌকায় নারীরা রহিয়াছে দেখিয়া লাটু বাঁকিয়া বসিলেন, এই হাউস বোটে তিনি কিছুতেই উঠিবেন না। স্বামীজী তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তবে নৌকায় তোলেন।

একান্তচারী, আত্মগোপন প্রয়াসী লাটু মহারাজ কোন অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করেন নাই। উচিত-বক্তারূপেই সর্ব্বত্র তিনি পরিচিত ছিলেন।

একবার এক প্রবীণ গৃহী ভক্ত বরানগর মঠে আসেন এবং মাতব্বরী চালে তরুণ সন্ন্যাসীদিগকে আঘাত দিয়া কথা বলিতে থাকেন। বয়সে বড় বলিয়া সকলে ইঁহার অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইতেছেন। লাটু মহারাজের কাছে আসিয়া ভদ্রলোকটি তাঁহার বৈরাগ্য-প্রবণতাকেও উপহাস করিতে ছাড়িলেন না।

এক মুহূর্ত্তে লাটু জ্বলিয়া উঠিলেন। সরোষে কহিলেন, "আঁশ-চুপড়ীর গন্ধ না হলে মেছোনীদের ঘুম হয় না, শুনেছি। আপুনারও যে সেই অবস্থা! আপুনি ত্যাগের পথে না এসে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা কি বুঝবেন? জনক রাজার কথা বলছেন, বাকী, জনক রাজা কি সবাই হোতে পারে?"

অভিভাবকত্ব-প্রয়াসী প্রবীণ ব্যক্তিটি লাটুর তিরস্কারে একেবারে চুপ্‌সাইয়া গেলেন।

বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে নিয়ম করেন যে ভোর চারটায় ঘণ্টা বাজানো হইবে এবং সবাই তখন ধ্যান-জপ শুরু করিবে। এ আদেশ জারীর পরদিনই দেখা গেল, লাটু মহারাজ তাঁহার কাপড়-গামছা নিয়া মঠ ত্যাগ করিতেছেন।

সবাই তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে লাটু বলেন, "হামি তোমার ওসব কানুন মানতে পারবো না। ঘড়ি ধরে হামার মন ধ্যানে বসে যাবে না।"

স্বামীজী তাঁহাকে বুঝান, "নূতন সাধকদের জন্যই এই বিধি, লাটু, তোর জন্য এসব নয়।" অনেকক্ষণ পরে লাটু নিরস্ত হন।

আপ্তকাম, রামকৃষ্ণময়, এই ত্যাগী সন্ন্যাসীর নিজের মানসিক ও আধ্যাত্মিক গঠনের সহিত মঠ স্থাপনা ও কর্ম্মানুষ্ঠানের সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে নাই। তাই মঠের গুরুভাইদের সহিত আত্মিক যোগ রাখিয়া লাটু নিভৃত ও নিজস্ব আবেষ্টনীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকিতেই ভালবাসিতেন।

অথচ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল চিরজাগ্রত। নরেন্দ্র যে ঠাকুরের চিহ্নিত শিষ্য ও প্রতিনিধি একথা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন। তাই উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দের সংগঠন হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখিলেও লাটু মহারাজ গুরুভাইদের প্রতি ও মঠের প্রতি গভীর মমত্ব চিরদিন পোষণ করিয়া গিয়াছেন।

লাটু মহারাজ স্বেচ্ছামত বিচরণ করেন, যত্রতত্র ভিক্ষা গ্রহণ করেন, ইহা অনেকের মনঃপূত নয়। এদিকে মঠের অধ্যক্ষ রাখাল মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি গোপনে কয়েকজন

ভক্তকে নিয়োজিত করেন, তাঁহারা যেন লাটু মহারাজকে বুঝাইয়া ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত করেন।

লাটু মহারাজ বুঝিলেন, তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তিতে মঠের সুনাম নষ্ট হইবে বলিয়া রাখাল মহারাজ আতঙ্কিত হইয়াছেন। আগত ভক্তদের তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ঠিকই তো, রাজাকে অনেক দিক ভেবে চলতে হয়। মঠের সুনাম তাকেই যে রক্ষে করতে হবে। তাই সে হামাকে এমন অনুরোধ জানিয়েছে তোমাদের থ্রু দিয়ে।"

ইহার পর তিনি বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসীর অবশ্য করণীয় মাধুকরী বা ভিক্ষা-বৃত্তি ত্যাগ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁহার ভাবাবেগ ও উৎসাহ বশে বলিতেছিলেন "ওরে দেখছিস্ কি? যা করে গেলুম, পরে তার ফল বুঝতে পারবি। এর পরে দেখবি—লোকের পর লোক আসছে। তখন বুঝবি এই বিবেকানন্দটা কি করে গেছে।"

তেজস্বী, উচিত-বক্তা, লাটু মহারাজ চট্ করিয়া উত্তর দিলেন, "ভাই, তুমি আর কি নোতুন করেছো? শঙ্কর বুদ্ধ এঁরা যা করে গেছেন, তুমি তো তার উপর শুধু দাগা বুলিয়েছ। এর বেশী কুছু করেছ কি?"

উদারচেতা স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন, কথাটি অপ্রিয় হইলেও সত্য। উত্তরে কহিলেন, "ঠিক বলেছিস লেটো! ঠিক! শুধু দাগাই আমি বুলিয়েছি।"

একবার লাটু মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হন। কয়েকটি পণ্ডিত লাটু মহারাজকে প্রশ্ন করিতে গেলে, স্বামীজী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠেন, আপনারা "আগে আমায় প্রশ্ন করুন। আমি যদি সদুত্তর না দিতে পারি তবেই আমার এই প্রবীণ গুরুভ্রাতাকে বিরক্ত করবেন।"

বলা বাহুল্য, স্বামীজীকে ডিঙ্গাইয়া লাটুর নিকট কাহাকেও পৌঁছিতে হইল না। দেশে ফিরিয়া আসিয়া লাটু মহারাজ সবাইকে

বলিলেন, "হাঁ, গুরুভাই হচ্ছে লোরেন, আমি যে শালা এক মুখ্খু, তা কাউকে জানতেই দিলে না।"

গুরুকৃপায় কাশীপুরে লাটু মহারাজের প্রথম সমাধির আস্বাদন লাভ হয়। ইহার পর তিনি মহাধাম জগন্নাথ পুরীতে গমন করেন। লাটু বলিতেন, "হামনে দারু-ব্রহ্মের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম—যে রূপ দেখে মহাপ্রভু চোখের জলে ভেসে যেতেন, হামাকে আপুনি তাই দেখান। এমনি শরণ নেবার পর তিনি হামার প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের আট বৎসর পর লাটু মহারাজের আবার একবার সমাধি হয়। এ কথাটি তিনি তাঁহার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, "হামার উপর তাঁর অশেষ কৃপা, তাই সাত-আট বছর মেহনতি করিয়ে তিনি ফিন্ সেই ওবস্থায় হামাকে তুলে দিলেন। একদিন গঙ্গাতীরে বসে ধ্যেন করছি, আকাশ-বাতাস ছেয়ে একটি জ্যোতি এলো, তার মাঝে অসংখ্য জ্যোতি, নিজেকে হারিয়ে ফেল্লুম। বাকী, সে মুল্লুক থেকে নেমে এসে যে কি আনন্দে রইলুম—তখন সব কুছু আনন্দময় হয়ে গিয়েছে।"

সারা অস্তিত্বে বিস্তারিত পরমানন্দের এই ধারাটি লাটু মহারাজ শুধু নিজের জীবনেই ধরিয়া রাখেন নাই, মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এই অমৃত তিনি মুক্তিকামী সাধকদের মধ্যে বিলাইয়া গিয়াছেন।

জীবনের শেষ আটটি বৎসর লাটু মহারাজ কাশীধামে যাপন করেন। ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ এই রামকৃষ্ণ সন্তান অল্পকাল মধ্যে কাশীর সাধকসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠেন। নিভৃতে আপন সাধনভজন নিয়া রত থাকিলেও বহু গৃহী ও সন্ন্যাসী সাধক

তাঁহার উপদেশ লাভে ধন্য হন, নিজেদের আত্মিক জীবন গঠনে অনেকে সমর্থ হন।

দেহান্তের এক বৎসর আগে লাটু মহারাজের পায়ে একটি গ্যাংরিন্ হয় এবং বার বার ইহাতে অস্ত্রোপচার করিতে হয়। প্রতি অস্ত্রোপচারের সময়ই সার্জ্জনেরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেন, মহাপুরুষের চোখে মুখে দুঃসহ যন্ত্রণার কোন চিহ্নই নাই। নির্ব্বিকার চিত্তে ইষ্টধ্যানে তিনি রহিয়াছেন সদা বিভোর, আর দেহবোধ হইয়াছে তিরোহিত।[১]

কাশী হাড়ারবাগের বাড়ীতে শরৎ মহারাজ রোগ শয্যাশায়ী লাটু মহারাজকে দেখিতে আসিয়াছেন।[২] সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সাধু, কেমন আছো ?"

"শরীর ধারণ বিড়ম্বনম্"—সহাস্যে উত্তর দেন লাটু মহারাজ।

লাটু মহারাজকে প্রণাম করিয়া শরৎ মহারাজ বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। এমন সময়ে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর এক সন্ন্যাসী প্রশ্ন করেন, "আপনি লাটু মহারাজকে প্রণাম করেন কেন ?"

"সে কি! সাধু যে আমাদের সবাইর আগে ঠাকুরের চরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমাদের সন্ন্যাসী গুরুভাইদের মধ্যে লাটু মহারাজই জ্যেষ্ঠ। তাঁকে প্রণাম করবো না, বলিস্ কিরে!"

সেদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দের একজন ভক্ত মৃত্যু পথযাত্রী লাটু মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, জগৎ কি এখন আর আপনাদের কাছে ভার-বোঝা বলে মনে হয় ?"

লাটু স্মিতহাস্যে কহিলেন, "ত্যাখো, গঙ্গার জলে ডুব দিলে, মাথার ওপর হাজার মণ জল থাকলেও ভারটা বুঝা যায় না। তেমনি ভগবানের সংসারে ভগবানকে ধরে ডুব দিলে, সংসারের বোঝা আর

১ দ্য ডিসাইপল্স্ অব রামকৃষ্ণ—অদ্ভুতানন্দ

২ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা।

বোঝা বলে মনে হয় না, সংসার তখন আনন্দের খেলা বলে মনে হয়। তুলসীদাসের একটা কথা মনে রেখো—'যো যাকো শরণ লিয়ে, সে রাখে তাকো লাজ। উলট্ জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ।' আরো একটি কথা জেনে রাখ্‌বে—'তোম জ্যায়সা রাম পর, তোমসে ত্যয়সা রাম। ডাহিনে যাও তো ডাহিনে যায়, বামে যাও তো বাম।"

১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল লাটু মহারাজের বিদায়ের লগ্নটি আসিয়া গেল। পরম সন্তোষের সহিত প্রভু বিশ্বনাথের চরণামৃত পান করিয়া চিরতরে তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেন। রামকৃষ্ণময় মহাসাধকের জীবনধারাটি এবার মিশিয়া গেল সচ্চিদানন্দ সাগরে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

রামকৃষ্ণের মানসপুত্র ও ঘনিষ্ঠতম লীলাপার্ষদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জীবন যেন রামকৃষ্ণেরই এক ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমাহার দেখা গিয়াছিল তাঁহার সাধনজীবনে, সেই সঙ্গে অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল গুরুর উদার ধর্ম্ম-সমন্বয়ের বাণী। চরিত্র, আচরণ ও ব্যক্তিত্বের এই ঐক্য ছিল গুরু ও শিষ্যের মধ্যে, ফলে উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল অপূর্ব্ব একাত্মকতাবোধ। প্রাণপ্রিয় ভক্ত ও সহচর রাখাল সদাই থাকিতেন ঠাকুরেরই রসে অভিসিঞ্চিত।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবী ভবতারিণীর কাছে স্বগতোক্তি করিতে শুনা যায়,—"মা. তোমার কাছে কাতর হয়ে বলেছিলাম, আমারই মতো আর একজনকে সঙ্গী করে দাও, তাই বুঝি রাখালকে হেথায় পাঠিয়েছো।"

শুধু সঙ্গী নয়, রাখাল ছিলেন ঠাকুরের লীলাসঙ্গী। ঠাকুরের ঐহিক জীবন ও অধ্যাত্মজীবনের অন্তরঙ্গ জন।

রামকৃষ্ণ ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিকরেরা রাখালকে আদর করিয়া ডাকিতেন—রাখালরাজ। আর উত্তরকালে তিনিই হন রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর রাজা। এই পদগৌরব ও নেতৃত্বের ইঙ্গিত ঠাকুর নিজেই দিয়া গিয়াছিলেন।

ঠাকুরের এই ইঙ্গিতের নিহিতার্থ বুঝিতে বিবেকানন্দের ভুল হয় নাই। তাই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষের পদে এই প্রিয়তম গুরুভাইকেই তিনি বরণ করিয়াছিলেন। এই পদের গুরু-দায়িত্ব রাখালও অবলীলায় পালন করিয়া গিয়াছেন।

মঠের কাজের সংগঠন ও প্রসার, জনসেবা এবং আর্ত্তত্রাণ, সাধনপ্রয়াসী ভক্ত-শিষ্যদের পরিচালনা—এ ধরণের বহুমুখী অনেক

কিছু কর্ত্তব্য কর্ম্মই তাঁহাকে করিতে হইত, আর এগুলি তিনি সম্পন্ন করিতেন অসাধারণ দক্ষতায়, স্মিতমুখে, প্রশান্ত চিত্তে।

মঠ পরিচালনার নিত্যকার সমস্ত কিছু জটিল ও বহুমুখী কাজ শেষ হইলেই রাখাল মহারাজ আপন মনে ডুব দিতেন আত্মিক সাধনার গভীরে। বহিরঙ্গ জীবন হইতে অন্তরঙ্গ লোকে উত্তরণের মধ্য দিয়া 'রাজা' হইতেন 'রাজর্ষি'। তাঁহার এই বৈশিষ্ট কে উদ্দেশ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভাইদের বলিতেন, "রাখাল হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার একটা বিরাট আধার। লক্ষ লক্ষ ভোল্টের শক্তি ওর ভেতর সুপ্ত রয়েছে।"

রাখালের অধ্যাত্ম সাধনা ও সিদ্ধির কেউ প্রশংসা করিলে স্বামীজী উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, বলিতেন, "রাজার স্পিরিচুয়েলিটি আঁকড়ে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে কোলে করতেন, আদর করে খাওয়াতেন, একসঙ্গে শয়ন করতেন, তার সঙ্গে কি কারো তুলনা হয় রে! রাজা আমাদের মঠের প্রাণ—আমাদের রাজা।"

রামকৃষ্ণের আদরের ধন, গুরুভ্রাতাদের মধ্যমণি, ধীর গম্ভীর সার্থক সাধক এই রাখাল মহারাজই উত্তরকালে বহুশখ্যাত হইয়া উঠেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে।

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত গণ্ডগ্রাম শিকরা। এই গ্রামেরই এক সম্পন্ন গৃহস্থ আনন্দমোহন ঘোষের পুত্ররূপে উত্তরকালের বহুজন বন্দিত রাখাল মহারাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দ আবির্ভূত হন। মাতা কৈলাসকামিনী ছিলেন পরম ভক্তিমতী মহিলা। পূজা-অর্চ্চনা ধ্যান-ধারণায় সদাই তাঁহার ঝোঁক ছিল। ভাগবত ও কৃষ্ণলীলার গ্রন্থাদি পাঠেও ছিলেন পরম উৎসাহিনী। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী তাঁহার অঙ্ক আলোকিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হয় এক সুদর্শন শিশু। আদর করিয়া জননী ও পরিজনেরা নাম রাখেন রাখাল।

পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাখাল তাঁহার জননীকে হারান,

অতঃপর বিমাতা হেমাঙ্গিনী দেবীই তাঁহাকে পুত্র জ্ঞানে পালন করিতে থাকেন, সযত্নে মানুষ করিয়া তোলেন।

শিশু রাখালের স্বভাব বড় অদ্ভুত। সঙ্গীদের নিয়া প্রায়ই পূজার খেলায় থাকেন মত্ত। কখনো ঘোষেদের পূজা মন্দিরে, কখনো বা বোধন তলায় মা-কালীর বিগ্রহ নিয়া আনন্দ করেন। এই পূজা-খেলার মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে কোন্ এক অজানা ভাব-গম্ভীর তন্ময়তায় শিশুচিত্ত তলাইয়া যায়, কখনো বা সঙ্গীদের সাথে শ্যামা-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে রাখাল বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। আত্মজনেরা শিশুকে নিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।

ছেলে বড় হইতেছে, লেখাপড়ার সুবন্দোবস্ত করা দরকার। অভিভাবকেরা ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিলেন, রাখাল কলিকাতার ভাল স্কুলে পড়াশুনা করিবে। বিমাতা হেমাঙ্গিনী দেবীর পিত্রালয় কলিকাতায়। স্থির হয়, সেখানে থাকিয়াই ছেলে পড়িবে। ইংরেজী স্কুল ট্রেনিং একাডেমিতে তিনি ভর্ত্তি হইলেন।

সঙ্গেই সুন্দর একটি ব্যায়ামাগার। রাখাল সেখানে সোৎসাহে শরীর-চর্চ্চা করেন। স্কুলের সহধ্যায়ী নরেনও সেখানে যাওয়া-আসা করেন। প্রিয়দর্শন তেজস্বী এই যুবক যেন এক আগুনের ফুলকি। অনতিকালমধ্যে রাখাল তাঁহার প্রতি খুব আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং দুজনের মধ্যে গড়িয়া উঠে অপূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতা। যে অমোঘ আকর্ষণে দুজনের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা জন্মে, যেভাবে তাহা পরিণত হয় অচ্ছেদ্য আত্মিক সম্পর্কে, তাহার তাৎপর্য্য কে সে সময়ে বুঝিতে পারিয়াছিল?

বাংলার শিক্ষিত তরুণ সমাজে তখন কেশবচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রভাব। এই ব্রাহ্ম নেতার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাঁহার আদর্শ চরিত্র ও বাগ্মিতা, প্রভাব বিস্তার করে রাখালের তরুণ জীবনে। কেশবের সংস্কারপন্থী আন্দোলনে রাখাল আকৃষ্ট হন।

উন্নততর নৈতিক জীবন এবং ব্রহ্ম উপাসনার আহ্বানও রাখালের অন্তর্জীবনে গভীরভাবে করে রেখাপাত।

অবসর ও সুযোগ পাইলেই ব্রাহ্মসমাজ গৃহে গিয়া বসেন, উপনিষদের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। আর প্রাণে জাগে তীব্র আকুলতা, কি করিয়া পরমার্থ লাভ করা যায়? দিনরাত এই ভাবনাতেই থাকেন বিভোর।

পড়াশুনায় ছেলের অমনোযোগ দিন দিন বাড়িতেছে। পিতা আনন্দমোহন চিন্তিত হইয়া পড়েন। বিবাহ দিলে সংসারের আকর্ষণ বাড়িবে মনে করিয়া তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। কোন্নগরের ডাক্তার ভুবনমোহন মিত্রের কন্যাটি বড় সুলক্ষণা, পছন্দ করিয়া এই মেয়েটিকেই রাখালের বধূরূপে ঘরে আনা হয়। এই বিবাহ সম্বন্ধকে সূত্র করিয়াই রাখালের অধ্যাত্ম-জীবনের সম্মুখে আসে এক পরম সুযোগ। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সান্নিধ্য তিনি প্রাপ্ত হন, ধীরে ধীরে পরিণত হন নূতন মানুষে।

রাখালের শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সাধক রামকৃষ্ণের অনুরাগী, ইঁহাদের মাধ্যমেই হঠাৎ একদিন তিনি ঠাকুরের পাদমূলে আসিয়া পৌঁছেন।

পূত সলিলা গঙ্গা তটে, দক্ষিণেশ্বরে, ভবতারিণী মন্দিরে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। কিছুদিন যাবৎ সিদ্ধ মহা-সাধকের অন্তরে জাগিয়াছে শুদ্ধসত্ত্ব আধার, ভক্তদলের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। জগন্মাতার নিকট তাই মাঝে মাঝে ব্যাকুল প্রার্থনা জানান—"মাগো, বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে জিভ যে আমার জ্বলে গেল।"

মা আশ্বাস দেন, "তোর ভয় নেই। ত্যাগী শুদ্ধাত্মা ভক্তেরা সব এবার আসছে।"

বালকবৎ ঠাকুর আর একদিন আব্দারের সুরে মাকে জানান, "মা, আমার তো সন্তান-টন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছে করে, একটি পরম শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে আমার সঙ্গে সব সময়ে থাকে। তেমনি একটি ছেলে আমায় এনে দে।"

এই প্রার্থনা জগজ্জননী পূর্ণ করিয়াছিলেন, জুটাইয়া দিয়াছিলেন পুত্রপ্রতিম শিষ্য রাখালকে।

বিবাহের পর রাখাল কোন্নগরে তাঁহার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। এই পরিবারটি ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরমভক্ত। রাখালের শ্যালক নিজেই সেদিন ভগ্নীপতিকে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণের জন্য দক্ষিণেশ্বরে নিয়া যান।

উভয়ে দেবপ্রতিম ঠাকুরকে প্রণাম করেন। কুশল প্রশ্নাদির পর ঠাকুর একদৃষ্টে রাখালের দিকে তাকাইয়া থাকেন—একি, এ ছেলেটি তো তাঁহার অচেনা নয়! অল্প কিছুদিন আগের কথা। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রহিয়াছেন। হঠাৎ দেখিলেন, বটতলায় একটি দিব্য লাবণ্যময় বালক দাঁড়াইয়া আছে। ঠাকুরের দিকে সে তাকাইয়া আছে সতৃষ্ণ নয়নে।

হৃদয়কে ডাকিয়া এই অলৌকিক দর্শনের কথা কহিতেই সে বলিয়া উঠিল, "মামা, আমি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝেছি। তোমার ছেলে হবে, তাই এটা তুমি দেখেছো।"

ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "সে কিরে? আমার তো মাতৃযোনি। আমার ছেলে কখনো হবে না।"

ইহার পরই আবার একদিন স্পষ্টতর রূপে দেখিলেন, একটি দিব্য শিশু জগন্মাতার কোলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার দিকে ইঙ্গিত করিয়া মা সানন্দে কহিলেন, "এই ছাখ্ তোর ছেলে।"

রামকৃষ্ণ কিন্তু বড় ভয় পাইয়া গেলেন! দেবী এ আবার কি বলিতেছেন! গার্হস্থ্য জীবন তিনি চিরতরে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই জীবনেই কি আবার প্রবেশ করিতে হইবে? পুত্র জন্ম নিবে তাঁহার ঘরে?

অন্তর্যামিনী মা সহাস্যে কহিলেন, "না গো তা নয়। এটি হচ্ছে তোর মানসপুত্র।"

একথা শোনার পর তবে রামকৃষ্ণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচেন।

আর একদিন আসে এই মানস সন্তানের বিষয়ে নূতন সঙ্কেত। ঠাকুর মানসনেত্রে দেখিতে পান, গঙ্গাবক্ষে মনোরম একটি পদ্মের উপর গোষ্ঠবিহারী কৃষ্ণ বিরাজিত, আর তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া আছে এক রাখাল-সখা—নূপুর পায়ে মনোহর ভঙ্গীতে সে নৃত্য করিতেছে।

এই দিব্যদর্শন যখন হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই ভক্ত মনোমোহনের সঙ্গে রাখাল গঙ্গা অতিক্রম কবেন, উপস্থিত হন দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র ভূমিতে। বিস্ময় ও কৌতুকভরা নয়নে ঠাকুর দেখিলেন—এই তো সেই পূর্ব্বদৃষ্ট গোপ বালক। জগজ্জননীই বুঝি এবার তাহাকে পাঠাইয়াছেন।

ঠাকুর অনেকক্ষণ রাখালের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর হইল—শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ।

মুহূর্ত্তমধ্যে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন। গদ্‌গদ কণ্ঠে, অস্ফুট স্বরে বলিতে থাকেন, "সেই নাম রাখাল। ব্রজের রাখাল।"

সাক্ষাতের পর বেশ কিছুক্ষণ পরমানন্দে কাটিয়াছে। এবার রাখালকে সস্নেহে সুধাস্নিগ্ধ স্বরে বলেন, "আবার শিগ্‌গীরই এসো একদিন। বুঝলে? শিগ্‌গীর এসো।"

তরুণ রাখালের জীবনে ঠাকুরের এই দর্শন জাগাইয়া তোলে অভূতপূর্ব্ব আলোড়ন। এ আলোড়ন সহজে নিবৃত্ত হইতে চাহে না। ঠাকুরের মোহন মূর্ত্তি, মধুর কণ্ঠ, আর সস্নেহ আহ্বান বার বার মনে পড়িতে থাকে। কেবলই মনে হয়, এ যে কত জন্মের চেনা জন, এ যে আত্মার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়। জন্মান্তরের ধারা বাহিয়া এই আত্মিক যোগ যেন চলিয়া আসিয়াছে।

রাখাল কলিকাতায় ফিরিলেন বটে, কিন্তু মন পড়িয়া রহিল ঠাকুরের কাছে। ব্যাকুল হইয়া আর একদিন একলাই দক্ষিণেশ্বরে যান। ঘনিষ্ঠ আত্মজনের মতো স্নেহের সহজ ও স্বাভাবিক

দাবী নিয়া ঠাকুর প্রশ্ন করেন—"তোর এখানে আসতে এত দেরী কেন রে? তোর জন্য যে আমি ভেবে ভেবে এ ক'দিন অস্থির।"

রাখাল তো অবাক। শুধু একটি দিনের দেখা, এরই মধ্যে ঠাকুর তাঁহাকে এমন আপনার করিয়া নিয়াছেন। মন তাঁহার অজানা আনন্দে ভরিয়া উঠে। নিঃশব্দে ঠাকুরের পদপ্রান্তে বসিয়া থাকেন—ভাবসমুদ্র অন্তরে কেবলি তরঙ্গায়িত হইতে থাকে।

ইহার পর হইতে রাখাল মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হন। আর ঠাকুরকে দেখিলেই হইয়া যান একটি আনন্দোজ্জ্বল শিশু। ঠাকুর যেমন তাঁহাকে আদর করেন, যুবক রাখালও তেমনি সহজ অধিকারের বলে তাঁহার কোলেই কখন কখন চড়িয়া বসেন। আব্দারের যেন সীমা নাই, ভুলিয়া যান যে তিনি একটি পূর্ণ বয়স্ক যুবক। ঠাকুরের এ বাৎসল্য লীলা চলে অব্যাহত ধারায়—স্নেহে, প্রেমে, মমতায় শিশুপ্রতিম পবিত্রচেতা রাখালকে সদা অভিসিঞ্চিত করেন।

রাখাল ঠাকুরকে কখনো দেখেন স্নেহময় পিতা রূপে, কখনো সখারূপে, কখনো বা দেখেন তাঁহাকে করুণাময়, মুক্তিদাতা সদ্‌গুরু-রূপে। গোড়া হইতেই এক সহজ সম্পর্কের মধ্য দিয়াই উভয়ের আত্মিক বন্ধনটি দৃঢ় হইতে থাকে।

আত্মীয়স্বজন কিন্তু রাখালকে নিয়া বড় বিপদে পড়েন। সে সদ্য বিবাহিত যুবক। নবজীবনের আনন্দ-আস্বাদ গ্রহণ করিবে, লেখা-পড়ায় কৃতকার্য্য হইবে, উন্নতির জন্য হইবে যত্নবান—ইহাই তো তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আচরণ দেখা যাইতেছে বিপরীত। সুযোগ পাইলেই সে দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া যায়। ভাবপ্রমত্ত ঠাকুরের সান্নিধ্যে থাকিয়া নিজেও হয় ভাববিহ্বল। সংসারের সব বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া উঠিতে থাকে।

পিতা আনন্দমোহন বড় দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। কি করিয়া এ ছেলেকে সংশোধন করা যায়? কয়েকদিন তাঁহাকে ঘরের ভিতর জোর করিয়া আবদ্ধও রাখেন। একদিন পিতা বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত

রহিয়াছেন, এই অবসরে রাখাল পলায়ন করেন, তারপর সোজা ঠাকুরের পদপ্রান্তে গিয়া নিপতিত হন। উত্তেজিত আনন্দমোহনও দক্ষিণেশ্বরে আসেন পুত্রের পিছু পিছু। ঘরে তাহাকে ফিরাইয়া নিতেই হইবে। কিন্তু ঝগড়া বা বিতর্ক করিবেন কাহার সঙ্গে? রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব বড় অদ্ভুত, দর্শন মাত্রেই প্রাণ কাড়িয়া নেয়। আর, কি সুমধুর প্রাণগলানো ব্যবহার! রাখালের প্রশস্তিও পিতার হৃদয়ে করে গভীর রেখাপাত। পুত্রের নবতর জীবনের সহিত সাময়িক সন্ধি স্থাপন করিয়া পিতা ফিরিয়া আসেন, তাহার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিতে থাকেন।

রাখাল দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া সাধনভজন করিতেছেন। সেদিন তাঁহার শাশুড়ী নিজের কন্যাকে নিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত। কন্যা ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুক, আর রাখালও হোক সংসারী, ইহাই তাঁহার অন্তরের কামনা।

নানা মধুর বাক্যে রামকৃষ্ণ তাহাদের প্রবোধ দেন, প্রসন্ন করেন। হঠাৎ মনে তাঁহার প্রশ্ন জাগে—রাখালের বধূটি সুলক্ষণা তো? তাহার সংস্পর্শে আসিয়া মানসপুত্র রাখালের অধ্যাত্ম-জীবনের ক্ষতি হইবে না তো?

ঠাকুর তখনি মেয়েটিকে নিকটে ডাকিয়া নেন, দেহের লক্ষণগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখেন। তারপর প্রসন্ন মনে মন্তব্য করেন, "নাঃ, ভয়ের কোন কারণ নেই—দেবী শক্তি। স্বামীর ধর্ম্মপথের বাধা হবে না কোনদিন।"

সারদামণি তখন নহবৎখানায় বাস করিতেছেন। খানিক বাদে ঠাকুর রাখালের স্ত্রীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন, নির্দ্দেশ দেন, "ওকে বল্‌বে, টাকা দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।"

রাখাল দিবারাত্র রামকৃষ্ণের কাছে অবস্থান করেন সহচররূপে। প্রাণ ভরিয়া করেন তাঁহার সেবা পরিচর্য্যা। এখন হইতে ঠাকুর

যখনি ভাবাবিষ্ট হন, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, রাখালই তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। মমতাভরে বুক দিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখেন।

নিত্যসঙ্গী নবীন সাধক রাখালকে ঠাকুর পরম যত্নে ও সতর্কতায় গড়িয়া তুলিতেছেন। যখনি যেখানে যান, তরুণসুলভ যে চপলতাই রাখাল করুন না কেন, সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুরের চোখ এড়ায় না। চরিত্রের সামান্যতম ত্রুটি দেখিলেই নামিয়া আসে তাঁহার শাসন ও তিরস্কার।

নূতন উৎসাহে রাখাল সাধনভজন করিতেছেন। ঠাকুরের কৃপায় মাঝে মাঝে মিলিতেছে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আলোর ঝলক। সেদিন একটি বিশেষ ধরণের অনুভূতি লাভের জন্য মন তাঁহার বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিল, ঠাকুরকে তাই খুব চাপিয়া ধরিলেন।

সব কিছু অন্তর্য্যামী ঠাকুরের নখদর্পণে। শান্ত স্বরে বুঝাইলেন, "ওরে, এখনো তার সময় হয় নি, আর একটু সবুর কর্।"

রাখাল কিছুতেই ছাড়িবেন না, বার বার একথা নিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বড় বিরক্ত হইলেন। এ কি রকমের একগুঁয়েমি তার। তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

এবার রাখালের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। রুখিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "বেশ তো, আপনার কাছে কিচ্ছু চাইনে। আপনাব এখানে থাকারও আমার কোন দরকার নেই। আমি আজই, এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

কিন্তু কি পরম আশ্চর্য্য। রাখাল যতই চেষ্টা করুন না কেন, দক্ষিণেশ্বরের বহির্দ্বারটি তিনি কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না। পদদ্বয় কি জানি কেন অসাড় হইয়া আসিতে থাকে। ধীরে ধীরে তাঁহার ক্রোধ পরিণত হয় বিস্ময়ে।

ভূমিতলে অসহায়ভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় করুণাময় প্রভু নিকটে আসিয়া জানাইলেন স্নেহ-আহ্বান।

ঠাকুরের চোখে মুখে কৌতুকোজ্জ্বল হাসি। স্নিগ্ধ স্বরে মন্তব্য

করিলেন, "কিরে, গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারলি? তবেই এবার বুঝে নে।"

রাখাল বুঝিলেন, ঠাকুরের শক্তি ও কৃপার এই গণ্ডীকে ভেদ করিয়া দূরে যাইবার শক্তি তাঁহার নাই। পরম কারুণিক সদ্‌গুরু তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। আর তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পরিধির ভিতরে রাখালকে থাকিতে হইবে, করিতে হইবে আত্মসমর্পণ। আর এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই মিলিবে পরম কাম্য ধন।

আর একবারের কথা। কি এক কারণে ঠাকুর রাখালকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। ফলে রাখালের অভিমান উদগ্র হইয়া উঠে, ক্রোধভরে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

কৃপালু প্রভু অতঃপর নিজেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রাখালের সঙ্গে আসিয়া দেখা করিলেন। এইদিন যে কথা কয়টি বলিলেন, তাহা তাঁহার মতো শক্তিধর অধ্যাত্ম-শিল্পীরই উপযুক্ত।

রাখালকে বলিলেন, "ওরে এখানকার কিন্তু শ্রাবণ মাসের জল নয়। জানিস্ তো, শ্রাবণ মাসের জল হুড়হুড় করে আসে আর বেরিয়ে যায়। এখানে পাতালফোঁড়া শিব। বসানো শিব নয়। তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে এলি, আমি মাকে বল্লুম—'মা, এতে ওর অপরাধ নিসনি, ও যে নিতান্ত বালক।"

রাখাল অতঃপর তাঁহার স্বস্থান অর্থাৎ ঠাকুরেরই চরণ প্রান্তে ফিরিয়া আসিলেন।

অল্প কিছুকাল পরেই রাখালের সাধনজীবনে জাগ্রত হয় এক অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-অনুভূতি। সেদিন তিনি ঠাকুরের পদসেবায় নিরত আছেন, হঠাৎ এক দিব্য জ্যোতির ছটায় সারা দেহ মন তাঁহার উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তারপর সর্ব্বসত্তা প্লাবিত করিয়া নামিয়া আসে ভাবাবেশের জোয়ার। ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান হয় তিরোহিত। সম্বিৎ ফিরিয়া পাইবার পর বুঝিলেন, এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি ঠাকুরেরই কৃপা-প্রসাদের ফল। যে বস্তু লাভ করার জন্য সামান্য কিছুদিন আগে তিনি আন্দোলন করিয়াছেন, রোষভরে ঠাকুরের সঙ্গে

বাতবিতণ্ডা করিয়াছেন, এ যে তাহাই। এই দিনকার অভিজ্ঞতাটি উত্তর জীবনে তাঁহার স্মৃতিতে চিরজাগরূক ছিল।

রাখালের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের প্রায় ছয় মাস পরে নরেনের সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। প্রিয়বন্ধু নরেনের প্রতি ঠাকুরের রহিয়াছে অপার স্নেহ, দুর্ব্বার আকর্ষণ। নরেনও ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসেন, হৃদয়ের জ্বালা জুড়ান। উভয়ের এই ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া রাখালের আনন্দের অবধি নাই।

সেদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ মন্দিরের বিভিন্ন বিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম করিতেছেন। রাখাল তাঁহার সঙ্গে, তিনিও ভক্তিভরে হইতেছেন প্রণত। নরেন তখনো তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের মনোভাব ও ধরণধারণ বর্জ্জন করেন নাই। রাখালের এই ভক্তি গদ্‌গদ ভাব, এই দৈন্যময় প্রণাম নিবেদন তাঁহার মোটেই ভাল লাগিল না। ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।

রাখাল নরেনেরই সঙ্গে একত্রে ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকার পত্রে সহি করিয়াছেন, তারপর আর দেবদেবী বিগ্রহকে প্রণাম করার তাঁহার অধিকার কই? সত্যসন্ধ তেজস্বী নরেনের মনে হইল, এতো সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। রাখালকে ডাকিয়া নিয়া কঠোর ভাষায় তিনি তিরস্কার করিলেন।

রাখাল স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, নরেনের এ আক্রমণের সম্মুখে বড় জড়সড়ো হইয়া পড়িয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার সাহায্যে আগাইয়া আসিলেন। নরেনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ওরে, সকলেরই প্রথমটায় নিরাকার বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া, রাখালের সাকারে বিশ্বাস হয়েছে—নিজের বিশ্বাস অনুযায়ীই তো ও চলবে। ওর যে সাকারেরই ঘর।"

ঠাকুরের এই বিশ্বাসদৃপ্ত কথায় নরেনকে নিরস্ত হইতে দেখা যায়। নূতন জামাই—তাই শ্বশুরবাড়ী হইতে রাখালের মাঝে মাঝে

নিমন্ত্রণ আসে। কিন্তু সংসারের আকর্ষণ তাঁহার শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাই নূতন দাম্পত্যজীবন আস্বাদনের জন্যও আর যেন উৎসাহ পান না। সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানও তাঁহার কাছে আজকাল বিরক্তিকর।

অন্তর্যামী ঠাকুরের কিন্তু হিসাবে ভুল নাই। দিব্য দৃষ্টি সহায়ে বুঝিতে পারেন, রাখালের অবচেতন মনে সূক্ষ্ম ভোগেচ্ছা কিছু কিছু রহিয়াই গিয়াছে, এগুলি ক্রমে ক্রমে উৎসাদিত করিতে হইবে। এ সম্পর্কে তিনি উত্তরকালে বলিতেন, "রাখাল যে আমার উপর সব নির্ভর করেছিল বাড়ী-ঘর ছেড়ে। তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতুম—একটু ভোগ বাকী ছিল কিনা।"

রাখাল মাঝে মাঝে নিজের গৃহে চলিয়া যান, দুই চারদিন অবস্থান করিয়া আবার ফিরিয়া আসেন দক্ষিণেশ্বরে। আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবেরা তর্ক করেন, "রাখাল, তুমি সাধনভজনে মেতেছো, মুক্তির জন্য অভিলাষী হয়েছো, তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোমার স্ত্রীর তাতে কি? সে বেচারা অসহায়া, কোন দোষই তো সে করে নি। তাকে ত্যাগ করলে কোন্ ধর্ম্ম লাভ হবে, বল তো?"

পত্নীর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া মাঝে মাঝে রাখালের দুশ্চিন্তা হয়। একদিন তো সরল মনে ঠাকুরকেই বলিয়া বসিলেন, "তাই তো, আমার স্ত্রীর কি উপায় হবে? তার দুর্দ্দশার জন্য শেষটায় কি আমিই দায়ী হবো? পাপের ভাগী হবো?"

ঠাকুর যেন কথাটি কানেই নেন না, নীরব নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া থাকেন। পলকহীন নয়ন দুটিতে বিরাজিত পরম নির্লিপ্তি। রাখাল বড় বিস্মিত হইয়া যান। নিজ জীবনের জটিল প্রশ্নটি তিনি ঠাকুরের কাছে উত্থাপন করিয়াছেন, সিদ্ধান্তের জন্য একান্ত মনে নির্ভর করিতেছেন তাঁহারই উপর। অথচ এদিকে ঠাকুরের মনোযোগ দিবার অবসরই যেন নাই। এ বড় রহস্যময়।

কয়েকদিন পরেই কিন্তু রাখাল তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হন, এই উত্তর আসে ঠাকুরের কৃপায় এক অদ্ভুত অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার

মধ্য দিয়া। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে বসিয়া রাখাল ধ্যান করিতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন, শয্যাপরি উপবিষ্ট ঠাকুরের মূর্ত্তিখানি দিব্য আলোক-ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণপরেই দেখা গেল আর এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। জগজ্জননী মহামায়া সেখানে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন তারপর ধীরে ধীরে দেবীর ঐ মূর্ত্তি রামকৃষ্ণের অঙ্গে মিশিয়া গেল।

সেদিনকার এই দিব্যদর্শন রাখালের সর্ব্বসত্তায় এক প্রচণ্ড নাড়া দিয়া গেল। রামকৃষ্ণের স্বরূপ ও মাহাত্ম্যের কিছুটা তিনি উপলব্ধি করিলেন। সদ্‌গুরুর উপর আসিল মনের দৃঢ়তর বিশ্বাস। পরমাশ্রয়রূপে একান্তভাবে তাঁহাকে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক জীবনের উপর আসিল প্রবল বিতৃষ্ণা। স্ত্রীর প্রতি যেটুকু মোহ অবশিষ্ট ছিল, সেদিনকার অতীন্দ্রিয় দর্শনের পর সেটুকুও যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

ঠাকুর প্রায়ই উচ্চ ভাবভূমিতে আরূঢ় থাকেন, আপনভোলা মহা-পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রেরও কিছু ঠিক থাকে না, অনেক সময় দিগম্বর হইয়াই বসিয়া থাকেন। কিন্তু যত ভাবতন্ময়ই থাকুন না কেন, রাখাল প্রভৃতি তরুণ শিষ্যদের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনে একটুও তাঁহার ভুল ক্রটি হয় না। বিশেষ করিয়া সদাসঙ্গী রাখালের উপর নিবদ্ধ থাকে তাঁহার সদা জাগ্রত দৃষ্টি। প্রতিদিনকার ধ্যান-জপের প্রেরণা ও নির্দ্দেশ দানের সঙ্গে ঠাকুরের নিজের সেবার কাজ ও গৃহকাজের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি রাখালকে দিয়া করানো হয়। সব কিছু যাহাতে নিখুঁত হয় সেজন্য ঠাকুরের সতর্কতার অবধি নাই। আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক এই উভয় জীবনের সতর্ক নিয়ন্ত্রণের ফলেই উত্তরকালে রাখাল মহারাজ রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের নেতৃত্ব এবং দুরূহ দায়িত্বের ভার অনায়াসে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন। সিদ্ধকাম সাধকের জীবনে দেখা যায় জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমাহার।

মানসপুত্র রাখালের উপর ঠাকুরের প্রহরা ছিল অতন্দ্র, নিরবচ্ছিন্ন। সেদিন রাখালকে চিন্তিত দেখিয়া নিকটে ডাকিলেন,

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "তোর মুখ অমন দেখাচ্ছে কেন রে ? কি যেন একটা গুরুতর অন্যায় করেছিস। ঠিক করে বলতো।"

রাখাল বড় থতমত খাইয়া যান। ভাবিয়া পান না, অজ্ঞাতসারে কোন্ অপকর্ম্ম তিনি করিয়াছেন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ঠাকুর আবার কহিলেন, "ভাল করে ভেবে ত্যাখ্ তো, কোন মিথ্যে কথা বলেছিস কিনা।"

এবার রাখালের মনে পড়িল, সত্যিই তো, সেই দিনই রহস্যছলে এক বন্ধুর কাছে তিনি একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। ভক্তবৎসল রামকৃষ্ণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই তথ্যটি এড়ায় নাই। সাধকের পক্ষে ঠাট্টা-বিদ্রূপের ছলেও যে অসত্য বলা অন্যায়, এ তত্ত্বটি চিরতরে তাঁহার অন্তরে গ্রথিত হইয়া যায়।

উত্তরকালে সত্যসন্ধ আপ্তকাম সাধক রাখাল মহারাজ বলিতেন "যে মিথ্যা কথা বলে বা মিথ্যাচার করে, তার জপতপ সাধন সবই বৃথা। সত্যের প্রতি ঠাকুর আমাদের এমন ধারণা করে দিয়েছেন যে, আমরা বুঝেছি—অন্য অপরাধের বরং ক্ষমা আছে কিন্তু মিথ্যা-বাদীর বা মিথ্যাচারীর পাপ থেকে নিষ্কৃতি নেই।"

সেবার ব্রাহ্মদের এক উৎসবে ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে কয়েকটি ঘনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্য। উৎসব অনুষ্ঠানের শেষে ধনী গৃহস্বামী তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী বন্ধুদের নিয়া মহাব্যস্ত, ঠাকুর বা তাঁহার সঙ্গীদের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসরই তাঁহার নাই।

অন্তরঙ্গ ভক্তগণসহ ঠাকুর এক কোণে দাঁড়াইয়া আছেন, মাঝে মাঝে বালকের মতো প্রশ্ন করিতেছেন, "কই রে, কেউ যে আমাদের ডাকছে না রে।"

রাখাল এতক্ষণ নীরবে গৃহস্বামীর এই অবহেলা সহ্য করিতে-ছিলেন। এবার ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন। কহিলেন, "চলুন মশাই! আমরা এক্ষুনি চলে যাই। এ অভদ্র জায়গায় আর থাকা নয়।"

ঠাকুরের কিন্তু নড়িবার মোটেই লক্ষণ দেখা যায় না। উত্তরে বরং অভিমানাহত রাখালকে ভয় দেখাইয়া বলেন, "আরে রোস্। এত ফোঁস ফোঁস করিস্ নে। বলি, গাড়ী ভাড়া তিন টাকা দু আনা কে দেবে? আছে তোর ট্যাঁকে? তাছাড়া, এত রাত্রে তোরা সব খাবিই বা কোথায়?"

রাখাল নিরস্ত হইয়া ভিতরে ভিতরে গর্জ্জিতে থাকেন। অবশেষে গভীর রাতে একটি অপরিচ্ছন্ন কোণে বসিয়া সবাই ভোজন সমাধা করিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পথে কিন্তু রাখালের মনশ্চক্ষু হইতে একটি পর্দ্দা অকস্মাৎ সরিয়া গেল। নিমন্ত্রণকারী গৃহস্বামীর উপেক্ষার মধ্য দিয়া ঠাকুরের কি অপরূপ ক্ষমাসুন্দর রূপই না আজ ফুটিয়া উঠিল। এই সঙ্গে রাখাল ধন্য হইলেন নিরভিমানতা ও সরলতার মূর্ত্ত বিগ্রহ-রূপে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া।

রাখালের মনোভাব ঠাকুরের কাছে অজ্ঞাত রহে নাই। তরুণ শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিতে লাগিলেন, "ছাখ্, গৃহস্থেরা অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞানতার জন্য সাধুর সঙ্গে ঠিকমতো আচরণ করতে পারে না, প্রকৃত মর্য্যাদা দিতে ভুলে যায়। কিন্তু সাধুর উচিত তাদের নিতান্ত অবোধ বলে ভাবা, দোষ না দেখে তাদের কল্যাণ কামনা করা। আমরা আজ ও-বাড়ী থেকে না খেয়ে চলে এলে, গৃহস্থের যে অমঙ্গল হতো রে।"

নীরব বিস্ময়ে রাখাল ঠাকুরের করুণাঘন মূর্ত্তির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন।

অন্তরঙ্গ ভক্ত সাধকের কাহারো কাহারো নানা দিব্য অনুভূতি ও দর্শনাদি হইতেছে। রাখালের অন্তরে এজন্য মাঝে মাঝে ক্ষোভ জাগিয়া উঠে। এত সাধন-ভজন করিতেছেন, কিন্তু কই, ঠাকুরের কৃপা ও দাক্ষিণ্যের পরিচয় তো তিনি তেমন পাইতেছেন না।

ঠিক এই সময়ে ঘটিল এক দিব্য দর্শন। ভবতারিণীর মন্দিরের এক কোণে বসিয়া রাখাল সেদিন জপ করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন, সারা কক্ষটি এক অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, এই জ্যোতির প্রবাহ ক্রমে আরো তীব্র হইয়া উঠে, তারপর অগ্রসর হয় জপনিরত রাখালের দিকে।

একি অদ্ভুত দৃশ্য! রাখাল কি জানি কেন ভয় পাইয়া গেলেন। ছুটিয়া গিয়া আশ্রয় নিলেন ঠাকুরের কক্ষে। বিস্মিত ও বিমূঢ় হইয়া অনেকক্ষণ সেখানে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন।

ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিলেন। তারপর হাসিয়া কহিলেন, "কিরে, তুই না ক্ষোভ করিস দর্শন-টর্শন তেমন কিছু হচ্ছে না। আবার তা যখন হয়, ভয়ে পালিয়ে আসিস্। তা হলে কি করবি, বল্?"

রাখাল বুঝিলেন, ভ্রান্ত বুদ্ধিবশতঃ নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি বড় বেশী ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠাকুর সদ্‌গুরু, অন্তর্য্যামী, তাঁহার কাছে তিনি চিরতরে আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন। কাজেই সকল দায়িত্বভার যে তাঁহারই। এ কথাটি বিস্মৃত হওয়া তো রাখালের পক্ষে শোভন হয় নাই।

অপর একদিনের কথা। রাখাল মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে বসিয়া একাত্মমনে জপ করিতেছেন। ধীরে ধীরে সারা সত্তায় নামিয়া আসিল ধ্যানের স্রোত, তরুণ সাধক তাহার গভীরে সত্তায় নিমজ্জিত হইয়া গেলেন।

এমন সময় সেখানে ঘটিল রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। ভাবতন্ময় অবস্থায় টলিতে টলিতে উপস্থিত হইলেন রাখালের সম্মুখে। দৃপ্তস্বরে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "ওরে, এই যে তোর মন্ত্র। আর এই ত্থাখ্ তোর ইষ্ট।"

ঠাকুর, এ কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে রাখালের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল জ্যোতির্ম্ময় ইষ্টমূর্ত্তি।

ঠাকুর যেন অধ্যাত্ম-রাজ্যের মহান্ ঐন্দ্রজালিক, প্রতীক্ষিত লগ্ন

উপস্থিত হওয়া মাত্র কোথা হইতে হঠাৎ আবির্ভূত হইলেন, শিষ্যের জীবনে ঢালিয়া দিলেন কৃপার প্রসাদ।

সেদিনকার এই অতীন্দ্রিয় দর্শন রাখালের সারা দেহে মনে জাগাইয়া তোলে অপূর্ব্ব আনন্দ শিহরণ। ভাববিহ্বল হইয়া ঠাকুরের চরণতলে তিনি পতিত হন।

রাখালের সাধন পথের বাঁকে বাঁকে আসে নানা বাধা বিঘ্ন। তরুণ হৃদয় এক এক সময়ে অশান্ত, বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। মনে উঠে চিন্তার তরঙ্গ, ঠাকুরের পরমাশ্রয়ে তিনি বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু যে পরম প্রাপ্তির জন্য মন এত আকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহা এখনো রহিয়াছে সুদূরপরাহত। মাঝে মাঝে অতীন্দ্রিয় দর্শন ও উচ্চতর উপলব্ধি কিছু কিছু হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা তো স্থায়ী হইতেছে না।

সেদিন জপ করিতে বসিয়া মনে বড় অনুশোচনা জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আসিল আত্মধিক্কার। ভাবিলেন, নাঃ আর এমন করিয়া এখানে পড়িয়া থাকা নয়। যেদিকে দুই চোখ যায় সেদিকে বাহির হইয়া পড়িবেন।

ভক্তের অন্তরের এই আলোড়ন অমনি উচ্চকিত করে অন্তর্য্যামী শ্রীরামকৃষ্ণকে। দ্রুত পায়ে চটি ঠক ঠক করিয়া তখনি রাখালের কাছে আসিয়া তিনি উপস্থিত। তরুণ ভক্তকে আশ্বাস দেন, "ভয় কিরে? আমি তো আছি। আচ্ছা হাঁ করে জিবটা বার কর দেখি।

আদেশ পালনে রাখালের বিলম্ব হয় না। ঠাকুরও তখনি আপনমনে অস্ফুট স্বরে কি এক মন্ত্র উচ্চারণ করেন, নিজের আঙ্গুল দিয়া রাখালের জিহ্বাতে অঙ্কিত করিয়া দেন তিনটি সাঙ্কেতিক রেখা।

তরুণ সাধকের অন্তরের সর্ব্ব কিছু চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ মুহূর্ত্তের মধ্যে শান্ত হইয়া যায়, দিব্য আনন্দের পাথারে এবার তিনি ভাসিতে থাকেন।

প্রয়োজন মতো এমনি করিয়া শক্তিধর রামকৃষ্ণ মানসপুত্র রাখালের সাধনপথের বাঁকে বাঁকে দর্শন দেন, উচ্চারণ করেন অজস্র

অভয়বাণী। সাধনের প্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগাইয়া তোলেন অবিরাম ধারায়, শিষ্যের জীবনকে গড়িয়া তুলিতে থাকেন এক সার্থক অধ্যাত্ম-সৃষ্টিরূপে।

সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া সাধন-ভজন করার ফলে রাখালের সাধনজীবনে আসে পরম প্রশান্তি, দেখা দেয় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমাহার। নিরন্তর সাহচর্য্য ও উপদেশাদি দিয়া ঠাকুর প্রিয় ভক্তের সাধনজীবনকেও ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে থাকেন। এ সময়ে ধ্যানজপের উচ্চতর প্রণালী শিক্ষা দিবার সঙ্গে ঠাকুর তাঁহাকে আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামের যৌগিক প্রক্রিয়াও কিছু কিছু দিয়াছিলেন।

সেদিন ভবতারিণীর মন্দিরে ঠাকুর অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাখাল অদূরে বসিয়া জপধ্যানে নিরত। ঠাকুর হঠাৎ তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন। এক গৃহস্থ ভক্ত খানিক আগে ষোড়শোপচারে কারণবারি সহ দেবীর ভোগ দিয়া গিয়াছে। নিবেদিত পাত্র হইতে কারণবারি আঙ্গুলে তুলিয়া রাখালের ভ্রূ-যুগলের মধ্যে ঠাকুর একটি ফোঁটা দিয়া দিলেন। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন নিগূঢ় মন্ত্র। দেবী ভবতারিণীর সম্মুখে অনুষ্ঠিত সেদিনকার ঐ ক্রিয়ার পর রাখালের জীবনে উন্মোচিত হইতে থাকে সাধনার এক একটি নূতন স্তর। বলা বাহুল্য এই তরুণ শিষ্যের প্রত্যেকটি অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার উপরেই সতত নিবদ্ধ থাকিত শক্তিধর সদ্‌গুরুর সদা-জাগ্রত দৃষ্টি।

এসময়কার সাধনকালে, নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই রাখাল একটি বিশেষ শক্তির অধিকারী হইয়া উঠেন। দিব্যদৃষ্টি সহায়ে প্রত্যেক মানুষের অন্তস্তল তিনি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেন। ঠাকুরের দর্শনাভিলাষী হইয়া এ সময়ে নানা শ্রেণীর লোক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইত। নব অলৌকিক শক্তির অধিকারী রাখাল ভাবিতেন, যে কেহ আসিয়া উপস্থিত হইলেই ঠাকুরের কাছে তাঁহাকে টানিয়া নেওয়া কেন? বরং কে কেমন স্তরের লোক আগে হইতে তাহা সঠিকভাবে

নির্ণয় করিয়া নেওয়া ভাল। নবলব্ধ অলৌকিক দৃষ্টি বলে তিনি সকলেরই মনের অভ্যন্তরভাগ আগে হইতে খানিকটা দেখিয়া নিতেন। তারপর যে কটি দর্শনার্থীকে তাঁহার মনে হইত শুদ্ধসত্ত্ব, বাছিয়া বাছিয়া তাহাদেরই উপস্থিত করিতেন ঠাকুরের কক্ষে।

শিষ্যদের আচার-আচরণ সম্পর্কে ঠাকুর অতিমাত্রায় সজাগ। রাখালের এই কাণ্ড তাঁহার চোখ এড়ায় নাই। সেদিন তাঁহাকে ডাকিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিরস্কার করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "আচ্ছা, তোর এসব কি হীনবুদ্ধি বল্ তো? কোথায় মায়ের চরণে শুদ্ধাভক্তি নিয়ে পড়ে থাকবি, তা না—কেবলই অষ্টসিদ্ধির দিকে মন দিচ্ছিস্। বিভূতির দিকে নজর দিলে কি কখনো ঈশ্বর লাভ হয় রে? ছিঃ ছিঃ ওদিকে মন রাখিস্‌নে—ওসব একেবারে ঝেড়ে ফেলে দে।"

রাখাল লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলেন, অন্তর্য্যামী ঠাকুরের অমোঘ দৃষ্টি সদা নিবদ্ধ রহিয়াছে নগণ্যতম ভক্ত-সাধকের প্রতিটি আচার-আচরণের দিকে। আজ তাই কৃপা করিয়া তরুণ সাধক রাখালের বিভূতি প্রয়োগের ইচ্ছাটিকে অঙ্কুরে এমনভাবে বিনষ্ট করিয়া দিলেন। এই দিনের তিরস্কারের পর হইতে রাখালের কাছে অতীন্দ্রিয় দর্শন ও সিদ্ধাই ইত্যাদি একেবারে তুচ্ছ হইয়া গেল। মনকে তিনি কেন্দ্রীভূত করিলেন ইষ্টের পাদপদ্মের দিকে।

রামকৃষ্ণের কক্ষে ধ্যান করিতে বসিলেই রাখাল স্বল্পকাল মধ্যে অন্তর্মুখীন হইয়া যান, তলাইয়া যান চৈতন্যময় সত্তার অতল গভীরে। এভাবে ধ্যানাবস্থায় রাখালকে দেখিলেই ঠাকুরের হৃদয়ে জাগে দিব্য উদ্দীপনা। এক একদিন ভাবপ্রমত্ত হইয়া অস্ফুটস্বরে রাখালকে কহিতে থাকেন, "আমি তো সেখান থেকে এসেছি অনেক দিন। হ্যাঁরে, তুই কবে এলি? বল্ দেখি, কবে এলি?"

অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবকেরা অবাক বিস্ময়ে ভাবিতে থাকেন, রাখালের সৌভাগ্যের অন্ত নাই। জন্মান্তরের পুরানো সম্পর্কের ধারাটি বাহিয়াই তাঁহার জীবনতরী আজ ঠাকুরের চরণতলে আসিয়া

ঠেকিয়াছে। প্রিয় পার্ষদের এই নিত্য সম্বন্ধের গূঢ় ইঙ্গিতটিই যে ভাবমত্ত সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হইতে হঠাৎ আজ প্রকাশিত হইল।

ইতিমধ্যে ঠাকুরকে ঘিরিয়া দক্ষিণেশ্বরে জড়ো হইয়াছে চিহ্নিত শিষ্যগোষ্ঠী। দিব্য স্পর্শ, সান্নিধ্য ও সাধননির্দ্দেশ দিয়া ঠাকুর ইহাদের জীবনে প্রজ্বলিত করিয়াছেন অধ্যাত্ম চেতনার আলো। তাই বুঝি এবার লীলামঞ্চ হইতে নিজেকে অপসৃত করিয়া নিতে চান। এ উদ্দেশ্যে নিজ দেহে সৃষ্টি করিয়াছেন মারাত্মক ক্যান্সার রোগ। আর তাঁহার শুশ্রূষাকে উপলক্ষ করিয়া শিষ্যেরা হইতেছে দিনের পর দিন ঘনিষ্ঠতর, গুরুগতপ্রাণ। সবার অলক্ষ্যে গুরুভাইদের মধ্যেও গড়িয়া উঠিতেছে এক দৃঢ় আত্মিক বন্ধন। ঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে রাখালও নিবিড়ভাবে যুক্ত হইলেন তাঁহার সঙ্গে, অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িলেন তাঁহার প্রত্যেকটি পরিকরের সঙ্গে।

রাখাল প্রায়ই মনে মনে পীড়া বোধ করেন—ঠাকুরের দেহ সিদ্ধ দেহ, তাহাতে কেন এই মারাত্মক রোগের আক্রমণ? সাধন বলে অপরিমেয় শক্তি বিভূতি অর্জ্জনে তবে কি তিনি সমর্থ হয় নাই? জগজ্জননীর সাধনায়ই বা কতটা তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন? কি তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ? জিজ্ঞাসু তরুণ সাধকের মনে বার বার এই সব প্রশ্ন আসিয়া ভীড় করে।

শ্যামপুকুরে ঠাকুর রোগশয্যায় থাকা কালে এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হয় যাহার ফলে রাখালের মনের সংশয় ঘুচিয়া যায়, ঠাকুরের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তিনি কৃতার্থ হন।

সেদিন শ্যামাপূজা। অন্তরঙ্গ ভক্ত-শিষ্যেরা সকাল হইতেই পূজার আয়োজনে রত। ঠাকুর স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের পূজা সম্পন্ন করিবেন। পূজার লগ্ন উপস্থিত হইলে ভক্তদের মনে জাগিয়া উঠে এক আকস্মিক ভাবের জোয়ার। আদ্যাশক্তি মহাকালী জ্ঞানে সবাই তখন সমস্বরে ঠাকুরের জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। শুরু হয় তাঁহারই অর্চ্চনা। সচন্দন

রক্তজবা ঠাকুরের চরণে অঞ্জলি দিয়া ভক্তেরা আনন্দে মাতোয়ার হইয়া উঠেন।

সকলের সাথে রাখালও সেদিন যোগ দেন ঠাকুরের এই অভিনব অর্চ্চনায়। হৃদয় তাঁহার দিব্য আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। বার বার ভাবিতে থাকেন, শ্যামাপূজার এই আয়োজনে ঠাকুর নিজেই আজ কত উৎসাহ দিয়াছেন। অতঃপর একি কাণ্ড! লগ্ন উপস্থিত হইতে দেখা গেল, নিজেই নিজের পূজা তিনি অঙ্গীকার করিলেন, আর দিব্য আবেশে হইলেন অভিভূত।[১]

রাখাল বিশ্বাস করিলেন, এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তদের ঠাকুর বুঝাইয়া দিলেন, মহাকালী আর মহাকালীর বরপুত্র রামকৃষ্ণের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। ভক্তদের পূজার অঞ্জলি পরম লক্ষ্যে গিয়াই পৌঁছিয়াছে।

সেদিন হইতে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রাখালের চেতনায় জাগিয়া উঠে নূতনতর এক উপলব্ধি। সদ্‌গুরুর সর্ব্বব্যাপী মহিমার আলো নূতন করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাঁহার হৃদয়াকাশে।

সে-বার ঠাকুরের বর্ষীয়ান ভক্ত বুড়ো গোপাল (উত্তরকালের অদ্বৈতানন্দ) উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করিয়া কাশীপুরে ঠাকুরের সকাশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তীর্থদর্শনের পর সাধু সেবা করাইতে হয় বুড়ো গোপালের অভিলাষ—একদল ভাল সাধুকে ডাকিয়া আনিয়া পরিতোষ সহকারে ভোজন করান।

শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "ওরে কোথায় আর সাধু খুঁজতে যাবি! এখানেই সব রয়েছে—এই ছোকরাদের খাওয়ালেই তোর কাজ হবে।"

বুড়ো গোপাল তখনি সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজী হন। ঠাকুর তাঁহাকে দিয়া কতকগুলি গেরুয়া বসন ও মালা-চন্দন আনাইয়া নেন। নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ত্যাগী তরুণ ভক্তেরা সবাই সেখানে উপস্থিত

১ লীলাপ্রসঙ্গ—সারদানন্দ

ঠাকুর একে একে তাঁহাদের কাছে ডাকিলেন, প্রত্যেককে দান করিলেন একটি করিয়া গৈরিক বস্ত্র ও মালাচন্দন। সহজ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য বড় গভীর। সেদিন ইহারই মধ্য দিয়া রামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসী সঙ্ঘের বীজ ঠাকুর তাঁহার নিজ হস্তে রোপন করিলেন।

বৈরাগ্য ও শুদ্ধাভক্তির সহিত ভাগবত প্রেমের অমৃতধারা ঠাকুর এই ভক্তদের জীবনকুম্ভে ঢালিয়া দেন। এই কৃপাপ্রসাদ উত্তরকালে তাঁহার চিহ্নিত সন্ন্যাসী পার্ষদদের সাধনজীবনকে রসসমৃদ্ধ করিয়া তোলে, মানবীয় প্রেম ও ভাগবত প্রেমের অপূর্ব্ব সমাহার সম্ভব হয় তাঁহাদের জীবনে। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, এই রামকৃষ্ণ শিষ্যদের কেহই শুষ্ক সন্ন্যাসীতে পরিণত হন নাই।

রামকৃষ্ণ প্রায়ই শিষ্যদের বলিতেন, "শুক্‌নো সাধু হবি কেন শুধুশুধু? তোরা জেনে রাখ্‌বি, এখানকার ভাব হচ্ছে রসে-বসে।" রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সাধকদের মধ্যে যে কয়জনের জীবনে সাধনরসের এই সমন্বয় দেখা গিয়াছে, রাখাল মহারাজ তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। সুখে দুঃখে মঠ মিশনের কর্ম্মের ভীড়ে বা ভাগবত-প্রসঙ্গে সদাই দেখা যাইত তাঁহার প্রশান্ত, প্রসন্নমধুর মূর্ত্তি।

এই সময়ে ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে তীর্থ পর্য্যটনের ঝোঁক প্রবল হইয়া উঠে। কেহ যাইতেছেন বুদ্ধগয়াতে, কেহ ছুটিতেছেন পুরী, বারাণসীতে। রাখাল কিন্তু ঠাকুরের সান্নিধ্য ছাড়িয়া কোথাও যাইতে রাজী নন, অটল হইয়া ঠাকুরেরই পদপ্রান্তে বসিয়া আছেন, অবিচল নিষ্ঠায় করিতেছেন তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা। কাশীপুরের বাগানে এ সময়ে তরুণ সাধক রাখালের যে মহিমোন্নত চরিত্র ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাই, উত্তরকালে রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের নায়করূপে দেখা যায় তাঁহারই পরিণত অভিব্যক্তি।

ঠাকুরের রুগ্নাবস্থায় নরেন একদিন অকস্মাৎ গয়াধামে চলিয়া যান। উদ্দেশ্য, সেখানে থাকিয়া কয়েকদিন তপস্যায় অতিবাহিত করিবেন। নরেনের অনুপস্থিতিতে ঠাকুরের সেবার অসুবিধা হইবে বলিয়া রাখাল কিন্তু বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এ দুর্ভাবনার কথা অন্তর্যামী রামকৃষ্ণের অগোচর রহিল না। রোগশয্যায় বসিয়া স্মিতহাস্যে সেদিন রাখালকে কহিলেন, "কেন তুই মিছে ভেবে মরছিস্? কোথায় যাবে সে? কদিন বাইরে থাকতে পারবে? ছাখ্ না এল বলে। চার খুঁট ঘুরে আয়, দেখবি কোথাও কিচ্ছু নেই।"

খানিক বাদে নিজের বক্ষ স্পর্শ করিয়া ঠাকুর কহিলেন, "মনে রাখ্‌বি, যা কিছু আছে সব এইখানে।"

ঠাকুরের শ্রীমুখের এই আশ্বাস-বাণী শ্রবণে রাখাল বিস্ময়ে আনন্দে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুরের কথাই ঠিক হইল। কয়েকদিনের মধ্যে নরেন ও অন্যান্য ভক্তেরা ফিরিয়া আসিলেন, উপবেশন করিলেন ঠাকুরের চরণতলে।

সাধন করিতে করিতে এসময়ে রাখালের অন্তর্দৃষ্টি স্বচ্ছতর হইয়া আসে। উপলব্ধি করেন, প্রভু রামকৃষ্ণ শুধু তাঁহাদের মতো গুটিকয়েক ভক্ত-শিষ্যেরই প্রভু নহেন। জগৎগুরুরূপে তিনি অবতীর্ণ। ঐশী লীলার এক চিহ্নিত পুরুষ তিনি। জগতের কল্যাণে প্রেমভক্তি বিতরণের জন্যই তিনি আসিয়াছেন।

একদিন সঙ্গী ভক্তদের কাছে রাখাল ঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার উপলব্ধির কথা স্পষ্টরূপে বলিয়া ফেলিলেন। দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "উনি নিজে কৃপা করে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'সদ্‌গুরু জগদ্‌গুরু'। তোমরা কি ভেবেছো, উনি কেবল আমাদের ক'জনার জন্যই আবির্ভূত হয়েছেন?"

নরেন একথা শুনিলেন। অসামান্য প্রতিভা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল তাঁহার। তাই যে কোন তত্ত্ব ও তথ্য তাঁহার সম্মুখে আসিত, বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া ছাড়িতেন না। সেদিন রাখালের এই কথাটি সোৎসাহে তিনি সমর্থন করিলেন। পরমশ্রদ্ধায় ঠাকুরের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন শুরু করিলেন।

রাখাল হৃষ্টচিত্তে ঠাকুরকে গিয়া কহিলেন, "আজকাল নরেন আপনাকে খুব বুঝতে শিখছে।"

ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। নরেনকে ডাকিয়া কথা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা বল্‌তো আমার ভেতরে কি ভাব রয়েছে।"

নরেন তৎক্ষণাৎ একথার উত্তর দিলেন, "বীরভাব, সখীভাব—সমস্ত কিছু ভাব।"

রামকৃষ্ণ এবার নিজের বুকটি হাত দিয়া স্পর্শ করিলেন. মৃদুস্বরে কহিলেন, "দেখছি, এর ভেতরে যা কিছু।"

তারপর ইশারায় নরেনকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন, "ওরে, কি বুঝলি বল্‌তো?"

"যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভেতর থেকে।"

হর্ষভরে ঠাকুর রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কহিলেন, "দেখছিস্‌ কেমন বুঝ্‌ছে?"

ঠাকুরের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য সেদিন তাঁহার সহিত কথা প্রসঙ্গে এমনিভাবে রাখালের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, চিরতরে তাঁহার অন্তরে গ্রথিত হইয়া যায়। রোগশয্যায় শায়িত থাকার সময় ঠাকুর প্রায়ই নরেনের সঙ্গে একান্তে বসিয়া নানা নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করিতেন, আশ্রিত ভক্ত-শিষ্যদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে ইঙ্গিত বা নির্দ্দেশাদিও দিতেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন, "জানিস্‌, আমাদের রাখালের কিন্তু রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছে করলে একটা প্রকাণ্ড রাজ্য সে চালাতে পারে।"

ঠাকুরের সামান্য একটি মন্তব্য। কিন্তু ইহার নিহিতার্থ বুঝিয়া নিতে তীক্ষ্ণধী নরেনের একটুও দেরী হইল না। ঠাকুরের অভিপ্রায়, ভক্ত-শিষ্যদের যে সঙ্ঘ পরবর্ত্তীকালে গঠিত হইবে, তাহার নায়ক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন রাখাল। বিনা দ্বিধায় তখনি মনে মনে নরেন ইহা মানিয়া নিলেন।

তারপর সুযোগমতো একদিন গুরুভাইদের কাছে রাখালের গুণগান করিতে করিতে কহিলেন, "রাখালরাজকে আজ থেকে আমরা রাজা বলেই ডাক্‌বো।

ভক্তেরা জানেন, রাখাল ঠাকুর রামকৃষ্ণের মানসপুত্র, পরম

আদরের ধন। কাজেই সবাই তাঁহার এই নূতন নামকরণ সোৎসাহে সমর্থন করিলেন।

ঠাকুরের কানে একথা উঠিল। নরেন এবং অন্যান্য ভক্তদের ডাকিয়া আনন্দ সহকারে তিনি কহিলেন, "বেশ করেছিস্ তোরা। রাখালের রাজা নামই ঠিক বটে।"

ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নায়ক সেদিন এভাবে ঠাকুর ও তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে চিহ্নিত হইয়া রহিলেন।

রামকৃষ্ণ ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছেন। তরুণ শিষ্যেরা প্রাণপণে দিন রাত তাঁহার সেবা করিয়া চলিয়াছেন, এই সময়ে এক পাগলী মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত। নানা অনাচার উপদ্রবও করিত।

শশী মহারাজ একদিন অতিষ্ঠ হইয়া কহিলেন, "পাগলীকে আর আস্করা দেওয়া ঠিক নয়। এবার এলে ধাক্কা মেরে তাড়াতে হবে।"

কৃপালু ঠাকুরের কানে একথা গেল। রাখালকে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "না—না সে আসবে। আর আমায় দেখেই চলে যাবে। ওকে তোরা তাড়াস্ নে।"

ঠাকুরের আদেশ শশী মহারাজকে শুনাইয়া দিয়া রাখাল কহিলেন, "ঠাকুরের ওপর উপদ্রব সবাই করে, আর তিনি তা অসীম করুণায় সহ্য করে যান। সকলেই কি খাঁটি হয়ে ওঁর কাছে এসেছে? ওঁকে আমরা কষ্ট দিই নি? নরেন্দ্র-টরেন্দ্র আগে কি রকম ছিল—কত তর্ক করতো। ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছেন। ধরতে গেলে আমরা কেউই নির্দোষ নই।"

উদারবুদ্ধি রাখালের কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর বার বার সানন্দে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"প্রেমে, আনন্দে, সেবায় এবং নিয়ত সাধনভজনে রাখাল এক অপূর্ব্ব উদার প্রেমদৃষ্টিতে সকলকে নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহার ঈশ্বরলুব্ধ চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও তাঁহার প্রেমমূর্ত্তি দিন

দিন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইতে লাগিল। ঠাকুর রাখাল প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের সম্বন্ধে বলিতেন, 'আমি কে আর ওরা কে, এই জানলেই হল।' কাশীপুর উদ্যানে তাঁহাদের মধ্যে এই তত্ত্বই দিন দিন স্ফুরিত হইয়া উঠিল। দক্ষিণেশ্বরে যাহা বীজাকারে অন্তরঙ্গদের মধ্যে ছিল, কাশীপুর উদ্যানে তাহা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। অলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের লইয়া একটি মহাশক্তির সঙ্ঘ ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। যে প্রেমসূত্রে ইঁহারা পরস্পর আনন্দে আবদ্ধ হইতেছেন—সেই প্রেমসূত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ[১]।"

ভক্তদের প্রাণের ঠাকুর ও পরমাশ্রয় শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগস্ট মহাপ্রয়াণ করিলেন। নরেন রাখাল প্রভৃতি ভক্তরা শোকে হইলেন মুহ্যমান। যাঁহার প্রেরণায় ঐহিক জীবনের সব কিছু তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার চরণতলে বসিয়া আত্মিক সাধনার ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন, তিনি আজ কোন্ অদৃশ্যলোকে চলিয়া গেলেন? ত্যাগ বৈরাগ্যে দীপ্ত তরুণ সাধকদের জীবনে নামিয়া আসিল এক সীমাহীন শূন্যতা।

নরেনের হৃদয়ে এখন একমাত্র চিন্তা, ঠাকুরের ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্তদের কি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, ঠাকুরের আদর্শ কি করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করা যায়।

রামকৃষ্ণ নিজেই বুঝি একদিন সুযোগ মিলাইয়া দিলেন। ভক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র একদিন ঠাকুরঘরে বসিয়া ধ্যান-জপ করিতেছেন। হঠাৎ ছায়া মূর্ত্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। কহিলেন, "তুই করছিস্ কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার আগে একটা ব্যবস্থা কর্।" নির্দ্দেশটি দিয়া তখনই ঠাকুর অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ: জীবন কথা—দেবেন্দ্রনাথ বসু

সুরেশ মিত্র ছুটিয়া আসিয়া সাশ্রুনয়নে নরেনের কাছে এই দর্শনের কথা বর্ণনা করিলেন। কহিলেন, "ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদের জন্য একটা আস্তানার বন্দোবস্ত কর, একত্রে তারা সাধন-ভজন করুক। প্রতি মাসে আমি অর্থ সাহায্য করবো।"

নরেনের আনন্দ আর ধরে না, সোৎসাহে বরানগরের গঙ্গাতীরে একটা জীর্ণ বাগানবাড়ী ভাড়া করিয়া ফেলেন। তারপর রাখাল তারককে সঙ্গে নিয়া সেই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে শুরু করেন বসবাস।

ক্রমে অপর ভক্তেরাও এখানে আসিয়া মিলিত হন এবং তাঁহাদের এখানকার সাধনা ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের মধ্য দিয়া সূত্রপাত হয় মঠ প্রতিষ্ঠার। রামকৃষ্ণের কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী এই ভক্তেরা প্রত্যেকেই এক একটি বিশুদ্ধ আধার। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী মূলে, ভবতারিণীর মন্দিরে ও কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর আপন হস্তে এই সব আধারে মুমুক্ষার আলো জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এবার সে আলো আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

নরেন রাখাল প্রভৃতি ভক্তদের ঈশ্বর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হইয়া উঠিল। ধ্যান-জপ, কীর্ত্তন ও শাস্ত্রব্যাখ্যার জোয়ার বহিয়া চলিল।

রাখালের বাবা আনন্দমোহন মাঝে মাঝে পুত্রের সঙ্গে দেখা করিতে বরানগরে আসিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, রামকৃষ্ণের বিরহে যুবক ভক্তেরা স্বভাবতঃই শোকে অভিভূত হইয়াছে, কিছুদিন পরে এই শোক কমিয়া গেলে যে যাহার বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল অন্যরূপ। ভক্তদের জীবনে ত্যাগ তিতিক্ষা ও তপস্যা যেন আরো তীব্র হইয়া দেখা দিল।

পিতা বার বার কষ্ট করিয়া মঠে আসেন, আর বিষাদখিন্ন হৃদয়ে ফিরিয়া যান। অবশেষে রাখাল একদিন তাঁহাকে নিজের সিদ্ধান্ত অকপটে জানাইয়া দিলেন, "কেন আপনারা কষ্ট করে এখানে আসেন? আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদেব ভুলে যাই।"

দৃঢ়, প্রশান্ত কণ্ঠে যে ভাবে রাখাল এই সঙ্কল্পের কথা কহিলেন তাহাতে পিতা বুঝিয়া নিলেন, আর তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া নেওয়া সম্ভব নয়।

বৈরাগ্যবান্ সাধক রাখাল মায়িক সম্বন্ধ ত্যাগের কথা শুধু মুখেই উচ্চারণ করেন নাই, অন্তরেও ইহা প্রতিফলিত করিতে তিনি সক্ষম হন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী বিশ্বেশ্বরীর দেহান্ত ঘটে, কিন্তু নিরাসক্ত ত্যাগী সাধক রাখাল এজন্য একটুও বিচলিত হন নাই। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক বালক পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শোনার পরও তিনি ছিলেন পরম প্রশান্ত ও নির্ব্বিকার।

১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে বরানগর মঠের ত্যাগী ভক্তদের জীবনে সংযোজিত হয় এক নূতন অধ্যায়। নরেনের নেতৃত্ব ও প্রেরণায় বিরজা হোম সম্পন্ন করিয়া সবাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রাখালের নব নামকরণ হয়—স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

তপস্যা সম্পর্কে অন্তরঙ্গ ভক্তদের রামকৃষ্ণ বলিতেন, "ওরে, আমি ষোল ট্যাং করেছি, তোরা অন্তত এক ট্যাং তো কর্।" মুমুক্ষু ভক্তদের একথা স্মরণ আছে। সবাই এবার নব ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন, কৃচ্ছ্রময় সাধনার পথে দৃঢ়পদে তাঁহারা অগ্রসর হন।

এ সময়ে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় নবীন সন্ন্যাসীদের। ভিক্ষা কোন দিন জুটে, কোনদিন জুটে না। পাড়াপড়শীরা পরমহংসের ফৌজ বলিয়া টিটকারী দেয়, অনেকে নানা কুৎসা ছড়ায় আর গালাগালি দেয়। কিন্তু তপস্বীদের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সদাই সাধন-ভজনে তাঁহারা বিভোর হইয়া আছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরকালে এসময়কার কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "বরানগরে কতদিন গিয়াছে যে খাবার কিছু নেই, ভাত জোটে তো নুন জোটে না। কয়েকদিন হয়তো শুধু নুনভাতই চললো, কিন্তু

কারুর তাতে গ্রাহ্য নেই। জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা ভাসছি। কখন কখন শুধু তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ ও নুনভাত—এই মাসাবধি চলেছে। আহা, সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেতো, মানুষের কথা কি?”

বরানগরের এই দিনগুলির স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরবর্ত্তীকালে একবার রহস্যভরে বলেন, “যখন খাবার শক্তি ছিল তখন তেলাকুচো সিদ্ধ ভাত জোটাই মুশকিল হতো, আর এখন খাবার সামর্থ্য নেই তাই উপাদেয় আহার জুটছে।”

পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে বরানগরের তরুণ সাধুদের মধ্যে তীর্থদর্শন ও নিভৃত তপস্যার প্রেরণা জাগিয়া উঠে। অন্যান্য গুরুভাইদের মতো ব্রহ্মানন্দ মহারাজও কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন পরিব্রাজন ও তীর্থ পরিক্রমায়। উত্তর ও মধ্য ভারতের নানা পবিত্র পীঠে তিনি দিনের পর দিন ঘুরিয়া বেড়ান, কখনো বা গভীর ধ্যান-ভজনে থাকেন বিভোর।

সে-বার ব্রহ্মানন্দ নর্ম্মদা তীরে ওঁকারনাথ তীর্থে আসিয়াছেন। পুণ্যতোয়া নর্ম্মদার সহিত আচার্য্য শঙ্করের নানা স্মৃতি জড়িত, তাই এখানে পৌঁছিয়া ব্রহ্মানন্দ আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে রহিয়াছেন গুরুভাই সুবোধানন্দ, উভয়ে একটি স্থানীয় মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

নর্ম্মদার আকর্ষণ ব্রহ্মানন্দ বহুদিন যাবৎই বোধ করিতেছিলেন। এবার এখানে পৌঁছানোর পর তাঁহার প্রাণমন ভরিয়া উঠিল।

এখানকার আকাশ, বাতাস, পবিত্র নদী-নীর সবই তপস্যার অনুকূল। কত প্রাচীন সাধুরা ঝুপড়ি বাঁধিয়া, গুম্ফা তৈরী করিয়া, নিভৃত সাধনায় বসিয়া আছেন। নদীতীরের এক বৃক্ষস্থলে ব্রহ্মানন্দ সেদিন ধ্যানাসনে বসিয়া পড়িলেন। তারপর এখানে ধ্যানস্থ অবস্থায় একাদিক্রমে ছয় দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, অতীন্দ্রিয় পরম

বোধে সর্ব্বসত্তা রহিল নিমজ্জিত। এই সময়ে গুরুভাই সুবোধানন্দ পরম যত্নে তাঁহার দেহের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

গোদাবরী তীরের দণ্ডকারণ্য অঞ্চল প্রভু রামচন্দ্রের লীলাস্থল। এখানকার পঞ্চবটি ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসীদের অতি প্রিয় তীর্থ। এই তীর্থে আসিয়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এক দুর্লভ অধ্যাত্ম-অনুভূতি লাভ করেন।

সেদিন পম্পা সরোবরের তীরে বসিয়া রাম সীতার পুণ্যস্মৃতির অনুধ্যান করিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল জটা-কম্বল পরিহিত ধনুর্ধারী রামচন্দ্র ও মা জানকীর দিব্য মূর্ত্তি। তরু-লতার পুষ্পাঞ্জলি আর পাখীর সেখানে কূজনে এক স্বর্গীয় আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে।

'জয় সীতারাম, জয় সীতারাম,' বলিয়া ব্রহ্মানন্দ ভাবাবেগে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন, তারপর বাহ্যজ্ঞান হইল তিরোহিত। চেতনা ফিরিয়া আসার পরও দীর্ঘকাল তাঁহার কণ্ঠে রামনামের গুঞ্জরণ চলিতে থাকে। এই সময়ে প্রায়ই ভাবতন্ময় হইয়া তিনি আত্মহারা হইতেন এবং সুবোধানন্দ সতর্কভাবে সদাই তাঁহাকে আগুলিয়া রাখিতেন।

দ্বারকা, গির্ণার, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দ ও সুবোধানন্দ সেবার বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছেন। এখানে আসিবার পর হইতেই মন তাঁহার কঠোর তপস্যার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। দিনের পর দিন ধ্যানাসনে তিনি বসিয়া থাকিতেন, নিমজ্জিত হইতেন অগাধ ভাব-সমুদ্রে। এক কুঠিয়াতে বাস করিয়াও কোন কোন দিন সঙ্গী গুরুভাই সুবোধানন্দের সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত হইত না। সুবোধানন্দ ভিক্ষা করিয়া যে আহার্য্য আনিতেন, প্রাই দেখা যাইত ব্রহ্মানন্দ তাহা স্পর্শ করেন নাই।

এই ধ্যানতন্ময়তা ও কৃচ্ছ্রসাধন দেখিয়া সুবোধানন্দ মনে মনে

ভীত হইয়া উঠিলেন। সত্যিই তো, এভাবে চলিলে শরীর আর কয়দিন টিকিবে? সেদিন গোবিন্দ মন্দিরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত তাঁহার দেখা। কথা প্রসঙ্গে জানাইলেন, ব্রহ্মানন্দ বৃন্দাবনে আসিয়াছেন এবং কঠোর তপস্যা শুরু করিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গোসাঁইজী প্রায়ই যাতায়াত করিতেন, তাই ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। পরদিনই ধ্যানরত ব্রহ্মানন্দের কুটিরে গিয়া তিনি উপস্থিত হন। দুজনে দুজনকে দেখিয়া মহাখুসী, পুরানো দিনের নানা কথার আলোচনা শুরু হইল।

কথাপ্রসঙ্গে গোসাঁইজী কহিলেন, "পরমহংসদেব তো আপনাকে সব রকম সাধন-ভজন, অনুভূতি, দর্শনাদি করিয়ে দিয়েছেন। তবে আপনি এখন কেন আবার কঠোর সাধনা করছেন?"

ব্রহ্মানন্দ প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "তাঁর কৃপায় যে সব অনুভূতি বা দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলো আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছি মাত্র।"

গোসাঁইজী বুঝিলেন, ঐশী প্রেমের দুর্ব্বার আবেগে ব্রহ্মানন্দ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, এখন তাঁহাকে নিরস্ত করা সম্ভব নয়।

এই সময়ে বৃন্দাবনে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ শুরু হইয়াছে। কয়েক দিন পরে ব্রহ্মানন্দও এই রোগে শয্যাশায়ী হন। সংবাদ পাইয়াই গোসাঁইজী তাঁহার কুটিরে ছুটিয়া আসেন। কুটিরে কোন মশারী নাই দেখিয়া তখনি উহা কিনিয়া আনেন এবং নিজ হস্তে রোগীর শয্যায় তাহা টানাইয়া দেন। গোসাঁইজীর প্রদত্ত ঔষধ খাইয়াই ব্রহ্মানন্দ এ সময়ে তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করেন।

কিছুদিন পরে সঙ্গী সুবোধানন্দ উত্তরাখণ্ডে চলিয়া যান এবং ব্রহ্মানন্দ তখন নিভৃতে বসিয়া কঠোরতর তপস্যায় ব্রতী হন। যেদিন ইচ্ছা হয় মাধুকরী করেন বা কোন কুঞ্জে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, কখনো বা উপবাসে দুই একদিন কাটাইয়া দেন, ধ্যান-জপে সময় কোথা দিয়া অতিবাহিত হয় তাহা জানিতে পারেন না।

এ সময়ে একদিন ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি চকিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হয়; তারপর এই মূর্ত্তি প্রসন্ন হাসি হাসিয়া

অদৃশ্য হইয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ প্রথমটায় চমকিয়া উঠেন, তারপর সারা অন্তর বিষাদে ভরিয়া উঠে। তবে তো ঠাকুরের ভক্ত-সেবক বলরাম আর ইহলোকে নাই। কয়েক দিন পরেই সংবাদ আসিল, বলরাম বসু মহাশয় সত্য সত্যই পরলোকে গমন করিয়াছেন। বলরামের ব্রহ্মানন্দের সম্বন্ধ মায়িক নয়, আত্মিক। ঠাকুরের পরমভক্ত ও অন্যতম প্রধান সেবক বলিয়াই বলরামের অন্তর্ধান সেদিন এমন করিয়া বাজিয়াছে।

অতঃপর কনখল, আবু পাহাড়, জ্বালামুখী প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল সাধন-ভজন করিয়া ব্রহ্মানন্দ তাঁহার গুরুভাই তুরীয়ানন্দ সহ আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। এবার তপস্যা শুরু করেন ব্রজমণ্ডলের কুসুম সরোবরে।

তুরীয়ানন্দ পরমপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে কখনো ভিক্ষা করিতে দিতেন না, নিজেই গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। একদিন ভিক্ষায় মিলিল কয়েকটি শুক্‌নো রুটি, একটু গুড় বা ব্যঞ্জনও যোগাড় করা গেল না। ঐ রুটিই কুয়োর জলে ভিজাইয়া তিনি ব্রহ্মানন্দের সম্মুখে ধরিলেন। দুই চোখ তাঁহার অশ্রুসজল হইয়া উঠিল, কম্প্রকণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ, আপনাকে ঠাকুর কত আদর-যত্ন করতেন। ক্ষীর, সর, ননী খাওয়াতেন, আর আমার কি দুর্ভাগ্য, আজ ঠাকুরের এত আদরের রাখালকে আমি খাওয়াচ্ছি শুক্‌নো রুটি।"

বলিতে বলিতে কান্নায় তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। গুরুভাইদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মানন্দ ছিলেন এমনি সমাদর ও শ্রদ্ধার বস্তু।

১৮৯২ সালের প্রথমার্ধ। রামকৃষ্ণ ভক্তদের মঠ এ সময় বরানগর হইতে আলম বাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সেখানকার চিঠি হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এক বিস্ময়কর আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হন। সুদূর আমেরিকায়, চিকাগোর বিশ্ব-ধর্ম্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। এই গৈরিক পরিহিত তরুণ সন্ন্যাসীর মুখে বেদান্তের তত্ত্ব ও ধর্ম্ম সমন্বয়ের উদাত্ত বাণী

শুনিয়া পাশ্চাত্যের মানুষ উচ্চকিত হইয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে। ইউরোপ. আমেরিকায় শুরু হইয়াছে ভারতের ধর্ম্ম সংস্কৃতির নব মূল্যায়ন।

বিবেকানন্দের এই সাফল্য ভারতেও আনিয়া দিয়াছে অভূতপূর্ব্ব উদ্দীপনা, জাতি ও ধর্ম্ম সম্পর্কে নূতনতর গর্ব্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়া উঠিয়াছে। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে দশ দিক হইয়াছে পরিপূরিত।

কলিকাতা হইতে আরো সংবাদ আসিয়াছে, মঠে রামকৃষ্ণের জন্ম দিনের উৎসবে এবার যে আনন্দ উৎসব হয় তাহা অভূতপূর্ব্ব। এবার দক্ষিণেশ্বরে প্রায় বিশ হাজার লোক প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দের হৃদয় তাই আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ঠাকুরের মাহাত্ম্য এবার তবে জগৎবাসী উপলব্ধি করিবে, তাঁহার উদার ধর্ম্মীয় আদর্শ ও সাধনপথ গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিবে।

ইতিমধ্যে ব্রহ্মানন্দ স্বামী একবার লখ্‌নৌতে গিয়া উপস্থিত হন। গুরুভাইদ্বয় তুরীয়ানন্দ ও শিবানন্দের সহিত দীর্ঘদিন পরে তাঁহার মিলন ঘটে, সবাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন।

ব্রহ্মানন্দের সাধন পিপাসা তখনো পূর্ব্ববৎ তীব্র রহিয়া গিয়াছে। মনে সঙ্কল্প করিয়াছেন, ঠাকুরের সহিত অবস্থানের কালে যে দিব্য আনন্দের স্রোতে সদা নিমগ্ন থাকিতেন, সাধনার ফলে সেই প্রেম-মধুর অনুভূতি জাগ্রত না হওয়া অবধি বৃন্দাবন তিনি ত্যাগ করিবেন না। আবার তাই সেই বৃন্দাবনেই ফিরিয়া আসিলেন, শুরু করিলেন কঠোর তপশ্চর্য্যা।

ধ্যান-ভজনের মধ্য দিয়া দিনের পর দিন তাঁহার কাটিয়া যায়। মাধুকরী বা ভিক্ষার জন্য কুটির হইতে এক পা-ও বাহিরে যাইতে মন সরে না। একেবারে অজগর বৃত্তি। ঈশ্বরের কৃপায় যে দিন যে আহার্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই হয় তাঁহার ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি।

একদিন আসনে বসিয়া নিভৃতে একমনে তিনি জপ করিতেছেন। এসময়ে পুণ্যকামী এক শেঠ অযাচিতভাবে একখানি কম্বল তাঁহার গায়ে চড়াইয়া দিয়া চলিয়া যায়। ক্ষণপরেই সেখানে উপস্থিত হয়

এক তস্কর। কোন কিছু না বলিয়া অতি সন্তর্পণে সেই কম্বলটি খুলিয়া নিয়া দ্রুতপদে সে সরিয়া পড়ে। ব্রহ্মানন্দ মৌন হইয়া জপ করিতেছেন। তস্করের কুকর্ম সবই লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু একেবারে রহিলেন নির্ব্বিকার। মনে মনে ভাবিলেন, ইহা মহামায়ার লীলা ছাড়া আর কিছু নয়, এক হাতে দান করিয়া আর এক হাতে তিনিই এটি করিলেন অপসারিত।

রামকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করার পর হইতেই ব্রহ্মানন্দ বিরহ-বেদনায় অধীর হইয়া রহিয়াছেন। হৃদয়ের মধ্যে অহর্নিশি গুমরিয়া উঠিতেছে একটা বিরাট আর্ত্তি ও হাহাকার। এই আর্ত্তি এই হাহাকার কি করিয়া দূর হইবে, দিব্য আনন্দে দেহ-মন-প্রাণ কবে হইবে পরিপ্লাবিত তাহা জানেন শুধু জীবনবিধাতা। নিজ জীবনের নৈরাশ্য ও অব্যক্ত বেদনার অবসান ঘটানোর জন্যই দিনরাত ধ্যান-ভজনের মধ্যে তিনি নিমজ্জিত থাকিতে চাহিতেছেন। বৈরাগ্যময় তপস্যাকে তাই এমনভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন।

বৃন্দাবন ধামে তখন রাসযাত্রার বড় ধুমধাম। ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রহ্মানন্দ লালাবাবুর কুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছেন। সুসজ্জিত রাসমঞ্চে কৃষ্ণ-রাধার বিগ্রহ বিরাজিত। ভক্ত ও সেবকেরা ভাবাবেশে মত্ত হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। দূর হইতে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে ব্রহ্মানন্দ সেদিকে তাকাইয়া আছেন, প্রেমভক্তি-রসের ধারায় হৃদয় হইতেছে অভিসিঞ্চিত।

হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, মঞ্চের সম্মুখে উপবিষ্ট প্রধান বাবাজীটি ইশারা দিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন।

কাছে যাইতেই বাবাজী তাঁহাকে পরমযত্নে নিজের পাশে বসাইয়া দিলেন। ব্রহ্মানন্দ তখন কীর্ত্তনের আনন্দে আত্মহারা, অন্যদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর তাঁহার নাই। এক একবার ভাব-তন্ময়তার ফলে বাহ্য চেতনা লোপ পাইবার মতো হইতেছে।

রাস উৎসবের ভক্তদের এত হৈ-চৈ ও নর্ত্তন-কীর্ত্তনের মধ্যেও বাবাজী কিছু প্রশান্ত মনে তাঁহার জপে নিরত রহিয়াছেন। শুধু

তাহাই নয়, অপরিচিত তরুণ সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দের দিকেও তাঁহার সস্নেহ দৃষ্টি রহিয়াছে নিবদ্ধ। যতবারই ব্রহ্মানন্দের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়, ততবারই বাবাজী নিজের জপমালার মেরুটি তাঁহার ললাটে স্পর্শ করাইয়া দেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ উদ্দীপিত হইয়া উঠেন দিব্য আনন্দের তরঙ্গে।

ব্রহ্মানন্দের এবারকার বৃন্দাবন-বাস ও তপস্যার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে তাঁদের ভক্তেরা লিখিয়াছেন, "এইরূপ কঠোর সাধন-ভজন ও তন্ময়ভাবে থাকিতে থাকিতে একদিন তাঁহার অন্তরলোক সহসা দিব্য আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া আনন্দরসে প্লাবিত হইয়া উঠিল। মনের যে অশান্তি, যে অভাব, যে দুঃখ-নৈরাশ্য তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল তাহা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল। গভীর প্রশান্তি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পাইল এবং আনন্দের নির্ঝর যেন নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমগ্র বিশ্ব এক অতীন্দ্রিয় ভাবস্পন্দনে স্পন্দিত হইল[১]।"

ব্রহ্মানন্দের সাধনজীবনে সহজ আনন্দের স্রোত আবার ফিরিয়া আসে। আনন্দময় ঠাকুরের কথা, তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভক্ত-শিষ্যদের কথা, ভাবিয়া হৃদয় হয় নবভাবে উদ্দীপিত। অতঃপর বৃন্দাবন ছাড়িয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়া সারা দেশে এক নূতন প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছে, নূতন আধ্যাত্মিকতার জোয়ার বহিতেছে। বিশেষ করিয়া কলিকাতার আকাশ-বাতাস তখন বিবেকানন্দের জয়গানে ভরপুর। আলম বাজারে তখন কত লোকজনের আনাগোনা। কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী রামকৃষ্ণভক্তদের দর্শনের জন্য। তাঁহাদের উপদেশ নিয়া জীবন গঠনের জন্য, আদর্শবাদী যুবকেরা দলে দলে আসিতেছে।

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন কর্তৃক প্রকাশিত

দৃশ্যপটের এ পরিবর্ত্তন দেখিয়া ব্রহ্মানন্দের আনন্দের সীমা নাই। বুঝিলেন, লগ্ন উপস্থিত—প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণ মুষ্টিমেয় ভক্ত-শিষ্যদের জীবনে যে দীপালোক জ্বালাইয়া গিয়াছেন, এবার তাহা ছড়াইয়া পড়িবে দিগ্‌বিদিকে। যাঁহারা ঠাকুরের কৃপাধন্য, অনন্য নিষ্ঠায় যাঁহারা ঠাকুরকে জ্ঞান করিয়াছেন পরমাশ্রয়রূপে, এবার তাঁহাদের প্রস্তুত হইতে হইবে চরম ত্যাগের জন্য, তাঁহার কাজে দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য।

সেদিন বলরাম বসুর ভবনে বসিয়া গুরুভাই যোগানন্দ ও প্রেমানন্দকে কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "ঠাকুরের কৃপায় বৃন্দাবনে পরম আনন্দে ছিলুম। এবার যাতে মঠের সবাকার ভেতর ঠাকুরের সেই প্রেমভক্তির ভাব বিকাশ পায়, যাতে তাদের দেখে ঠাকুরের কথা সবাই স্মরণ করতে পারে, তাই তো বৃন্দাবন ছেড়ে তাদের সেবা করতে এলুম। এমন সময়, এই যুগ তো আর সহজে মিলবে না।"

আন্তরিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ে ভরা ব্রহ্মানন্দের এই কথাকয়টি। শুধু তাহাই নয়, তিনি যে তাঁহার সর্ব্বশক্তি নিয়া ঠাকুরের ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য এবার বদ্ধপরিকর তাহাও সেদিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল গুরুভাইদের চোখে।

বিশ্ব-ধর্ম্মসভার জয়গৌরব নিয়া, পাশ্চাত্য দেশে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় ১৮৯৭ সালে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাগবাজারে পশুপতি বোসের বাড়িতে দেশবাসী তাঁহাকে সাড়ম্বর সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের বন্দোবস্ত করিয়াছে। সেখানে গিয়া স্বামীজীর কণ্ঠে ব্রহ্মানন্দ একটি মনোহর পুষ্পমালা জড়াইয়া দিলেন।

স্বামীজী তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলেন। স্মিতহাস্যে কহিলেন, "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।"

ব্রহ্মানন্দও সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল স্বরে উত্তর দেন, "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাসম পিতা।"—স্বামীজী বয়সে তাঁহা হইতে কয়েক দিনের বড়, এ কথাটি তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন।

সেই দিনই অপরাহ্নে আলম বাজার মঠে ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী কাছে ডাকাইলেন, বিদেশ হইতে সংগৃহীত টাকার ব্যাগটি তাঁহার হাতে দিয়া সবাইর উদ্দেশে কহিলেন, "এদ্দিন যার জিনিষ বয়ে বেড়িয়েছি আজ তাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।"

এই বৎসরই স্বামীজীর নেতৃত্বে বলরাম বসুর ভবনে মিলিত হইয়া ভক্তরা স্থাপনা করিলেন রামকৃষ্ণ মিশন। ইহার অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মানন্দ মহারাজের প্রেরণা ও নির্দ্দেশে মিশনের কর্ম্মীরা মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, দেওঘরে দুর্ভিক্ষের ত্রাণ কার্য্যে অবতীর্ণ হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শে বিবেকানন্দ তখন আলমোড়ায় গিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দকেই একধারে মঠ ও মিশনের সমস্ত কিছু দায়িত্ব বহন করিতে হইতেছে। অর্থ সংগ্রহ, কর্ম্মীদের পরিচালনা, তরুণ ভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবনের সাহায্য দান, সব কিছু তিনি করিতেন অনন্য নিষ্ঠায় এবং অসাধারণ দক্ষতার সহিত। কিন্তু এতকিছু বহুমুখীন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও কোনদিন তাঁহার আত্মাভিমান জাগে নাই, বাহ্যিক জীবনের সংঘাত তাঁহাকে চঞ্চল করে নাই। অপার প্রশান্তি নিয়া অচল অটল পর্ব্বতের মতো সংগঠনের স্নায়ুকেন্দ্রে তিনি সদাই থাকিতেন বিরাজিত।

স্বামীজী সে-বার ব্রহ্মানন্দকে কহেন, "রাজা, আমাদের এমন একটা সংগঠন তৈরী কর যা আপন ত্যাগে ও তেজ বীর্য্যে আপনা আপনি চলে যায়, আমরা মরি বা বাঁচি তার অপেক্ষা না ক'রে এটা যেন বেঁচে থাকতে পারে।"

স্বামীজীর এই নির্দ্দেশ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও যত্নে মিশনের মধ্যে এমন একটা দক্ষতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও আত্মিক শক্তির উদ্বোধন ঘটে যাহা দীর্ঘদিন রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর বহুমুখী কর্ম্মধারাকে সঞ্জীবিত ও উদ্দীপিত করিয়া রাখিয়াছে।

কাশ্মীরে কিছুকাল অবস্থানের পর স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে

ফিরিয়া আসেন। স্বাস্থ্য তাঁহার তখন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাখাল প্রভৃতি গুরুভাইরা আতঙ্কিত হইয়া পড়েন।

গিরিশ ঘোষ এ সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি মঠে ছুটিয়া আসেন। শয্যায় পড়িয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না, স্বামীজী কোনমতে হাঁটিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গিরিশবাবু কহিলেন, "একি স্বামীজী, শুনলাম তুমি অত্যন্ত পীড়িত, তাই দেখতে এলাম। এখন দেখছি তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো।"

স্বামীজী উত্তর দিলেন, "কি করবো বল জি-সি। বিছানায় শুয়ে থেকে যতবার চোখ মেলেছি দেখেছি রাজা প্যাঁচার মতো মুখ করে সামনে বসে আছে। তার মুখখানার ঐ ভাব দেখে আর শুয়ে থাকতে পারলুম না। তাই আস্তে আস্তে উঠে এলুম। আমি হাঁটছি বেড়াচ্ছি দেখে যদি রাজার মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে।"

এমন সময়ে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহেন, "এ'কি, তুমি এভাবে উঠে এলে যে? শরীর কি কিছুটা ভাল বোধ হচ্ছে?"

গিরিশবাবুকে উদ্দেশ করিয়া স্বামীজী কহেন, "রাজা শালা আমায় রোগী করে শুইয়ে রাখতে চায়। রোগ-ফোগ কি? আমি এখন বেশ ভাল আছি।"

ব্রহ্মানন্দ স্থান ত্যাগ করার পর কথা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, "বুঝলে জি-সি, রাজার কাজ দেখে আমি কিন্তু অবাক্ হয়ে গেছি। কি সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে মঠ ও মিশনের কাজ চালাচ্ছে। রাজার রাজবুদ্ধির তারিফ অবশ্যই করতে হয়। ঠাকুর ঠিকই বলতেন—রাখালের রাজবুদ্ধি; একটা প্রকাণ্ড রাজ্য চালাতে পারে। তা ঠিক।"

গিরিশ সোৎসাহে একথায় সায় দেন,—"তা হবে না কেন? ঠাকুরেরই তো ছেলে।"

স্বামীজী হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠেন। তারপর বলেন, "ত্যাখো, রাজার স্পিরিচ্যুয়েলিটি আঁকড়ে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে

কোলে করতেন, আদর করে খাওয়াতেন, এক সঙ্গে শয়ন করতেন, তার কি তুলনা হয়? রাজা আমাদের মঠের প্রাণ— সত্যিই সে আমাদের রাজা।”

সে-বার এক ইউরোপীয় ভক্ত মঠে আসিয়া বিবেকানন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতেছেন, স্বামীজীর কাছে কোন একটি জটিল তত্ত্বের তিনি মীমাংসা চান। স্বামীজী সাহেবকে বলেন, “তুমি এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে। তাঁর কাছে গিয়ে সব খুলে বল।”

ভক্তটি ব্রহ্মানন্দেরই দ্বারস্থ হইলেন। ব্রহ্মানন্দ কিন্তু তাঁহাকে ফেরত পাঠাইলেন স্বামীজীরই কাছে, কহিলেন, “তিনি ছাড়া তোমায় এ তত্ত্ব কে বোঝাবে, বল?”

স্বামীজীর কাছে ভক্তটি আবার যাইতেই তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “তবে শোন. ওঘরে বসে আছেন যে ব্রহ্মানন্দ তিনি হচ্ছেন একটি সক্রিয় ডায়নামো—আধ্যাত্মিক শক্তি সদাই নিঃসৃত হচ্ছে তার ভেতর থেকে। আর আমরা এখানকার সবাই হচ্ছি তাঁরই অধীনস্থ। তুমি তাঁকে ভাল করে চেপে ধর—কাজ হবে।”

ব্রহ্মানন্দ বুঝিলেন, বিদেশী ভক্তটি একজন প্রকৃত সত্যান্বেষী। এবার সযত্নে কাছে বসাইয়া জটিল সমস্যার সমাধান তিনি অবলীলায় করিয়া দিলেন। ভক্তটির আনন্দ আর ধরে না। তখনই স্বামীজীর কক্ষে গিয়া বার বার জ্ঞাপন করেন তাঁহার কৃতজ্ঞতা। বলেন, “আমার ভারতে আসা সার্থক হয়েছে, স্বামী ব্রহ্মানন্দের কৃপায় সত্য বস্তু কি. তা আমি বুঝতে পেরেছি।”

১৮৯৯ সালে রামকৃষ্ণ মঠ বেলুড়ের নবনির্ম্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। তারপর একদিন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রাণপ্রিয় রাজাকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান। এসময়ে গুরুভাইয়ের সমক্ষে যুক্তকরে ব্রহ্মানন্দের কাছে নিবেদন করেন, “রাজা, তোর আদর শুধু ঠাকুরই যে জানতেন। আমরা কি জানি যে তোর প্রকৃত সমাদর করবো?”

দ্বিতীয়বার আমেরিকা ও ইউরোপ সফর করিয়া স্বামীজী দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তারপর অল্প দিনের মধ্যেই রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করেন ব্রহ্মানন্দের উপর। স্নেহপূর্ণ নয়নে স্বামীজী তাঁহাকে কহেন, "রাজা, আজ থেকে এসবই তোর। আমি কেউ নই।"

বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ দুজনেরই প্রকৃতি ও গুণাবলী ছিল ভিন্ন রকমের। কিন্তু দুই জনেই ছিলেন অতি অন্তরঙ্গ, পরস্পরের প্রতি একান্তভাবে নির্ভরশীল ও বিশ্বাসসম্পন্ন। আর সর্ব্বোপরি তাঁহাদের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য হইয়া উঠিয়াছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের একাত্মকতার মধ্য দিয়া।

রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সংগঠনে, রামকৃষ্ণের তত্ত্ব প্রচারে স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দ দুইজনেই ছিলেন দুইজনের পরিপূরক। তাঁহাদের যুগ্মশক্তি ও যুগ্ম প্রতিভা তাই এদেশের অধ্যাত্মজীবনের কল্যাণে এমন সার্থক হইতে পারিয়াছিল।

"স্বামীজী ছিলেন দৃপ্ত সিংহের মতো তেজস্বী, সাগরের মতো অপার, গভীর জ্ঞানবৈরাগ্য ও বিদ্যাবুদ্ধির আধার, তারুণ্য শক্তির দুকূলপ্লাবী উত্তাল উদ্বেল তরঙ্গে সতত চঞ্চল, আর মহারাজ ছিলেন ধীর প্রশান্ত অচঞ্চল, আকাশের মতো উদার, অপরিমেয়, অসীম ভাবতন্ময়, কমনীয় বালস্বভাবের মাধুর্যে কোমল। একজন ছিলেন প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক কর্ম্মশক্তির দীপ্যমান ভাস্কর, অপরে ছিলেন অন্তর্মুখী ভাবদ্যুতির বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতি। একজনের বাণী প্রাণস্পর্শী বিদ্যুৎবাহী শক্তিকণা, অপরের অন্তঃসলিলা ফল্গুর পূতপ্রবাহ। একজনের বিশাল আকর্ণবিস্তৃত নয়নে বিশ্বগ্রাসী প্রেমপূর্ণ প্রখর দিব্য তেজ। অপরের ধ্যানস্তিমিত লোচনে সকরুণ, অপার্থিব, ঠাকুরের কথায়—'ফ্যালফেলে দৃষ্টি, যেন ডিমে তা দিচ্ছে'[১]।'

দ্বিতীয় বারে আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া স্বামী

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত

বিবেকানন্দ একদিন ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য গুরুভাইদের বলেন, "প্রথম বারে পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে ওদের সঙ্ঘবদ্ধতা দেখে বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, তাদের সব প্রতিষ্ঠানের ভিতর ব্যবসাদারী বুদ্ধি,—আর নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ভরে রয়েছে। নিজের নিজের প্রাধান্য আর ক্ষমতার লোভে যেন সবাই তারা সদাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। গরীব দুর্ব্বলদের পিষে ফেলে ধনীরা নিজেদের সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের যোগাড় করে নিচ্ছে। এই দেখে এবার জ্ঞান হল—ওসব যেন সাক্ষাৎ নরক।"

ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ত্যাগপূত আদর্শ ও প্রেমভক্তির ভিত্তিতে মঠের কাজকর্ম্ম চলিতেছে, ভক্ত ও কর্ম্মীরা নিঃস্বার্থভাবে জীব সেবায় ব্রতী হইয়াছে, ইহা দেখিয়া স্বামীজী খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

মিশনের তরুণ কর্ম্মীদের অধ্যাত্ম-জীবন যাহাতে সুগঠিত হয়, কর্ম্মব্রত উদ্‌যাপনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ঈশ্বরভজন ও ঈশ্বরনিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়, সেদিকে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। ত্যাগ বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক ধৃতি দৃঢ় না হইলে, ঈশ্বরপ্রেমের আনন্দ-রস হৃদয়ে ওতপ্রোত না হইলে, মঠ মিশনের কাজে স্বার্থবুদ্ধি, ঐহিকতা ও অহমিকা আসিবে, সঙ্ঘের ভিত্তি ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, ইহা ব্রহ্মানন্দ জানিতেন। তাই সর্ব্বসময়ে তরুণ সাধুদের তিনি যোগাইতেন ঈশ্বরীয় প্রেরণা ও সাধন-ভজনের উদ্দীপনা।

কর্ম্মীদের উপদেশ দিতে গিয়া মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "মনের গোলমালের জন্য ধ্যান-জপ হয় না। কাজের জন্য ধ্যান-জপের সময় পাওয়া যায় না, মনে করা ভুল। ওয়ার্ক অ্যাণ্ড ওয়ারশিপ—কর্ম এবং উপাসনা একসঙ্গে করবার অভ্যাস করতে হবে। কেবল সাধন-ভজন নিয়ে থাকতে পারলে ভাল, কিন্তু কয়জনে তা পারবে? কিছু না করে অজগরবৃত্তি অবলম্বন করে থাকে এক সম্পূর্ণ জড়বুদ্ধি

লোকেরা অর্থাৎ যাদের মস্তিষ্ক খাটাবার কোনই শক্তি নেই, কোন রকমে বেঁচে থাকে, তারাই পারে—আর পারেন মহাপুরুষরা যাঁরা সকল কর্মের পার। গীতায় আছে, কর্ম না করে জ্ঞানলাভ হয় না। কর্মের মধ্যে দিয়ে যেতেই হয়। যারা কর্ম ছেড়ে দিয়ে সাধনভজন করে, তাদেরও ঝুপড়ি বাঁধতে আর রান্না করতে সময় কেটে যায়। কর্ম ঠাকুর স্বামীজির—এই ভাব নিয়ে করলে কোনো বন্ধন তো হবেই না, অধিকন্তু তার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক, নৈতিক মানসিক, শারীরিক সব রকমের উন্নতি হবে। তাঁদের পায়ে আত্মসমর্পণ ক'র। শরীর মন সব তাঁদের পায়ে দিয়ে দাও।"

মানুষের মনস্তত্ত্ব ও মনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে মহারাজ অভিজ্ঞ ছিলেন। এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নবীন সাধকদের উদ্দেশে বলিতেন[১]:

"মন খাটিতে চায় না, সকল সময় সুখ খোঁজে। কিছু পাইতে হইলে খাটিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় অভ্যাস দৃঢ় করিবার জন্য জোর করিয়া ধ্যান-জপাদি করিতে হয়। যদি অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে কষ্ট বোধ হয়, শুইয়া জপ করিবে, ঘুম পাইলে বেড়াইয়া বেড়াইয়া করিবে। এইরূপে অভ্যাস দৃঢ় ও ধাতুস্থ করিয়া লইতে হইবে। ইচ্ছা হইলেই কি ছাড়িয়া দিতে হইবে? এইরূপভাবে চলিলে কোনদিনও অভ্যাস দৃঢ় হয় না। মনের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করা চাই। এইরূপ চেষ্টার নামই সাধন। মনকে বসে আনাই সাধন পথের লক্ষ্য।"

পৃথিবীতে সৎ অসৎ দুই আছে এবং থাকিবে। এসম্পর্কে নবীন সাধনার্থীদের তিনি দার্শনিক মনোভাব অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেন। বলিতেন, "সৎভাবের লোক উপকার করেই যাবে, এ তাদের স্বভাব। দুষ্টলোক অনিষ্ট করবে, সেও কিন্তু তাদের স্বভাব। 'একজন সাধু নদীর ধারে বসে ধ্যানজপ ভজন করত। একদিন

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ: পত্রাবলী

একটি বিছে জলে ভেসে যাচ্ছে দেখে তার মনে দয়া হল এবং হাতে ধরে বিছেটাকে জল থেকে পারে তুলে দিলে। বিছেটাকে যেমনি ধরতে গেছে, অমনি সে হাতে কামড়ে দিয়েছে। সাধুটি তখন যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে বিছেটা আবার জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। তা দেখে সাধুটি আবার তাকে পারে তুলে দিলে —বিছেটা আবার তাঁকে কামড়ে দিলে। কিছুক্ষণ পরে বিছেটা আবার জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখে সাধুটি যখন তাকে ফের তুলতে যাচ্ছে, তখন এক ব্যক্তি বললে,—'দেখুন বিছেটা আপনাকে বার বার কামড়ে দিচ্ছে, আর আপনি ফের তাকে তুলতে যাচ্ছেন? তার কথা শুনে সাধুটি জবাব দিলে. 'বিছের স্বভাব কামড়ানো, সে কামড়াচ্ছে; সাধুর স্বভাব পরোপকার করা, আমি তাই করব। সে আমাকে কামড়েছে বলে আমি নির্দয় হব কেন?' এই বলে আবার বিছেটাকে জল থেকে তুলে অনেক দূরে ফেলে দিলে, যাতে আর না জলে পড়তে পারে। যাদের সৎস্বভাব, তারা এইরূপই করে যাবে—তারা কখনও নিজের স্বভাব ছাড়ে না।"

তরুণ ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মানন্দের কণ্ঠে যে আশা ও উৎসাহের বাণী শুনিতেন, তাহা অপূর্ব্ব। তিনি বলিতেন, "উঠে পড়ে লেগে বস্তু লাভ করে নে। মনটাকে ঠিক কম্পাসের কাঁটার মতো করতে হবে। জাহাজ যে দিকেই যাক না কেন, কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকেই থাকে। তাই জাহাজের দিক্ ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তাহলে তারও আর কোন ভয় থাকে না। হাজার কুলোকের মধ্যে পড়লেও তার বিশ্বাস ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবৎকথা হলেই সে ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। কি রকম জানিস্? যেমন চক্‌মকি পাথর শত বৎসর জলের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার আগুন নষ্ট হয় না—তুলে লোহার ঘা মারা মাত্রই আগুন বেরোয়, সেই রকম তাঁকে লাভ করে যে ধন্য হয়েছে সে অন্য কিছুতেই মন দিতে পারে না। কেবল তাঁকে নিয়েই দিন যাপন করে। ভগবৎ কথা ও সাধু ভক্তের সঙ্গ ছাড়া তার আর কিছুই ভাল লাগে না। ঝড়ের এঁটো

পাতার মতো পড়ে থাকে, নিজের কোন ইচ্ছা বা অভিমান থাকে না, বাতাস তাকে যে দিকে নিয়ে যায় সে দিকেই যায়। সে তখন সংসারেও থাকতে পারে, আবার সচ্চিদানন্দ-সাগরেও ডুবে যেতে পারে।

"তোদের মনের স্বভাবটা যাতে পাকা হয়ে যায় তার চেষ্টা কর্। একবার অন্য রকম হয়ে গেলে আর উপায় নেই। বাসনাহীন মন কেমন জানিস? যেমন শুকনো দেশলাই—একবার ঘষলেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে। কিন্তু ভিজে গেলে ঘষতে ঘষতে কাঠি ভেঙ্গে গেলেও জ্বলে না। তেমনি মনে একবার অন্য রকম ছাপ পড়লে শত চেষ্টাতে তা নষ্ট করা যায় না।"

মঠের যুবক সাধুদের সতর্ক করিতে গিয়া তিনি কহিতেন,[১] "আসল তপস্যা তিনটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম সত্যাশ্রয়ী হতে হবে, সত্য খোঁটাকে সর্বদা ধরে থাকতে হবে, প্রত্যেক কাজে। দ্বিতীয় কামজয়ী হতে হবে। তৃতীয় বাসনা জয়ী হতে হবে। এই তিনটি পালন করতেই হবে এইগুলি জীবনে ফলানো বা সাধন করাই আসল তপস্যা। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি সবচেয়ে দরকারী, অর্থাৎ ব্রহ্মচারী হতে হবে। আমাদের শাস্ত্র বলেন, যারা বারো বৎসর কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তাদের পক্ষে ভগবান লাভ করা খুব সোজা। এরূপ হওয়া ভারী শক্ত। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের বলছি, ঠিক ঠিক ব্রহ্মচারী না হলে ঠিক ঠিক ধ্যান হওয়া অসম্ভব। সূক্ষ্ম বাসনা জয় করা ভারী শক্ত। এই জন্য সন্ন্যাসীদের এত কঠোর নিয়ম। সন্ন্যাসী কোন স্ত্রীলোকের দিকে তাকাবে না। এমন কি, ফটোগ্রাফ দেখলেও মনের উপর একটা ছাপ পড়তে পারে। মনের স্বভাব হচ্ছে কোন একটা সুন্দর জিনিস দেখলেই ভোগ করতে চায়। এইরূপে অনিচ্ছাসত্ত্বে অনেক জিনিস ভোগ করে। এটা অতিশয় হানিকর। ব্রহ্মচর্য্য পালনে ওজঃশক্তি বৃদ্ধি হবে।"

১ ধর্মপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ: কথাপকথন

একটি জিজ্ঞাসু ভক্ত ধ্যানজপ সম্পর্কে মহারাজের কাছে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাঁহার উত্তরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি লিখেন[১], "ধ্যান-জপে ও পূজা-পাঠে যত বেশী সময় দিতে পারা যায় তা কল্যাণকর। যাহারা শুধু সাধন-ভজন লইয়া থাকিতে চায়, তাহাদের অন্ততঃ ১৪।১৫ ঘণ্টা ধ্যান-জপ করা উচিত। অভ্যাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে সময় আরও বাড়িয়া যাইবে। মন যত ভিতরের দিকে যাইবে, তত বেশী আনন্দ পাইবে। ভজনে একবার আনন্দ পাইলে আর কোনমতেই ছাড়িতে ইচ্ছা হইবে না। তখন কত সময় কি করিতে হইবে—সে প্রশ্নের মীমাংসা মন নিজেই ঠিক করিয়া লইবে। মনের এইরূপ অবস্থা না হওয়া পর্যান্ত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ⅔ ভাগ সময় যাহাতে ধ্যান-জপে কাটে, বিশেষভাবে তাহার চেষ্টা করিবে। সৎগ্রন্থ পাঠ করিবে ও ধ্যান-জপের সময় মনে কত ভাব উঠে, মন কতটা স্থির হয় ইত্যাদি বিষয় ভাবিবে। শুধু চোখ-কান বুজিয়া ঘণ্টাখানেক ধ্যান-জপ করিলেই সব হইয়া গেল না। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করা দরকার। এইভাবে চিন্তা করিলে মনের অবস্থা বিশেষভাবে বুঝা যায় এবং মনে যে সব স্ফুট উঠে সেগুলিকে ত্যাগ করিবার চেষ্টা করা যায়। এইরূপে একটি একটি করিয়া ত্যাগ করিবার পর মন যখন শান্ত হইয়া যাইবে তখনই ঠিক ঠিক ধ্যান জপ হইবে। ধ্যান-জপের উদ্দেশ্য মনকে শান্ত করা। ধ্যান-জপ করিয়া মন যদি শান্ত না হয়, আনন্দ যদি না পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে ধ্যান-জপ ঠিক ঠিক হইতেছে না।"

ব্রহ্মানন্দকে আরও বলিতে শুনা যাইত, "যারা সাধন-ভজন করে, সব অবস্থায়ই করে। যেখানে সুযোগ-সুবিধা বেশী হয় সেখানে তারা আরও জোরে সাধন-ভজন করে। এখানে সুবিধা হচ্ছে না, ওখানে সুবিধা হচ্ছে না করে যারা বেড়ায়, তারা কোন কালে কিছু করতে পারে না, ভ্যাগাবণ্ডের মত ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে শুধু সময় নষ্ট করে।

১ পত্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ

"খুব জপ কর্ বাবা, খুব জপ কর্। কলিতে জপই হচ্ছে সহজ উপায়। এ যুগে যোগ-যাগ করা বড় কঠিন। জপ করতে করতেই মন স্থির হয়ে ইষ্টেতে লয় হয়ে যাবে। জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমূর্তি চিন্তা করতে হয়। তাতে জপ-ধ্যান তুই-ই একসঙ্গে হয়ে যায়। এভাবে জপ করতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়।

"স্মরণ-মনন খুব রাখতে হবে। জপ-ধ্যান করতে গেলে নানা সুযোগ সুবিধা খুঁজে নিতে হয়, কিন্তু স্মরণ-মননে কোন অপেক্ষা রাখে না। খেতে-শুতে, উঠতে-বসতে, সব সময়ই স্মরণ-মনন হতে পারে। দিনরাত স্মরণ-মনন রাখতে পারিস্ তো জানবি, মন অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। রামানুজের মতে, ঐরূপ অবিশ্রান্ত চিন্তার নামই ধ্যান।"

তরুণ সাধকদের শুদ্ধতা, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও পবিত্রতার উপর ব্রহ্মানন্দ মহারাজ অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। কহিতেন, "ছাখো, ঠাকুর বলতেন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। তাই বলছি, যদি আমরা তার ভক্ত, তাঁর সেবক, তাঁর দাস বলে পরিচয় দিতে চাই, তা হলে আমাদের শুদ্ধ, পবিত্র হতে হবে। শুদ্ধ হৃদয়ই তাঁর আসন। অশুদ্ধ হৃদয় থেকে তিনি অনেক দূরে থাকেন। আমাদের হৃদয় যখন কাঁচের মতো স্বচ্ছ ও নির্মল হবে—কোন দাগ থাকবে না, তখনই আমাদের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা হবে। তখনই আমরা তাঁর ভক্ত, সেবক, আশ্রিত বলবার অধিকারী।

"শুদ্ধ মনে তাঁর ছাপ সুন্দর পড়ে। আরশিতে ময়লা থাকলে যেমন মুখ দেখা যায় না, তেমনি অশুদ্ধ মনে ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে না। তোমাদের এখন অল্প বয়স, মনে কোন রকম ময়লা ধরে নি, এখন থেকে তাঁর জন্য হৃদয়ে আসন পেতে রাখ—অন্য কোন জিনিসের স্থান যেন সেখানে আর না হয়। শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন না হলে তাঁকে কখনো জানা যায় না। শুদ্ধ পবিত্র হও। তাঁকে লাভ করতেই হবে এ জীবনে।"

তপস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে এক নবীন সাধুকে তিনি লিখিতেছেন[১], "মনকে দুষ্ট অশ্বের সঙ্গে তুলনা করেছে। দুষ্ট অশ্ব বিপথে নিয়ে যায়। যে রাশ টেনে রাখতে পারে সেই ঠিক চলে। খুব লড়াই কর। কি কচ্ছ তোমরা? গেরুয়া নিলে আর সংসার ত্যাগ করলেই কি সব হয়ে গেল? কি হয়েছে তোমাদের?

"সময় শুধু চলে যাচ্ছে। এক মুহূর্তও নষ্ট ক'রো না। খুব জোর আর তিন চার বৎসর করতে পারবে, তারপর শরীর, মন দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন আর কিছুই করতে পারবে না। না খাটলে কি কিছু হয়? তোমরা বুঝি ভেবেছ যে আগে অনুরাগ ও ভক্তি বিশ্বাস হোক তারপর ডাকবে। তা কি কখনও হয়? অরুণোদয় না হলে কি আলো আসে? তিনি এলেই তবে প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে আসবে। তাঁকে জানবার জন্যই তপস্যা। তপস্যা ছাড়া কি কিছু হয়। ব্রহ্মা প্রথমে শুনেছিলেন, 'তপঃ, তপঃ, তপঃ।' দেখছ না অবতার পুরুষদের পর্য্যন্ত কত খাটতে হয়েছে! কেউ কি না খেটে কিছু পেয়েছে? বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য এঁদেরও কত তপস্যা করতে হয়েছে। আহা! কি ত্যাগ, কি তপস্যা!

"বিশ্বাস কি প্রথমে হয়? রিয়েলিজেশান বা অনুভূতি হলে তবে বিশ্বাস হয়। কিন্তু তার আগে শুধু গুরু মহাপুরুষদের বাক্যে বিশ্বাস করে, এমন কি অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে এগুতে হয়। ঠাকুরের সেই ঝিনুকের কথা জানতো? স্বাতী নক্ষত্রের এক-ফোঁটা জলের জন্য হাঁ করে থাকে, ফোঁটাটা পেলেই অতল জলে ডুবে যায়, গিয়ে মুক্তা তৈরী করে। তোমরাও তেমনি গুরুকৃপারূপ এক-ফোঁটা জল পেয়েছো। যাও, ডুবে যাও।

"তোমাদের একটা আত্মবিশ্বাস নেই। সাধন পথে পুরুষাকার দরকার। কিছু কর—চার বৎসর অন্ততঃ করে দেখ দেখি। যদি কিছু না হয় তবে আমার গালে একটা চড় মেরো। তমঃ রজঃ

১ পত্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ

ছাড়িয়ে সত্ত্বে যেতে না পারলে ধ্যান-জপ কিছু হয় না। তারপর সত্ত্বকেও ছাড়িয়ে চলতে হবে। এমন জায়গায় যেতে হবে যে আর আসতে না হয়। মানুষ জন্ম কত দুর্লভ। অপর প্রাণীদের জ্ঞান হয় না। একমাত্র মানুষ জন্মেই ভগবান লাভ হয় এবং তা করতে হবে। এই জন্মে খেটে-খুটে মনটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেন আর জন্মাতে না হয়। প্রথমে মনকে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, পরে সূক্ষ্ম থেকে কারণ, কারণ থেকে মহাকারণ, মহাকারণ থেকে মহাসমাধিতে নিয়ে যেতে হবে।

"আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর পাদপদ্মে ছেড়ে দাও। তিনি ছাড়া যে আর কিছু নেই। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' তিনিই সব, সবই তাঁর। কিন্তু হিসেব ক'রো না। আত্মসমর্পণ কি একদিনে হয়? সেটা হলে তো সব হয়েই গেল। সেটার জন্য খুব চেষ্টা করতে হয়। অনন্ত জীবন রয়েছে। মানুষের আয়ু বড় জোর একশ বছর; যদি অনন্ত সুখ চাও তো এই একশ বছরের সুখ ছেড়ে দিতে হবে।"

ভক্তদের প্রায়ই তিনি বলিতেন সময় থাকিতে সাধন-ভজনের কাজ গুছাইয়া নিতে—"এই জীবনের কিছুই ঠিক নেই। দশ বিশ বছর পরে শেষ হতে পারে বা আজই শেষ হতে পারে। কখন শেষ হবে তা যখন জানা নেই, তখন পথের সম্বল যত শীঘ্র করা যায় ততই ভাল। কি জানি কখন সে ডাক আসে। শেষে কি খালি হাতে অজানা, অচেনা দেশে যেতে হবে? খালি হাতে অজানা দেশে গেলে বড় কষ্ট পেতে হয়। যখন জন্মেছ তখন মৃত্যু নিশ্চয়ই হবে। মৃত্যু হলে অন্য এক দেশে যেতে হবে এটাও ঠিক। যো সো করে পথের সম্বল করে নিয়ে বসে থাকো। ডাক এলে হাসতে হাসতে চলে যাবে। কাজ গোছানো থাকলে আর কোন ভয় থাকবে না। মনে ঠিক ঠিক জানা থাকে আমাদের পথের সম্বল আছে।

"সদ্বাসনা মনে যখন জেগেছে, সদ্ভাবে জীবন যাপন করবার, তাঁকে জানবার ও বোঝবার সুযোগ যখন হয়েছে, তখন খেটে-খুটে বস্তু লাভ করে নাও। খুঁটি পাকড়াও। শরীর যাক্ থাক্, খুঁটি

পাকড়ানো চাই-ই চাই। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ। আমি মানুষ, আমি সব করতে পারি, এই রকম বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যাও —বস্তু পাবে, মনুষ্য জীবনের যথার্থ সদ্ব্যবহার হবে। আসা যাওয়া বড় কষ্ট। আসা যাওয়ার দফা শেষ করে ফেল। তাঁর নিত্যসাথী হয়ে যাও।

"ভয় ও দুর্ব্বলতা মন থেকে দূর করে দাও। পাপ পাপ ভেবে মন কখনও খারাপ করবে না। তাছাড়া, যত বড় পাপই হোক না কেন, লোকের চক্ষেই উহা বড়, ভগবানের দিক দিয়ে ওটা কিছুই নয়। তাঁর একটি কটাক্ষে কোটি কোটি জন্মের পাপ এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন হতে পারে।"

প্রেমপূর্ণ নয়নে, দৃপ্ত ভঙ্গীতে, ঈশ্বরের কৃপার প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "ওহে, তিনি যে অপেক্ষা করছেন, পাল তুলে ধরলেই নৌকা ঠিকানায় ঠিক পৌঁছে যাবে। পাল তোল, ওহে পাল তোল। শক্তি তোমাদের যথেষ্ট রয়েছে। এবার নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ— তাঁর নাম শুনেছি, তাঁর নাম করেছি, আমাতে ভয় দুর্ব্বলতা থাকতে পারে না; তাঁর কৃপায় আমি তাঁকে লাভ করবই এ জীবনে। পিছনে ফিরে তাকিও না, এগিয়ে যাও— তাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে, মনুষ্য জন্ম সার্থক হবে, অপার আনন্দের অধিকারী হবে।"

মঠের ছেলেদের মহারাজ সকল সময় চোখে চোখে রাখিতেন, তাঁহার পরমাশ্রয়ে অবস্থান করিয়া নির্ভয়ে তাঁহারা গঠন করিত সাধনময় ও সেবাময় জীবন। মহারাজ বলিতেন, "তোদের এত বলি কেন জানিস? আমাদের যখন তোদের মতো বয়স ছিল, ঠাকুর আমাদের জোর করে সাধনা করিয়ে নিতেন। ছেলেবেলা কাঁচা মাটির মতন স্বভাবটা থাকে কিনা, তাই যেটা সামনে পায় সেইটাকেই আঁকড়ে ধরে। নরম মাটিতে যা ইচ্ছে হয় গড়—সব জিনিসই তৈরী করতে পারা যায়। একটি জিনিস তৈরী কর, তাকে ভেঙ্গে ফেলে

আবার অন্য জিনিস তৈরী কর। যতক্ষণ মাটি কাঁচা থাকে তাতে যেরূপ ইচ্ছে গড়ন করা যায়। কিন্তু এ মাটিকে আগুনে পোড়াবার পর আর কোন রকম গড়ন হবে না। তোদের মন এখন কাঁচা মাটির মতো। এখন যে ভাবে গড়বি সে রকম হবে। মন এখন শুদ্ধ পবিত্র আছে—অল্প চেষ্টাতেই ভগবানের দিকে যাবে। মনটা এখন থেকে বেশ করে ভগবানে লাগিয়ে রাখলে অন্য কোন ভাব ঢুকতে পারবে না। তাঁর ভাবে মন যদি একবার পাকা হয়ে যায়, আর কোন ভাবনা নেই।

"মন সরষের পুঁটুলির মতো। সরষের পুঁটুলি খুলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়লে কুড়িয়ে তোলা যেমন শক্ত, বয়স হলে মন যখন সংসারে ছড়িয়ে পড়বে তখন সে মনকে গুটিয়ে এনে ঈশ্বরীয় বিষয়ে লাগানও তেমনি শক্ত। তাই তোদের বলি, ছড়িয়ে যাবার আগে মনটা গড়ে নে। খুঁটি বেশ পাকা করে নে। এরপর বেশী বয়স হলে মন যখন সংসারে ছড়িয়ে যাবে, তখন সদ্ভাবে মন লাগাতে খুব বেগ পেতে হবে—কষ্ট পেতে হবে। ষোল বৎসর থেকে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যা করবার করে নিতে হবে।"

ঠাকুরের কথা প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ এক ভক্তকে লিখিয়াছেন,[১] "ভগবানের জন্য যে সব ছেড়েছে, ভগবানের উপর তার একটা জোর আছে। বাপ-মার কাছে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে যেমন জোর করা যায়, আব্দার করা যায়, তাঁকেও তেমনি জোর করে বলা যায়—দেখা দাও, দেখা দিতেই হবে। তখন তিনি দৌড়ে আসেন, কোলে তুলে নেন। তার কোলে উঠলে যে কি আনন্দ, তা সেই জানে যাকে তিনি কোলে তুলে নিয়েছেন। সে আনন্দের কাছে মানুষ যাকে আনন্দ বলে তা তুচ্ছ হয়—আলুনী লাগে। ঠাকুর আরও বলতেন, 'যাঁরা তাঁর জন্য ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করেছে, তারা বারআনা রাস্তা এগিয়ে গেছে।' দেহসুখ ত্যাগ করা কি সোজা রে? তাঁর অনেক

১ পত্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ

কৃপা থাকলে, পূর্ব্ব জন্মের অনেক তপস্যা থাকলে তবে মানুষ সেই শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী হয়। মনটাকে এমনভাবে তৈরী করতে চেষ্টা কর যেন ওসব বাসনা মনে আদৌ উঠতে না পারে। এইভাবে জীবন কাটান বড় শক্ত। এখন ছেলেমানুষ বলে যত সোজা মনে করছিস তত সোজা নয়। এ অবস্থাটা কি রকম জিনিস?—খোলা তরোয়ালের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। প্রত্যেক মুহূর্তে কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া এ রাস্তায় চলা যায় না। ভগবানে ভালবাসা ও বিশ্বাস না হলে ব্রহ্মচর্য্য রাখা বড় শক্ত। ভোগ বিলাসপূর্ণ জগতে থাকতে হবে, চোখের সামনে শতকরা নিরানব্বই জনেরও বেশী লোক ভোগের পিছনে পিছনে দৌড়ুচ্ছে; এই সব নিত্য দেখতে হবে, এইসব দেখে শুনে মনের মধ্যে নানা রকম ছাপ পড়বার খুবই সম্ভাবনা। এই সব ছাপ যদি একবার কোনরকমে পড়ে আর রক্ষা নেই। যারা ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করতে চায়, তাদের সদা সর্ব্বদা নিজের মনকে সৎ বিষয়ে নিযুক্ত করে রাখতে হবে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সৎ বিষয়ে আলোচনা, ঠাকুর সেবা, সাধু সেবা, সাধুসঙ্গ ও জপধ্যান নিয়ে থাকতে হবে। একমাত্র এই উপায়েই নিজেকে তৈরী করা যেতে পারে।

"প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যে নিষ্ঠা পাকা করবে—বাকী সব আপনি এসে যাবে। সাধনা না করলে ব্রহ্মচর্য্য ঠিক রাখা যায় না। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই ভগবান লাভ হয়। ভগবান লাভ না হলে মনুষ্যজন্ম বৃথা গেল। তাঁর দর্শন হলে তবেই আনন্দ। ছেলেমানুষ তোরা, সৎ বুদ্ধি, সৎ মন তোদের। একটু চেষ্টা কর্। অল্প চেষ্টাতেই ভক্তি-বিশ্বাস জেগে উঠবে।"

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া মঠের কঠোর সন্ন্যাস জীবন তরুণেরা নিয়াছে, তাঁহাদের যাহাতে পরমার্থ লাভ হয় এজন্য ব্রহ্মানন্দের ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। তাহাদের কহিতেন[১], "ভগবান লাভের

১ পত্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ

জন্য ঘর-দোর ছেড়ে এসেছিস্, তাঁকে লাভ করবার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে প্রাণপণ চেষ্টা চাই। পাগলা কুকুরের মতন ভগবানের জন্য 'হন্যে' হতে হবে। চারটি ডাল ভাত খেয়ে মঠে শুধু পড়ে থাকা মানে অত্যন্ত হীনভাবে জীবন যাপন করা—না হল এদিক, না হবে ওদিক, একুল ওকূল দুকূল গেল! ইতো নষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হবে। আর মন যদি তাঁতে বসতে না চায়, অভ্যাস রাখতে হবে। রোজ এক অধ্যায় করে গীতাপাঠ দরকার। আমি নিজে দেখেছি, মন যখন নীচে নামে, একটু গীতাপাঠ করলে সেগুলো একেবারে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেয়। চারটি ডাল ভাত খেয়ে পড়ে থাকাই তো ইতো নষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ।

"প্রত্যহ মনকে খোঁচাতে হবে। কি করতে এসেছি, কি করে দিনটা গেল? বাস্তবিকই কি ভগবানকে আমার চাই? চাই যদি তো করছি কি? বুকে হাত দিয়ে বল্ দেখি চাওয়ার মতো কাজ করেছিস কিনা? মন ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে। তার গলা টিপে ধরতে হবে, ফাঁকি না দিতে পারে। সত্যকে ধরতে হবে—পবিত্র হতে হবে। যতই পবিত্র হবে ততই মনের একাগ্রতা বাড়বে ও মনের সূক্ষ্ম ফাঁকিগুলো ধরা পড়বে, আর সেগুলি সম্পূর্ণরূপে নাশ পাবে। 'কে শত্রবঃ সন্তি নিজেন্দ্রিয়ানি। তান্যেব মিত্রাণি-জিতানি যানি।' এই মনই নিজের শত্রু আবার এই মনই নিজের মিত্র। যে যত বিশ্লেষণ করে, জেরা করে, মনের এই গলদ বের করে তার সম্যক্ নাশ করতে পারবে, সে তত দ্রুত সাধনরাজ্যে এগিয়ে যাবে।

"খুব জপধ্যান করবি। প্রথম প্রথম মন স্থূল বিষয়ে থাকে। ধ্যানজপ করলে তখন সূক্ষ্ম বিষয় ধরতে শিখে। শীতকালই তো ধ্যানজপের সময়, আর এই-ই বয়স। 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং' —বলে বসে যা। সত্যই ভগবান আছেন কি না একবার দেখে নে না। একটু একটু তিতিক্ষা, যেমন অমাবস্যা একাদশীতে একাহার, করা ভাল। বাজে গল্পটল্প না করে সারাদিন তাঁর স্মরণ-মনন করবি। খেতে, শুতে, বসতে—সর্ব্বক্ষণ। এইরূপ করলে দেখবি

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ক্রমে ক্রমে জাগবে। স্মরণ-মননের চেয়ে কি আর জিনিস আছে? মায়ার পর্দা একটার পর একটা খুলে যাবে। নিজের ভেতরে যে কি অদ্ভুত জিনিস আছে দেখতে পাবি—স্ব-প্রকাশ হবি।"

স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এই দুই গুরুভাই-এর আকৈশোর বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা ও প্রেম ছিল এক দর্শনীয় বস্তু। আবার দুইজনের মধ্যে কলহ, মান-অভিমান ও কান্নাকাটিও কম দেখা যাইত না। গোলযোগটা প্রায়ই স্বামীজীই শুরু করিতেন। শেষের দিকে, রোগে ভুগিয়া ও অতিরিক্ত শ্রমজনিত অবসন্নতার ফলে স্বামীজীর মেজাজ কিছুটা খিট্‌খিটে হইয়া যায়। এ সময়ে তাঁহার ঝামেলা ও চেঁচামেচি ব্রহ্মানন্দকেই সহ্য করিতে হইত বেশী, আর ইহা তিনি করিতেন স্বামীজীর প্রেমের আকর্ষণে, নিজের ঔদার্য্য ও প্রশান্তির গুণে।

সে-বার বলরাম বসুর ভবনে স্বামীজী এবং ব্রহ্মানন্দ দুই জনেই অবস্থান করিতেছেন। ডায়াবিটিজ্ রোগে স্বামী বিবেকানন্দ তখন খুব পীড়িত। ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য গুরুভাইদের এজন্য উদ্বেগের অবধি নাই। রাত্রে স্বামীজী প্রায়ই ঘুমাইতে পারেন না, সেদিন ক্লান্ত হইয়া দুপুরে নিজের ঘরে শয়ন করিয়া আছেন। এমন সময় স্বামীজীর মাতার পুরানো দাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

ব্রহ্মানন্দকে সে প্রশ্ন করে, "হ্যাঁগা, আমাদের নরেন কোথায় রয়েছে, বল তো।"

ব্রহ্মানন্দ জানান, "তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন। শরীর অসুস্থ, কাল সারা রাত ঘুম হয় নি। তুমি বরং আর একদিন এসো।" একথা শুনিয়া দাসী সেখান হইতে চলিয়া গেল।

নিদ্রাভঙ্গের পর বিবেকানন্দকে একথা জানানো হয়। ক্রোধে তিনি গর্জ্জিয়া উঠেন, ব্রহ্মানন্দকে কহেন, "তোর কি কিছুমাত্র

কাণ্ডজ্ঞান নেই? ঝি কি এমনি শুধু শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো? নিশ্চয় মা তাকে কোন জরুরী কাজের ভার দিয়ে এখানে পাঠিয়েছিলেন।"

সঙ্গে সঙ্গে বর্ষিত হয় প্রচুর তিরস্কার ও কটূক্তি। তখনি একটা ঘোড়ার গাড়ী ডাকাইয়া স্বামীজী তাঁহার জননীর সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়া গেলেন।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া শুনিলেন, মা ঐ ঝিকে তাঁহার নিকট পাঠান নাই। ও পাড়ায় তাহার কি যেন এক কাজ ছিল, সেই সুযোগে নরেনের সঙ্গেও সে দেখা করার চেষ্টা করিয়াছে।

একথা শোনা মাত্র স্বামীজীর অনুতাপের আর সীমা রহিল না। তৎক্ষণাৎ জননীর নাম করিয়া ব্রহ্মানন্দের জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। ব্রহ্মানন্দ সেখানে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অনুতপ্ত স্বরে কহিলেন, "রাজা, আমি বড় অন্যায় করেছি। অযথা তোকে এত গালমন্দ দিয়েছি। কেবল তুই বলেই ওরকম কটু কথা আমি বলতে পেরেছি।"

ব্রহ্মানন্দের দুঃখ ও অভিমান ততক্ষণে দূর হইয়াছে। একগাল হাসিয়া এবার স্বামীজীকে প্রবোধ দিবার জন্যই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

স্বামীজীর ইচ্ছা, বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরের কিছুটা অংশে পোস্তা বাঁধানো হোক, এবং একটা ঘাট তৈরী করা হোক। বিজ্ঞানানন্দ প্রাক্তন ইন্‌জিনিয়ার, তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ছাখো তাড়াতাড়ি এর একটা প্ল্যান আর খরচের এষ্টিমেট দাও।"

বিজ্ঞানানন্দ ভয়ে ভয়ে কম করিয়াই ব্যয়বরাদ্দ স্থির করিলেন। কহিলেন, "তিন হাজার টাকাতেই এটা হয়ে যাবে।"

ব্রহ্মানন্দের উপর টাকা সংগ্রহ ও কাজকর্ম্ম দেখাশুনার ভার, কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু দেখা গেল, পূর্ব্বের ব্যয়বরাদ্দ আর ঠিক থাকিতেছে না। স্বামীজীর ভয়ে বিজ্ঞানানন্দ ভীত হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মানন্দ আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তা আর কি করা যাবে? কাজে

যখন হাত দেওয়া হয়েছে, খরচ বেশী হলেও শেষ করতেই হবে। এজন্য তুমি ভেবো না। কাজ যাতে ভালো হয় তাই কর।"

স্বামীজী একদিন খোঁজখবর নিতে গিয়া দেখেন, এষ্টিমেটের চাইতে ব্যয় ইতিমধ্যে বেশী হইয়া গিয়াছে এবং কাজ এখনো অনেক বাকী। ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন; তীব্র ভাষায় ব্রহ্মানন্দকে করিতে লাগিলেন গালিগালাজ।

স্বামীজী সেখান হইতে চলিয়া গেলে মর্ম্মাহত ব্রহ্মানন্দ নিজের ঘরে গিয়া দুয়ার বন্ধ করিলেন।

এবার স্বামীজীর হুঁস হইল, প্রিয়তম গুরুভাইকে অযথা কি মনোব্যথাই না তিনি দিয়াছেন। অখণ্ডানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "পেশন, শিগ্‌গীর যাও তো একবার, দেখে এসো রাজা কি করছে। আহা তাকে কি কটু কথাই না বলেছি।"

অখণ্ডানন্দ ঘরে ঢুকিয়া দেখেন ব্রহ্মানন্দ শয্যায় মুখ গুঁজিয়া অঝোর ধারে কাঁদিতেছেন। এ সংবাদ স্বামীজীর কাছে পৌঁছিল, তখনি উন্মাদের মতো তিনি ছুটিয়া আসিলেন ব্রহ্মানন্দের কক্ষে। তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন, "রাজা, রাজা, আমায় তুই ক্ষমা কর। কি ঘোর অন্যায় আমি করেছি। তোকে অনর্থক গালাগালি দিয়েছি। আমায় তুই ক্ষমা করলি কিনা বল।'

ব্রহ্মানন্দের মনের ক্ষোভ দুঃখ কোথায় চলিয়া গেল, ক্রন্দনরত স্বামীজীকে সান্ত্বনা দিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, "তুমি কেন এমন উতল হয়েছো? আমায় গালাগাল দিয়েছো, তাতে কি হয়েছে? আমায় এত ভালবাসো বলেই তো গাল দিতে পেরেছো। তুমি শান্ত হও।"

স্বামীজীর অনুশোচনার অন্ত নাই। প্রবোধ বাক্য শোনার পরেও অশ্রু ছলছল নয়নে কহিতে থাকেন, "না, না রাখাল, তুই আমায় ক্ষমা কর্। ঠাকুর তোকে কত আদর করতেন, কখনো একটা কড়া কথা তোকে তিনি বলেন নি। আর আমি কিনা ছাই কাজের জন্য তোকে এত গালাগালি করলুম—মনে কষ্ট দিলুম।

আমি আর তোদের সঙ্গে থাকার যোগ্য নই। চলে যাই হিমালয়ে। কোথাও নির্জ্জনে গিয়ে থাকবো।"

ব্রহ্মানন্দ ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলেন, "ওসব কি কথা তুমি বলছো। তোমার গালাগালি যে আমাদের আশীর্ব্বাদ। তুমি কোথায় চলে যাবে? তুমি যে আমাদের মাথা। তুমি চলে গেলে আমরা থাক্‌বো কি নিয়ে?"

বহিরঙ্গ জীবনের অন্তস্তলে এমনি এক গভীর প্রেমের ফল্গুধারা উভয়ের মধ্যে ছিল প্রবাহিত। এক একদিনের আকস্মিক ঘটনায় ইহার প্রকাশ দেখিয়া ভক্ত-শিষ্যেরা অবাক হইয়া যাইতেন।

আর একবার স্বামীজীর কঠোর তিরস্কারে ব্রহ্মানন্দ মনে নিদারুণ আঘাত পাইলেন। ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন, না এই ঝামেলা আর পোহাইবেন না, দু চোখ যেদিকে যায়, চলিয়া যাইবেন।

মঠ-ত্যাগ করার সংকল্প নিয়া বাহিরে যাইতেছেন, বেলতলায় আসিয়া পা দুটি অচল হইয়া গেল। সেখানেই তিনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'এই মঠ, এই ভক্তসঙ্ঘ, এই পবিত্র সেবাকর্ম্ম, সব কিছুই তো ঠাকুরের। আমাদের কারুর ব্যক্তিগত তো কিছু নয়। ঠাকুরের এসব ফেলে কোথায় যাবো? কেনই বা যাবো? স্বামীজীর বকাবকিতে কি আসে যায়। বকেছে তো কি হয়েছে? তাছাড়া, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়ার জন্যই তো তার এমন খিটখিটে মেজাজ।'

মন তাঁহার অমনি শান্ত হইয়া যায়, চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে আনন্দোজ্জ্বল হাসির আভা। ধীরপদে মঠে ঢুকিয়া শুরু করেন নিজের দিনচর্য্যা।

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহার সারা অন্তরের উপলব্ধি দিয়া জানিতেন, বিবেকানন্দ, তাঁহার আকৈশোর বন্ধু বিবেকানন্দ, তাঁহার প্রাণপ্রিয় ঠাকুরের লীলার প্রধান পার্ষদ—ঠাকুরের সহস্রদল কমল। আবার স্বামী বিবেকানন্দও জানিতেন, ব্রহ্মানন্দ শুধু তাঁহার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুই নয়, ঠাকুর নিজের চিহ্নিত সঙ্ঘনায়ক—রাখালরাজ। তাই বাহিরের

লোক এই দুইয়ের প্রীতি ও সখ্যের গভীরত্বের পরিমাপ করিতে সক্ষম হইত না। দুইজনেই ছিলেন গুরুগতপ্রাণ এবং গুরুসর্ব্বস্ব। তাই গুরুর মাধ্যমেই দুইয়ের আত্মিক বন্ধন হইয়া উঠে এমনতর চির-অবিচ্ছেদ্য।

রামকৃষ্ণ লীলার ধারক ও বাহক এই দুই প্রধান শিষ্যের প্রণয়-কলহ ছিল মঠের তরুণ ব্রহ্মচারীদের এক দর্শনীয় বস্তু।

"মঠের বাগানের পার্শ্বে খোলা মাঠ জমিতে স্বামীজীর গাভী, ছাগল প্রভৃতি চরিয়া বেড়াইত। স্বামীজী ও মহারাজ এই মাঠ এবং বাগানের একটি সীমা বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। যদি স্বামীজীর গাভী, ছাগল প্রভৃতি ভক্ত-সীমা অতিক্রম করিয়া বাগানে আসিত তবে মহারাজ অনধিকার প্রবেশ লইয়া প্রবল আপত্তি তুলিতেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে তুমুল প্রেমকলহ উপস্থিত হইত। পরস্পরের এই অদ্ভুত বালকবৎ আচরণে তাঁহাদের গুরুভ্রাতারা এবং মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা আনন্দে আপ্লুত হইতেন। মনে হইত যেন দুইটি দিব্য ভাবাপন্ন বালক অপরূপ খেলায় মত্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের একজন বিশ্বজয়ী আচার্য্য শ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যজন মঠ-মিশনের সঙ্ঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দ। দুই জনেই প্রায় প্রৌঢ় সীমায় উপনীত। অথচ ইঁহাদের দুইজনের বালকের মতো বাহ্যিক প্রীতি-কলহের অন্তরালে কি গভীর প্রেম প্রকাশ পাইত[১]।"

মঠ ও মিশনের কাজ ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছে, মঠনায়ক ব্রহ্মানন্দের তাই কর্ম্মতৎপরতার সীমা নাই। কিন্তু ব্রহ্মচারী ও কর্ম্মীরা শুধু সেবাকর্ম্ম নিয়াই ব্যস্ত থাকুক ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নয়। এই কর্ম্মের পিছনে একটি সাধনভিত্তি গড়িয়া উঠুক, যে জন্য তাহারা

[১] স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন

ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে সেই ঈশ্বর-লাভের সঙ্কল্প সফল হোক, ইহাই তিনি মনেপ্রাণে সর্ব্বদা চাহিতেন। তাই দেখা যাইত, মঠ পরিচালনার ব্যাপক কর্ম্মসূচীর মধ্যেও এই তরুণ কর্ম্মীদের আত্মিক উন্নতির ভিত্তি গঠনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ সদা তৎপর থাকিতেন। সাধন-নির্দ্দেশ ও তত্ত্বের মীমাংসা তাঁহার কাছ হইতে জানিয়া নিয়া ভক্ত সাধকেরা কৃতার্থ বোধ করিতেন।

স্নেহপূর্ণ স্বরে ইহাদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেন, "খুব সকাল সকাল শয্যা ত্যাগ করা ভাল। রাত্রি যায় দিন আসে, দিন যায় রাত্রি আসে এই সময়টা সংযম সময়। এই সময় প্রকৃতি শান্ত থাকে, উহা ধ্যানজপের বিশেষ অনুকূল। এই সময় সুষুম্না নাড়ী চলে, তখন দুই নাক দিয়েই নিঃশ্বাস বয়। নচেৎ সর্বদা ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী চলে, অর্থাৎ এক নাক দিয়ে নিঃশ্বাস বয়। তখন চিত্ত চঞ্চল হয়। যোগীপুরুষরা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখেন, কখন সুষুম্না নাড়ী বইবে। সেই সময় তাঁরা যে কাজেই থাকুন না কেন, সব ছেড়ে দিয়ে ধ্যানে বসবেন।"

সাধন-ভজন সম্পর্কে ভক্ত ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা মহারাজের কাছ হইতে কত খুঁটিনাটি কথা, কত জটিল তত্ত্বের মীমাংসাই না জানিয়া নিতেন। তিনি বলিতেন, "সাক্ষাৎ সাধন হচ্ছে সব চেয়ে উত্তম— সেই পরমাত্মা রয়েছেন, সর্ব্বদা তার অনুভূতি হচ্ছে। তারপর হচ্ছে ধ্যান, সেখানে তিনি আছেন, আর আমি আছি, জপ-তপ সব কিছু বন্ধ। যখন ধ্যান জমবে তখন দেখবে শুধু ইষ্টের রূপ, তখন জপতপ সব আর চলে না। তার নীচে স্তবস্তুতি ও জপ-তপ করা যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ চিন্তা করা যাচ্ছে। আর তারও নীচে হচ্ছে বাহ্যপূজা—প্রতীক বা প্রতিমা-উপাসনা। এই সবই হচ্ছে ক্রমোন্নতির নানা অবস্থা। যার মনের যে রকম অবস্থা, সে সেখানে থেকে সাধন আরম্ভ করে, আর ক্রমে বেড়ে যায়। একজন সাধারণ লোকের কথা ধর, তাকে একেবারেই যদি নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তা বা সমাধি সম্বন্ধে উপদেশ করা যায়, সে কিছুই ধারণা করতে পারবে না, তার

ভালও লাগবে না। দু-একদিন চেষ্টা করে ছেড়ে দেবে। কিন্তু তাকে যদি ফুল-বেলপাতা নিয়ে পূজা করতে দেওয়া যায়, তাতে সে মনে করবে একটা কিছু করলুম। তার মনটাও খানিক ক্ষণের জন্য কতকটা স্থির হলো। এতে সে বেশ আনন্দও পায়। তারপর ক্রমে সেই অবস্থা অতিক্রম করে।

"মন যত সূক্ষ্ম হতে থাকে, স্থূল জিনিসে আর সেই রকম রস পায় না। ধরুন আপনি প্রথমে পূজা আরম্ভ করলেন। কিছুদিন পরে দেখবেন, আপনা থেকেই মনে হবে—জপ করা ভাল, তখন জপটা বেড়ে যাবে। আবার কিছুদিন পরে মনে হবে ধ্যান করা ভাল, তখন শুধু ধ্যান করতে ইচ্ছা যাবে। এই রকমে মানুষ ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। একেই বলে—ন্যাচারাল গ্রোথ্ বা স্বাভাবিক উন্নতি। এই রকমে মন যেটুকু লাভ করে তা আর নষ্ট হয় না।

"মনে করুন, আপনি এই উঠানে আছেন, আপনাকে ছাদে উঠতে হবে। কোথায় সিঁড়ি আছে খুঁজে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তবে উঠতে পারেন। তা না হয়ে উঠান থেকে কেউ যদি আপনাকে ছুঁড়ে দেয়, তা হলে আপনার অনেক কষ্ট হবে এবং তাতে বিপদের আশঙ্কাও খুব আছে। এই বাইরের জগতে যেমন দেখছেন নিয়মকানুন আছে, অন্তর্জগতেও ঠিক সেই রকম সব ব্যবস্থা আছে"[১]।

ভক্তদের মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "ছাখো, দেহই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। সেইজন্য ধ্যান-ট্যান সব শরীরের ভিতর করতে বলে। সহস্রারে মন গেলে আর নামতে চায় না। 'যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।' 'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা' প্রভৃতির মানে হচ্ছে, হৃদয়ের ভিতর সেই পরমপুরুষকে দেখলে আর জন্ম হয় না। নিম্ন অধিকারীর জন্য বাহ্যরথ, মন্দির প্রভৃতির সৃষ্টি। রামপ্রসাদ যখন হৃদয়ে মাকে দেখলেন, তখন গান বানিয়ে বললেন—'তুমি মাতা

ধর্মপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ : কথোপকথন

থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।' উঃ, কি ভয়ানক কথা বল দেখি। বাস্তবিক সেই আস্বাদ পেলে আর অন্য কিছু কি ভাল লাগে?

"ঠাকুর বলতেন—দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে জ্ঞাননেত্র আছে, সেটা ফুটলে চারদিক আনন্দময় দেখায়।

—রাজার সাত দেউড়ি বাড়ি। কোন গরীব নায়েবের কাছে রাজদর্শন প্রার্থনা করলে। নায়েব সঙ্গে করে এক এক দেউড়িতে নিয়ে যায়, আর সে জিজ্ঞাসা করে—এই কি রাজা? উত্তর হয়—'না'। এই প্রকারে যখন সপ্তম দেউড়িতে প্রবেশ করে রাজদর্শন করলে, তখন সেই অপরূপ রূপ দেখে আর জিজ্ঞাসা করলে না। সেই রকম গুরু এক এক দেউড়ি দিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষে ভগবানকে মিলিয়ে দেন।"

ধ্যানের পদ্ধতি ও চরম উপলব্ধি সম্পর্কে এক ব্যক্তি মহারাজকে সেবার প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি জানান,—"ধ্যানকালে ইষ্টমূর্ত্তিকে জ্যোতির্ময় ভাবতে হয়—যেন তাঁর জ্যোতিতে সব আলোকিত। চৈতন্যস্বরূপ ভাব্‌বে। এইরূপ ধ্যান পরে সহজেই নিরাকার ধ্যানে পরিণত হয়। তাতে বোধে বোধ হয়। তারপর জ্ঞানচক্ষু খুলে গেলে তখন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সে আর এক জগৎ। এ জগৎটা যেন আলাদা। তাছাড়া, এটা তখন খুব তুচ্ছ হয়ে যায়—যেমন উদি (মহারাজের ভুবনেশ্বরস্থিত পাচক) কলকাতায় এসে শহরের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য দেখে বললে, 'ভুবনেশ্বরটা কিছুই না'। তারপর মন লয় হয়ে যায়--তখন সমাধি। তারপর নির্বিকল্প। তারপর আরও এগিয়ে কি যে, তা মুখে আর বলা যায় না। সেখানে দেখা নাই, শোনা নাই, অনন্ত—অনন্ত !! এ সবই হচ্ছে অবস্থার কথা। তখন মনকে জোর করে এজগতে আনতে হয়—এটা কিছু নয় বলে মনে হয়। 'দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিতং'। সে অবস্থায় গিয়ে কেউ কেউ শরীরটাকে মস্ত বাধা মনে করে সমাধিতে শরীরটা ছেড়ে দেন। যেন ঘটটা ভেঙ্গে দেওয়া। ঠাকুর বেশ একটা দৃষ্টান্ত দিতেন—'দশটা সরায় জল আছে, তাতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে।

এক একটা করে সরা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে শেষে একটি সরা ও একটি সূর্য্য রইল। সেটাও ভেঙ্গে দিতে যা রইল, তাই রইল—সত্য সূর্য্য রইল এ কথাও বলা চলে না। কে তখন বলবে ?'

অধ্যাত্ম-আলোচনার প্রসঙ্গে একদিন তরুণ সাধকদের তিনি বলিলেন, "ঠিক পাকা বিশ্বাস, সেটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি না হলে হয় না। একবার যদি তাঁর দর্শন হয়, অনুভূতি হয়, তবেই ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়। তার পূর্বে সেই বিশ্বাসের খুব কাছাকাছি একটা হয়। খুব জোর করে বিশ্বাস আনতে হয়। আর বারে বারে এই রকম করতে করতে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। অবিশ্বাস করতে নেই। যখন সন্দেহ উপস্থিত হবে, তখন ভাবতে হয়—ভগবান সত্য ; আমার অদৃষ্টদোষে, আমার অশুভ সংস্কারের ফলে তাঁকে বুঝতে পারছি না। যখন তাঁর কৃপা হবে তখন হবে।

"এই মন কি তাঁর ধারণা করতে পারে ? তিনি যে এই মনবুদ্ধির অনেক দূরে। এই যে সৃষ্টিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো মনের রাজত্ব ? মনই হলো এর কর্ত্তা। এই সব হচ্ছে মনেরই সৃষ্টি। এর পারে ওর যাবার জো নেই। ভগবানের নাম করতে করতে আর একটি সূক্ষ্ম মন জন্মায়। সেই মন এখন ক্ষুদ্র জীবাণুরূপে সকলেরই ভিতর রয়েছে, সাধনার দ্বারা সেই মন যখন বিকাশ লাভ করে তখন নানারকম সূক্ষ্ম অনুভূতি হয়। সেও ফাইনাল বা চরম কিছু নয়। এই সূক্ষ্ম মনও পরমাত্মার কাছ পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারে না, জগতের আর কিছু ভাল লাগে না। কেবল ভগবদ্‌ভাবে বুঁদ হয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়।

"তারপরে সমাধি। সে অবস্থা বর্ণনা করা যায় না, অস্তি-নাস্তির পার। সেখানে সুখ নেই, দুঃখ নেই, আনন্দ নেই, নিরানন্দ নেই, আলো নেই, আঁধার নেই—কি যে আছে মুখে বলা যায় না।"[১]

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ : কথোপকথন

এক ভক্ত সেদিন প্রশ্ন করেন, "মহারাজ, সাধন পথের শেষে তো আনন্দের স্রোত সদাই প্রবাহিত হচ্ছে, তাই না ?"

উত্তরে ব্রহ্মানন্দ বলেন, "আনন্দের কথা কি বলছো ? সেখানে আনন্দ-নিরানন্দ কিছুই নেই, সুখ-দুঃখ কিছুই নেই, ভাব-অভাব কিছুই নেই। আনন্দ তো সাধন অবস্থার কথা। তোমার নৌকাখানি যতক্ষণ লক্ষ্যস্থলে না পৌঁছায় ততক্ষণ অনুকূল বাতাস দরকার। পৌঁছে গেলে আর বাতাস-টাতাস দরকার নেই। আনন্দ ঐ অনুকূল বাতাসের মতো খুব সাহায্য করে। জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, সব লয় হয়ে যায়। শাস্ত্রে শুধ্ ঐ পর্যন্ত বলেছে। কিন্তু কি জান তারপর যা আছে তা আর বলতে পারে না। সাধন করলে সে সব নিজের অনুভব হয়। স্বয়ংবেদ্য হচ্ছে সেই ভূমা বস্তু। সেখানে কোন অভাব নেই, কোন ভয় নেই - শুধু ভাবলেই মনটা উঁচু হয়ে যায়। কি মজার জিনিস! কেউ কেউ নিত্য আর লীলা—এই দুটোই দেখেন।

"নিত্যে পৌঁছে তারপরে তো লীলা"—এ প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বলিলেন--"তার কিছু মানে নেই, দুই-ই বটে। রাসলীলা যখন হচ্ছিল, তখন এক সখী আর এক সখীকে বলেছিল, সখি, বেদান্ত-সিদ্ধান্তো নৃত্যতি। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত কি না সেই পরব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। এখানে নিত্য আর লীলা এক। আর একটা আছে নিত্যলীলা দুইয়েরই পার।"

সাধনজীবনে মন্ত্র ও গুরুকরণের আবশ্যকতা সম্পর্কে তাঁহার মতবাদ ছিল অতিশয় স্পষ্ট—"মন্ত্র না নিলে একাগ্রতা আসে না। আজ হয়তো তোমার কালীরূপ ভাল লাগল, আবার কাল হরিরূপ ভাল লাগল, পরশু নিরাকারে মন হলো—ফলে কোনোটাতেই একাগ্রতা হবে না। মন স্থির না হলে ভগবান লাভ ত দূরের কথা, সাধারণ সাংসারিক কাজের মধ্যেও অনেক কিছু গোলমাল হবে।

ভগবান লাভ করতে হলে গুরুর একান্ত দরকার। গুরু তাঁর শিষ্যের ভাবানুযায়ী মন্ত্র ও ইষ্ট ঠিক করে দেন। সেই গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে নিষ্ঠার সহিত সাধন-ভজন না করলে কিছুতেই কিছু হবে না। ধর্ম্মপথ অতি দুর্গম। সিদ্ধগুরুর আশ্রয় না হলে যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, যতই চেষ্টা করুক না কেন, হোঁচট খেয়ে পড়তেই হবে। চুরি করতে পর্য্যন্ত একজন গুরুর দরকার হয়। আর এতবড় ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে গুরুর দরকার নেই ?"

সাধনা, সিদ্ধি ও ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এক মুমুক্ষু ভক্তকে ব্রহ্মানন্দ সেদিন বলিতেছেন, "মনের আসক্তি ত্যাগই ত্যাগ। হাজার জিনিস আসুক না কেন, আসক্তি না থাকলে কিছুই নয়। আবার কিছুই নেই কিন্তু আসক্তি থাকলে সবই রইল। সাধনার দ্বারা মনটাকে নির্ম্মল করতে হয়। তা না হলে ভগবানের আসন পড়ে না। চাই চেষ্টা, চাই সংগ্রাম। সংগ্রাম করবার প্রবৃত্তি যার আসেনি সেতো মৃত। বুক পেতে এই সংগ্রাম বরণ করে নিতে হবে তার পরের অবস্থা হচ্ছে শান্তি। সব চেয়ে সহজ সাধন—সর্বদা তাঁর স্মরণ-মনন। তাঁকে আপনার বলে জানতে হবে। বাইরে যেমন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ানো, পরানো এবং তাদের সঙ্গে আলাপ ব্যবহারাদি করা, মনোরাজ্যেও যখন এইরূপ হবে, অর্থাৎ সেই রাজ্যেও যখন আলাপ ব্যবহারাদি হবে তখনই শান্তি।

"তাঁর কার্য কি বুঝা যায় ? অনন্ত অথচ শান্ত। মানুষেও তিনি আসেন। কাকভূষণ্ডী প্রথম প্রথম রামচন্দ্রকে মানুষ বলে ধারণা করে ত্রিলোকের কোথাও স্থান পেলে না। পরে তাঁর কৃপায় তাঁকে ভগবান বলে বুঝলে ও স্তবস্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করলে। ভগবান কাকে কোন্ পথ দিয়ে নিয়ে যান তা বুদ্ধির অগম্য। তিনি কখনও সুগম পথ দিয়ে, কখনও কাঁটার মধ্যে দিয়ে, কখনও দুর্গম পাহাড়-পর্বতের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যান। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।"

সে-বার এক জিজ্ঞাসু সাধকের প্রশ্নের উত্তরে ধ্যান এবং ধ্যানলব্ধ অনুভূতি সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলেন, "ধ্যানাদিতে কেবল যে মনের শান্তি হয় তা নয়। ওতে শরীরেরও উন্নতি হয়, ব্যারাম-স্যারাম কম হয়। শরীরের উন্নতির জন্যও ধ্যানাদি করা উচিত।

"প্রথম প্রথম ধ্যানও মনের সঙ্গে যুদ্ধ। দোলায়মান মনকে ক্রমাগত টেনে এনে ইষ্টপাদপদ্মে লাগাতে হয়। এতে কিছুক্ষণ পরে একটু মাথা গরম হয়। এজন্য প্রথম প্রথম বেশী ধ্যান-ধারণা করে মস্তিষ্ককে খুব বেশী খাটাতে নেই, খুব আস্তে আস্তে বাড়াতে হয়। কিছুদিন এরূপ অভ্যাসের ফলে যখন ঠিক ঠিক ধ্যান হবে তখন এক আসনে বসে দুই-চার ঘণ্টা ধ্যান-ধারণা করলেও কোন কষ্ট হবে না বরং সুষুপ্তির পর শরীর ও মন যেরূপ সতেজ ও স্বচ্ছন্দ হয়, সেরূপ বোধ হবে, আর ভিতরে খুব আনন্দ অনুভব হতে থাকবে।

"দেহটা যেন মন্দির, ঠাকুর তাতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। ধ্যান করতে করতে মন যখন স্থির হবে তখন যেখানে ইচ্ছা ইষ্টদর্শন হবে। পার্শ্বে, হৃদয়ে, পশ্চাতে বাহিরে সবখানেই ধ্যান করা যায়। ধ্যান করতে করতে প্রথমে জ্যোতি দর্শন হয়, কিন্তু ঐরূপ জ্যোতি দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বা একটু পরেই একটা নিবিড় আনন্দ আসে, তা ছেড়ে মন এগুতে চায় না। তারপর জ্যোতির্ঘন-দর্শন, তখন মন তাতে তন্ময় হয়ে যায়। কখনও কখনও বা দীর্ঘ প্রণব ধ্বনি শুনতে শুনতেও মন তন্ময় হয়। দর্শন, অনুভূতির রাজ্য এর কি ইতি আছে? যত এগোও অনন্ত! অনন্ত! অনেকে একটু জ্যোতিঃ-টোতি দেখে মনে ভাবে এই শেষ—তা নয়! যেখানে গিয়ে মনের বিকল্প শেষ হয়, কেউ কেউ বলেন ঐখানেই শেষ। আবার কেউ কেউ বলেন, ঐখান থেকেই আরম্ভ[১]।"

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ

ভগবান লাভ না হইলে মানবজীবন সফল হয় না, বন্ধ্যা বলিয়া গণ্য হয়। এ সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "ভগবান লাভের জন্ম তিনটি জিনিসের দরকার। প্রথম মনুষ্য জন্ম, দ্বিতীয় মুক্তির কামনা তৃতীয় মহাপুরুষের আশ্রয়। ভগবানের কৃপায় মনুষ্য জন্ম পেয়েছ, সৎসঙ্গও লাভ করেছ, মুক্ত হবার বাসনাও জেগেছে, এখন জীবনটাকে এমনভাবে গড়ে তোল যেন এই জন্মটা বৃথা না যায়। কি হবে ক্ষণস্থায়ী ভোগের পিছনে দৌড়ে? অনন্তের অধিকারী হও। আর একটা কথা মনে রেখো. মনুষ্যজন্ম আবার হয়তো হবে, মুক্তির বাসনা পরজীবনে আবার হয়তো আসবে, কিন্তু এবারের মতো সাধুসঙ্গ বার বার পাবে না। সব সময় মহাপুরুষের-সঙ্গ ভাগ্যে জোটা বড় দুর্লভ। জন্ম-জন্মান্তরের অনেক সুকৃতি ও তপস্যার ফলে এই সুযোগ হয়। ভাগ্যফলে যখন ঠাকুরের গণ্ডির ভিতর এসে পড়েছ, দেখো যেন জীবনটা গোলমালে কেটে না যায়।

"বিশ্বাস, বিশ্বাস, কেবল বিশ্বাস চাই! গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে পড়ে থাক। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে পড়ে থাকলে সব হয়ে যাবে। গুরুবাক্যে যদি বিশ্বাস না থাকে শুধু মন্ত্রে-তন্ত্রে কিছু হবে না! বেড়ালের ছানার মতো পড়ে থাক। গুরু যখন যা দরকার করিয়ে নেবেন। নিজে তুমি কতটুকু বোঝ? তাঁর উপর ভার দিয়ে পড়ে থাক। যাঁকে ভার দিয়েছ, তাঁর একটা দায়িত্ববোধ আছে। তিনি তোমার নিজের চাইতে তোমার বিষয় ঢের বেশী ভাবেন। ষোল আনা তাঁতে নির্ভর কর, তিনি সকল আপদ-বিপদ থেকে তোমায় রক্ষা করবেন। এ জগতে কারও সাধ্য নেই গুরু আশ্রিত শিষ্যের অনিষ্ট করে। গুরুর কৃপায় তার চতুর্দিকে লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা। জীবনে অনেক ভুল হবার সম্ভাবনা, যতক্ষণ না ভগবান লাভ হয়। গুরুকে আশ্রয় করে থাকলে ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। আলের উপর দিয়ে বাপ-বেটায় যাবার ঠাকুরের সেই গল্পটি মনে আছে তো? বাপ ছেলের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে না। ছেলে বাপের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে। সদ্‌গুরুর আশ্রয় যারা পেয়েছে, তারা

যদি তাঁকে আশ্রয় করে পড়ে থাকে তবে তিনিই তাঁদের ভুলভ্রান্তি সব শুধরে নেবেন।"

গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া কহিতেন, "ঠাকুর বলতেন—'সদ্‌গুরু হলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে যায়।" গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। কাঁচা গুরুর হাতে পড়লে শিষ্যের অহঙ্কার যায় না, সংস্কার-বন্ধন ঘোচে না। যারা ঈশ্বরলাভ করেনি, তাঁর আদর্শ পায়নি, তাঁর শক্তিতে শক্তিমান্ হয়নি, তাদের সাধ্য কি যে অপরের সংসার বন্ধন মোচন করে? কানা কানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলে হিতে বিপরীত হয়। নিজে মুক্ত হলেই তবে অপরকে মুক্ত করা যায়—সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যায়।

"যদি কারো ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে, সাধনভজন করবার ইচ্ছে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন। গুরু লাভের জন্য সাধকের চিন্তা করবার কোন দরকার নেই। যাদের সদ্‌গুরু লাভ হয়েছে তাদের আর ভাবনা কি? রাস্তা তো তারা পেয়েছে। সে রাস্তা ধরে এখন তারা চলুক।

সাধনা, সিদ্ধি ও ঈশ্বরীয় কর্ম্ম, সর্ব্ব দিক দিয়াই ব্রহ্মানন্দ ছিলেন একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ। একাধারে তিনি ছিলেন আপ্তকাম সাধক, দরদী আচার্য্য এবং মঠ ও মিশনের সংগ্রামকুশল অধিনায়ক। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত জীবনের এই বহুমুখী সাফল্যের কথাটি প্রত্যক্ষদর্শী, ভক্ত সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসুর লেখনীতে বড় সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।[১] তিনি লিখিয়াছেন, "মহারাজ অমিত ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার বহুমুখী শক্তি বর্ষার বারিধারার ন্যায় শতমুখে প্রবাহিত হইত। কিন্তু এত তেজ, এত শক্তি কিরূপে যে মৃন্ময় আধারে এত শান্ত হইয়া থাকিত, তাহার সন্ধান কেহ জানিত না।

১ ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ: পরিচয়—দেবেন্দ্রনাথ বসু

বিদ্যুৎবাহী তার দেখিতে নির্জীব, কিন্তু স্পর্শ করিলে জানা যায় কি অমোঘ শক্তি তাহাতে নিহিত! শুনিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীর মৃন্ময় নয়—চিন্ময়। কিন্তু এই চিন্ময় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সে তথ্য সহজে বুঝা যাইত না। কি অলৌকিক ভালবাসায় তিনি সকলকে ভুলাইয়া রাখিতেন। সাধু, ভক্ত বা ব্রহ্মচারী নির্ম্মল চিত্ত লইয়া অথবা ব্যথিত, তাপিত, পতিত, কলঙ্কিত জীবনের বোঝা বহিয়া যে-কেহ এই পুরুষোত্তমের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, তিনিই অন্তরে অন্তরে এই সত্যটি অনুভব করিয়াছেন—তিনিই দেখিয়াছেন, যাহাকে সম্ভাষণ করিতে মন সঙ্কুচিত হয় সেই অনাদৃত জনকে মহারাজ কি আদরে আপ্যায়িত করিতেছেন। আত্মীয়স্বজন যাহার নাম শুনিতে কুণ্ঠাবোধ করে, কি স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে মহারাজ তাদের তত্ত্ব লইতেছেন। যে অভাগা সর্ব্বজন পরিত্যক্ত, কি মমতায় মহারাজ তাহাকে বাঁধিয়াছেন। যার কোথাও স্থান নাই, মহারাজের দ্বার তাহার জন্য চির উন্মুক্ত।

"এই উদার বিশ্বপ্রেমের অমৃত-আস্বাদ পাইয়া কেহ ধারণা করিতে পারিত না যে, এই নিশ্চিন্ত শান্ত শিবময় পুরুষের কি মহান্ ত্যাগ, কঠোর বৈরাগ্য, অপরিমেয় তিতিক্ষা, কি জ্ঞান ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম্মানুরক্তি সংসার-মোহ-হারিণী এক মহাশক্তির উদ্বোধনের জন্য নিরুদ্বেগ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া থাকিত! ভিক্ষু তাঁহার অপ্রত্যাশিত করুণায় কৃতার্থ হইয়া ফিরিত; জ্ঞানী জ্ঞানচর্চ্চায় তাঁহার ইতি করিতে পারিত না; ভক্ত সে ভক্তিসিন্ধু সন্তরণ করিয়া পার পাইত না; কর্ম্মী কর্ম্মকৌশলে তাঁহার কাছে হার মানিত; সংশয়ী বিশ্বাসের বল পাইত; সংসারী সংসারধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিত; রসিক তাঁহার রসস্ফূর্ত্তিতে মহাহাস্যধারায় হাবুডুবু খাইত; সাধক তাঁহার কাছে সাধনার উচ্চতত্ত্ব লাভ করিয়া চরিতার্থ হইত; তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া হতাশ চিত্ত উৎসাহে, ভগ্ন হৃদয় আশার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিত, অথচ এই মহারাজ বালকের সঙ্গে যেন বালকটি হইয়াই খেলা করিতেন।

"মহারাজ যে মহারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন সেথায় দুঃখ, দৈন্য, শোকের প্রবেশ অধিকার ছিল না; রিপুদল সেখানে বল প্রকাশ করিতে পারিত না। সে রাজ্যের যাঁহারা প্রজা—মহারাজের অমায়িক ব্যবহারে তাঁহারা ভাবিতেন, আমি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, অথচ আপন আপন অধিকার-সীমা লঙ্ঘন করিয়া প্রশ্রয় লইতে কেহ কখন সাহসী হইতেন না। এ রাজ্যে প্রবেশ করিলে মনে হইত সংসারের বহু উর্দ্ধে কোন্ এক অত্যাশ্চর্য আনন্দময় লোকে আসিয়াছি—যেখানে দ্বেষ দেশছাড়া, দ্বন্দ্ব স্পন্দনহীন, তাঁর আনন্দ অবাধ।"

সে-বার কাশীধামে অবস্থান করার সময় স্বামী বিবেকানন্দ গুরুতরভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন। সারা শরীরে শোথ দেখা দেয়, ডাক্তারেরা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া উঠেন।

বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে। তিনি স্থির করেন, কলিকাতায় আনিয়া স্বামীজীর চিকিৎসা করানো হইবে। অবিলম্বে স্বামীজীকে বেলুড় মঠে নিয়া আসা হয় এবং অভিজ্ঞ কবিরাজের তত্ত্বাবধানে তাঁহার চিকিৎসা চলিতে থাকে। এ সময়ে ব্রহ্মানন্দ গুরুভাই ও তরুণ ব্রহ্মচারীদের বলিতেন, "তোমরা সবাই প্রাণপণে স্বামীজীর সেবা-যত্ন কর, তাঁকে সুস্থ করে তোল। স্বামীজী আমাদের সব চাইতে বড় অবলম্বন।"

স্বামীজীর সেবা-পরিচর্য্যায় ব্রহ্মানন্দ নিজেও একান্তভাবে তাঁহার প্রাণ-মন ঢালিয়া দেন। এসময়ে দিনরাত রোগীর শয্যার পাশে চিন্তাকুল হইয়া তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। ক্রমে স্বামীজী কিছুটা সুস্থ হইয়া উঠেন, গুরুভাইরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন এবং ব্রহ্মানন্দের মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার আভা। এ সময়ে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে বলিতে শোনা যায়, "স্বামীজীর এই পীড়ার সময় কি ব্যস্ততা আর উদ্বেগেই না দিন কেটেছে। মনে হচ্ছে ঠাকুরের পীড়ার সময়ও এত সেবা করতে পারি নি।"

স্বামীজীর ভগ্নস্বাস্থ্য আর জোড়া লাগে নাই, কয়েকমাসের মধ্যেই আবার দেখা দেয় এক দারুণ সঙ্কট। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে তিনি মরধাম চিরতরে ত্যাগ করিয়া যান। ভক্ত ও গুরু-ভাইদের হৃদয়ে নামিয়া আসে বিষাদের অন্ধকার।

প্রিয়তম গুরুভাই, গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধানতম লীলাপার্ষদ বিবেকানন্দের শোকে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ উন্মত্তের মতো হইয়া যান. স্বামীজীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তিনি ক্রন্দন করিতে থাকেন। শোকের বেগ কিছুটা প্রশমিত হইলে মহারাজকে সাশ্রুনয়নে বলিতে শোনা যায়,—"সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড়টা আজ অদৃশ্য হয়ে গেল।"

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারা এসময়ে দিকে দিকে বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করিয়া তরুণ ছাত্রসমাজে সেবাধর্মের একটা জোয়ার বহিয়া যায়। আর্ত্তত্রাণ, নিরক্ষরদের শিক্ষাদান, আর বন্যা-দুর্ভিক্ষের সঙ্কটে দেশের তারুণ্য শক্তি রামকৃষ্ণ মিশনের নেতৃত্বে অগ্রসর হইয়া আসে। সারা ভারতের জনজীবনে ইহার প্রভাব অনুভূত হয়।

মঠ ও মিশনের বিস্তার সাধিত হইতেছে আর ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্ব-শক্তিও হইতেছে দূরবিস্তারী। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণীবহরূপে, জীবন্ত ভাষ্যরূপে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

যুবক ভক্ত ও ব্রহ্মচারীদের কাছে ব্রহ্মানন্দের প্রথম ও শেষ কথা ছিল কর্ম্ম ও উপাসনার যুগ্ম সাধনা। প্রায়ই বলিতেন, "রামকৃষ্ণ-ভক্তদের সেবাধর্ম্ম মানুষের বা জীবের সেবা নয়, এটা হচ্ছে জীবন্ত ভগবানের পূজা—প্রেমে ও ভক্তিতে জীবরূপী নারায়ণের সেবা।"

ব্রহ্মানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ-রসের ঘনীভূত বিগ্রহ। মঠ মিশনের কাজে যখন যেখানে তিনি উপস্থিত হইতেন ভক্ত ও সেবকদের অন্তরে, নবাগত জিজ্ঞাসু তরুণদের অন্তরে জাগিয়া উঠিত আনন্দের

স্রোতধারা। মহারাজের প্রেম বিহ্বলতার স্মৃতি চিরতরে তাহাদের মনে অঙ্কিত হইয়া যাইত। ঐশ্বরীয় ভাবে তাহারা উদ্দীপিত হইয়া উঠিত।

মহারাজের প্রাণঢালা ভালবাসাই ছিল তরুণ কর্ম্মীদের এবং সমগ্র রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরই সেবা ও উপাসনার এক বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিতে তিনি সক্ষম হন। "সকল প্রকার কাজকর্ম্ম ও জাগতিক ব্যাপারের উর্দ্ধে অতীন্দ্রিয় উচ্চ ভাবভূমিতে নিয়ত অবস্থান করিয়াও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে তিনি দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন করিয়াছিলেন। এইরূপ পরমহংসের ন্যায় বিরাজ করিয়াই তিনি সঙ্ঘের বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন। মঠ ও মিশনের যাবতীয় সদনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান এবং জনহিতকর কার্য্যের প্রেরণার মূলে থাকিয়াও তিনি ছিলেন অনাসক্ত, একক, নির্দ্বন্দ্ব এবং সমাহিত। বালকবৎ কোমল, সরল ও আনন্দময় হইয়াও তিনি ছিলেন প্রশান্ত, অচঞ্চল এবং গম্ভীর। এই অপূর্ব্ব দিব্যভাবেই আধ্যাত্মিক তরঙ্গের প্রবাহে তিনি নীরবে সঙ্ঘের সম্প্রসারণ করিয়াছিলেন[১]।"

বঙ্গভঙ্গের পর সারা দেশে একটা বিরাট রাজনৈতিক আলোড়ন দেখা দেয়। রাজনৈতিক মুক্তি-সাধন এবং ভারতীয় ধর্ম্মসংস্কৃতির উজ্জীবন সাধনের জন্য শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ জাগিয়া উঠে। এই সময়ে বিশেষ করিয়া বিবেকানন্দের ভাবধারা দেশের সর্ব্বত্র বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে; দলে দলে যুবক কর্ম্মী ও মুমুক্ষুরা রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনে ভীড় করিতে থাকে। রামকৃষ্ণের ধারক ও বাহক ব্রহ্মানন্দের বাণী ও দিব্য সান্নিধ্য এইসময়ে অনেকের জীবনকে রূপান্তরিত করে।

কিছুসংখ্যক প্রাক্তন বিপ্লবী ও রাজরোষে পতিত রাজনৈতিক কর্ম্মীও এই সময়ে সাধনপ্রয়াসী হন এবং ব্রহ্মানন্দের শরণ নেন। বিদেশী শাসকদের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করিয়া মহারাজ মঠে

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন কর্ত্তৃক প্রকাশিত

তাঁহাদের আশ্রয় দেন, পরমার্থ লাভের সুযোগ পাইয়া তাঁহারা ধন্য হয়।

নবাগত সাধনার্থী ও কর্ম্মীদের মহারাজ বলিতেন, "ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখলে মনের একটা শক্তি জন্মে। বারো আনা মন ভগবানের দিকে রেখে, চার আনায় জগতের কাজ ভেসে যায়।"

ত্যাগ বৈরাগ্য ও সাধনের সঙ্কল্প স্থির থাকিলে এবং ঈশ্বরের আশ্রয় নিলে সাধনার সমস্ত কিছু সুযোগ, সুযোগ ঈশ্বর নিজেই পুরাইয়া দেন। ঈশ্বরের ধারক বাহক জীবন্ত মহাপুরুষেরাই শুধু নয়, সূক্ষ্মদেহী বিদেহী মহাপুরুষেরাও সাধনপথে সাধকদের নানাভাবে সাহায্য করেন। এই সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ তাহার নিজ জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা মাঝে মাঝে বলিতেন।

একবার তিনি বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। সে সময়ে রাত বারোটায় ঘুম হইতে উঠিয়া জপ-ধ্যানে নিবিষ্ট হইবার অভ্যাস তাহার ছিল। জপ করার সময় প্রায়ই চোখে পড়িত এক অলৌকিক দৃশ্য। কক্ষের দ্বার রুদ্ধ। কিন্তু, দেখা যাইত, এক সৌম্যমূর্ত্তি বৈষ্ণব বাবাজী জপের মালা হাতে নিয়া শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রহ্মানন্দ বুঝিতেন, কোন সূক্ষ্মদেহী মহাত্মা তাঁহাকে আশ্বাস ও প্রেরণা দিবার জন্যই রোজ প্রভাতে আবির্ভূত হইতেছেন।

একদিন শরীর বড় ক্লান্ত ছিল, অভ্যাসমতো বারোটার প্রাক্কালে ব্রহ্মানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। এমন সময়ে কে যেন তাঁহাকে ধাক্কা মারিয়া জাগাইয়া দিল। চোখ মেলিতেই দেখিলেন, সেই বিদেহী বাবাজী স্মিতহাস্যে শয্যার পাশে দণ্ডায়মান, জপমালাটি প্রসারিত করিয়া ব্রহ্মানন্দকে ইঙ্গিত করিতেছেন জপে বসিবার জন্য।

ভগবান লাভে বদ্ধপরিকর সাধুদের জন্য সাহায্য এমনিভাবে ভগবৎ কৃপায় জাগতিক ও সূক্ষ্ম স্তর হইতে নামিয়া আসে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের চেষ্টায় ও যত্নে মাদ্রাজের মঠ তখন দৃঢ়

ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা, মঠনায়ক ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একবার সেখানে পদার্পণ করেন। মহারাজের আগমনের প্রাক্কালে রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ মঠের সাধু ও কর্মীদের ডাকিয়া কহিলেন, "একথাটি তোমরা সবাই স্মরণ রেখো স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের নিজের সন্তান। তোমরা তাঁকে যখন দর্শন করবে তখন ঠাকুর কেমন ছিলেন তার কতকটা আভাস পাবে। ব্রহ্মানন্দের অহংটি সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে। যা তিনি বলেন, যা তিনি করেন তা ঠাকুরের প্রেরণায়। ঠাকুর তাকে ঠিক নিজের ছেলের মতোই দেখতেন। তিনি ঠাকুরের ঘরেই শুতেন, কখনো কখনো এক মশারীর ভেতরেই থাকতেন। রাখালের পরিধানে কোন ছিন্ন বস্ত্র দেখলে তিনি কেঁদে ফেলতেন আর চেঁচিয়ে বলতেন, 'রাখালকে নূতন কাপড় দেবার কি কেউ নেই?' ঠাকুরের জন্য কেউ কোন ফল মিষ্টি বা খাবার জিনিষ আনলে অনেক সময় তিনি তাদের বলতেন, 'ও সব রাখালকে দাও - আমি তার মুখে খাই।' একদিন রাত্রে ঠাকুরের পিপাসা পায়। তিনি রাখালকে খাবার জল দিতে বল্লেন। রাখাল বিছানায় শুয়ে তন্দ্রার ঘোরে বিড়বিড় করে 'পারবো না' বলে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন। গুরু মহারাজের এতে আনন্দ যেন উথলে উঠল। পরের দিন তিনি আনন্দ করে সবাইকে এই ঘটনাটি আনুপূর্বিক উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'এখন বুঝেছি, রাখাল আমাকে ঠিক বাপ বলেই জানে।'

গুরুভাই ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের ধারণা ও মূল্যায়ন কি ছিল, এই ভাষণ হইতে তাহা উপলব্ধি করা যায়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাষায় রাখাল মহারাজ ছিলেন একটি বর্ণচোরা আম। সহজ সুন্দর অমায়িক আনন্দময় এই সাধকের ভিতরে যে গম্ভীর তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষটি বাস করিতেন তাহার সন্ধান অনেকের পক্ষেই পাওয়া কঠিন ছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে সে সময়ে ভক্ত-প্রবর গিরিশ ঘোষ এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "তুমি আমায় লিখিয়াছিলে, রাখালকে কেউ চিনিতে পারে না। আমার ধারণা,

যে ভাগ্যবান রাখালকে চিনিবে, সে সেইদিনই মহারাজের (ঠাকুর রামকৃষ্ণের) কৃপা প্রাপ্ত হইবে তাহার মনুষ্য জন্ম সফল।"

মাদ্রাজে মানাক্ষী মন্দির দর্শন কালে ব্রহ্মানন্দের যে দিব্য ভাবাবেশ হয় তাহার স্মৃতি স্থানীয় ভক্তদের হৃদয়ে দীর্ঘদিন জাগ্রত ছিল। দর্শনের দিন ভোরবেলা হইতে মহারাজ গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দকে বলিতে থাকেন, "মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাবের জোয়ার আসছে, যেন একটা কিছু আজ ঘটবে।"

মন্দিরের ভিতরে গিয়া দেবীমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ নীরব নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়েন, অতীন্দ্রিয় দর্শনের ফলে হারান তাঁহার বাহ্যজ্ঞান। গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার দেহটি বেষ্টন করিয়া থাকেন।

একঘণ্টা কাল ব্রহ্মানন্দের এই ধ্যানাবেশ চলিতে দেখা যায়, মন্দিরের তীর্থযাত্রী ও সাধু সন্ন্যাসীরা দিব্যভাবে বিভাবিত এই মহাপুরুষের দিকে সবিস্ময়ে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে শত শত লোক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধন্য হয়।

সেদিনকার ভাবাবেশ সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ ভক্তদের বলিয়াছিলেন, "যখন মন্দিরে বিগ্রহের সামনে দাঁড়ালাম তখন দেখলাম, জগন্মাতার বিগ্রহ যেন জীবন্ত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন— তাই তো অমন সংজ্ঞাহারা হয়ে গিয়েছিলাম।"

বাঙ্গালোরে মঠ স্থাপিত হওয়ার পর সে-বার স্বামী নির্ম্মলানন্দের আগ্রহাতিশয্যে ব্রহ্মানন্দ সেখানে গিয়া কিছুদিন অতিবাহিত করেন। তাঁহার উপস্থিতিতে আশ্রমে ও তাহার আশেপাশে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়, একটা অভূতপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ রচিত হয়।

এখানকার মুচি সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক ভক্ত রবিবারে মঠে আসিয়া কীর্ত্তন ও ভজনে অংশ গ্রহণ করিত। মহারাজ পরমানন্দে তাঁহাদের সহিত যোগ দিতেন, তাহারাও এই পুণ্যচরিত মহাত্মার

পদবন্দনা করিয়া ধন্য হইত। এই অস্পৃশ্য ভক্তদের আকর্ষণে মহারাজ একদিন তাহাদের পল্লীস্থিত ঠাকুরঘরে গিয়া উপস্থিত হন, সাধন-ভজনে উৎসাহ দান করিয়া এই মুচিদের আশীর্ব্বাদ করিয়া আসেন। তাঁহার এই প্রেমপূর্ণ মনোভাব ও সমদর্শিতা দেখিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও ভক্ত-সাধকেরা প্রেরণা লাভ করেন, অন্ত্যজদের প্রতি সংস্কারজাত যে বৈষম্যবোধ ও বিদ্বেষ ছিল তাহা অনেকটা দূরীভূত হয়।

এই মঠের কর্ম্মী ও সাধুদের আধ্যাত্মিক ভিত্তি যাহাতে দৃঢ় হয় এজন্য ব্রহ্মানন্দ সদাই তাহাদের উৎসাহিত করিতেন। কখনো কখনো মধ্য রাত্রে বা শেষ রাত্রে একজন লণ্ঠনধারী সেবককে সঙ্গে নিয়া নবীন সাধুদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেন, লক্ষ্য করিতেন জপতপে কাহারা রত, আর কাহারাই বা রহিয়াছে তামস ঘুমে অচেতন। পরের দিন ভোরবেলায় ছেলেরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিত, ক্ষুব্ধ গম্ভীর কণ্ঠে মহারাজ আলস্যপরায়ণ সাধুদের তীব্র তিরস্কার করিতেন—"এ কি কচ্ছিস্ তোরা? রাত্রিকাল সাধনের প্রশস্ত সময়। আর তোরা ঘুমিয়ে তা কাটিয়ে দিচ্ছিস্। এই জোয়ান বয়সে তোদের এত ঘুম? এখন যদি ভগবান লাভ করবার জন্য না খাটবি, তবে কবে আর তোদের সময় হবে? দিনের বেলা তো কাজকর্ম্মে গল্পে-সল্পে সময় কেটে যায়। তাঁকে ডাকবি কখন?"

স্বভাব গম্ভীর, শান্ত সমাহিত পুরুষ, ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ভিতরে বাস করিত একটি আনন্দময় বালক। এই বালকটি হঠাৎ এক একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিত, তখন আনন্দরঙ্গ ও হাস্য পরিহাসে মহারাজ চারিদিক মাতাইয়া তুলিতেন। তখন তাঁহার রকমসকম দেখিয়া কে ভাবিতে পারিত যে ইনিই রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের বহুভক্ত-সেবিত অধিনায়ক ব্রহ্মানন্দ মহারাজ।

মহারাজের রহস্যপ্রিয়তার একটি কাহিনী এখানে বর্ণিত হইতেছে। সেবার দূরদেশ হইতে এক গুরুভাই বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দের

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। কয়েক দিন পরমানন্দে মঠে অতিবাহিত করার পর তিনি জানান, এবার তাঁহাকে নিজের কর্ম্মকেন্দ্রে ফিরিতে হইবে, রাত্রির ট্রেনেই তিনি রওনা দিবেন।

অনেক দিন পরে গুরুভাইকে কাছে পাইয়াছেন, মহারাজের মন চাহিতেছে না যে তিনি চলিয়া যান। কহিলেন, "আরো দু'চার দিন থেকেই যাও না। কতকাল পরে দেখা।"

"তা কি করে হয়! সেখানে যে নানা জরুরী কাজ রয়েছে। আজই আমার যাওয়া অত্যন্ত দরকার।" গুরুভাইটি উত্তরে বলেন।

ব্রহ্মানন্দ চুপ করিয়া গেলেন। গুরুভাইকে ধরিয়া রাখার জন্য গোপনে আঁটিলেন এক ফন্দী। তখনকার দিনে বেলুড় মঠ হইতে স্টেশনে যাইতে হইলে পাল্কী নিতে হইত। রাতের বেলায় পাল্কী নিয়া বেহারারা হাজির, যাত্রার প্রাক্কালে মহারাজ তাহাদের নিভৃতে ডাকিয়া ফিসফিস করিয়া কি যেন বলিয়া দিলেন। পাল্কী চলিতে শুরু করিল, গুরুভাইটি ভিতরে পা ছড়াইয়া তন্দ্রায় ঢুলিতেছেন আর মাঝে মাঝে কানে আসিতেছে বাহকদের হুম্-হুম্ আওয়াজ। ক্রমে তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

অতি প্রত্যূষে দেখা গেল, বাহকেরা পাল্কীটি নিয়া মঠের মাঠেই বিচরণ করিতেছে. আর অবিরাম হুম্-হুম্ শব্দ করিয়া চলিয়াছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া স্মিতহাস্যে গুরুভাইটিকে অভ্যর্থনা জানাইলেন।

বুঝা গেল, বাহকেরা পাল্কীটি নিয়া মোটেই স্টেশনের দিকে যায় নাই। আরোহীটি ভিতর হইতে বাহকদের মুখের আওয়াজ শুনিয়া নিশ্চিন্তে শুইয়া ভাবিতেছিলেন, পাল্কী যথারীতি তাহাদের গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। তারপর কখন হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়েন। আসলে সারারাত তিনি মঠের ময়দানেই চক্কর খাইতেছেন। মহারাজের এই রসিকতায় তিনি একেবারে বোকা বনিয়া গেলেন, চারিদিক হইতে হাসির রোল উঠিল।

গুরুভাইটি উপলব্ধি করিলেন, ব্রহ্মানন্দের এই রসিকতার মধ্যে

লুক্কায়িত রহিয়াছে পুরাতন ও অন্তরঙ্গ সখাকে আরো দুই চারদিন কাছে ধরিয়া রাখার ব্যাকুলতা। তাই দুই চোখ তাঁহার আনন্দের অশ্রুতে ছলছল হইয়া উঠে।

সে-বার ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও প্রবীণ ভক্তেরা কিছুদিনের জন্য কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে আসিয়াছেন। বিশেষ করিয়া মহারাজের আগমনে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, নানা স্থান হইতে কর্ম্মী ও সাধুরা জমায়েত হইতেছেন। আশ্রম ও সেবায়তন দিন রাত আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ। মহারাজ তরুণ সাধুদের রোজ উৎসাহ দিতেছেন, "ক্ষেত্রের মধ্যে কাশীধাম শ্রেষ্ঠ। কাশীর মতো জায়গা নেই। কত সাধু ঋষি তপস্বী রাজর্ষির সাধনার ক্ষেত্র, সিদ্ধির স্থান। এখানে একটু জপ-ধ্যান করলেই জমে যায়।"

কখনো বা কাউকে বলিতেছেন, "খুব উঠে পড়ে লাগ্। এ এমন স্থান যে ধ্যান আপনা হতেই হয়। রাতদিন হর-হর বোম্-বোম্ শব্দ হচ্ছে। এখানকার হাওয়াই অন্যরকম। একটু করলেই হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়।

মা-সারদামণিও তখন কাশীতে রহিয়াছেন। একদিন ভক্তেরা পরম সমাদরে তাঁহাকে আশ্রম ও সেবায়তনে নিয়া আসিলেন।[১] পাল্কীতে করিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া তাঁহাকে সব দেখানো হইল। দেখিয়া শুনিয়া শ্রীমার আনন্দ আর ধরে না। তাঁহার নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তনের পর এক ভক্ত মায়ের পদবন্দনা করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "মা, কেমন দেখলেন আপনার ছেলেদের সেবাশ্রম।"

প্রশান্ত কণ্ঠে সারদামণি উত্তর দিলেন, "দেখলুম, ঠাকুর ওখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন। তাই এই সব কাজ হচ্ছে। এই সব যত কিছু তাঁরই কাজ।"

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা

ভক্তটি তখনি আশ্রমে গিয়া সোৎসাহে মহারাজকে মায়ের এই মন্তব্য জানাইয়া দিলেন। শিষ্য ও ভক্তেরা সবাই এ সংবাদে আনন্দে উৎফুল্ল। ঠাকুরের প্রবীণ ভক্ত, কথামৃতকার মহেন্দ্র গুপ্ত এসময়ে আশ্রমে আসিয়াছেন। রামকৃষ্ণ ভক্তদের মধ্যে একদল কহিতেন, 'ঠাকুরের উপদেশের সারমর্ম—প্রাণপণ প্রয়াসে ঈশ্বর লাভ কর। ত্রাণকার্য্য ও সেবাধর্ম্মের কথা কখনো তিনি বলেন নাই। এসব পরিকল্পনা এসেছে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে।' মহেন্দ্র গুপ্ত এই মতবাদীদের অন্যতম। ব্রহ্মানন্দ ও ঠাকুরের অন্যান্য শিষ্য-ভক্তেরা তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন। কহিলেন, "মাষ্টারমশাই, মা'র কথা শুনেছেন তো? এখন আর না মানলে চলবে না যে ঠাকুরের সম্মতি আছে সেবাকর্ম্মে। মা এই সেবাশ্রমে ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করলেন। মা বলেছেন এ তাঁরই শ্রীমুখের কথা।"

মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সহাস্যে কহিলেন, "তা বটেই তো। আর এসব অস্বীকার করবার জো নেই।"

ব্রহ্মানন্দ-স্বামী বালকের মতো আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। স্বামীজীর আহ্বানে কর্ম্ম ও উপাসনার যে তত্ত্ব তাঁহারা প্রচার করিয়া চলিয়াছেন সে তত্ত্বের বিপুল সমর্থন যেন তিনি আদায় করিয়া ছাড়িলেন।

কাশীতে মা-সারদামণি অদ্বৈত আশ্রমের নিকট এক ভক্তের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। ব্রহ্মানন্দ প্রতিদিনই সেখানে মা'কে দর্শন করিতে যাইতেন। নীচতলায় দাঁড়াইয়া এই দর্শনকার্য্য চলিত। এক-একদিন বালকের মতো হাসি গানে তিনি মাতিয়া উঠিতেন, আর উপর হইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মা আনন্দ উপভোগ করিতেন।

মায়ের কাছে দর্শনার্থীদের নানা আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উত্থাপিত হইত। কোন কোনটির সমাধান তিনি নিজেই করিতেন, কখনো বা বলিতেন, "রাখালের কাছ থেকে এর উত্তর জেনে নিও।" কোন কোন মুমুক্ষু ভক্তকে গৈরিক দিয়া মা নির্দ্দেশ দিতেন, "এবার রাখালের কাছ থেকে সন্ন্যাস নিও।"

একদিন মাতৃ দর্শনের জন্য ব্রহ্মানন্দ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। আশেপাশে আরো কয়েকজন উপস্থিত। মায়ের সেবিকা গোলাপ-মা দোতলা হইতে ডাকিয়া বলেন, "রাখাল, মা জিজ্ঞেস করছেন, আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?"

ব্রহ্মানন্দ যুক্তকরে উত্তর দেন, "মার কাছেই যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে আর উপায় নেই।"

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহে মনে এক দিব্যভাবের তরঙ্গ খেলিয়া যায়। পরমানন্দে উদাত্ত স্বরে তিনি গান ধরেন :

শঙ্করী-চরণে মন মগ্ন হয়ে রওরে।
মগ্ন হয়ে রওরে সব যন্ত্রণা এড়াওরে।
এ তিন সংসার মিছে, মিছে ভ্রমিয়ে বেড়াওরে।
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধেয়াও রে।
কমলাকান্তের বাণী শ্যামা মায়ের গুণ গাওরে।
এতো সুখের নদী নিরবধি ধীরে ধীরে বাওরে।

ভাবাবেশে মত্ত মহারাজ বালকের মতো নাচিয়া নাচিয়া করতালি দিয়া গানটি শেষ করেন। তারপর হো-হো-হো শব্দে অট্টহাস্য করিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলায়ন করেন।

মা-সারদামণি এতক্ষণ অলিন্দ হইতে এই স্বর্গীয় দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলেন। বালক ভাবে বিভাবিত তনয়ের এই আনন্দরঙ্গ দেখিয়া অন্তর তাঁহার অপার প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল।

বেলুড় মঠে আর একদিন মা-সারদামণির সম্মুখে ব্রহ্মানন্দ যেরূপ দিব্যভাবে আবিষ্ট হন, তাঁহার স্মৃতিও সেবকদের মনে দীর্ঘকাল জাগরূক ছিল।

মঠ প্রাঙ্গণে কালীকীর্তন হইতেছে, লোকে লোকারণ্য। শ্রীমা উপরের ঘরে বসিয়া কীর্তন শুনিতেছেন। প্রেমানন্দ স্বামী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মহারাজকে কীর্তনের আসরে ধরিয়া নিয়া বসাইলেন। ক্ষণপরেই দেখা গেল, ভাবতরঙ্গে উদ্বেল হইয়া মহারাজ নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছেন। ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হইল তিরোহিত।

ভক্তেরা প্রমাদ গণিলেন। অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে কীর্ত্তন আসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া বসানো হইল মঠবাড়ীর নিম্নতলের এক কক্ষে।

মহারাজ স্থাণুবৎ নিশ্চল নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া আছেন। বাহ্য চেতনার কোন চিহ্ন নাই। সেবকদের বহু ডাকাডাকিতেও তাঁহার হুঁস আসিতেছে না।

মা-সারদামণি মঠে আসিবেন, তাই মহারাজ ভোর হইতে রহিয়াছেন উপবাসী। দীর্ঘসময় ভাবাবিষ্ট থাকার পরও তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতেছে না দেখিয়া প্রবীণ গুরুভাইরা শঙ্কিত হইলেন।

এ সংবাদ মাকে জানানো হইল। তাঁহার চোখে মুখে প্রসন্নতার আভা, কহিলেন, "সেজন্য ভেবো না। নাও—এই প্রসাদ রাখালকে গিয়ে দাও।"

মায়ের প্রসাদ সামনে রাখিয়া অনেকবার উচ্চ স্বরে ডাকাডাকি করা হইল, কিন্তু ধ্যানস্থ ব্রহ্মানন্দের কানে কোন কথাই পৌঁছিল না। নিমীলিত নয়নে, ঋজু হইয়া তিনি বসিয়া আছেন, মুখমণ্ডল দিব্য আনন্দের ছটায় উজ্জ্বল। এই বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার যেন আর কোন যোগাযোগ নাই।

মা-সারদামণি এবার ধীরপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। ব্রহ্মানন্দের বাহু স্পর্শ করিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে কহেন, "ও রাখাল, এই যে আমি প্রসাদ দিয়েছি, তুমি খাও।"

সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের বাহ্য-চেতনা ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়। রোমাঞ্চিত কলেবরে মায়ের চরণ বন্দনা করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন, তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে।

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের বালকবৎ ভাব ও প্রেমঘন অন্তর্লীন অবস্থার উল্লেখ করিয়া স্বামী সারদানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, "আমাদের মধ্যে একমাত্র মহারাজের ভেতরেই ঠাকুরের পরমহংস অবস্থার

হাবভাব, চালচলন দেখতে পাওয়া যায়। মহারাজকে পেছন থেকে দেখলে তো ঠাকুর বলেই মনে হত।"

ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন বহুভাবের প্রমূর্ত্ত রূপ। কর্ম্ম, জ্ঞান ও প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ দেখা যাইত তাঁহার মহাজীবনে। "কোন্ সময়ে কোন্ ভাবের স্ফুরণ হইবে তাহা বাহির হইতে দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না। অনুভূতির বিশাল রাজ্য যেন তাঁহার করতলগত, অথচ তাহা যেন স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—'মন এখন লীলা হইতে নিত্য এবং নিত্য হইতে লীলায় আসে।' তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, তাঁহার দেহ-মন যেন কোন অপার্থিব বস্তুতে গঠিত। প্রেম, পবিত্রতা, সরলতা ও সাধু প্রবৃত্তির তিনি ছিলেন মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। মহারাজের মুখমণ্ডল প্রায়ই ভাবজ্যোতিতে পরিপূর্ণ থাকিত, সর্ব্বদাই আনন্দময়—কখনও বালকের মতো হাস্যকৌতুক ও ক্রীড়ারঙ্গে মত্ত আবার কখনও নৃত্যবাদ্যে উৎফুল্ল। তাঁহার একদিকে সহজ বালস্বভাব, অপরদিকে অপূর্ব্ব গম্ভীরভাব। তিনি যখন নিজের ভাবে মত্ত থাকিয়া ভাবগম্ভীর অবস্থায় বসিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার নিকট কেহ অগ্রসর হইতে সাহস পাইত না, এবং কেহ কোন প্রশ্ন করিতে আসিলেও নীরব হইয়া থাকিত; আবার কেহ কিছু বলিতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া যাইত। যখন তিনি একাকী মঠের প্রাঙ্গণে বা কোন উন্মুক্ত দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে গম্ভীরভাবে পাদচারণা করিতেন তখন তাঁহাকে দেখিলে তেজোদৃপ্ত নরসিংহের ন্যায় বোধ হইত[১]।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে গুরুভাই, প্রতিভাধর নাট্যকার ও নট, গিরিশ ঘোষের অতি উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁহার এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"রাখাল-টাখাল

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন

আমার কাছে ছেলেমানুষ, কালকের ছোকরা। ঠাকুরের কাছে আমি যখন যেতাম, তখন আর ওদের বয়স কত? এই রাখালকে আমি ঠাকুরের মানস-পুত্র বলে মানি। তা কি শুধু শুধুই মানি? যখন আমার প্রথম হাঁফানি হল, তখন খুব জ্বর, খুব দুর্ব্বলও হয়ে পড়লুম। এখানে তো শান্তি স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ হচ্ছে। এদিকে আমার মনে এক সর্ব্বনেশে ভাবের উদয় হল—ঠাকুর একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। তখনি মনে হল—গুরুতে মানুষজ্ঞান, মানুষ-বুদ্ধি, আমি বেটা গেছি। মনে এল দারুণ অশান্তি, কিছুতেই ঠাকুরের উপর ভগবদ্‌বুদ্ধি এল না। অনেককে বললাম, যে সব ত্যাগী গুরুভাইরা আমায় দেখতে আসতো, সবাইকে বলতাম। কিন্তু সবাই শুনে চুপ করে থাক্‌তো। আমার মনে দিন দিন দারুণ অশান্তি বৃদ্ধি পেতে লাগলো। মনের সঙ্গে সর্ব্বদা লড়াই করছি—তবু ঠাকুরের উপর মানুষবুদ্ধি যায় না। এই সময় একদিন রাখাল দেখতে এল। তাঁকে সব খুলে বলে, কাতরভাবে প্রশ্ন করলাম, 'এখন উপায় কি?'

"রাখাল সব কথা শুনে হোহো করে হেসে উঠলো। বললে—'ও কিছু নয়, ঢেউ যেমন হুস করে উঁচু হয় আবার তখনি নীচু হয়ে নেমে যায়, মনটাও তেমনি। ওর জন্য কিছু ভাববেন না। শিগগীরই আধ্যাত্মিক উন্নতির একটা উঁচু স্তরে আপনাকে নিয়ে যাবে, তাই মন এমনি হচ্ছে। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না'। ন'দিদি খাবার এনে দিলে। রাখাল খেয়ে উঠে গেল, যাবার সময়ে হেসে বল্লে, 'ব্যস্ত হবেন না। কোন ভয় নেই, মন আবার তড়াক্ করে লাফ দিয়ে কোথায় চলে যাবে।' এই বলে যেই রাখাল বাড়ীর সামনের-গলি পার হয়ে অন্য গলিতে মোড় ফিরলে, অমনি আমার কাঁধের ভূতটা যেন চলে গেল—ঠাকুরের উপর আগেকার মত ভগবদ্‌বুদ্ধি এল। সাধ করে কি ওকে মানি? রাখাল পিছন ফিরলে অনেক সময় ঠাকুর বলে আমারই ভুল হয়। ঠিক সেই রকম হাব-ভাব কথাবার্ত্তা কতক কতক পেয়েছে।'

ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তির বিচ্ছুরণ আরো অনেক ভক্তের উপর পড়িয়াছে, তাহাদের জীবনে আনয়ন করিয়াছে শান্তি, স্থৈর্য্য ও আত্মিক সাধনার সাফল্য।

ত্যাগ বৈরাগ্যের সহিত সংগঠন পরিচালকের দৃঢ়তা ও দূরদৃষ্টি ব্রহ্মানন্দের জীবনে সমন্বিত হইয়াছিল। তাই মঠ মিশন ও ভক্ত শিষ্যেরা তাঁহার প্রজ্ঞা এবং সূক্ষ্ম স্বচ্ছ দৃষ্টির সাহায্য লাভ করিয়া সতত উপকৃত হইতেন।

সে-বার এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁহার একমাত্র পুত্রের দেহান্তের পর শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন। সাধুসঙ্গের ফলে প্রাণে শান্তি আসিবে এই আশায় কিছুদিন তিনি বেলুড় মঠের কাছাকাছি একটি বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। দুবেলা মঠে যাতায়াত এবং ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করার ফলে হৃদয়ের জ্বালা কিছুটা দূর হইল। মঠের প্রতি ক্রমে তিনি খুব আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

রামকৃষ্ণের উদার মত, বিবেকানন্দের সেবাধর্ম্ম এবং ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের পূত চরিত্র তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এদিকে নিজের হৃদয়ে জাগিয়াছে নির্ব্বেদ। সংসারে কে কাহার এবং বিত্ত ও পুত্র কলত্রের স্থায়িত্বই বা কতটুকু? স্থির করিলেন, নিজের সব কিছু বিষয়-আশয় ত্যাগ করিবেন, লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসাটিও অর্পণ করিবেন মিশনের জনহিতকর কাজে।

স্বামী প্রেমানন্দের কাছে এই প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করেন এবং সকাতর অনুনয় জানান এসব গ্রহণের জন্য। প্রেমানন্দ কোমল-হৃদয় সন্ন্যাসী, ধনী ব্যবসায়ীর কথায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়, তখনি ব্রহ্মানন্দকে গিয়া সব কথা খুলিয়া বলেন।

ব্রহ্মানন্দ কিন্তু বুঝিয়া নিলেন, শোকের আঘাতে ধনী ব্যক্তিটির সাময়িক বৈরাগ্য আসিয়াছে—ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাহাকে বলিতেন, মর্কট বৈরাগ্য। শোক দূরীভূত হইলেই পূর্ব্ব-সংস্কার তাঁহার

জাগিয়া উঠিবে, তারপর মনে আসিবে তীব্র অনুশোচনা ও প্রতিক্রিয়া।

মহারাজ তুই হাত জোড় করিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু কহিলেন, "বাবুরামদা একি তুমি বলছো? ক'দিনের সাধুসঙ্গ করে লোকটির মনে ত্যাগ বৈরাগ্যের উদয় হল, আর তার সঙ্গ করার ফলে আমাদের বিষয়বুদ্ধি জেগে উঠবে?"

প্রেমানন্দ মুহূর্তে ব্রহ্মানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারধারা বুঝিয়া নিলেন। ধনী ব্যক্তিটির প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ করিলেন প্রত্যাখ্যান।

আর একবার একজন বিত্তবান ভক্ত মঠকে বেশ কিছু জমি দান করিতে ব্যগ্র হয়। মঠের সাধু সন্ন্যাসীরা সর্ব্বদাই অর্থাভাবে থাকে, তদুপরি সদাই এখানে রহিয়াছে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের প্রসাদ নেওয়া। আবাদী জমিতে উৎপন্ন চাউল মজুদ করা থাকিলে সাধুদের অনেক ঝামেলা কমিয়া যায়।

ভক্তটির আগ্রহাতিশয্যে প্রেমানন্দ সসঙ্কোচে একদিন ব্রহ্মানন্দকে এই প্রস্তাবের কথা নিবেদন করেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সেদিনও উত্তর দিলেন, "বাবুরামদা, তোমরা সিদ্ধসংকল্প সাধুপুরুষ, তোমরা যা মনে করবে তা ফলবে। ঐরূপ সংকল্প ছেড়ে দাও।"

মঠ ও মিশনের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিজের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দিয়া এমনিভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিচার করিতেন, নির্দ্ধারণ করিতেন নিজেদের নীতি ও কর্ম্মপন্থা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রভাব ও কর্ম্মের পরিধি যেমন বাড়িতে থাকে, তেমনি দলে দলে এখানে আসিতে থাকে সাধনপ্রার্থী ও মুমুক্ষু নরনারী। রামকৃষ্ণ-তনয়, মিশনের অধিনায়ক, ব্রহ্মানন্দের কাছে সাধন ও আশ্রয় নিবার জন্য ইহাদের অনেকে ব্যাকুল হয়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের মতো ব্রহ্মানন্দও দীক্ষা এবং সাধনপ্রার্থীদের আগে হইতে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া নিতেন। তাহাদের আগ্রহ,

চরিত্রের ধৃতি ও পবিত্রতার দিকে তীক্ষ্ণ, সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তারপর দীক্ষার্থীর ইষ্ট এবং সাধনপথ ধ্যানবলে জানিয়া নিয়া দিতেন তাহাকে পরমাশ্রয়। দীক্ষা দানের পূর্ব্বে প্রায়ই ঠাকুরের ইঙ্গিত বা নির্দ্দেশ আসিত। তাই একবার তাঁহাকে স্পষ্টভাবে বলিতে শোনা যায়, "ঠাকুরের আদেশেই আমি সবাইকে নাম দিচ্ছি।"

ব্রহ্মানন্দ সেবার কয়েকদিনের জন্য বলরাম ভবনে আসিয়াছেন। একদিন দুপুরে শয়নকক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে ধনী ঘরের এক বিধবা কিশোরী ব্যাকুল হইয়া সেখানে উপস্থিত হয়, কাতর কণ্ঠে তাঁহার দর্শন প্রার্থনা করে।

সেবক ভক্তটি একথা জানাইলে মহারাজ উত্তরে বলেন, "এই বুড়ো বয়সে দিন রাত আর কত বক্‌বো বাবা ?"

তদনুযায়ী মেয়েটিকে জানাইয়া দেওয়া হয়, "মহারাজ বড় ক্লান্ত, তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হবে না।"

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। আর্ত্ত স্বরে জানায়, "আমি তাঁকে একটুও বিরক্ত করবো না। একটিবার শুধু দর্শন করেই চলে যাবো।"

এবার মহারাজকে অনুমতি দিতেই হইল। মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করার পর আবার ক্রন্দন শুরু করে, অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়া যায়। এদিকে মহারাজেরও অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা, একটা দিব্য ভাবাবেশে আননখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে শান্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে ব্রহ্মানন্দ বলেন, "স্থির হও, মা, স্থির হও। কি হয়েছে আমায় বল।"

এ অভয় বাণী শুনিয়া মেয়েটি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়। তারপর দেয়ালস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোটির দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠে, "ঐ উনিই আমায় নির্দ্দেশ দিয়েছেন আপনার কাছে শরণ নিতে। তাইতো আমি পাগলিনীর মতো ছুটে এসেছি।"

অতঃপর মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে মেয়েটি সবিস্তারে সব কথা খুলিয়া বলে। সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা সে, বাল্যকালেই বিধবা হইয়াছে। এখন

বয়স প্রায় চৌদ্দ বৎসর। দীর্ঘ জীবন সম্মুখে পড়িয়া আছে, অথচ নিজের মনের দিক দিয়া তাহার কোন অবলম্বন নাই, আশ্রয় নাই। কিছুদিন যাবৎ সে বড় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, নিজের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া মন হইয়াছে নৈরাশ্যে অভিভূত। এই সঙ্কট সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কয়েকদিন আগে গভীর রাত্রে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, চাহিয়া দেখে শয্যার পাশে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন। কৃপাভরে তিনি কহিলেন, 'আমার ছেলে রাখাল বাগবাজারেই তো রয়েছে। তার কাছে তুই চলে যা।"

এই দৈবী আদেশ প্রাপ্তির পর অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া এখানে আসিয়া সে উপস্থিত হইয়াছে।

সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দ্দেশের মর্ম্ম বুঝিয়া নিতে মহারাজের দেরী হইল না। সেই দিনই কৃপাভরে এই বিধবা কিশোরীকে তিনি দীক্ষা দান করিলেন।

মহারাজের কৃপায় এই মহিলা অল্পকাল মধ্যে উন্নততর সাধনের অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং উত্তরকালে গ্রহণ করেন সন্ন্যাসজীবন।

ব্রহ্মানন্দের কৃপার ধারা ছিল সকলেরই জন্য উন্মুক্ত। এ কৃপা ধনী নির্ধন, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের কোন তারতম্য করিত না। অভিনেত্রী তারাসুন্দরী এ সময়ে মহারাজের পরমাশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশিত সাধনপন্থা অনুসরণ করিয়া অপার শান্তি লাভ করেন।

একবার অক্সফোর্ডের কোন বিশিষ্ট অধ্যাপকের কন্যা কলিকাতায় স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। এই সময়ে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দিব্য স্পর্শ এই বিদেশিনীর সম্মুখে এক অলৌকিক অনুভূতির দ্বার খুলিয়া দেয়। এ সম্পর্কে তিনি ভগিনী দেবমাতাকে এক পত্র লিখেন,—"ভগিনী, আমি যা আশা করেছিলাম তার চাইতেও অনেক বেশী বিস্ময়কর কাণ্ড! মাত্র পাঁচ মিনিট কাল দর্শন পেয়েছি, কিন্তু তাঁর দুটি হাতের ভেতর আমার হাতটি নিয়ে তিনি এমন কিছু উৎসাহপূর্ণ আশ্চর্য্যজনক কথা বলেছিলেন যাতে নিশ্চিতরূপে কিছু ঘটে গেল। যখন তাঁর ঘর থেকে বাইরে এলাম

আমার মনে হলো, আমার বয়স যেন বিশ বৎসর কমে গিয়েছে। আর নূতন আশা নিয়ে, নূতন বিশ্বাসের ধৃতি নিয়ে আত্মিক সংগ্রাম চালানোর জন্য আমি যেন প্রস্তুত হয়েছি। এ দিনটি আমার কাছে অপূর্ব্ব, এদিন থেকে কত তৃপ্তি আর আনন্দ আমি বোধ করছি। এর জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, আর যাঁরা এই দর্শন লাভে আমায় সাহায্যে করেছিলেন তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ [১]।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্যেরা জানিতেন, ব্রহ্মানন্দের মতো অপর কেহই ঠাকুরের নিয়ত সঙ্গ করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া দিনের পর দিন ঠাকুর অজস্র উপদেশ ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বিতরণ করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ শিষ্যদের অধ্যাত্মজীবন গড়িয়া তুলিতে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। নানা নিগূঢ় সাধন-নির্দ্দেশ তিনি এ সময়ে তাঁহাদের দিতেন এবং কথাপ্রসঙ্গে নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির কাহিনীও অকপটে বিবৃত করিতেন। এই সব তত্ত্ব ও তথ্যের প্রধান ভাণ্ডারী ছিলেন তাঁহার আদরের পুত্র, নিত্যকার সঙ্গী,. রাখালরাজ। তাই উত্তরকালে ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে শ্রুত এধরণের অনেক কিছু তথ্য সারদানন্দ স্বামী তাঁহার লীলপ্রসঙ্গে পরিবেশন করিয়াছেন।

ঠাকুরের নিজমুখের উপদেশবাণী সঠিকভাবে সঙ্কলিত হয় এবং ভক্ত-সাধকদের উপকারে আসে, এ বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ উদ্যোগী হন এবং কাজ অনেকটা অগ্রসরও হয়। সে-বার কাশীতে থাকাকালে মহারাজ একদিন একটি সেবককে দিয়া তাঁহার নিজের কানে শোনা কয়েকটি উপদেশ লিখাইয়া রাখেন।

সেই দিনই নিশীথ রাতে হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। ব্যস্ত হইয়া সেবকটিকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দেন। সে আসিলে বলেন, "ওরে ছাখ্ তো, উপদেশ সঙ্কলনের খাতাটা কোথায়।"

খাতাটি নিয়া আসিলে উহা হইতে একটি উপদেশ বাদ দিবার

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ: উদ্বোধন কর্তৃক প্রকাশিত

নির্দ্দেশ তিনি দেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে বলেন, "ঠাকুর নিজে এসে বলে গেলেন,—"রাখাল, ওটা কিন্তু আমার কথা নয়।"

এই অলৌকিক ঘটনাটি হইতে বুঝা যায়, অন্তর্দ্ধানের পরও ঠাকুর তাঁহার প্রাণপ্রিয় শিষ্য রাখালরাজের প্রতিটি কার্য্যের উপর কি সতর্ক দৃষ্টিই না রাখিতেন।

অতীন্দ্রিয় দর্শনের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন, রাখাল ব্রজের রাখাল, কৃষ্ণ-সখা, সহস্রদল কমলের উপর কৃষ্ণের হাত ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে। এই সঙ্গে ঠাকুর এ সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেন, ব্রজের স্বরূপসত্তা যেদিন সে উপলব্ধি করিবে, নরদেহের ঘটিবে অবসান। ঠাকুরের গুরুভাইরা রাখালের কাছে একথাটি গোপন রাখিতেন। এ সময়ে স্বামী সারদানন্দ ঠাকুর-রামকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ লিখিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রেসে তাহা ছাপানো হইতেছে। গুরুভাই প্রেমানন্দ মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হন। আর সারদানন্দ পরম উৎসাহে পাণ্ডুলিপিটি তাঁহাকে পাঠ করিতে দেন।

সেদিন পাণ্ডুলিপির একটি অংশ পড়িতে গিয়া প্রেমানন্দ চমকিয়া উঠেন। রাখাল ব্রজের বালক কৃষ্ণ-সখা—এ সম্পর্কে ঠাকুরের যে অলৌকিক দর্শন ঘটিয়াছিল, সে কথাটি এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রেমানন্দ শঙ্কিত কণ্ঠে কহিলেন, "শরৎ, এ তুমি কি করেছো? ঠাকুরের কথা কি তোমার মনে নেই? এসব প্রকাশিত হলে যে মহারাজের দেহ চলে যাবে!"

সারদানন্দ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এখনি এ ভুল অবিলম্বে শুধ্‌রানো দরকার। তৎক্ষণাৎ প্রেসে লোক পাঠাইয়া দিলেন। পাণ্ডুলিপির সংশ্লিষ্ট পাতাটি ছিঁড়িয়া ফেলা হইল এবং কম্পোজ করা টাইপের অংশবিশেষও করা হইল অপসারিত।

বাগবাজারাস্থিত বলরাম বসুর ভবনটি রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর অন্যতম পুণ্যতীর্থ। বলরাম, তাঁহার পুত্র রাম ও পুরনারীরা সবাই দীর্ঘদিন

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তদের আন্তরিক সেবা করিয়াছেন। ঠাকুর নিজে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় আসিলে প্রধানতঃ বলরামের ভবনেই অবস্থান করিতেন, এখানেই ভক্তদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ করিতেন। মা সারদামণির পুণ্যস্মৃতিও এস্থানে বিজড়িত। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এবং অন্যান্য রামকৃষ্ণ ভক্তদেরও প্রিয় বাসস্থান ছিল এই বলরাম ভবন।

সে-বার ব্রহ্মানন্দ কয়েকদিনের জন্য এখানে আসিয়াছেন। কলিকাতার ভক্তদের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী চলিতেছে। এসময়ে একদিন রাত্রে একটি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিল। গভীর রাত্রে কি এক কারণে মহারাজের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হঠাৎ দেখিলেন, তাঁহার বসিবার ছোট খাটটির সম্মুখে ঠাকুর নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। ক্ষণপরেই এই মূর্ত্তি তেমনি আকস্মিকভাবে শূন্যে মিলাইয়া গেল।

সবিস্ময়ে মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন, 'ঠাকুরের এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের কারণ কি? কোন কথা না বলে, কোন কিছুর নির্দ্দেশ না দিয়ে এমন নির্ব্বাক ভাবেই বা চলে গেলেন কেন? এই আবির্ভাব কি কোন ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত বহন করছে?'

মনে নানা চিন্তার তরঙ্গ খেলিতেছে। উদাস দৃষ্টিতে ব্রহ্মানন্দ চুপচাপ শয্যায় বসিয়া আছেন। এমন সময়ে সেবক ভক্তটি তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মানন্দ মৃদুস্বরে ঠাকুরের এই অলৌকিক দর্শনের কথা তাঁহার কাছে বিবৃত করেন, সেই সঙ্গে উচ্চারণ করেন স্বগতোক্তি,—"এখন আমার মনে কোন বাসনা নেই। এমন কি তাঁর নাম করবারও আর বাসনা নেই—এখন শুধু শরণাগত, শরণাগত।"

সেদিন ভোরবেলায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। রামলালকে দেখিলেই ব্রহ্মানন্দের মনে দক্ষিণেশ্বরের পুরাতন দিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিত, ঠাকুর হাসিয়া গাহিয়া যে মধুময় পরিবেশের সৃষ্টি করিতেন তাঁহার উল্লেখ করিয়া উভয়েই মুখর হইয়া উঠিতেন।

সদানন্দময় ঠাকুর যে রসালাপ করিতেন, যে ভঙ্গীতে নাচিতেন গাহিতেন, যে আখর দিতেন তাঁহার অনুকরণ করা হইত আর হাসির তুফান উঠিত।

সেদিনও তুজনের কথাবার্ত্তা ও হাসি গান খুব জমিয়া উঠিল। প্রেমানন্দে মাতিয়া উঠিয়া মহারাজ আব্‌দার ধরিলেন, "রামলাল দাদা, এসো সবাই মিলে আনন্দ করে ঠাকুরের পুরানো দিনের গান শুনা যাক্। আজ সন্ধ্যায় তুমি ঢপ্‌ওয়ালী সেজে আসর করে বস্‌বে। হ্যাঁ, আজই।"

রামলাল বড় সরল মানুষ ছিলেন, আর মহারাজের প্রতি তাঁহার ভালোবাসাও ছিল অতি গভীর, তাঁহার কোন কথা তিনি অমান্য করিতে পারিতেন না। সলজ্জভাবে কহিলেন, "মহারাজ, আপনি বলছেন বটে, কিন্তু এতো মঠ নয়, এ যে গৃহস্থ বাড়ী। বিশেষতঃ বাড়ীতে মেয়েরা রয়েছেন। সবাই কি মনে করবেন, বলুন তো।"

মহারাজ তখন আনন্দের আবেশে মাতিয়া উঠিয়াছেন, কহিলেন, "না রামলালদা, তোমার কোন ওজর-আপত্তিই আমি শুনছি না। কে কি মনে করবে তাতে বয়েই গেল। হ্যাঁ, আজ কীর্ত্তনওয়ালীর মতো সেজেগুজে তোমায় ঠাকুরের গান সবাইকে শোনাতেই হবে। সে খুব মজা হবে, ঠাকুরকে ঘিরে যে পুরানো দিনগুলো আমরা কাটিয়েছি আবার তা মনে ঝলমল করে ভেসে উঠবে।"

বৃদ্ধ রামলালদার কোন কাকুতি-মিনতিতেই মহারাজ কান দিলেন না। ঢপ্ আজ তাঁহাকে গাহিতেই হইবে।

অগত্যা রামলালদাকে রাজী হইতে হইল। সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, তোমার কথা কে ফেল্‌তে পারে? বেশ তাই হবে।"

সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মানন্দ সেবক-ভক্তদের আদেশ দিলেন, "তোরা ভাল করে রামলালদাদাকে সাজিয়ে নিয়ে আয়।"

বলরাম-গৃহের বধূদের কাছ হইতে রঙ্গীন রেশমী শাড়ি ও গহনা আনিয়া রামলালদাদাকে নারীর বেশে সজ্জিত করা হইল। বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণের শরীর শুক্নো, সব গহনা পরানো যাইতেছে না। একথা শুনিয়া পুরনারীরা সোৎসাহে খিল্-দেওয়া গহনা পাঠাইয়া দিলেন। সারা বাড়ীতে তখন আনন্দ কলরব পড়িয়া গিয়াছে।

বড় হলঘরে মহারাজ আসর জমকাইয়া বসিলেন, আশেপাশে ভক্ত, কৌতূহলী দর্শকবৃন্দ। বাড়ীর মেয়েরাও চিকের আড়াল হইতে এই নাটকীয় দৃশ্য দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন।

ঢপ্‌কীর্ত্তন শুরু হইল। কীর্ত্তনওয়ালীর বেশধারী বৃদ্ধ রামলাল-দাদা নাচিয়া গান ধরিলেন,—

একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত
(ও তোর) মন মানে তো থাক্‌বি সেথা নইলে আসবি দ্রুত।
আগে ছিল এক হেঁটো জল
এখন যমুনা অতল—
সাঁতার দিতে হবে।
নৈলে যমুনার তীরে বসে ব্রজ নিরখিবে।
(বল্‌লেও বল্‌তে পারো, আগে রাখাল ছিলে
—এখন রাজা হয়েছো)
না হয় ব্রজগোপীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে।

সভার শ্রোতারূপে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ভক্ত এবং সেবকগণ সহ বসিয়া আছেন। রামলালদাদা তাঁহার নিকটে আসিয়া ঢপওয়ালীর ভঙ্গীতে অঙ্গভঙ্গী করিয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া গাহিতেছেন। বার বার দিতেছেন ভাবময় আখর—আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছো।

এই আখর শুনিয়া সহসা মহারাজের হাসি আনন্দ ও কৌতুক-চপলতায় ছেদ পড়িয়া যায়। মুহূর্ত্তে তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে এক ভাবগম্ভীর মহিমময় মূর্ত্তি। সমুন্নত দেহ ঋজু হইয়া উঠে। নয়ন দুটি স্থির নিষ্পলক, চোখে মুখে বিস্তারিত দিব্য জ্যোতির ছটা।

এই গুরুগম্ভীর ভাবমূর্ত্তি দেখিয়া রামলালদাদা তাড়াতাড়ি তাঁহার কীর্ত্তন সমাপ্ত করেন। চিকের আড়ালে পুরনারীদের মৃদু

গুঞ্জন স্তব্ধ হইয়া যায়। ভক্ত সাধু ও সেবকেরা নির্ব্বাক হইয়া অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকেন মহারাজের দিকে। হঠাৎ ধ্যানের গভীরে কোন্ অতলে তিনি তলাইয়া গিয়াছেন।

আনন্দোজ্জ্বল, হাস্য-কৌতুকে মুখর, কীর্ত্তন-সভা ভাঙ্গিয়া যায়। ধ্যানস্তিমিত নয়ন মহারাজকে ঘিরিয়া ভক্ত ও সেবকের উৎকণ্ঠার অবধি নাই। এক স্তব্ধ গম্ভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে সেখানে।

হঠাৎ কেন ব্রহ্মানন্দের এই অদ্ভুত ভাবান্তর! 'রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছো'—কি যাদু নিহিত আছে এই কথা কয়টিতে? রামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে দেখা ব্রজের রাখাল, রাখালরাজ, আজ কি তাঁহার জন্মান্তরের স্মৃতি খুঁজিয়া পাইয়াছে? 'ব্রজের খেলা—নিত্যলীলা'—এই নিত্যলীলার উদ্দীপনার মধ্য দিয়াই কি মহারাজ তাঁহার স্বরূপসত্তার অতলে এমনি করিয়া ডুবিয়া গেলেন?

অতঃপর আর বেশীদিন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহার মরদেহে অবস্থান করেন নাই। বলরাম ভবনে সে-বার গুরুতর পীড়ায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। চিকিৎসক ও সেবকদের সমস্ত কিছু প্রাণপণ প্রয়াস বিফল হয়। ভক্ত ও সুহৃদ্দের অশ্রুসজল নয়নের সমক্ষে এই আপ্তকাম সদানন্দময় মহাপুরুষের চিরবিদায়ের লগ্নটি হয় নিকটতর।

শয্যার পাশে দণ্ডায়মান বিষাদখিন্ন ভক্তদের দিকে চাহিয়া মহারাজ বলেন, "ভয় পেয়ো না। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।"

গুরুভাইদের কাছে বিদায় নিয়া কহিলেন, "রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই, আমি ব্রজের রাখাল,—দে দে আমায় ঘুঙুর পরিয়ে দে,—আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচবো—ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্। কৃষ্ণ এসেছো। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। তোরা দেখতে পাচ্ছিস নে? তোদের চোখ নেই! আহা-হা কি সুন্দর!"

অন্তরঙ্গেরা স্মরণ করিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা—"ব্রজের স্বপ্নে ব্রজের রাখালের জীবনের অবসান হবে।" স্পষ্টতঃই বুঝা গেল শেষ মুহূর্ত্তের আর বেশী দেরী নাই।

ক্ষণকাল বিরতির পর মহারাজ মৃদু স্বরে আবার বলিয়া উঠেন, "আমার কৃষ্ণ—কমলে কৃষ্ণ, পীতবসনে কৃষ্ণ! ব্রহ্ম সমুদ্রে বটপত্রে ভেসে যাচ্ছি। এবারের খেলা শেষ হল। ঠাকুরের পা-দুখানি কি সুন্দর! দ্যাখো—দ্যাখো, একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে—বল্‌ছে, আয়, চলে আয়।"

পরের দিনই ১৯২২ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মহাসাধক ব্রহ্মানন্দ নরলীলায় ছেদ টানিয়া দিলেন, প্রবেশ করিলেন চিদানন্দময় নিত্য ধামে।

যোগত্রয়ানন্দজী

যোগীরাজ শিবরাম স্বামী সে-বার হাওড়ার উপকণ্ঠে বালীতে গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতেছেন। গুরুদেবের দেহ মোটেই সুস্থ নাই এবং এবার এটি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। তাই নানা স্থান হইতে শিষ্য ও ভক্তেরা আসিয়া জুটিতেছেন শেষ দর্শনের জন্য। দু বেলাই চলিতেছে সৎসঙ্গ ও তত্ত্ব আলোচনা।

প্রবীণ শিষ্য কালীনাথও বালীতেই থাকেন, গুরুদেবের এখানে নিত্য করেন আসা-যাওয়া। একদিন প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র শশীভূষণকে সঙ্গে নিয়া আসেন। গুরুর চরণে দণ্ডবৎ করার পর যুক্তকরে নিবেদন করেন, "প্রভু, আপনি শশীর প্রতি একটু কৃপা দৃষ্টি করুন। নয় বৎসর বয়সে ওর উপনয়ন হয়। তারপর থেকেই দেখা দেয় এক দুরন্ত মূর্চ্ছা রোগ। ডাক্তার কবিরাজেরা সব হার মেনেছেন। এবার আপনার চরণতলে একে রেখে দিচ্ছি, এর প্রাণ রক্ষা করুন।"

বালক শশী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম নিবেদন করে, প্রসন্নমধুর হাস্যে যোগীবর তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করেন। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া স্পর্শ করেন তাঁহার মেরুদণ্ড। ধীরে ধীরে বালক সম্বিৎহারা হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে।

কালীনাথ ও অপর ভক্ত-শিষ্যেরা এবার ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়েন। গুরুজী শিবরাম স্বামী কিন্তু রহিয়াছেন নির্বিকার। প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কক্ষের একধারে সন্তর্পণে ওকে সরিয়ে রাখো, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুক।"

আদেশ তখনি পালিত হয়। শিবরামানন্দ শুরু করেন তাঁহার তত্ত্ব-আলোচনা। কেনোপনিষদের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া ভক্তদের তিনি বুঝাইতে থাকেন।

ব্যাখ্যান শেষে যোগীবর বলেন, "এবার বালক শশীকে তোমরা

একটু ত্থাখো তো। তার বাহ্যজ্ঞান এতক্ষণে এসে গিয়েছে। এখানে আমার সম্মুখে নিয়ে এসো।"

বালককে তুলিয়া আনা হইল। শিবরামানন্দজী হাসিয়া কহিলেন, "শশী, এবার তুমি বলো তো, এতক্ষণ এখানে বসে আমি ভক্তদের কি বুঝাচ্ছিলাম।"

শশী ঋজু হইয়া উঠিয়া বসে, চোখে মুখে বিদ্যুতের দীপ্তি খেলিয়া যায়। শান্ত ধীর কণ্ঠে যোগীবরের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সারমর্ম সে বিবৃত করে। উপস্থিত ভক্ত-সাধকদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

কালীনাথের দিকে তাকাইয়া শিবরামানন্দজী কহিলেন, "বৎস, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের রোগ চিরতরে সেরে গিয়েছে, আর কোন ভয় নেই। মূর্চ্ছা রোগে সে আক্রান্ত হতো না। আসলে এটা ছিল তার পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারজাত একটা ধ্যানাবেশ। বিস্মৃতির পাথরে এতকাল এটা চাপা পড়ে ছিল, আজ খুলে দিলাম।"

প্রসন্ন কণ্ঠে আরো কহিলেন, "কালীনাথ, শশীকে আমি দীক্ষা দেবো। বয়সে বালক হলেও, সে এর যোগ্য আধার।"

অতঃপর বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে কহিলেন, "আরে শশী, তুই তো আমার তত্ত্ব আলোচনার মর্ম্ম চমৎকার বুঝিয়ে বলেছিস্। তুই তো তাহলে সত্যিকার পণ্ডিত। যা—আজ থেকে তোকে আমি পণ্ডিত বলেই ডাকৃবো।"

পরদিনই শশীভূষণের দীক্ষা সম্পন্ন হইয়া যায়। গুরুর কৃপায় দশ বৎসর বয়স্ক এ বালকের জীবনে ঘটিতে থাকে অমানুষী মেধা ও প্রতিভার বিকাশ। যে শাস্ত্রকথা, যে সাধনরহস্য বালক একবার শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ উহা তাহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। মহাসাধক, অশেষ শাস্ত্রবিদ্, সিদ্ধযোগী শিবরামানন্দজীর স্নেহাশিসে জীবন তাঁহার সার্থক হইয়া উঠিতে থাকে।

গঙ্গাতীরে দেহত্যাগের সঙ্কল্প যোগীবর নিয়াছেন। বিদায়ের লগ্নটি এবার তিনি ত্বরান্বিত করিতে চান। শিষ্য ও ভক্তদের সেদিন তাই জানাইয়া দিলেন, "আজ থেকে আমি গঙ্গাজল ছাড়া অপর

কোন কিছু পানীয় বা খাদ্যরূপে গ্রহণ করবো না। অচিরে প্রাণের উৎক্রমণ ঘটবে, তখন এ দেহটিকে তোমরা পুণ্যতোয়া গঙ্গার গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়ো।”

আশ্রিত শিষ্যদের অন্তরে আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়া ঘনাইয়া আসে, অশ্রুসজল চক্ষে দুবেলাই তাঁহারা শিবকল্প গুরুদেবকে দর্শন করিতে আসেন।

ইতিমধ্যে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। উপবাসে যোগীরাজের তনু ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। শেষ শয্যায় শায়িত থাকিয়া ইষ্টধ্যানে সদা বিভোর হইয়া আছেন।

বালক-শিষ্য শশী সেদিন আসিয়া গুরুর পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়েন, আর্ত্ত কান্নায় বক্ষ তাহার ভাসিয়া যায়।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে থাকেন, “প্রভু, এভাবে স্বেচ্ছায় কেন আপনি দেহ ছেড়ে দিচ্ছেন? আমি প্রাণ পেয়েছি, পরমাশ্রয় পেয়েছি আপনার কৃপায়। সেই আপনি আজ কেন এমন নিষ্ঠুর হচ্ছেন? আপনার বিহনে কি করে আমি জীবন কাটাবো?”

গুরু কহিলেন, “পণ্ডিত, স্থির হও। বয়সে বালক হলেও সত্য বস্তু তোমার ভেতরে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। তুমি কেন এত ধৈর্য্য-হারা হবে? আমি ধ্যানাসনে বসে দেহত্যাগ করবো আগামী কাল। এর কোন নড়চড় হবার উপায় নেই।”

শশী ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, “আপনার অভাবে কে দেবে আমার মতো হতভাগ্যকে সাধনতত্ত্বের উপদেশ? কে দেবে ইষ্টলাভে সহায়তা?”

“তোমার ভবিষ্যতের জন্য ভেবো না, পণ্ডিত সে ভাবনা আমার। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার সাধনসত্তায় তত্ত্ব স্ফুরিত হয়ে উঠবে, শাস্ত্রজ্ঞান ও যোগ সিদ্ধি হবে তোমার করতলগত। আমি বিদেহী হয়েও তোমার সঙ্গে থাকবো চিরকাল, আমার আশীর্ব্বাদে উত্তর-জীবনে হবে তুমি আপ্তকাম। আরও একটা কথা স্মরণ রেখো। আমার সার্থকনামা শিষ্য চিদ্‌ঘনানন্দ রইলো। তার কাছ থেকে শাস্ত্র ও সাধনসম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব কিছু সাহায্য তুমি পাবে।”

কালীনাথ ইতিমধ্যে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। গুরু তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস, আমার দেহান্তের সময় নিকটবর্ত্তী। যাবার আগে তোমায় প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করে যাই। আর বলে যাই তোমায়, তোমার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র শশীর সম্বন্ধে আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী। উত্তরকালে সে কীর্ত্তিত হবে এক শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্‌ সাধকরূপে। অমানুষী প্রতিভা, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি আর অসামান্য যোগসিদ্ধির হবে সে অধিকারী। যে দীক্ষা ও সাধন সে আমার কাছে লাভ করেছে তার পরিণত রূপ বিস্মিত করবে দেশবাসীকে।"

পরের দিনই তাঁহার পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত লগ্নে স্বামী শিবরামানন্দ চিরসমাধিতে মগ্ন হন। সমবেত ভক্ত শিষ্যেরা তাঁহার মরদেহটি এক কাষ্ঠসম্পুটে স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে দেন গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন।

গুরু মরলীলায় ছেদ টানিয়া দিলেন বটে কিন্তু তাঁহার বিদেহী লীলায় ইহার পরেও ছেদ পড়ে নাই। উত্তরকালে তাঁহার কৃপাদত্ত বীজ শশীভূষণের জীবনে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া উঠে। মনীষা, প্রজ্ঞা ও লোকশক্তির বিস্ময়কর সমাহার দেখা যায় তাঁহার জীবনে। নাম হয়—যোগত্রয়ানন্দ। বাংলা ও কাশীর অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে এক করুণাঘন আচার্য্যরূপে ঘটে তাঁহার অভ্যুদয়।

শশীভূষণের জন্ম হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। কলিকাতার ওপারে হাওড়া জেলার বালীতে তাঁহার পৈতৃক নিবাস। পিতা রামজীবন সান্ন্যাল ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। সরল ও সৎ প্রকৃতির লোক বলিয়া সবাই তাঁহাকে ভালবাসিত। আর শশীভূষণের জননী বিশ্বেশ্বরী দেবী ছিলেন ধর্ম্মপ্রাণা উদার স্বভাবা।

ঘরে কুলদেবতা নারায়ণ বিগ্রহ স্থাপিত ছিলেন, প্রতিদিন তাঁহার পূজা না করিয়া রামজীবন জলগ্রহণ করিতেন না। রামজীবনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালীনাথ ছিলেন সাত্ত্বিক ধরণের লোক। সাধনভজন, পূজা অর্চ্চনা ও দেবদ্বিজের সেবাতেই দিনের বেশী সময় তিনি নিরত থাকিতেন। যোগীরাজ শিবরামানন্দ স্বামীর অনুগৃহীত ও অন্তরঙ্গ

শিষ্যদের তিনি অন্যতম। ইঁহারই মাধ্যমে বালক শশীভূষণ যোগীরাজের চরণতলে উপনীত হন, লাভ করেন তাঁহার কৃপা-প্রসাদ।

স্বামী শিবরামানন্দের আশিস ও ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হইতে দেরী হয় নাই। দুই দশকের মধ্যেই শশীভূষণ পরিচিত হইয়া উঠেন একজন অতুলনীয় শাস্ত্রবিদ্ ও শক্তিধর সাধকরূপে। শত শত আর্ত্ত ও মুমুক্ষু তাঁহার শরণ নিয়া কৃতার্থ হয়।

গুরুর অন্তর্দ্ধানের পর হইতে গুরুগতপ্রাণ সাধক নিজেকে শশীভূষণ নামে আর পরিচিত করেন নাই, নিজেকে আখ্যাত করেন শিবরাম-কিঙ্কর নামে। কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই তিন যোগেই ছিল তাঁহার অসামান্য অধিকার, তাই ভক্ত ও শিষ্যেরা তাঁহাকে অভিহিত করিতে থাকেন যোগত্রয়ানন্দ নামে। উত্তরকালে কলিকাতা এবং কাশীর সারস্বত ও সাধকসমাজে তাঁহার এই নামটিই বেশী প্রচলিত হইয়া উঠে। শশীভূষণের তখন কিশোর বয়স। এই বয়সে লোকে খেলাধূলা ও হাসি-আনন্দেই মত্ত থাকে। কিন্তু তাহার বেলায় দেখা যায় ভিন্ন রূপ। গঙ্গাস্নান, পূজা পাঠ ও শাস্ত্র অধ্যয়নেই বেশী সময় সে অতিবাহিত করে। তদুপরি রহিয়াছে গুরু প্রদত্ত মন্ত্রজপ ও ধ্যান-ধারণা। অসাধারণ শ্রুতিধর ও মেধাবী সে, যে কোন গ্রন্থ একবার পাঠ করে, যে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শ্রবণ করে তখনি উহা তাহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। প্রতিভাধর কিশোরকে আশেপাশের লোকেরা স্বভাবতঃই কিছুটা সমীহ করিয়া চলে।

তখন শীতকাল। লাল রঙে ছোপানো একটি মোটা চাদর শশীভূষণকে কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেদিন এটিকে কাঁধে ফেলিতে গিয়া হঠাৎ একটা তামাসা করার ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠে। লাল চাদরটি নেংটির মতো পরিধান করিয়া জননীর সম্মুখে উপস্থিত হন, বলেন, "চেয়ে ছাখো মা, আমি কেমন সন্ন্যাসী সেজেছি।"

তামাসাটি জননী তখনকার মতো উপভোগ করেন বটে, কিন্তু মনে তাঁহার কি জানি কেন একটা দুর্ভাবনা জাগে। শশী তাঁহার আর পাঁচটা ছেলের মতো নয়, পূজাপাঠ জপ নিয়াই এ বয়সে বিভোর

হইয়া আছে। ভয় হয়, শেষটায় সত্যি সত্যিই ঘর ছাড়িয়া সে সন্ন্যাসী না হয়। স্বামীকে জানাইলেন তাঁহার দুশ্চিন্তার কথা, তারপর কহিলেন, "এ ছেলেকে ঘরে ধরে রাখা কিন্তু দায় হবে। তাড়াতাড়ি এর বিয়ে দাও, সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে যদিবা কিছুটা বদলায়।"

পত্নী বিশ্বেশ্বরীর কথা রামজীবনের মনঃপূত হইল, বড়ভাই-এর অনুমতি নিয়া পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ তিনি করিয়া ফেলিলেন।

গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণ করিয়া সংসারের জালে আবদ্ধ হইবেন, একথা শশীভূষণ কখনো কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বরং সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া ঈশ্বর লাভের জন্য তপস্যা করিবেন, ইহা ছিল মনের গোপন আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু পিতা ও মাতার আদেশকে তিনি জ্ঞান করেন দেবতার আদেশরূপে, তাই সেদিন কোন প্রতিবাদ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

এক শুভ লগ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। শশীভূষণের বয়স তখন তের, আর পত্নী হরিদাসীর নয়।

যৌবনে উপনীত হওয়ার পর শশীভূষণের শাস্ত্রজ্ঞানের পিপাসা ও সাধননিষ্ঠা আরো তীব্র হইয়া উঠে। বেদ আগম স্মৃতি পুরাণের বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলেন, পাঠ করাই শুধু নয়, এই সব গ্রন্থের দুরূহ তত্ত্ব অবলীলায় তাঁহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। এই সঙ্গে সদ্‌গুরু শিবরাম স্বামীর প্রদত্ত সাধন ও তাঁহার জীবনে আনিয়া দেয় মূল্যবান্ অধ্যাত্ম সম্পদ। গুরু মহারাজের প্রধান শিষ্য চিদ্‌ঘনানন্দ-স্বামী মাঝে মাঝে এ অঞ্চলে আগমন করেন। তাঁহার শিক্ষাধীনে থাকিয়াও দিনের পর দিন শশীভূষণের সাধন প্রস্তুতি পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিতে থাকে।

পিতার আয় অতি নগণ্য, শশীভূষণ নিজে তখনও কোন অর্থকরী বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। অথচ সংসারে অনটন সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। এসময়ে কিছু উপার্জ্জন অবশ্যই করা দরকার। ভাবিলেন, কবিরাজী চিকিৎসা শিখিলে মন্দ কি?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল পুরাতন দিনের এক দুঃখময় স্মৃতি। শশীভূষণ তখন মারাত্মক উদরাময় রোগে ভুগিতেছেন, কবিরাজী চিকিৎসা চলিতেছে, কিন্তু রোগ কিছুতেই সারিতেছে না। ঘরে টাকা-কড়ির অভাব, চিকিৎসককে কিছুদিন ঔষধের দাম দেওয়া যায় নাই। তিনি বাঁকিয়া বসিলেন, টাকা না পাইলে ঔষধপত্র আর দিতে পারিবেন না।

শশীভূষণ মিনতি করিয়া, সজল চক্ষে, কহিলেন, "কব্‌রেজ মশাই, আপনি দয়া করে আমার রোগ দূর করুন, আমায় বাঁচিয়ে তুলুন। যে টাকা আপনার পাওনা থাকবে তা গণ্য হবে আমার নিজের ঋণ বলে। আমার উপার্জ্জন শুরু হলে, এই ঋণ আমি অবশ্যই শোধ করে দেবো।"

কবিরাজের হৃদয় গলিল না, ঔষধ দেওয়া তিনি বন্ধ করিলেন। তারপর নানা গ্রাম্য টোট্‌কা ঔষধ ব্যবহার করিয়া, দীর্ঘদিন ভুগিয়া, শশীভূষণ ঐ দুরন্ত রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান।

তখন তিনি ভাবিতে বসেন, 'চিকিৎসকের মনোভঙ্গী যদি এরূপ হয় তবে তো দরিদ্র জনসাধারণের কষ্টের অবধি নেই। দুবেলা যাদের অন্ন জোটে না, ঔষধের দাম ও চিকিৎসকের পাওনা টাকা কি করে তারা মেটাবে? না—আমায় তবে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পড়তেই হবে। চিকিৎসা-বৃত্তি আমি গ্রহণ করবো, সাধ্যমতো দূর করবো দরিদ্র জনগণের কষ্ট।'

এবার স্থির করিলেন, আগেকার ইচ্ছাটিকেই বাস্তব রূপ তিনি দিবেন, কবিরাজী শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়া চিকিৎসা শুরু করিবেন, ইহা দ্বারা সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ এবং জনকল্যাণ দুই-ই সাধিত হইবে।

অলৌকিক মেধা ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন শশীভূষণ। তাই অল্পদিনের মধ্যেই প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সঙ্গে অথর্ব্ব বেদের রোগনাশক মন্ত্র ও দ্রব্যগুণ সম্পর্কিত জ্ঞানও তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

বিদ্যাবত্তা ও প্রয়োগ নৈপুণ্য তাঁহার অসামান্য। তাই চিকিৎসক হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করিতে বেশী দেরী হয় নাই।

জটিল রোগে আক্রান্ত যে সব রোগীকে অভিজ্ঞ ডাক্তারেরা পরিত্যাগ করিতেন, তাহাদের অনেকেই শশীভূষণের চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইতে থাকে। ফলে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়ে।

চিকিৎসাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিলেও, শাস্ত্রপাঠ ও সাধন-ভজনেই দিন রাতের বেশী সময় তিনি ব্যয় করিতেন। এক একদিন দেখা যাইত, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া প্রায় সারা রাত অতিবাহিত করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বর গ্রামে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অভ্যুদয় তখন সবে শুরু হইয়াছে। তাঁহার অমৃতময়ী কথা শোনার জন্য, সাধন নির্দ্দেশ নিবার জন্য, জড়ো হইতেছে কৌতূহলী দর্শক ও মুমুক্ষু ভক্তের দল। নবীন সাধক শশীভূষণও মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন, আপ্তকাম মহাসাধকের মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়া হইতেন কৃতকৃতার্থ।

বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব দিন দিন বাড়িতেছে, আয় অতিশয় সীমিত। কারণ যে সব রোগীরা শশীভূষণের কাছে চিকিৎসার জন্য আসে তাহাদের অধিকাংশই দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট—অন্ন বস্ত্রেরই সংস্থান নাই, চিকিৎসার ব্যয় কি করিয়া বহন করিবে? ইহার উপর আছে শশীভূষণের নানা গোপন দান। ফলে পরিবারে অভাব অনটন লাগিয়াই আছে।

অপর দিকে কঠোর সঙ্কল্প নিয়া শশীভূষণ সাধনভজন চালাইয়া যাইতেছেন, কিন্তু আশানুরূপ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি তো তাঁহার হইতেছে না। নৈরাশ্যে এক একদিন মুহ্যমান হইয়া পড়েন। সেদিন তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে ছুটিয়া আসেন।

ঠাকুর তখন ভবতারিণীর মন্দিরে। শশীভূষণ ধীর পদে অগ্রসর হইয়া সিঁড়ির নীচে অপেক্ষায় রহিলেন, নামিয়া আসার সময়

ঠাকুরকে ধরিবেন। আজ তাঁহার হৃদয়ের আগুন ঠাকুরকে নির্ব্বাপিত করিতেই হইবে।

মন্দির হইতে অবতরণের সময় ঠাকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন, কহিলেন, "কে গো, আমাদের পণ্ডিত না?" শিবরামানন্দের দেওয়া ঐ উপনামটি ঠাকুরও ব্যবহার করিতেন।

যুক্তকরে শশীভূষণ উত্তর দেন, "আজ্ঞে হাঁ, আমিই বটে। আপনার কাছে নিভৃতে আমার কিছু বলার আছে।"

"তা, কি বলবে বল।"

"দেখুন, প্রাণের জ্বালা কিছুতেই নিবৃত্ত হচ্ছে না। আপনার কৃপা স্পর্শ চাই। পবিত্র চরণখানি আমার বুকে একবার রাখুন, তাহলে যদি শান্তি পাই।"

"পণ্ডিত, জ্বালায় জ্বলছো, এতো ভালো কথা। এর পরেই তো আসে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন, আসে পরম শান্তি, পরম অমৃত।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণের চরণখানি কিছুক্ষণ বক্ষে ধারণ করিয়া শশীভূষণ দিব্য আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে ঠাকুর কহিলেন, "পণ্ডিত, স্থির হও। এবার উঠে বসো। আমি ওপারে, তোমাদের বালীতেই যাচ্ছি বাবা-কল্যাণেশ্বর শিব দর্শন করতে। ভক্তেরাও সঙ্গে যাচ্ছে। তুমিও যাবে চল।"

শশীভূষণ সোৎসাহে রাজী হইলেন। শিব দর্শন উপলক্ষ করিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের পূত সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা পরম আনন্দে কাটিয়া গেল। ঠাকুরের ভাগবতী কথা শুনিয়া ও ধ্যানতন্ময় দিব্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া শশীভূষণের যেন আর আশা মিটে না।

মন্দিরের দর্শনাদি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর নিজে যাচিয়া শশীভূষণের বালীস্থিত ভবনে পদার্পণ করিলেন। আনন্দরঙ্গে সেই অঞ্চলের সবাইকে মাতাইয়া ঠাকুর যখন ফিরিয়া চলিলেন তখন শশীভূষণের হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইয়াছে, দেহমনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে দিব্য আনন্দের রসধারায়।

বিদায় নিবার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ কহিলেন, "পণ্ডিত, তুমি

ব্রাহ্মণ, সদ্‌বংশীয়। চিকিৎসা বৃত্তি থেকে টাকা রোজগার করছো, —ও টাকা ভালো নয়। এ বৃত্তি ছেড়ে দাও।"

ক্ষণপরেই ঠাকুর আবার মন্তব্য করেন, "তাই তো এত বড় সংসারের দায়িত্ব রয়েছে। চিকিৎসার আয় না থাকলে চলবেই বা কেমন করে? আচ্ছা, তুমি চিকিৎসা করে টাকা নেবে, কিন্তু সংসার চালানোর জন্য ঠিক যতটুকু দরকার তাই নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের এই নির্দ্দেশ শশীভূষণ সেদিন শিরোধার্য্য করিয়া নেন। অতঃপর নিজের দক্ষতায় বহু দুশ্চিকিৎস্য রোগ তিনি নিরাময় করিয়াছেন বটে, কিন্তু আয় বৃদ্ধি কোনদিন করেন নাই। ফলে সংসারে দারিদ্র্যের কষ্ট রহিয়াই গেল।

ঈশ্বর-দত্ত প্রতিভা ও মনীষা নিয়া শশীভূষণ জন্মিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে প্রথম জীবনে নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান অধিগত করার স্পৃহাও ছিল প্রচুর। তাই শুধু সংস্কৃতে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়নেই তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজীতে ব্যুৎপন্ন হইয়া আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রধান গ্রন্থগুলিও তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন।

কিন্তু শশীভূষণের জীবনের মূল লক্ষ্য—ভারতীয় ঋষিদের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করা, ঋষিদের জ্ঞানবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পন্থা অনুসরণ করিয়া ঋদ্ধি ও সিদ্ধি করায়ত্ত করা। তাই বেদ বেদান্ত, আগম, স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ ও সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি কোন কিছুর অধ্যয়নই তিনি বাকী রাখেন নাই।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করিতে গিয়া শশীভূষণ শুধু চরক সুশ্রুত প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের পন্থা যেমন অনুসরণ করিতেন, তেমনি করিতেন অথর্ব্ব বেদের মন্ত্র ও ঔষধি প্রয়োগ। কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রশক্তির উপরই তিনি নির্ভর করিতেন বেশী।

শশীভূষণ তখন বরানগরে বাস করিতেছেন। এক ভদ্রলোক কয়েক বৎসর যাবৎ দুরারোগ্য বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া আছেন,

কলিকাতার প্রবীণ চিকিৎসকদের সব কিছু চেষ্টা বিফল হইয়াছে এবং রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহার প্রাণের আশা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমন সময়ে ঐ রোগীটি শশীভূষণের শরণ নেয়। আর্ত্তস্বরে জানায়, "মরতে হয় তো আপনার চিকিৎসাধীনে থেকেই মরবো। শেষ চেষ্টা হিসেবে, যা কিছু করবার আপনি তা করুন।"

দ্রব্যগুণের সব পরীক্ষাই এ যাবৎ এই রোগীর উপর করা হইয়াছে। ডাক্তার ও কবিরাজেরা সাধ্যমতো সব কিছু করার পর হার মানিয়াছেন। এবার শশীভূষণ এই দুশ্চিকিৎস্য রোগের জন্য ব্যবস্থা করিলেন ঋষিদের উদ্ভাবিত মন্ত্রের প্রয়োগ। "শুধু বৈদিক মন্ত্রের অচিন্ত্য শক্তির আশ্রয় লইয়া তিনি এই রোগীর অসহ্য যন্ত্রণা অল্পকালের মধ্যেই পূর্ণভাবে শান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ তিনি ঋগ্বেদ অথবা অথর্ব্ববেদের মন্ত্র প্রয়োগ করিতেন। বৈদিক মন্ত্রের উপর তাঁহার এইরূপ আধিপত্য ছিল যে তিনি যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারাই অল্পক্ষণের মধ্যে রোগের যন্ত্রণা ও উপসর্গের জটিলতা দূর করিতে সমর্থ হইতেন। এই ভদ্রলোকটির বেলায়ও তিনি সেইরূপ করিয়াছিলেন।

"ভদ্রলোকটিকে সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার মস্তক হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত নিজের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা সঞ্চালন করিতে করিতে বিধি অনুসারে তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চারণ ও সঞ্চালন ক্রিয়া কয়েকবার অনুষ্ঠিত হইলে রোগীর অসহ্য বেদনা আশ্চর্য্যরূপে শান্ত হইয়া যায়, তাঁহার দেহের মধ্যে একপ্রকার স্নিগ্ধ শান্তিময় ভাব অনুভূত হয়। সুদীর্ঘকাল স্থায়ী এই দেহের যন্ত্রণা নিবৃত্ত হইতে পাঁচ মিনিটের অধিক সময় লাগে নাই। ইহার পর বেদনার আর পুনরাবৃত্তি হয় নাই এবং কয়েকদিন পর্য্যন্ত ঐ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে রোগীর মুখ্য রোগও নির্ম্মূল ভাবে অপগত হয়[১]।"

এই রোগীটি উত্তরবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নের

১ সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ : ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

বন্ধু ছিলেন। তর্করত্ন মহাশয় রোগীর নিজ মুখ হইতে শশীভূষণের এই মন্ত্রচিকিৎসার কথা শুনিতে পান এবং এই তথ্যটি ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের কাছে প্রকাশ করেন।

গুরু মহারাজ শিবরামানন্দ স্বামীর কৃপায় ও জন্মান্তরের অর্জ্জিত পুণ্যবলে শশীভূষণ অনেক সময় সূক্ষ্মলোকচারী মহাত্মা ও দেবদেবী-দের দর্শন পাইতেন, শাস্ত্রতত্ত্বের বহু দুরূহ বিষয় ইঁহাদের কৃপায় জানিতে সমর্থ হইতেন।

এক সময়ে তিনি ঋষি পাণিনির মহাভাষ্য (পতঞ্জলি-কৃত) অধ্যয়ন করার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। বাংলায় তখন পাণিনির চর্চ্চা তেমন হইত না এবং উপযুক্ত শিক্ষাদাতারও অভাব ছিল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, দক্ষিণী পণ্ডিত গোবিন্দ শাস্ত্রী ভরদ্বাজের তখন খুব নামডাক। বিশেষ করিয়া পাণিনির অধ্যাপনায় তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। ভাবিয়া চিন্তিয়া শশীভূষণ তাঁহারই কাছে গিয়া উপস্থিত। প্রণাম নিবেদনের পর যুক্তকরে বলেন, "আমার একান্ত অভিলাষ, আপনার মতো মহাপণ্ডিতের কাছে পাণিনি পাঠ করি। আপনি আমায় কৃপা করুন।"

শাস্ত্রী মহোদয় তখন তাঁহার ছাত্রদের নিয়া তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন। কহিলেন, "এখানে যাদের দেখছো, এরা সবাই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। আমি তো বাইরের কোন ছাত্রের অধ্যাপনা করিনে। সে ইচ্ছাও নেই, সময়ও নেই।"

শশীভূষণ কিছুতেই ছাড়িবেন না, বার বার মিনতি করিতে থাকেন, "আমায় পাণিনির মহাভাষ্যের পাঠ আপনাকে দিতেই হবে, একান্তভাবে আমি আপনার শরণ নিচ্ছি।"

শাস্ত্রীজী তাঁহার সঙ্কল্পে অটল। শশীভূষণকে বার বার মিনতি করিতে শুনিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। কটূক্তি করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন।

এই রূঢ় প্রত্যাখ্যান শশীভূষণের হৃদয়ে বড় বাজিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি অন্নজল ত্যাগ করেন, তীব্র মনোকষ্ট নিয়া বার বার ভাবিতে থাকেন নিজের ব্যর্থতার কথা। সঙ্গে সঙ্গে অন্তস্তল হইতে উদ্‌গত হয় আকুল প্রার্থনা, "হে প্রভু, হে দেবাদিদেব, তুমি তো জান, নিজ স্বার্থের জন্য আমি এমন ব্যাকুল হই নি, ঋষিশাস্ত্র অধ্যয়নের চাবিকাঠিই আমি হাতড়ে বেড়াচ্ছি, যাতে ত্রিতাপ তাপিত মানুষের কল্যাণ হয় তা-ই তো আমি সারা অন্তর দিয়ে চেয়েছি। প্রভু, এবার থেকে আর আমি মানুষের দ্বারে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য ভিক্ষা করতে যাবো না, থাকবো একান্তভাবে তোমারই সাক্ষাৎ কৃপার ওপর নির্ভর ক'রে।"

সারা দিনরাত অনাহারে কাটিয়া যায়। গভীর রাতে পূজার ঘরে বসিয়া শশীভূষণ জপে নিবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে চাহিয়া দেখেন ক্ষুদ্র কক্ষটি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে, আর অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন জটাজুটমণ্ডিত এক ঋষিকল্প মহাপুরুষ।

ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়াই তো শশীভূষণ পূজায় বসিয়াছিলেন, তবে কি করিয়া এই বৃদ্ধ তাপস ভিতরে ঢুকিলেন? বিস্মিত হইয়া একথা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে স্নেহপূর্ণ স্বরে মহাপুরুষ কহিলেন, "বৎস, তুমি এত মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছ কেন? সারাদিন অন্নজলই বা গ্রহণ কর নি কেন? শরীরকে কেন শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছ? শাস্ত্রী তোমার জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করে নি, এজন্যই কি তুমি এমন মর্ম্মাহত? প্রকৃত জিজ্ঞাসু, তপস্যাপরায়ণ ও একনিষ্ঠ সাধকেরা ভগবানের কাছ থেকেই তো জ্ঞান আহরণ করে। তুমি হতাশ হয়ো না, আমিই তোমায় শিক্ষা দেবো ব্যাকরণ ভাষ্যের রহস্য। আমি যে গ্রন্থ রচনা করেছি, তা শিক্ষা দেবার সামর্থ্য কি আমার নেই?"

শশীভূষণ উপলব্ধি করিলেন, আবির্ভূত মহাত্মাটি হইতেছেন স্বয়ং পতঞ্জলি দেব, কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহাকে তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন।

আর কালবিলম্ব না করিয়া আগন্তুক ঋষিবর শশীভূষণের কাছে

পাণিনি মহাভাষ্যের ব্যাখ্যান শুরু করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সকল কিছু তত্ত্ব সকল কিছু রহস্য তিনি বুঝাইয়া দিলেন। শশীভূষণের মনের সংশয় এবার ঘুচিয়া গেল। দিব্য আনন্দে তিনি আপ্লুত হইলেন।

ঋষির আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধানের মধ্যে ব্যবধান বেশী ছিল না। এই অত্যল্প সময়েই মহাত্মা দুরূহ মহাভাষ্যটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল? এই চিন্তা মনে উঠার সঙ্গে সঙ্গে শশীভূষণ উপলব্ধি করিলেন, সাধারণ জীবজগৎ কালের যে মানে অবস্থিত থাকে, বিদেহী শক্তিধর মহাত্মার কালের মান তাহা হইতে সূক্ষ্মতর। মুহূর্ত্তে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার তাঁহার কৃপায় যে কোন মানুষ আয়ত্ত করিতে সক্ষম।

ঋষি প্রদত্ত জ্ঞান সত্য সত্যই তিনি ধারণ করিতে পারিয়াছেন কিনা, তখনই শশীভূষণ ইহা পরীক্ষা করিতে ব্যগ্র হন। দেখিলেন, ভাষ্য খুলিয়া পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে উহার নিহিতার্থ তাঁহার নিকটে স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে। ঋষির কৃপার বলে জন্মান্তরের প্রাক্তন বিদ্যা উৎসারিত হইতেছে ইন্দ্রজালের মতো। এই দৈবী বিদ্যা শশীভূষণ কিছু সংখ্যক উত্তম অধিকারীকে উত্তরকালে বিতরণ করিয়াছিলেন।

আর একবার, শিবরাত্রির মহানিশায় সাধক শশীভূষণ কৃপা লাভ করেন ঋষি গৌতমের। সমগ্র ন্যায়দর্শনের তত্ত্ব এসময়ে তিনি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন।

পবিত্রতা, ত্যাগ বৈরাগ্য ও তপঃশক্তির সহিত শশীভূষণের জীবনে মিলিত হয় ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনের ব্যাকুলতা। ইহার ফলেই সূক্ষ্মলোকচারী মহাত্মাদের কৃপালীলা এভাবে তাঁহার জীবনে বিস্তারিত হয়।

দৈবী শক্তিসম্পন্ন শাস্ত্রবিদ্ ও সাধকরূপে তাঁহার খ্যাতি এবার কলিকাতা ও শহরতলীগুলিতে প্রচারিত হয়। ধীরে ধীরে তাঁহার চারিপাশে গড়িয়া উঠে একটি জিজ্ঞাসু ভক্তগোষ্ঠী। প্রায়ই তাঁহারা শাস্ত্র পাঠের জন্য সাধক শশীভূষণের কুটিরে সমবেত হইতেন। এই

জিজ্ঞাসুদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভক্ত নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ (উত্তরকালের বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ) এবং প্রেমানন্দ ভারতীকেও দেখা যাইত।

শশীভূষণের তপস্যামর জীবনে দেখা গিয়াছিল কর্ম্ম, শক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব মিলন। জীবন যুদ্ধের জয় পরাজয় ও লাভ-ক্ষতিতে তিনি ছিলেন নির্ব্বিকার ও নিরাসক্ত। ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, একনিষ্ঠা ভক্তি নিয়া, অযাচকভাবে তিনি তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বহু ত্যাগী ভক্তের পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না। এই সঙ্গে অধ্যাত্মজ্ঞান ও প্রাচীন শাস্ত্রতত্ত্বের তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট ধারক বাহক। তাঁহার সাধনজীবনে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের এই সমাহার লক্ষ্য করিয়া বিশিষ্ট ভক্ত ও অনুরাগীরা তাঁহার নাম দেন—যোগত্রয়ানন্দ। এখন হইতে দর্শনার্থী ও সাধনকামী ভক্তদের মধ্যে এই নামেই প্রধানতঃ তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

জননী অনেক দিন হয় কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছেন, আর যে আরোগ্যলাভ করিবেন এমন আশা নাই। পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "শশী, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে বাবা, এবার তুই আমায় কাশীধামে নিয়ে যা। সেখানে প্রভু বিশ্বনাথের পুণ্যভূমিতে শেষ নিঃশ্বাস আমি ত্যাগ করতে চাই। তাড়াতাড়ি এর একটা ব্যবস্থা তোকে করতে হবে।"

মায়ের কথা শিরোধার্য্য করেন যোগত্রয়ানন্দ, তাঁহাকে আশ্বাস দেন, "মা, তুমি নিশ্চিত হয়ে থাকো। যে ক'রেই হোক তোমার কাশীবাসের বন্দোবস্ত আমি করবোই।"

জননীকে তো কথা দিলেন, এখন উপায়? সংসারে যত্র আয় তত্র ব্যয়, হাতে টাকা-কড়ি কোন সময়েই কিছু থাকে না। অনেক চেষ্টা করিয়া এক অর্থবান্ রোগীর নিকট হইতে একশত টাকা ধার করিলেন।

রাস্তায় কাশী প্রত্যাগত এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার দেখা। যোগত্রয়ানন্দকে তিনি কহিলেন, "কাশীতে যাচ্ছো যাও, কিন্তু সেখানে গুণ্ডার বড় উৎপাত। বটুক পাঁড়ে নামে এক বড় পাণ্ডা আছে, সেখানে তার খুব প্রতিপত্তি। আমার অনেক দিনের চেনা। তাকে আমার নাম করে আগে থাকতে চিঠি দিয়ে দাও। তার বাড়ীতেই উঠ্‌বে। কোন ভয় ভাবনা থাক্‌বে না।"

সবাইকে নিয়া যোগত্রয়ানন্দ বটুক পাঁড়ের হাবেলীতেই আশ্রয় নিলেন। মোক্ষদায়িনী কাশী, বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার পুণ্যধাম কাশী। জননীকে নিয়া এই মহাতীর্থে পৌঁছিবার পরই মন তাঁহার আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে।

গঙ্গাস্নান ও বাবা বিশ্বনাথের দর্শন শেষ করিয়া বাসায় ঢুকিতেছেন, এমন সময় মহল্লার কয়েকটি বাসিন্দা যোগত্রয়ানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া নেন, বলেন, "মশাই, এ আপনি কি করেছেন? শেষটায় বটুক পাঁড়ের বাড়ীতে উঠেছেন সপরিবারে। পাঁড়ে যে এখানকার এক গুণ্ডা—ডাকাত বিশেষ। শিগ্‌গীর অন্য কোথাও উঠে গিয়ে সবার প্রাণ বাঁচান।"

যোগত্রয়ানন্দের ললাটের একটি রেখাও কুঞ্চিত হইল না, কথাগুলি শোনার পরও রহিলেন পূর্ব্ববৎ ধীর স্থির অকুতোভয়।

যুক্তকর শিরে ঠেকাইয়া শুধু কহিলেন, "বাবা বিশ্বনাথের শরণ নিতেই আমরা এসেছি। সেস্থলে তুচ্ছ এক বটুক পাঁড়ের ভয়ে ভীত হলে চলবে কেন? তাছাড়া বটুক গুণ্ডামী করছে তার নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ। আমি তার সঙ্গে দেখা করবো, তার দোষত্রুটি বুঝিয়ে বলবো। এজন্য আপনারা ভাব্‌বেন না।"

প্রতিবেশী শুভানুধ্যায়ীরা বুঝিয়া নিলেন, এ নবাগত ব্রাহ্মণের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, ইহার সঙ্গে তর্ক করিয়া কোন লাভ নাই। একে একে তাঁহারা সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিকালবেলায় যোগত্রয়ানন্দ পাঁড়েজীর ছড়িদারকে ডাকাইয়া আনেন। হাসিয়া বলেন, "বাবার স্নান তর্পণ ও দর্শন হয়েছে, এবার

তো বাবার পাণ্ডাকে একবার দর্শন করা চাই। চলুন একবার বটুক পাঁড়েজীকে ভেট করে আসবো।”

ছড়িদার তখনি সোৎসাহে যোগত্রয়ানন্দকে পাঁড়ের কাছে হাজির করিলেন। তেতলার ছাদের উপর বটুক পাঁড়ে একটা চৌপাই-র উপর উপবিষ্ট। ভাঁটার মতো চোখ দুইটি সিদ্ধির সরবতের প্রভাবে ঢুলু ঢুলু। নীচে মাদুরে বসিয়া কয়েকজন বয়স্য ও সেবক হাণ্ডিতে সিদ্ধি ঘোঁটিতেছে। অদূরে ছাদের উপর দুইজন পালোয়ান ল্যাঙ্গট পরিয়া কুস্তী কসরত করিতে ব্যস্ত।

নূতন যজমান কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, পাঁড়ে সৌজন্য সহকারে যোগত্রয়ানন্দকে বসিতে বলিল। সম্মুখের আসনটিতে উপবেশন করিয়াই যোগত্রয়ানন্দ পাঁড়ের দিকে সঞ্চালিত করিলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, “মহল্লার অনেকে বলে, তুমি নাকি একজন দুর্দ্ধর্ষ গুণ্ডা? ধর্ম্মক্ষেত্রে আছো, বাবা বিশ্বনাথের সেবার অধিকার পেয়েছো, তবে গুণ্ডামী কর কেন?”

বটুক পাঁড়ের ভাঙ্গের নেশা এই আকস্মিক আঘাতে অনেকটা টুটিয়া গিয়াছে। ভাঁটার মতো চোখ দুইটি যোগত্রয়ানন্দের দিকে সে নিবদ্ধ করে, কিন্তু ক্ষণপরেই তাহা সরাইয়া নেয়, কি জানি কেন মাথা নীচু করিয়া নীরব নিস্পন্দ হইয়া সে বসিয়া থাকে। যোগত্রয়ানন্দের চোখে মুখে কোন্ অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ সে দেখিয়াছে, তাহা কে বলিবে?

পাঁড়ের ইয়ার-বন্ধু এবং সেবকেরা এই আকস্মিক তিরস্কারে চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, আর কসরত-রত পালোয়ান দুইটি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যোগত্রয়ানন্দের ঠিক পিছনে। অর্থাৎ, পাঁড়েজীর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে তাহারা প্রস্তুত, হুকুম মিলিলেই কলিকাতার এই বেকুব আদমীকে তাহারা নীচে ছুঁড়িয়া ফেলিবে।

ইতিমধ্যে গুণ্ডারাজ বটুক পাঁড়ের মুখভাব প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে। যুক্তকরে, ধীর কণ্ঠে সে বলিতে থাকে, “আমার

ভেতর থেকে কে যেন কেবলি ডেকে বলছে—আপনি আমার জন্ম-জন্মান্তরের গুরু। আমি তা বিশ্বাস করেছি, মেনেও নিয়েছি। নইলে ছুনিয়ায় এমন কোন্ মানুষ আছে যে বটুক পাঁড়েকে গুণ্ডা বলে গালি দেবার হিম্মত রাখে?"

সঙ্গে সঙ্গেই বটুক পাঁড়ে যোগত্রয়ানন্দজীর চরণতলে লুটাইয়া পড়ে। অনুশোচনায় হৃদয় তাহার দগ্ধ হয়। তারপর অকপটে যোগত্রয়ানন্দের কাছে বিবৃত করে তাহার এতদিনকার অনেক কিছু দুষ্কৃতি ও পাপাচারের কাহিনী। ততক্ষণে দিব্য আনন্দের আভায় যোগত্রয়ানন্দের চোখ মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম ও করুণায় আপ্লুত হইয়া অতঃপর পাঁড়েকে তিনি নানা উপদেশ ও আশ্বাস দেন। ধর্ম্ম-জীবন গঠনে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করেন।

পাঁড়ে একান্তভাবে যোগত্রয়ানন্দের শরণ নেয় এবং সেই দিন হইতে ঘটে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল পাপময় জীবনের অবসান।[১]

হাতের টাকা কয়েক দিনের মধ্যেই ফুরাইয়া গেল। এবার যোগত্রয়ানন্দ কাশীধামে বসিয়াই শুরু করেন তাঁহার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা। বহু সঙ্কটাপন্ন রোগীকে তিনি এ সময়ে আরোগ্য করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি খ্যাতনামা হইয়া পড়েন। ভাল উপার্জ্জনও হইতে থাকে। কিন্তু দরিদ্র রোগীদের কাছ হইতে তিনি কোন অর্থ গ্রহণ করেন না, আর গৃহে সদাব্রত লাগিয়াই আছে, তাই অর্থের অভাব তাঁহার ঘুচিতে চায় না।

জননীর দেহের অবস্থা ক্রমে অবনতির দিকে যাইতেছে, এবার শেষের দিনটি সমাগত হয়। মাতৃভক্ত যোগত্রয়ানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, "মা, তুমি আদেশ দিয়েছিলে—তাই কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথের চরণতলে তোমায় নিয়ে এসেছি। আমার কথা আমি রেখেছি। তোমার মনের আর কি ইচ্ছে আছে, আমায় খুলে বল। আমি তা পূরণ করবো।"

১ সাধক শশীভূষণ : সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যু-পথ যাত্রিণী জননী বলেন, "বাবা শশী, তোকে আমার একটা শেষ অনুরোধও রাখতে হবে।"

"বল মা, কি তুমি চাও।"

"বাবা, তুই যে অবস্থায় আছিস্ তাতে সংসারে থাকা কষ্টকর তা আমি বুঝি। কিন্তু তুই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হলে পরিবারের এতগুলো লোক যে অনাহারে মরবে। তুই আমায় কথা দে—গৃহস্থ থেকেই তুই সাধনভজন করবি, সন্ন্যাসী কখনো হবিনে।"

"তাই হবে মা। তোমার কথাই রাখবো। গৃহীযোগী রূপেই চালিয়ে যাবো আমার সাধনা। গুরুকৃপায় ও তোমার আশীর্ব্বাদে পরম প্রাপ্তি যেন আমার ঘটে।"

এবার অপার সন্তোষে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া জননী ত্যাগ করেন তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস।

এ সময়কার কাশীর পরিবেশটি বড় আনন্দময়। কয়েক জন শিবকল্প মহাত্মার আবির্ভাবের ফলে জনজীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে নূতন আধ্যাত্মিক চেতনা। এই সিদ্ধপুরুষদের অলৌকিক জীবন, শক্তি বিভূতি ও করুণা-লীলার কাহিনী নিয়া সর্ব্বত্র সোৎসাহ আলোচনা চলিতেছে। দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থীদের ভীড় এই সব বিরাট পুরুষদের আস্থানে লাগিয়াই আছে।

যোগত্রয়ানন্দ অবসর পাইলেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ প্রভৃতি মহাত্মাদের কাছে গিয়া উপস্থিত হন, পুণ্যময় সান্নিধ্যে বসিয়া দেহ মন প্রাণ তাঁহার জুড়াইয়া যায়। একদিন তিনি ভাস্করানন্দ সরস্বতী মহারাজের আশ্রমে তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন। শহরের উপান্তে এক বিস্তীর্ণ বাগিচায় তাঁহার আশ্রম। যোগবিভূতিসম্পন্ন এই মহাপুরুষকে দর্শনের জন্য দর্শনার্থীদের উৎসাহের সীমা নাই।

প্রথম দিন জনতার ব্যূহ ভেদ করিয়া যোগত্রয়ানন্দ কোন মতে মহাত্মার নিকটস্থ হইলেন। প্রণাম করার পর তিনি শুধু কহিলেন, "দর্শন হো গিয়া, আভি চলা যাও।"

বড় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়েন যোগত্রয়ানন্দ। পর পর আরো দুই দিন ভাস্করানন্দ মহারাজের কাছে গেলেন, কিন্তু মহাত্মা তাঁহাকে তেমন আমলই দিলেন না।

এবার তিনি দুঃখিত চিত্তে ভাবিতে থাকেন, 'কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে তো আমি সরস্বতীজীর কাছে যাই নি, গিয়েছি জ্ঞান আহরণের জন্য। তবে কেন তিনি এমনভাবে আমায় উপেক্ষা করলেন?'

কয়েক দিনের মধ্যেই ঘটনার গতিপ্রকৃতি বিস্ময়কররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। প্রবীণ গুরুভ্রাতা চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামী এসময়ে কিছুদিনের জন্য কাশী আসিয়া উপস্থিত। গুরু শিবরামানন্দ স্বামীর হাতে গড়া মানুষ তিনি, গুরুকৃপায় ও আপন সাধন-বলে অশেষ-শাস্ত্রবিদ্ রূপে তিনি পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন, যোগবিভূতি অর্জ্জনে হইয়াছেন সফলকাম। এই গুরুভ্রাতাকে যোগত্রয়ানন্দ নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতোই শ্রদ্ধা করেন, প্রয়োজনমতো দুরূহ শাস্ত্রতত্ত্ব তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া নেন, নিগূঢ় যোগসাধনের নির্দ্দেশাদি গ্রহণ করেন। কাশীতে আসিয়া চিদ্‌ঘনানন্দজী তাঁহার পরম স্নেহভাজন যোগত্রয়ানন্দের গৃহেই অবস্থান করিতে থাকেন।

চিদ্‌ঘনানন্দের নিকট ভাস্করানন্দ সরস্বতী মহারাজ নানাভাবে উপকৃত, তাঁহার আগমনের বার্ত্তা শুনিয়াই তাড়াতাড়ি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। স্বামীজীকে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য দেখানোর জন্য প্রচুর পুষ্পমাল্য ও ফলমূল নিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে রহিয়াছে কতিপয় ভক্ত-শিষ্য।

সরস্বতী মহারাজের আগমনের সংবাদ শুনিয়াই চিদ্‌ঘনানন্দজী চাদর মুড়ি দিয়া কম্বলাসনে শুইয়া পড়িলেন। ভান করিলেন, তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। সরস্বতী মহারাজ নীরবে কক্ষের একপাশে বসিয়া বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। তারপর হঠাৎ চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামীর কপট নিদ্রা টুটিয়া গেলে নিযুক্ত হইলেন তাঁহার পদসেবায়।

"ওকে, ভাস্কর এসেছো? তা বেশ, তা বেশ, তোমায় দেখে খুব আনন্দ হলো। কখন এলে?"—বলিয়া চিদ্‌ঘনানন্দ সাদরে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, জানাইলেন তাঁহার আশীর্ব্বাদ।

এবার গৃহস্বামী যোগত্রয়ানন্দের দিকে সরস্বতী মহারাজের দৃষ্টি পতিত হয়। সোৎসাহে বলেন, "ধন্য তুমি। কি সৌভাগ্য তোমার। অতুলনীয় শ্রদ্ধা আর প্রেমের ডোরে অনায়াসে তুমি এই শিবকল্প মহাপুরুষকে বেঁধে ফেলেছো। অথচ আমরা কত চেষ্টা করেও এঁকে আমাদের কাছে ধরে রাখতে পারিনে। কেবলই তিনি দূরে দূরে পালিয়ে বেড়ান।"

চিদ্‌ঘনানন্দ স্মিতহাস্যে বলেন, "ভাস্কর, তুমি এই সমর্থ গৃহী-যোগীকে, আমার গুরুর আশিস্‌পূত এই সাধককে, ঠিকমতো চিনতে পারো নি। একে ভেবেছিলে সংসারাবদ্ধ জীব বলে। তাই তোমার সকাশে দু-তিনবার গিয়েও ইনি তোমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পান নি।"

ভাস্করানন্দ সরস্বতী নিজের ভুল বুঝিতে পারেন, এবার আনন্দে যোগত্রয়ানন্দকে জড়াইয়া ধরেন, বার বার করেন সাধুবাদ।

আনীত ফলমূল চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামীর সম্মুখে ধরিতেই তিনি বলেন, "না ভাস্কর, আগে তুমি আমার এই গুরুভাইর আতিথ্য গ্রহণ করো, তারপর আমি তোমার উপহার করবো অঙ্গীকার।"

যোগত্রয়ানন্দের গৃহে বসিয়া দুই চারিটি ফল ভাস্করানন্দ ভোজন করিলেন। তারপর চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামীর সহিত নানা নিগূঢ় শাস্ত্রতত্ত্ব সাধনপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা সারিয়া নিজের আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। গুরুভ্রাতা চিদ্‌ঘনানন্দের কৌশলে যোগত্রয়ানন্দের মনের ক্ষোভ সেদিন এভাবে তিরোহিত হইল[১]।

যোগত্রয়ানন্দের বৃহৎ পরিবারে ব্যয় অনেক। অথচ আয় অতি সামান্য। দুশ্চিকিৎস্য বহু রোগী তিনি আরোগ্য করিতেছেন বটে,

১ সাধক শশীভূষণ : সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু পারিশ্রমিক নেন যৎসামান্য। দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসায় অর্থ গ্রহণ তো করেনই না বরং পথ্য ও অন্নবস্ত্রের জন্য অনেক সময় তাহাদেরই সাহায্য করিতে হয়। তাছাড়া, কোন প্রার্থীকে যোগত্রয়ানন্দ ফিরাইতে পারেন না, তাই ছোটখাটো আর্থিক সাহায্য মাঝে মাঝে দুঃস্থদের দিতে হয়। ফলে সংসার প্রায় অচল, ঋণের বোঝা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামী এ পরিস্থিতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন। ভাবিলেন, দেবপ্রতিম এই গুরুভাইকে তো এবার রক্ষা করা দরকার। অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করিয়া এত বড় পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন কি করিয়া চলিবে?

আমেটির রাজা চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামীর খুব ভক্ত। স্বামীজী তাঁহার কাছে যোগত্রয়ানন্দের কথা বিশদ করিয়া লিখিলেন,—"আমার এই গুরুভাইটি বৈরাগ্যবান্ সাধক, শাস্ত্রজ্ঞান এবং যোগৈশ্বর্য্যও তাঁহার প্রচুর। নিস্পৃহ ও অনাসক্ত হইয়া সংসারে আছেন তাই অর্থাভাবে তাঁহার বৃহৎ সংসারটি ক্লিষ্ট হচ্ছে। আমার ইচ্ছা তুমি একে তোমার কাছে রাখ এবং এর সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়ে একে ভারমুক্ত করো। এতে তোমার কল্যাণ হবে।"

উত্তরে রাজা জানান, "আজ্ঞা পালন করতে পারলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করবো। যোগী মহারাজের পরিবারের খরচ চালানোর জন্য প্রতি মাসে আমার এস্টেট তিনশত টাকা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনি অবিলম্বে তাঁকে পাঠাবেন এবং তাঁকে সেবা করার সুযোগ দিয়ে আমায় কৃতার্থ করবেন।"

রাজার এই স্বীকৃতি পাইয়া স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দের আনন্দের অবধি নাই। চিঠিটি যোগত্রয়ানন্দকে দেখাইয়া কহিলেন, "যাক্ এবার থেকে একটা বড় দুশ্চিন্তা দূর হলো। এই বৃহৎ পরিবারের দায়িত্বের কথা আর তোমায় ভাবতে হবে না। যত সত্বর পার, সবাইকে নিয়ে তুমি আমেটি যাত্রা করো।"

যোগত্রয়ানন্দ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকেন। তারপর যুক্তকরে

নিবেদন করেন, "স্বামীজী এভাবে কোন ধনী ব্যক্তির গলগ্রহ হয়ে থাকাটা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করিনে। গুরুদেবের কৃপায় এবং আপনার আশীর্ব্বাদে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ কোনমতে হয়েই যাবে। আপনার চরণে আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।"

চিদ্‌ঘনানন্দজী প্রসন্ন হইয়া উঠেন, গুরুভাইকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া কহেন, "আত্মজ্ঞান পেতে হলে চাই এমনি অনাসক্তি, এমনি ত্যাগ বৈরাগ্য। অচিরে তোমার তপস্যা জয়যুক্ত হোক, আন্তরিক-ভাবে এই আশীর্ব্বাদ আমি করছি।"

বহু কঠিন রোগী যোগত্রয়ানন্দ আরোগ্য করিতেছেন, মৃত্যুপথ-যাত্রী কত লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। মারাত্মক রোগে আক্রান্ত নরনারী প্রথমেই তাঁহার কাছে চিকিৎসার জন্য চলিয়া আসে। কাশীর কয়েকজন প্রবীণ ডাক্তার কবিরাজের এজন্য খেদের অন্ত নাই।

একদিন এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার যোগত্রয়ানন্দকে প্রণাম জানান, প্রশ্ন করেন, "বাবা, মায়ের তো গঙ্গা-প্রাপ্তি হলো, এবার আপনি কবে কোলকাতায় ফিরছেন ?"

"কেন বলুন তো"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন যোগত্রয়ানন্দ।

ডাক্তার মৃদুহাস্য করিয়া বলেন, "ভাবছি, তাহলে আমাদের আরো রোগী জুটবে এবং আমরা দুমুঠো খেতে পাবো। আর ওদিকে আপনি ফিরে গেলে আপনার কোলকাতার রোগীরাও বাঁচবে।"

যোগত্রয়ানন্দ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "ভয় নেই আপনাদের। সময় এসে গেছে। শিগ্‌গীরই আমি কাশী ত্যাগ করবো।"

অল্পদিনের ব্যবধানেই বৃহৎ পরিবারটি সঙ্গে নিয়া তিনি বরানগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কয়েক মাস পরে এক নিদারুণ দুঃসংবাদ পৌঁছিল যোগত্রয়ানন্দের কাছে। কাশী ত্যাগ করার পর স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া তীর্থরাজ প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হন এবং হঠাৎ প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হন। শেষ সময় সমাগত জানিয়া স্বামীজী ভক্তগণ-

সহ পবিত্র সঙ্গমস্থলে উপনীত হন, তারপর পদ্মাসনে আসীন অবস্থায় স্বেচ্ছায় বরণ করেন জল-সমাধি।

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ শুধু যোগত্রয়ানন্দের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ গুরুভ্রাতাই নন, গুরু শিবরামানন্দ স্বামীর পাণ্ডিত্য ও যোগপন্থার এক শ্রেষ্ঠ ধারকবাহক তিনি। গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর হইতে যোগত্রয়ানন্দকে সাধনা ও শাস্ত্রতত্ত্ব সম্পর্কে নানা নিগূঢ় উপদেশ এতকাল তিনি দিয়া আসিতেছিলেন। তাই তাঁহার এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে যোগত্রয়ানন্দ শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন।

শুধু একজন অশেষ শাস্ত্রবিদ্‌রূপেই নয়, মহাজ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষরূপেও কলিকাতা এবং কাশীর সাধকসমাজে যোগত্রয়ানন্দ পরিচিত ছিলেন।

বরানগরে ও বালীতে থাকাকালে তাঁহার গৃহটি হয় তরুণ শাস্ত্রবিদ্যার্থী ও সাধকদের এক মর্ম্মকেন্দ্র। বহু প্রবীণ সাধু-সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ ভক্তেরা এসময়ে তাঁহার কাছে উপনীত হইতেন, অধ্যাত্ম জীবনের নানা জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া নিতেন।

তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যে-সব প্রতিভাধর এবং তরুণ জিজ্ঞাসুরা আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসাদ চন্দ্র, প্রেমানন্দ ভারতী প্রভৃতি। প্রথমোক্ত দুই জন উত্তরকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ নামে। প্রেমানন্দ ভারতীও পরবর্ত্তীকালে সাধনমার্গে উন্নতি লাভ করেন এবং আমেরিকায় ধর্ম্ম প্রচারে উদ্বুদ্ধ হন।

যোগত্রয়ানন্দের কাছে পাণিনির মহাভাষ্য ও ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যা শুনিয়া বিবেকানন্দ সোৎসাহে একবার বলিয়াছিলেন, "আমার ইচ্ছে হয়, কোন নির্জ্জন পাহাড়ের গুহায় গিয়ে, আপনার চরণতলে বসে, ঋষিদের শাস্ত্রগুলো একান্ত মনে পাঠ কার।"

একদিন যোগত্রয়ান্দ দিব্যভাবে উদ্দীপিত হইয়া ঋষিদের ধ্যানলব্ধ

বৈদিক জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। নিবিষ্ট মনে দীর্ঘসময় তাঁহার ভাষণ শোনার পর বিবেকানন্দ উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠেন, "বেদের পরমতত্ত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব যদি এমনি হয়, তবে এই পৃথিবীতে এমন কোন্ মানুষ আছে যে এই মহাপবিত্র গ্রন্থের কাছে মাথা নীচু করবে না?"

জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, ডন পত্রিকার সম্পাদক, মনীষী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একবার মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনে বরাবরই বর্ত্তমান ছিল। উত্তর জীবনে তিনি গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং কাশীধামে কঠোর সাধনায় ব্রতী হইয়া এক উচ্চকোটির সাধকে পরিণত হন। যোগত্রয়ানন্দের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সতীশচন্দ্র দর্শনতত্ত্বের কয়েকটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

মহাত্মা এই সব প্রশ্নের মীমাংসা করেন গণিতের সাহায্যে। প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও আধুনিক গণিতের তত্ত্ব ও প্রয়োগ কৌশল যেরূপ নৈপুণ্যের সহিত তিনি বুঝাইয়া দেন, তাহাতে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া যান।

বিদায় নিবার সময় তিনি বলেন, "গণিতের সাহায্যে ধর্ম্ম ও দর্শনের মর্ম্ম যে এমন করে উদ্‌ঘাটন করা যায়, তা আমার ধারণায় ছিল না। আমার প্রার্থনা, আপনি এ ধরণের ব্যাখ্যাযুক্ত একটি গ্রন্থ কৃপা ক'রে রচনা করুন। আধুনিক যুগের মানুষ এর দ্বারা অশেষ-ভাবে উপকৃত হবে।"

যোগত্রয়ানন্দ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "সবই প্রভুর ইচ্ছা।"

অভেদানন্দ মহারাজ এসময়ে শাস্ত্রপাঠের জন্য আগ্রহাকুল। প্রায়ই তিনি যোগত্রয়ানন্দের সকাশে উপস্থিত হইতেন, অলৌকিকী প্রজ্ঞা ও যোগসিদ্ধির অধিকারী এই মহাত্মার কাছ হইতে বহু শাস্ত্রীয় প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা তিনি জানিয়া নিতেন। সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে যোগত্রয়ানন্দের সমান ব্যুৎপত্তি ছিল, কাজেই আধুনিক

শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণেরা তাঁহার সংসঙ্গ ও আলোচনায় তৃপ্তি পাইতেন, তাঁহাদের নানা সন্দেহের নিরসন ঘটিত।

যোগত্রয়ানন্দ এসময়ে অযাচক বৃত্তি নিয়া বাস করিতেছেন। বহু দুরারোগ্য রোগী তাঁহার চিকিৎসার ফলে বাঁচিয়া উঠিতেছে বটে, কিন্তু এজন্য কোন পারিশ্রমিক নিতে তিনি অপারগ। ভগবৎ কৃপায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যখন যে যাহা দেয় তাহাতেই তাঁহার সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

এমন বহুদিনই গিয়াছে, ঘরে শিশুপুত্রের জন্য দুধটুকুও যোগাড় করা যায় নাই। গৃহিণী গোপনে নিজের আঁচলে চোখের জল মুছিতেছেন। চাল ডাল ফুরাইয়াছে, হাট-বাজার করার কোন সঙ্গতি নাই, অথচ দশ-বারোটি প্রাণীর অন্ন জোগাইতে হইবে। নিজের পরিবারের লোক তো ছিলই, তদুপরি দুঃস্থ রোগী এবং আত্মীয়-অভ্যাগতেরাও অনেক সময় তাঁহার গৃহে আশ্রয় নিতেন। এই গুরু সাংসারিক দায়িত্বের সকল কিছু তিনি সমর্পণ করিয়াছিলেন ভগবানের চরণে। আর লোকে প্রায়ই অবাক হইয়া দেখিত, শরণাগত সাধকের সকল কিছু প্রয়োজন ভগবানই দিনের পর দিন মিটাইয়া দিতেছেন।

সে-বার রাধানাথ নামে একটি ছাত্র মরণাপন্ন কাতর হইয়া যোগত্রয়ানন্দের গৃহে আশ্রয় নেয়। রোগীর শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধানের জন্য তাহার পত্নী ও মাতাপিতাও আসিয়া উপস্থিত। রোগীর ঔষধের ব্যয় তো মহাত্মাকে বহন করিতে হইতেছেই, তদুপরি রহিয়াছে রোগীর পরিবারের সবাইর ভরণপোষণ।

বহু চেষ্টা ও যত্নে যোগত্রয়ানন্দ রোগীকে ভাল করিয়া তুলিলেন। রোগমুক্ত হইবার পর মাঝে মাঝে সে যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গে ভগবৎ তত্ত্বের আলোচনা করিতে বসিত।

রাধানাথের মা ইহা লক্ষ্য করিতেছেন আর বিরক্তিতে তাঁহার মন

ভরিয়া উঠিতেছে। অবশেষে একদিন তিনি ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন। যোগত্রয়ানন্দকে গালাগালি দিয়া বলিতে থাকেন, "আমার একটি মাত্র ছেলে, এবার এম-এ পরীক্ষা দেবে, রোজগার করে সংসারের সব দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে, তাকে কিনা আপনি সাধু বানিয়ে ফেলছেন। আপনার এ বাহাদুরিতে আর কাজ নেই।"

ক্রোধভরে মহিলাটি সেইদিনই সবাইকে নিয়া প্রস্থান করেন। মহাত্মা যে তাঁহার পুত্রের প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, তাঁহার পরিবারের সবাইকে এতদিন ভরণ-পোষণ করিয়াছেন এবং এজন্য যে চিরকাল তাঁহার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এসব কোন কিছুই তাঁহার অন্তরে ঠাঁই পায় নাই। যোগত্রয়ানন্দ কিন্তু একটি কথাও ইঁহাদের বলেন নাই। নির্ব্বিকার, অভিমানশূন্য মহাপুরুষ তখন বহির্ব্বাটিতে বসিয়া জিজ্ঞাসুদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন।

এই সময়ে যোগত্রয়ানন্দ একদিন গুরুদেব শিবরামানন্দের প্রত্যাদেশ লাভ করেন। গুরু বলেন, "বৎস, অযাচক বৃত্তি নিয়ে সংসার করছো, ত্যাগ তিতিক্ষাময় তপস্যায় আপ্তকাম হয়েছো, ভাল কথা। কিন্তু সাধু যদি জনসমাজে বাস করে, জনকল্যাণের জন্য কিছু করতে হয়। ভগবৎ কৃপায় বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি দ্বারা ঋষিদের তত্ত্ব তুমি উপলব্ধি করেছো। সেই তত্ত্ব এ যুগের মানুষের উপযোগী করে প্রকাশ করো। বেদ, আগম, ভক্তিশাস্ত্র সব কিছুর নির্য্যাস নিয়ে তুমি রচনা করো একটি মহান গ্রন্থ।"

যে চিন্তা মাঝে তাঁহার হৃদয়ে দোলা দিত, বিদেহী গুরুদেব আজ দিলেন তাহারই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ। সঙ্কল্প তাঁহার তখনি স্থির হইয়া গেল, যোগত্রয়ানন্দ শুরু করিলেন তাঁহার মহান কালজয়ী গ্রন্থের রচনা। এই গ্রন্থ হইতেছে বহু খ্যাত—আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডার খুঁজিয়া, সাধনজাত স্বচ্ছ দৃষ্টির আলোকে, এই অপূর্ব্ব মনীষা-দীপ্ত মহাগ্রন্থ রচিত। সাত্ত্বিক বিচারনৈপুণ্য যেমন

ইহাতে আছে, তেমনি আছে চিরন্তন ও সর্ব্বজনীন পরমতত্ত্বের উদ্‌ঘাটন, বিশেষ করিয়া ঋষি-রচিত শাস্ত্রের তত্ত্ব নিরূপণ।

এই গ্রন্থ রচনার সময় যে ত্যাগ তিতিক্ষা ও ধৈর্য্য যোগত্রয়ানন্দ স্বীকার করিয়াছেন, সমগ্র পরিবারকে যে চরম দুর্গতি ও অর্থকষ্টের পরীক্ষায় টানিয়া নিয়াছেন তাহা অকল্পনীয়। কোন দিন অর্দ্ধাহার জুটিয়াছে, কোন দিন তাহাও জুটে নাই, বেলপাতার রস পান করিয়া বাড়ীর সবাই দিনাতিপাত করিয়াছে। ঠাকুরঘরে ধ্যান-ভজনের পর যোগত্রয়ানন্দ রত হইতেন তাঁহার এই শাস্ত্রগ্রন্থের রচনায়। প্রতিদিন চৌদ্দ-পনের ঘণ্টা করিয়া অবিরাম পরিশ্রম তাঁহাকে করিতে হইত। হাতে অর্থ নাই, প্রাচীন দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা নাই, অথচ গুরু কৃপায়, সিদ্ধ মহাত্মাদের সাহায্য ও দৈবী যোগাযোগের ফলে প্রয়োজনমতো সব কিছুরই ব্যবস্থা যেন আপনা হইতে সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে।

গৃহে যাঁহার অন্নের সংস্থান নাই, তাঁহার পক্ষে এই সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করা কি করিয়া সম্ভব? অথচ এ অসম্ভব সম্ভব হইল, প্রয়োজনমতো সব কিছুই ভগবান মিলাইয়া দিলেন।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ প্রকাশিত হইলে সাধকমহলে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের সাধনোজ্জ্বল প্রজ্ঞা, মনীষা ও বিদ্যাবত্তায় সকলে বিস্মিত হন।

এই গ্রন্থের পরিচয় পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন,—এমন একটি বহুমুখীন তত্ত্ব-সম্বলিত মহাগ্রন্থ যে মানুষ রচনা করতে পারেন, তাঁর মেধা ও প্রতিভার পরিমাপ আমি করতে পারছি না। আমার মনে হয়, এই গ্রন্থ ইংরেজীতে রচিত হলে সারা পৃথিবীতে এর প্রচার হতো, সত্যকার আদর হতো।

মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ তাঁহার যৌবনকালে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "এই মহান গ্রন্থে এমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতার নিদর্শন ছিল যাহা দেখিয়া তৎকালে আমার মন স্তব্ধ

হইয়া গিয়াছিল এবং নীরবভাবে মহাজ্ঞানী ঋষিকল্প গ্রন্থকারের চরণে পুনঃপুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছিলাম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন এবং নবীন দর্শন, বিজ্ঞান সর্ব্ব শাস্ত্রেরই পূর্ণ জ্ঞানের পরিচয় এই গ্রন্থমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া আমার একান্ত ইচ্ছা যে ইঁহাকে দর্শন করিব এবং ইঁহার চরণে বসিয়া জ্ঞানের অনুশীলন করিব। গ্রন্থপাঠে মনে হইতেছিল যে গ্রন্থকার কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সকল মার্গেই সমরূপ অধিকারী; তিনি ঋষিকল্প এবং বিজ্ঞান মদগর্ব্বিত বর্ত্তমান ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের গুরু স্বরূপ।”

যোগত্রয়ানন্দজীর উত্তুঙ্গ সারস্বত প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়া ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ আরও লিখিয়াছেন, “তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান গ্রন্থ—আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ। এই মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে পৃথিবীর বিশেষ কল্যাণ হইত সন্দেহ নাই। ইহার ভূমিকায় যে অংশটুকু প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাও অতি বিশাল ও অপূর্ব্ব। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার যেরূপ ‘সিন্থেটিক ফিলসফির’ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার চেয়েও বিরাট কল্পনা ছিল আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপকারের। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য; ইহা হইয়া উঠে নাই। তাঁহার মানবতত্ত্ব ও বর্ণ বিবেক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। তাঁহার পরলোক তত্ত্ব, পরলোক ও আবশ্যকীয় যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে বিপুল গ্রন্থ। ইহা বড় বড় চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার তিন খণ্ড আমি দেখিয়াছি, চতুর্থ খণ্ড দেখি নাই। প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা জানি না। তাঁহার ভূত ও শক্তি, আয়ুস্তত্ত্ব, গণিতের দার্শনিক রহস্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক আলোচনা-প্রধান গ্রন্থও আছে। এই সব গ্রন্থ তাঁহার কাশী আসিবার পূর্ব্ব সময়কার রচনা। কাশী আসিবার পর কাশী অবস্থানের শেষ দিকে এবং কাশী ত্যাগের পর তাঁহার আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে[১]।”

অযাচক বৃত্তির উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া যোগত্রয়ানন্দ

---

১ সাধু দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ: ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। তদুপরি ছিল শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়, এজন্য তাঁহাকে বহুতর কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কিন্তু সুখে দুঃখে, জয়-পরাজয়ে, লাভ ক্ষতিতে সমজ্ঞানী মহাপুরুষ সর্ব্বদা হাসি মুখে এই সব পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন।

সেদিন গৃহিণী জানাইয়া দেন। গৃহে এক মুষ্টি তণ্ডুল নাই। মুদি বাকিতে মাল দিতে অস্বীকার করিয়াছে। একটি টাকা কোথাও হইতে সংগ্রহ করা যায় নাই। এখন উপায় ?

মহাত্মা আকাশের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া কহিলেন, "আমরা তাঁর চরণে শরণ নিয়ে আছি, রাখতে হয় তিনি রাখবেন, মারতে হয় মারবেন। ধৈর্য্য ধর, একটু কিছু হবেই।"

তারপর তাঁর আদেশে বাড়ীর সবাই বিল্বপত্রের রস পান করিয়া সেদিনটি অতিবাহিত করিলেন। আরো প্রায় দুই দিন অনশনে কাটিয়া গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে যে এই চরম দুর্গতি চলিয়াছে—শিষ্য, ভক্ত, দর্শনার্থীদের কেহই তাহা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে নাই। পাঠকক্ষে বসিয়া যোগত্রয়ানন্দ যথারীতি গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, কখনো বা ভক্ত ও সাধনার্থীদের নিয়া তত্ত্ব আলোচনায় রহিয়াছেন বিভোর।

তৃতীয় দিনের অপরাহ্ণ। কালীপ্রসাদ (অভেদানন্দ) প্রভৃতি জিজ্ঞাসু ভক্ত গৃহে সমবেত হইয়াছেন। আর যোগত্রয়ানন্দ প্রশান্ত কণ্ঠে একটি জটিল দার্শনিকতত্ত্ব তাহাদের বুঝাইতেছেন। এমন সময়ে ডাকপিওন আসিয়া একটি রেজেষ্ট্রী করা ইনসিওরড্ খাম বিলি করিয়া গেল।

খামটি খুলিয়া যোগত্রয়ানন্দ উহার ভিতরকার চিঠিটি পাঠ করেন। তারপর ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিষ্পন্দ হইয়া যান। কপোল বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরিতে থাকে।

ভক্ত ও শিক্ষার্থীরা বিস্ময়ে অবাক হইয়া মহাত্মার দিকে নীরবে নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া আছেন। এমন দৃশ্য আর কখনো তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই।

প্রায় পনের মিনিট কাল এইভাবে কাটিয়া যায়। অতঃপর কালী-মহারাজ (অভেদানন্দ) প্রশ্ন করেন, "বাবা, ব্যাপারটি কি, আমরা কেউ তা বুঝতে পারছিনে। আপনার চক্ষে অশ্রুজল তো আমরা কখনো দেখি নি। সমস্ত কিছু শোক দুঃখের অতীত আপনি। এমন কি দুর্দ্দৈব ঘটেছে যার জন্যে আপনি এত অভিভূত হয়ে পড়েছেন ? আপনার চোখে জল কেন ? আর ঐ চিঠি পড়েই বা এমন স্তব্ধ হলেন কেন আপনি ? আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি।"

যোগত্রয়ানন্দ এবার মুখ খুলিলেন। কহিলেন, "তোমরা আজ আমার চক্ষু থেকে যে অশ্রু ঝরতে দেখেছ তা শোকের নয়, আনন্দের। শোক আমায় কখনো অভিভূত করতে পারে না, কাঁদাতে পারে না। আমি কেঁদেছি শ্রীভগবানের করুণার কথা মনে করে। এই পত্রটা তোমরা পড়ে দেখতে পারো।"

সবাইর সম্মুখে এটি পাঠ করা হইল। লিখিয়াছেন কাশীর চৌখাম্বা মহল্লার অধিবাসী এক সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁহার চিঠির মর্ম্ম এইরূপ :

আগের দিন রাত্রে তিনি এক স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বাবা বিশ্বনাথ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন—আমি উপবাসী রয়েছি, অন্নজল কিছুই গ্রহণ করি নি শিগ্‌গীর আমার জন্যে অন্নের ব্যবস্থা কর। আমার এক পরমভক্ত উপবাসী রয়েছে, তাই আমায়ও কাটাতে হচ্ছে উপবাসী হয়ে। আমার প্রতি তোমার যদি বিন্দুমাত্র ভক্তিশ্রদ্ধা থাকে তবে আমার ঐ ভক্তের অন্ন গ্রহণের ব্যবস্থা করে দাও। এতে তিলমাত্র বিলম্ব যেন না হয়।

শুধু তাহাই নয়, প্রভু বিশ্বনাথ কাশীধামের ঐ ভদ্রলোকটিকে উপবাসী ভক্তের নাম ঠিকানা জানাইয়া দিতেও ভুল করেন নাই—ঐ নাম ঠিকানা স্বপ্নের মধ্যেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে প্রকট হইয়া উঠে এবং প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিটি তদনুযায়ী যোগত্রয়ানন্দের ঠিকানায় এই খাম পাঠান। ইহার মধ্যে রহিয়াছে বিস্তৃত একটি চিঠি এবং পাঁচশত টাকার নোট।

পত্রপ্রেরক আরো লিখিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাস প্রভু বিশ্বনাথের স্বপ্নাদেশ ব্যর্থ হইবে না এবং প্রেরিত অর্থ যথাস্থানে এবং যথাসময়ে পৌঁছিবে।

অতঃপর যোগত্রয়ানন্দ তাঁহার গৃহের অবস্থা সবিস্তারে বিবৃত করেন। প্রায় তিনদিন যাবৎ তাঁহার পরিবারের সবাই উপবাসী রহিয়াছেন। তিনি খুব ভালভাবে জানেন, তাঁহার এমন বহু ভক্ত আছেন যাঁহারা এ সম্পর্কে একটু মাত্র ইঙ্গিত পাইলে তৎক্ষণাৎ সব ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কিন্তু ক্ষুণাক্ষরেও একথা কাহারও নিকট তিনি প্রকাশ করেন নাই। একান্তভাবে শ্রীভগবানের উপরই তিনি নির্ভর করিয়াছেন। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্ব করুণার উৎস, তিনি তো সব কিছুই দেখিতে পাইতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে মুহূর্ত্তে তাঁহার এ অভাব মোচন হইতে পারে। তবে কেন যোগত্রয়ানন্দ অপরের উপর নির্ভর করিতে যাইবেন ?

আজ করুণাময়ের এই দিব্য লীলা দেখিয়া তিনি অভিভূত হইয়াছেন, নয়ন হইতে নামিয়া আসিয়াছে পুলকাশ্রুর ধারা।

এ কাহিনী শুনিয়া সবাই আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন, শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যায় বিরতি দিয়া শুরু করিলেন শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন।

মহেন্দ্র দাস নামে এক ধনী প্রতিবেশী সেখানে ছিলেন। লোকটি শিক্ষিত, অমায়িক ও ধর্ম্মপ্রবণ। যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গে কোনদিনই তাঁহার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু দূর হইতে মহেন্দ্রবাবু তাঁহাকে প্রায়ই লক্ষ্য করিতেন এবং গণ্য করিতেন একজন উঁচুদরের মহাত্মারূপে।

তখন যোগত্রয়ানন্দের খুব অর্থ-সঙ্কট চলিয়াছে। প্রায়ই পাওনাদারেরা বাড়ীতে তাগাদা দিতে আসে। মহেন্দ্রবাবু সেদিন নিজে যাচিয়া কহিলেন, “বাবাজী, আমার কিছু নিবেদন করার আছে, অভয় দেন তো বলি।”

"বল বাবা, কি তুমি আমায় বলতে চাও"—স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেন যোগত্রয়ানন্দ।

"দেখুন, আমার বাবা জীবিত থাকতে প্রায়ই বলতেন, 'ভগবানকে বেঁধে রাখবার কৌশল আমি জানি।' আমরা ব্যগ্র হয়ে তাঁকে ধরে বসতাম, 'বলতাম, বেশ তো, তাহলে সে কৌশলটা আমাদের শিখিয়ে দিন।' তিনি এড়িয়ে যেতেন, বলতেন, 'মৃত্যুর সময় বলে যাবো।'

"বলে যেতে পেরেছেন তো তিনি?" কৌতুকভরে প্রশ্ন করেন যোগত্রয়ানন্দ।"

"হ্যাঁ, তিনি তাঁর দেহান্তের আগে শোনালেন সে কৌশলের কথা। বললেন, 'প্রথমে তোরা প্রচুর টাকাকড়ি রোজগার করে নিবি। তা' দিয়ে গঙ্গাতীরে তৈরী করবি দেয়াল-ঘেরা বাগান। তারপর সন্ধান নিতে হবে এমন সাধুপুরুষের যিনি সাধনা আর শাস্ত্র চর্চ্চায় সব সময় রত, যিনি সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানী, যিনি লোভমোহের অতীত হয়ে ভগবৎ-ভাবে সদা বিভোর হয়ে আছেন। ভগবানকে পাওয়া কঠিন, কিন্তু ভগবানের কৃপা আর অন্তরঙ্গতা পেয়েছেন এমন সাধু পাওয়া তেমন কঠিন নয়। খুঁজলে পাওয়া যায়। এমনতর সাধু ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরের ঐ বাগানে রেখে সেবা করবি। তাঁর মধ্য দিয়ে ভগবানও বাঁধা পড়ে যাবেন।"

"বুঝতে পারছি, তোমার বাবা সত্যিকার চতুর লোক ছিলেন। ভগবানকে বাঁধবার কৌশল যে বার করে, তার চাইতে চতুর আর কে? কিন্তু, আমায় একথা শোনাচ্ছো কেন, বল তো?"

"আপনাকে দর্শন করার পর থেকে বাবার সেই কথাগুলো বার-বার আমার মনে পড়ছে। আপনার সেবার অধিকার আমায় কিছুটা দিন, আমি কৃতার্থ হই। আপনার ওপর ঋণের বোঝা চেপে গিয়েছে। আমি তা লাঘব করতে চাই। আপনি ঋণমুক্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে মানুষের উপকার করতে থাকুন।"

মহাপুরুষের সম্মতি নিয়া এই নূতন ভক্তটি একটা মোটা অঙ্কের ঋণ এ সময়ে পরিশোধ করিয়া দেন।

যোগত্রয়ানন্দের চিকিৎসা পদ্ধতির মূলে ছিল প্রাচীন ভারতের ভেষজ বিদ্যা, অথর্ব্ব বেদোক্ত মন্ত্র প্রয়োগ এবং তাঁহার যোগবিভূতি। জীবনের গোড়ার দিক হইতে রোগ-নিরাময়কে তিনি তাঁহার এক মহান ব্রতরূপে গ্রহণ করেন এবং এই ব্রতসাধনে অর্থ-উপার্জ্জনকে কোনদিনই গুরুত্ব দেন নাই। রোগমুক্তির পর রোগী ও তাহার পরিজনের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিলেই নিজেকে তিনি কৃতার্থ বোধ করিতেন। শ্রীভগবানের করুণালীলার জন্য বার বার করিতেন কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

বালীর অন্যতম জমিদার রাজেন্দ্রবাবুর সহিত যোগত্রয়ানন্দের বেশ হৃদ্যতা ছিল। তাঁহার পরিবারের চিকিৎসায় প্রায়ই তাঁহাকে আহ্বান করা হইত। সে-বার রাজেন্দ্রবাবুর মাতার মস্তকে এক ক্ষত হয় এবং ক্রমে তাহাতে দেখা যায় নিক্রোসিস্ বা অস্থিক্ষয় রোগের আক্রমণ। বিখ্যাত সার্জ্জন, ডাঃ সুরেশ সর্ব্বাধিকারীকে আনিয়া রোগিণীকে দেখানো হয়, তিনি শলাকা ঢুকাইয়া দেখেন, ক্ষত অত্যন্ত গভীর। প্রায় মস্তিষ্কে গিয়া পৌঁছিয়াছে। এ অবস্থায় অস্ত্রোপচার অত্যন্ত বিপজ্জনক—এই মত প্রকাশ করিয়া সার্জ্জন চলিয়া গেলেন। রোগিণী ও তাঁহার ছেলে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন, এবং সেইদিন হইতে যোগত্রয়ানন্দ গ্রহণ করেন চিকিৎসার দায়িত্ব।

অথর্ব্ব বেদোক্ত কয়েকটি নিগূঢ় প্রক্রিয়া এই রোগিণীর উপর যোগত্রয়ানন্দ প্রয়োগ করিলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল, ক্ষত প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে এবং রোগিণীর সুনিদ্রা হইতেছে। অচিরে এই রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

সতীশ পাল শুধু যোগত্রয়ানন্দের ভক্তই নয়, সে তাঁহার সমগ্র পরিবারের একজন একনিষ্ঠ সেবক। অল্প বয়সে সতীশের মনে

তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং বেলুড়ে থাকিয়া মঠ ও স্বামীজীদের সেবায় সে আত্মনিয়োগ করে। অতঃপর এক সময়ে মঠে বাবুরাম মহারাজ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং যোগত্রয়ানন্দ দীর্ঘদিন চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। এই সময়ে সাধক যোগত্রয়ানন্দের তেজোময় ব্যক্তিত্ব ও ত্যাগপূত জীবনের প্রতি সতীশ আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার আশ্রয়েই চলিয়া আসে। সে-বার সতীশ তাঁহার নিজের বাড়ীতে গিয়া মারাত্মক রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। ডাক্তারদের সমস্ত যত্ন ও চেষ্টা বিফল হয় এবং বাড়ীর লোক তাঁহার প্রাণের আশা ছাড়িয়া দেন।

যোগত্রয়ানন্দের কাছে এ সংবাদ পৌঁছিল। সতীশ যে তাঁহার অতি প্রিয় সেবক। তাড়াতাড়ি তখনই সতীশের বাড়ী আলমবাজারে তিনি ছুটিয়া যান। তাঁহাকে দেখিয়াই সতীশ ক্রন্দন করিয়া উঠে, বলিতে থাকে, "বাবা, এবার আর আমি বাঁচবো না, আশীর্ব্বাদ করুন, জন্মে জন্মে যেন আপনার সেবার অধিকার পাই।"

সতীশের অস্থিচর্ম্মসার দেহটি দেখিয়া যোগত্রয়ানন্দ হতাশ হইয়া পড়েন। সেদিনকার মতো কিছু ওষুধপত্র ব্যবস্থা করিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিতেছেন, সঙ্গে রহিয়াছেন এক তরুণ ভক্ত, তাঁহার দিকে তাকাইয়া শোকার্ত্ত স্বরে যোগত্রয়ানন্দ বলিয়া উঠেন, "সতীশের যে অন্তিম অবস্থা দেখলুম রে। এখন একমাত্র ভগবান যদি কৃপা ক'রে বাঁচান।"

ভক্তটি দৃঢ় স্বরে উত্তর দেয়, "বাবা, এজন্য আপনি এত উতলা হয়েছেন কেন? আপনি ভগবানকে একটু চেপে ধরুন, তাহলেই তো সতীশ বেঁচে যায়।"

যোগত্রয়ানন্দ সমস্তটা পথ একেবারে মৌনী হইয়া রহিলেন। বাড়ীতে ফিরিয়াই প্রবেশ করিলেন ঠাকুরঘরে। দ্বার রুদ্ধ অবস্থায় প্রহরের পর প্রহর প্রার্থনা ও ধ্যান-জপে কাটিয়া গেল। পূজাকক্ষ হইতে বাহিরে আসিলে দেখা গেল, বদনমণ্ডল দিব্য প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রভাতে সংবাদ নিয়া জানা গেল, সতীশের রোগ-সঙ্কট

অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। তীব্র যন্ত্রণারও হইয়াছে উপশম। অতঃপর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সে সুস্থ হইয়া উঠে।

যোগত্রয়ানন্দের শাস্ত্রজ্ঞান ও যোগবিভূতির কথা শুনিয়া রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এক সময়ে তাঁহার প্রতি খুব আকৃষ্ট হন। স্বয়ং তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করেন, "বাবা, আপনি লোকের কল্যাণের জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করে শাস্ত্রগ্রন্থ লিখছেন। অর্থের অভাবে অনেক সময় এই কাজে কত ব্যাঘাত হচ্ছে। আপনি অনুমতি দিলে, আমি আপনার সংসার চালানোর ভার নিতে পারি।

যোগত্রয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "গুরুর আদেশে শাস্ত্রতত্ত্ব প্রচারে আমি ব্রতী। বেশ, যতদিন গ্রন্থ ছাপানোর কাজ চলবে ততদিন আপনার প্রস্তাবিত অর্থ আমি নেব। কিন্তু এটা গণ্য হবে আমার ঋণ রূপে। গ্রন্থ ছাপানো হবার পর বিক্রির টাকা থেকে এই ঋণ পরিশোধ করা হবে।"

কালীকৃষ্ণ এ কথায় রাজী হন এবং তাঁহার প্রদত্ত টাকায় কোন-মতে প্রতি মাসে মহাত্মার সংসার ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে থাকে।

কিছুদিন পরের কথা। যোগত্রয়ানন্দ নিজ গৃহে নিভৃতে বসিয়া ধ্যান-জপ করিতেছেন, হঠাৎ এক সময়ে মানসপটে ভাসিয়া উঠে এক দুর্ঘটনার দৃশ্য। দেখেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর নিজের ঠাকুরঘরে সহসা পা ফস্‌কাইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। উঠিয়া দাঁড়ানোর সামর্থ্য নাই। 'আহা! আহা!' বলিয়া যোগত্রয়ানন্দ আর্ত্তস্বরে চেঁচাইয়া উঠেন। নয়ন দুটি করুণায় অশ্রুসজল হইয়া উঠে।

কিছুক্ষণ পরে ধ্যানকক্ষ হইতে বাহির হইতেই দেখিলেন, ঠাকুর-বাড়ীর এক কর্ম্মচারী গাড়ী নিয়া আসিয়াছে।—কর্ত্তা বড় অসুস্থ। এখনই একবার বাবার সেখানে যাওয়া আবশ্যক।

সেখানে উপস্থিত হইয়া যোগত্রয়ানন্দ দেখেন, কালীকৃষ্ণের পা হঠাৎ জখম হইয়াছে তাহা নয়, ব্যাপার আরও গুরুতর। আকস্মিক-

ভাবে পক্ষাঘাতের আক্রমণ ঘটে তাঁহার দুই পায়ে, ফলে তিনি ভূতলে পড়িয়া আহত হন। এই পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্য করা বড় সহজসাধ্য নয়।

কালীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া অসহায়ের মতো কাঁদিয়া ফেলেন। যোগত্রয়ানন্দ সস্নেহে তাঁহার পিঠে কল্যাণময় হস্তটি বুলাইয়া দেন, আশ্বাস দিয়া বলেন, "ভয় কি? ভালো হয়ে যাবেন। শ্রীভগবান নিশ্চয় কৃপা করবেন।"

মহাপুরুষের মঙ্গল হস্তের স্পর্শে তখনি এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, কালীকৃষ্ণের পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত আর নাই। ধীরে ধীরে লাঠিতে ভর দিয়া তিনি দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। এবারও যোগত্রয়ানন্দের কৃপায় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পরিবার এক মর্ম্মান্তিক দুর্দ্দৈব এড়াইতে সক্ষম হয়।

ঠাকুরের এক ভাইঝির হাতে নিক্রোসিস্ বা অস্থিক্ষয় রোগ দেখা দেয়। প্রবীণ শল্য চিকিৎসক ডাঃ মাউয়াটি রোগিণীর ভার নিয়াছেন। ইতিমধ্যে কয়েকবার অস্ত্রোপচারও হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রোগ সারে নাই। কেবলই চলিয়াছে বৃদ্ধির পথে। অবশেষে অভিজ্ঞ সার্জ্জন বলিয়া দিলেন, কনুইয়ের নীচেকার অংশ কাটিয়া বাদ দিতে হইবে, নতুবা রোগিণীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হইবে না।

কালীকৃষ্ণ বড় ঘাবড়াইয়া যান, তৎক্ষণাৎ গাড়ী পাঠাইয়া যোগত্রয়ানন্দকে বাড়ীতে নিয়া আসেন। কাতর স্বরে বলেন, "বিজ্ঞ সার্জ্জনের বিদ্যা বুদ্ধি সব হার মেনেছে। এবার আপনি কৃপা ক'রে এ মেয়েটিকে বাঁচান।"

যোগত্রয়ানন্দ কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে রোগিণীকে পরীক্ষা করেন, তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, "ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি বলছি, দুশ্চিকিৎস্য হলেও এ রোগ অচিরে আরোগ্য করা যাবে। দু সপ্তাহের বেশী সময় লাগবে না।"

কার্য্যকালে তাহাই ঘটিতে দেখা যায়। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভেষজের গুণে প্রাণঘাতী অস্থিক্ষয় নিবারিত হয়।

অতঃপর ঠাকুর ভবনের চিকিৎসার সব কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত হইল যোগত্রয়ানন্দের উপর। এইসব চিকিৎসার পারিশ্রমিক বাবদ বহু টাকা তাঁহার পাওনা হয়। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ভাবিতেছিলেন, এই বাবদ একটা মোটা টাকা একসঙ্গে তাঁহাকে দিয়া দিবেন। কিন্তু যোগত্রয়ানন্দ তাহাতে বাধ সাধিলেন। তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "গ্রন্থ ছাপানোর সময় আপনি প্রতি মাসে আমার সংসারের ব্যয়ের জন্য টাকা দিয়েছেন। সে টাকা আমি ঋণ বলেই এতকাল গণ্য করে আসছি। চিকিৎসার খাতে আমার যে টাকা পাওনা হয়েছে, তা থেকে পূর্ব্বেকার ঐ ঋণ শোধ হয়ে যাক্।"

এই ব্যবস্থাই কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে সেদিন মানিয়া নিতে হইল।

ঠাকুরবাড়ীর উপর যোগত্রয়ানন্দের কৃপা দীর্ঘদিন ছিল। সে-বার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের দৌহিত্রীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে। বিবাহের দিন সারা আকাশ জুড়িয়া মেঘের ঘনঘটা দেখা গেল। সকলেই মহা চিন্তিত, ঝড়-জল বেশী হইলে চরম অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। কালীকৃষ্ণের নাতনী বিবাহের কনে, আতঙ্কিত হইয়া বলে, "দাদু, সব যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, এখন উপায়?"

কালীকৃষ্ণ চিন্তিত হইয়া কহিলেন, "তাই তো, এ যে মহাবিপদ দেখ্‌ছি। একমাত্র বাবাজীই এ বিপদে রক্ষা করতে পারেন। তিনি পাশের ঘরেই বসে আছেন। তোকে তো খুব স্নেহ করেন, তুই তাঁকে চেপে ধর না!"

কালীকৃষ্ণের নাতনী আবদারের সুরে যোগত্রয়ানন্দকে বলিতে থাকে, "আজকের ঝড়-বাদল থামাতেই হবে, নইলে বাবাজী, আপনার মাহাত্ম্য বুঝা যাবে না।"

যোগত্রয়ানন্দ হাসিয়া কহিলেন, "ঝড় বৃষ্টিও চলবে, তোমার বিয়েতে কোন বাধা হবে না, এই ব্যবস্থাই বরং ভালো।"

নীরবে বারান্দায় বসিয়া, দূর আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া

যোগত্রয়ানন্দ মৃদুস্বরে কতকগুলি মন্ত্র পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইল প্রবল বর্ষণ। এই বর্ষণের শেষে আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া গেল। তারপর সে রাত্রে আর বৃষ্টি হয় নাই, বিবাহ সভার কোন ক্ষতিও সাধিত হয় নাই।

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী যোগত্রয়ানন্দ যেমন চিকিৎসা করিতেন, তেমনি অতি আধুনিক ডাক্তারী বিদ্যায়ও তাঁহার ব্যুৎপত্তি কম ছিল না। ইংরেজীতে রচিত দেহতত্ত্ব ও চিকিৎসা সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ এক সময়ে তিনি অধ্যয়ন করেন। এগুলি আয়ত্তও করেন আপন সহজাত মেধা ও প্রতিভার বলে। প্রয়োজনবোধে কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে তাঁহাকে অভিজ্ঞ ইউরোপীয় ডাক্তারদের পদ্ধতি অনুসরণ করিতে দেখা যাইত এবং আধুনিকতম চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া প্রবীণ ডাক্তারেরাও বিস্মিত হইতেন।

কাশীপুরে থাকা কালে একটি জ্বরের রোগী তাঁহার হাতে আসে। স্থানীয় এক বিজ্ঞ ডাক্তারও রোগীটির দেখাশুনা করিতেছেন। জ্বর বড় অদ্ভুত ধরণের, কোনমতেই ইহার গতি-প্রকৃতি সঠিকভাবে বুঝা যাইতেছে না। রোগীর অবস্থা ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে।

যোগত্রয়ানন্দ রোগ নির্ণয় করেন, সহযোগী ডাক্তারকে বলেন, "আসলে এ রোগটি হচ্ছে বিলিয়াস নিউমোনিয়া। লিভারকে আরো বেশী সক্রিয় না করতে পারলে রোগীকে বাঁচানো যাবে না।"

অতঃপর রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা তিনি করিলেন।

সহযোগী ডাক্তারটি অভিজ্ঞ ও প্রবীণ। তিনি মন্তব্য করিলেন, "ইউরোপে এই রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি বার করা হয়েছে বলে শুনেছি। ভারতবর্ষে অনেক ডাক্তারের কাছে তা অজ্ঞাত।"

সেদিন ঠাকুরঘর হইতে যোগত্রয়ানন্দ বাহিরে আসিতেছেন,

হঠাৎ তাঁহার পায়ে আসিয়া ঠেকিল একটি পুরাতন কাগজের ঠোঙ্গা। হাতে তুলিতেই দেখিলেন, ইউরোপীয় গবেষক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের রচিত কতকগুলি গ্রন্থের বিজ্ঞাপন উহাতে দেওয়া রহিয়াছে। এই বিজ্ঞাপন-তালিকা হইতে একটি গ্রন্থ বাছিয়া নিয়া তখনি ভক্ত সতীশকে কলিকাতায় পাঠাইলেন। নির্দ্দেশ দিলেন, যে কোন মূল্যে এটি যেন সংগ্রহ করা হয়।

ঐ ডাক্তারী গ্রন্থটি কিনিয়া আনা হইল, গভীর রাত অবধি যোগত্রয়ানন্দ উহা পাঠ করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসা ঠিক পথেই চলিয়াছে। পরের দিনই রোগীর জ্বর ছাড়িয়া গেল, বাড়ীর সবাই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

যোগত্রয়ানন্দ এবার সহযোগী প্রবীণ ডাক্তারটিকে ডাকিয়া নূতন কিনিয়া-আনা ইউরোপীয় চিকিৎসা-গ্রন্থের নির্দ্দেশ দেখাইয়া দিলেন।

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, "আপনি যত কিছুই বলুন না কেন, আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির যত বই-ই দেখান না কেন, আমি বলবো, আপনার যোগশক্তিই এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনাকে পথ দেখিয়েছে, সঠিক রোগনির্ণয়ের দিকে টেনে এনেছে।"

একবার এক পশ্চিম দেশীয় সাধু শহরে আসিয়া উপস্থিত হন। লোক পরম্পরায় যোগত্রয়ানন্দের কথা তাঁহার কানে যায় এবং তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন।

সাধুকে যথেষ্ট সমাদর করা হইল এবং উভয়ের মধ্যে নানা ধর্ম্ম-প্রসঙ্গের আলাপ-আলোচনা চলিল। এবার যোগত্রয়ানন্দ যুক্তকরে কহিলেন, "মহারাজ, বেলা হয়ে গিয়েছে, আমার একান্ত ইচ্ছে আপনি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমার কয়েকটি ভক্ত নিকটেই এক বাড়ীতে বসবাস করেন। চলুন, সেখানে আপনার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে।"

সাধুটি গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, "আমি তো কোন গৃহীর আতিথ্য গ্রহণ করিনে। লোকালয়ের বাইরে গিয়ে কোন একটা জায়গা দেখে নেবো। এজন্য ভাবনার প্রয়োজন নেই।"

"প্রয়োজন আছে বলেই তো ভাবছি মহারাজ। শুধু ভাবছিনে, দুর্ভাবনায়ই পড়েছি আপনাকে নিয়ে।"—সবিনয়ে নিবেদন করেন যোগত্রয়ানন্দ।

"তার মানে? ওসব অবান্তর কথা রাখুন। আমার ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না।"—বলিয়া সাধুটি বাড়ীর বাহিরে আসিলেন, রাস্তা দিয়া আপন মনে চলা শুরু করিলেন।

যোগত্রয়ানন্দ তাঁহার পিছনে পিছনে চলিয়াছেন, আর বার বার জানাইতেছেন অনুরোধ। অবশেষে দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "মহারাজ, আপনি অবুঝের মতো ব্যবহার করছেন। আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, একটা মারাত্মক ব্যাধি আপনার দেহে প্রবেশ করেছে। এখন কিছুকাল আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। সুচিকিৎসার ব্যবস্থা তো করতেই হবে।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সাধু পূর্ব্ববৎ পথ চলিতে থাকেন। অগত্যা যোগত্রয়ানন্দকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

কিন্তু দেখা গেল, রাস্তার মোড় পার না হইতেই সাধুটি প্রবল জ্বরের ঘোরে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। যোগত্রয়ানন্দ তখনি আবার ছুটিয়া যান। ধরাধরি করিয়া সাধুটিকে পূর্ব্বকথিত বাড়ীতে নিয়া তোলা হয়। যোগত্রয়ানন্দের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ভক্ত-সেবকেরা গ্রহণ করেন তাঁহার সেবার ভার।

রোগীর জ্বরটি বড় মারাত্মক ধরণের। যোগত্রয়ানন্দ রোজই তাঁহাকে দেখিতে যান, ওষুধপত্রাদি দিয়া আসেন। সেদিন খাওয়ার ওষুধের সঙ্গে বুকে-পিঠে মালিস করার জন্যও একশিশি ওষুধ পাঠানো হইয়াছে। পূজার ঘরে ঢুকিয়া যোগত্রয়ানন্দ জপে বসিতে যাইবেন, এমন সময় শুনিলেন এক দৈবী আওয়াজ। কে যেন বলিতেছেন, 'শিগ্‌গীর পীড়িত সাধুটিকে দেখে এসো। শুশ্রূষাকারী

ভুল করে তাকে মালিসের ওষুধ খাওয়াতে যাচ্ছে। খাওয়ানোর পরই বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।”

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যোগত্রয়ানন্দ ত্রস্তপদে সাধুর কাছে গিয়া উপস্থিত হন। সেবক ভক্তটির হাত হইতে ওষুধের গ্লাসটি সাধু নিতে যাইবেন এমন সময় যোগত্রয়ানন্দ উহা কাড়িয়া নিলেন। গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “এটা খাবার ওষুধ নয়, মালিস।”

এ কথা শুনিয়াই সাধুর মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া যায়। সক্রোধে মালিস এবং খাবার ওষুধ সব কিছুই তিনি বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলেন।

যোগত্রয়ানন্দ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন, “অনর্থক আপনি রাগ করছেন। ভুল করে আপনাকে মালিস খেতে দেওয়া হচ্ছে, ঠাকুর একথা আমায় জানিয়ে দিলেন। তাই তো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলাম। আর একটু দেরী হলেই আপনাকে আর বাঁচানো যেতো না।”

এবার সাধুর চৈতন্যোদয় হইল। অনুতপ্ত হইয়া কহিলেন, “নিজের অভিমান বশতঃ মহাত্মাকে আমি চিনতে পারি নি। আপনি আমার জীবনদাতা। আমায় ক্ষমা করুন, কৃপা করুন।

প্রায় তিন সপ্তাহ মারাত্মক জ্বরে ভুগিবার পর ঐ সাধুটি সুস্থ হইয়া উঠেন, তারপর নিজের দেশে ফিরিয়া যান।

আশ্রিত ভক্ত-শিষ্যদের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত অধিকারী তাঁহাদের অনেকে যোগত্রয়ানন্দের যোগবিভূতি ও অলৌকিক শক্তির সহিত পরিচিত ছিলেন। সিদ্ধ মহাপুরুষের এই শক্তির প্রকাশ ঘটিত নানা ভঙ্গীতে এবং নানা মাধ্যমের ভিতর দিয়া।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার পত্নী যোগত্রয়ানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত। ব্যবহারিক জীবন এবং সাধনময় জীবনের অনেক কিছু সমস্যায়ই এই শক্তিধর মহাত্মার কৃপার উপর তাঁহারা নির্ভর করিতেন।

গোপালবাবু বিচার বিভাগের একজন অফিসার। সে-বার তিনি বদলী হইয়া নূতন চাকুরিস্থল ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ শহরে আসিয়াছেন। খড়ের চালযুক্ত একটি বাংলো বাড়ীতে তাঁহারা বাস করিতেছেন। একদিন গভীর রাতে কি এক অজ্ঞাত কারণে চালে আগুন লাগিয়া যায় এবং অল্পকাল মধ্যে বাড়ীর চারিদিকে তাহা ছড়াইয়া পড়ে। হঠাৎ এক দৈবী কণ্ঠস্বর শুনিয়া গোপালবাবু ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠেন। দেখেন, লেলিহান আগুনের শিখা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। তখনি পত্নীকে জাগাইয়া তুলিলেন। ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র উভয়ে মিলিয়া উঠানে স্থানান্তরিত করার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত ছাদটি নীচে ধসিয়া পড়িল। আর একটু বিলম্ব হইলে দু'জনেই এই অগ্নিদাহে দগ্ধ হইতেন।

গোপালবাবুর পত্নী সবিস্ময়ে দেখিলেন, জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর মূর্ত্তিতে যোগত্রয়ানন্দ ঐ জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার প্রশান্ত কৃপাদৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে আশ্রিত ভক্ত দম্পতির উপর।

সাশ্রুনয়নে এই ভক্তিমতী মহিলা তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত হয়ে স্বয়ং বাবাই আজ আমাদের দু'জনের প্রাণ রক্ষা করলেন। তাঁকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয় নি।"

১৯০৬ সাল। যোগত্রয়ানন্দ স্থির করিলেন, এবার তিনি কাশীতে বাস করিবেন, প্রভু বিশ্বনাথের পাদপদ্মে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া শুরু করিবেন অধ্যাত্ম জীবনের নূতন পর্য্যায়। স্বজনবর্গ এবং দুই চারিটি সেবক-ভক্ত সঙ্গে নিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁহার বহু আকাঙ্ক্ষিত শিবধামে।

অধ্যাত্ম জগতে সুপরিচিত, উৎসব সম্পাদক অধ্যাপক রামদয়াল মজুমদার এ সময়ে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীতে বাস করিতেছেন। শক্তিধর মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের আগমনে তিনি মহা পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

প্রত্যূষে উঠিয়া যোগত্রয়ানন্দ গঙ্গাস্নান করিতেন, তারপর রুদ্ধ কক্ষে দীর্ঘসময় কাটাইতেন যোগসাধনায় ও নিত্যকার পূজা ও জপতপে। বিশ্বনাথ দর্শন, গঙ্গাভ্রমণ ও নামকীর্ত্তনও ছিল তাঁহার প্রাত্যহিক দিনচর্য্যার অঙ্গ।

রামদয়াল মজুমদার প্রায়ই গঙ্গাভ্রমণের সময় যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গী হইতেন। মহাত্মার পুণ্যসঙ্গ ও অমৃতময় বচনসুধা পান করিয়া মন তাঁহার দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিত। উত্তরকালে কথা প্রসঙ্গে মজুমদার মহাশয় যোগত্রয়ানন্দের মহনীয় চরিত্র ও অন্তরঙ্গ আচরণের নানা কাহিনী বর্ণনা করিতেন।

তখন শীতকাল। একদিন বিকালে তিনি যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গী হইয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিয়াছেন। পথের পাশে একটি ভিখারী ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে আসিতেই কাতরকণ্ঠে সে সামান্য কিছু ভিক্ষা চায়। যোগত্রয়ানন্দ করুণ নেত্রে তাঁহার অর্দ্ধনগ্ন বেশের দিকে তাকাইয়াই নিজের কাঁধের পশমী আলোয়ানটি তাহাকে দিয়া দিলেন। সম্প্রতি এক ধনী ভক্ত এই মূল্যবান বস্তুটি মহাত্মাকে উপহার দিয়াছিলেন।

রামদয়ালবাবু মন্তব্য করেন, "এই দামী আলোয়ানটি না দিয়ে, ওকে বাজার থেকে আর একটা গায়ের চাদর কিনে দিলেই হতো।"

স্মিতহাস্যে মহাপুরুষ কহিলেন, "ভগবান যদি দামী শীতবস্ত্র আমায় পরাতেই চান, তবে তো নিজেই কৃপা করে পাঠিয়ে দেবেন। এ নিয়ে ভাব্‌বার কি আছে?"

সেইদিনই গঙ্গাভ্রমণ হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিলে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগত্রয়ানন্দের হাতে একটি পার্শেল দিয়া কহিলেন, "দাদা, এটি কলকাতা থেকে এসেছে।"

পার্শেলটি খুলিয়া দেখা গেল, এক ভক্ত শীতে ব্যবহারের জন্য বাবাকে একটি মূল্যবান পশমী শাল পাঠাইয়াছেন। রামদয়াল বিস্ময়ে মহাত্মার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যোগত্রয়ানন্দের রচিত আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপের খ্যাতি তখন সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বহু শিক্ষিত এবং জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা এই মহান গ্রন্থের রচয়িতার সহিত পরিচিত হইতে আসিতেন। তত্ত্ব ও সাধনপ্রণালী সম্পর্কে তাঁহারা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাধক মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ তখন তরুণবয়স্ক। আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপকারের প্রতিভা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাই তাঁহাকে একবার দর্শন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। যোগাযোগ অচিরে ঘটিয়া গেল, কাশীতে একদিন যোগত্রয়ানন্দের গৃহে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিলেন।

মহাত্মা তাঁহাকে স্নেহাশিস্ জানাইলেন, স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন, "বাবা, তোমার কোন সংশয় বা প্রশ্ন যদি থাকে বল।"

তরুণ বিদ্যার্থী গোপীনাথ একটি সুন্দর প্রশ্ন—যাহা বহু জিজ্ঞাসু সাধকের প্রশ্ন—উত্থাপিত করিলেন। কহিলেন, "বাবা, গুরুজনদের মুখে শুনেছি, সত্য এক ও অখণ্ড। মুনি ঋষিরা যদি সত্যের সাক্ষাৎকার ক'রে থাকেন তবে তাঁদের মতে মতবৈষম্য হয় কেন? নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্—একথার অর্থ কি? নানা মুনির নানা মত কেন হবে? ব্রহ্মবিদ্ মুনিরা কি একমত হতে পারেন না? এর তাৎপর্য্য আমায় বুঝিয়ে বলুন। এ তাৎপর্য্য বুঝতে পারলে সাধারণ জিজ্ঞাসুরা উপকৃত হবে। নানা পথ ও মতবৈষম্যের মধ্যে পড়ে তাদের বিভ্রান্ত হতে হবে না।"

এই প্রশ্নের এক অপরূপ মীমাংসা যোগত্রয়ানন্দ করিয়া দিলেন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের ভাষাতেই এখানে উহা বর্ণিত হইতেছে। "বাবাজী কহিলেন, বৎস, তোমার প্রশ্নের অঙ্গীভূত বাক্যের মধ্যেই উহার সমাধান রহিয়াছে। মুনি কাহাকে বলে? যিনি মননশীল তিনিই মুনি-পদবাচ্য। মত কাহাকে বলে? মনের দ্বারা যাহা অঙ্গীকৃত হয় অর্থাৎ অখণ্ড সত্যের যে অংশটুকু খণ্ড মনের দ্বারা গৃহীত হয় তাহাই মত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনকে অবলম্বন করিয়া সত্যের সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করা যাইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অখণ্ড

সত্যের দর্শন লাভ সুদূর পরাহত। অখণ্ড সত্যের ধারণা করিতে হইলে মনকে নিরুদ্ধ করিয়া এবং শুধু মনকে নয় অন্তঃকরণের যাবতীয় বৃত্তিকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া অন্তঃকরণের বাহিরে যাইতে হইবে। অন্তঃকরণের পৃষ্ঠভূমিতেই আত্মার স্বয়ংপ্রকাশ আলোক অবস্থিত। বিকল্প শক্তির দ্বারা মন ঐ আলোককে ভাগ করিয়া পৃথক পৃথক ভাবরূপে পরিণত করে। মনের ইহা দোষ নহে, ইহাই মনের স্বভাব।

"বিকল্পশূন্য পরম সত্যকে পাইতে হইলে মনের ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে হইবে। এই অবস্থায় মতামতের কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ মনই যেখানে নাই সেখানে মত কোথায়? কিন্তু ঐ সত্যের প্রকৃত চিত্র অজ্ঞানীকে প্রদর্শন করান যায় না, কারণ উহার সংক্রমণ হয় না। যাহার চিত্ত ঐ স্বয়ংপ্রকাশ ভূমিতে প্রবিষ্ট হইবে তাহার নিকট উহা আপনিই প্রকাশিত হইবে। কিন্তু অজ্ঞান জগতের জ্ঞানলাভের কোন উপায় উহা হইতে হয় না। ঐ অবস্থা যাহার হয়, শুধু তাহারই হয়। ঐ জ্ঞান অজ্ঞানী পরন্তু অনুরাগী ও আশ্রিত জিজ্ঞাসু-জনকে দিতে হইলে মনের আশ্রয় গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। মনের ধর্ম্মই কল্পনা বা বিকল্প বৃত্তি। ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞানকে বিকল্পের সঙ্গে যুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসুর নিকট উপস্থাপিত করা হয়। বিকল্প নানা প্রকার। জিজ্ঞাসুর চিত্তের প্রকৃতি, বাসনা ও অনুভব প্রভৃতি বিচার করিয়া তত্ত্বজ্ঞ গুরু তদনুরূপভাবে শব্দের সাহায্যে তাঁহাকে ঐ জ্ঞান দান করেন।

"এইখানেই মনের সার্থকতা। এইখান হইতেই মতের উদ্ভব হয়। যিনি পূর্ণ সত্যকে মনের দ্বারা ধারণা করিতে যান তাঁহার তো মত থাকিবেই, কিন্তু যিনি মনকে ত্যাগ করিয়া পূর্ণ সত্যকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারও মত থাকে। তখন তিনি মনোভূমিতে বিদ্যমান, বিশিষ্ট অধিকার সম্পন্ন জিজ্ঞাসুর নিকট ঐ জ্ঞান সঞ্চার করেন। এই জন্যই উভয় জ্ঞানীতে স্বরূপতঃ পার্থক্য না থাকিলেও অধিকার ভেদে তাঁহাদের উপদেশের মধ্যে পার্থক্য

আসিয়া পড়ে। এই জন্যই বলা হইয়াছে—নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।

"ইহাই মুনিদের মতভেদের রহস্য। সাধারণ লোকের অর্থাৎ অজ্ঞ লোকের মতভেদ এই প্রকার নহে। কারণ মুনিদের মতভেদ সত্ত্বেও মূলে আছে জ্ঞান, কেবল অন্যের উপদেশের জন্য বিকল্পের আশ্রয় নেওয়া হয়। সাধারণ লোকের মতভেদের মূল অজ্ঞান[১]।"

প্রশান্ত বদনে সৌম্যভাবে বাবাজী এই দুরূহ প্রশ্নটিকে সরল ও সহজবোধ্য করিয়া দিলেন। প্রজ্ঞা এবং করুণার প্রতিমূর্ত্তি এই মহাসাধকের চরণধূলি নিয়া তরুণ জিজ্ঞাসু হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিলেন।

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন তখন কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পুত্র বৃন্দাবন এসময়ে এক মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত হয়, ক্রমে তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টাই করিয়াছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এবার দৈব কৃপা ছাড়া গতি নাই।

তর্করত্ন মহাশয় স্থির করিলেন, বৃন্দাবনকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা তিনি এবার করিবেন,—যোগত্রয়ানন্দজীর কাছে মাগিবেন তাহার জীবনভিক্ষা।

গোপীনাথ কবিরাজ তর্করত্ন মহাশয়ের অতিশয় স্নেহের পাত্র, আবার যোগত্রয়ানন্দ বাবার সঙ্গেও গোপীনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তাই তর্করত্ন মহাশয় সেদিন ভোরবেলায় লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন। কহিলেন, "গত রাতে বৃন্দাবনের অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে। আর বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই বাবাজীর এবার শরণ নিতে যাচ্ছি। তুমি আমায় এখুনি সেখানে নিয়ে চল।"

গোপীনাথ জানেন, বাবাজী সকালবেলায় দীর্ঘ সময় রুদ্ধদ্বার

১ সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ—যোগত্রয়ানন্দজী : ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

কক্ষে একান্তে সাধনভজন করেন। কোন বাহিরের লোকের সঙ্গে তখন দেখাশুনা করেন না। অন্তরঙ্গ সেবকেরাও এসময়ে তাঁহার ঘরে ঢুকিতে সাহস পায় না। কাজেই এখন তর্করত্ন মহাশয়কে নিয়া সেখানে গেলে, হয়তো বাবাজীর কাছে তাঁহার আগমন সংবাদ পৌঁছিবেই না, সাক্ষাৎও হইবে না।

তর্করত্ন মহাশয়কে কহিলেন, "বাবাজী অপরাহ্নেই দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখাশুনা করেন, তাই ঐ সময়টাই তাঁর কাছে যাওয়ার প্রশস্ত সময়।"

তর্করত্ন মহাশয় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শয্যাশায়ী বৃন্দাবনকে দেখাইয়া দিলেন। দীর্ঘদিন ভুগিয়া ভুগিয়া সে কঙ্কালসার হইয়াছে, পড়িয়া আছে মৃতের মতো অসাড় হইয়া। শিয়রে বসিয়া তাহার জননী অসহায়ভাবে কাঁদিতেছেন।

গোপীনাথ বুঝিলেন, বৃন্দাবনের জীবনের কোন আশাই নাই। তর্করত্ন মহাশয় করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "না গোপীনাথ, আর সময় ক্ষেপণ করা যায় না। চল, এখনি গিয়া বাবাজীর কাছে আমার প্রার্থনা নিবেদন করি।"

যোগত্রয়ানন্দ তখন কাশীর রাজঘাটে বাস করিতেছেন। উভয়ে তাঁহার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইতেই, বাবাজীর প্রিয় সেবক সতীশ কহিল, "এই যে আপনারা এসে গেছেন দেখ্‌ছি। বাবা একটু আগেই আমায় ডেকে বললেন, 'গোপীনাথ আর তর্করত্ন মশাই এখনই এখানে আসবেন। বৃন্দাবনের শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। দেখো, ওরা যেন ফিরে না যান। তুমি নীচে গিয়ে অপেক্ষা করবে এবং ওরা এলেই আমার ঘরে নিয়ে আসবে। আমি ওদের জন্য প্রতীক্ষা করবো আর একলাটিই থাক্‌বো। যদিও এসময়ে আমি কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনে, তবুও ওদের সঙ্গে করতেই হবে। কেউ যেন ওদের বাধা না দেয়।"

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীর কৃপার কথা ভাবিয়া তর্করত্ন মহাশয়ের দুই চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

বাবাজীর সহিত তখনি উভয়ে সাক্ষাৎ করিলেন। তর্করত্ন মহাশয় মহাত্মার প্রশস্তিসূচক এবং ভক্তি-অর্ঘ্য স্বরূপ কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া আনিয়াছিলেন, উহা পাঠ করিয়া ও প্রণাম নিবেদন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

যোগত্রয়ানন্দ স্নেহপূর্ণ স্বরে তর্করত্নকে কহিলেন, "গত রাতে ধ্যানাসনে বসবার পরই দেখতে পেলাম, বৃন্দাবনের অবস্থা সঙ্কট-জনক, আর আপনি চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন। আপনারা আসবেন, তাও জানতে পারলাম। তাই সতীশকে বলে রেখেছি, আপনাদের যেন ফিরিয়ে দেওয়া না হয়।"

তর্করত্ন মহাশয় পুত্রের রোগমুক্তির জন্য বাবাজীর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন, আর তিনি যে কৃপাভরে তাঁহার জন্য এতটা চিন্তা করিয়াছেন সেজন্য বার বার জানান কৃতজ্ঞতা।

কথা প্রসঙ্গে তর্করত্ন মহাশয় প্রশ্ন করেন, "বাবা, এসব কি আপনার যোগশক্তির ব্যাপার?"

যোগত্রয়ানন্দ স্মিতহাস্যে উত্তর দেন, "যোগশক্তি ছাড়া আর কি? হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হলে স্বভাবতঃ এই রকমই ঘটে থাকে। তখন দূরকেও নিকটে দেখা যায় এবং ভবিষ্যৎকেও বর্ত্তমানরূপে জানা যায়।"

কিছুকাল মৌনী থাকিয়া আবার বলিলেন, "আপনি বৃন্দাবনের জন্য আর চিন্তা করবেন না। যখন সে আমার দৃষ্টিতে পড়েছে তখন সে অবশ্যই ভাল হয়ে যাবে। আপনারা বাড়ী ফিরে গেলেই দেখতে পাবেন—তার অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে।"

বাবাজীর এই অহেতুক করুণায় তর্করত্ন মহাশয় একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। ছল ছল নেত্রে বাবাজীকে প্রণাম করিয়া তিনি ঘরে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর বৃন্দাবনের অবস্থায় দ্রুত উন্নতি দেখা গেল এবং অনতিবিলম্বে সে সুস্থ হইয়া উঠিল।

যোগত্রয়ানন্দ প্রায়ই ভক্ত এবং দর্শনার্থীদের বলিতেন, "সাধন-জীবনের উন্নতি সাধন করতে হলে চাই আন্তরিক বিশ্বাস। এই

বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় না হলে শুধু যুক্তি-তর্কের সাহায্যে এ পথে এগোনো যায় না।"

আরো বলিতেন, "ত্যাখো, বিশ্বাসের বলে সবই হতে পারে। যা লৌকিক দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়, বিশ্বাসের বলে তাও অনায়াসে সংঘটিত হতে পারে। কিভাবে, কোন্ শক্তির দ্বারা কোন্ কাজ সাধিত হয়, তা মানুষ বুঝে উঠতে পারে না।

কলিকাতার এক ইন্‌জিনিয়ার ভদ্রলোকের মাতা যোগত্রয়ানন্দের খুব ভক্ত ছিলেন, বাবার যে কোন কথার উপর তাঁহার অটুট আস্থা ছিল। এই বৃদ্ধা মহিলা তখন হৃদ্‌রোগে খুব ভুগিতেছেন। ডাক্তারদের মতে, যে কোন সময়ে এই পীড়া আরো বাড়িতে পারে এবং তাঁহার মৃত্যু ঘটিতে পারে। তাঁহার পক্ষে বেশী নড়াচড়া করা ভাল নয়, এ সতর্কবাণীও তাঁহারা উচ্চারণ করিয়াছেন।

বৃদ্ধা মহিলা একদিন করজোড়ে যোগত্রয়ানন্দকে কহিলেন, "বাবা, আমার এই অবস্থা। বাইরে কোথাও যাওয়া ডাক্তারদের নিষেধ। কিন্তু প্রাণে বড় ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর আগে কয়েকটা তীর্থ দর্শন করবো। এ ইচ্ছা পূর্ণ হয়, যদি আপনি আমায় কৃপা করেন। আরো একটা ইচ্ছে আছে, কাশীতে যেন আমার দেহান্ত হয়।"

বাবা সহাস্যে কহিলেন, "বেশ, আপনার দুটো আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হবে। কাশীপ্রাপ্তি আপনার অবশ্যই ঘটবে। আর আপনাকে তীর্থ দর্শনও করাবো। আপনার কোন ভয় নেই। কিন্তু আমি অনুমতি দেবো, একটা সর্ত্তে।"

"বলুন বাবা, আমি তা মেনে নিতে রাজী।"

"আমি যে যে স্থানে যেতে নির্দ্দেশ দেবো, যে যে দৃশ্য দেখতে বলবো, তা-ই আপনি করবেন। অতিরিক্ত কোথাও যাবেন না, বা দেখবেন না। আমার কথামতো চললে আপনার জীবনহানির কোন আশঙ্কা নেই। অন্যথায় বিপদ হবে।"

বৃদ্ধার ধর্ম্মবিশ্বাসের আঁট ছিল, বাবাজীর প্রতিও ছিল অবিচল নিষ্ঠা। অনুমতি পাইয়া কয়েকটি তীর্থ দর্শন তিনি সমাপ্ত করিলেন।

কিন্তু হঠাৎ ঝোঁকের বশে তিনি এক মস্ত ভুল করিয়া বসিলেন। যোগত্রয়ানন্দের নির্দ্দেশ ছিল, গির্ণার পাহাড়ে বৃদ্ধা যাইবেন না। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে বাবার কথা বিস্মৃত হইয়া তিনি পাহাড়ে উঠিয়া গেলেন। তারপর শুরু হইল হৃৎপিণ্ডে তীব্র যন্ত্রণা ও স্পন্দন।

সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত, পা দুটি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা আকুল কণ্ঠে বাবাকে ডাকিতে লাগিলেন। কহিলেন, "বাবা, তোমার কথা না শুনে কি অন্যায়ই না আমি করেছি। যা হোক্, তুমি কৃপাময়, কৃপাই তোমার স্বভাবগত ধর্ম্ম। এ বারটি আমায় বাঁচাও। তাছাড়া, বাবা, তুমি তো বলেছো, কাশীতে আমার মৃত্যু হবে, এখন এই গির্ণার পাহাড়ে, বিদেশ-বিভূঁই-এ মৃত্যু হলে যে তোমারই দুর্নাম হবে। দয়া ক'রে আমায় রক্ষা করো।"

বৃদ্ধার কাতর ক্রন্দনের ফল অচিরে ফলিল। দেখিলেন, একটি গৌরকান্তি প্রৌঢ় সাধু, দেখিতে অনেকটা যোগত্রয়ানন্দেরই মতো, তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আর তাঁহাকে আশ্বাস বাক্য বলিতেছেন।

এই সাধুটিই এবার বৃদ্ধাকে কোলে তুলিয়া নিয়া পাহাড়ের উপরকার মন্দির ও অন্যান্য দর্শনীয় সব কিছু দেখাইয়া দিলেন। অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে নিচে নামাইয়াও আনিলেন। ততক্ষণে তাঁহার হৃৎপিণ্ডের বেদনা ও কাঁপুনিও একেবারে থামিয়া গিয়াছে, তিনি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। অতঃপর বৃদ্ধাটি সঙ্গিগণসহ নিরাপদে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

যোগত্রয়ানন্দকে এই অলৌকিক ঘটনার রহস্য সম্পর্কে জনৈক অন্তরঙ্গ ভক্ত এক সময়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, "আসল কথাটা কি জানো? ভগবান হচ্ছেন বিশ্বরূপ স্বরূপ। তাঁর যে ভক্ত তাঁকে যে রূপে দর্শন করতে ইচ্ছে ক'রে—সেই রূপেই ভগবান তাকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেন। গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করাই শাস্ত্রের উপদেশ। বৃদ্ধা তা-ই করেছিলেন। আমি তো পাষাণ—কিন্তু পাষাণেও ভক্তির প্রভাবে শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি হয়।"

কিছুদিন পরে ঐ বৃদ্ধা ভক্তটির হৃদ্‌রোগ আবার বৃদ্ধি পায়, তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। তাঁহার চিরদিনের ইচ্ছা, অন্ত্য-কালে যেন কাশীপ্রাপ্তি হয়। তাই অবিলম্বে কাশীতে যাওয়ার জন্ম অস্থির হইয়া পড়িলেন।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর, এল, দত্ত বৃদ্ধার চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "এ অবস্থায় রোগিণীকে যেন নড়াচড়া করতে দেওয়া না হয়। কাশীতে যাওয়া দূরের কথা, দোতলা থেকে একতলায় নামতে গেলেই ঘোর বিপদের সম্ভাবনা। বৃদ্ধার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরাও ডাক্তারের কথা মানিয়া নিলেন, বাধা দিলেন কাশী যাওয়ার প্রস্তাবে।

অবশেষে বৃদ্ধার আগ্রহাতিশয্যে কাশীতে যোগত্রয়ানন্দের কাছে তাঁহার মত চাহিয়া তার করা হইল। উত্তরে তিনি নির্দ্দেশ দিলেন, "যে যা বলুক, কোন ভয় নেই, অবিলম্বে এখানে চলে এসো।"

অতঃপর স্বজনগণসহ বৃদ্ধা কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে কিছুদিনের মধ্যেই ঘটে তাঁহার অভিলষিত কাশীপ্রাপ্তি।

•

বহু মুমুক্ষু নরনারীকে যোগত্রয়ানন্দ দীক্ষা দিয়াছেন এবং এই সব দীক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেকে উচ্চতর সাধনমার্গে প্রবিষ্টও হইয়াছেন। দীক্ষাদানের আগে আপন যোগশক্তি সহায়ে তিনি শিষ্যের জন্মান্তরের সংস্কার এবং তাঁহার সাধনেচ্ছার আসল গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে নির্ণয় করিতেন। তারপর স্থির করিতেন তাঁহার সাধন-মার্গ ও ইষ্টতত্ত্ব। শিষ্যের বহিরঙ্গ জীবনের ঝোঁক বা রুচিকে এই প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহাপুরুষ কোনদিনই গুরুত্ব দিতে চাহিতেন না।

খড়দহের এক ভদ্রলোক কাশীতে থাকিয়া সাধনভজন করিতেন। এখানে আসিয়া একটি হরিসভার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। ভক্তিভাবের উদ্রেক হয় তাঁহার হৃদয়ে এবং ক্রমশঃ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাকথা শুনিতে তাঁহার প্রবল উৎসাহ। নিত্য সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও ভাগবত পাঠের

আসরে গিয়া না বসিলে মনে তিনি শান্তি পান না। সে-বার এই ভদ্রলোকটি এক সময়ে যোগত্রয়ানন্দের সন্ধান পাইয়া তাঁহার কাছে যাতায়াত শুরু করেন, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও যোগৈশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যান।

ভদ্রলোকটি মনে মনে স্থির করেন, এই মহাপুরুষের নিকট হইতেই দীক্ষা নিবেন, তাঁহার চরণেই নিবেন একান্ত শরণ। একদিন যোগত্রয়ানন্দের কাছে নিজের প্রার্থনা তিনি নিবেদন করিলেন।

বাবাজীও সম্মতি দিলেন, "বেশ তো, তোমার যখন তীব্র ইচ্ছে হয়েছে, দীক্ষা আমার কাছে পাবে। কিছুদিনের মধ্যেই একটা দিন স্থির করতে হবে।"

দুই চারদিন পরে কথাপ্রসঙ্গে যোগত্রয়ানন্দ তাঁহাকে কহিলেন, "ওহে, তোমার তো দেখছি—শক্তিমন্ত্র। মহাশক্তিকে মাতৃরূপে উপাসনা করে সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। এখন থেকেই এজন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নাও। নিজের ভেতর সন্তান ভাবটি জাগিয়ে তুলে জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করো। সব নারীমূর্ত্তি জগজ্জননী মহামায়ার প্রকাশ, এটা অভ্যাস করো।"

ভদ্রলোকটি নীরবে কথাগুলি শুনিলেন কিন্তু কোন উৎসাহ দেখাইলেন না। মনে তখন তাঁহার একটা ঘোরতর সংশয় আসিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব ভাবে তিনি ভাবিত, বৈষ্ণবীয় রুচি তাঁহার। অথচ বাবা তাঁহাকে শক্তিমন্ত্র দিতে চাহিতেছেন। যিনি শিষ্যের অন্তরের গতিপ্রকৃতি বুঝিতে পারেন না, তাহার সংস্কার কি তাহা ধরিতে পারেন না, তিনি আবার কেমন মহাপুরুষ ?

বাবাকে তিনি অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া ধরিয়া নিয়াছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে তাঁহার প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি নাই। প্রকৃত সাধন-বৈভব যাঁহার নাই এমন সাধকের কাছে তো আত্ম-সমর্পণ করা যায় না!

ভদ্রলোকটি যোগত্রয়ানন্দের কাছে যাওয়া-আসা প্রায় বন্ধ করিয়া দিলেন, ফলে দীক্ষার ব্যাপারটিও চাপা পড়িয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি কাশী ত্যাগ করিয়া খড়দহে ফিরিয়া আসেন। এখানে আসার পর জীবনধারার পরিবর্ত্তন ঘটে এবং কাশীতে হরিসভায় যাতায়াত করার ফলে যে ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল তাহা ক্রমে স্তিমিত হইয়া আসে।

দেশে থাকার সময় সে-বার ভদ্রলোকটি গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অভিজ্ঞ ডাক্তারদের বহু চেষ্টার ফলেও তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেছেন না। বরং এই ব্যাধি ক্রমে মারাত্মক হইয়া উঠে এবং দেহের যন্ত্রণায় তিনি মৃতকল্প হইয়া পড়েন।

সেদিন গভীর রাতে অসহায়ভাবে রোগশয্যায় শুইয়াছেন, হঠাৎ দেখিলেন—শিয়রে দণ্ডায়মান এক জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি; এই মূর্ত্তি নির্নিমেষে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন, আর আয়ত নয়ন দুইটি হইতে ঝরিতেছে দিব্য স্নেহ আর করুণার ধারা।

যেমন আকস্মিকভাবে এই মাতৃমূর্ত্তির আবির্ভাব ঘটে, তেমনি তাহা হয় অন্তর্হিত। কিন্তু পরমবিস্ময়ের কথা, এই অন্তর্দ্ধানের পর হইতেই ভদ্রলোকটির রোগ যন্ত্রণার উপশম ঘটে। শুধু তাহাই নয়, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

এবার যোগত্রয়ানন্দের কথা সম্পর্কে তাঁহার চৈতন্যের উদয় হয়। বাবা কেন তাহাকে শক্তিমন্ত্র দিতে চাহিয়াছেন, মাতৃরূপিণী ইষ্টের উপাসনায় কেন উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন। বুঝিলেন, নিজের বহিরঙ্গ জীবনের ঝোঁক ও রুচি দিয়া নিজের আভ্যন্তরীণ সত্তাকে চিনিবার চেষ্টা করিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন। বাবার সাধনলব্ধ অন্তর্দৃষ্টি অভ্রান্ত, তাই উহা সঠিকভাবে তাঁহার মন্ত্র ও ইষ্ট নির্ণয় করিয়া দিয়াছে।

অতঃপর ভদ্রলোকটি কাশীতে গিয়া যোগত্রয়ানন্দের চরণতলে পতিত হন। কাতর কণ্ঠে বলেন, "বাবা, আমার অপরাধের সীমা নেই। আপনার বাক্যে আমার সংশয় এসেছিল। আপনার কৃপায় মা নিজে এসে আমার রোগযন্ত্রণা সারিয়ে দিয়েছেন, প্রাণ রক্ষা

করেছেন। আর এই কৃপালীলার মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন আপনার কথার সত্যতা। আপনি আমায় মার্জ্জনা করুন।"

বাবাজী তাঁহাকে সস্নেহে কাছে টানিয়া নেন, নানা প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করেন। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই ভক্তটি অতঃপর সাধনজীবনে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন।

যোগত্রয়ানন্দ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ভারতের সারস্বত সমাজের মুকুটমণি ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন—"নিবৃত্তরাগস্য গৃহ তপোবনং—এই শাস্ত্রবাক্য তাঁহার ন্যায় রাগদ্বেষহীন, পূর্ণ বৈরাগ্য-সম্পন্ন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ গৃহস্থ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।"

আশেপাশের সাধকজনের উপর যোগত্রয়ানন্দের দূর বিস্তারী প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়া ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ লিখিতেছেন :

"বাবাজী জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। বহু দূর দেশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উচ্চাঙ্গের বিভিন্ন সাধক তাঁহার নিকট সদ্-উপদেশের জন্য উপস্থিত হইতেন। যতি, সন্ন্যাসী, অবধূত, যোগী, কর্ম্মী, ভক্ত অনেকেই তাঁহার নিকট আসিতেন। সকলেই তাঁহার নিকট নিজ নিজ সমস্যার প্রকৃত সমাধান প্রাপ্ত হইতেন। সকল সম্প্রদায়কেই তিনি আপন বলিয়া মনে করিতেন এবং সকলকেই যথাযোগ্য উপদেশ দান করিতেন। গৃহস্থের নিকট সন্ন্যাসীর জ্ঞানলিপ্সাতে আগমন অপূর্ব্ব, সন্দেহ নাই। কিন্তু জনক ও শুকদেবের কিংবদন্তী এই দেশে এখনও জাগরূক রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও কাশীনিবাসী মহাত্মা ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ীর সান্নিধ্যে বহুসংখ্যক জিজ্ঞাসু ও সাধনপ্রার্থী সন্ন্যাসীর ভীড় প্রায় সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত।

"আমার ব্যক্তিগত জীবনে বাবাজীর প্রভাব যে কতটা পড়িয়াছিল আজ তাহা ঠিক ঠিক নির্দ্দেশ করা সহজ নহে, তবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার

করিব। তাঁহার কৃপাতে অনেক সময় অলৌকিকভাবে আমি দৈহিক রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। তাঁহার অযাচিত করুণার প্রতিদান আমি দিতে পারি নাই এবং কোনদিন দিতে পারিব না। বুদ্ধি-সংক্রান্ত জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁহার সাহায্য অতুলনীয়—শুধু তাঁহার জ্ঞানময় জীবনের আদর্শ নহে, সাক্ষাৎভাবেও তিনি বহু জ্ঞান এই আধারে সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ জীবন, পবিত্র হৃদয়, অমায়িক স্বভাব এবং কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান-ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় আমার প্রথম যৌবনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বুদ্ধির অতীত ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান আমি নত শিরে স্বীকার করিতে বাধ্য।”

১৯২৫ সাল। স্বেচ্ছায় যোগত্রয়ানন্দ এবার কাশীধামের লীলায় ছেদ টানিয়া দিলেন। কহিলেন, “এবার বিরতির পালা। শিবের কিঙ্কর, রামের কিঙ্কর, এবার থেকে ভাব্‌বে শুধু কৈঙ্কর্য্যের কথা আর মুখে জপ্‌বে সুধাময় নাম।”

কলিকাতার ভক্তেরা সাগ্রহে বাবাজীর এই প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা শিরোধার্য্য করিলেন। প্রথমে উত্তর পাড়ায় কিছুদিন তিনি অবস্থান করেন, তারপর বরানগরের গঙ্গাতীরের এক উদ্যানে তাঁহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

কথাপ্রসঙ্গে ভক্তদের একদিন বলেন, “সর্ব্ব তীর্থ সার এই গঙ্গাতীর। জীবনের সব কিছু চাওয়া-পাওয়া দেবো এবার বিসর্জ্জন।

কিছুদিনের মধ্যে বাবাজী আতুর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গঙ্গার পবিত্র জল ছাড়া আর কিছু গ্রহণে তাঁহার আর রুচি নাই, ইচ্ছা নাই। পুত্র ইন্দুভূষণ ও ভক্ত-শিষ্যদের আবেদন ও মিনতি ব্যর্থ হয়। স্বেচ্ছায়, পরম আনন্দে দিনের পর দিন বাবাজী অগ্রসর হন তাঁহার বিদায় লগ্নের দিকে।

একদিন উদাস নয়নে নিস্তরঙ্গ ভাগীরথীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভক্তদের কহিলেন, “যেখানে শ্রীগুরু বাবাকে জলসমাধি দেওয়া হয়েছে, দেহত্যাগের পর এ খোলসটাকে সেখানেই তোমরা রেখে দিও।”

ভক্ত-শিষ্যেরা সাশ্রুনয়নে অনুরোধ জানান, "বাবা, আর কিছুদিন থেকে গেলে হতো না? কৃপা করে তাই করুন।"

মৃদু হাসিয়া যোগত্রয়ানন্দ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "শ্রীগুরু বাবার চরণে নিজেকে এবার একেবারে সঁপে দিয়েছি। আর থাকা যায় না। আমায় এবার যে যেতেই হবে।"

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর। সেদিন গভীর রাতে মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দ সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হন, তারপর এদিক ওদিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন।

পুত্র ইন্দুভূষণ বাহিরের বারান্দায় নিদ্রিত ছিলেন, কে যেন তাঁহাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়া গেল, "আর বিলম্ব না করে বাবার কাছে যাও।"

পুত্র ও ভক্তেরা নিকটে দাঁড়াইতেই প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "এখনি আমায় তোমরা গঙ্গায় নিয়ে চল।"

সবাই মিলিয়া দেহটি বহন করিয়া আনিলেন গঙ্গাতটে। পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া যোগত্রয়ানন্দ কিছুক্ষণ ধ্যানাবিষ্ট রহিলেন। তারপর ভক্ত ও শিষ্যদের শোকসাগরে ভাসাইয়া মগ্ন হইলেন চিরসমাধিতে।